দেশ

] শনিবার, ৮ ভাদ্র, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 25th August, 1973 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা ৪৩
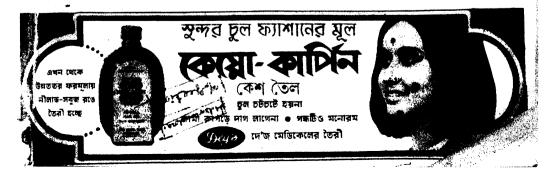
নতুন তিন ভাবে কার্যকর ডেট

নতুন ডেটে রয়েছে সবচেয়ে সাদা ক'রে কাপড় ধোয়ার জন্যে সাদা করার একটি উৎকৃষ্ট পদার্থ।

নতুন ডেটে রয়েছে সাদা করার বাড়তি শক্তি। এটি কাপড়ের পুরনো ময়লা দূর ক'রে দেয় আর রঙীন কাপড় উজ্জ্বল ক'রে তোলে।

নতুন ডেটে প্রচুর ফেনা হয় আর এই ফেনায় রয়েছে কাপড়-চোপড় নরম করার বিশেষ গুণ। এটি যেমন আপনার জামাকাপড়ের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ--তেমনি আপনার হাতের পক্ষেও সবচেয়ে নরম।

সাদা ডেট

নীল ডেট

নতুন সাইজ : ডেট ২০০, ৪০০, ৬০০, ৮০০, ১০০০ প্যাক

আরেকটি উৎকৃষ্ট ডেট উৎপাদন
ডেট কেক

সাবানের তুলনায় ১½ গুণ বেশী কাপড় ধোয়, আগের তুলনায় অনেক বেশী সাদা হয়—তা সে জল যে ধরণেরই হোক।

Shilpi HPMA-40A/72 Ben

পেপার-ব্যাক ক্লাসিক্স্ ও বাংলা পকেট বইয়ের স্থায়ী গ্রাহকরা যে কোন তিনখানি বই একসঙ্গে নিলে শতকরা কুড়ি টাকা বা টাকা পিছু ২০ পয়সা বাদ পাবেন। সাধারণ ক্রেতারা পাঁচখানি পকেট বই একসঙ্গে নিলে ১৫% বাদ পাবেন — অর্থাৎ মোট টাঃ ৮.৫০ পয়সায় পাবেন। পেপার ব্যাক ক্লাসিক্স-এর দ্বিতীয় দফায় চারখানি বই একত্রে নিলে যে কোন ক্রেতা মোট দাম ১৮৷৷ স্থলে মাত্র ১৬ টাকায় পাবেন।

দ্বিতীয় দফার চারখানি বই :—

প্রমথনাথ বিশীর কেরী সাহেবের মুন্সী ৬৲ · প্রবোধকুমার সান্যালের মহাপ্রস্থানের পথে ৩৷৷ · অন্নদাশঙ্কর রায়ের পথে-প্রবাসে ৩৲ · বনফুলের স্থাবর ৬৲

স্থায়ী গ্রাহক এখনও হ'তে পারেন। পত্র লিখুন

যাযাবরের নতুন বই **হ্রস্ব ও দীর্ঘ ৪৲**

বিমল মিত্রের নতুন বই আসামী হাজির ৩০৲

জ্যোতির্ময়ী দেবীর নতুন বই সোনা রূপা নয় ১৫৲

বিমল করের নতুন বই **সেতু ৫৲**

নীহাররঞ্জন গুপ্তের বিখ্যাত বই **কোমল গান্ধার ৮৲**

দক্ষিণারঞ্জন বসুর নতুন বই **প্লাবন ৫৲**

প্রমথনাথ বিশীর **লালকেল্লা ১৮৲**

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **বহ্নিবন্যা ১১৲**

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **শতরূপে দেখা ১৪৲**

আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৮৲ · যার যা দাম ৫৲

তারাশঙ্করের ১৯৭১-৬৲

আবদুল জব্বারের বাংলার চালচিত্র ১১৲

জরাসন্ধের শ্রেষ্ঠ গল্প ৬৷৷ · নিঃসঙ্গ পথিক ১০৲ · রাজা উজীর ৮৲

সৈয়দ মুজতবা আলীর টুনিমেম ১০৲

প্রেমেন্দ্র মিত্রের হার মানলেন পরাশর বর্মা ৪৷৷

অবধূত/শঙ্কুমহারাজের পঞ্চ-প্রয়াগ ৫৷৷

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সারী তুমি কার ৫৲

[...]রঞ্জন গুপ্তের [...]ক কথা ৬৷৷

হরিনারায়ণের ভোরের আকাশ ৬৷৷

সাহানা দেবীর মৃত্যুহীন প্রাণ ৪৷৷

উমাপ্রসাদের কাবেরী কাহিনী ৫৲

হেমলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের [...]নেন্দ্রনাথ ৬৷৷ অসংখ্য চিত্রসমৃদ্ধ

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর **বাঙালী জীবনে রমণী ১০৲**

মুকুল চক্রবর্তীর **ঘাটশীলায় বিভূতিভূষণ ৪৲**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের **অনশ্বর ৫৲**

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের চিরদিনের রূপকথা — অমর গ্রন্থ

ঠাকুরমার ঝুলি ৫৷৷ · **ঠাকুরদাদার ঝুলি ৫৷৷**

দাদামশায়ের থলে ৫৲ · **কিশোর গ্রন্থাবলী ৪৷৷**

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সঞ্চয়ী পরিবারই সুখী পরিবার

আপনার নিজের বার্দ্ধক্যের ও পরিবারের যাবতীয় আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য এখন থেকেই সঞ্চয় সুরু করুন।

'পিয়ারলেস'-এর সহজ ও বিশেষ লাভজনক সঞ্চয় পরিকল্পনায় যোগ দিয়ে ছেলেমেয়ের শিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান ক'রে রাখুন। বিশদ বিবরণের জন্য আজই কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা নিকটবর্তী এজেন্টের নিকট খোঁজ নিন।

'পিয়ারলেস'-এর সঞ্চয় পরিকল্পনায় ইতিমধ্যেই দুই লক্ষাধিক ব্যক্তি যোগদান করেছেন।

— বিনা খরচায় —

দুর্ঘটনা এবং কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যু-বীমার সুযোগ নিন—

"পিয়ারলেস"-এর মাধ্যমে সঞ্চয় করুন।

PHASA

দি পিয়ারলেস জেনারেল ইন্সিওরেন্স

এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ • (স্থাপিত ১৯৩২)

রেজিঃ অফিস: পিয়ারলেস হাউস

৫/২, ফকির দে লেন • কলিকাতা-১২

গভঃ সিকিউরিটিতে লগ্নী—এক কোটি টাকার উর্দ্ধে (Face Valu.)

সূচীপত্র

বিষয় — লেখক — পৃষ্ঠা

বিশেষ সুযোগ

সহৃদয় সাহিত্যিক ও রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকের সাহিত্যরসপিপাসা চরিতার্থ করবার সুযোগ সম্প্রসারিত হয় এই উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থে পাঠক ও পুস্তকবিক্রেতাদের বিশেষ কমিশন দেওয়া হবে। আগামী রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

১। বিচিত্রা ॥ ২৩টি বিভাগে রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ রচনার বিচিত্র সংকলন। মূল্য ১৮·০০, ২০·০০ টাকা

২। ভারতপথিক রামমোহন রায় ॥ নবযুগের পথিকৃৎ মহাত্মা রামমোহনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাঞ্জলি। মূল্য ৪·৫০ টাকা।

৩। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ॥ রবীন্দ্রচর্চামূলক পত্রিকা। রবীন্দ্রজিজ্ঞাসু গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে অবশ্য-সংগ্রহযোগ্য। প্রথম খণ্ড ১৫·০০, দ্বিতীয় খণ্ড ২০·০০

৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ ॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত মৌলিক নাটকের সংকলন। মূল্য ১৪·০০, ১৬·০০ টাকা

॥ কমিশনের হার ॥

সাধারণ ক্রেতা শতকরা ২০·০০ টাকা

পুস্তকবিক্রেতা শতকরা ৩০·০০ টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট । কলিকাতা ১৬

ফোন ঃ ৪৪-৯৮৬৮-৬৯

পূজোর পূর্বেই প্রকাশিত হইবে

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

রম্যাণি বীক্ষ্য

আর একখানি নূতন পর্ব লিখছেন

অবন্তীপর্ব

এই গ্রন্থে কালিদাসের অবন্তী ও বিদিশার কথা নয় বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, ভোজরাজের ধারানগরী, চান্দেল্লাদের মন্দিরময় খাজুরাহো, পাঠানদের দুর্গ মাণ্ডু অহল্যাবাঈ-এর ইন্দোর ও মহেশ্বর, এবং লক্ষ্মীবাঈ-এর ঝাঁসির কথাও পাবেন। আরও পাবেন অমরকণ্টকে নর্মদার উৎস থেকে জব্বলপুরে তার সুন্দর জলপ্রপাত ও ওঙ্কারজীতে তার দুই ধারায় বেষ্টিত দ্বীপে জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বর, পশ্চিমঘাট পাহাড়ে প্রাচীন গুহামন্দির বাঘ ও বিন্ধ্য পর্বতে পাচমারি শৈলাবাসের পরিচয়, মানসিংহের গোয়ালিয়র, শিবপুরী ও মাণ্ডলার কথাও আছে, আছে মধ্যপ্রদেশের ইতিহাস, শিল্প সংস্কৃতি আদিবাসী ও দস্যুদের কথাও। বহু চিত্রশোভিত মূল্যবান গ্রন্থ।

—এ পর্বগুলি আবার ছাপা হলো—

উৎকল পর্ব—সপ্তম সং ১০·০০

কালিন্দী পর্ব—নবম সং ১০·০০

মগধ পর্ব—চতুর্থ সং ১০·০০

হিমাচল পর্ব—ষষ্ঠ সং ১০·০০

অন্যান্য পর্বগুলিও আছে।

* * *

—সম্প্রতি বাহির হইয়াছে—

বাংলার সাধক

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মূল্য ৮·০০

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

—প্রকাশক—

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি ৭১১১)

কর্কট-মকরে মিলে আনে স্বর্গের আলো
লালভাইয়ের গোলাপী-সবুজ সবার লাগে ভালো

UC-3 BEN

সর্দি ও ফ্লুতে যাঁরা কষ্ট পাচ্ছেন তাঁদের জন্য!

সর্দি পালাবে:

সর্দি ও ফ্লুর সব কষ্ট দূর করতে
সর্দির জন্য বিশেষভাবে তৈরী কোল্ডারিনের
একটি বড়ি খান—এর সঙ্গে মেশানো
ভিটামিন 'সি' সর্দির
আক্রমণ প্রতিরোধ
করার শক্তি
গড়ে তোলে।

বিশেষভাবে তৈরী কোল্ডারিন
আপনার সর্দি ও ফ্লুর সব কষ্ট তাড়া-
তাড়ি দূর করে। এর সঙ্গে মেশানো
ভিটামিন 'সি' আপনার সর্দির
আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তি গড়ে
তোলে। সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই
মাত্র একটি কোল্ডারিনের বড়ি
খান—যতদূর সম্ভব খাবার পরে।

সর্দির অমোঘ বড়ি

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রাণেশকুমার মণ্ডল

রচনাবলী

রামমোহন রচনাবলী ১০৲
মধুসূদন রচনাবলী ১১৲
দীনবন্ধু রচনাবলী ৯৲
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ২০৲

প্রতিটি রচনাবলীর জন্য ৫৲ দিয়ে গ্রাহক হোন। বাংলাসাহিত্যে রচনাবলীর প্রকাশনা যে কত উন্নত মানের হতে পারে আমাদের প্রকাশিত রচনাবলীগুলি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। নির্ভুল পাঠ, সুসম্পাদিত, দামী কাগজ, ঝকঝকে টাইপ, সুদৃঢ় রেক্সিন বাঁধাই, স্বর্ণাঙ্কিত নাম, মনোরম আবরণী। আমাদের প্রতিটি রচনাবলী ডিলাক্স এডিশন এবং ৫০ বছর স্থায়ী একটি অমূল্য সম্পদ।

হরফ প্রকাশনী। এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা—১২

(সে ৭০৭৪)

শারদীয়া

রজনীগন্ধা

৭টি উপন্যাস : ৭টি গল্প
১টি বড় গল্প : ২টি রম্য রচনা

বুদ্ধদেব বসু
প্রেমেন্দ্র মিত্র
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
শিবরাম চক্রবর্তী
বিমল কর
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
মতি নন্দী
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব গুহ
শংকু মহারাজ
নটরাজন
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী
বাসুদেব বসু
অন্নদাশংকর রায়

এবং

সমরেশ বসুর
অসহযোগ

পূর্ণাঙ্গ সূচী আগামী সপ্তাহে

দাম : সাড়ে পাঁচ টাকা

১০, কালী [illegible] রোড, কলি—১৩

(সে ৬৯৩৯)

পঁচিশ বছর পরে

দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ পঁচিশ বছর, অথচ ভারতের জনমানসে তার স্পন্দন কতটুকু এ-চিন্তা মনে এলে বিমর্ষ হতে হয়। স্বাধীনতা পাবার পর একটি যুগ কেটেছে আশায় আশায়, দেশ গঠনের প্রাথমিক কিছু পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে। এক-দিকে ছিল ঘর সামলাবার বিরাট দায়িত্ব, অন্য দিকে দায় ছিল বাইরের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থির করা। প্রথম বা দ্বিতীয় কোনোটাতেই আমাদের সাফল্য বিরাট কিছু নয়, আবার এমনও নয় যে আমরা কিছুই অর্জন করিনি। সর্ব-দেশের প্রীতি ও বন্ধুত্ব অর্জন করতে না পারলেও আমরা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে একটি ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। তবু সেই প্রথম যুগটি কেটে যাবার পর গত দশ বারোটি বছরে আমরা বোধ করি আরও সংকটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়েছি। সমস্ত দেশের দিকে তাকালে আজ যা চোখে পড়ে তাতে বিমর্ষ না হয়ে উপায় নেই। অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে, রাজ-নৈতিক দলগুলোর [illegible] এবং স্বার্থপরতায় বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, জন-সংখ্যার চাপ হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, বেকারের সংখ্যা স্ফীত হয়ে উঠছে বছরে বছরে, প্রাদেশিকতার বিদ্বেষ বাড়ছে, প্রশাসনের সর্বস্তরে আলস্য ও অকর্মণ্যতা ব্যাপক হয়ে উঠেছে। এমন অবস্থায় জনমানসে উদ্দীপনা আসা সম্ভব নয়। অথচ অস্বীকার করা যাবে না যে সরকার দেশের উন্নতির জন্যে গঠনমূলক কর্মসূচী নেন নি। পরি-কল্পনার কয়েকটি ধাপ শেষ হয়েছে, জাতীয়করণের কোনো কোনো দাবিও মেটানো হয়েছে। তবু জনসাধারণের এই দুর্গতি কেন? কেন এত দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সংকীর্ণতা, অনুৎসাহ? এর জন্যে সরকারী কর্মসূচীর কিছু ভুল-ভ্রান্তির সঙ্গে প্রশাসনের ব্যর্থতা অনেকটা দায়ী। কিন্তু একটি গোষ্ঠী— দেশের অর্থনীতিকে যারা কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের স্বার্থপরতা নিশ্চয় আরও বেশী দায়ী। সরকারের যদি এই নীতি হয় যে, দেশকে ধীরে ধীরে সমাজবাদের পথে নিয়ে যাওয়া হবে তবে তাতে আপত্তি করার তো কিছু নেই। কিন্তু সরকারী এই নীতিকে বাস্তবে রূপদান করার জন্যে যারা আছে তারা কাজে কর্মে আমাদের কোন অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে সেটা কী নতুন করে বলে দিতে হবে? যে দেশের ব্যাঙ্ক আমানত ১৯৭১-৭২ পর্যন্ত ৬৫০০ কোটি টাকায় উঠেছিল সে-দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে কত কোটি টাকা যথার্থভাবে খাটছে তা কী আমরা জানতে পারি? এই বিপুল পরিমাণ টাকা জনসাধারণের কতটুকু উপকারে আসছে? সরকারের সদিচ্ছা যতই থাক, জনস্বার্থবিরোধী একটি শক্তি দেশের প্রগতির অনেক চেষ্টাই বিফল করে দিচ্ছে। এই শক্তির সঙ্গে প্রশাসনের [illegible] কিছু কম নয়। দেশের শতকরা সত্তর ভাগ লোক যেখানে দরিদ্র, সেখানে এই জনস্বার্থ বিরোধী শক্তিকে দমন করতে না পারলে কোনো সদিচ্ছাই পালন হবার নয়। সরকার এবং প্রশাসন যদি এমন ব্যবস্থা না করতে পারেন যাতে জনসাধারণ কর্মে উৎসাহ ও সাহস পায় তবে আমাদের দেশে জনমানসে কোনো উদ্দীপনা আসবে না।

সুরেশচন্দ্র

গত সাতাশে শ্রাবণ সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ঊনবিংশ মৃত্যু-বার্ষিকী পালিত হয়েছে। সুরেশ-চন্দ্র সর্বভারতীয় রাজনীতিতে হয়ত প্রখ্যাত পুরুষ নন, কিন্তু বাংলাদেশের বিপ্লব আন্দোলনের কাল থেকে দেশ স্বাধীন হবার পর যে বঙ্গীয় রাজনীতি সজীব ছিল তিনি তার অন্যতম কর্মী ছিলেন। সুরেশচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন প্রচারবিমুখ ছিল, স্বভাবতই সাধারণে তা অবহিত নন। তিনি রাজ-রোষে নিপীড়িত হয়েছেন, বাধা পেয়েছেন, বৃটিশ শাসনের সদা সতর্ক চক্ষুর মধ্যে দিন কাটিয়েছেন, তবু দেশসেবা থেকে বিরত থাকেন নি। জাতীয়তাবাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল দৃঢ়, সমাজ-সেবায় তাঁর নিষ্ঠা ছিল আন্তরিক। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র যদিও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রধানত দেশসেবায় নিয়োজিত ছিলেন তবু তাঁর নেতৃত্ব পরামর্শ এবং সাহায্য তৎকালীন রাজনীতিকে অনেক পরি-মাণে ঋণী করে রেখেছে। মানুষ এবং কর্মী হিসেবে সুরেশচন্দ্র যেসব গুণের অধিকারী ছিলেন তা তাঁর পরিচিত বন্ধুবর্গ এবং আমরা অনেকেই জানি। এই মানুষটির তিরোধান-দিবস আমাদের ব্যথিত করে। তাঁর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

৪০ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৩
শনিবার, ৯ ভাদ্র ১৩৮০
Saturday 25 August 1973

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম : ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৬.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৮.৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯.৫০

আসামে ও ত্রিপুরায়
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৪৪.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ২২.৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১.৫০

ভারতের বাইরে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৮৭.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৪৪.০০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ২২.০০
বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৬০.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৩১.০০

লণ্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক — টাঃ ১৭৪.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৮৭.৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৪৪.০০

ভেজাল চাল.....
ভেজাল তেল.....
ভেজাল দুধ. ঘি. ওষুধ, মশলা....
ভেজাল সমাজতন্ত্র.....

প্রভৃতি আমাদের পাল। তাঁরা ওই নিয়ে মশগুল থাকতে চান।

*

আমাদের সমাজে কেন, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সমাজেই কিছু না কিছু দুর্নীতি আছে। কোথাও খুব কম, কোথাও মাঝারি, কোথাও বা খুব বেশি। যেমন ধরুন, এই ভারতেরই কথা। প্রশাসনে ও রাজনীতিতে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে যত দুর্নীতি তত দুর্নীতি পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা বা কেরল, অন্ধ্রে নেই। তামিলনাড়ুতেও দুর্নীতি কম ছিল, ডি এম কে রাজত্ব আসার পর অবশ্য তামিলনাড়ুতে দুর্নীতি অনেক বেড়েছে।

কিন্তু দুর্নীতি কম বেশি সর্বত্র আছে এবং আপনি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করেন তা হলে সর্বত্রই কিছু না কিছু দুর্নীতি বের হবে। কোথাও হয়তো দেখা যাবে মন্ত্রী শুধু রাজনীতির জন্য টাকা নেন। (ভারতের সব বড় পার্টিই রাজনীতির জন্য টাকা নেয়।) কোথাও দেখা যাবে তিনি ... দুস্থ ভাইদের জন্য টাকা তোলেন। কোথাও বা দেখা যাবে তিনি নিজের জন্যই টাকা তোলেন। আবার কোথাও কোথাও মন্ত্রী টাকা স্পর্শই করেন না। কোথাও দেখা যাবে বেয়ারা চাপরাশি থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত অফিসার পর্যন্ত সবাই টাকা নেন। কোথাও বা দেখা যাবে নেহাত দিলে বেয়ারা চাপরাশি বকশিস নেয় এবং অফিসাররা ডালি নেয়। কিন্তু কেউই ঘুষ নেয় না।

একেবারে ঘুষ নেন না এমন শত শত মন্ত্রী, অফিসার, কেরানী আছেন আমাদের দেশে। সৎ লোকেরও অভাব নেই। আবার অভাবেই — বলুন বা স্বভাবেই বলুন, দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেরও অভাব নেই। কোনও প্রশাসন, কোনও পার্টি পুরোপুরি দুর্নীতি মুক্ত নয়।

প্রশ্ন হল, আপনি কোনটা আগে করবেন? দুর্নীতি দমন করতে আগে নামবেন, না আগে কাজ করার চেষ্টা করবেন?

কথাটা শুনতে খুব খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু রিপোর্টার হিসাবে এটা আমার প্রান্তর অভিজ্ঞতা—আপনি যদি দুর্নীতি ধরার জন্য খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, যদি সব সময় দুর্নীতি ধরার জন্য ওঁৎ পেতে থাকতে চান, বা যদি সব কিছু সন্দেহের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে থাকেন, তা হলে কাজকর্ম বন্ধ হবে, নিদেনপক্ষে ভীষণ কমে যেতে বাধ্য।

কাজ কমতে বাধ্য এই জন্য নয় যে, দুর্নীতির সুযোগ না থাকলে কেউ কাজ করবেন না। সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত এই ধারণা একটা অত্যন্ত ভুল। অধিকাংশই সৎ। কিন্তু দুর্নীতির আতঙ্ক খুব বেশি ছড়ালে, দুর্নীতি নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি চললে সৎ কর্মী বা অফিসার বা মন্ত্রীরাও ভয় পেতে বাধ্য। তখন সবাই চেষ্টা করবেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে রাখতে। বিশেষভাবে যেখানে টাকা পয়সার ব্যাপার জড়িত। যাতে ভবিষ্যতে কোনও প্রশ্ন উঠলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য কেউ তাঁকে ধরতে না পারে।

কীভাবে এ জিনিস হয় আমি তার দুটো সাম্প্রতিক উদাহরণ দিচ্ছি। একটা হল প্রভুদয়াল গুপ্তকে নিয়ে। আর একটা ওড়িশার চাল আনার ব্যাপার। খাদ্য দফতর বেশ কয়েক মাস ধরেই নানা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। দফতরের প্রত্যেকেরই ভয়, কোন্ দিনের কোন্ সিদ্ধান্তের জন্য কাকে ধরা হয়।

এবার প্রভুদয়াল গুপ্ত ধরা পড়ার পর খাদ্য দফতরের নীচের দিকের লোকজন ঊর্ধ্বতন অফিসারদের জানালেন, স্যার, প্রভুদয়াল গুপ্তের ... নামে একটা রেশনের দোকান আছে। বলুন, এই রেশনের দোকান বাতিল করে দেব কিনা। সংশ্লিষ্ট অফিসাররা মহা মুশকিলে পড়লেন, কী করা, হ্যাঁ বললেও বিপদ হতে পারে, না বললেও বিপদ হতে পারে। তাই তাঁরা কেউ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন না। প্রত্যেকেই তাঁর ওপরওয়ালাকে ফাইল পাঠাতে আরম্ভ করলেন।

এইভাবে ফাইল পৌঁছল ফুড কমিশনার অর্থাৎ দফতরের সবচেয়ে বড় অফিসার পর্যন্ত। তিনিও কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত নিতে সাহস পেলেন না। তিনি ফাইলটা পাঠিয়ে দিলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং এল আর-এর কাছে। আইনগত পরামর্শের জন্য। তাঁরা দুজনেই আইনের সব দিক দেখলেন। কিন্তু চূড়ান্ত রায় কেউই দিলেন না।

এর পর ফাইল গেল খাদ্যমন্ত্রীর কাছে। ফল অবশ্য একই হল। তিনিও কোনও সিদ্ধান্ত নিলেন না। ফাইল পাঠিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

একটা রেশন দোকান 'বাতিল করা না করার ফাইল যদি এইভাবে ছোটাছুটি করে তা হলে কাজ চলবে কী করে?

আরও একটা উদাহরণ দেই। ওড়িশা সরকার বললেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওড়িশার বাজার থেকে ১০ হাজার টন চাল নিতে পারেন। তবে, কিনতে হবে উড়িষ্যার সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে। খোলা বাজারের দরে। এবং পশ্চিমবঙ্গেও চালটা আনবেন সমবায় প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিগত কোনও প্রতিষ্ঠানকে এই চাল আনতে দেওয়া হবে না।

এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের যেটা কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান সেইটা অগ্রসর হল এই চাল কিনতে। ওড়িশায় গিয়ে কথাবার্তা ও ঠিক হল। দরও চূড়ান্ত হল। হিসাব করে ওঁরা দেখলেন ১ টাকা ৬৫ পয়সায় খুব ভাল চাল পাওয়া যাবে। ওড়িশা সরকার প্রথম পর্যায়ে ৫০০ টন চাল পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতিও দিলেন।

এইবার এল পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য দফতরের ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গের ওই কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান রাজ্য খাদ্য দফতর থেকে জানতে চাইল, আমরা এই দরে চাল আনছি ওড়িশা থেকে। পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল শহরগুলিতে বিক্রয়মূল্য দাঁড়াবে কিলো প্রায় ১ টাকা ৭৫ পয়সা। আপনারা অনুমতি দিন।

কিন্তু সে অনুমতি আর কেউই দিলেন না। ফাইল ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেল। প্রথম যিনি ফাইলে নোট দিলেন সেই কেরানী লিখলেন: চালটা না আনা পর্যন্ত দরটা ঠিক করে দেওয়া হবে কিসের ভিত্তিতে? চাল দেখে তবে না দর ঠিক করা যায়।

মন্ত্রী পর্যন্ত কেউ এই মতামত অবজ্ঞা করতে পারলেন না। সবাই বললেন: প্রশ্নটা সঙ্গত।

ওই সমবায় প্রতিষ্ঠান বললেন: মহা মুশকিল তো। চাল না কিনে না এনে আমরা তা দেখাবো কি করে? আর আনার পর যদি আপনারা বলেন, চালটা ১ টাকা ৫৫ পয়সা দরে বিক্রি করতে হবে, তা হলে তখন আমরা কী করব ওই চাল নিয়ে? আমরা নমুনা এনেছি, তা দেখাতে পারি।

সেই কেরানী আবার নোট দিলেন: নমুনা মতই যে সব চাল হবে তার গ্যারান্টি কী? চাল তো আর মেসিনে তৈরি হয় না।

আবার সবাই সেই নোটে সম্মতি দিলেন। সকলেই বললেন: ঠিক কথা।

পশ্চিমবঙ্গে ... আনার ব্যাপারে যখন এই রকম টালবাহানা চলছে তখন কেরল সরকার ছোঁ মেরে সব চালটা তুলে নিয়ে গেলেন। তাঁরা ওই চাল কেরলে ২ টাকা ৫০ পয়সা পর্যন্ত বিক্রি করার অনুমতি দিলেন।

সব চাল চলে গেল কেরলে। পশ্চিমবঙ্গ কিছুই পেল না।

তা হলেই দেখুন, দুর্নীতির অভিযোগের হিড়িকে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য দফতরের এখন কী অবস্থা!

আপনি আমি কি এই অবস্থা চাই? না, আমরা কাজ চাই?

তাই বলছিলাম, দুর্নীতি বিরোধী অভিযান ভাল, কিন্তু তা নিয়ে বেশি মাতামাতি করলে কাজকর্ম সব বন্ধ হতে বাধ্য।

১৩-৮-৭৩

সুবারণ গুপ্ত

লিমিটেড ডিকটেটর

—ভারতের প্রথম লিমিটেড ডিকটেটর মহামান্য শশিভূষণ জবরদস্ত বাহাদুর! ভারতের নতুন রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে আপনি ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং আমার মাধ্যমে আমাদের কাগজের অগণিত পাঠক-পাঠিকার শর্তহীন আনুগত্য এবং আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এবং আপনি আমাদের কাগজকেই আপনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়ে যেভাবে আমাদের সম্মানিত করেছেন, সেজন্য প্রথমেই আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই এবং লিমিটেড ডিকটেটর হিসাবে আপনার সাফল্য, শ্রীবৃদ্ধি এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি। হে প্রবল প্রতাপ, আমাদের পাঠক-পাঠিকারা আপনার সঙ্গে আমাদের কাগজের একান্ত সাক্ষাৎকারের বিবরণ পাঠ করার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি, অনুগ্রহ করে যদি বলেন?

—বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা বা সে সম্পর্কে ভাববার সময় আমি এখনও পাইনি। তবে এই কথাটা জানিয়ে দিতে পারেন, দেশ এখন মহা দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই আমি চাই জাতীয় ঐক্য। আমি জাতীয় ঐক্যের উপরই জোর দিতে চাই। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পথে অনৈক্যই বড় বাধা।

—মহাত্মন্, লোকসভার আগামী অধিবেশনে আপনি কি এই সম্পর্কে কোনও পরিকল্পনা পেশ করবেন?

—লোকসভার কোনও অধিবেশন দেশের এই দুঃসময়ে বসাবার ইচ্ছে বা সময় আমার নেই। তা ছাড়া লোকসভা অনৈক্যের জন্ম দেয়।

—তবে কি স্যর, লোকসভা ভেঙে দিতে চান?

—এখন লিমিটেড ডিকটেটরশিপ, লোকসভা ভাঙার প্রশ্ন এখনই উঠছে না। ওটা ধাপে ধাপে ভাঙতে হবে। তাই আমার প্ল্যান হচ্ছে লোকসভা এখন থাকবে তবে স্পিকারকে কিছু দিনের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে দেব। স্পিকার না থাকলে লোকসভার অধিবেশন ডাকবে কে?

—কেন স্যর, ডেপুটি স্পিকার। স্পিকারের অনুপস্থিতিতে কাজ চালাবার অধিকার তাঁকেই বর্তাবে।

—তবে তাঁর অনুপস্থিতিরও স্থায়ী একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

—তাকে বুঝি রাষ্ট্রদূত করবেন স্যর?

—না, জনবিরোধী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কয়েদ করে রাখব।

—আশ্বস্ত হলাম। এবার আপনার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা অনুগ্রহ করে যদি জানান।

—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার। ব্যাপক জাতীয়করণের মাধ্যমে গরিবি হটাও-র চেষ্টা। আভ্যন্তরীণ বিরোধী শক্তিগুলিকে ঝাড়ে-বংশে বিনাশের দ্বারা দেশে স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং বন্ধুভাবাপন্ন ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলির কাছ থেকে খাদ্য সাহায্যের জন্য চুক্তি সম্পাদন। এই সব কাজ, আশা করি আমি আগামী ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই শেষ করতে পারব। ১৭ সেপ্টেম্বর, বুঝেছেন?

—১৭ সেপ্টেম্বরের উপর আপনি এত গুরুত্ব আরোপ করছেন কেন, স্যর। এর কি বিশেষ কোনও কারণ আছে?

—আছে বইকি। কারণ তখনই তো আমি আমাকে উৎখাত করার প্রথম ষড়যন্ত্রের কথা গুপ্তচর মারফত টের পেয়ে যাব।

—ষড়যন্ত্রটা কি সফল হবে বলে মনে করেন?

—মোটেই না। এই ষড়যন্ত্রের বিফলতা আমার হাতকে শক্তিশালী করে তুলবে। আমি লোকসভা এবং রাজ্যসভা বাতিল করে দেব। এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে স্বদল এবং বিরোধী দলগুলো থেকে পাইকারি করে নেতৃস্থানীয় সদস্যদের বেছে নিয়ে ভারতীয় জনগণের স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ইনডিয়া গেটের সামনে গুলি করে মারব। প্রেস ফটোগ্রাফার এবং নিউজ রিল ক্যামেরাম্যানরা যাতে অ্যাকশান ছবি তুলতে পারে, তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখা হবে।

—বিরোধী দলের নেতাদের মারার কারণ বুঝি। কিন্তু স্যর, নিজের দলের নেতাদের মারলে—

—লোকে আমার নিরপেক্ষতার সন্দেহ প্রকাশ করবে না। আমার ইমেজ উজ্জ্বল হবে। আবার ওদিকে যারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারত, এই সুযোগে তাদের খতম করে আমার লিমিটেড ডিকটেটরশিপ আনলিমিটেড করে তুলব। অবিশ্যি এটা অফ দি রেকর্ড।

—ব্যাপারটা কিন্তু তাই স্যর, এত অল্পের উপর দিয়ে মিটবে না।

—এত বড় একটা জনস্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্র, আর এই দিয়ে, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মানেই জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, মানেই জনস্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্র, এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপার, এর ফয়সালা কি মাত্র গোটা কতক পলিটিশিয়ানকে মারলেই মিটবে? না লোকে বিশ্বাস করবে? এ বিষয়ে একটা মোটামুটি প্ল্যান আমার নোট বইতে টোকা আছে। নোট বইটা দেখে বলছি। হ্যাঁ, পলিটিক্যাল নেতাদের হত্যার পনের দিন পর আমার প্রধান বিশ্বস্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গুপ্তঘাতী হবেন।

—ষড়যন্ত্র, স্যর!

—অবশ্যই। তারপর প্রতিরক্ষামন্ত্রী একদিন পালাবার চেষ্টা করবেন এবং অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হবেন। মিলিটারি ট্রাইবুনালের হাতে এই বিষয়ের তদন্তের ভার দেওয়া হবে। ফলে সেনাবাহিনীর একজন প্রবীণ জেনারেল, নৌ-বাহিনীর একজন অ্যাডমিরাল এবং বিমানবাহিনীর একজন উইং কম্যান্ডারের প্রাণদণ্ড হবে। সারা দেশে কারফু এবং সামরিক আইন জারি হবে। দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হবে। খাদ্যের মজুত উদ্ধার ও চোরাকারবার দমন করার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে সতের জন করে দোকানি পাইকারি করে মনোহারী দোকানের মালিক, এবং পাঁচ জন করে সবজি, মাছ ও মাংস বিক্রেতাকে ক্রুদ্ধ জনতা লেলিয়ে দিয়ে প্রথমে পিটিয়ে মেরে ফেলা হবে এবং আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য পরে ক্রুদ্ধ জনতার উপর টহলদার মিলিটারি নির্বিচারে মেশিন গান চালাবে। এইভাবে মিলিটারি কড়া দাপটে কাজ চালাবে।

—তারপর কি ঘটবে, স্যর?

—তারপর, একদিন সকালে, আন্দাজে আগামী ২০ নভেম্বর, একদিন আগে কি একদিন পরেও হতে পারে, আমার মিলিটারি বডি গার্ডরা আমাকে বন্দী করবে এবং ওদের তরুণ নেতাদের নির্দেশে বেতার কেন্দ্রে গিয়ে উদাত্ত নির্দেশে বেতারে পার্লামেন্টের দিকে চোখ রেখে জাতির উদ্দেশে আমাকে শেষ ভাষণ দিতে হবে, আমার লিমিটেড ডিকটেটরশিপ সানন্দে বাতিল করে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সমস্ত ক্ষমতা আজ থেকে পূর্ণ ডিকটেটরের হাতে অর্পণ করলাম।

—তারপর, স্যর?

—তারপর আমার মৃতদেহটা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ পাঁচ দিন ইনডিয়া গেটের সামনে ঝোলানো থাকবে।

যে জন আছে মাঝখানে

দেবরাজ

বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত পালা করে বিলেতে মন্ত্রিত্ব করেছে দুটো দল। শুরুতে তাদের নাম ছিল হুইগ আর টোরি, তারপর পালটে হয়েছে লিবারাল আর কনজারভেটিভ অর্থাৎ উদারনৈতিক আর রক্ষণশীল। লিবারালদের কপাল পুড়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। সে লড়াই যখন বাধে তখন সরকার তাদেরই দখলে। জার্মানদের মোকাবিলা করার জন্যে লড়াইয়ের সময় একটিমাত্র দল নিয়ে গড়া সরকার ভেঙে দিয়ে গড়া হয়েছিল মিশ্র সরকার, তবে প্রধানমন্ত্রী রইলেন লিবারাল দলের অ্যাসকুইথই। যুদ্ধ চলতে চলতেই মন্ত্রিসভা ভেঙে যখন নতুন করে গড়া হলো তারও প্রধানমন্ত্রী হলেন লিবারাল দলেরই আর একজন চাঁই ডেভিড লয়েড জর্জ। বিলেতে তিনিই শেষ উদারনৈতিক প্রধানমন্ত্রী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই উপদলীয় কোঁদলে নষ্ট হয়ে গেল উদারনৈতিক দল। তাদের হয়ে দাঁড়ালো বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি। সেই থেকে নির্বাচনী লড়ায়ে কেল্লা ফতে তারা আর করতে পারে নি ফিরবার আসরে নামলেও।

উদারনৈতিক দলের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়লেও বিলেতে দু দলের পালা করে দেশ শাসন করার রেওয়াজ বাতিল হয়ে যায়নি। লিবারালদের জায়গা নিয়েছে লেবার অর্থাৎ শ্রমিক দল। ১৯১৮ সনের নির্বাচনেই তারা হয়েছিল মুখ্য বিরোধী দল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত হয় তারা জিতে গদি দখল করেছে নয় হেরে মুখ্য বিরোধী দল হয়েছে। উদারনৈতিকরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি বটে তবে দু প্রধানের ধারে-কাছেও তারা আর ঘেঁষতে পারছে না—গুটিকয়েক আসনে জিতে কোনও রকমে তারা সিঁথের সিঁদুর বজায় রেখেছে। দশটা আসনও সব বার তাদের বরাতে জোটে না। ১৯৬৬ সনে তারা পেয়েছিল ১২টা আসন সত্তরের নির্বাচনে তা দাঁড়িয়েছিল কমে ছয়-এ। দেশে-বিদেশে লোককে ধরে নিয়েছিল বিলেতে নির্বাচনী দৌড়ের পাল্লায় তিন নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দু প্রধানের সঙ্গে সমানে লড়বার যে আশা লিবারালদের আছে তা কোনও দিনই পুরবে না।

লিবারালদের আশার নিবন্ত পিদিমটা হঠাৎ আবার জ্বলে উঠেছে এ বছর। নির্বাচন বিলেতে তিন বছরে হবার কথা নয়, হয়ওনি। কিন্তু পার্লামেন্টের কোনও সদস্য মারা গেলে কিংবা ইস্তফা দিলে তাঁর শূন্য আসন পূরণ করার জন্যে রেওয়াজ মাফিক উপনির্বাচন হচ্ছে মাঝে মাঝে। সে সব আসনের প্রায় সবই ছিল হয় শ্রমিকদের নয় রক্ষণশীলদের দখলে। উপনির্বাচনে একটা দল আর একটা দলের আসন ছিনিয়ে নিতে পারে কি না লোকে আগ্রহের সঙ্গে তা লক্ষ করে। উপনির্বাচনে বিরোধী দল জিতলে তাদের বুকের পাটা বাড়ে, তারা সামনের নির্বাচনে জেতার রঙীন স্বপ্ন দেখে, সরকারী দল হারলে তাদের পাণ্ডাদের বুক ধুকপুক করে, এই বুঝি মন্ত্রিত্ব যায়। কথা আছে বিলেতে উপনির্বাচন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। সে ইঙ্গিত সব সময়ে যে মিলবে এমন কথা নেই। এক এর পর এক উপনির্বাচনে হেরে শেষে গদি ছাড়ার নজির যেমন আছে তেমনই আছে আখেরে সামলে যাওয়ার। কিন্তু উপনির্বাচনে বিলেতে এবার বাজীমাত করছে সরকারী রক্ষণশীল দলও নয়, মুখ্য বিরোধী দল শ্রমিকও নয়, একটানা জিতে চলেছে উদারনৈতিক দল।

হীথের রাজত্ব যখন শুরু হয় তখন পার্লামেন্টে লিবারালদের পুঁজি ছিল ছয়। জুলাই মাসে তা বেড়ে হয়েছে দশ। চার-চারটে উপনির্বাচনে তাদের প্রার্থী জিতেছে দুই প্রধানের প্রার্থীদের কুপোকাত করে। তিনটেতে হেরেছে রক্ষণশীলরা, একটাতে শ্রমিকরা। চার টুর কোনোটাতেই উদারনৈতিকদের জেতার কথা নয়, কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তারা দিব্যি ভোট বৈতরণী পার হয়ে গেছে। হারাধনের দশটি ছেলের রক্ষণশীল সরকারের কবল থেকে গদি ছিনিয়ে নেবার মতো ক্ষমতা হয়নি—যেখানে হাউস অব কমন্সের মোট সদস্য ৬৩৫ সেখানে দশজন নিয়ে তো আর কেল্লা ফতে করা যায় না। রক্ষণশীলদের সদস্য এখনও ৩২৪, শ্রমিকদের ২৮৮। তবুও কিন্তু লিবারালদের একের পর এক উপনির্বাচনে জিত নিয়ে হইচই পড়ে গেছে বিলেতে। টনক নড়েছে রক্ষণশীলদেরও, শ্রমিকদেরও। রাজনীতি নিয়ে যাঁরা ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁরা বলছেন এতদিন পরে বিলেতে হাওয়াটা বইছে উদারনৈতিকদের দিকে। এমন ধারণাও কারুর কারুর হয়েছে দু দলের যুগ কেটে গিয়ে সেখানে তিন-দলের যুগ আসছে—পরের নির্বাচনে লড়াই তিন-মুখী হবে, দু-মুখী নয়।

লিবারালদের চার-চারটে উপনির্বাচনে জিত ঠিক বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া গোছের নয়। ভোটাররা বুঝেসুঝেই ভোট দিয়েছে তাদের। কিন্তু কেন? সাধারণ নির্বাচনে যে দল পাত্তা পায়নি উপনির্বাচনে তার ওপর প্রসন্ন হলেন কেন ভোটার দেবতা? যাঁরা লিবারালদের তরফ থেকে দাঁড়িয়ে মাথায় মাথায় ঠুকে দিয়েছেন টোরি আর লেবার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তাঁরা কেউ তালেবর লোক নন। নিজের প্রতিপত্তি খাটিয়ে তাঁরা জিতেছেন এ কথা বলা চলে না। মনে হচ্ছে বিলেতে ভোটারদের ভক্তি দু প্রধানের ওপরই চটে গেছে, তারা সরকারী দল রক্ষণশীলদের ওপর খুশী নয়, মুখ্য বিরোধী দল শ্রমিকদের ওপরও ভরসা রাখতে পারছে না। দু দলের ওপর গায়ের ঝাল মেটাতে তারা ভোট দিয়েছে লিবারালদের। লোকের আশা এতে চোখ খুলবে দুই প্রধানের, তাদের চাল তারা পালটাবে। জিনিসপত্তরের দাম বিলেতেও হু হু করে বাড়ছে। তাতে মেজাজ গরম হয়েছে গিন্নীদের। দুই মন্ত্রীর রঙ্গিনী নিয়ে কেলেঙ্কারিতেও অনেকের মন বিষিয়ে গেছে সরকারী দলের ওপর। গাঁকে শহর বানাবার সরকারী পরিকল্পনাও অনেকের পছন্দ নয়। তার ওপর মোক্ষম চাল চেলেছে উদারনৈতিকরা বড় বড় জাতীয় সমস্যার বদলে স্থানীয় সমস্যার ওপর জোর দিয়ে। তাদের দাবি জঞ্জাল সাফ হোক, বস্তি উঠে যাক, রাস্তায় আলো দেওয়ার ব্যবস্থা ভালো হোক, ইস্কুলের উন্নতি ঘটুক।

নাক সিঁটকোচ্ছে বড় দল দুটো ক্ষুদে দলের ছোট নজর দেখে। কোথায় ঘরোয়া বাজার, পাউন্ডের দর, কালা আদমীদের নিয়ে ঝামেলা, কমনওয়েলথের ভবিষ্যৎ, পারমাণবিক বিস্ফোরণ আর কোথায় ময়লা ফেলা, রাস্তায় বাতি দেওয়া, ইস্কুল বাড়ি মেরামত, ঘিঞ্জি এলাকার উন্নতি। এ সব ছোট সমস্যা নিয়ে বড় দলরা কখনও মাথা ঘামায়নি, নির্বাচন লড়েনি। ও আঁস্তাকুড়ের রাজনীতি এতকাল তারা থোড়াই কেয়ার করে এসেছে। কিন্তু লিবারালদের জিতের পর জিত তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। অবশ্য উপনির্বাচন আর সাধারণ নির্বাচন এক কথা নয়। একটা দুটো উপনির্বাচনে হার-জিতে কিছু এসে যায় না বলে লোক তার ওপর তেমন গুরুত্ব দেয় না। এর আগেও উপনির্বাচনে উদারনৈতিকরা জিতেছে কিন্তু গো-হারান হেরেছে সাধারণ নির্বাচনে। এবার কিন্তু মনে হচ্ছে গতিকটা ভিন্ন। জনমত যাচাইয়ের ভোটে দেখা যাচ্ছে উদারনৈতিকদের দিকে পাল্লাটা আস্তে আস্তে ভারী হচ্ছে। একটা হিসেবে দেখা গেছে ঝটপট নির্বাচন হলে ৪৬ শতক লোক ভোট দেবে শ্রমিকদের, ৩১ শতক রক্ষণশীলদের, ২৬ শতক উদারনৈতিকদের। তার মানে অবশ্য এ নয়, সামনের নির্বাচনে বিলেতে জিতবে শ্রমিক দল, হারবে রক্ষণশীলরা। ভোটারদের মনে সত্যিই কী আছে তা বিধাতাও জানেন না। তবে মনে হচ্ছে বিলেতে উদারনৈতিকদের আর হেলাফেলা করা যাবে না। সরাসরি জিত হয়তো তাদের ভাগ্যে নেই তবে বেশ কিছু আসন তাদের দখলে আসা কিছু আশ্চর্য নয়।

একালের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্ভার

এই সংখ্যার দুটি বিশেষ রচনা

অপ্রকাশিত পত্রাবলী
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের পাঁচালী, আরণ্যক, অশনি সংকেত প্রভৃতি
কালজয়ী গ্রন্থের স্রষ্টা ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
এক প্রবাদ-তুল্য ব্যক্তিত্ব। মানুষ বিভূতিভূষণ
ও তাঁর ব্যক্তিমানস সম্পর্কে জানবার আগ্রহও
পাঠকের মনে প্রবল। শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিতব্য
পত্রগুচ্ছে ব্যক্তি বিভূতিভূষণ ও তাঁর মানসতার
এ-যাবৎ অপ্রকাশিত এক উল্লেখযোগ্য
পরিচয় পাওয়া যাবে।

আমার যৌবন
বুদ্ধদেব বসু

দেশ শারদীয় সংখ্যায় গত বছরে প্রকাশিত
বুদ্ধদেব বসুর আত্মজৈবনিক রচনা
'আমার ছেলেবেলা'য় এই মনীষী লেখকের বাল্য ও
কৈশোরের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এবারে
প্রকাশিত হচ্ছে সেই রচনারই দ্বিতীয় অথচ
স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্ব। বলাবাহুল্য, আত্মজৈবনিক হওয়া
ছাড়াও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ
সময়-পর্বের বিবরণ হিসেবে এই সুদীর্ঘ
নিবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়।

৫টি উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়
(গোয়েন্দা ফেলুদার আর-এক রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস)
শংকর
বিমল কর
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

এঁরা কেউই অন্য কোন পূজা সংখ্যায় উপন্যাস লিখছেন না

গল্প

বনফুল/অন্নদাশঙ্কর রায়/শিবরাম চক্রবর্তী
সুবোধ ঘোষ/বিমল মিত্র/সন্তোষকুমার ঘোষ
সমরেশ বসু/নরেন্দ্রনাথ মিত্র/প্রতিভা বসু
রমাপদ চৌধুরী/রূপদর্শী/দেবেশ রায় প্রভৃতি

এবং কবিতা আর সিনেমা সম্পর্কে রচনা

ADPC-3 BEN

দাম ৮ টাকা মাত্র/সডাক ৯.২০/সেপ্টেম্বরের গোড়ায় প্রকাশিত হবে।

নীলদর্পণ

সম্প্রতি নীলদর্পণ নাটক এবং তার অনুবাদ সম্পর্কে একটা বেশ উপভোগ্য বাদানুবাদ চলছে। রাতারাতি এই নাটকের রচনা, মাইকেলকৃত অনুবাদ, প্রকাশক হিসেবে পাদ্রী লঙ সাহেবের আদালতে দণ্ড এবং ছোকরা জমিদার কালীপ্রসন্ন সিংহের তৎক্ষণাৎ জরিমানার হাজার টাকা (কেউ কেউ বলেন, দশ হাজার টাকা কিংবা আরও বেশী) নগদ করে ফেলে দেওয়া—এই সব নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। এখন গবেষকরা এই নাটকের রহস্য আরও ঘনীভূত করে তুলছেন। অনুবাদ কর্মের সঙ্গে মাইকেলের যোগাযোগ আরো অবাস্তবই মনে হচ্ছে, বঙ্কিমবাবু তা হলে মাইকেলের নাম জড়ালেনই বা কেন—বঙ্কিমবাবুর বদলে সঞ্জীবচন্দ্র যদি লেখার মধ্যে ঐ কথাটা জুড়ে দেন, তা হলে বঙ্কিমবাবু কেন প্রতিবাদ করলেন না—তিনি তাঁর এই উচ্ছৃঙ্খল দাদাটিকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করতে তো ছাড়েন নি—এ সবের এখনো সঠিক উত্তর নেই। নীল আন্দোলন তো দূরের কথা, দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গেই মাইকেলের আদৌ কোনো সুসম্পর্ক ছিল কিনা—সেটাও চিন্তার বিষয়।

যাই হোক, কোনো বইকে কেন্দ্র করে একটা বিতর্ক শুরু হলেই আমার স্বভাব সেই বইটা আর একবার পড়ে ফেলা। কলেজ জীবনের প্রথমে নাটকটা একবার পড়েছিলাম, দু একটি টুকরো টুকরো দৃশ্য ছাড়া বিশেষ কিছুই মনে ছিল না। এখন আমি ছাত্রও নই, গবেষকও নই, সুতরাং আমার কোনো দায় নেই—ভয় ছিল, শেষ পর্যন্ত পড়তে পারবো কি না। না, পড়া যায় এখনো, বেশ আগ্রহের সঙ্গেই পড়া যায়। গিরিশবাবু, ক্ষিরোদপ্রসাদ, এমন কি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের নাটক এখন শখ করে পড়তে গেলে বেশী এগুতে পারবো না।

বঙ্কিমবাবু অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ছিলেন, কারুকেই ছেড়ে কথা বলতেন না। দীনবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং নানা প্রসঙ্গে প্রশংসা সত্ত্বেও এই নাটকটিকে তিনি উচ্চ মূল্য দেন নি। তিনি বলেছিলেন, "নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কুপ্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন, আমাদিগের বিবেচনায়, তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন।" বঙ্কিমবাবুর এ ধারণা অনেকখানিই যুক্তিসম্মত। এই শতাব্দীর সিকি ভাগের পর থেকে যে হাওয়া উঠেছে সাহিত্যকে একটা কিছু গঠনমূলক বক্তব্যের বাহন হতে হবে, বঙ্কিমবাবু তার ধার ধারেন নি। এবং গত শতাব্দীর শেষে অনেক আদর্শবান পুরুষ বহু বিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ সমর্থন, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, নারী শিক্ষা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি

উদ্দেশ্যের বিষয় নিয়ে ভুরি ভুরি বই লিখেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের জঞ্জাল বাড়িয়েছেন। তাদের দ্বারা না হয়েছে উদ্দেশ্যের সাধন, না হয়েছে রসসৃষ্টি। বই এমনই একটা জিনিস, পাঠকরা না পড়লে যার কোন মূল্যই নেই, সমালোচকরা তাকে যতই বাহবা দিন, প্রগতিবাদীরা যতই পিঠ চাপড়ান। সুনির্দিষ্ট আশাবাদ এবং রাজনৈতিক বিধান দান রচনা কদাচিৎ সার্থক হয়।

তবে, নীলদর্পণও একটি উদ্দেশ্যমূলক নাটক হলেও, অনেকখানি সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছে। দীনবন্ধু ছিলেন একজন সাহিত্যিক, স্লোগানসর্বস্ব আদর্শবাদী মাত্র নন, এমন কি নীল আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগও তেমন গভীর ছিল কিনা সন্দেহ, নিজের নামও তিনি জানান নি। অনেকটা আড়ালে সাহিত্যিকের মতনই তিনি একটা নাটক লিখে দিয়েছিলেন, তবু সেটা অনেকটা সার্থক করেছেন স্রেফ প্রতিভার জোরে—মাঝে মাঝে যে আবেগ তিনি সঞ্চারিত করতে পেরেছেন, তা একজন সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব, সংলাপের মৌলিকত্বেও তাঁকে চেনা যায়।

নাটকের শুরুটি দেখে বোঝা যায়, তিনি কাহিনীর কাঠামো বিষয়ে ঠিক মনঃস্থির করতে পারেন নি। গোলোক বসুর বাড়িতে রায়তদের কথোপকথন দিয়ে নীল চাষের অবস্থাটা তিনি বুঝিয়ে দিতে চান। কিন্তু সেটা এমন তাড়াহুড়ো করে বলা প্রকৃত নাট্যকারের কাজ নয়। নবীনকে নায়ক চরিত্র হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ব্যস্ত। এই নাটকের প্রকৃত নায়ক যে তোরাপ, তার কোনো ইঙ্গিতই নেই। আমার সন্দেহ হয়, নাটক লিখতে শুরু করার সময় তোরাপের কথা তিনি একবারও ভেবেছিলেন কিনা। তা হলে তিনি ঐ চরিত্রটির প্রতি আর একটু যত্ন নিতেন।

সৈরি, সরলতা আর আদুরীর কথোপকথন তো নেহাত খেলাচ্ছলে লেখা। দীনবন্ধু মিত্রের মতন একজন লেখকের পক্ষে ঐরকম কয়েক পাতা রচনার জন্য বেশী মাথা ঘামাতে হয় না, কথার পিঠে কথা আর সে, আদুরীর মতন টাইপ চরিত্র গত শতাব্দীর বাংলা নাটকে খুবই সুলভ। ক্ষেত্রমণিকে আনার পর তিনি পাঠকদের একটু সজাগ করে তোলেন, কারণ এর সে আদিরসের গন্ধ আছে। কে না জানে, পাঠককে ধাক্কা দিয়ে সজাগ করার জন্য কিঞ্চিৎ আদিরসের আমদানি পৃথিবীর বহু লেখকেরই একটা অত্যন্ত কৌশল মাত্র। নীতিবাগিশরা এখান থেকে প্রতিবাদ করার জন্য এবং অন্যরা উপভোগ করার জন্য একাগ্র হয়।

সধবার একাদশীতেও এ রকম চটুল আদিরসের ইঙ্গিত অনেক জায়গায় আছে বটে, কিন্তু নীলদর্পণে তার প্রকৃতি ভিন্ন। এখানে তিনি আদিরসের সঙ্গে গোড়া থেকেই একটা ট্র্যাজেডি মিশিয়ে দিতে পেরেছেন। ক্ষেত্রমণি এই নাটকের সবচেয়ে সার্থক চরিত্র, তা বলাই বাহুল্য।

আপশোসের বিষয়, নাটকটি বড়ই ছোট। তোরাপ আসবার পর, আমাদের আকাঙ্ক্ষা জাগে, আরও অনেক কিছু ঘটবে। কিন্তু তিনি সে সময় দিলেন না। হুড়োস হাড়োস করে সব কিছু ঘটিয়ে দিলেন। সাহেব দুটির চরিত্র—এই বইয়ের সবচেয়ে দুর্বল রচনা। এখানে তিনি আর সাহিত্যিক নেই, নিছক প্রচারবাদী হয়ে পড়েছেন। এখানে তিনি ভুলে গেছেন যে, দুর্বৃত্ত চরিত্রও যদি অবাস্তব হয়, তা হলেও বুকের ঠিক মর্মটি আর পৌঁছয় না। ক্ষেত্রমণির ওপর বলাৎকারের দৃশ্যটি—যা মঞ্চে দেখে বিদ্যাসাগর মশাই জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন এমন গুজব রটেছিল—(বিদ্যাসাগর সত্যিই অবশ্য জুতো ছুঁড়ে মারেন নি, তিনি নীলদর্পণের অভিনয় দেখেনই নি—ইন্দ্র মিত্র মহাশয় তা প্রমাণ করে ছেড়েছেন)—সেই দৃশ্যটি দাঁড়িয়ে গেছে শুধু ক্ষেত্রমণির সংলাপে—নচেৎ, দৃশ্যটি আধুনিক হিন্দী সিনেমা ছাড়া আর কিছুই না। সাধারণ পাঠক হিসেবে আমার মনে হলো, ঐ দৃশ্যে তোরাপের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল রোগ সাহেবকে খুন করা এবং পলাতক হয়ে যাওয়া। পরবর্তী ঘটনা ঘটা উচিত ছিল তোরাপকে নিয়েই—কিন্তু দীনবন্ধু আর সেদিকে গেলেন না, তিনি যে নবীনচন্দ্রকে নায়ক করবেন, আগেই ঠিক করে ফেলেছেন! নবীনচন্দ্রকে মারা, তার বউকে কাঁদানো, তার মাকে পাগল করা—এই সব দৃশ্যগুলিতে সাহিত্যটা তো গোল্লায় গেছে। এখানে তিনি গত শতাব্দীর মঞ্চের দর্শকদের কথাই শুধু ভেবেছেন, কিংবা তাঁর উদ্দেশ্য প্রকট করার জন্য যা যা দরকার তাই এনেছেন—এই সব অংশ বঙ্কিমবাবু পছন্দ করবেন কি করে?

নীল আন্দোলনের সময় এই নাটক কতটা কাজে লেগেছিল, সেই বিচার করে নীলদর্পণ এতদিন টিকে থাকে নি। এর আংশিক সাহিত্য সাফল্যের জন্যই এটাকে এখনো একটি সৎ উদ্দেশ্যযুক্ত সার্থক রচনার অতি বিরল উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়। কুলীনকুলসর্বস্ব ইত্যাদি কেউ টেকেনি।

সনাতন পাঠক

তোমাদের মনের মতো রঙীন পূজাবার্ষিকী

দ্যাখো কে কি লিখছেন

খেলাধুলো নিয়ে উপন্যাস
মতি নন্দী

অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ডিটেকটিভ উপন্যাস
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

রূপকথা নিয়ে উপন্যাস
শৈলেন ঘোষ

আর সত্যিকারের হৈ-রৈ করা
বড় গল্প লিখছেন
সত্যজিৎ রায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র

আর থাকছে অন্তত ১০টি নানা স্বাদের গল্প,
ধাঁধা, কমিকস্, প্রতিযোগিতা এই সব

সবচেয়ে জবর খবর
শিশুদের আঁকা ১২টি ছবির সঙ্গে
অন্নদাশঙ্কর রায়ের
১২টি ছড়া

দাম ৪ টাকা মাত্র

চিরমায়া

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বাহিরে দেখি না, শুধু স্থির জানি, ভিতরে কোথাও
চৌকাঠে পা রেখে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ,
চিরমায়া।
দাঁতে-চাপা অধরে কৌতুক স্থির বিদ্যুতের মতো,
লগ্ন হয়ে আছে, ভুরু
বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বাঁকানো, জ্বলে
কোমল আগুন
সিঁথি ও ললাটে। স্থির সরসীর মতো দুই চোখে
চক্ষু রেখে জগৎ-সংসার
অকস্মাৎ তার
কার্যকারণের-সূত্রে-গাঁথা মালাখানিকে ঘোরাতে
ভুলে যায়।

বাহিরে দেখি না, কিন্তু ভিতরে এখনও
ওই মূর্তি জাগিয়ে রেখেছ,
চিরমায়া।
বুঝি না কী মন্ত্রে তুমি অজস্র বিপর্যয়ে
লগ্ন আজও রয়েছ হৃদয়ে।
কী রয়েছে ওই চোখে, অধরে অথবা
ওই যুগ্ম ভুরুতে তোমার?
প্রত্যাশা? না পরিহাস?
নাকি যুদ্ধশেষে ফের যুদ্ধঘোষণার
অভিপ্রায়?
কিছুই বুঝি না, চিরমায়া,
এক অর্থ উদ্ধার না-হতে যেন সহসা আর-এক অর্থ
খুলে যায়।

বেঁধেছ অলক্ষ্য ডোরে। যে-রকম উড্ডীন পাখিও
বস্তুত অরণ্যে বাঁধা, কিংবা দিগ্বিজয়ীও যেমন
অদৃশ্য সুতোয়
টান পড়বামাত্র তার একমাত্র-নারীর
জঙ্ঘা অবলোকনের জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠে,
চিরমায়া,
আমিও তেমন ফিরি, নতজানু হয়ে
নিরীক্ষণ করি ওই জঙ্ঘা ও জঘন, স্তনসন্ধির গোপনে
রাখি মুখ। আমিও তেমন
বুঝে নিতে চেষ্টা করি দাঁতে-চাপা ওষ্ঠের ইঙ্গিত।
এবং দেখি যে, স্থির সরসীর মতো দুই চোখে
পলকে পলকে
স্বর্গ-মর্ত-পাতালের ছায়া
দুলে যায়।

পথে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে, বিতর্কসভায়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে আজকাল সর্বত্রই আপনার চোখে পড়বে নোংরা পোশাক আর লম্বা চুলের কিছু বিদেশী তরুণ-তরুণীকে। এ'দের পরনে পাজামা পাঞ্জাবি প্যান্ট গেঞ্জি চামড়ার জ্যাকেট, ইত্যাদি রকমারী পোশাক, গলায় রুদ্রাক্ষ বা পুঁতির একরাশ মালা, কোমরে চওড়া বেল্ট। পায়ে কারুর রবারের চপ্পল, কারুর তাও হয়তো নেই। সাজগোজের ব্যাপারে এবং সবেতেই একটা অসামঞ্জস্য কতকটা বিদ্রোহের ভঙ্গিতে। মাথায় কেউ গোঁজে ফুল, কেউ বা পাখির পালক। সঙ্গে থলেতে সামান্য কিছু জিনিসপত্র আর নেশার তাবৎ সরঞ্জাম। এই বর্ণনা মিলিয়ে যদি কারুকে চোখে পড়ে তবে নিশ্চিত জানবেন আপনি একজন হিপ্পির দেখা পেলেন। সামাজিক মানুষের মত এরা আত্মীয়পরিজনের সংসারে বাস করে না। এদের ভোজন যত্রতত্র, শয়ন হট্ট-মন্দিরে। অন্তত একজন প্রকৃত হিপ্পির জীবনদর্শন অনুযায়ী তাই হবার কথা। তবু এদের কতকগুলো আস্তানা আছে। বম্বেতে রেলস্টেশনের আশেপাশে বিশাল ফ্ল্যাট বাড়িতে, দিল্লীর জনপথের আনাচে-কানাচে, কলকাতার চৌরঙ্গী পাড়ার মাঝারি হোটেলে এদের দেখা মিলবে। মনে অশেষ কৌতূহল থাকলেও কাছে যেতে দ্বিধা হবে আপনার, নোংরামি আর নেশাগ্রস্ত চেহারা দেখে। তবু সব ঝেড়ে ফেলে যদি এগিয়ে যান, তবে অনেক ভাবনার খোরাক পাবেন নিঃসন্দেহে। এদেরই মাঝে সন্ধান পাবেন বহু ঘরছাড়া ছন্নছাড়া অভিমানী তরুণ-তরুণীর যারা নিজেদের সমাজকে সইতে না পেরে, নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে না পেরে পালিয়ে এসেছে সমাজ জীবনের বাইরে। আর সেই পলায়নকে গৌরবান্বিত করবার জন্য নিজেদের চিহ্নিত করছে 'বিদ্রোহী' বলে। তাই স্বভাবতই আপনার জানতে ইচ্ছে হবে, কি এদের সমস্যা? কি এদের দুঃখ? এরা কি নির্যাতিত, অথবা পথভ্রান্ত? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে গেলে আপনাকে যেতে হবে সেই দেশে, সেই সমাজে, যেখানে হিপ্পিদের প্রথম উদ্ভব হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহ আর রাষ্ট্রবিপ্লব। শতাব্দীর মাঝখানে এসে সেটা পৌঁছল চরমে। পরমাণু বোমা মানুষের মনোজগতে একটা বড় রকমের ধাক্কা দিল। চারদিকে ধ্বংসের উন্মাদনার মধ্যে জীবনের শান্তি হারিয়ে গেল চিরতরে, বদলে গেল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আর মূল্যবোধের ধারণা। এই পরিবর্তনের দমকা ঝড় একদিন উড়িয়ে নিয়ে গেল নীতি নিয়মের পর্দাখানা। যে যা পারো ভোগ করে নাও—এই হল মূল মন্ত্র। কে কতটুকু পেল, কে কতটুকু নিতে পারল এই নিয়ে হানাহানি চলল রাষ্ট্রপর্যায় থেকে ব্যক্তিগত জীবনে। সুখের আহরণে ব্যস্ত হল সবাই। ভেসে গেল পরিবার ভেসে গেল সমাজ। প্রধান হল ব্যক্তি। 'আমি'র কাছে তুচ্ছ হল পুত্রকন্যা স্বামীস্ত্রী সব। কাজেই ধীরে ধীরে স্ত্রী হারাল স্বামীর মনোযোগ, স্বামী হারাল স্ত্রীর প্রীতি, সন্তান বঞ্চিত হল মা বাপের স্নেহ থেকে। তাছাড়া হিপ্পি আন্দোলনের জন্মভূমি আমেরিকা গত দুই দশক ধরে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফল ভোগ করেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের। ওদেশে আজ এমন পরিবার খুব বেশী নেই যাদের গায়ে আঁচ লাগেনি এই যুদ্ধের। ঘরে ঘরে রয়ে গেছে মৃত্যুর স্বাক্ষর। ওদেশে শিশুরা জন্ম থেকে অনুভব করছে হিংসাদ্বেষ হানাহানির ফল। কেউ বা পিতৃহীন, কেউ বা ভ্রাতৃহীন, কেউ বা হারিয়েছে আরও কোন নিকট আপনজন।

এই পরিবেশে যারা বড় হয়ে উঠল তারা মনের দিক থেকে রইল সম্পূর্ণ নিঃস্ব, অথচ আর্থিক দিক দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন ঘটে, অবস্থা এমনও নয়। খরচ করবার মত পয়সা প্রায় প্রত্যেকেই পায় এবং মা বাপের কাছ থেকে ওইটুকুই যা প্রাপ্তি। তাছাড়া উপার্জনের পথও আছে বহু। তাই শাসন অনুশাসন বিহীন জীবনে ওরা ভারসাম্য রাখতে পারল না। বড় হয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করবার অধিকার পেয়ে সবার আগে ওরা ঘৃণা করতে চাইল ওদের স্নেহহীন স্বার্থপর মা বাপকে। প্রচ্ছন্ন অভিমান আর অশ্রদ্ধা থেকে জন্ম নিল এই ঘৃণা আর বিদ্বেষ—মা বাপ সমাজ সংসার সবার বিরুদ্ধে।" প্রতিষ্ঠিত সমাজের সঙ্গে ওরা ছিন্ন করল সব বন্ধন। উচ্চকণ্ঠে জগতকে জানিয়ে দিল নিজেদের মতটা। বলল, তোমাদের এই সমাজটা পচে গেছে। কি সভ্যতার বড়াই কর তোমরা! তোমরা স্বার্থপর নিষ্ঠুর প্রবঞ্চক আর সবার ওপরে ভণ্ড। তোমাদের নীতি নিয়মের বুলিগুলো নিছক ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। তোমরা মুখে যা বল, মনে তা বিশ্বাস কর না, তাই সবকিছু তোমাদের লুকিয়ে করতে হয়। ওরা বলল, তোমরা কারুকে ভালবাস না শুধু নিজেকে ছাড়া। অন্তরে হিংসাদ্বেষের বিষ ভরে নিয়ে মানবতা, বিশ্বপ্রেম এই সব

হিপ্পি

গালভরা কথা দিয়ে জগৎকে ঠকাচ্ছ। ভিয়েতনামের দিকে তাকাও, দেখবে তাদের উপকার করবার সদিচ্ছায় তাদেরই মাথায় কত বোমা আর বুকে গুলি মেরেছ তোমরা। তোমাদের বিশ্বপ্রেমিক গভর্নমেণ্টের আদেশে রোজ কত শত তাজা প্রাণ বলি পড়েছে ভিয়েতনামের জঙ্গলে। এরই নাম সভ্যতা! এরই নাম শান্তি!

তাই ওরা থাকতে চায় না এ সমাজে। বলে, রইল তোমাদের সমাজ, রইল তোমাদের সংসার! আমরা মানব না তোমাদের কোন নিয়ম, সইব না কোন বন্ধন। আমরা বাঁধনহারা হতচ্ছাড়ার দল। আমরা গড়ে তুলব আমাদের স্বতন্ত্র জগৎ, সেখানে নাক গলাতে এসো না তোমরা।

এই জীবনদর্শনের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম নিল হিপ্পি কালচার। কোনরকম নিয়মই মানতে ওরা রাজী নয়। আহারবিহারে, বেশভূষা, এমন কি পরিচ্ছন্নতার মৌল নিয়মগুলিও ওদের কাছে গ্রাহ্য নয়। যৌন জীবনেও কোন বাধা কোন নিষেধের পরোয়া ওরা করে না। যার যেমন ইচ্ছা উপভোগ কর—এই হল ওদের নীতি। এ ব্যাপারে পথেঘাটে পার্কে সর্বত্র ওরা লোকচক্ষুকে উপেক্ষা করে অবজ্ঞাভরে। এই হল হিপ্পি জীবনের একদিক। অন্যদিকে আছে নেশা। যা কিনা একজন হিপ্পির জীবনে অপরিহার্য। ওদের মতে এই অকরুণ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার রসদই হল এইটুকু। মানুষের হৃদয়হীনতায় জীবন যখন শুকিয়ে যায় তখন কল্পধারার মত আসে মারিজুয়ানা, হেরোইন আর এল এস ডি। তবে এই নেশার ট্রেন্ড আসেনি একদিনে। এর জন্যও প্রয়োজন হয়েছে কিছু প্রস্তুতির।

উনিশ শ' ষাট সালের পর থেকে ইওরোপ আমেরিকার আকাশবাতাস মুখরিত হচ্ছিল পপ্ মিউজিকে। এদের মধ্যে লম্বা চুল বীটল্‌রা একেবারে জয় করে নিল কিশোর কিশোরীর হৃদয়। তাদের চুল, তাদের প্রিয় নেশা অ্যাসিড, রসায়নের ভাষায় যাকে বলে Lysergic acid d e thalomide—সংক্ষেপে L S D, প্রিয় হয়ে উঠল নবীনদের। উনিশ শ' বাষট্টি-তেষট্টি সালের শীতকালে 'Walk Right In' বলে একটি গান অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করল। তাতে ইঙ্গিত ছিল মারিজুয়ানার মহিমার প্রতি। এর পর এল পিটার পল এবং মেরীর গ্রুপ এবং পপ্ সঙ্গীতের রাজকুমার বব্ ডাইলন। সবার মুখেই কিছু ইঙ্গিত, কিছু প্রশস্তি। তবে আর চিন্তা কিসের! দ্বিধা যেটুকু ছিল তাও কেটে গেল এইবার। আমেরিকা ইওরোপের আকাশবাতাস ভরে উঠল মারিজুয়ানার ধোঁয়ায়। এরপর ক্রমে এল এল এস ডি, এল হেরোইন। স্কুল কলেজের হিপ্পিভাবে ভাবিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এর চল হল ব্যাপক। তরুণ তরুণীদের বিধ্বস্ত অশান্ত মনে এরা আনল শান্তি। পাশ্চাত্য জগতের কিশোর মন ভুলল মা-বাপের অকরুণতা, প্রতিবেশীর হৃদয়হীনতা, জয় করল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ—আর হাইড্রোজেন বোমার অজানা বিভীষিকাকে। এবার শুরু হল নির্ভাবনায় মত্ত জীবন—উদ্দাম ছন্নছাড়া। ইওরোপ আমেরিকার পথেঘাটে বাজারে এরা ছড়িয়ে পড়ল, এক সময় আবার পাড়ি জমালো পুবের দিকেও।

নাইটক্লাব, ডিস্কোথিক্ আর বিশেষ বিশেষ রেস্তোঁরার চোখ ধাঁধানো মন উচাটন করা আলো-আঁধারির খেলা, নৃত্য-গীত বাদ্য সবই Psychedelic—অর্থাৎ চোখ ঝলসান, মন থমকান পরিবেশের মধ্যে দেখা মিললো লম্বা চুল নোংরা পোশাক আর ঢুলুঢুলু চোখের এই নবীন নাগরিকদের। তবে এদের সবাইকে হিপ্পি মনে করলে নিশ্চিত ভুল হবে। হিপ্পি জীবনের সবচেয়ে লোভনীয় দুটি শর্তের লোভে এ দলে অনেকে আসে যারা এদের জীবনদর্শনে বিশ্বাসী নয়। যা হোক দুদিন ত' মজা লুটে নেওয়া যাক—এই ভাব আর কি।

হিপ্পিদের জীবনেও ধর্ম সম্বন্ধে

প্রকাশিত হল

শঙ্কু মহারাজের

ভাঙা দেউলের দেবতা ৮৲

লেখকের আরও দুটি রসসিক্ত ভ্রমণকাহিনী

লীলাভূমি লাহুল ৭৲

গঙ্গা-যমুনার দেশে ৭৲

দে'জ পাবলিশিং C/o. দে বুক স্টোর, কলিকাতা—১২

(সি ৭২০৭/১)

আগামী সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হবে :

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক

শঙ্করনাথ রায়ের

সাধু সন্তের মহাসঙ্গমে ১০.০০

এই লেখকের ভারতের সাধক [১ম—১২শ খণ্ড]

ভারতের সাধিকা [১ম ও ২য় খণ্ড] ১০.০০ প্রতি খণ্ড

—পূজার মধ্যেই প্রকাশিত হবে—

শক্তিপদ রাজগুরু — বন্যা এলো ১০.০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় — দুঃস্বপ্ন ৬.০০

কাজী নজরুল ইসলাম ভক্তি গীতিমাধুরী ৮.০০

শঙ্করনাথ রায় —ভারতের সাধক [ত্রয়োদশ খণ্ড]

করুণা প্রকাশনী : ১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা—৯

(সি ৭১০০)

পূজা সংখ্যা মানেই আনন্দবাজার

এবারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা

রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা

অপঘাতে মৃতা নতুন বৌঠান, অকালমৃত পুত্রকন্যা, পরলোকগতা সহধর্মিণী, জ্যোতিদাদা, সত্যেন দত্ত, সুকুমার রায় প্রমুখ বহু প্রিয়জনের আত্মা বিভিন্ন সময়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেটে। পরলোকের সঙ্গে তাঁর রোমাঞ্চকর আলাপের বিশ্বস্ত বর্ণনা এই প্রথম সংকলিত হলো রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়ার মতো এই সুদীর্ঘ রচনাতে।

মৃত স্বজনদের আত্মার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'প্ল্যানচেট' মিডিয়াম মারফৎ আলোচনা, প্রতিটি প্রশ্ন, প্রতিটি উত্তর লিপিবদ্ধ হয়েও এতোদিন পড়েছিল শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে। লোকচক্ষুর আড়াল থেকে উদ্ধার করে এনে প্রায় দুই শতাধিক মুদ্রপৃষ্ঠার এই রচনায় রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চার যাবতীয় তথ্য উপহার দিয়েছেন অমিতাভ চৌধুরী।

সঙ্গে মিডিয়াম মারফৎ আত্মার হাতের লেখার প্রতিলিপি।

এই সংখ্যার আরেকটি অবশ্যপাঠ্য সচিত্র রচনা

শ্রীপান্থ লিখিত

বিবাহ করিব সুখে ইংরাজ ললনা

৬টি উপন্যাস

সুবোধ ঘোষ

(দীর্ঘকাল পরে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি উপন্যাস লিখছেন)

সমরেশ বসু
রমাপদ চৌধুরী
দিব্যেন্দু পালিত
বুদ্ধদেব গুহ

শারদীয়া সংখ্যার ৬ষ্ঠ উপন্যাসটির লেখক পঙ্কজলাল ভট্টাচার্য। বিষয় ও রচনারীতিতে এই উপন্যাসটি এতোই অভিনব যে পাঠকগণ তরুণ এই লেখককে সাদর স্বীকৃতি জানাবেন।

একমাত্র আনন্দবাজারেই এঁরা উপন্যাস লিখছেন

২টি বড় গল্প

শংকর/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গল্প

শিবরাম চক্রবর্তী / মনোজ বসু / আশাপূর্ণা দেবী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র / সন্তোষকুমার ঘোষ / বিমল কর
গৌরকিশোর ঘোষ / অসীম রায় / মতি নন্দী
হিমানীশ গোস্বামী / শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি

কবিতা। চলচ্চিত্র

দাম ৮ টাকা মাত্র/সডাক ৯·২০
সেপ্টেম্বরের গোড়ায় প্রকাশিত হবে

ABPC-3 BEN

নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে, যদিও সবার মতে ততটা মিল নেই। কারু মত যীশু-খৃস্টই বিশ্বের প্রথম হিপ্পি। তিনি শান্তি ও প্রেম-এর জন্য জীবন দিয়েছেন। এ যুগের মহেশ-যোগীর প্রীতি অনুরক্তের সংখ্যাও কম নয়। কেউ বা আবার গৌতম বুদ্ধের প্রতি ভক্তিমান। তাদের লক্ষ্য হল, তথাগতের মত নির্বাণলাভ। মাধ্যম অবশ্য এল এস ডি।

আধুনিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে এই এল এস ডি প্রীতি দিনে দিনে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এর চল ব্যাপক। এমন কি আধুনিকতা ও কৃষ্টির সঙ্গে এই নেশার একটা সম্পর্ক কল্পনা করে নিচ্ছে অনেকে। এর ঢেউ অধুনা পশ্চিম ছাড়িয়ে পূবেও হানা দিচ্ছে। তাই আমাদের দেশেও তরুণদলের কাছে নেশার প্রতি আসক্তি আর ততটা লজ্জার বা সঙ্কোচের ব্যাপার নয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষে গর্বের ছোঁয়াও বুঝি লাগে একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য।

সৃষ্টির প্রথম থেকে নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি হাত বাড়িয়ে মানুষ ভুগেছে বহু, আর বর্তমানেও তাই ঘটতে চলেছে। এল এস ডি এমন একটি রাসায়নিক যার গুণাগুণ নিয়ে বহু গবেষণার পর বিশেষজ্ঞরা স্থিরনিশ্চয় হয়েছেন যে, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এর প্রভাব জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এর ব্যবহার শুরু হয় কেবলমাত্র মনঃসমীক্ষার ব্যাপারে—রোগ নির্ণয় ও থেরাপির জন্য। কিন্তু নেশা হিসেবে এর প্রচলন স্বভাবতই বিজ্ঞানীদের চঞ্চল করে তুলল। কারণ, সমীক্ষায় ফল বলছে এল এস ডি-সেবীরা হিংস্র হয়ে উঠছে। আত্মহনন, এমন কি নরহত্যার প্রবণতাও এদের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাঁরা আরও বলছেন, মা বাপ এই নেশায় আসক্ত হলে তার ফল ভোগ করবে তাদের শিশুরা। কারণ এল এস ডি'র প্রভাবে জীবদেহে ক্রমসোম-এর পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং ফল হিসেবে জন্মের আগেই শিশুর দেহে আসবে বিকৃতি।

এই ত' গেল আশঙ্কার একটা দিক। অন্যদিকে আছে—যৌনব্যাধি। বাধানিষেধ, বাছ-বিচারহীন যৌন উপভোগের ফলে আমেরিকায় যৌন রোগ এখন মহামারীর আকার নিচ্ছে এবং যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের অর্ধেকের বয়স কুড়ির নীচে। এদের মধ্যে আছে হিপ্পিরা এবং সভ্যসমাজের নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছেলেমেয়েরা, যারা বেশবাস এবং চালচলনে হিপ্পিদের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত।

এইভাবে হিপ্পি কালচারের দার্শনিক দিকটাকে অতিক্রম করে দিনে দিনে তার বহিরঙ্গটাই প্রবল এবং প্রধান হয়ে উঠছে সারা পৃথিবীর যুব মানসের কাছে। পরিবার, সমাজের বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলে, সমস্ত স্বীকৃত মূল্যবোধকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপনটাই চরম এবং পরম লক্ষ্য বলে আজ মনে হচ্ছে এদের। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সমাজ আজ ক্ষয়রোগে ভুগছে। দিনে দিনে এ রোগ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। মানুষের শুভবুদ্ধি ক্রমে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে স্বার্থ আর লোভের তাগিদে, আর বংশধরদের তারা দিয়ে যাচ্ছে তাদের স্বার্থপরতা এবং আত্মসর্বস্বতার উত্তরাধিকার। এ যুগের নতুন নাগরিকদের সামনে তাই নেই কোন মহান আদর্শ, নেই কোন শ্রদ্ধার পাত্র। অনাবিল স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার ছবি ওদের চোখে বেশী পড়েনি যা দেখে ওরা বড় হবার শক্তি অর্জন করতে পারবে। আজ যদি ওদের এই ভ্রান্ত জীবনের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হয়, সুস্থ নাগরিক করে গড়ে তুলতে হয়, তবে ওদের দিতে হবে স্নেহ, দিতে হবে ভালবাসা। শুদ্ধ করতে হবে নিজেদের চিত্ত, ওদের সামনে তুলে ধরতে হবে মহৎ দৃষ্টান্ত। আর তা করতে হবে পৃথিবীর সবার স্বার্থে, না হলে এই ধ্বংসের বীজ পৃথিবীময় যে মহামারী সৃষ্টি করবে তা থেকে রেহাই পাবে না কোন দেশ, কোন পরিবার, কোন সমাজ।

প্রকাশিত হল

শক্তিমান লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ

সমরেশ দাশগুপ্ত প্রণীত

সাজঘরের বাইরে ৫·০০

অন্যান্য গ্রন্থ

সুনীল দাশ/স্বরচিত প্রতিবিম্ব ৪.০০ রবীন্দ্র গুহ/জনমানুষ ৪·০০
মিহির পাল / জীবনের মুখ ৪·০০মিহির আচার্যের / গল্প ১০·০০

শুকসারী ॥ ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা—১৪
প্রাপ্তিস্থান ॥ নাথ ব্রাদার্স। দে বুক স্টোর্স। কথা ও কাহিনী। স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স।

(সি ৭১৩২)

প্রকাশিত হয়েছে

শঙ্কু মহারাজের নতুন বই

ভাঙা দেউলের দেবতা ৮৲

'......পণ্ডিত ও পীরেদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন ওদের দুজনের কাউকেই ধর্মত্যাগ করতে হবে না। ধর্ম ওদের ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে থাক।......হিন্দু বা মুসলমান কোন সমাজেই ওরা আশ্রয় চাইবে না। ওরা গড়ে তুলবে এক নতুন সমাজ—ভবিষ্যতের মানবসমাজ। সুতরাং অতনু আজও হিন্দু, জাবেদা আজও মুসলমান। তবে ওরা দুয়ে মিলে এক নতুন জীবন—একটি শান্তির নীড়।........'

লেখকের আরও দুটি রসসিক্ত ভ্রমণকাহিনী

লীলাভূমি লাহুল ৭৲

গঙ্গা-যমুনার দেশে ৭৲

দে'জ পাবলিশিং C/o. দে বুক স্টোর, কলিকাতা—১২

(সি ৭২০৯)

রমেনবাবুকে মনে নেই?· আমাদের রমেনবাবুরে—

"কোন্ রমেনবাবু? কার কথা বলচিস্?"

আরে অঙ্কের মাস্টারমশাই! স্কুলে যিনি আমাদের অঙ্ক কষাতেন, ক্লাস এইট, নাইন আর টেন্-এ!

"ওহো মনে পড়ছে, মাল-কোঁচা মারা, কদম-ছাঁট চুল, দাড়ি-গোঁফ চাঁচা রমেন-বাবু তো? হাতে সব সময় একটা দেড় হাত লম্বা স্কেল থাকতো! উঃ—"

"হঠাৎ উঃ করলি কেন?"

"মনে নেই ক্লাস টেনে একবার একটা অঙ্ক ব্ল্যাকবোর্ডে কষে দেখাতে পারিনি বলে ওই স্কেলের বাড়ি প্যাঁক্ ক'রে পিঠে মেরেছিলেন, তিনদিন পিঠের ব্যথায় তেল মালিশ ক'রতে হয়েছিল!"

হ্যাঁ, ওই একটা বদ অভ্যাস ছিল মাস্টারমশাইয়ের, কথা নেই, বার্তা নেই স্কেলের বাড়ি মারতেন! কিন্তু অঙ্ক কষাতেন ভাল, যে-কোন অঙ্ক ও'র কাছে জল! এক্সট্রাগুলো কিরকম সল্‌ভ ক'রে দিতেন বলতো?"

"আর ও'র জন্যই সেবারে আমাদের ব্যাচে পনেরজন অঙ্কে লেটার পেয়েছিল! তুই-ও তো পেয়েছিলি?"

"আমার কথা বাদ দে, তালে-গোলে হয়ে গিয়েছিল। অঙ্ক-ফঙ্ক আমার মাথায় আসে না। স্কুলে ওই রমেনমাস্টারের ভয়ে যাহোক কিছু হয়েছিল, এখনো তাই ভাঙিয়ে খাচ্ছি—হিসেব-পত্তরের সামান্য কিছু কাজ করছি"

কথাটা কিন্তু সত্যেন্দ্র নিজের সম্বন্ধে কম ক'রে বলেছে। 'হিসেব-পত্রের সামান্য কিছু কাজ' সে করছে না, এতবড় একটা কোম্পানীর 'হিসেব-নিকাশের' সে সর্বময় কর্তা চিফ অ্যাকাউনটস্ অফিসার!

বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে নির্মল বললে, তা বটে, আমাদের মত মাথা ছিল বলে বিলেত থেকে চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট হয়ে বিলিতী কোম্পানীতে চাকরি পেয়েছিস্, দু-তিন হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছিস! নে রাখ গল্প; এখন বল হঠাৎ রমেনবাবুর কথা তুললি কেন? আমি তো মনে করেছিলুম ভদ্রলোক বুঝি মারা গেছেন, আর তোরা সব তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলি বলে কথাটা মনে করচিস! মনে কন্‌ডোলেন্‌স—

সত্যেন্দ্র অনামনস্ক হয়ে বললে, না না, মরবেন কেন! বেঁচেই আছেন—

নির্মল তেমনি লঘু সুরে বললে, তাহলে হঠাৎ তাঁর কথা কেন? স্কুল ছেড়েছি কি আজ—মনেই পড়ে না!
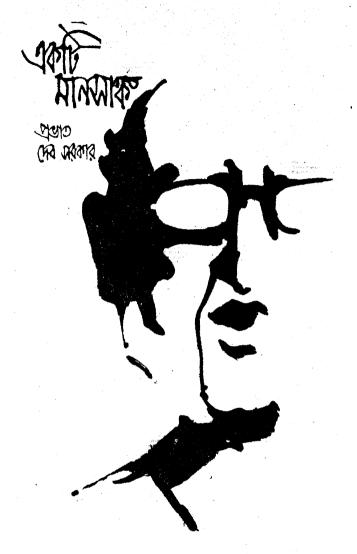
সত্যেন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললে, মাস্টারমশাইকে দেখলি না?

কোথায়?

নীচে, গেটে!

এত জায়গা থাকতে স্কুলের সহপাঠী বন্ধুর আপিসের গেটে বিখ্যাত অঙ্কের মাস্টারমশাই রমেনবাবুকে এতদিন পরে দেখতে পাওয়া যাবে কেন, নির্মল ভেবে পেল না। সবিস্ময়ে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল।

সত্যেন্দ্র বললে, চিনতে পারিসনি তো? তুই কিন্তু তাঁর সামনে দিয়েই এলি! রহস্যটা নির্মল যেন এখনো ধরতে পারছে না। বললে, কোথায় কাউকে দেখলুম বলে তো মনে হচ্ছে না! তুই চিনলি আর আমি চিনতে পারলুম না, এ কেমন ক'রে হয়?

তেমনি গাম্ভীর্য সহকারে সত্যেন্দ্র বললে, হয় হয়, সবার দেখার চোখ তো সমান নয়! স্কুলের সব মাস্টারমশাইদের মুখ তোর মনে আছে? দেখলে চিনতে পারবি?

তা মনে থাকবে না কেন, তবে দেখা-শোনা কার সঙ্গেই বা হয়! তাঁরা কি আর এখনো আমাদের মত চলাফেরা করতে পারেন! খবর নিয়ে দেখ তাঁদের এক-আধজন ছাড়া হয়তো কেউ বেঁচে নেই। তিরিশ চল্লিশ বছর পরেও যাঁর

তাঁরা আজও বেঁচে থাকেন তাহলে তো তাঁরা অমর!

সত্যেন্দ্র বললে, রমেনবাবু কিন্তু বেঁচে আছেন, আর তোর আমার চোখের সামনেই আছেন!

রহস্য ক'রে নির্মল বললে, নিশ্চয়ই উঠে-হেঁটে বেড়াতে পারেন না!

সত্যেন্দ্র বললে, তা যদি না পারবেন তাহলে আমাদের অফিসে আসবেন কি ক'রে! তোর যেমন বুদ্ধি, পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সে মানুষ বুঝি সব পঙ্গু হয়ে যায়! স্কুলের মাস্টারমশাইরা আমাদের চেয়ে আর কত বড় ছিলেন বয়সে?

নির্মল স্বীকার ক'রে বললে, তা বটে, রমেনবাবু তো তখন বেশ গাট্টাগোট্টা স্বাস্থ্যবান ছিলেন! তখন তাঁর কত বয়স হবে বল তো?

সে তুই বল! তাঁদের তো তুই বুদ্ধ জম্বুগবের দলে ফেলে দিয়েছিস? একজন দুজন নয়, তাঁদের অনেকেই বেঁচে আছেন, সংসার চালাবার জন্য তোর আমার মত এখনো পরিশ্রমও করছেন!

কি মজা দেখ্, নিজেরা বুড়ো হচ্ছি বলে আমাদের আগে যাঁরা বুড়ো হয়েছেন তাঁদের কথা বাদই দিয়েছি! তা রমেনবাবু তোর আপিসে কি করতে এসেছেন—কোন কাজকর্ম দিয়েছিস্ নাকি?

খুব ঠাউরেছিস্! মাস্টারমশাইকে আমি চাকরি দেব, আমার কি ক্ষমতা!

না, তোমার কোন ক্ষমতা নেই! এখন রহস্যটা ভেঙে বল দিকি!

রহস্য আর কি, নীচে যখন যাবি একটু চোখ চেয়ে এদিক-ওদিক দেখিস্ দেখতে পাবি! তখন তাঁকেই জিজ্ঞেস করিস।

নির্মলের কেমন ধারণা হল, সত্যেন্দ্র দয়াপরবশ হয়ে অঙ্কের মাস্টারমশাইকে নিজের আপিসে চাকরি দিয়েছে, অসময়ে তাঁর উপকার করবার চেষ্টা করেছে—বয়স হলেও গ্রাহ্য করেনি! নিজের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেছে। কিন্তু তাই নিয়ে নিজেকে জাহির করতে চায় না।

মনে মনে বন্ধুর কাজকে প্রশংসা ক'রে নির্মল বললে, যাক্ তোর দ্বারা তবু মাস্টারমশাই-এর উপকার হচ্ছে! যা চাকরির বাজার পড়েছে যুবকরাই চাকরি পায় না, বুড়োরা তো হিসেবের মধ্যেই আসে না!

সত্যেন্দ্র সহপাঠী বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। বন্ধুর সঙ্গে কাজের কথা সেরে নির্মল ওঠবার সময় জিজ্ঞেস করলে, তোকে দেখে মাস্টারমশাই চিনতে পেরেছিলেন, না, তুই মাস্টারমশাইকে চিনেছিলি? এতদিন পরে চেনা কি সহজ! নাইনটিন্ থার্টি, আর অঙ্ক নাইন্টিন্ সেভেন্টি—

সত্যেন্দ্র কোন কথা না বলে তেমনি হাসতে লাগল। সুইংডোর ঠেলে একপা ঘরে একপা বাইরে দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে নির্মল বললে, লেট্ মি ট্রাই! তারপর সজোরে হেসে বললে, চিনতে পারলে, সেদিন স্কেলের বাড়ি খেয়ে পিঠে যে-ব্যথা লেগেছিল তার কথা বলবো?

মুখটিপে সত্যেন্দ্র বললে, বলিস্, পিঠে তেল মালিশ ক'রে দেবেন!

দোতলা থেকে শ্বেত পাথরের বাঁধান সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে নির্মল সত্যেন্দ্রর অফিসের নীচের তলার প্রশস্ত হলঘরটার চারদিকে চেয়ে দেখলে। এর আগে নির্মল অনেকবার এ আপিসে এসেছে, কিন্তু আপিসটা যে এমন পরিচ্ছন্ন, ঝক্‌ঝকে কোনদিন খেয়াল করে দেখেনি। তার দরকার এস এন রায়ের সঙ্গে, সুতরাং লিফ্‌টে উঠে বেয়ারাকে বলেছে, বেয়ারা খাতির ক'রে সাহেবের ঘরে নিয়ে গেছে। সত্যেন্দ্রর অফিস যে এতবড়, এত লোক যে এখানে দাবা বোড়ের ছকে বোড়ের চালের মত চুপচাপ বসে কাজ করে কোনদিন লক্ষ্য করেনি। নীচের হলটা মার্বেল-মোজেকে চক্‌চক্ করছে, চেয়ার-টেবিলে-বসা মাথা নীচু করা লোক-গুলোকে দেখে এ অফিসে বন্ধুর উচ্চ-পদের কথা ভেবে নির্মলের নিজেকে কেমন ছোট মনে হল, ভাবলে এর মধ্যে এখন স্কুলের অঙ্কের মাস্টারকে খুঁজে বার করতে গেলে তার সম্মান কিছু বাড়বে না, বা মাস্টারমশাইও পুরনো সম্বন্ধে বিগলিত হবেন না।

নির্মল সত্যেন্দ্রর [illegible] হলঘরের একধার দিয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামবার সিঁড়ির ওপর খানিক থমকে দাঁড়াল। দৃষ্টিটা ফিরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, অদূরে মোড়ের মাথায় ট্রাফিক জাম হয়ে গাড়িতে গাড়িতে ছেয়ে গেছে, গলদ্‌ঘর্মের মত রাস্তাটা হাঁসফাঁস করছে একটা গাড়ির হর্ন বিকল হয়ে একটানা সুরে বেজে যাচ্ছে। আপিস পাড়ার হাট খুব জমেছে।

হঠাৎ-আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে নির্মল আর একবার পিছন ফিরে সত্যেন্দ্রর আপিসটা দেখে নিলে। ইংরেজরা চলে গেলে কি হবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সেই ঠাট বজায় আছে, আপিস-আদালত সেই আগের মতই চলছে; থামওলা বাড়ি-গুলো যেন বলছে, তফাত যাও—

কিন্তু একি! এর আগে নির্মল কোনদিন লক্ষ্য করেনি। সত্যেন্দ্রর আপিসে ঢোকবার শ্বেতপাথরের সিঁড়ির ডান-

বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান

বাংলা ভাষায় লেখা
শিশু ও কিশোর
পাঠকপাঠিকাদের জন্য
সচিত্র বিরাট
এনসাইক্লোপিডিয়া

(পাঁচ খণ্ডে)
চার খণ্ড ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে | প্রতি খণ্ডের দাম বারো টাকা

সম্পাদক | 'মৌচাক'-সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য
বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

জ্ঞানবিজ্ঞানের সবরকম জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অল্পকথায় সরল ঝরঝরে ভাষায় লিখেছেন নিজের নিজের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিশু সাহিত্যের সুপটু লেখকেরা।

যে কোন গ্রন্থাগারে এর এক সেট বই না থাকলে সে গ্রন্থাগার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে
সুদৃশ্য ছাপা • প্রচুর ছবি • এক রঙা • দুরঙা • হাফটোন • রঙিন

মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট •• কলিকাতা-১২

(সি ৭০৬৬)

দিকের একজকোণে এক বৃদ্ধ একটা-কাঠিতে ছাতা বেঁধে তার তলায় বসে যেন ঝিমচ্ছে, দুপুরের রোদটা ওই খোলা ছাতার গা-গড়িয়ে বাঁকা হয়ে সিঁড়িটার ওপর ছ্যাঁক-পোড়া হয়ে পড়েছে, বৃদ্ধের সামনে এদিক-ওদিক অনেকগুলো নানা রঙ-এর কাগজের টুকরো ইঁট-পাথরের চাপা দেওয়া আছে। দেখলে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বাল্যকাল প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ছেঁড়া কাগজ নিয়ে খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। নির্মল বিখ্যাত এই আপিস পাড়ায় বহুদিন ঘোরাঘুরি করছে, স্বাধীনতার পর এইসব বড় বড় আপিসের সামনে যে দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে, তার সঙ্গে ওই বৃদ্ধের বসে-থাকার আদৌ মিল নেই। ওখানে যদি কোন মহিলা পানের পসরা নিয়ে বসতো নির্মল বুঝি অবাক হত না।

সত্যেন্দ্র কি দেখেনি তার অফিসের বার্মিংহাম থেকে তৈরি ক'রে আনা পিতলের ঝকঝকে নেমপ্লেটটার পাশে একজন বৃদ্ধের ওভাবে বসে থাকটা বিশেষ বেমানান আর দৃষ্টিকটু? ভেতরে ভেতরে সাহেবী কোম্পানীর মালিকানা যে-ভাবেই হস্তান্তরিত হোক না কেন তার বাইরের চেহারার অবক্ষেপ হবে কেন! এমন একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মাঝখানে এমন একটা লক্ষ্মীছাড়া কাকের বাসা বাঁধতে কে দিল? আশ্চর্য, সত্যেন্দ্রর আপিসের চাপরাশিগুলোও কি লক্ষ্য করেনি?

নির্মল কৌতূহল বশে এগিয়ে এসে বৃদ্ধের সামনে দাঁড়াল। বৃদ্ধের ঝিমুনী কেটে গেল, সাগ্রহে ছানি-পড়া চোখের চশমার ভেতর দিয়ে দেখে আগন্তুককে বললে, লটারীর টিকিট নেবেন? নিন না একটা—পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, টামিলনাড়ু! কোন্ খেলার টিকিট দেব? বাম্পার আকার আছে কেরালার? বাইশ তারিখে খেলা!

নির্মল অবাক বিস্ময়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। ঘষা কাচের আবরণে একটা চোখ সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন, আর একটি চোখের কাচ এত পুরু যে দৃষ্টি আছে কি নেই বোঝা যায় না। তবে ওর মধ্যে দিয়ে যে বৃদ্ধের দৃষ্টি চলছে বোঝা যায়। পেশেন্স খেলার বিন্যস্ত তাস একটির পর একটি তোলার মত বৃদ্ধ সামনে সাজান লটারীর টিকিট-গুলোর গুরুত্ব হিসাবে তুলে ধরে বলতে লাগলেন, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, টামিলনাড়ু, কেরালা, মহারাষ্ট্র, বিহার, ইউ-পি কোনটা নেবেন? সবই এক টাকা, খেলা সব পর পর—সাত, পাঁচ, তের, কুড়ি, বাইশ!

স্থির নির্বাক দণ্ডায়মান নির্মল কোন সাড়া করছে না দেখে বৃদ্ধের আগ্রহ যেন বেড়ে যায়—রঙীন টিকিটগুলো উল্টেপাল্টে, নেড়ে-চেড়ে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কি মনে ক'রে নির্মল জিজ্ঞেস করলে, এ কাজ আপনি কতদিন করছেন? বৃদ্ধ যেন চকিত, ত্রস্ত হয়ে বলেন, কেন বলুন তো?

না, তাই জিজ্ঞেস করছি। এতে কিছু হয়?

যা হয়! বেশ হতাশার সুর বৃদ্ধের কণ্ঠে।

লটারীর টিকিট লোকে কেনে? নির্মল জেরা করে, চলে আজকাল?

বৃদ্ধ অনুনয়ের সুরে বললেন, চলবে না কেন, খুব চলে! আজকাল অনেক হয়ে গেছে তাই মনে হয়—

বৃদ্ধকে শেষ করতে না দিয়ে নির্মল পূর্বের প্রশ্নে ফিরে যায়, আপনি কদিন এ-কাজ করছেন?

খুব বেশি দিন না, এই দু'বছর হলো!

আপনি এখানেই বরাবর বসছেন?

না, আগে নিজের বাড়িতে থেকে টিকিট বিক্রি করতুম; কিছু হতো না, তাই এখানে এসেছি—আপিস-পাড়া, অনেক লোকজন আসা-যাওয়া করে, বিক্রি করা সহজ।

আপনাকে এখানে বসতে দিলে? এত-বড় আপিস!

বৃদ্ধ সাগ্রহে এখানে বসতে পাওয়ার ইতিহাস বললেন। বললেন, কানা লোক, ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড় দেখে দরওয়ান-গুলো এই মারে সেই মারে! কতবার টান মেরে টিনের সুটকেশে টিকিটগুলো পুরে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি, এখানে বসা নিয়ে ওরা আর কিছু বলছে না। মনে হলো লটারী জিনিসটা খারাপ নয় ওরা বুঝতে পেরেছে! দরওয়ানগুলো বেশ টিকিট কেনে আজকাল, বলতে গেলে ওরাই এখন বাঁচিয়ে রেখেছে—

এখানে বসার দরুণ কিছু নেয় আপনার কাছ থেকে?

নিতে পারতো, কিন্তু নেয় না! কেন জানি না বিহারীগুলো আমাকে দয়া

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আরোগ্য নিকেতন
৮ম মুদ্রণ ১১.০০

চাণক্য সেনের
রাজপথ জনপথ
নতুন মুদ্রণ ৯.৫০

দেবল দেববর্মার
বাড়ি
নতুন উপন্যাস : ৮.০০

বিনয় ঘোষের
বাংলার বিদ্বৎ সমাজ
দাম : ৭.৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পুতুল নাচের ইতিকথা
১২শ মুদ্রণ ৮.০০

নারায়ণ সান্যালের
নাগচম্পা ৯.০০
২য় মুদ্রণ। ছায়াচিত্রে আসছে

বনফুলের
সন্ধিপূজা
দাম : ৬.০০

জরাসন্ধ-র
উত্তরাধিকার
দাম : ১০.০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর
জাগরী
১২শ মুদ্রণ ৭.৫০

মানব কল্যাণে রসায়ন ৭.৫০ ॥ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
জেনানা ফাটক ৬.০০ ॥ রাণী চন্দ
রাশিয়ার ডায়েরী ২০.০০ ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল
কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় ৬.০০ ॥ অমল মিত্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
শরৎ-বিচিত্রা ১২.০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
বরযাত্রী ও বাসর ১০.০০

নরেন্দ্র ঘোষের
আগুনের উক্তি ৩.৫০
নতুন স্বাদের উপন্যাস

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
রুদ্ধ যাযাবর ৮.৫০
ফেলিক্স কেরির জীবনীর পটভূমিতে লেখা

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা—১২

হাসি নয় তো,

যেন মুক্তোর ঝিলিক

হাঁ্য, আপনার হাসিতে সব সময়েই একটি শুভ্র—সুন্দর আভা মুক্তোর মত ঝকমকিয়ে উঠবে। রোজ পেপ্‌সোডেন্ট দিয়ে দাঁত মেজে দেখুন, কত সহজে আপনি এধরনের হাসি ছড়াতে পারেন। পেপ্‌সোডেন্ট বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী—অপূর্ব এর স্বাদ, এবং দাঁতকে আরও বেশী সাদা ও সুন্দর করে পেপ্‌সোডেন্ট।

Pepsodent

পেপ্‌সোডেন্ট

ঝকমকে দাঁতের জন্য

হিন্দুস্থান লিভার-এর তৈরী একটি সেরা টুথপেস্ট

[illegible]-যন্ত্রণা এমনিভাবে অবহেলিত হতে দিয়েছেন?

খাদে উঠে আর একবার নির্মল জানালার বাইরে নির্লিপ্ত নিদাঘে দৃষ্টি দিয়ে ভাবলে, আড়াল থেকে অফিসের সিঁড়িতে বসতে দেওয়ার সুবিধে ক'রে দিয়ে সত্যেন্দ্র মাস্টারমশাইয়ের প্রতি কোনো কর্তব্যই করেনি, তার উচিত ছিল, যখন চিনতেই পেরেছিল তখন সাদরে সশ্রদ্ধায় তাঁর উপযুক্ত কোন রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া!

বাসটা মোড় ঘুরতে নির্মলের মনে হল, সেও তো কোন কর্তব্য করলে না। মাস্টারমশাই-এর কাছ থেকে দুটো টিকিট সে যে কিনলে সে তো তার নিজের স্বার্থে—ভাগ্যের নামে ঢিল ছুঁড়ে দিলে!

[illegible] মাস্টারমশাইয়ের কথাটা কানে বাজছে: আপনি পেলে আমারও লাভ—লোকে জানবে আমার কাছে টিকিট কিনে আপনি প্রাইজ পেয়েছেন!

কিন্তু ও'র কাছে বাল্যে অঙ্ক নির্ভুল করার শিক্ষা নিয়ে যে আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, রোজগারপাতি করছি, ভদ্রভাবে বেঁচে আছি সে-কথা কে জানছে? কেউ কি ও'র পূর্ব ইতিহাস জানে? উনি যে গাধা পিটে ঘোড়া বানাতেন সে খবর কি কেউ রাখে? স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষতে কষতে রমেনবাবু হাতে-মুখে খড়ি মেখে বলতেন, দেখবি জীবনটাই অঙ্ক—এখন থেকে ভাল ক'রে শিখলে বুঝবি কোন গোলমাল নেই, ঠিক ঠিক সব মিলে যাচ্ছে: অঙ্ক-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কত বড় বড় লোকের নাম করতেন। অঙ্ক কষাতে কষতে এমনি বিভোর হয়ে যেতেন, কোন কিছুই তাঁর খেয়াল থাকতো না, কখনো কোঁচার খুঁট কখনো হাত দিয়েই ব্ল্যাক বোর্ড মুছতেন, ডাস্টার কোথায় পড়ে থাকতো কে জানে! ঘণ্টা পড়ে গেলেও ক্লাস থেকে বেরোতেন না, পিছনের বেঞ্চের ছেলেরা উসখুস করলে টেবিলের ওপর স্কেল ঠুকে বলতেন, যার ভাল না লাগে বেরিয়ে যাও! এই একাগ্রতা খুব ইম্পরট্যান্ট! জ্যামিতির সঙ্গে জীবনের অনেক যোগ আছে, ছেলেখেলা নয়—অনেক কাজে লাগবে। অঙ্ক! অঙ্ক! অঙ্ক যত শিখবি তত মজা!

ছেলেবেলায় ক্লাসে যাদের রমেন মাস্টারের অঙ্ক কষান ভাল লাগতো না, আড়ালে ও'র দেড় হাত স্কেলটাকে বসরদের কাঁধের হাতের সঙ্গে তুলনা করতো, আজ যদি তাদের কেউ জানতো অঙ্কের পণ্ডিত রমেন মাস্টার বৃদ্ধ বয়সে লটারীর টিকিট বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বিদ্রূপ করে বলতো, বেশি অঙ্ক জানার ফল! একদিন আমাদের কম জ্বালিয়েছেন!

নির্মল ভাবলে, এবার যেদিন আসবে, মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করবে, লটারী খেলার মধ্যে কি অঙ্ক আছে?

এখন ফিরে গিয়ে সত্যেনকে কি জিজ্ঞেস করা যায় না, যদি অঙ্কের মাস্টার-মশাই বলে চিনেছিলি তাহলে সামনে না এসে, পরিচয় না দিয়ে তাকে অমন অকিঞ্চনের মত অফিসের দরজায় বসিয়ে রেখেছিস কেন? এতে কি মাস্টারমশাই-এর সম্মান বাড়ছে?

সত্যেনের মত সেও কি অপরাধী? সেও কি মাস্টারমশাই-এর অসম্মান করেছে? সে নিশ্চয়ই ভাবছে না, দুটো লটারীর টিকিট কিনে মাস্টার-মশাই এর অনেক উপকার করেছে—প্রকারান্তরে গুরুদক্ষিণা দিয়ে দিয়েছে আবার কি করণীয় আছে! কমিশন হিসেবে চারআনা পয়সা সে এমনি দেয়নি, এতেই মাস্টারমশাই-এর সম্মান বজায় আছে!

নির্মল কেমন যেন গোলমাল আর ধাঁধায় পড়ে। এতে এত ভাবনার কি আছে ভেবেও যেন সুস্থির হতে পারে না। মনের মধ্যে অপরাধ-বোধ থেকেই যায়। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। মাস্টারমশাই-এর কাছে পরিচয় দিয়ে টিকিট কিনলে না কেন? পরিচয় দিতে লজ্জা অর দায়িত্ব এড়ানর কথা মনে হয়েছিল?...

তারপর একদিন সমস্ত ব্যাপারটাই নির্মল ভুলে গেল। ভাগ্যে এসব ভাবনা মানুষের বেশিক্ষণ বা বেশি দিন স্থায়ী হয় না! কর্তব্য, অকর্তব্য, দায়-দায়িত্ব নিয়ে মানুষ সবক্ষণ মাথা ঘামায় না!

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কাগজে শিক্ষক-দের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দেওয়ার সংবাদ দেখে নির্মলের অঙ্কের মাস্টার রমেনবাবুর কথা মনে পড়ল। মনটা কেন জানি না খারাপ হয়ে গেল। মনে হল, তাদের মাস্টারমশাই যদি এমনি কোন পুরস্কার পেতেন খুব উপকার হতো। সে কবেকার কথা, রমেন মাস্টারের শিক্ষক হিসাবে যোগ্যতা আজ আর কে মনে করে রেখেছে? জীবনের মত তখনকার অঙ্ক-

যদি কেহ বাড়ীতে অল্প মূলধন দ্বারা কোন ছোট ব্যবসা-বাণিজ্য করে লাভবান হইতে চান, তাহা হইলে—বাংলা ভাষায় প্রকাশিত "কুটির উদ্যোগ" নামক পুস্তক অধ্যয়ন করুন। মোট পাতা 224, মূল্য 10 টাকা। "গৃহ উদ্যোগ" পাতা 464 মূল্য 16 টাকা। ডাইস্ কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ (ইংরেজি) পাতা 1048, মূল্য 22 টাকা। ডাক মাশুল 3 টাকা।
Cottage Industry (DA-36) PB No. 1362, Angurı Bagh Market, Delhi-6.

(সি ৬৬৮০)

সৈয়দ মুজতবা আলী
ও
রঞ্জন-এর
কোয়ালিশন গ্রন্থ
দ্বন্দ্ব মধুর ৬·০০
ডাঃ আলী এবং রঞ্জনের চরিত্র যে গল্পে সুসাধ্য, তাঁদের গল্পের চরিত্রও যে তাই, তা এই কোয়ালিশন গ্রন্থে আর একবার প্রমাণ হয়েছে।
সৈয়দ মুজতবা আলীর অন্যান্য গ্রন্থ
মুসাফির ৯, কত না অশ্রুজল ১০, হিটলার ৭, শবনম ৭, ধূপছায়া ৬, অবিশ্বাস্য ৫,
রঞ্জনের একটি উপন্যাস
শীতে উপেক্ষিতা ৬,
বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা-৯

(সি ৬৩২৩/১)

চুলকে নরম ও পরিপাটি রাখার একেবারে নতুন উপায়

হ্যালো কনসেন্ট্রেট

ময়শ্চারাইজার মেশানো শ্যাম্পু

কয়েক ফোঁটাতেই ষোলআনা কাজ দেয়

New Halo SHAMPOO

সামান্য কয়েক ফোঁটা বাস ফাঁপি ফাঁপি ফেনায় আপনার চুলের সব ময়লা আর তেল-কালি ধুয়ে বেরিয়ে যাবে। ময়শ্চারাইজার মেশানোর ফলে হ্যালো কনসেন্ট্রেটের কার্যকারীতা অন্যান্য শ্যাম্পুর চাইতে বেশী। এই ময়শ্চারাইজার চুলের গোড়ায় পুষ্টি যোগায়। চুলের যে নিজস্ব তৈলাক্ততা সেটা নষ্ট হয় না। ফলে সব সময়েই চুল শুকনো খটখটে না হয়ে নরম ও চিকন থাকে। যাতে সুন্দর করে চুল বাঁধতে কোনোরকম অসুবিধে না হয়। জট পাকাবার ভয় থাকে না। চুলে চিরুণী ফেলবে ভালো—যেমনটা চাইবেন—পরিপাটি করে চুল বাঁধতে পারবেন।

হ্যালো কনসেন্ট্রেট ব্যবহার করুন—খুশীমত পছন্দসই চুল বাঁধুন। আর কোনো বাধা থাকবে না।

তিনটি সুবিধাজনক সাইজে পাওয়া যায়।

সৌন্দর্য রাখতে সারা পৃথিবী জুড়ে হ্যালোর জুড়ি নেই!

যেমন খুশী যেভাবে চান... আপনার চুল বাঁধুন

HCON.6.1 BN

॥ ৩৪ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি উপমা দিয়ে বলেছিলেন, গৃহস্থের বউ যেমন সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে উপপতির পায়ের শব্দের দিকে কান খাড়া করে থাকে, তেমনি সকল কাজের মধ্যে থেকেও ঈশ্বরের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকবি।

আমি সাবিত্রীর চিঠির জন্য সকল কাজের মধ্যেও ডাকপিওনের দিকে উৎকর্ণ হয়ে দিন কাটাতুম। কথা ছিল, প্রতি শনিবারে যেন একখানা করে চিঠি পাই,—এবং উভয়ের চিঠিতে থাকবে তীর্থযাত্রার টুকরো টুকরো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা, পরস্পরের মানসের অভিব্যক্তি—যা অনেক সময় অধ্যাত্ম অনুরাগের রঙে রঞ্জিত। আমি নিজে চিঠির প্রারম্ভে লিখতুম, কল্যাণীয়াসু এবং পরিশেষে লিখতুম, আমার শ্রদ্ধানুরাগ গ্রহণ করো। ইতি 'স্বামীজি'।

উনি একদা আমার গেরুয়া বসনাদি দেখে এই নামটি দিয়েছিলেন! কিন্তু উনি আমাকে যে তিন চারটি বিভিন্ন শব্দের দ্বারা প্রিয়-সম্ভাষণ করতেন, আমি সেগুলির যোগ্য ছিলুম কিনা, এটি অনেকবার বিচার করেছি। ওঁর চিঠি আসতে এক-আধ দিন দেরি হলে আমি বিনিদ্র রাত কাটাতুম। মনে হত আমি যেন সেই উত্তুঙ্গ হিমালয়ের কোনও এক চূড়ার সমগ্র পাইন বনের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছি এবং আমার নৈরাশ্যসঞ্জাত অশ্রুর আভাসকে মনে হত গহন হিমালয়ের কোনও সঙ্গোপন গিরিনির্ঝরিণী আমার দুই চোখের ভিতর দিয়ে ছুটে আসতে চাইছে! যখন তাঁর চিঠি আসত তখন ভাবতুম, এ আমার সুকঠোর সাধনারই সিদ্ধি। প্রসন্না দেবী যেন সুললিত কণ্ঠে আমাকে উজ্জীবন-মন্ত্র দান করেছেন। ইনি প্রকৃতই বিদুষী ও বিদ্যাবতী। ইনি আধুনিক কালের বিদগ্ধাদের কেউ নন। একবার সাবিত্রী বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক কবিতা আমার কাছে স্তব পাঠের মতো! একবার একখানা চিঠিতে আমি বলেছিলাম, সাবিত্রী, প্রথম তোমাকে দেখেছিলুম তুমি তখন জ্ঞানযোগিনী, এখন দেখছি আমার জীবনে তুমি জ্ঞানদায়িনী হয়ে এসেছ। তোমাকে নমস্কার করি।

পুজোর প্রাক্কালেই আমি গিয়েছিলুম কাশীতে। ওঁদের বাড়ি শিবালার দিকে। উনি একটি প্রতিষ্ঠান চালাতেন। দুঃস্থ গরীব মেয়েরা সেখানে সেলাই মেশিনে সেলাই ইত্যাদি শিখত, সাবিত্রী তার খরচ যোগাতেন। বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য উনি একটি পাঠাগার তৈরি করেছিলেন এবং তার জন্য কাশীবাসী একটি তরুণ বয়স্ক ছোকরাকে একবার কলকাতায় আমার বাসস্থানে পাঠিয়েছিলেন। ছেলেটির নাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ছোকরাকেই ডি এম লাইব্রেরীর গোপাল মজুমদার পরবর্তী কালে কাজে লাগিয়ে 'শ্রীমতী' ইত্যাদি নামে বই লেখান, যার ফলে আমাদের বন্ধু 'গণদেবতার' তারাশঙ্করকে তাঁর 'শ্রী' অক্ষরটি পরিত্যাগ করতে হয়।

সাবিত্রীর পাঠাগারের জন্য আমি কিছু [illegible] দিয়েছিলুম।

যাই হোক, কাশীতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগের অসুবিধা ছিল না। ওঁর অগ্রজ সম্পর্কে ছিলেন আমার এক বন্ধু, গঙ্গা ঘোষাল। গঙ্গা থাকতেন হাজারীবাগে। তিনি অতি নিষ্ঠাবান ও জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। গঙ্গাকে আমি বলতুম, সাবিত্রীকে [illegible] দেখি, মনে হয় আমি দেবীর [illegible] ঢুকেছি!

—অবাক করলে তুমি—অন্তরঙ্গপ্রীতির গঙ্গা আমাকে বলত, টুনুও ঠিক এই কথা বলে তোমার সম্বন্ধে।

সাবিত্রীর ডাক নাম ছিল টুনু, আগেই বলেছি।

সেবার কাশীতে ছিলেন সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সেই তাঁর [illegible]-পুরার বাড়িতে আমাদের আসর বসে যেত জমজমাট। কিন্তু একদিন ওঁর ঘরে কেউ ছিল না। সকাল তখন দশটা। উনি এক কলসী পানীয় জল সকল সময়েই সামনে রাখতেন। ওঁর ধারণা, মাত্রা অতিক্রমণে [illegible] অভ্যস্ত তাদের পক্ষে প্রচুর ঠাণ্ডা জল পান করা উচিত। উনি কিছু নিউরটিক, সেই কারণে হঠাৎ নাটকীয়ভাবে উঠে এক একবার এখানে-ওখানে ঘুরে নিতেন। দিবারাত্রির অধিকাংশ কাল তিনি রবীন্দ্র-

শিব্রাম রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে ছোটদের সমগ্র রচনাবলী, গ্রাহকমূল্য—৫০ টাকা, প্রতি খণ্ড মূল্য ১৫ টাকা। কেবল গ্রাহকদের জন্য ১০ টাকা।

অগ্রিম ৫ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হোন।
প্রতিটি খণ্ড ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা, সোনার জলে নাম লেখা, রেক্সিনে বাঁধাই।
ছোট বড় সবার হাতে তুলে দেওয়ার মতন একমাত্র গ্রন্থ।

শিব্রাম চকরবরতির বই এর দোকান (রচনা সংগ্রহ প্রকাশন বিভাগ)
এম. টি. ৫৩/১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা

কাব্যজগ হয়ে থাকতেন এবং বাকি অল্পাংশ কাল পৃথিবীর সকল দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্ভার নিয়ে একপ্রকার বেহুঁশ অবস্থায় সময় কাটাতেন।

এক কলসী জল ও একটি গেলাস সামনে রেখে সুধাদা বললেন, তুমি যে হিমালয়ে গিয়ে সাড়ে চারশ'-পাঁচশ' মাইল হেঁটে তীর্থযাত্রা করে এলে, বলো তো কেমন লাগল? কী দেখলে? দু মাস ধরে কীভাবে কাটালে?

সুধাদা সেদিন প্রস্তুত ছিলেন। আজ নিরিবিলিতে তাঁকে পেয়ে আমি আমার অভিজ্ঞতার আনুপূর্বিক কাহিনী অকপটে বলে গেলুম। কাহিনীটি শেষ করতে বেলা আড়াইটে বেজে গেল, এবং অবাক হয়ে এবার লক্ষ্য করলুম, সুধাদা অবিচলভাবে এই দীর্ঘ সময় আমার দিকে স্তব্ধ ও নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে স্থির হয়ে বসে-ছিলেন। হঠাৎ এক সময়ে তিনি তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, তুমি ঠিক যে-ভাবে আমাকে আগাগোড়া বললে, ঠিক এই-ভাবে সবটা লিখে ফেলতে পারবে?

চমকিয়ে উঠলুম। ভ্রমণ করেছি বহু, তার ইতিবৃত্ত লিখব, একথা কখনো ভাবিনি। সাবিত্রীকে অবশ্য লেখবার কথা বলে রেখেছিলুম, এবং তিনি তাঁর নিজের ছদ্ম-নাম দিয়েছিলেন 'রানী', কিন্তু তার অনেকটাই ছিল আমার স্তোকবাক্য। হঠাৎ আজ সুধাদার প্রস্তাব শোনামাত্র আমার যেন তন্দ্রা ভেঙে গেল!

আমি জবাব দিলুম, হ্যাঁ, পারব।

সেবার কলকাতায় ফিরে লিখতে বসে গেলুম। সুধাদাকে বলবার সময় নিজের কাহিনী নিজের কানে নতুন করে শুনে যেন মুখস্থ করে রেখেছিলুম। লেখাটা অনর্গল-ভাবে চলতে লাগল।

তখন লেখকদের একটা বৈঠক মাঝে মাঝে বসত 'সাহিত্য সেবক সমিতি'তে। এটি ঠিক একটা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি ছিল কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেনের কবিরাজী বৈঠক। কয়েকজন কবিরাজ তখন সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। তাঁদের মধ্যে 'অবতার' সম্পাদক অমরেন্দ্র রায়, 'পরিচয়' গোষ্ঠীর জীবনময় রায়, এবং সাহিত্য সেবক সমিতির রমেশচন্দ্র। লেখকদের মধ্যে বিনামূল্যে চা বিতরণ করতেন রমেশবাবু। এখানে আসত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ রায়চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, সুবল মুখুজ্যে, হেম বাগচী, শৈলজানন্দ, হীরেন মুখুজ্যে ও বাঁড়ুয্যে, মধ্যে-মাঝে অচিন্ত্য, এবং আরও অনেকে। কবিরাজ রমেশচন্দ্রের একটি চোখ নষ্ট ছিল। তিনিও একজন লেখক হতে চাইতেন এবং সকল লেখককেই তিনি সমাদর করতেন।

রমেশচন্দ্র একদা আমাকে একটি স্বরচিত রচনা পাঠের জন্য 'সাহিত্য সেবক সমিতি'র তরফ থেকে আমন্ত্রণ করলেন। আমি প্রকাশ্যে কখনও স্বরচিত রচনা-পাঠের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি—যেমন অনেক লেখকই করে। ওটা অনেকটা যেন পরীক্ষা দেবার সামিল মনে করতুম এবং এড়িয়ে যেতুম। কিন্তু এবার আমি ও'দের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম। স্থির করলুম, ভবানী মুখুজ্যে আমার সঙ্গে থাকবে।

ইতিমধ্যে ভবানী আমার রচনায় বর্ণিত অনেকগুলি চরিত্রের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচিত হয়েছিল।

কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ও মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি—কয়েক পা মুক্তারামের ভিতরে ঢুকে বাঁ হাতি রমেশ কবিরাজের দোকানঘরের আড্ডা। কিন্তু রমেশচন্দ্র জানতেন, আমি আজ আমার হিমালয় ভ্রমণ কথার একটা অংশ তাঁর ওখানে পড়ব। তখন হিমালয় সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান খুবই কম, সেই কারণে ঔৎসুক্য ছিল বেশি। এই ঔৎসুক্যের ফলেই হোক বা আমার ভ্রমণের প্রতি কৌতূহলের জন্যই হোক, সেদিন লেখকরা ছাড়াও বহু বাইরের লোক এসে-

প্রথম প্রেমের মত স্নিগ্ধ মধুর!

দুজনে যেদিন প্রথমে দেখা, ও বলেছিল, 'ভারী মিষ্টি গন্ধ তো'। আমি বলেছিলাম, 'তানিয়া'। এখন ও আমাকে ডাকে 'তানিয়া' ব'লে। আচ্ছা, তানিয়ার মিষ্টি গন্ধে কি আমাকে ওর ভালো লেগেছিল, না আমাকে ভালোবেসেই তানিয়া ওর এত পছন্দ—কে জানে।

তানিয়া সুরভি

প্রস্তুতকারক: সাহেব সিং'স

'বিউটি ...' পুস্তিকার জন্য এবং আপনার রূপচর্চার নানা সমস্যার উত্তরের জন্য আমাদের 'বিউটি কনসালটেন্টস্', পোস্ট বক্স: ৪৪০ নিউ দিল্লী, এই ঠিকানায় লিখুন।

ছিল। ফলে, রমেশবাবুকে তাঁর দোকানের বিপরীত দিকে ঘোড়ার গাড়ির আড্ডার গায়ে বড় বাড়িটার একটি হল নিতে হয়েছিল। সেদিন বিস্মিত হয়েছিলুম, 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওদেরই কয়েকজন বন্ধু শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। সজনী আমাকে বলল, তোর লেখা ভাল না লাগলে কিন্তু গালি দেবো, মনে রাখিস।—আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলুম, ভাল লাগলেও তুই গাল দিবি, কারণ ওটাই তোর পেশা!

আমার সমগ্র লেখার মাত্র একটা কিস্তি লিখেছিলুম, সেইটিই সেদিন পাঠ করে সবাইকে শোনালুম। ওদের মধ্যে যারা পরিচিত নিন্দুক, তারা একটু গায়ে পড়েই বলে গেল, মন্দ হয়নি, তবে নতুন ধরনের। সজনী বলে গেল, আমার বেশ ভাল লেগেছে। অ্যাটমসফিয়ারটা করেছিস বটে!

পরবর্তী মাঘ মাস থেকে এই ভ্রমণ-কাহিনীটি 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে ছাপা হতে থাক 'মহাপ্রস্থানের পথে' এই শিরোনামায়। এই গ্রন্থের চতুর্থ কিস্তি নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে বসে লিখেছিলুম। মাত্র পাঁচটি কিস্তিতে এই বই বেরোয়। প্রথম কিস্তি থেকেই এ বই যেন পাঠক মহলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং যে অভিজ্ঞতা আমার কোন দিনই ছিল না,—তাই দেখলুম শ্যামবাজার ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। রাস্তার আলোর নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একজন 'ভারতবর্ষ' পড়ছে এবং দশ পনেরোজন শুনছে!

১৯৩৩-এর মে মাসে গুরুদাস চ্যাটার্জির দোকানে দাঁড়ালুম। ও'রা বললেন, ও-বই আ বাব, আপনার কি মাথা খারাপ হ কাহিনী কেউ পয়সা দিয়ে কেনে? ই যে পাঁচ কিস্তির দরুন পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি, ওই তো যথেষ্ট পেয়েছেন!

আমি ফিরে গেলুম। অতঃপর অনেক ভেবে-চিন্তে অনেক হিসেব কষে এবং অনেক সঙ্কোচ কাটিয়ে আর্য পাবলিশিং হাউসের তরফ থেকে বন্ধুবর শশাঙ্ক চৌধুরী বই-খানা ছাপল। শরৎ চাটুয্যে মশায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এ বইয়ের ভূমিকা তিনি লিখবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একখানা চিঠি আমাকে লিখে তিনি সরে দাঁড়ালেন। নতুন লেখকদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ঔদাসীন্য আমাদের অনেকেরই জানা ছিল।

কিন্তু আমি ১৯৩২-এর কথা এখনও শেষ করিনি।

এই বছরেই শরৎচন্দ্রের অনুরাগীরা টাউন হলে 'শরৎ বন্দনার' আয়োজন করেন এবং বন্দনার আয়োজন নির্দিষ্ট দিনে লণ্ডভণ্ড হয়। এ আলোচনা আগেই আমি করেছি। হিজলী জেলের বন্দীদের উপর অমানুষিক গুলীচালনার ঘটনা ঠিক এক বছর আগে অনুষ্ঠিত হয়। পরের বছরে ঠিক সেই তারিখটিতে 'শরৎ বন্দনার' আয়োজন গান্ধীপন্থী ছাত্র মহলের ভাল লাগেনি। শরৎচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধু ও সুভাষপন্থী, এবং শরৎ বন্দনার আয়োজনের মধ্যে ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি। যে-ছাত্র মহলটি এই বন্দনাকে ভণ্ডুল করে দিল, তারা ছিল সেনগুপ্ত-পন্থী। যাই হোক, গভর্নমেণ্ট হাউসের কাছাকাছি শরৎচন্দ্রের গাড়ি যখন এল—দেখলুম সেই গাড়িতে রয়েছেন বেহালার মণীন্দ্র রায়। তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে সেদিন বেহালায় ফিরলেন। শরৎচন্দ্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল।

আমার গলার ভিতরে তখন দুটি কৈ-মাছের কাঁটা ফুটেছিল। বড় কাঁটাটি হল,

সদ্য কারাগারমুক্ত আমার বিধবা ভাগ্নী বুলি এবং ছোট কাঁটাটি হল শ্রীমতী রমলা রায়—যিনি আমার জন্য তাঁর পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেছেন। এই দুটি বাঁকা ধরনের কাঁটা গলার মধ্যে এমনভাবে বিঁধেছে যে, গলায় আঙুল দিলে বমি বরং হয়, কিন্তু ঢোক গিলতে গেলেই গলার মধ্যে খচখচ করে! সুতরাং এ দুটিকে তুলে না ফেললে উপায় নেই।

আমার উপার্জন কিছু কিছু বেড়েছে বই কি। একজন এম এ পাস করা ভাল ছেলে পঁচিশ টাকা মাসিক মাইনে পেলে বেঁচে যায়, সেই সময় আমার গড়পড়তা রোজগার চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় উঠেছে, এ কি সোজা কথা! ওর মধ্যে থেকে আবার শ্যামবাজার পোস্ট অফিসের সেভিংস-এ কিছু কিছু জমাচ্ছি বই কি। কে জানে, হঠাৎ হয়ত কাশী থেকে সাবিত্রী লিখলেন, 'তোমার চাঁদমুখখানি একবারটি দেখিয়ে যাও, স্বামীজি! তখন আমি রাহাখরচ পাব কোথায়? তবে হ্যাঁ, সাহিত্য মন দিয়ে খাটো, মনোহর ও চিত্তগ্রাহী কথা লেখো মৌলিক এক স্টাইলে—তোমার আখের ভাল! কিন্তু খাটতে হবে। প্রতিভার সঙ্গে কপালের ঘাম জড়িয়ে থাকে, দেখছ না রবি ঠাকুরকে তাঁর এই একাত্তর বছর বয়সে? পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ঘাম, অর্ধাহার, বিনিদ্রা—বড় প্রতিভার পিছনে এরা থাকে লুকিয়ে। ওর সঙ্গে আবার মিলিয়ে থাকে শারীরিক বিকলতা এবং যকৃতের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার গণ্ডগোল। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অনেক দুঃখে সৃষ্টি হয়।

আমি ওই কই-মাছের কাঁটা গলা থেকে বার করে দেবার মতলব আঁটছিলুম। চেষ্টায় ছিলাম বুলির আবার বিয়ে দেবো। তৎকালে গৃহস্থঘরের কুমারী মেয়েরই পাত্র জুটতে চায় না, ঘরে ঘরে তখন আইবুড়ো মেয়েদেরই গাদাগাদি, এর ওপর বুলি আবার বিধবা। বিধবাকে বিয়ে করে কে তার জাত ধর্ম, মান সম্ভ্রম খোয়াতে চায়? মেয়ে সুন্দরী হলে কি হবে, সমাজনীতির শাসন সেখানে অনেক বড়। কোনও মেয়ে যদি কারও হাত ধরে পালিয়ে যায়, সব পরিচয় মুছে দিয়ে যদি নিরুদ্দেশ হয়, তাহলে মা-বাপের জাতিচ্যুতি ঘটে, ছি ছি নিন্দা রটে, কারও কোনও শুভকর্মে তাদের ডাক পড়ে না, তারা মুখ দেখায় না ভদ্র-সমাজে। এই যে রমলা রায় বাপের বাড়ির অবাধ্য হয়ে বেরিয়ে এসেছেন, ওঁর ভবিষ্যৎ ত অন্ধকার! মেয়েছেলের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য রবিঠাকুরকেও ত চিৎকার করে বলতে হয়েছে, "নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা—"

সুতরাং বুলির দ্বিতীয়বার বিয়ে ছিল

আমার পক্ষে স্বপ্নবৎ। তবু আমি আমার বড়দা ও মার সঙ্গে একদিন গোপনে আলোচনায় বসলুম। বুলির স্বাস্থ্যশ্রী ও বয়সোচিত তারুণ্যের সঙ্গে তার হাস্যমুখের প্রগলভতাই তার শত্রু! তার মা-বাপ তার সম্বন্ধে হাত ধুয়ে বসে আছে। তার বিবাহিত বোনেরা, পিসি ও খুড়িরা, মাসিরা—কেউ তাকে ঠাঁই দিতে চায় না। তার একমাত্র আশ্রয় হল তার এই মামার বাড়ি—যেখানে তাকে এক কোণে শুতে দেবার মতোও জায়গা নেই! এই সব কারণ পরম্পরা বিবেচনা করে আমার মা—যিনি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণকুলের আচারনিষ্ঠ বিধবা এবং আমার সদ্যবিপত্নীক বড়দা, এঁরা দু' জনে বুলির পুনর্বিবাহে রাজি হলেন। বুলি যদি সুখী হয়, যদি তার ভবিষ্যৎ নিরাপদ হয়, এই তাঁদের ইচ্ছে। সেদিন এই প্রকার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ, সমাজ-বিপ্লবকে ডাক দেবার মতো ছিল! তরুণী বিধবার প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা, দাক্ষিণ্য —এগুলোর কানাকড়িও দাম ছিল না, বরং সেখানে রক্ষণশীল সমাজমন আপন মর্মস্থলে আঘাত পেয়ে বিষধর ফণা তুলে একে একে সকলকে ছোবল মারবে, এই আতঙ্কই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। কিন্তু আমি সেক্ষেত্রে ছিলুম মরিয়া, এবং আমার মা জানতেন আমার মারমুখী শক্তি, রুক্ষ-কণ্ঠের তিরস্কার, প্রচণ্ড দম্ভ ও আত্ম-প্রত্যয়ী প্রবলতা—যেগুলি অনেকের পক্ষে ভয়ের বস্তু ছিল। সেদিন আমার মা ও বড়দার সম্মতিলাভ করে প্রবল উৎসাহ পেয়েছিলুম। আমি নিজে চাচ্ছিলুম সমস্তটা ভেঙ্গে দিতে। পুরনো আচার বিচার কুসংস্কার কুশিক্ষা অন্ধতা, এগুলো চারদিক থেকে চিরকাল আমাকে যেন বেঁধে রেখেছিল, আমি এদেরই জঞ্জাল ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যাচ্ছিলুম।

একদিন আমি স্থির করলুম, শ্রীমতী শোভার পায়ে এই ব্যাপারটা নিয়ে কেঁদে পড়ি। তিনি আমার ভাবনেত্রী, এবং তাঁর প্রতি আমার মন অনুরাগরঞ্জিত। তিনি নিজে তাঁর ব্যবসায়ী স্বামীকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেছেন, সুতরাং তিনি হয়ত বলতে পারেন বুলি যেমন আছে তেমনি থাক, ওকে বরং কোনও সমাজকর্মে লাগিয়ে দিন। কিন্তু সাহিত্যকর্মে যেমন লেখকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় ভরা, ঠিক তেমনি সমাজকর্মেও মেয়ে বা পুরুষের ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট। প্রকাশকের দরজায় দরজায় লেখকও যেমন ঘুরবে, প্রতিষ্ঠানের দরজায় দরজায় সমাজকর্মী মেয়ে-পুরুষও তেমনি ঘুরবে। দেশের নিয়তি এই।

সেদিন লাবণ্যপ্রভা দেবীর ওখানে গিয়ে দেখি বাড়িটা থমথম করছে। আমার পথ কিন্তু অবারিত। সোজা দোতলায় উঠে শোভারাণীর ঘরে ঢুকলুম। রবিবারের দুপুর। আহারাদির পর যে যার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। মা একা রয়েছেন অন্য ঘরে খান দুই সংবাদপত্র নিয়ে। আমি তাঁর ঘরেই এলুম। আমার সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা-পুত্র সংবাদ হলেও একটা সম্ভ্রমের সম্পর্ক প্রচলিত। তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে মেয়েমহলের অন্যতম নেত্রী বলে স্বীকৃত হচ্ছেন। কোনদিক থেকে তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতা বিচার করা হচ্ছে অতটা কেউ ভেবে দেখেনি। লেখাপড়া তিনি সামান্যই জানেন, বক্তৃতাদি তাঁর তেমন আসে না, মৌলিক চিন্তাধারার দিক থেকে তাঁর কন্ট্রিবিউশন তেমন কিছু নেই, রাজ-নীতির মধ্যে এক গান্ধীবাদ তাঁর আশ্রয়, যেটি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শোভা একেবারেই উড়িয়ে দেন, তবু তাঁকে যে নেত্রী বলে মেয়েরা স্বীকার করে নিচ্ছে, তার বড় কারণ হল তাঁর আন্তরিকতা, স্নেহশীলতা, সৌজন্য, স্বভাবমিষ্টতা এবং মধুর ব্যবহার। এর সঙ্গে কাজ করেছে তাঁর শান্ত গৌরবর্ণা মূর্তি ও পুজা-অর্চনার প্রতি তাঁর অনুরাগ।

মায়ের কাছে বসে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলছি, এমন সময় পিছন থেকে 'জমাদারজি' হাঁক পাড়লেন, এ ঘরে আসুন।

ব্যারীন ঘোষ মশায় শ্রীমতী শোভার নাম রেখেছিলেন 'জমাদারনী'।

আমি তৎক্ষণাৎ উঠে এ ঘরে এলুম। গত কয়েক দিন আমি এখানে আসিনি, সেই খোঁটা দিয়ে শ্রীমতী শোভা বললেন, মাঝে মাঝে আপনায় পায়ে ধরে না আনলে বুঝি আসতে ইচ্ছে হয় না?

বললুম, পায়ে ধরবার আগেই আজ এসে পড়েছি। এখন যদি কেউ পায়ে ধরে খুশী হই!

—ধরছি, ভাল করেই আজ ধরব। —এই বলে শ্রীমতী শোভা ভিতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। শুধু পূর্বদিকের বাগানের জানলা দুটো খোলা রইল। উত্তরে প্রতিবেশীর দিকের জানলা এমনিতেই বন্ধ থাকে। কিন্তু এই প্রকার নিশুতি দুপুর বেলায় ওঁর এবম্বিধ অভিনব আচরণ লক্ষ করে আমি ভয়ে কাঠ! ওঁকে আমি ভয় করি, সম্মানও করি। ওঁর সামনে সিগারেটও খাইনে।

ওঁনি এসে জানলার ধারে বসলেন প্রায় আমার গায়ে-গায়ে। ওঁর মুখে-চোখে

উত্তেজনা। উনি কোনদিন আমার এত নিকটে বসেন না। এবার উনি বললেন, আপনাকে নিয়ে আমার এত জ্বালা কেন বলুন তো?

—জ্বালাটা কি প্রকার আগে শুনি?

আমি শোভারানীর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি পুনরায় বললেন, আপনি নাকি পরশু দিন কোন এক রাস্তার নর্দমার ধারে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন?

এবার আমি হাসলুম। বললুম, আপনি কি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন?

উনি থমকিয়ে গেলেন। বললেন, আমি কেন, আপনারই 'চ্যালাকাঠ' কবিবন্ধু এসে চুপি চুপি বলে গেছেন দিদির কাছে। এটা আশ্চর্য, আপনি আপনার যতগুলো বন্ধুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, সবাই আপনার প্রতি বিদ্বেষে জরোজরো।

ওই 'চ্যালাকাঠ' যখন আপনার কথায় কাট ফাটা হাসি হাসেন, সেই হাসির সঙ্গে গলগল করে বিষ বেরোয়! আপনি তো ওদের নিন্দে করেন না কখনও?

হাসিমুখেই আমি বললুম, দাঁড়ান আগে কথাটা পরিষ্কার হোক। আমার রাস্তার ধারের নর্দমায় গড়াগড়ি দেওয়া আপনারা বিশ্বাস করলে আজ আমার এ

লিনটাস-V.৩৭-১৭৪ BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

[illegible] আলাপ বলতেন না। [illegible] আমার মুখে চোখে সামান্য লোভ বা অশুচিতার ছায়া থাকলে আপনি দরজায় খিল আঁটতেন না! পুরুষের লোভের চক্ষু মেয়েরা ঠিকই চেনে। আরেক কথা। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর অনুরাগ কি প্রকার, এ নিশ্চয় আপনি জানেন। কিন্তু যেদিন শুনব, আপনারা আমার চরিত্ররক্ষার অভিভাবক, তার পরের দিন থেকে আপনাদের ছায়া মাড়াবো না। ক্ষমা করবেন, যদি নিজের কথা দু-একটা বলি। আমার নৈতিক চরিত্র সব সময় ভাল থাকে না। কিন্তু সব মিলিয়েই আমি। আমি শিব ও শক্তির পুজোও জানি, এবং [illegible] চেহারাটাও আমার অজানা নয়। আমার প্রবৃত্তির রাশ মাঝে মাঝে যদি আলগা হয়, সেটাকে আমি যথেষ্ট [illegible] পাপ বা অপরাধ মনে করিনে। দিন দরজা খুলুন, আমি বেরোব।

শ্রীমতী বোধ করি একমনে আমার কথা শুনছিলেন। কিন্তু তিনি একটুও নড়লেন না। আমার হাঁটুর ওপর একখানা হাতের [illegible] দিয়ে উনি একভাবেই [illegible] রইলেন। এক সময় উনি বললেন, আপনি [illegible] কথা বলছেন আমি বেশ জানি, আপনার চোখ যে কিছু এড়ায় না—তাও আমার জানা। কিন্তু তার জন্যে আমি কেন এ বাড়িতে অপমান হই, বলতে পারেন? আমার কোনও উপায় থাকলে আমি কি আজকের এই অপমান মুখ বুজে সইতুম?

[illegible] বহুকাল ধরে যে [illegible] কঠিন ও নির্মম প্রকৃতির [illegible] পরিচয়, [illegible]-অপমৃত্যু-পুলিসী উৎপীড়নে যে মেয়ে একের পর এক প্রিয়জনকে ছেড়ে দিয়েছে দ্বিধাহীন মনে, আজ হঠাৎ দেখি তার দুই চোখ জলে ভরো-ভরো। আজ তিনি অকপটে বলতে আরম্ভ করলেন, এ বাড়িতে থাকা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক। তিনি ও তাঁর মা শুধু [illegible] নয়, তাঁরা নিঃসম্বল। তাঁদের দিন চলে না, খরচ জোটে না, নানা লোকের সহায়তা না পেলে তাঁদের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। তাঁর মা'র সম্মান কিভাবে তিনি এই নিরুপায় অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে রক্ষা করবেন, এটি সমস্যা।

এক সময় উনি চোখ মুছে সোজা হয়ে বসলেন। তারপরেই এই আত্মসচেতন নারী আপন সাময়িক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, আপনি বুঝি এতক্ষণ ভাবছিলেন, আপনার পায়ে ধরে কাঁদতে বসেছি?

আমি কিছুই ভাবছিনে। আমি শুধু দেখছিলুম, উত্তেজনায় কথা আরম্ভ হয়েছিল এবং চোখের জলে তার শেষ হল!

উনি উঠে গিয়ে এবার দরজা খুলে দরজা একটু ভেজিয়ে সামান্য একটু ব্যবধান রেখে কাছাকাছি বসলেন। আমি এবার বুলির কথা পাড়লুম, এবং শ্রীমতী কল্যাণী দাস সম্প্রতি একটি পাত্রের সন্ধান দিয়েছেন, সেই সংবাদ জানালুম। শোভা বললেন, আমরাও বুলিকে নাড়াচাড়া করে দেখলুম কিছুদিন। আপনি যদি তার বিয়ে দেন, তার আপত্তি হবে না। বাকিটা আমি ব্যবস্থা করে দেবো। যদি কল্যাণী আপনাকে কোনও পাত্রের কথা বলে থাকে, তবে সে পাত্র ভালোই হবে। বুলিকে কল্যাণী খুবই ভালবাসে।

শ্রীমতী শোভার এ কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি কল্যাণী দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলুম। অতঃপর তাঁরই প্রস্তাবিত এক পাত্রকে আমি দেখি। পাত্রের দাদা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রফেসর। পাত্র রূপবান, গুণবান এবং উপার্জনশীল। বুলির সঙ্গে বেশ ভালই মানাবে। কল্যাণীর কাছে খবর নিয়ে পরে নিজেই আমার বাসস্থানে একদিন আলাপ করতে গেলেন। পাত্র দেখতে চান পাত্রীকে। আমি আমার বন্ধু সাতারু শান্তি পালকে বলে শিয়ালদার 'ছবিঘর'-এ [illegible] করলুম। যতদূর মনে পড়ে, বোধ হয় আমার সঙ্গে ছিলেন নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী। দোতলায় একটি বক্সে বুলি গিয়ে বসল রাধারানীর সঙ্গে। বুলি তখনও জানে না যে, তাকে দেখবার জন্যই এই আয়োজন। পাত্র সেদিন পাত্রীকে খুবই পছন্দ করে আমাকে এক প্রকার পাকা কথাই

কিন্তু অত অল্পকালের মধ্যে বুলির ভাগ্যের চাকটা একটু অন্যদিকে ঘুরে গেল। হয়তো কেউ ভাংচি দিল, কেউ নিষেধ করল, কেউ ঈর্ষান্বিত হলো, কেউ বা হয়তো সরে দাঁড়াল। আমি জানিনে ঠিক কারণটি কি।

আজ হাওয়া ঘুরেছে, ইতিহাস পালটেছে, সেদিনের সমকালীন জীবনে যাঁরা আমার আশেপাশে নড়াচড়া করতেন তাঁদের অনেকেরই জেল্লা কমে গেছে। কিন্তু জীবনের যেগুলি নির্ভুল সত্য ঘটনা আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা কারও গৌরব এবং কারও অপযশ বহন করছে বইকি।

সেদিন আমার সমস্ত প্রকার অধ্যবসায় কিছুকালের জন্য নষ্ট হতে বসেছিল।

শ্রীমতী শোভা সবই জানতেন, এবং তাঁর অনুচরবর্গের কাছে সব খবরই পেতেন। তিনিও বিশ্বাস করলেন, আমি প্রতারিত হয়েছি। কিন্তু আমার এই অনর্থক হয়রানির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে তিনি একদিন বললেন, আপনাকে বলতে সাহস হয় না, আপনারা যে ব্রাহ্মণ। পাত্র যদি কায়স্থ হয়, আপনাদের আপত্তি আছে কি?

—কি রকম পাত্র?

—পাত্রের বয়স প্রায় আঠাশ। গুজরাটে এক টেক্সটাইল মিলে কাজ নিয়ে শীঘ্রই সেখানে চলে যাচ্ছে। পাত্রের বাবা ছিলেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। অবস্থা মোটা-মুটি। সম্পত্তি কিছু নেই। আপনারা যদি

রাজি থাকেন, আমি কথা বলতে পারি। দুটিকেই ওরা পছন্দ করবে।

শ্রীমতীর প্রস্তাবটি নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলুম। সেটি ১৯৩২-এর নবেম্বর। কিন্তু সেদিনকার বিবেক-সঙ্কট ও সমাজ জীবনের সংক্রম স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। প্রশান্ত বংশীয় ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা, তার পুনরায় বিবাহ দেওয়া সমাজবিরোধী কাজ। দ্বিতীয়ত, তৎকালের বিচারে অব্রাহ্মণ পাত্র মানেই শূদ্রজাত! হোক না কেন ভাল চাকরি, হোক না কেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার—শূদ্র ত বটে! এখানে সম্মান, সুনাম, জাতি, ধর্ম, সমাজ, ইহকাল পরকাল—সমস্তই যে বিপন্ন! এ যে একসঙ্গে অনেকগুলি পরিবারের সাত পুরুষ নরকস্থ হওয়া! এমন কাজ তুই কেন করতে যাচ্ছিস? তার চেয়ে বুলির মৃত্যু হোক, ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল। ওকে না হয় বনজঙ্গলে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আয়। ওর যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাক।

বললুম, সেই ভাল, ওকে গুজরাটের জঙ্গলের দিকে ছেড়ে দেওয়া যাক। সেখানে সিংহের জঙ্গলে গিয়ে ও মরুক!

পাত্রটি হল শ্রীমতী শোভার জেঠতুতো ভাই শ্রীমান সুবোধ। শ্রীমতী তাকে সেজদা বলেন, এবং সুবোধ আমার চেয়ে সামান্য বড়। স্থির হলো, এই চলতি অগ্রহায়ণেই এ বিয়ে হবে। ছেলের পক্ষে শোভা হলেন কর্ত্রী, এবং মেয়ের পক্ষে আমি হলুম কর্তা।

কিন্তু বিয়ের খরচ? কন্যাপক্ষের খরচ কে দিচ্ছে? মেয়েকে ত ত্যাগ করেছে মা-বাপ-ভাই-বোন-মাসি-পিসিরা! তার ওপর জেলখাটা মেয়ে তার জাত খুইয়ে এসেছে! বড় দুই মামার এক-ফোঁটা সঙ্গতি নেই। আমি ছোট মামা, আমার 'টিকে ধরাতে জামিন লাগে!' সুতরাং বিয়ের খরচ কে জোগাচ্ছে? তা ছাড়া এ বিয়ের সবাই বিরোধী। কোনদিকে কোনও উৎসাহ বা সহানুভূতি নেই।

বিয়ের তারিখ নির্দিষ্ট হল বোধ হয় ২৭ অগ্রহায়ণ, অর্থাৎ ডিসেম্বরের বোধ হয় ১২ তারিখ। আমার তখন 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল!' আমি তখন শুধু ছুটছি পথে পথে। সর্বাগ্রে আমি 'প্রিয়-বান্ধবী'র পাণ্ডুলিপিখানা বগলে নিয়ে গুরুদাসে গিয়ে হাজির হলুম। গুরুদাসের অন্যতম মালিক সুধাংশু চাটুজ্যের মনে ভয় ছিল, এ বই আবার পুলিসে ধরবে কিনা। ওঁদের দোকানের ইতিহাসে পুলিস হামলা করল এই প্রথম আমার বই নিয়ে। সুতরাং ওঁরা এবার থেকে খুব সচেতন।

কিন্তু ওঁরা 'প্রকৃত' ব্যবসায়ী। হৃদয়হীন বলব না, কারণ ওঁরা অসময়ে টাকা দিয়ে থাকেন। লেখকরা যখন দুঃসহ দারিদ্র্যে ছটফটিয়ে ওঁদের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ে, ওঁরা তখন নিরাশ করেন না। শুনেছি শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ' অথবা 'বিন্দুর ছেলে' ওঁরা নাকি এক-একশ' টাকায় সর্বস্বত্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ কপি-রাইট কিনেছেন। শুনেছি কান্ত কবি রজনী সেন যখন হাসপাতালে মুমূর্ষু—ওঁরা তাঁর 'বাণী ও কল্যাণী' নামক সুপ্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ ওইভাবে কিনেছেন মাত্র পঞ্চাশ টাকায়! ওঁরা জেনেছেন, আমার বাজার-মূল্য খারাপ নয়, সুতরাং আমার কাছে ওঁরা একখানির পর একখানি বই-এর কপি-রাইট কিনতে চান। আজ ওঁরা ভাল করেই জেনেছেন যে, ওঁরা ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই, অতএব ওঁরা মাত্র 'তিনশ' পঁচিশ টাকায় 'প্রিয়-বান্ধবী'র কপি-রাইট চিরকালের জন্য কিনে নিলেন! বহুকাল পরে জেনেছিলুম, 'প্রিয়-বান্ধবী' উপন্যাসের কম-বেশি পঁয়ত্রিশটি সংস্করণ ওঁরা একে একে প্রকাশ করেছেন, এবং সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়েও ওঁরা অনেক টাকা লাভ করেছেন। আমি তবুও কৃতজ্ঞ, ওঁরা অসময়ে টাকা দিয়েছিলেন!

কাত্যায়নী বুক স্টলের মালিক গিরীন ঘোষের কাছে অগ্রিম দেড়শ' টাকা আদায় করতে আমার একজোড়া জুতো ছিঁড়ল। তারপরে রইল দেব সাহিত্য কুটীরের সুবোধ মজুমদার, ওয়েলিংটনের নাথ ব্রাদার্স, সাঁতরাগাছির ভগ্নী, আমার পোস্ট অফিসের খাতায় ষেষট্টি টাকা।

চারদিন, আজ নিয়ে।' শিউলী বলে, ওর গভীর চোখ যেন ছায়ায় ঢেকে যায়। বলে, 'জানি না বাড়িতে কী হয়েছে, ওদের বাড়ির সবাই তো খুব চাপা, কেউ মুখ খুলতে চায় না। আমি জিজ্ঞেস করতেও পারি না। ওর বউদির মুখে শুনলাম, চারদিন আগে, সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, আর ফেরেনি।'

মোহনের ঝলকানো চোখের দৃষ্টি শিউলীর চোখের দিকে, জিজ্ঞেস করে, 'তোমাকে কিছু বলে যায়নি?'

শিউলী চোখ নামায়, মাথা নাড়ে, বলে, 'দেখা পর্যন্ত করে যায়নি।'

শহরে ত্রিদিবেশের সব থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোহন, ত্রিদিবেশের সব কিছুই ও জানে, শিউলীর কথাও, সেই জন্যই শিউলী মোহনকে এভাবে অনায়াসে বলতে পারে। মোহন চিনতো শিউলীকে, দীনুদার বোন—দীনবন্ধু মজুমদার। পার্টিকে চাঁদা দেয়, জনযুদ্ধ কেনে, পড়ে না, সে প্রমাণ অনেকবার পেয়েছে। দীনুদা ছাপোষা লোক বেশ ভালো, নিরীহ, সাদাসিধা, কেউ কিছু বোঝালেই বুঝতে চেষ্টা করে, না বুঝলেও। শিউলীর সঙ্গে ত্রিদিবেশের প্রেম—প্রথম ত্রিদিবেশের কাছে শুনেছিল, তারপরে সামনে-সামনিও প্রেম করা দেখেছে, ওদের হাসি আর কথাবার্তায়, মোহনও তাই শিউলীর বন্ধু হয়ে গিয়েছে। মোহন প্রথমে অবাক হয়েছিল ত্রিদিবেশের প্রেম করা দেখে, তারপরে বন্ধুর সাহসে প্রায় সম্মোহিত হয়েছিল, অথচ ওরই সমবয়সী ত্রিদিবেশ, একটু বড় হতে পারে, প্রেম বিষয়ে তাকে কখনোই চঞ্চল বা উত্তেজিত দেখা যায়নি। প্রায় দু'বছর ধরে ত্রিদিবেশ শিউলীর মধ্যে এই প্রেম যোগ, এবং মোহনের সম্মোহন থেকে জেগে ওঠার প্রথম অনুভূতি, গোপন ঈর্ষা। জাগরণের সময়, এখন থেকে মাস কয়েক আগে, হঠাৎ। কখন, কোনদিন থেকে, মোহনের নিজেরও জানা নেই, কিন্তু সেই ঈর্ষা একলাও ওর নিজের মধ্যে, কারোর কাছেই কখনো প্রকাশ করেনি।

শিউলী মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাকেও কিছু বলে যায়নি?'

মোহন বলে, 'না, সেটাই তো আশ্চর্য, ও তো সব কথাই আমাকে বলে।'

শিউলীর মুখে লজ্জার ঝলক লাগে। মোহনের চোখের দিকে তাকিয়েই, দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, এবং এক মুহূর্ত পরেই চোখ তুলতে দেখা যায়, দৃষ্টিতে যেন একটি বিশেষ জিজ্ঞাসা। না, মোহনের দৃষ্টিতে কোনো বিশেষ জবাবের সংকেত নেই। শিউলী আবার বলে, 'বকুলতলাতেও যায়নি নিশ্চয় তাহলে—।'

মোহন বলে ওঠে, 'তা হলে তো—।'

শিউলী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে, 'হ্যা হ্যাঁ, তা হলে তো জানতেই পারতে। আমার মনে হয়, ওকে বাড়িতে খুব অপমান করেছে, তা না হলে, এরকম কাউকে কিছু না বলে, হঠাৎ কোথাও চলে যেতে না।'

মোহন বলে, 'হতে পারে। ওর বাবা দাদা সবাই তো ওর ওপর খুব রেগে আছে। কেন যে পড়াশোনা করলো না।'

শিউলী একথার কোনো জবাব দেয় না। মোহনের কথা শুনে মনটা কেমন মুষড়ে যায়। মোহন আবার বলে, 'এই ব্যাপার নিয়ে, বাড়িতে আমাদেরও কথা শুনতে হয়। অবশ্য ওর অনেক গুণ আছে। কিন্তু লেখাপড়া না শিখলে কী করবে?'

শিউলীর মনে হয়, ওর নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে। বুকের কাছে একটা কষ্ট হয়। ত্রিদিবেশের অপরাধ যেন ওর মুখেই ছায়াপাত করে। এরকম কথা মোহনের মুখে আগে আর কখনো শোনেনি। ত্রিদিবেশ লেখাপড়া করেনি, তথাপি মোহনকে বন্ধু সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী আর সহৃদয় দেখা গিয়েছে। শিউলী মোহনকে অনেকটা ত্রিদিবেশের ওই বৃত্তেই যেন দেখেছে। এখন মোহন এই সব কথা বলে।

মোহন বলে ওঠে, 'যাক গে, সে নিয়ে এখন আর ভেবে কী হবে। ও ঠিক নিজের রাস্তা দেখে নেবে। ও বসে থাকবার ছেলে না। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, ব্যাটা গেলো কোথায়?'

মোহনের স্বরে [illegible] সুর ফোটে, আন্তরিকতার বিশেষণ শোনা যায়। শিউলী যেন একটু সন্দিগ্ধ, প্রায় কাতর চোখে মোহনের দিকে চোখ তুলে তাকায়, বলে, 'আমার মনে হয়, ও কোনো চাকরি-বাকরির খোঁজে কোথাও গেছে।'

মোহন বলে, 'পিসিমাও বলছিলেন, একটা কী চাকরির খোঁজ যেন করছেন।'

শিউলী বলে, 'ও বোধহয় তা জানে

না। তবে আমার মনে হয়, খুব শীগ্‌গিরই তোমার সঙ্গে দেখা করবেই।'

'তা হয় তো করতে পারে।' মোহন বলে, 'তবে সবই তো ওর খেয়াল। ব্যাটার তো অনেক পাগলামি আছে।'

মোহন হাসে, যেন বন্ধুপ্রীতির থেকেও ওর ভঙ্গিমা একটু ভারিক্কি। শিউলী বলে, 'আমার খুব বিশ্বাস, ও নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে শীগ্‌গির দেখা করবে, আমার মন বলছে।'

মোহনের চোখে জিজ্ঞাসা ফোটে। বুঝতে চায় শিউলী এতোটা নিশ্চিত কেন। শিউলি বুকের আঁচল সরায় না, জামার ভিতরে হাত ঢোকায়, বোঝা যায় ওর বুকের ভিতরে আর কোনো জামা নেই। একটি চিঠি বের করে, হলুদ খামে বন্ধ, বুকের ঘামে ভেজা ভেজা। মোহনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ও এসে যদি আমার সঙ্গে দেখা নাও করে, তুমি এই চিঠিটা ওকে দিয়ে দিও। আর আমার সঙ্গে দেখা করলে, আমি তো মুখেই বলতে পারবো।'

মোহন চিঠিটার দিকে তাকায়, হাতে নেয়, ওর মুখ একটু গম্ভীর, কপালের একটি ছোট রেখা একটু গাঢ় হয়। শিউলী দালানের এদিকে ওদিকে দেখে, দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে, যেন আপন মনেই বলে, 'আমার কিছু ভালো লাগছে না, ভারি অশান্তি লাগছে। চিঠিটা তুমি পকেটে পোরো।'

মোহনের দিকে তাকিয়ে বলে।

মোহন ভেজা ভেজা খামটা ওর জামার বুক পকেটে রাখতে রাখতে শিউলীর বুকের দিকে একবার তাকায়, ত্রিদিবেশের চেহারাটা ওর মনে পড়ে যায়। ও বলে, 'ঠিক আছে, ও এলে, চিঠিটা ওকে দিয়ে দেব।'

দালান থেকেও কর্মকারদের পুকুর-ধারে রাজু কর্মকার আর তার স্ত্রীর ঝগড়া চিৎকারে ভেসে আসে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, রাজু কর্মকারের প্রকৃত রাগ তার স্ত্রীর প্রতি, কারণ, সে-ই মেয়ের অসময়ে জলে নেমে সাঁতার কাটার কথা বলে স্বামীর কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। রাজু কর্মকার এখন ব্যস্ত, সামনে পুজো, অগ্রহায়ণে বিয়ের কাজ। কিন্তু মেঘে ঢাকা বিকাল ক্রমে ছায়াঘন হয়ে আসে, আকাশের হলুদ ছাপ মিলিয়ে গিয়ে ক্রমে কালো মেঘ গাঢ়তর হয়, জল-গন্ধ বাতাস একটু যেন বেড়ে ওঠে, সময় বহে যায়। মেয়ের মায়ের হয় তো মনে হয়, মেয়েটার হাতে পায়ে সাঁতা হয়তো খিল ধরে যাবে, জলে ডুবে মরবে। নির্ঘাত প্রহার আর প্রতি-শোধের জন্য সে স্বামীকে পুকুর ধারে পাঠায়নি, নিতান্ত ভয় দেখাবার জন্য। অতএব, এখন স্ত্রীর আবির্ভাব পুকুর ধারে, মূর্তি ভিন্ন, ভূমিকাও, এখন সে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে

বিভূতি-সাহিত্যানুরাগীদের বিশেষ সুবিধা

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভূতিভূষণের জন্মদিন উপলক্ষে বিভূতিভূষণের নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি এবং

বিভূতি রচনাবলী

খুচরা বা সম্পূর্ণ সেট সাধারণ ক্রেতাদের বিশেষ কমিশনে দেওয়া হইবে।

রচনাবলীর সম্পূর্ণ সেট লইলে মোট ১৮১, টাকার বই ১৪৪·৮০ পয়সায় (শতকরা ২০ টাকা অর্থাৎ ২০% কমিশন বাদ দিয়া) পাইবেন। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন খণ্ড ফুরাইয়া যায়—সেই খণ্ড বাদে পুরা সেট লইলেও ঐ কমিশন পাইবেন। রচনাবলীর খুচরা খণ্ড ও নিম্নোক্ত যে কোন বইতে শতকরা ১৫, টাকা কমিশন পাইবেন। ভিঃ পিঃ যোগে যাঁহারা এক সেট রচনাবলী সংগ্রহ করিতে চান তাঁহাদের অর্ডারের সঙ্গে ২৫, টাকা অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে হইবে। ডাকব্যয় আলাদা লাগিবে।

এজেণ্টগণ পূর্ণ সেট লইলে শতকরা ২৫, টাকা কমিশন পাইবেন। মফঃস্বলের এজেণ্টগণ অর্ডারের সহিত অবশ্যই ৩০, টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

পথের পাঁচালী ৮, অপরাজিত ১২, অনুবর্তন ৬,
আরণ্যক ৭॥ অথৈজল ৫॥ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৬,
ঐ (নাটক) ২॥ ইছামতী ৯, কিন্নর দল ৩,
কুশল পাহাড়ী ৫, দেবযান ৭॥ মেঘমল্লার ৪॥
শ্রেষ্ঠ গল্প ৬॥ নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব ৪,
দৃষ্টি প্রদীপ ৭,

অশনি সংকেত ৫॥

আরো একটি ২, পথের পাঁচালী (পেপার ব্যাক) ৪,
অভিযাত্রিক ৫॥ অরণ্যমর্মর ৭॥

এই সুবিধা ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেওয়া হইবে।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২ ফোন ৩৪-৩৪৯২/৩৪-৮৭৯১

ফ্রেসকাকে অভিনন্দন জানান
ফ্রেসকা বিউটি ট্যালক তাজা মনমাতানো গন্ধে আর তুষার শুভ্র লালিত্যে আপনাকে ঘিরে রাখবে। ফ্রেসকার চাপা সোনালী বর্ণচ্ছটায় আপনার কান্তি হবে কমনীয় আর রূপ হবে রমণীয়।
ফ্রেসকার শীতল সৌরভে সজীব তরুণ বোধ করবেন। নিন ফ্রেসকার মধুর স্পর্শ।
দু'টি সাইজে পাবেন—
ফ্রেসকা বিউটি ট্যালক গোদরেজের তৈরী
Beauty Talc
fresca
ফ্রেসকা মানে-তরতাজা
Interpub/GSF/9/73 BN

মেয়েকে রক্ষা করতে এসেছে। তার অনিবার্য পরিণতি, পুকুর ধারে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ।

শিউলী বলে, 'আমি তা হলে যাচ্ছি এখন, বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।'

মোহন ঘাড় কাত করে বলে, 'হ্যাঁ। ও যদি তোমার সঙ্গে দেখা করে, আমাকে একটু খবর দিও।'

'তা দেব। যাই, কাননদির সঙ্গে একটু দেখা করে যাবো। তোমাকে হয় তো কাননদি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে। এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কী কথা বলছিলাম—।' কথাটা যেন শেষ না করেই, শিউলী থেমে যায়, কিন্তু ওর চোখে জিজ্ঞাসা।

মোহন বলে, 'সে আমি কিছু একটা বলে দেব।'

শিউলী ঘাড় ঝাঁকিয়ে মোহনের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে, মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যায়। মোহন ঘরে ঢোকে, সন্টু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি বাইরের দিকে। মোহন কাছে এগিয়ে যায়। পুকুরের ধারে রাজু কর্মকারের বৃদ্ধা মায়ের আবির্ভাব হয়েছে, সে ঝগড়া সামলাবার চেষ্টা করে। মেয়েটা সেই সুযোগে দক্ষিণের কূলে গিয়ে ওঠে।

মোহন বলে, 'চল্ বেরোই।'

সন্টু ফিরে তাকায়। মোহন ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তোর কী হয়েছে, মুখটা ওরকম করে আছিস কেন?'

সন্টু কোনো জবাব দেয় না, দরজার দিকে এগোয়। মোহন আবার জিজ্ঞেস করে, 'কী রে?'

সন্টু বেশ উষ্মার সঙ্গে বলে, 'কী আবার, ওই যে শিউলী, ওকে তুই করে বলেছি বলে ওর গায়ে নাকি ফোসকা পড়ে গেছে।'

মোহন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সেটা আবার কী?'

সন্টু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে মুখ করে, বলে, 'কী আবার? আমাকে বললে, আমি যেন ওকে তুই করে না বলি। আমি ওদের পাড়ার ছেলে না, ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করিনি, ও নাকি অনেক বড় হয়ে গেছে।'

মোহন গম্ভীর হয়, একটু ভাবে, শিউলীর চেহারাটা ওর চোখের সামনে ভাসে, বলে, 'সত্যিই তো, তুই ওকে তুই করে বলিস কেন? আমি তো বলি না। ওর যখন খারাপ লাগে, বলবি না।'

সন্টুর চোখে অপমানের জ্বালা, গলায়ও; বলে, 'সেটা বুঝি ভালো করে বলা যায় না? এমন খাপচুরিয়াস্ ভাবে বললো, যেন আমি কী একটা মহা পাপ করে ফেলেছি।'

মোহন ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিতে চায় না, বলে, 'ঠিক আছে, তোর সঙ্গে শিউলীর আর কতোটুকু দেখা হয়, কথা হয়। কথা না বললেই হলো।'

'আবার?' সন্টু বললো, 'আমার বয়ে গেছে ওর সঙ্গে কথা বলতে। কী না একেবারে রূপের ধুকোড়!'

মোহন ভুরু কুঁচকে বলে, 'শালা, এতে আবার রূপের কথা আসছে কী করে। ও কি বলেছে, ও রূপসী?'

সন্টু একথার কোনো জবাব দিতে পারে না। মোহন আবার বলে, 'আর সত্যিই তো, শিউলী বেশ বড় মেয়ে, ওকে এখন তুই করে বলা যায় না। নিজের দাদা-টাদা হলে আলাদা কথা।'

সন্টু পরাজয় মেনে নিলেও, একটু খোঁচা না মেরে পারে না, বলে, 'ঠিক আছে! তবু যদি শালা না জানতাম!'

মোহন বাইরে যাবার জন্য দরজার কাছে এগিয়ে আসে, কিন্তু সন্টুর কথায় আবার ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস, 'জানিসটা আবার কী?'

সন্টু দালানে পা দিয়ে বলে, 'বলে দরকার নেই, চল্ যাই।'

মোহনও দালানে আসে, তবু জিজ্ঞেস করে, 'নতুন কথা কী জানিস তুই, বল্ না।'

সন্টু প্রায় অন্ধকার দালানের এদিকে ওদিকে দেখে বলে, 'কী আবার, বিপিনবেশের সঙ্গে—।'

সন্টু কথা শেষ করে না। যেন ও একটা বিশেষ গোপন কথা বলে। মোহন ঠোঁট বাঁকিয়ে উচ্চারণ করে, 'ক্যালানে।'

'কেন?' সন্টুর ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা।

মোহন বলে, 'তা ছাড়া আবার কী। এর আবার জানাজানির কী আছে? অনেকেই ওদের ব্যাপার জানে। বোধহয় ওদের বাড়ির লোকেরাও জানে।'

সন্টু বলে, 'সেটা বুঝি খুব ভালো? লোকে কি ওদের ভালো বলে? ওরা কি খুব ভালো কাজ করছে, এরা—ওরা—ওই শিউলী বুঝি ভালো মেয়ে?'

মোহন গলা চড়ায় না, অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বলে, 'কোথাকার বুদ্ধুরে তুই! প্রেম করলে কেউ খারাপ হয়ে যায় নাকি? তুই তো ফিউডাল রিঅ্যাকশনারিদের মতো কথা বলছিস্।'

সন্টু এবার একটু থমকে যায়, বিভ্রান্ত চোখে মোহনের দিকে তাকায়। মোহনের

বাহির হইল :

মহাত্মা শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত

তন্ত্রতত্ত্ব (দুই খণ্ড একত্রে) কুড়ি টাকা

তাভের্নিয়ে-র

ভারত-ভ্রমণ ১৬·০০

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ORIGIN OF THE BENGALI SCRIPT—15/-

বাঙ্গালার ইতিহাস প্রতি খণ্ড ১২·৫০ ১ম / ২য়

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত দু'খানি বই

ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক প্রণীত

অপরাধ জগতের ভাষা — ৫·০০

অপরাধ জগতের শব্দকোষ — ৫·০০

নবভারত পাবলিশার্স ॥ ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

(সি ৬৯১৯)

নাকের পাটা ফুলে ওঠে, যেন অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে, তর্জনী নেড়ে নেড়ে বলে, 'প্রেম কখনো খারাপ হতে পারে না। আমি পারি না, তাই করি না। তুই পারিস না, তাই করিস না। দিব্যি গেলে বল্ তো, তোর কি প্রেম করতে ইচ্ছা করে না?'

সন্টুর দৃষ্টিতে বিভ্রান্তি বাড়ে, বলে, 'এই বয়সে?'

মোহন বলে, 'তবে সবাইকে কি নিশিথদার মতো হতে হবে নাকি? তিরিশ বছর না হলে, ইস্কুলে মেয়ে-টিচার না হলে, খুক খুক কাশি না হলে, কবিতা না লিখলে, গান না গাইলে, প্রেম করা যাবে না?'

কথাগুলো বলতে বলতে, মোহনের মুখ যেন জ্বলজ্বলিয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, 'তুই রমা রলাঁর জাঁ ক্রিস্টোফার পড়েছিস?'

সন্টু অনেকখানি নিবে আসে, মাথা নেড়ে বলে, 'না।'

'আমি পড়েছি। আঠারো বছর বয়সের আগেই প্রেম করা যায়। ত্রিদিবেশ তো পারে। আমাদের বয়সে প্রেম করা যায় না যারা বলে, তারা মোটেই প্রগ্রেসিভ মাইণ্ডেড না, রিঅ্যাকশনারি। তুই ওসব আজেবাজে কথা বলিস না। সকলেরই প্রেম করতে ইচ্ছা করে।'

সন্টুর ধন্দ সোচ্চার না, জিজ্ঞেস করে, 'ছোট ছোট বাচ্চারাও প্রেম করবে?'

'উল্লুক!' মোহন বলে, 'ছোট ছেলেদের কথা হচ্ছে না, ওরা প্রেমের কী বোঝে? তোর কিছু মনে হয় কী না বল্ না।'

'কী মনে হবে?'

'কিছু মনে হয় না, কোনো মেয়েকে দেখলে?'

সন্টু কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। মোহনের ঝলকানো দৃষ্টি ওর চোখের দিকে। সন্টু যেন লজ্জা পেয়ে যায়, মোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। মোহন সন্টুর হাসিকে ভেংচি কেটে বলে, 'এঁহ্, দাঁত মানুকে। খালি নরেশের পেছনে লাগতে পারিস, মল্লিকার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বলে। দোষ করেছে ত্রিদিবেশ, না?'

সন্টু এবার পুরোপুরি আপোস করে, বলে, 'না, তা বলছি না। শিউলী আমাকে খামোকা কতগুলো কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিল। ভালো ভাবে বললেই পারতো।'

মোহন দালান দিয়ে সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে বলে, 'শিউলী একটু কড়াধাতের মেয়ে।'

দুজনেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে। নিচের দালানের ওপারে, জানালার সামনে বসে কানন কুটনো কোটে, তার মুখ রান্না ঘরের দিকে, ...া যায় বড় বউদির সঙ্গে কথা বলে। বড় বউদি নিশ্চয়ই রাত্রের রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। বাইরের ঘরের দরজার দিকে মোড় নেবার আগে বাবাকে দেখা যায়, দক্ষিণের জানালার ধারে ইজিচেয়ারে বসে আছেন। খদ্দরের পাঞ্জাবির বুক খোলা মুখে কয়েক দিনের আকাটা গোঁফ দাড়ি, নাকের মাঝামাঝি চশমা নামানো, কোলের কাছে ধরে রাখা বইয়ের দিকে ও'র দৃষ্টি। পুব দিকের দেওয়ালে মায়ের ছবি, কপালের টিপ আর সিঁথি লাল রঙ দিয়ে আঁকা। কানন একবার মোহন আর সন্টুর দিকে তাকায়। শিউলী ওখানে আর নেই। ওরা যখন বাইরের ঘরে যায়, তখন কাননের গলা শোনা যায়, 'জবার মা, বাইরের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো।'

মোহন বাইরের ঘরের দরজা খুলে,

শরীর দুর্বল থাকলে সর্দিকাশি সারতে চায় না

সেইজন্য সর্দিকাশির বিরুদ্ধে যোঝবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার শরীরে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা চাই। একমাত্র ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড লাল লেবেলই এই দুই কাজ একসঙ্গে করতে পারে: সর্দিকাশি প্রতিহত করে, আর দুর্বলতাও দূর করে।

সুস্থ এবং সবল থাকার জন্যে...

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড
লাল লেবেল

পরিবারের সকলের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য টনিক।

ওয়ার্নার-ল্যাম্বার্ট এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

সন্টুকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। জবার মা বাড়ির ঝি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোহন একবার দাঁড়ায়, যেন ঠিক করতে পারে না কোথায় যাবে। সন্টু জিজ্ঞেস করে, 'বকুলতলায় যাবি তো?'

মোহন বলে, 'ইচ্ছে করছে না।'

সন্টু বলে, 'পণ্ডিতদা দুদিন হলো, কলকাতা থেকে ফেরেনি।'

'জানি।' মোহন বলে, আর এ সময়েই রাস্তার আলোগুলো একবার জ্বলে, নেবে, আবার জ্বলে, ঠুলির ভিতর থেকে টিমটিমে আলোর কিছুই বোঝা যায় না। আকাশে মেঘ, সন্ধ্যার এখনো একটু দেরি, পুবের বাতাস ক্রমে যেন উতল হয়। মোহন বলে, 'চল্, গদাইয়ের দোকানে যাই, একটু চা খাবো, আর সিগারেট।'

বলে ও ডানদিকের রাস্তায় হাঁটতে আরম্ভ করে। ওদের বাড়ির পিছন দিক, যেখানে কর্মকারদের পুকুর। সেখানে এখন রাজু কর্মকার, তার স্ত্রী এবং মা ও কন্যা, কেউ নেই। রাজুর হাতে বা পুকুরের জলে, কন্যার মৃত্যু হয়নি, বিবাদের ফয়সালা নিশ্চয়ই রাত্রে শয়ন ঘরে হবে। সন্টু বলে, 'গদাইয়ের দোকানে হয়তো নলীমাস্টার থাকবে।'

মোহনের নাকের পাটা ফুলে ওঠে। বলে, 'তাতে কী হয়েছে? বেশি রমজানি করলে তার জবাব পাবে। ছেড়ে দেব না।'

'এই, কোথায় যাচ্ছিস্ রে মোহন?' পণ্ডিতমশাইয়ের বউ, একটু আগে যিনি পুকুরে গা ধুচ্ছিলেন, তাঁর ঘরের রাস্তার ধারের জানালায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন। লাল ডোরা, লাল পাড়, সাদা জমিনের তাঁতের শাড়ি, তাঁর গায়ে জামা নেই, কপালে সিঁথিতে সদ্য লাগানো সিঁদুর।

মোহন বলে, 'এই একটু বেরোচ্ছি। কেন, কিছু দরকার আছে?'

পণ্ডিতমশাইয়ের বউ বলেন, 'আমার বড় মেয়েটা গেছে ইতুদের বাড়িতে, এখনো আসবার নাম নেই। এদিকে সন্ধে হয়ে এলো, কী যে করি।'

তাঁর মুখে উদ্বেগের থেকেও, একটা অস্বস্তির ভাব বেশি। মোহন বলে, ইতুদের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসবো?'

পণ্ডিতমশাইয়ের বউ—যাঁর নাম পদ্মাবতী—পদ্ম, পণ্ডিতমশাই তাঁকে নাম ধরে পদ্ম বলে ডাকেন, ছাত্রদের সামনেই বলেন, 'সে তো ডেকে আনতে আনতে সন্ধে উত্তরে যাবে, আমার সন্ধে দেওয়া আর হবে না। ছোটটা শাঁখ বাজাতে পারে না, পিদীম জ্বালাতেও পারবে না। তুই আয় একটু, সন্ধেটা দিয়ে যাবি।'

সন্টু অবাক চোখে মোহনের দিকে তাকায়, মোহনও প্রথমটা অবাক হয়, তারপরে বলে, 'যাচ্ছি চলুন।'

পদ্মাবতী জানালা থেকে সরে যান। বাঁদিকে বাড়ি ঢোকবার দরজা খোলা। সন্টু জিজ্ঞেস করে, 'উনি সন্ধে দেখাতে পারবেন না?'

মোহন বলে, 'না।'

'কেন?'

বাড়ির উঠোনের এক পাশে একটি কুরচি ফুলের গাছ, পিছনের সীমানা দেওয়ালের ধারে ডুমুর গাছ একটা, আর কয়েকটি কৃষ্ণকলির ঝাড়। মেজেন্টা রঙের ফুলকলিগুলো ফুটতে আরম্ভ করেছে। সন্ধ্যায় পূর্ণ বিকসিত, গন্ধ ছড়ায়, রাত্রেই শুকোয়, সকালে ঝরে। মোহন বলে, 'এখন সন্ধে দিতে নেই, ঠাকুরকে ছুঁতে নেই তিন চারদিন মাত্র, আমি জানি।'

সন্টুর চোখে তখনো কৌতূহল, জিজ্ঞাসা। ঘরের ভিতর থেকে পদ্মাবতীর স্বর ভেসে আসে, 'এ ঘরে আয়।'

মোহন ভুরু কুঁচকে সন্টুর দিকে তাকায়, গলা নামিয়ে বলে, 'মেয়েদের হয় না, প্রতি মাসে? তখন ওসব করতে নেই।'

সন্টু ঘরে ঢোকবার আগে পর্যন্ত বিভ্রান্ত, পরে অনুমান করতে পারে। পদ্মাবতী তাঁর ঠাকুরের আসন পট প্রদীপ ইত্যাদি দেখিয়ে বলেন, 'এখানেই সব আছে মোহন। তুই খালি পিদীমটা জেলে, শাঁখ বাজিয়ে দে, তা হলেই হবে। চা খাবি?'

মোহন বলে, 'খাবো। পণ্ডিতমশাইয়ের সিগারেট এক-আধটা বাড়িতে আছে?'

'দেখছি, তুই আগে পায়জামা আর জামাটা খুলে গামছা পরে নে।' তাঁর হাতে আগে থেকেই গামছা ছিল, সেটা মোহনের গায়ে ছুঁড়ে দেন। দিয়ে, অন্য ঘরে যান।

মোহন দ্বিরুক্তি করে না, কোমরে গামছা জড়িয়ে পায়জামা খোলে। গামছা কোমরে বেঁধে গায়ের জামা খুলে রাখে মেঝেয়। পদ্মাবতী একটা দেশলাই ওর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেন, হাতে একটা চিমনি-ঝকঝকে হ্যারিকেন।

মোহন দেশলাই জেলে প্রদীপ ধরায়। লক্ষ্মী আর কালীর পট, একাসনে, পাশাপাশি। মোহন শাঁখ তুলে তিনবার ধ্বনি করে। শাঁখটা আবার যথাস্থানে রাখতে যায়, পদ্মাবতী বলেন, 'রাখছিস কী, ওই কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল আছে, শাঁখটার মুখটা ধুয়ে রাখ। তারপরে দেশলাইটা আমাকে দে।'

মোহন জানে, শাঁখ গঙ্গাজলে ধুয়ে রাখতেই হয়। ও তাই করে। দেশলাই পেয়ে পদ্মাবতী পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে হ্যারিকেন জ্বালেন, তাঁর শাড়ির লাল ডোরাগুলো কোমরের কাছে বৃত্তাকার হয়ে ওঠে। দক্ষিণ বুকের আঁচল খসে যায় অনেকখানি। হ্যারিকেন ধরিয়ে বলেন, 'খুব সিগারেট খাওয়া শিখেছিস, দাঁড়া, পণ্ডিতমশাইকে এবার একদিন বলে দেব।'

মোহন পায়জামা আর জামা পরতে পরতে বলে, 'এখন তো কলেজে পড়ি।'

পদ্মাবতী দাঁড়িয়ে মোহনের চুল আস্তে করে টেনে দিয়ে বলেন, 'তবে আর কী, মাথা কিনেছিস। বোস এখানে, আগে চা করি, তারপরে সিগারেট।'

মোহন বলে, 'দিলেন তো চুলটা খারাপ করে। এত কষ্ট করে আঁচড়ালাম।'

যেতে গিয়ে পদ্মাবতী ফিরে দাঁড়ান, তাঁর লাল ডোরা বুকে হঠাৎ যেন উদ্ধত মনে হয়, বলেন, 'আহা, কী না আঁচড়াবার ছিরি। খারাপ করেছি তো, যা, চিরুনি দিয়ে আবার আঁচড়ে নে।'

মোহনের মনে পড়ে যায়, কয়েক দিন আগে ওস্তাগার গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে একজন মিলিটারি সাহেব পকেট থেকে চিরুনি বের করে মাথা আঁচড়াচ্ছিল। সে নিজেকে ফিটফাট করছিল, ওস্তাগার গলির কোনো মেয়ের ঘরে তার চুল অগোছালো হয়েছিল। ব্যাপারটা ওর ভালো লেগেছিল, ইচ্ছা করে সেই রকম একটা ছোট চিরুনি ও পকেটে রাখে। ও হ্যারিকেনের সামনে মেঝেয় বসে, বুক পকেটে হাত দিয়ে শিউলীর দেওয়া খামটা বের করে। শিউলীর বুকের ঘামে ভেজা ভেজা খাম এখন শুকনো। ও চিঠির আঠা-বন্ধ মুখ দেখতে থাকে।

সন্টু কাছে বসে জিজ্ঞেস করে, [illegible] এটা?'

'চিঠি।' মোহন বলে, [illegible] বলে খামের মুখ ছেঁড়ে, [illegible] কাছে শির ফুলে ওঠে, মুহ[illegible] দেখ।'

'কেন?' সন্টু জিজ্ঞে[illegible] চিঠি?'

মোহন খামের ভিতর [illegible] করে, রুল টানা খাতার কাগজ[illegible] ওর হাত যেন কাঁপে, যেন নিঃশ্বাস[illegible] আসে, বলে, 'পরে বলবো, সন্[illegible] দেখিস না।'

সন্টু সরে যায়, মোহন চিঠির ভাঁজ খোলে।

(ক্রমশ)

নতুন-ফসফোমিন নির্মাতাদের দ্বারা তৈরী আরেকটি উৎপাদন

ফসফোমিন আয়রন

...কারণ মেয়েদের জন্যে আয়রনের বেশী প্রয়োজন হয়

মেয়েদের জন্যে আয়রনের দরকার অনেক বেশী। কারণ প্রতি-মাসে তাঁদের শরীর থেকে আয়রন বেরিয়ে যায়। শরীরের পক্ষে আয়রন খুবই দরকার। তাই আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করাও প্রয়োজন।

গর্ভাবস্থায় আর শিশুকে স্তন্যপান করাবার [illegible] প্রত্যেক স্ত্রীলোকের আরো বেশী [illegible]রনের প্রয়োজন হয়। কারণ সন্তানের [illegible]তো আয়রনের দরকার!

[illegible] এই ঘাটতি পূরণ করতে আর শরীরে [illegible] মাত্রায় আয়রন বজায় রাখতে আপনি [illegible]ফোমিন আয়রন—প্রতিটি নারীর [illegible]কটি অত্যাবশ্যক টনিক।

[illegible]মিন আয়রন স্বাস্থ্যকর লাল রক্ত-[illegible] গড়ে তোলে আর আপনার যৌবনশ্রী ফিরিয়ে আনে।

ফসফোমিন আয়রনে সব ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও পাবেন। ফলে আপনি হয়ে উঠবেন যেমন কর্মঠ তেমনি প্রফুল্ল।

আজ থেকেই ফসফোমিন আয়রন খেতে শুরু করুন। প্রত্যেক দিন নিন ফসফোমিন আয়রন।

সব কেমিস্টের দোকানে ২টি সাইজে পাওয়া যায়: ১১০ মি. লি. ও ৪৫০ মি. লি.।

নতুন! ফসফোমিন আয়রন— মেয়েদের জন্যে বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী প্রথম টনিক

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS

ফসফোমিন [illegible] প্রাইভেট লিমিটেডের একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
© ই. আর. স্কুইব অ্যাণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক আর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী হলেন কে পি পি এল।

Shilpi-HPMA-7A/73 Ben

॥ পঁচিশ ॥

পিকাডিলির কাছেই কভেণ্ট গার্ডেন। দু'-চারজন বিদেশী প্রথম প্রথম ফস করে বলে বসে, কনভেণ্ট গার্ডেন। লণ্ডনের এই বনেদী অঞ্চল ব্যালে অপেরা ও নানা প্রতিষ্ঠানের ঐকতানের জন্যে প্রসিদ্ধ। তবে অভিজাত প্রতিষ্ঠান না হলে কভেণ্ট গার্ডেনের প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ প্রায় অসম্ভব।

আনা পাভলোভার ক্ষেত্রে কভেণ্ট গার্ডেনের রয়াল অপেরা হাউসে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সেই রকম কোন বাধা ছিল না। কেননা এর মধ্যেই তিনি যশস্বিনী হয়ে উঠেছেন। এবং তিনি আপামর জনসাধারণের শ্রদ্ধেয়া।

বিদেশে নৃত্যশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা আনা পাভলোভার পক্ষে রাতারাতি সম্ভব ছিল না। দেশে যদিও তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছিলেন পূর্ণ পরিণতির দিকে, কিন্তু মাঝপথেই হঠাৎ পড়ল ছেদ। আরও গভীর এক উপলব্ধির জন্যে সেই মুহূর্তে সম্ভবত খ্যাতির মোহ তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। ভিক্টর দানদ্রের পাশে এসে দাঁড়ালেন পাভলোভা এবং তারই সঙ্গে রাশিয়া ছেড়ে এলেন।

প্রতিভার বিকাশ অনিবার্য। হয়তো যা লাভ করা যেত দু' দিনে, তা পেতে সময় লাগবে দীর্ঘ দু' বছর। তবু যিনি প্রতিভাময়ী, ঘরে বাইরে, দেশে-বিদেশে—এমন কি প্রতিকূল পরিবেশেও লোকে তাঁকে চিনবেই চিনবে। যত তুচ্ছ কাজে তিনি লিপ্ত থাকুন, তাও যদি মন দিয়ে করেন তা হলে সেই ক্ষুদ্র কাজ তাঁকে আর বেশী দিন করতে হয় না।

আজ কভেণ্ট গার্ডেনের রয়্যাল অপেরা হাউসে সন্ধ্যার মুখে মুখে অসংখ্য দর্শকের সামনে দাঁড়াবেন প্রতীচ্যের ব্যালে সম্রাজ্ঞী আনা পাভলোভা। পোস্টারে তার মনোহারিণী মূর্তি। অপেরা হাউসের সামনে লম্বা 'কিউ' ছিল কয়েক দিন। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। পাভলোভার ক্ষেত্রে এমনিই হয়।

কিন্তু মাত্র কয়েক বছর আগে, যুদ্ধের সময় সময় তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের হিপোড্রমে নাচতে হয়েছে ব্যায়ামকুশলীদের সঙ্গে, এক পাল হাতি ও চীনে খেলোয়াড়দের সঙ্গে। তাঁর নাচের সঙ্গে দর্শকদের আরও বেশী করে আকর্ষণ করার জন্যে কিছু কিছু যাদুবিদ্যাও প্রদর্শন করা হত। মঞ্চের ওপর দূরে একটা পুকুরে দেখা যেত জলকেলি করছে পরীরা। যথাসময় পুকুরসুদ্ধ পরীরা অদৃশ্য হয়ে যেত দর্শকদের চোখের সামনে থেকে।

তবু কোন অনুযোগ করেননি পাভলোভা। কারুর কাছে কোন অভিযোগও জানান নি। শুধু এক-একবার তাঁর জন্মভূমি তাঁকে যেন ডাকত বড় করুণ করে। ফিরে যেতে চাইতেন তিনি রাশিয়ায় কিছু দিনের জন্যে। সেখানকার সবই তো বদলে গেছে এখন। জার-এর পতন হয়েছে। তিলে তিলে নতুন হচ্ছে তাঁর মাতৃভূমি।

পাভলোভা বলতেন দানদ্রেকে, "সেই কবে দেশ ছেড়েছি! চল না একবার ঘুরে আসি!"

দানদ্রে শুকনো স্বরে বলত, "না।"

পাভলোভা তার ছোট উঁচুর শুনে দমে

উদয়শঙ্কর

শক্তি

[illegible] এক-একবার বড় [illegible] হয়ে উঠতেন পাভলোভা। [illegible] ছেড়ে বেরোবার পর তিনি কাতর চোখে তাকাতেন এপাশে-ওপাশে, বিষণ্ণ হয়ে পড়তেন। নীল আবছা আলোয় একা বসে বসে পাভলোভা ভাবতেন, কত রূপেই না তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন নৃত্যমঞ্চে। কখনো পরী। কখনো রাজহংসী! আবার কখনো বা অতিপ্রাকৃত কোন এক রমণী! কিন্তু আসলে তিনি তো নারী! শুধু নারীই!

তাঁর নিকট বন্ধুদের কখনো কখনো বলতেন পাভলোভা, "ভাবছি বছর খানেকের ছুটি নেব। দায়-দায়িত্ব কাজকর্ম কিছু নয়, প্রাণ ভরে উপভোগ করব ছুটি। এক-একবার আমার কি ইচ্ছে হয় জান নভিকফ? জান হ্যুরক?"

"কি?"

"চলে যাই রিভিয়েরায়। সেখানে ছবির মত একটা বাংলো নিই। কিছু করব না, শুধু গড়াগড়ি খাব রোদ্দুরে। ফুল-টুল দেখব। আর দিশী রান্না করে খাওয়াব তোমাদের—" বলতে বলতে মানুষী দুর্বলতার ভারে নীরব হয়ে থাকতেন পাভলোভা কিছু সময়। পরে অস্ফুট স্বরে আবার বলতেন, "আর হয়তো একদিন আমার কোল জুড়ে আসবে ফুটফুটে এক শিশু—"

কিন্তু রিভিয়েরার ছবির মত সেই বাংলো পাভলোভার স্বপ্নের কুটির হয়েই থাকল। আর তাঁর শিশু-সন্তান? সে-ও রয়ে গেল স্বপ্নে। সারা দিনরাতের কাজ আচ্ছন্ন করে রাখল পাভলোভার জীবন তাঁর মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত।

যেতেন না। আরও বলতেন, "চল না! রাশিয়া দেখে আসব—"

"না! তুমি একা যাও না!"

"তোমার সে রাশিয়া তো নেই এখন, সে সরকারও নেই। জন্মভূমির নতুন রূপ একবার কি দেখতে ইচ্ছে করে না তোমার?"

দানদ্রের সেই এক উত্তর, "না!"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকতেন পাভলোভা। তর্ক করে দানদ্রেকে আর কিছু বোঝাতে চাইতেন না। এবং ইচ্ছে থাকলেও শেষ অবধি রাশিয়ায় আর ফিরে যাওয়া হয়ে ওঠেনি পাভলোভার। এক দিনের জন্যেও নয়। দানদ্রেকে ফেলে তিনি একা কখনো কোথাও যেতে চাননি।

কিন্তু দানদ্রের সঙ্গে আনা পাভলোভার কোন আইনগত বন্ধন ছিল না। যদিও মার্কিনী সংবাদপত্রে একদা ভিক্টর দানদ্রে ও তাঁর শুভপরিণয়ের খবর প্রকাশিত হয়েছিল, তা শুধু পাভলোভার দর্শকদের মনে নাড়া জাগাবার জন্য তাঁর ইম্প্রেসারিও সলোমন হ্যুরকের একটা ছল। সে খবর ভিত্তিহীন।

পাভলোভা চিরকাল দর্শকদের কাছে রহস্যময়ী নর্তকী হয়েই থাকতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বিবাহবন্ধনে জড়িয়ে পড়লে দর্শকদের মনে নর্তকীর নামের ঔজ্জ্বল্য অনেকখানি হ্রাস হয়ে আসে। এবং দানদ্রের সঙ্গে শেষ অবধি পাভলোভার বিয়ে হয়নি বলে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিপুল সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে আদালতে বেশ হইচই হয়েছিল। আইনমত পাভলোভার সম্পত্তির কোন অংশ পেতে পারে না ভিক্টর দানদ্রে।

কিন্তু কিছু না পেলে তার দিন চলবে কেমন করে! অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে অবশেষে সে পেল আনা পাভলোভার সম্পত্তির অর্ধেক ভাগ। বাকি অর্ধেক পেলেন আনার মা। তিনি তখন বাস করছিলেন লেনিনগ্রাদে।

বিবাহবন্ধনে বিশেষ আগ্রহ না

'ডাইং সোয়ান' হয়ে গেছে। 'অটম লিভস'ও শেষ। এই [illegible] দু-তিনটে ইউরোপীয় ব্যালের পর শুরু হল আনা পাভলোভার ওরিয়েন্টাল ইম্প্রেসনস। এই পর্যায়ের প্রথম নাচ হিন্দু বিবাহ। নৃত্যের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ উদয়শঙ্করের। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে তারই উপদেশমত সুরারোপ করেছে কমল ব্যানার্জি। পঞ্চাশ-ষাটজন রুশ বাজিয়ের ঐকতানে এখন সেই সুর ছড়িয়ে গেল প্রেক্ষাগৃহে।

হিন্দু বিবাহের পশ্চাৎপটে দেখা যাচ্ছে প্রাসাদের অভ্যন্তর। মঞ্চের ওপর এসে পড়েছে জোরালো আলো। পুরোহিত তার উদাত্ত স্বরে হোমাগ্নির সামনে বসে উচ্চারণ করছে বিবাহমন্ত্র। ছেলেমেয়েদের কলরবে মুখর মঞ্চ। কখনো শোনা যাচ্ছে উচ্চকিত কলকল হাসি। মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে, উলুধ্বনি করছে। হইচই করে কনেকে সাত পাক ঘুরিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল বরের পাশে। এবং পরে তাদের ঘিরে শুরু হল নাচ।

পটভূমি বাংলার নয়, রাজস্থানের।

রাধাকৃষ্ণ নৃত্যে উদয়শঙ্কর ও পাভলোভা

ছেলেমেয়েদের সাজপোশাক দেখলেই সে কথা বোঝা যায়। মেয়েরা পরেছে চোলি, ঘাঘরা আর ওড়না। ছেলেদের মাথায় পাগড়ি, পায়ে নাগরা। তারা পরেছে শেরওয়ানী, চুড়িদার পায়জামা ও কোমরবন্ধ।

কাঁচি দিয়ে নিজের হাতে কাপড় কেটে ঘাগরা কিংবা পায়জামা কেমন করে তৈরি করতে হয় দরজীকে তা-ও বুঝিয়ে দিয়েছে উদয়শঙ্কর—ছেলেমেয়েদের সেই এসব পরতে শিখিয়েছে। উলুধ্বনি কেমন করে দিতে হয় তা সে বার বার দেখিয়ে দিয়েছে মেয়েদের।

মঞ্চসজ্জা অপূর্ব। ভারতীয় পোশাকে বিদেশী ছেলেমেয়েদের খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। নাচ ও [illegible] তাদের। গোটা মঞ্চটাই যেন [illegible] করছে। মঞ্চে জিনিসপত্রও আনা হয়েছে অনেক। ঘট কুলো রুপোর থালা ছাড়ও চন্দন কুঙ্কুম—এই রকম প্রসাধন সামগ্রীও আছে।

বর, কনে আর ষোলজন ছেলে এবং ষোলজন মেয়ে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে গেল। বিদেশী দর্শকের কাছে উদয়শঙ্করের 'হিন্দু বিবাহ' এক বিস্ময়। এই রকম হাতের মুদ্রা, চোখ-মুখের এই রকম অভিব্যক্তি এবং আধুনিক জীবনের পরম লগ্নের এমন অপূর্ব প্রকাশ মঞ্চে তারা আর কখনো দেখেনি। মাত্র দশ-বারো মিনিটে ভারতবর্ষের একটা বিশেষ রূপ তারা দেখে নিল।

উদয়শঙ্করের 'হিন্দু বিবাহে' ভারতবর্ষের কোন নৃত্যের সামান্য প্রভাবও ছিল না—মালোয়ার কিংবা উত্তরপ্রদেশের লোকনৃত্যেরও নয়। তার পরিচালিত প্রথম সমবেত নৃত্য সম্পূর্ণ তারই কল্পনাপ্রসূত। কেননা নাচের ব্যাকরণ তখন উদয়শঙ্করের অজ্ঞাত। এবং যেহেতু সে তখন পেশাদারী নর্তক নয়, সেই হেতু নৃত্যের শ্রেণী বিভাগ করার মত জ্ঞানও তার ছিল না।

নৃত্যের ব্যাকরণ আয়ত্ত করার ছাত্রজনোচিত আগ্রহ যদিও নর্তক জীবনের শুরু থেকেই উদয়শঙ্করের ছিল না। তার জন্মগত প্রতিভা তার মনের মধ্যে আপনা-আপনি গড়ে তুলেছিল পরমাশ্চর্য এক রূপময় জগৎ। ভাবের ঘোরে সেখানে চলত উদয়শঙ্করের স্বতঃস্ফূর্ত অন্বেষণ। এবং পরে তার ভাব ও ভাবনা মিশে বিকশিত হত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের আধারে। উদয়শঙ্করের সৌন্দর্যবোধ ব্যাকরণের প্রথাগত নিয়মে আচ্ছন্ন হওয়ার নয়। তার ব্যাকরণ সৌন্দর্যের অবাধ বিস্তার। এবং তা তার নিজেরই সৃষ্টি।

দৈবের আনুকূল্যের মত অন্না পাভলোভার আহ্বান এবং তাঁর দলে যোগদান আত্মবিশ্বাস অনেক বেশী দৃঢ় করে তুলেছিল উদয়শঙ্করের। আর তারই প্রশ্রয় সহজ করে তুলেছিল ব্যাকরণ অগ্রাহ্য করে রূপসায়রে তার স্বাধীন ও দুঃসাহসিক পুনঃ পুনঃ অবগাহন।

পাভলোভার দলে এসেই রুচিবোধ আরও সূক্ষ্ম হল উদয়শঙ্করের। সময়ের মূল্য কতখানি, সে তা-ও বুঝল। পাভলোভার দলের আর সব নর্তক-নর্তকীর মত উদয়শঙ্করেরও মনে হল কর্মই যেন ভগবান। কি বিশাল ব্যক্তিত্ব পাভলোভার! নৃত্যের এত বড় একটা দল কি সুশৃঙ্খলভাবে তিনি পরিচালনা করে চলেছেন!

কারুর দিক থেকে কোন ত্রুটি হলে আর রক্ষে নেই। পাভলোভার সংহারমূর্তি কতবার যে দেখেছে উদয়শঙ্কর! তাঁর মুখের ওপর কিছু বলে এমন সাহস কারুরই

নেই। নতুনের বিচার, উদয়শঙ্করের বেলায় তিনি চিরতারুণ্যময়ী। কখনো তিনি নড়ে অমন কথা বলেন নি তাঁর সঙ্গে। একবার এমন ব্যাপার ঘটেনি।

এক দিক থেকে উদয়শঙ্করই তো পাশ্চাত্যলোকের ভারতীয় নৃত্যদূত। তাঁকে রাধার ভূমিকা বোঝাবার জন্যে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে উদয়শঙ্করকে। এর মধ্যে সে যোগাড় করে নিয়েছিল এক কপি গীতগোবিন্দের ইংরেজী অনুবাদ। প্রথমে সে পড়তে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সারমর্ম।

উদয়শঙ্কর মহড়ার আগেই তাঁকে বলেছে, "ম্যাডাম, রাধাকৃষ্ণের প্রেম হল প্রতীকী প্রেম। এই রকম প্রেম-বিরহের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ভগবানকে একান্ত আপনার জন হিসেবে খুব কাছে টেনে আনবার জন্য। তা হলে সহজেই মানুষের মনে সাড়া জাগবে।

"ম্যাডাম, ভগবানকে পাওয়া তো সহজ নয়। রাধার সংসার আছে। গৃহকাজ আছে। স্বামী আছে। কত বাধা। তাঁর অভিসারে যাওয়ার পথ বড় দুর্গম। কিন্তু কৃষ্ণের বাঁশির আকুল সুর তাঁকে বড় ব্যাকুল করে তোলে।
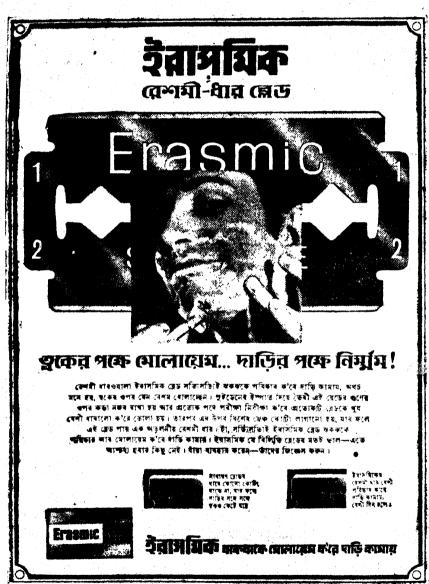
রাধা কোন কাজে আর মন দিতে পারে না।"

পাভলোভা খুব মন দিয়ে শোনেন উদয়শংকরের কথা। 'গীতগোবিন্দ' নিয়ে তিনিও নাড়াচাড়া করেন। একরে বলেন, 'শুনতে আমার খুব ভাল লাগছে।"

"রাধার ছিল অনেক সখী। কৃষ্ণর বাঁশি বেজে উঠল এক চাঁদনী রাতে। রাধা বেরিয়ে পড়ল অভিসারে। এল কৃষ্ণর কাছে। তাঁকে দেখে রাধার চোখ জুড়িয়ে গেল। মন ভরে গেল। কিছু পরে এল তাঁর সখীর দল।... দৃশ্যটা আপনি কল্পনা করুন ম্যাডাম—"

পাভলোভা তাঁর স্বপ্নময় চোখ তুলে বলেন, "অপূর্ব!"

"মাঝখানে রাধাকৃষ্ণ। এই যুগল মূর্তিকে ঘিরে নাচবে ষোলজন সখী। রাধাকৃষ্ণ তো নাচবেই।"

উদয়শংকর বার বার হাতের মুদ্রা দেখায় পাভলোভাকে। চোখ-মুখের অভিব্যক্তি দেখায়। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু উদয়শংকর যেমন দেখায় তেমন কিছুতেই হয় না। পাভলোভা হাল ছেড়ে দেন, চিৎকার করে নিজেকে ধিক্কার দেন।

ভাঙা কান্না-কান্না গলায় তিনি বলেন, "লোকে আমাকে বলে শ্রেষ্ঠ ব্যালে নর্তকী! ছাই! তোমার মত হাতের মুদ্রা আমি কিছুতেই করতে পারছি না। হাতের কোন কাজই যে নেই আমাদের ব্যালেতে—"

উদয়শংকর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে অল্প হেসে বলে, "আস্তে ম্যাডাম—"। সে একটু ভাবে, "আচ্ছা, 'ডাইং সোয়ান'-এ আপনি কিভাবে হাত নাড়েন?"

পাভলোভা হাঁসের ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার ভংগী করেন তাঁর দু-হাত টান-টান করে নাড়তে নাড়তে।

উদয়শংকর নিজের দু-হাত একটু ভেঙে ঢেউয়ের দোলায় খেলাতে খেলাতে বলে, "এই রকম করলেও তো হয়।"

পাভলোভা অবাক হয়ে দেখেন তার হাত চালনার ভঙ্গি। ঠিক যেন হাঁস ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। পাভলোভা তেমন করতে করতে বলেন, "শংকর, মনে হয় তোমার হাতে হাড়-টাড় কিছু নেই।"

উদয়শংকর আর এক ভঙ্গি দেখায় পাভলোভাকে, "এবার এই রকম করুন তো ম্যাডাম—রাধা কৃষ্ণর গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে—"

পাভলোভা চেষ্টা করেন। একবার। দুবার। তিন বার। বার বার।

পশ্চাৎপটে বট গাছ। রাজপুত ছোট চিত্র দেখে উদয়শংকরের নির্দেশমত এঁকেছে বিদেশী শিল্পী। গাছের নিচে একটা ঢিবি। তার ওপর দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ। চাঁদের নরম আলো ছড়িয়ে আছে। তাই মঞ্চের ওপর এসে পড়েছে নীল আলোর আভা।

কৃষ্ণের বাঁশি বেজে উঠল। ফুলের মালা হাতে নিয়ে তাঁর চকিত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে ধীর পদক্ষেপে এলেন রাধা।

কৃষ্ণ নেমে এলেন ঢিবি থেকে। তাঁর চোখে ফুটে উঠল কৌতূহল, পরে ঐশী তৃপ্তির আভা ছড়িয়ে গেল তাঁর মুখে। কৃষ্ণ সরে এলেন রাধার খুব কাছে। রাধার দু নয়নে পরিতৃপ্তির ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এল সখীরা। প্রথমে আটজন, পরে আরও আটজন। প্রথম দলের চেয়ে দ্বিতীয় দলের মেয়েরা আকারে কিছু দীর্ঘ। তাদেরও পরনে চোলি ওড়না ঘাগরা, পায়ে নূপুর।

ঐকতানে যে-সুর ধ্বনিত হচ্ছে বিদেশী দর্শকদের শ্রবণে তা অভূতপূর্ব। যে-দৃশ্য দেখছে তারা চোখের সামনে তা-ও লোকাতীত। তারা বসে থাকল মন্ত্রমুগ্ধের মত। কিন্তু মাত্র দশ মিনিট। সময় চলে গেল নদীর স্রোতের মত।

পরদিন লণ্ডনের সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল 'রাধাকৃষ্ণ'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। পাভলোভার এই নতুন সংযোজনের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হল। কিন্তু বিরূপ সমালোচনা হল 'অজন্তা ব্যালের'। সমালোচকের দল কটাক্ষ করে লিখলেন, বিদেশী ভঙ্গিতে প্রাচ্যের এই নৃত্য প্রদর্শনের কোন মানে হয় না। এই প্রচেষ্টা একেবারে হাস্যকর। অজন্তা ব্যালেতে শুধু রাজস্থানী বেশে ভেরা ও উদয়শংকরের সাড়ে তিন মিনিটের নাচ খাঁটি ভারতীয় বলে প্রশংসিত হল।

পেশাদারী মঞ্চ জীবনে প্রথম অবতীর্ণ হল উদয়শংকর। এবং তার ভাগ্যে হল যশোলাভ। কিন্তু কি নাচ নাচল সে? নৃত্যের পীঠস্থান ভারতবর্ষ! কথক, ভারতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী—দীর্ঘ সে দেশের তালিকা। জগদ্বিখ্যাত তার ঐতিহ্য।

সুতরাং কোন তালিকাভুক্ত হবে উদয়শংকরের নাচ? কি তার নৃত্যের উপাদান? সৃষ্টি, সৌন্দর্য আর সরলতা? এমন কোন নাচ নেই ভারতীয় নৃত্যতালিকায়।

সেদিন ভারতবর্ষের কোন নৃত্যগুরু যদি উপস্থিত থাকতেন কভেন্ট গার্ডেনের রয়্যাল অপেরা হাউসে তা হলে তিনি কিভাবে গ্রহণ করতেন উদয়শংকরকে? তিনি কি সহ্য করতে পারতেন এই অনভিজ্ঞ তরুণের অপটু অঙ্গভঙ্গি? শুধু তাঁর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন কোন পণ্ডিত?

তবু প্রতিভা প্রতিভাই। উদয়শংকর উদয়শংকরই। শিল্পের আর সব ক্ষেত্রেই প্রতিভাধরের মত তারও ছিল দুর্জয় সাহস, অখণ্ড আত্মবিশ্বাস এবং রসসৃষ্টির জন্মগত অধিকার।

যে ব্যালেরিনা-সম্রাজ্ঞী আন্না পাভলোভা তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের জন্যে হয়েছিলেন উদয়শংকরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পাত্রী, একদিন তিনিই তাকে দিলেন নিদারুণ আঘাত। উদয়শংকর দিশাহারার মত হয়ে গেল।

একটা বিদেশী ব্যালের পাত্র পাত্রী অনেক। বলা বাহুল্য প্রধান নর্তকী পাভলোভা। কিন্তু মঞ্চে তিনি প্রবেশ করেন পরে। প্রথমে যায় শকি। সেই ইতালীয় নর্তকীদ্বয়ের দু বোনের এক বোন।

শকি ঈষৎ দীর্ঘ। তার চেহারাও সুন্দর। একদিন দর্শকেরা ভুল করে তাকেই ভাবল পাভলোভা। সে মঞ্চে প্রবেশ করায় সঙ্গে সঙ্গে উঠল প্রচণ্ড হাততালির আওয়াজ। কিছু পরেই এলেন পাভলোভা স্বয়ং। দর্শককুল তাদের ভুল বুঝতে পেরে পাভলোভাকে অভ্যর্থনা জানাল দ্বিগুণ জোরে আবার হাততালি দিয়ে।

কিন্তু পরদিন অবাক হয়ে উদয়শংকর দেখল সেই ব্যালে থেকে পাভলোভা বাদ দিয়ে দিয়েছেন শকিকে। তিনি নিজেই প্রথম প্রবেশ করলেন মঞ্চে। দর্শকরা যেন ভুল করবার আর সুযোগ না পায়।

বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে লাগল উদয়শংকর শকিকে কেন বাদ দিলেন পাভলোভা। জগৎজোড়া যশ যাঁর তাঁর মনে কেন ঈর্ষার এই দাহ?

কেন?

(ক্রমশ)

পরাগ রেণু এবং প্রাগৈতিহাসিক কলকাতা

ডঃ সুনির্মল চন্দ

[গাঙ্গেয় উপত্যকায় স্তরীভূত পলির উপর শহর কলকাতা যেখানে দাঁড়িয়ে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে তার পরিচয় : অজস্র গাছপালায় সমাকীর্ণ গহন অরণ্য। প্রাকৃতিক ঘটনাচক্রে ওই সব গাছপালার কোন কোনটি হয়ত এখান থেকে অবলুপ্ত। অবশিষ্টরা অনিবার্য কারণে ঠাঁই করে নিয়েছে কলকাতার দক্ষিণে সুন্দরবনে। তবু একদা এখানে যখন তাদের বাস, তখন তাদের ফুল থেকে ছড়িয়ে পড়া পরাগ-কোষ বা রেণু এখানকার ভূস্তরের ফাঁকে ফাঁকে জমা হতে থাকে। জীবাশ্মরূপে তাদের কিছু কিছু সন্ধানও পাওয়া গেছে। পাতাল রেল তৈরির জন্যে কলকাতায় যখন ব্যাপক খনন কার্য চলবে, ওই সমস্ত জীবাশ্মের অনেকই তখন অনাবৃত হবে। লেখক মনে করেন, ওই সমস্ত জীবাশ্মের উপর আরো ধারাবাহিক গবেষণা চালালে, একদা কলকাতার বুকে কী ধরনের গাছপালা বাস করত, তাদের পারস্পরিক পরাগ সংযোগের প্রতিক্রিয়া এবং বিবর্তন এ সব ব্যাপারে এমন অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করা যাবে, যার তাৎপর্য উদ্ভিদ এবং ভূ-বিজ্ঞানীদের কাছে মূল্যবান।

জীবন্ত পরাগরেণু, ফুলের অভ্যন্তরস্থ পরাগ কোষ থেকে প্রাপ্ত। রেণুর বহিরাবরণে সূক্ষ্ম কারুকাজ এবং এক প্রান্তে অবস্থিত রন্ধ্র এই রেণুর পরিচয় জ্ঞাপন করে।

ডঃ সুনির্মল চন্দ বর্তমানে কলকাতার বসুবিজ্ঞান মন্দিরে রেণু-বিজ্ঞান শাখার ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী। কলকাতার মাটি নিয়ে গবেষণার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁর সহযোগী ডঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, রেণু-বিজ্ঞান বা পলিনোলজি আধুনিকতম বিজ্ঞানে এক নতুন সংযোজন।]

'বিজ্ঞানীরা নিজেদের গবেষণা সম্পর্কে নিজেরাই বাংলাভাষায় কিছু লিখুন।' সম্প্রতি কয়েকজন বিজ্ঞানীকে এমন একটি অনুরোধ করায় আমরা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য দুটি। এক, বাংলা রচনার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করা। দুই, কোথায় এবং কে কী ধরনের গবেষণা করছেন তার সঙ্গে 'দেশ' এর পাঠক-পাঠিকাদের পরিচিত করা। এ ব্যাপারে সমস্ত বিজ্ঞানীর কাছে আমাদের আমন্ত্রণ রইল। রচনা ৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়; সম্ভব হলে সচিত্র। উপযুক্ত রচনা বিশ্ববিজ্ঞান বিভাগে প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক, দেশ

গাছপালার জীবনচক্রের একটি প্রধান দিক ফুলের অভ্যন্তরস্থ পরাগকোষের (anther) ভেতর থেকে পরাগ-রেণুর (pollen grain) মুক্তি এবং বিস্তার। অসংখ্য পরাগ-রেণু মুক্তি পেয়ে হাওয়ায় বিস্তার লাভ করে এবং ধীরে ধীরে মাধ্যাকর্ষণের টানে মাটির বুকে, জলাশয়ের ওপর বা যত্র তত্র স্থান লাভ করে। যেগুলো জলের ওপর পড়ে সেগুলো নিমজ্জিত হয়ে তলদেশে স্থিতিশীল হয়। পরাগ-রেণু অত্যন্ত ক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক। আশ্চর্যের বিষয় এই, প্রতিটি পরাগ-রেণুর এমন কতগুলো চারিত্রিক এবং বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য আছে যা কেবল সেই উদ্ভিদের, যার থেকে পরাগ-রেণু উদ্ভূত হয়েছে, তার বংশ পরিচয়কে বহন করে। অর্থাৎ পরাগ-রেণু দেখে কোন গাছের সঙ্গে সে সংশ্লিষ্ট ছিল তা অনায়াসে নির্ধারণ করা যায়।

যে রেণুগুলো মাটির ওপর বা অন্যত্র সঞ্চিত হয় সেগুলো কিছুদিন বাদেই হাওয়ার সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যেগুলো জলের তলায় সমাধিস্থ হয় সেগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। কারণ তাদের বহিরাবরণ (exine) এমন একটি আশ্চর্য রাসায়নিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত (sporopollenin) যা সহজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। হাজার হাজার বছর ধরে নানারকম জৈবিক এবং অজৈবিক পদার্থের সঞ্চয় হতে হতে যখন একদিন জলাশয়টি পূর্ণ হয়, তার ভেতর কিন্তু পরাগ-রেণুগুলো জীবাশ্মতে পরিণত হয়ে অনন্তকালের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যায়। একেবারে তলদেশের রেণুগুলো স্বভাবতই বয়সে প্রাচীন হয় এবং যত ওপরে ওঠা যায় ততই সেগুলো অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ হয় এবং একেবারে পৃষ্ঠদেশে অর্থাৎ যে সময়ে জলাশয়টির শেষ অস্তিত্ব লোপ পেল, সেই সময়কার পরাগ-রেণু সঞ্চিত হয়ে অনাদিকালের সাক্ষী হয়ে থাকে। একেবারে তলদেশ থেকে আরম্ভ করে যদি একটু একটু পলল (sediment) নিয়ে পরাগ-রেণুগুলোকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অজৈব পদার্থ অর্থাৎ মৃত্তিকা থেকে পৃথক করে একেবারে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে একটি নির্দিষ্ট পথে উদ্ভিদ জগতের পরিবর্তন ঘটেছে এবং সেই বিশ্লেষণের ফল যদি শতকরা হিসাবে দর্শানো যায় তাহলে তলদেশ থেকে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত পরিবর্তন এবং বিবর্তনের ক্রমিক ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

কলকাতার পাতালিক স্তরে পাওয়া ৬০০০ বৎসরের অশ্মীভূত পরাগরেণু, কেওড়া গাছের, যা এখন শুধু সুন্দরবনে হয়। কলকাতার মাটির তলায় এ জাতীয় রেণু পাওয়ার অর্থ হলো ৬০০০ বছর আগে কলকাতায় গহন অরণ্য ছিল, যে অরণ্য এখন সুন্দরবনে বিদ্যমান

*

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের রেণু বিজ্ঞান গবেষণাগারে আমরা কলকাতার মাটি নিয়ে প্রায় আট বছর ধরে কাজ করছি। শিলীভূত পরাগ-রেণু নিয়ে কাজ করতে যাওয়ার আগে স্বভাবতই কলকাতার আসেপাশের এবং সুন্দরবনের প্রায় সমস্ত বর্তমান গাছপালার পরাগ-রেণু সংগ্রহ করে তাদের বাহ্যিক আকৃতি, গঠন, রন্ধ্রের সংখ্যা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বিশেষ যত্ন সহকারে আমাদের আয়ত্ত করতে হয়েছে যাতে শিলীভূত পরাগ-রেণুগুলো কোন্ উদ্ভিদ থেকে উদ্ভূত সেটা অবলীলাক্রমে সনাক্ত

করা যায়। পরিচয় উদ্ধার হলে আসে-পাশের বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক সংযোগ নির্ধারণ করা তো সম্ভব হয়ই, তাছাড়া উদ্ভিদ সমাবেশের প্রকৃতি ও আকার, তৎকালীন জলবায়ু ও আবহাওয়া প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঠিক সন্ধান দিতে সাহায্য করে।

কলকাতার মাটিকে পৃষ্ঠদেশ থেকে ৫০ মিটার গভীর পর্যন্ত কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। তলদেশ থেকে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত স্তরগুলি বিভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত। পৃষ্ঠদেশস্থ স্তরটি পলিমাটি, কাঁকর, কাদা, বালি ইত্যাদির সংমিশ্রণ ও দ্বিতীয় স্তরটি ৫ থেকে ১১ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বিতীয় স্তরটির ভেতর দিয়েই পাতাল রেল বসানো স্থির হয়েছে। আমাদের কাজও এই দ্বিতীয় স্তরটি নিয়ে। এই স্তরটি গাঢ় খয়েরী রংয়ের বালি মেশানো নরম পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এই স্তরের ভিতর অনেক বড় বড় সুন্দরী গাছের গুঁড়ি পাওয়া গেছে। তার অনেকগুলো আবার দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে গাছ-গুলো এখানেই হয়েছিল, অন্য স্থান থেকে জলস্রোতে বা অন্য কোন উপায়ে আসেনি। এই পুরু স্তরটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে দুটি বা তিনটি জৈব-মৃত্তিকা বা পীট-এর (peat) পাতলা স্তর আছে যাকে সাধারণভাবে কালকাটা পিট বলা হয়। পীট্ আংশিক অঙ্গারীভূত জলাভূমির উদ্ভিদ দ্বারা সংগঠিত জৈব এবং অজৈব পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। এতে শিলীভূত পরাগ-রেণুগুলো অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত হয়ে যায়। কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত পীট্ থেকে আমরা পরাগ-রেণু বিশ্লেষণের কাজ করেছি, যেমন বেলগাছিয়া, [illegible], বালিগঞ্জ, বৈদ্যবাটি ইত্যাদি। [illegible] পরাগ-রেণুর থেকে উদ্ভিদ জগতের যে ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করেছি তা আজকের কলকাতার গাছপালার সঙ্গে একেবারে মেলে না। পীট্ থেকে বড় ছোট সবরকম গাছের পরাগ-রেণু পাওয়া গেছে, আর অধিকাংশই আজকের সুন্দরবনের গাছপালার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। সেই গাছ-গুলো হলো সুন্দরী (Heritiera), গর্জন (Rhizophora), কেওড়া (Sonneratia), বাণী (Avicennia), কাঁকড়া (Bruguiera), গোলপাতা (Nypa), গড়ান (Ceriops), ইত্যাদি। এর সঙ্গে যেসব গাছের গুঁড়ি পাওয়া গেছে সেগুলোর কোষ সমষ্টি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সেগুলো লবণাক্ত মাটিতে শ্বসনমূলধারী গাছ, যা সাধারণত সুন্দরবন অঞ্চলে হয়—যথা সুন্দরী, কেওড়া, ধুধুল (*Carapa*), গড়ান ইত্যাদি।

এই স্তরে কিছু জৈব-মৃত্তিকা সংগ্রহ করে রেডিও-কার্বন (কার্বন-১৪) প্রণালীতে তার বয়স নির্ধারণ করেছি। ফলাফল হলো আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে পরাগরেণুগুলো এবং অন্যান্য উদ্ভিদ অংশ স্তরীভূত হয়েছিল এবং কালক্রমে জীবাশ্মতে পরিণত হয়েছিল। যে পরাগ-রেণু-গোষ্ঠী বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার মধ্যে ঘাস জাতীয় রেণুও কিছু পাওয়া গেছে যেগুলো আয়তনে বেশ বড় অর্থাৎ কর্ষিত ঘাসের (ধান জাতীয়) রেণু বলে মনে হয়। সাধারণত কর্ষিত ঘাসের রেণু অকর্ষিত ঘাসের রেণু অপেক্ষা বড় হয়। এ বিষয়ে অবশ্য আমরা এখনও স্থির কিছু বলতে পারছি না, কাজ এখনও চলছে। যদি সত্যি কর্ষিত ঘাসের রেণু হয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে এ অঞ্চলে আজ থেকে ৫০০০ হাজার বছর আগে আদিমজাতীয় মানুষের দ্বারা আদিম প্রথায় চাষ আবাদ হতো।

বর্তমান গবেষণার ফলাফল থেকে এই সিদ্ধান্তই করা যায়: আজকে যে মৃত্তিকার ওপর কলকাতা [illegible]নগরী অবস্থিত এবং প্রাণচাঞ্চল্যে উচ্ছ্বসিত সেখানে আজ থেকে ৫০০০ হাজার বছর আগে একটি বিস্তৃত গভীর বন অধ্যুষিত, বাঘ, কুমীর পরি-বৃত লবণাক্ত জলাভূমি ছিল। এই বনের গাছপালার সঙ্গে আজকের দিনের সুন্দর-বনের গাছপালার নির্ভুল সাদৃশ্য বর্তমান, যাকে আমরা mangroves বলি। সম্ভবত, ক্রমাগত পলিমাটির আস্তরণ পড়তে পড়তে এবং ভূপৃষ্ঠে নানা পরিবর্তনের ফলে কালক্রমে জলাভূমি ভরাট হয়ে যায় এবং আদিমযুগের মানুষ বসবাস করতে আরম্ভ করে, বন কেটে বসত বানায়। সেই চাপে বন ক্রমশ দক্ষিণে সঞ্চরণশীল হয় এবং যেখানে বর্তমান সুন্দরবন সেখানে এসে থামে। সুন্দরবনের সেই দক্ষিণাভিযানের কি সমাপ্তি হয়েছে?

বিজ্ঞান সংবাদ

জীবন মৃত্যুর দূরত্ব
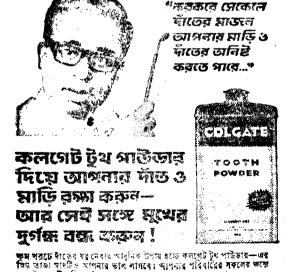
স্পন্দিত প্রাণ পুরোপুরি নিস্পন্দ হতে কতটা সময় লাগে? প্রশ্নটা আরও সহজ করে দাঁড় করালে হয়ত এই রকম হবে: সম্পূর্ণ জীবিত অবস্থা থেকে পুরোপুরি মৃতের পর্যায়ে পৌঁছতে সময় লাগে কত? কোলন-এর (জার্মানি) ম্যাকস প্লাঙ্ক ইনসটিটিউটের মস্তিষ্ক গবেষণা বিভাগের ডাইরেকটার অধ্যাপক ক্লস জুলেশ সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, জীবন এবং মৃত্যুর দূরত্ব প্রায় এক ঘণ্টা তিরিশ মিনিটের মত। তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন কোলনেরই জনৈক তরুণ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডঃ হোৎসমান, ৩৬। তাঁর মন্তব্য, এক সময়ে যে বলা হত মস্তিষ্কের মৃত্যু খুবই তাৎক্ষণিক ব্যাপার, এখন সেটা ভুল বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। বরং তথাকথিত মৃত্যুর পরও মস্তিষ্কের পুরোপুরি নিষ্কর্মা হতে সময় লাগে এক থেকে দেড় ঘণ্টার মত। কুকুর এবং বেড়ালের উপর পরীক্ষা চালিয়ে ডঃ হোৎসমান সিদ্ধান্ত করেছেন, হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করার কাজটা বন্ধ করলেই আমরা বলি লোকটি মারা গেল। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায়, ব্যাপারটা যেন আংশিক সত্য। কারণ, অনেক সময় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার পর হৃদপিণ্ড আবার স্বাভাবিকভাবে তার কাজ শুরু করে। উল্লেখ্য, এর আগে অনেকেই মনে করতেন, হৃদস্পন্দন বন্ধ মানেই মস্তিষ্কে রক্ত সংবহনও বন্ধ। তার ফলে মস্তিষ্ক-কোষগুলি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কখনও তারা স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে প্রায় জড় পদার্থের মতই পরিণত হয়। যার সংশোধন অসম্ভব।

কিন্তু ডঃ হোৎসমান ভিন্ন কথা শুনিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য: হৃদপিণ্ড রক্ত পাম্প করা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ধমনি এবং শিরা উপশিরা হঠাৎ সংকুচিত হয়ে পড়ে। যার ফলে হৃদপিণ্ডের এবং মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কখনও কখনও কৃত্রিম পদ্ধতিতে হৃদপিণ্ডকে আবার সচল করে তোলার পরও দেখা গেছে মস্তিষ্কের ওই সব ধমনি বা শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে তখনও রক্ত চলাচল বাধা পাচ্ছে। ডঃ হোৎসমান বলেছেন, রক্তের চাপ কিছুটা বাড়ালেই এই বাধা দূর করা যায়।

ডঃ হোৎসমান এসব ব্যাপার নিয়ে গত তিন বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। এর জন্যে গবেষণাগারে প্রচুর প্রাণীর মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল তাঁকে বন্ধ করতে হয়েছিল। বিরতি কখনও কখনও এক থেকে দেড় ঘণ্টার মত। তারপর রক্তের চাপ বাড়িয়ে তাদের সংকুচিত রক্ত-বহা নালিকাকে আবার রক্তবাহী করে তুলে অনেক প্রাণীকেই তিনি বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছেন। এইভাবে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ প্রাণী পুরোপুরি প্রাণ ফিরে পেয়েছে। এবং প্রতিটি প্রাণীর পুনর্জীবন লাভ করতে সময় লাগে প্রায় তিন ঘণ্টার মত।

প্লুটো

টেক্সাসের কোন একটি মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ইনডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের লিফ অ্যান্ডারসন মন্তব্য করেছেন, সৌরমণ্ডলের সুদূরতম গ্রহ প্লুটোর মেরু ঠিক পৃথিবীর দিকে মুখ করে অবস্থান করছে। যার অর্থ, প্লুটো যেন তার পরিক্রমণ তলের উপর শুয়ে থেকে সূর্যের চারপাশে পরিক্রমণ করে। অ্যান্ডারসন আরও লক্ষ করেছেন, ইউরেনাস-এরও মেরু তার পরিক্রমণ তলের উপর যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সে তুলনায় অনেকটা যেন হেলে পড়েছে। অ্যান্ডাসনের আবিষ্কার যদি নির্ভুল হয়, তা হলে আপাতত একটি সিদ্ধান্তই করা যেতে পারে। সেটা হল, সৃষ্টির পর সৌরমণ্ডলে গ্রহ, উপগ্রহ এবং সূর্যের পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব প্লুটো, ইউরেনাস এসব গ্রহের গতি-দশার উপরই সব চাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাদের প্রাথমিক গতি-দশা বা 'ডাইনামিক্যাল কনফিগুরেশন' তার ফলে অনেক বেশি পরিবর্তিত হয়েছে।

ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিকেল সোসাইটি

গত ১৯ জুলাই কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর বক্তৃতা-গৃহে **ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি** একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। অধিবেশনে পৌরোহিত্য করলেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট অতিথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল স্বর্গত অধ্যাপক এন আর সেন তৃতীয় বক্তৃতামালা। বক্তা অধ্যাপক নন্দলাল ঘোষ, এফ এন আই। অধ্যাপক ঘোষ 'ফ্লুইড মেকানিকস'-এর আধুনিক কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ এবং অধ্যাপকবৃন্দের এমন একটি সমাবেশ আমাদের ভারতে গণিত শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতে গণিত শাস্ত্রের উপর নিয়মিত গবেষণা এবং ক্রমান্বয় উন্নতি সাধন যাতে বজায় থাকে এমন উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক তরুণ গণিতজ্ঞ একটি গণিত সমাজের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। এর প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় পরে, ১৯০৮ সালে সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করল। এগিয়ে এলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে অকৃপণ সাহায্য করলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা তখন সারা ভারতের রাজধানী। প্রতিষ্ঠিত হল ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি উত্তরকালে বিদগ্ধ এই গণিত সমাজের সঙ্গে জড়িত হল অধ্যাপক সি ই কুলিস, অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, ডবলু এইচ ইয়ং, স্যার বি এন শীল, অধ্যাপক গণেশ প্রসাদ, নোবেল বিজ্ঞানী সি ভি রমন, ডঃ ডি এন মল্লিক প্রভৃতির মত স্বনামধন্য গণিতজ্ঞ। এ ছাড়াও এই গণিত সমাজের উচ্চতর মান এবং নানা রকম উন্নয়নমূলক কাজে অক্লান্ত সাহায্য করেছেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক এন আর সেন, ডঃ এস কে বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ এন এম বসু, ডঃ এস ধর প্রভৃতির মত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীবৃন্দ। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আন্তর্জাতিক গণিত সমাজের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এগিয়ে আসেন।

ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটির নিজস্ব পাঠাগারে এখন দেশী-বিদেশী মিলিয়ে প্রায় ৩০০ গণিতবিষয়ক পত্র-

সম্প্রতি প্রকাশিত

এবার আর ঘনাদার গল্প নয়।
একেবারে সত্যিকারের উপন্যাস।
ছোটগল্পের গণ্ডী ছাড়িয়ে
মহাকাশ যাত্রার
সব রেকর্ড ভাঙছেন ঘনাদা।
দু' দশ
পাতায় যাঁর কথা
আশ মিটিয়ে পড়তে
না পড়তে ফুরিয়ে যায়
সেই ঘনাদার
প্রাণভরে পড়বার উপন্যাস।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা

দাম চার টাকা মাত্র

এই লেখকের অন্য বই
খুনে পাহাড় ৫.০০ হার্মাদ ৩.০০
ঘনাদার জুড়ি নেই ৪.০০ ৩য় মুঃ
শৈব্যা পুস্তকালয়—কলিকাতা ১২

(সি ৭১০৯)

পত্রিকার আনাগোনা। এ ছাড়া এই পাঠাগারে এমন কিছু কিছু পুরনো পুঁথিপত্র রয়েছে যা ভারতে আর কোথাও নেই। পাঠাগারটির উন্নতিকল্পেও অকৃপণ দান করেছেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক এস সি বাগচী, ডঃ এস সি কর এবং অধ্যাপক এন এম বসু। প্রতিষ্ঠানটির নিয়মিত প্রকাশন 'বুলেটিন অব দ্য ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি' বিদগ্ধ মহলের কাছে খুবই পরিচিত।

১৯ জুলাই-এর অধিবেশনে উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন বললেন, গত কয়েক দশকে গণিতশাস্ত্রের বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে যেভাবে তার প্রবেশ ঘটেছে, এক কথায় তা অভূতপূর্ব। নিজেকে নজির হিসেবে দাঁড় করিয়ে অধ্যাপক সেন বললেন, 'আমি অর্থনীতির ছাত্র। সেকালের। এ বিষয়টিতে তখন গণিতের তেমন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু এখন উচ্চতর গণিত ছাড়া অর্থনীতি বুঝে ওঠাই একটা শক্ত ব্যাপার।'

অধ্যাপক সেন বললেন, যে কোন শাস্ত্রের ক্ষেত্রেই গণিত এখন অপরিহার্য বিষয়। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সেকালের গণিত থেকে একালের গণিত অনেকটা যেন ভিন্নতর। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে গণিতের পঠন পাঠন এবং পাঠ্যসূচী সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা দরকার। এ সব ব্যাপারে ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।

শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের গণিতের কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, গণিতের কথা শুনলেই ছাত্রছাত্রীদের যেন গা কাঁপে, বার বার জল খেতে ইচ্ছে করে [মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সামনে রাখা এক গেলাস জল ছিল। সে দিকে চেয়েই রসিকতা করে এই বাস্তব সত্যটি হয়ত তুলে ধরলেন তিনি]। কীভাবে পঠন-পাঠনের সংস্কার করলে এই ভয়ের ভাবটা দূর হয়, সোসাইটিকে তিনি সে ব্যাপারে ভেবে দেখতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, নীচের দিক থেকে এই ভয়ের ভাবটা যদি আমরা কাটিয়ে তুলতে না পারি, শুধু উচ্চতর গবেষণার কথা ভেবে লাভ হবে না। তাতে করে গণিতকে কখনও সার্বজনীন করে তোলা যাবে না।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুও গণিত শাস্ত্রের ব্যাপক অনুশীলন এবং পঠন পঠনের ওপর জোর দেন।

ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক এবং প্রবীণ গণিতশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক মহাদেব দত্ত তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কাজকর্মের কথা উল্লেখ করেন। ওই দিন আনুষ্ঠানিকভাবে এই সোসাইটির একটি শাখা কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করা হয়। এদিন থেকে এই শাখা কেন্দ্রটি মার্কিন দেশের ইস্ট ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হল। এর জন্যে ওই বিশ্ববিদ্যালয় কিছু অর্থ, জায়গা এবং কয়েকজন কর্মী দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অধ্যাপক দত্তের আবেদন, বেশ কিছু সংখ্যক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ স্থান সংকুলানের অভাবে এখন প্রায় নষ্ট হওয়ার মত অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া বহু মূল্যবান জার্নাল আর্থিক অভাবে বাঁধিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গবেষকরা নিয়মিত যাতে এখানকার গ্রন্থাগারের সাহায্য পেতে পারেন তার জন্যেও আরও কিছুটা জায়গা দরকার। এর জন্যে সরকার এবং বিশেষ করে সহৃদয় উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা দরকার। বলা বাহুল্য, একদা শুধু সহৃদয় ব্যক্তিদের আনুকূল্যেই এই গণিত সমাজের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা বাস্তবায়িত করে তুলেছিল।

প্রশ্ন

শ্রীহীরক সরকার, দুর্গাপুর-৯ থেকে প্রশ্ন করেছেন: লেকচারারের বাংলা প্রতিশব্দ কী? প্রফেসরের বাংলা অধ্যাপক। অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর সহকারী অধ্যাপক। এমন কি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের ক্ষেত্রে লেখা হয় সহযোগী অধ্যাপক। লেকচারারের প্রতিশব্দ পাই না। অনেক জায়গায় 'শিক্ষক' বলে চালান হয়। কিন্তু শিক্ষক তো সবাই। কেউ এ ব্যাপারে আলোকপাত করলে খুশী হব।

সমরজিৎ কর

ইণ্ডো-জার্মান সোসাইটির উদ্যোগে ম্যাক্স ম্যুলর ভবনে সম্প্রতি শিল্পী মনোজিৎ সেনগুপ্তের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে শিল্পীর আঁকা ২৮টি ছবি দেখা যায়।

প্রথম দিকে মনোজিৎ সেনগুপ্ত খ্যাত-নামা শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে শিক্ষানবিশী করেন। পরে তিনি ইংলণ্ড যান ও সেখানকার একটি স্টুডিওতে অঙ্কনবিদ্যা শেখেন। তারপর তিনি প্যারিস ও হল্যাণ্ডেও কিছুকাল থাকেন। দেশে ফিরে ইতিপূর্বে তিনি লখনউয়ে একটি একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন এবং সম্প্রতি কলকাতার দু-একটি যৌথ প্রদর্শনীতেও তাঁর কলানিদর্শন দেখা যায়। সুতরাং ঠিক পরিচিত না হলেও, গত কয়েক বছর যাবৎ তিনি নিয়মিতভাবেই শিল্পচর্চা করে চলেছেন। বর্তমানে তিনি দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের জনসংযোগ বিভাগে নিযুক্ত আছেন। প্রদর্শনীভুক্ত ছবিগুলির অধিকাংশই পরীক্ষামূলক এবং মিশ্র জাতীয় —অঙ্কনরীতির দিক থেকে তো বটেই, উৎকর্ষের দিক থেকেও তারতম্য ধরা পড়ে। অর্থাৎ দু-চারটি ছবি যেমন প্রশংসা দাবী করে, তেমন অপর পক্ষে আবার কয়েকটি নিদর্শন বেশ দুর্বল। শুধু তাই নয়, দু-একটি আবার শিক্ষার্থীসুলভ। অধিকাংশ স্থলেই তিনি জলরঙে ছবি এঁকেছেন ও চাপা রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। আগেই বলেছি, রচনারীতিও মিশ্র, অর্থাৎ মিনিয়েচর ও ভারতীয় রীতিতে শিল্পী কাজ করেছেন, সেই সঙ্গে কয়েকটি আধুনিকধর্মী ছবিও এঁকেছেন। দু-একটি ছবি অনেকের চোখে পড়ে, যেমন টু দি মার্কেট। ড্রয়িং, চাপা হলুদ ও লাল রঙ ব্যবহার ও প্রকাশভঙ্গীর জন্য ভারতীয় প্রথায় রচিত ছবিখানি অনেকের ভাল লাগে। আধুনিকধর্মী দু-একটি নিদর্শনে শিল্পী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কমপোজিশন অব হর্সেস-এর নাম করা চলে। ছবিটির বলিষ্ঠ রেখাভিত্তিক ড্রয়িং ও কমপোজিশন পদ্ধতি দ্রষ্টব্য। একটি নিসর্গ দৃশ্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—এ নাইট ডিভাইন। স্তরভেদ ও গভীর রঙপ্রধান বাদনাটিতে বলিষ্ঠ রেখা-ভিত্তিক গাছ ও কয়েকটি কুঁড়েঘরের পরি-প্রেক্ষিতে স্বচ্ছ আলোক বিকীরণ দ্বারা শিল্পী মায়াবী রাতের একটি মদির পরি-বেশের অবতারণা করেছেন। বলা বাহুল্য, ছোট্ট হলেও ছবিখানি অনেকের মনে রেখাপাত করে। বর্ষা অবলম্বনে রচিত দু-একটি ছবিরও নাম এই প্রসঙ্গে করা যায়—বিশেষ করে রেন কয়ার্স্ কয়েকজনের ভাল লাগে। অবিরাম বর্ষণের সুললিত ছন্দে মানুষের মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয় তারই অভিব্যক্তি শিল্পী এক তরুণীর বিশিষ্ট ছন্দবহুল দেহলতার প্রকাশ-ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। দু-একটিতে যামিনী রায় ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ধরা পড়ে, যেমন রিফিউজি। ১৯৩৩ সালে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম ভবনে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর প্রদর্শনীতে যামিনী রায়ের 'মা ও শিশু' নামক যে ছবিটি সর্ব-শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়, এই ছবিতে তার প্রভাব সুস্পষ্ট। কোনটিতে রবীন্দ্রনাথের রচনা রীতি ধরা পড়ে, যেমন দি ট্রুথ এক্স-রেড-এ। মিনিয়েচার জাতীয় ছবিগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি। অন্যান্য ছবির মধ্যে প্রতীকমূলক বার-এর নাম করা চলে।

চিত্রপ্রিয়

টু দি মার্কেট —মনোজিৎ সেনগুপ্ত

॥ নতুন নাটক ॥

অগ্নিদূত
নক্ষত্রের জন্ম : ৪·০০

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়
লাভার্স লেন : ৩·২৫

মনোজ মিত্র
চাক ভাঙা মধু : ৩·৫০

ছটি একাঙ্ক সঙ্কলন
নতুন রীতির একাঙ্ক : ৬·০০

লিপিকা : ৩০/১এ কলেজ রো,
কলিকাতা - ৯

(সি ৭১৪৪)

বি-এ (অনার্স) ও এম-এ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কয়েকটি বই

ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি এইচ্ ডি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি আর এস উপাধিপ্রাপ্ত গ্রন্থ
পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য ১০·০০

অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র
রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য ৫·০০
রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা

অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত
দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত ৫·০০

অধ্যাপক শ্রীসুবন্ধু ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রনাথের রাজা ৫·০০
রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন ৪·০০

অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত
বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ৪·০০

সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন।

দেজ পাবলিশিং, C/o. দে বুক স্টোর্স
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২

(সি ৭২০৮)

ডাক্তাররা বলেন,
৩ মাসের পর,
সর্বাঙ্গীণ বিকাশের
জন্যে আপনার
বাচ্চার চাই
শক্ত আহার

ফ্যারেক্স আপনার বাড়ন্ত বাচ্চাকে ফ্যারেক্স কত কি দেয় দেখুন!
সহজপাচ্য প্রোটিন। সেই সঙ্গে, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, আয়রণ
আর কার্বোহাইড্রেট।

আপনার বাচ্চার জন্যে কি অনুপাতে ফ্যারেক্স বাড়ানো প্রয়োজন :

বাচ্চার বয়েস	ফ্যারেক্সের পরিমাণ
৩-৬ মাস	১-২ চায়ের চামচ দিনে দুবার
৬-৯ মাস	৩-৪ চায়ের চামচ দিনে তিনবার
৯ মাসের পর	৪-৬ চায়ের চামচ দিনে চারবার

বিনামূল্যে ফ্যারেক্স পুস্তিকার জন্যে এখানে লিখুন :
ডিপার্টমেন্ট D-7, পোস্ট বক্স ১৬৫৫৮, বম্বে ১৮ ডবলিউ বি.
সঙ্গে ২০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন।
(যে ভাষা চাই জানাবেন)

ফ্যারেক্স®
গ্ল্যাক্সোর তৈরী

সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যে আপনার
বাচ্চার প্রথম শক্ত আহার

CMG F-32-175 BN
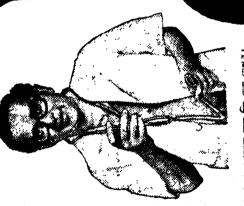
তারা আলি বেগ

শ্রীমতী তারা আলি বেগ এখন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের নতুন প্রেসিডেন্ট। শিশু ও কিশোর কল্যাণ ক্ষেত্রে শ্রীমতী বেগ-এর নাম ভারতে তো বটেই, বিদেশেও সুপরিচিত। তারা কিন্তু আমাদের ঘরের মেয়ে। বাঙালী সমাজের অতি আদরণীয় পরিবারে তাঁর জন্ম। কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত অর্থাৎ স্যার কে জি গুপ্তের তিনি পৌত্রী। ঢাকা জেলায় গুপ্ত পরিবারের আদি নিবাস। শ্রীমতী বেগের পিতার কর্মস্থানও ছিল ঢাকা শহর। সেকালে কথায় বলতো 'দিল্লী লাহোর, ঢাকার শহর'। সেই কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ঢাকায় বড় হয়েছেন তারা আলি বেগ। তাঁরা তিন বোন ছিলেন। কমলা, ইউনিস ও তারা। তারা সর্বকনিষ্ঠা।

তারা আলি বেগ ইণ্টারন্যাশনাল ইউ-নিয়ন ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার-এর ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট। ৬০টি দেশ এই সংস্থার সভ্য। তার মধ্যে চীন একটি। সম্প্রতি চীনের আমন্ত্রণে সাতটি দেশের যে প্রতিনিধি দল চীনে গিয়েছিলেন তার মধ্যে তারা আলি বেগ একজন। চীনের সফরে একটি অদ্ভুত জিনিস তিনি লক্ষ করেছিলেন। সে কথাই সেদিন বলছিলেন। শিশু-কিশোরকে যারা ভালবাসে তাঁদের কাছে তাদের মঙ্গল সবার উপরে। প্রথম আগ্রহ স্থানকালপাত্র নির্বিশেষে একই। একবার সেখানে ভোজসভা বসেছিল দুটি টেবিল ঘিরে। আগত অতিথিরা আলোচনা কি করবেন তা কিছুই আগে জানেননি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিনিধি আছেন। আছেন জর্জেস সিকল্ট, (যাঁর বিখ্যাত বই "দ্য উইংস অব চিলড্রেন" সারা দুনিয়ায় সাড়া জাগিয়েছিল), ছিলেন মরোক্কো থেকে শিশুবিশেষজ্ঞ ডাক্তার এসে-ছেন বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়ের সমস্যা নিয়ে বিশেষ অধ্যয়ন যাঁরা করেছেন। এরকম দলটি দু-ভাগে কি আলোচনা করেছিলেন? টেবিল থেকে উঠে তাঁরা অপর টেবিলে যাঁরা বসে-ছিলেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, কি তাঁদের আলাপের বিষয় ছিল। আশ্চর্য, তারা আলি বেগ যে টেবিলে বসেছিলেন এবং সেখানে যে কথা হয়েছিল, ঠিক তা-ই হয়েছিল পাশের টেবিলে। কোনও ভেদাভেদ নেই। যে চীনা মানুষ অতিথিদের দেখাশুনো করতেন তাঁরাও আত্মার এই ঐক্য দেখে অবাক।

তারা আলি বেগ এগারো দিন ছিলেন চীনে। শিশুকল্যাণে চীন এগিয়েছে অনেক। ১লা জুন ছিল শিশু দিবস। সেদিন সি মির স্ট্রীট, ন্যানকিং-এর এক স্কুলে অভ্যর্থনা হয়েছিল প্রতিনিধি দলের। টুকটুকে স্বাস্থ্যে ঝলমল ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়িত করেছিল। মনে হয়েছিল যেন পাখির দলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, আগ্রহে পরিপূর্ণ শিশুর দলকে যত্ন করা যেন সেখানে সবার সেরা কর্তব্য।

তারা আলি বেগ আরও একটি আন্ত-র্জাতিক সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। SOS বা Save our Souls প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রেসিডেণ্ট। এস ও এস ভারতবর্ষে এখন প্রচুর গঠনমূলক কাজ করছে। অনাথ বা

শ্রীমতী তারা আলি বেগ

পরিত্যক্ত ছেলেমেয়েকে ভালবাসা দিয়ে তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে চান এই প্রতিষ্ঠান। গতানুগতিক অনাথ আশ্রমের ধারায় তাঁরা বিশ্বাস করেন না। শিশুর প্রথম প্রয়োজন মাতৃস্নেহ। গুটিকয়েক শিশুকে ঠিক গৃহ-পরিবেশের মতন করে একত্র রাখা হয়। তাদের তত্ত্বাবধান করেন একটি "মা"। অনেক ক্ষেত্রে এ মা-ও স্নেহহীন পরিবেশের কবল থেকে পালিয়ে আসা মহিলা। মা ও শিশুর দল মিলে নতুন ঘর বাঁধা এবং নতুন স্নেহ-ডোর রচনা হয়। এ-রকম দশ বারোটি মিলে হয় 'ভিলেজ' বা শিশুপল্লী। সেই উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন তারা আলি বেগ কলকাতায় সেদিন। প্রথম ঠাকুরপুকুর এলাকায় জমি দেখছিলেন। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেশ বড় এক খণ্ড জমি দিয়েছেন সল্ট লেক এলাকায়। এস ও এস-এর কর্মসূচীর কলকাতা কাণ্ডের হালে আছেন রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীমতী ডায়াস। আশা করা যায়, অল্প দিনের মধ্যেই এস ও এস-এর শিশুনগরী বা পল্লী কলকাতার অভিভাবকহীন, অসহায় ও নিরাশ্রয় বালকবালিকাকে আশা ও আনন্দের পরিবেশে নিয়ে যাবে।

এবারে শ্রীমতী তারা আলি বেগ কল-কাতার একটি হাসপাতাল থেকে আট বছরের একটি বালিকাকে নতুন দিল্লির নিকটস্থ ফরিদাবাদের কাছে এস ও এস পল্লীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে সম্প্রতি পাঁচটি বাঙালী বালকবালিকা আছে। যাকে এবার নিলেন তার নাম অনিমা হালদার। সপ্রতিভ, বুদ্ধিমতী, চটপটে মেয়ে। এই দীর্ঘ আট বছর হাসপাতালের কর্মীদের যত্নে আদরে সে প্রতিপালিত হয়েছে। তার আপনজনের কোন হদিশ নেই। তাই বুঝি সে সবার আপন হয়েছিল। আসবার সময় হাসপাতালের পাতানো আত্মীয় যত কাঁদে তত কাঁদে শিশু অনিমা হালদার। এখন সে খুব খুশী। হাসিতে কথাতে ভরা। সবাই হয়তো এমন প্রাণচঞ্চল নয়, কিন্তু ভালবাসার আলোতে নতুন জগৎ দেখছে তারা প্রত্যেকেই।

শিশুদের কল্যাণে ও কিশোরের লালন পালন ও চরিত্র গঠনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বিশেষ আগ্রহ। তাঁরই উৎসাহে শ্রীমতী বেগ, তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত বেগ চীফ অব প্রোটোকল থাকাকালে, শিশুকল্যাণে ব্রতী হয়েছিলেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনায় 'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার প্ল্যান'-এর তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন।

সম্প্রতি আই সি সি ডবলিউ-এর কর্ণ-ধার হিসাবে তাঁরা দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে একটি
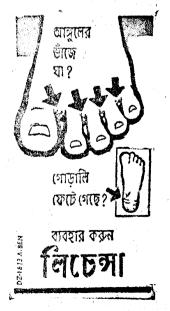
বিল আমখার কাজে ব্যস্ত আছেন। ভারতীয় আইনে দত্তক গ্রহণ ব্যাপারে বড্ড কড়াকড়ি। তাতে বহু শিশুর ক্ষতি হয়। কড়াকড়ি কমিয়ে দিলে অসহায় শিশুরা অনেকেই স্নেহপূর্ণ সংসারে মিশে যেতে পারে। বিদেশে এখনও দত্তক গ্রহণের জন্য সচ্ছল সুন্দর সুখময় ঘরের অভাব নেই। অথচ সেখানে দত্তকের জন্য শিশু মেলে না। অভাব তেমন নেই, আইনের চোখে জারজ সন্তানের কোন অসুবিধা নেই, সমাজও প্রায় মেনে নিয়েছে। কাজেই দত্তক কেউ দিতে চায় না। ভারতের শিশু বা এশিয়া আফ্রিকার অনাদরের অবহেলার শিশু, নেবার জন্য তাঁরা আকুল। সে ক্ষেত্রে আইনের অর্থহীন প্রয়োগে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার আমাদের অধিকার আছে কি? আমরা শ্রীমতী বেদের এই প্রচেষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তাঁর শক্তিপ্রয়োগে সমাজের ও আইনের এ ত্রুটিটুকু কাটবে এই আমরা প্রার্থনা করি। জন্ম দিলেই জনক বা জননীর সার্থকতা হয় না। সন্তান পালনে অক্ষম পিতামাতা কি অধিকারে শিশুকে হৃদয়হীন সংসারের বলিস্বরূপ বেঁধে রাখবেন?

বাংলাদেশের বই

সমালোচনা সাহিত্য

মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য
ডঃ আনিসুজ্জামান
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও প্রগতিশীল সাহিত্যিকের লিখিত মুসলিম মানসিকতা সম্পর্কে প্রামাণ্য, তথ্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ।
মূল্য পনের টাকা।

সমকালীন চিন্তা
আবুল ফজল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিকের লেখা, জাতীয়তা, রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা সম্বন্ধে কুড়িটি প্রবন্ধের অনন্য সংকলন।
মূল্য ছয় টাকা।

নজরুল কাব্য সঞ্চয়ন
আতাউর রহমান
নূতন দৃষ্টিতে নজরুলের কাব্যের বিচার। কবির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অবদান।
মূল্য নয় টাকা।

কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা
সৈয়দ আলী আহসান
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক লিখিত বাঙলা কাব্যের প্রবহমান ধারার নন্দনতাত্ত্বিক ও আঙ্গিকগত বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থে উদ্ভাসিত হয়েছে কবিতার আত্মা ও শরীর। এছাড়া দেশ-বিদেশের নানা সাহিত্য-ভাবনার বিচার বিশ্লেষণও এই গ্রন্থের মূল্যবান সম্পদ।
মূল্য তের টাকা।

ঢাকার চিঠি
সরলানন্দ সেন
দেশ বিভাগের শুরু থেকে দীর্ঘকাল ঢাকা থেকে লিখিত লেখকের অসংখ্য চিঠির সংগ্রহ —যাতে প্রতিফলিত হয়েছে সেখানকার তদানীন্তন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র।
মূল্য বার টাকা।

উপন্যাস * গল্প * নাটক

শওকত ওসমানের
ক্রীতদাসের হাসি উপন্যাস ৪.৫০
ঐ নাটক ২.৫০
নাট্যরূপ : রামেন্দু মজুমদার
নেত্রপথ গল্প সংকলন ৫.০০
জননী উপন্যাস ৯.০০
বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশের স্বপ্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পীর বইগুলি এ বঙ্গেও বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে।

সম্রাটের ছবি
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
খ্যাতনামা কথাশিল্পীর চিত্তাকর্ষক গল্প-সংকলন উভয় বঙ্গে আলোড়ন এনেছে।
মূল্য ছয় টাকা।

সূর্য তুমি সাথী
আহমদ ছফা
বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজচিত্র অবলম্বনে রচিত চাঞ্চল্যকর উপন্যাস। মূল্য ছয় টাকা।

মুক্তধারা
৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি ৬৯৪১)

টুকিটাকি

প্রসাধনী কিনতে সাবধান! প্রসাধনী পর্ব প্রচুর বেড়েছে। নখের পালিশ বা ওষ্ঠরঞ্জনী এখন আর কেবলমাত্র তথাকথিত ফ্যাশন-সচেতন আভিজাত্যের অংশ নয়। সাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে গেছে অঙ্গরাগের আকর্ষণ। কাজেই বাজারে আসছে নিত্য নতুন জিনিস। মানিনীর মন কেড়ে নেওয়া মোড়কের বাহার দেখে ভুলবেন না। ভাল করে ভেবে দেখবেন, বাজিয়ে নিয়ে কিনবেন।

একটি খুব সাধারণ জিনিসের বিষাক্ত সংযোগ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেমিক্যাল একজামিনার স্বর্গত ডাঃ কে এন বাগচি আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বঙ্গনারীর চুলে সীসা পাওয়াতে তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন সিন্দুর থেকে সীসা আসছে। সেই সীসা থেকে নানা রোগ (কেবলমাত্র মাথার ত্বকের রোগ নয়) হওয়া বিচিত্র নয়।

সিন্দুরের মত হেনাও উত্তরভারতে সদাসর্বদা ব্যবহার হয়। চুল রং করতে, হাতে পায়ে নকশা করতে উৎসবে বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে হেনার আদর প্রাসাদ থেকে কুটীরে বহু যুগ ধরে চলে আসছে। হেনার যে মৃদু রং ও সুবাস তা মেহেদির নিজস্ব। বর্তমান বাজারে কৃত্রিম রং মিশিয়ে হেনা বলে চালাবার চেষ্টা চলেছে। নমুনা সংগ্রহ করে দেখা গেছে, হলুদ, সবুজ ও নীল কেমিক্যাল রং হেনায় [illegible]। আসল হেনার পরিমাণ খুব কম। ভারতীয়তার বিভিন্ন দিকের মধ্যে বিদেশীদের আগ্রহ অত্যন্ত। হেনাও এখন রপ্তানির বাজারে নেমেছে। বিদেশে তার নমুনা নিকৃষ্ট বলে প্রতিপন্ন হলে আমাদের সুনাম বাড়ে কি?

জাফরান বা কেশর মূল্যবান জিনিস। রূপটান থেকে নিয়ে ঠাকুরঘর, খাদ্য থেকে নিয়ে ওষুধ সবেতেই ব্যবহার হয়। কাশ্মীরের জাফরান বিখ্যাত। অথচ বাজারে যা চলছে তার শতকরা নিরানব্বইটি নমুনা কোলটার বা আলকাতরা থেকে নেওয়া রং।

লিপস্টিক, পাউডার ইত্যাদি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সুনামের উপর নির্ভর করে কেনা ভিন্ন আমাদের উপায় নেই। প্রত্যেকটি নমুনা কেউ পরীক্ষা করিয়ে তো আর কিনতে পারে না। নামা অজানা অথবা বিনা নামের নকল কখনও কিনবেন না। তার চেয়ে প্রসাধনী বা অঙ্গরাগ ব্যবহার কমিয়ে দেওয়াও ভাল।

শ্রীমতী

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৭৭ ॥

হিমানীর বড়দা এবং দাদারা [illegible] নিয়েছেন [illegible]। হিমানীর বাবার বয়েস অনেক হয়েছে, তবু বেশ শক্ত সমর্থ ছিলেন [illegible] দিয়েছে। [illegible] প্রত্যেক দিন [illegible] শেষ মুহূর্তে ঘনিয়ে এলো বৃষ্টি, কিন্তু [illegible] প্রচণ্ড।

হিমানী প্রায় [illegible] বছরকে দেখতে যান। দু দিন ধরে বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে সেদিন তিনি সকালেই চলে গেলেন স্বামীকে নিয়ে। বাদল কিছুতেই গেল না। সে আগে কয়েকদিন গেছে। কিন্তু আত্মীয়দের বাড়িতে তার কিছুই করার থাকে না, ও বাড়িতে বই পড়েও বেশী নেই—তার সময় কাটানোই এক সমস্যা হয়।

ছোটবেলায় এই দাদামশাই বাদলকে খুব ভালোবাসতেন। তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন রোজ। সেই যুদ্ধের সময়, যখন বাদলরা সবাই পূর্ব বাংলায় মামাবাড়িতে চলে গিয়েছিল। গ্রামের সেই বাড়িও নেই, মানুষগুলোও কেমন যেন বদলে গেছে। মামা মাসীমাদের সঙ্গে বাদল কিছুতেই ভাব জমাতে পারলো না। সে একেই তো একটু মুখচোরা লাজুক, তা ছাড়া বাদল যে জগৎ নিয়ে চিন্তা করে—সে জগৎ সম্পর্কে এঁদের কারুর মাথাব্যথা নেই। এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ দাদামশাই সম্পর্কে বাদলের আগে একটা বিরাট ধারণা ছিল, এখন কলেজ-পড়া মন নিয়ে বাদল দেখতে পায় দাদামশাইদের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যও তাঁকে অনেক সংস্কার থেকে মুক্ত করতে পারেনি।

বাদল দাদামশাইকে অসুখের সময় দেখে এসেছে। তিনি এখন মানুষ চিনতে পারেন না। ও বাড়িতে কাজের লোকের অভাব নেই, তা হলে বাদল শুধু শুধু গিয়ে কি করবে? খালি ভিড় বাড়ানো। তবু হিমানী বললেন, তোর দাদা বউদিরা নাকি [illegible] জিজ্ঞেস করেন, বাদল এলো না [illegible] কেন, এলো না কেন? শুধুই বাদলের কথা ধরে যায়। বাড়ির লোকদের সব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি। কোনো কাজ নেই, শুধু মুখ দেখাবার জন্য যেতে হবে?

সেদিন সকালে হিমানী অনেক করে বললেন। বাদল যাবে না একেবারে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে।

হিমানী জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে দুপুরে খাবি কোথায়? হোটেল-রেস্টোরাঁয় খেতে চাস বুঝি?

বাদল বললো, আমি রান্না করে খাবো।

—রান্না করে খাবি? হেঃ, কোনোদিন রান্নাঘরের ধারেই যেতে দেখলুম না।

—সে তোমাদের ভাবতে হবে না। আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেবো। তোমরা এখন যাও তো—দশটার সময় বেরোবে বলেছিলে, এখন এগারোটা বাজে—

হিমানী বললেন, বাড়িতে বুঝি বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে আজ আড্ডা বসানো হবে? নিজের দাদুর এ রকম অসুখ—

বাদল বললো, না, না, আড্ডা হবে না। আমার নিজস্ব কাজ আছে।

একমাত্র ছেলে, সেই জন্যই হিমানী কিছুতেই ইচ্ছে থাকলেও প্রাণ খুলে বকতে পারেন না বাদলকে। চিররঞ্জন তাঁর একমাত্র স্বামী হলেও তাঁকে বকুনি দেবার ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য নেই। স্বামীকে বকেই তিনি আশ মিটিয়ে নেন।

মা-বাবা চলে যাবার পর বাদল সত্যিই রান্নার যোগাড়যন্ত্র করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কোনোদিন সে রান্না করেনি, তাতে কি। ভাত আর আলুসেদ্ধ সবাই রাঁধতে পারে। ইস, রেণুকে দুপুরের বদলে এই সময় যদি আসতে বলতো, তাহলে দুজনে মিলে দারুণ রান্না করা যেত। শুধু দু' জনের পিকনিক। এখন এক ছুটে গিয়ে রেণুকে ডেকে আনলে কেমন হয়? কিন্তু বাদল যে রেণুদের বাড়িতে আর কখনো যাবে না ঠিক করেছে। রেণুদের বাড়িতে টেলিফোনটাও যে থাকে ছোট কাকার ঘরে। বাদল কিছুতেই ছোটকাকাকে বলতে পারবে না, রেণুকে ডেকে দিন। তিনি যদি আবার সেই রকম 'অ' বলেন!

থাক, রেণু তো দুপুরে আসবেই—এখন আর তাকে ডাকার চেষ্টা করার দরকার নেই। বাদল রান্না ঘরে গিয়ে স্টোভ জ্বাললো।

এ বাড়িতে ঠাকুর-চাকর সব ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন ঠিকে ঝি শুধু

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর

নিশীথ রাতের আহ্বান

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

সকালে-বিকেলে এসে বাসন মেজে দিয়ে যায়। ঠাকুর চাকর রাখার সঙ্গতি এদের আর নেই। বাড়ির মিচতলাটা ভাড়া দিলে কিছু আয় হয়। ইদানীং হঠাৎ কলকাতায় ভাড়া বাড়ির খুব চাহিদা হয়েছে, ভাড়া বেড়েছেও দ্বিগুণ—প্রায়ই এ বাড়ির একতলাটা ভাড়া হবে কিনা খবর নেবার জন্য লোকজন আসে। একতলাটা একদম খালি, কেউ ব্যবহার করে না, তবু চিররঞ্জন ভরসা করে ভাড়া দিতে পারছেন না। সূর্যকে জিজ্ঞেস না করে ভাড়া দেবেন কি করে? সূর্যর তো পাত্তাই নেই।

বাদল স্টোভের উপর হাঁড়ি চাপিয়ে তাতে জল আর চাল ঢেলে দিল। তারপর সামনে বই খুলে বসলো। কিন্তু বই পড়ায় মন বসবে কি করে, প্রতি মিনিটে একবার হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখছে। ভাত তৈরি হতে এতক্ষণ সময় লাগে? টগবগ করে ফুটে উঠলে তখন ঢাকনা খুলে দিতে হয় এবং হাতায় করে দু-একটা তুলে টিপে দেখতে হয় সেদ্ধ হয়েছে কিনা—এটুকু বাদল জানে।

এক সময় টগবগ করলো এবং ভাত টিপেও দেখা হলো। সব ঠিক আছে। বাদল

ফেললো। সে ভগবানে বিশ্বাস করে না, বন্ধুদের কাছে এই নিয়ে অনেক বড়াই করেছে—কিন্তু বিপদের চিন্তায় কিরকম ভগবানের নাম মনে এসে গেল? আজ যদি জিতেন না আসে এবং রেণু ঠিক সময় আসে, তাহলে বাদল মাসে একদিন ভগবানকে মানতে রাজি আছে।

বাড়িটা অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধ। বাড়িতে আর কেউ নেই। এই কথাটা মনে এলেই এরকম নিস্তব্ধতার অনুভূতি হয়। অনেক সময় তো বাবা দুপুরে দুপুরে বেরিয়ে যান, মা ঘুমিয়ে থাকেন, বাদল একা একা নিজের ঘরে বই পড়ে—তখন তো এরকম ঠান্ডা নিস্তব্ধতার বোধ আসে না। একদম ফাঁকা বাড়িতে বেশীক্ষণ একা থাকলে কি রকম গা শিরশির করে। বড়বাবু এক সময় দিনের পর দিন এ বাড়িতে একা থাকতেন। অনেকদিন পর বড়বাবুর কথা মনে পড়লো। বড়বাবুর একটা জীবনী লেখার কথা একবার সে ভেবেছিল, এখন সেসব চিন্তা ঘুচে গেছে।

ঘড়িতে মাত্র পোনে তিনটে বাজে। আরও অনেকক্ষণ। রেণু কি একটু বুদ্ধি করে আগে আসতে পারে না? বাদল দারুণ উত্তেজিত বোধ করতে লাগলো। এখন তা গা ছুঁলে মনে হবে, তার জ্বর হয়েছে। সত্যি সত্যি তার চোখ ও কানের পাশটায় যেন আগুনের হল্কা লাগছে। সে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছে না। তখন তার মনে হলো, বার বার দোতলা থেকে একতলায় নেমে যাবার বদলে বৈঠকখানায় বসে থাকলেই তো হয়।

বৈঠকখানায় বসে সে ঘন ঘন সিগারেট খেতে লাগলো। ঘড়ি আর দেখবেই না।

তার ছেলেবেলার আপন মনে কথা বলার স্বভাব এখনো রয়ে গেছে। দিবাস্বপ্ন দেখাও তার রোগ। সে কল্পনায় দেখতে লাগলো, রেণু আসার পর সে কি রকম ভাবে কথা বলছে।

দরজা খুলে দিতেই দেখা গেল রেণু। হাতে দু'খানা মোটা মোটা বই। বাদল জিজ্ঞেস করলো, এত দেরি করলে যে?

—কোথায় দেরি? ঠিক তো সাড়ে তিনটে।

—ভুল করেও কি একটু আগে আসতে নেই?

—তুমি কোনোদিন ঠিক সময়ে আসো? তুমি তো সব সময় দেরি করো—

নাঃ এতো ঝগড়ার মতন হয়ে আসছে শুরু থেকেই। আজ রেণু এলে সে ঝগড়া করবে নাকি? এরকম ভাবে নয়।

রেণুর হাতে দু'খানা মোটা মোটা বই। বাদল জানে, আজ কলেজ বন্ধ। বাদল জিজ্ঞেস করলো, কি বই দেখি? আমার জন্য এনেছো?

—এ বই তোমার পড়া। লাইব্রেরির বই। মাকে বললাম কিনা, সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরীতে যাচ্ছি।

—আজকাল বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কিছু বলে বেরুতে হয় নাকি?

—বাঃ, এই দুপুরে রোদে বেরোলে মা জিজ্ঞেস করবে না? তাও তো মা আসতে দিচ্ছিল না। এত রোদে বেরুলে রং কালো হয়ে যায়।

এই কথা বলে রেণু হাসলো। তার উত্তরে বাদল দুম করে বললো, জানো, আজ আমি নিজে রান্না করে খেয়েছি।

—সত্যি? না মিথ্যে—

—বিশ্বাস করো। মা-বা তো দশটার সময় বেরিয়ে গেছেন—হোটেলে না খেয়ে আমি নিজেই রান্না করে খেলাম।

—কি কি রাঁধলে?

ধুৎ! রেণু আসতে না আসতেই সে রান্নার কথা বলবে নাকি? ভারি একটা কৃতিত্বের ব্যাপার যেন। এটা বড্ড বোকা বোকা হচ্ছে। রেণু যদি জিজ্ঞেস করে, তা হলে বলা যেতে পারে।

দরজার সামনে রেণু। হাতে বই নেই। রেণু বললো, আমার দেরি হয়ে গেছে নাকি?

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস
অভিনয় ১০·০০

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যোপন্যাস
সেদিন শৈলশিখরে ৬·০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
প্রেমে অপ্রেমে ৬·০০

অমলা সেনগুপ্তের ভ্রমণকাহিনী
হিমতীর্থ হিমাদ্রি ৮·০০

.... উপন্যাস/রাজনৈতিক গ্রন্থ ....

পুরুষ — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫·০০
তৃণভূমি — সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ ১২·০০
বাঘবন্দী — কণিষ্ক ॥ ৮·০০
নগশৃঙ্গার — আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·৫০
হিপিসঙ্গমে — রঞ্জন মজুমদার ॥ ৮·০০
প্রতিধ্বনি — নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ৫·০০
নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে — অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১মঃ ১৫·০০; ২য়ঃ ১০·০০
অস্থিরপঞ্চক — সমরেশ ॥ ৯·০০
কান্না ঘাম রক্ত — সৌরীন সেন ॥ ১২·০০
চেনামুখ — সৌরীন সেন ॥ ৮·০০
অপরিচিতা — সৌরীন সেন ॥ ৮·০০
অ্যাঙ্গোলা-আফ্রিকার ভিয়েতনাম — বরুণ রায় ॥ ৯·০০
ফিদেল কাস্ত্রো — শৌনক গুপ্ত ॥ ১০·০০
ডেটলাইন ঢাকা — পার্থ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৮·০০
সৈনিকের ডায়েরী — শেখর সেনগুপ্ত ॥ ৬·৫০

প্রাণেশ চক্রবর্তীর
মানসী মানা
পর্বত অভিযান কাহিনী ॥ ৭·০০

শোরজংগের শিকার কাহিনী
ডোরাকাটার অভিসারে
অনুঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ ৯·০০

অসীম সোম সম্পাদিত
চলচ্চিত্রকথা
চলচ্চিত্র-বিষয়ক ॥ ১৫·০০

অজয় বসুর
মাঠ থেকে বলছি
ফুটবল-বিষয়ক ॥ ৫·০০

রূপরেখা ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

(সি ৭১৪৫)

প্রস্তুতকারক ঃ
কিং এণ্ড কোং
(১৮৯৪ সাল হইতে
জাতির সেবায় নিয়োজিত)
৯০/৬ এ,
মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭

একমাত্র পরিবেশক ঃ
আর, ডি, এম এণ্ড কোং
১৮৪বি,
মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭,
ফোন ঃ ৩৪-৩৮৩৩

Grees
(সি ৭১৫২)

বাদল বললো, ভীষণ, ভীষণ দেরি করেছো। আমি ভেবেছিলাম, তুমি আসবেই না।

—সত্যিই বোধহয় আসতে পারতাম না। সেজোকাকীমা চারটে সিনেমার টিকিট কেটেছিলেন, তার মধ্যে বেবীমাসীর মাথা ধরেছে বলে যেতে পারবেন না, তাই সেজো কাকীমা বললেন আমাকে যেতে। আমি দেখলাম, দারুণ বিপদ। আমি তো মাথা ধরার কথা বলতে পারি না, কারণ একটু বাদেই বেরুবো। বললুম, 'ছবিটা আমার দেখা। তাও শোনে না—একবার দেখলে কি দু' বার দেখা যায় না? তবে আমি দেখলাম, এই সব। তোমার জন্য আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হলো।

—আমার জন্য না হয় বললিই একদিন।

—আমি মিথ্যে কথা বলি না সবাই জানে। আমার কি রকম অস্বস্তি হয়।

—একদিন বললে কিছু ক্ষতি হয় না। তুই আজ না এলে আমি আজ ভীষণ রেগে যেতাম।

—আমি তোমার রাগকে বড্ড ভয় পাই। হঠাৎ আজ ডেকেছো কেন?

—আজ অনেকক্ষণ ধরে গল্প করবো। কতদিন তো ভালো করে গল্প করা হয়নি। তা ছাড়া আমার কয়েকটা দরকারী কথা আছে।

—মাসীমা নেই বাড়িতে?

—না, ওরা সাড়ে আটটার আগে ফিরবেন না। কাছাকাছি আর কেউ না থাকলে, বেশ একটু, বুঝলি না, বেশ সহজ ভাবে কথা বলা যায়।

—হঠাৎ এরকম গল্প করবার ইচ্ছে হলো যে! আজকাল তুমি সব সময় কি রকম গম্ভীর গম্ভীর হয়ে থাকো—

—রেণু, আমার খুব মন খারাপ থাকছে।

—কেন?

—সেই কথাই তো বলবো বলে তোকে ডেকেছি। তোকে ছাড়া আর তো কারুকে বলতে পারি না।

—আমি তোমার মন ভালো করে দিতে পারি?

—শুধু তুইই পারিস। তুই আমার চোখের দিকে তাকাবি, ম্যাজিশিয়ানের মতন ঐ হাত তুলে—

—তুমি এই রকম একটা কবিতা লিখেছিলে না?

—চল, আমরা ওপরে গিয়ে বসি। চা খাবি? আমি চা তৈরি করে দিতে পারি।

—না, চা-টা খাবো না। তুমি আজকাল কবিতা-টবিতা লেখো না কেন?

—কি হবে লিখে? তা ছাড়া, তুই-ও তো আমার কবিতা লেখার প্রেরণা দিচ্ছিস না আজকাল।

—আমি আবার কি করে প্রেরণা দেবো? ধ্যাৎ!

—আমি তোর কাছাকাছি থাকতে চাই। আমার তো এখন আর কোনো বন্ধু নেই—

দরজায় এবার সত্যিই শব্দ। বাদল তড়াক করে লাফিয়ে এসে দরজা খুলে দেখলো এবার সত্যিই রেণু। হাতে একখানা মাত্র বই, মোটা নয়, সরু।

বাদল কোনো কথাই বললো না। রেণু ভেতরে ঢুকে বললো, এরকম অন্ধকার ঘরে বসে আছো কেন?

বাদল সে কথার কোনো উত্তর দিল না। কোনো কিছু চিন্তাও করলো না, দরজাটা বন্ধ করেই রেণুকে জড়িয়ে ধরলো দু' হাতে। রেণু বাধা দেবার আগেই তার ঠোঁটে ঠোঁট ডোবালো।

রেণু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, এ কি? (ক্রমশ)

১০৬/১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা—৯
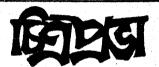
বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে পত্র পত্রিকাগুলি মাসাভাবে সজ্জিত হয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। এ বছরেও হবে। আপনারা পুজোর ছুটির অবসর কাটাবার জন্য প্রতি বছরই শারদীয় পূজা সংখ্যা কিনে থাকেন। এ বছর বাংলাদেশের পত্র পত্রিকার জগতে নবাগত **'চিত্রপ্রভা'** তার [illegible] ও মুদ্রণ পারিপাট্য নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। যে সব পত্র পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা বেরুবে, তার মধ্যে নিশ্চিতভাবে **'চিত্রপ্রভা'** স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত হবে।

৫টি উপন্যাস লিখছেন — বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিবরাম চক্রবর্তী।

২টি উপন্যাসোপম বড় গল্প লিখছেন — বিমল কর এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১০টি গল্প লিখছেন — রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আশা দেবী, বারীন্দ্রনাথ দাস।

রম্যরচনায় — দক্ষিণারঞ্জন বসু, অমিতাভ চৌধুরী, হিমানীশ গোস্বামী।

এছাড়া — **সিনেমা জগতের নানা লেখা ও ছবির ফিচার।** যা অন্য পত্র পত্রিকা থেকে স্বতন্ত্র হবে।

সেপ্টেম্বরের প্রথমে প্রকাশিত হবে।

দাম মাত্র পাঁচ টাকা। এজেন্টরা এখনি অর্ডার পাঠান।

(সি ৭২০৫)

ফ্যাশান মডেল মিন্না জোহরের সঙ্গে মুখোমুখি

"ফেস পাউডার?
আমার তো না হলেই নয়!
তবে পণ্ডস হওয়া চাই"

মিন্না জোহরকে ভালো ক'রে দেখুন। পণ্ডস ফেস পাউডার
ওঁর সুন্দর মুখে ঝলমলে আভা এনে দেয় আর ওঁকে
মনোহারিণী ক'রে রাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে।
আপনিও পণ্ডস ফেস পাউডার মেখে দেখুন কি সুন্দর লাগে!
পণ্ডস ফেস পাউডার এদেশের রূপসীদের মুখের রঙের
সঙ্গে মানানসই ছ'রকম জনপ্রিয় রঙে পাওয়া যায়।

পণ্ডস ফেস পাউডার
সব ফেস পাউডারের চেয়ে
[illegible] রূপসীদের প্রিয়

চীজব্রো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড
(সীমিত দায়িত্বসহ ইউ.এস.এ-তে [illegible])

রবীন্দ্রসঙ্গীতের উচ্চারণ

দেশ পত্রিকার ২৯ বৈশাখ সংখ্যার পত্রের আলোচনা সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

কিছুদিন আগে রবীন্দ্রসংগীতে 'হৃদয়' অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, রবীন্দ্র-সংগীত থেকে হৃদয়েরই প্রতিশব্দ 'মন' উধাও হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রসংগীতের বেশ কিছুটা অংশ 'হৃদয়' এবং 'মন' নিয়ে, তা যদি এমনভাবে উচ্চারণে উধাও কিংবা অবলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে রবীন্দ্রসংগীতের আর কী বাকী রইল? এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতুম না। যেহেতু ভাষাতত্ত্ব এবং রবীন্দ্রসংগীত, দুটোই আমার কাছে সমান আকর্ষক, প্রথমটি পেশা এবং দ্বিতীয়টি নেশা হিসেবে, তাই আলোচনায় অগ্রসর হতে হল, 'হৃদয়' এবং 'মনে'রই তাগিদ ও প্রেরণায়।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে ভাষাবিজ্ঞানীমহলে রবীন্দ্রনাথ অবিসম্বাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো রকম training বা শিক্ষণ ছিল না, অথচ তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক-সুলভ তীক্ষ্ন অন্তর্দৃষ্টি ছিল। বাংলা-ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন, তারই ফসল 'শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলাভাষা পরিচয়'।

প্রথমেই হৃদয়ের অবলুপ্তির ব্যাপারেই কিছু বলা যাক। বাংলাভাষায়, আমরা জানি, ঋ-কারের সংস্কৃতানুসারী কোনো উচ্চারণ নেই—এমনকি সংস্কৃতেও ছিল কিনা সন্দেহ। (প্রসঙ্গত স্মরণ করা যাক: 'ঋ, ঌ, ঙ, এগুলো কেবল সং সাজিয়া আছে': (শব্দতত্ত্ব, পৃঃ ৪)। ঋ-কারকে আমরা উচ্চারণ করি 'রি' হিসেবে, এবং হ-কারের সাথে তার উচ্চারণে হ সম্পূর্ণ-ভাবেই অবলুপ্ত হয়, 'হৃদয়' অত্যন্ত নির্দয়ভাবেই হয়ে যায় 'রিদয়'। বাংলাভাষার উচ্চারণ চলবে বাংলাভাষারই নিয়ম-অনুযায়ী, সংস্কৃত বা বৈদিক যুগের উচ্চারণ পদ্ধতিতে তো নয়ই। এমনকি বৈদিক প্রাতিশাখ্যেও বলা হয়েছে যে বৈদিকযুগে ঋ উচ্চারণ হতো আগে অথবা পরে অন্য কোনো স্বর (অ, ই অথবা উ) সহযোগে Altindische Grammatik vol I by J Wackernagel (পৃঃ ৩১, অনুচ্ছেদ ২৮)। এবং ঋকারের উচ্চারণ যে পুরোপুরি স্বরমূলক (vocalic) ছিল না তার উদাহরণ আমরা সংস্কৃতভাষা থেকেই পাই, যেমন, সংস্কৃত শ্রু ('শোনা')-ধাতুর বর্তমানকালে প্রথম পুরুষের একবচনে হওয়া উচিত 'শৃণোতি', কিন্তু হচ্ছে শৃণোতি, অর্থাৎ অনুমান করতে পারি 'ঋ' এবং 'রু' এর উচ্চারণে অদলবদল হতো প্রাচীন আমলেই। বর্তমান কালেও ঋ-এর রু-কার সুলভ উচ্চারণ পাওয়া যায় মারাঠী (অমৃত স্থলে অম্রুত) ও ওড়িশী ভাষায় (কৃষ্ণ স্থলে ক্রুষ্ণ)।

সুতরাং কোনো গায়ক যদি "হৃদয়" স্থলে "রিদয়" গেয়ে থাকেন তবে তা "অশুদ্ধ উচ্চারণ" আর যিনিই মনে করুন না কেন, কোনো ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র তা মেনে নিতে পারেন না। রেকরডে জনৈক "বিশুদ্ধ" গায়কের গাওয়া কয়েকখানা "হৃদয়"-ভরা গান বাজিয়েছি বারবার, কান পেতেই শুনেছি "হিদয়", অথচ সমালোচকের ভাষায় তা হয়ে গেল বিশুদ্ধ উচ্চারিত "হৃদয়"॥ একই গানে অন্তত দুরকমের উচ্চারণ শুনতে পেলুম॥ একটি পুরোনো কথাই বলি, রবীন্দ্রনাথও তাঁর আলোচনায় একাধিকবার বলেছেন, ভাষা বহতা নদী, পরিবর্তনশীল। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের পোশাক পরিয়ে যাঁরা ময়দানে পাঠাতে চাইছেন, তাঁরা ভাষার মূল ধর্মকে ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারছেন কিনা সন্দেহ হয়॥ রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মৌলিক-ভাবেই বলেছেন: "বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমন কি কোনো নতুন শব্দ আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তখনি সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে হয়েছে, আমরা লিখি এক আর পড়ি আর। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃতভাষায় আর ঠিক সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলাভাষায়" ('বাংলাভাষা পরিচয়' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, পৃঃ ৯৬—৯৭)॥ অর্থাৎ বাংলাভাষার কোনো তৎসম শব্দ নেই, সংস্কৃত থেকে কৃতঋণ (borrowed) সমস্ত শব্দই তদ্ভব কারণ কোনো তৎসম শব্দই সংস্কৃতের মতো উচ্চারিত হয় না, তৎসম শব্দ বাংলায় আকার-গতভাবে (graphemically) তৎসম (আমার মনে হয় সংস্কৃত তৎসম শব্দকে বাংলায় "তদাকার" শব্দ বলাই যুক্তিযুক্ত ও ভাষাবিজ্ঞানসম্মত, যদিও তা গ্রহণসাপেক্ষ—এখানে 'তদ' বলতে প্রাকৃত বৈয়াকরণেদের মতোই সংস্কৃতভাষাকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ যে শব্দের আকার সংস্কৃত শব্দের মতোই, কিন্তু উচ্চারণে খাঁটি বাংলা)।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গে এবার আসা যাক। 'দেশ' পত্রিকায় (২৯ বৈশাখ, ১৩৮০) জনৈক

সুদূর অতীতের যে সৌরভ আমাদের মনে রোমাঞ্চ জাগায় তারই পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসটির প্রতিটি ছত্রে জাহানারার নিঃশব্দ ক্রন্দনের ছোঁয়াচ পাঠকের মনে অব্যক্ত এক ব্যথার শিহরণ সঞ্চার করে।

শ্রীপারাবত-এর

মমতাজ-দুহিতা

জাহানারা ৭৲

প্রকাশিত হলো এই লেখকের

যে কিশোর নিষ্ঠুর পৃথিবীর নির্যাতনেও সহানুভূতির প্রলেপ লাগাতে চায়নি, সে এক অনিশ্চয়তার সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হয় সহায় সম্বলহীন অবস্থায়। লেখকের সুনিপুণ লেখনীতে অসাধারণ সৃষ্টি......।

সিংহদ্বার

দে'জ পাবলিশিং C/o. দে বুক স্টোর, কলি—১২

(সি ৭২০৭/২)

পত্রলেখক পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছেন রেডিওতে (এবং রেকর্ডে) রবীন্দ্রসংগীতের কোনো কোনো গানে মন ধন, বন, জন ইত্যাদির অ-কারের উচ্চারণ ও-হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা-সম্পর্কিত চিন্তা কী বলে দেখা যাক : "দ্ব্যক্ষরবিশিষ্ট (=অক্ষর বলতে রবীন্দ্রনাথ এখানে syllable বোঝান নি, বুঝিয়েছেন বর্ণমালার অক্ষর—লেখক) শব্দে দন্ত্য ন অথবা মূর্ধণ্য ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অকার ও হইয়া যায়। যথা, বন, ধন, জন, মণ, পণ, ক্ষণ।" (শব্দতত্ত্ব বিশ্বভারতী, ১৩৪২, পৃঃ ৮)। "শব্দের প্রথমস্থিত অ-কারের এই ক্ষতি বারে বারে নানারূপেই ঘটছে। যথা, মন, বন ...। এই শব্দগুলির আদ্য অ-কার ও স্বরকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। দেখা গেছে, ... পূর্বে তার এই দুর্গতি...।" (বাংলা ভাষা পরিচয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ১৯৩৮, পৃঃ ৮০)।

এ প্রসঙ্গে "ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের" অভিমত : "কতকগুলি ণ বা ন-কারান্ত একাক্ষর (one syllable) শব্দে অ-এর উচ্চারণ ও-কার হয়; যেমন মন, বন, ধন, জন (ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ১৯৪২, পৃঃ ৩৩)। আবার গগন, চরণ, মরণ প্রভৃতির উচ্চারণ প্রসঙ্গেও ভাষাসার্বভৌম সুনীতিকুমারের বইয়ে নির্দেশ আছে : "উচ্চরিত শব্দ দুই অক্ষরের শেষের অক্ষরে অ- থাকিলে, তাহা ও-বৎ হয়; অনল =[অনোল]...ইত্যাদি। সুতরাং মরোণ্, চরোণ্, উচ্চারণ ভাষাতত্ত্বসম্মত। তবে 'স্ময়'-এর উচ্চারণ "সোমোয়" হতে আপত্তি কী? 'সোময়' (লিপি—কিংবা মুদ্রাকর প্রমাদ?) আমি যদিও শুনিনি, তবু বর্তমানে শ্রুতিকটু বলবো, ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। ভাষা এবং উচ্চারণের বেলায় গ্রাম্যতা বলে কিছুই নেই। পত্রলেখকের ভাষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী খুবই সংকীর্ণ এবং অবৈজ্ঞানিক বলেই কোলকাতার প্রচলিত উচ্চারণকেই 'গ্রাম্যতা' বলে পরিহাস করেছেন। এ বিষয়ে লিখতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়, তাই লিখলুম না।

সবশেষে একটি কথা বলি। ইংরেজীতে শ্যেন ড্যানিয়েল জোন্স-এর An English Pronouncing Dictionary ছাড়াও ইংরেজী উচ্চারণের কয়েকটি অভিধান আছে, বাংলায় নেই, তাতে "সঠিক" ও "শুদ্ধ" উচ্চারণের নির্দেশ আছে। আচার্য সুনীতিকুমারের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ যে উনি যেন বাংলা উচ্চারণের একটি অভিধান রচনা করে যান। তাহলে হয়তো কিছু লোক অবান্তর কথা লিখে "দেশ" এর মতো পত্রিকার পাতা ভরাবার সুযোগ হারাবেন, নিজের কূপমণ্ডূকতা সম্বন্ধেও সচেতন হবার চেষ্টা করবেন।

মৃণাল নাথ
গবেষক/কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
কোলকাতা—৭০০০১২

ছোটদের বই

ঘনাদার গল্প ও উপন্যাস, টেনিদার গল্প ও উপন্যাস, হর্ষবর্ধনের গল্প, রহস্য, রোমাঞ্চ ও অভিযানের কাহিনী

মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র ।। ৪.০০
চারমূর্তি ।। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ।। ৪.০০
অদৃশ্য হন হর্ষবর্ধন ।। শিবরাম চক্রবর্তী ।। ২.৫০
সুন্দরবনে সাত বৎসর ।। বিভূতি বন্দ্যোঃ ।। ৪.০০
কাকতাড়ুয়া ।। দক্ষিণারঞ্জন বসু ।। ৪.০০
বিচ্ছুদের বাহাদুরী ।। স্বপনবুড়ো ।। ৩.০০
থুনে পাহাড় ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র ।। ৫.০০
ঝাউবাংলোর রহস্য ।। নারায়ণ গঙ্গোঃ ।। ৪.০০
কলকাতার কেঁদো ।। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ।। ৪.০০
নীলতিমি ।। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ৪.০০
হার্মাদ ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র ।। ৩.০০
দুরন্তযাত্রী ।। ধীরেন্দ্রলাল ধর ।। ৩.৫০
ঘনাদার জুড়ি নেই ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র ।। ৪.০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী
আমাজনের অরণ্যে ৪·০০
—প্রকাশ আসন্ন—

শৈব্যা পুস্তকালয় : ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মীর মশাররফ হোসেন

গত ২৯শে আষাঢ় (১৩৮০) সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্তের লেখা '১২৫ বছরের আলোয় মীর মশাররফ হোসেন' শীর্ষক লেখাটি পড়লাম। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়লো কিছুকাল আগে সনাতন পাঠক 'দেশ' এর 'সাহিত্য সংবাদ'এ মীর মশাররফ হোসেনের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বিষাদসিন্ধু' সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা লিখেছিলেন; সম্ভবত সেই আলোচনাটিই শ্রী সেনগুপ্তকে তাঁর আলোচ্য তথ্যমূলক নিবন্ধ রচনায় অনুপ্রাণিত করে থাকবে। রচনাটিতে লেখক অনেক জানা ও অজানা তথ্য জড়ো করেছেন; এতে তাঁর তথ্যনিষ্ঠতা ফুটে উঠেছে। কিন্তু তথ্য সমাবেশে ও গবেষণায় পারঙ্গম হলেও শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্ত যে সাহিত্য বিচারে—বিশেষত তুলনামূলক সাহিত্য বিচারে সুদক্ষ নন তার পরিচয় রয়েছে তাঁর নিবন্ধের শেষ দিকে। লেখকের সাহিত্যবোধ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা বাঞ্ছনীয় মনে করি না, কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে তিনি মীর মশাররফ হোসেন আর সৈয়দ মুজতবা আলীকে তুল্য জ্ঞান করলেন কোন্ বিচারে? আর বিচার যদি করলেনই তবে বাংলা সাহিত্যের দুই কালের এই দুই লেখক সম্পর্কে 'সাম্প্রদায়িক' মানদণ্ডটিই বা কেন ব্যবহৃত হল? এসব প্রশ্নের

মীমাংসার আগে লেখকের বক্তব্যের শরণ নেওয়া যাক : তিনি লিখেছেন : "১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেনের মৃত্যু হয়। রত্নবতী উপন্যাস দিয়ে যে কলমের শুরু যে কলম দিয়ে বিষাদসিন্ধু, বসন্তকুমারী, জমিদার, দর্পণ, বেহুলা গীতাভিনয় ও গাজীমিয়ার বস্তানীর সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনা কোথায়?" এই প্রশ্ন তুলে ধরে নিবন্ধকার সমগ্র বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও 'তুলনা' খুঁজে না পেয়ে অগত্যা বলেছেন : "এমন মধুর খাঁটি বাংলা গদ্য পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে অদ্বিতীয় সৈয়দ মুজতবা আলী ছাড়া আর কোন মুসলমান লেখক লিখতে পেরেছেন?"

সূচনায় মনে হয়েছিল শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্ত বুঝি মীর মশাররফ হোসেনের রচনার তুলনা খুঁজতে গিয়ে সমগ্র বাংলা সাহিত্যকেই চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কিন্তু না, খানিক পরেই তিনি ভুল ভেঙেছেন, বলেছেন: অদ্বিতীয় সৈয়দ মুজতবা আলী ছাড়া আর কোন মুসলমান লেখক লিখতে পেরেছেন? এতকাল জানতাম, সাহিত্যের বিচার—বিশেষত সাহিত্যের শিল্প গুণের বিচার 'হিন্দু মুসলমান' হিসাবে হয় না এবং মীর মশাররফ হোসেন কি সৈয়দ মুজতবা আলী—বাংলা সাহিত্যের গুণী লেখক হিসাবেই গণ্য। কিন্তু সুজিতবাবুর কল্যাণে জানলাম সেকালের মীর মশাররফ হোসেন আর একালের সৈয়দ মুজতবা আলী 'মুসলমান লেখক'। সেনগুপ্ত তাঁর নিবন্ধেই জানিয়েছেন যে মীর মশাররফ হোসেনের রচনা পাঠ করে সেই সুদূর অতীতেই শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার মন্তব্য করেছিলেন : 'তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাংলা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না।" সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও মন্তব্য করেন : "অনেক হিন্দুর প্রণীত বাংলার অপেক্ষা, এই মুসলমান লেখকের বাংলা পরিশুদ্ধ।"—এই যখন অবস্থা তখন ১২৫ বছর পরে মীর মশাররফ হোসেনের 'মধুর খাঁটি বাংলা গদ্য' এর সাথে তুলনার জন্য 'মুসলমান লেখক' এর অনুসন্ধান কেন? আর কেনই বা 'মুসলমান লেখক' সৈয়দ মুজতবা আলীর উল্লেখ? গত একশো বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত 'মুসলমান লেখক' আরও অনেক জন্মেছেন। কাজি নজরুল ইসলামের কথা বাদ দিলেও, নিছক গদ্য রচয়িতা হিসাবেও এ প্রসঙ্গে এয়াকুব আলী চৌধুরী, লুতফর রহমান, কাজী ইমদাদুল হক প্রমুখের নাম মনে পড়ে। শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্ত হয়তো এই সব 'মুসলমান লেখকদের' কোনো রচনার সাথে পরিচিত নন। তাঁর অন্তত এস ওয়াজেদ আলী কাজী আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবির, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ 'মুসলমান লেখকদের' রচনার সাথে পরিচিত থাকা উচিত ছিল, থাকলে বুঝতেন, তুলনা যদি খুঁজতে হয় (অবশ্য যদিও মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধুর' গদ্যের সাথে এঁদের কারোরই রচনার তুলনা চলে না; কেননা এরা অনেক বেশি রবীন্দ্র-প্রভাবিত) তা হলে সৈয়দ মুজতবা আলীতে নয় উল্লেখিত লেখকদের রচনার মধ্যেই তা অনুসন্ধান করতে হবে। কারণ, মীর মশাররফ হোসেনের মত 'খাঁটি বাংলা গদ্য' অর্থাৎ আরবী-ফারসী শব্দবর্জিত বিশুদ্ধ গদ্য এঁরাই লিখেছেন, সৈয়দ মুজতবা আলী নন। আর মধুর! সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্য যে কতখানি মধুর তা তো আমরা 'দেশ'-এর পাতায় 'পঞ্চতন্ত্র' পাঠ করেই টের পাচ্ছি।

সুজিতবাবুর প্রতি অনুরোধ, মীর মশাররফ হোসেনের গদ্য রচনা আর একালের সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্য রচনার মধ্যে 'মধুর খাঁটি বাংলা গদ্য' হিসাবে মিল-অমিল কতখানি এবং শিল্পগুণের তুলনায় সুরাটিই বা কোথায় তা একটু উদ্ধৃতি সহযোগে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিন। সুজিতবাবু তাঁর নিবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন : "কাঙাল হরিনাথের সুস্পষ্ট প্রভাবে লেখক-জীবনের শুরু থেকেই উর্দু-ফারসী বর্জিত বিশুদ্ধ ও সুমধুর সংস্কৃত অনুসারী খাঁটি বাংলা লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন মীর মশাররফ হোসেন।" কিন্তু সুজিতবাবুকে প্রশ্ন, যিনি তাঁর গদ্য রচনায় উর্দু-ফারসী-আরবী ইত্যাদি শব্দ এন্তার ব্যবহার করেন সেই সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষার অর্থাৎ 'খাঁটি বাংলার' অস্তিত্বটা কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে?

শরিফ হোসেন
আজিমপুর, ঢাকা বাংলাদেশ

॥ ২ ॥

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত রচিত '১২৫ বছরের আলোয় মীর মশাররফ্ হোসেন' প্রবন্ধটির (দেশ, ২৯ আষাঢ় ১৩৮০) অধিকাংশ তথ্য যে 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা—২৮, ২৯' থেকে গৃহীত সে কথার উল্লেখ থাকলে প্রবন্ধটির গৌরব বৃদ্ধি হত বলে মনে করি। সুজিতবাবুর লেখনী স্বাধীন' তিনি 'এন্তার' 'হাবিজাবি লিখে' আসর জমাতে পারেন। কিন্তু সে আখড়ায় মাননীয়দের নিয়ে টানাটানি কেন? 'প্রসঙ্গত সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিই' বাংলা সাহিত্যের সমালোচক ও প্রবীণ অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় 'কালীপ্রসন্নর বিপক্ষে বিস্তর ফাটাফাটি করেছেন'—এ ভাষার আসর স্বতন্ত্র। সেনগুপ্ত মহাশয় অধ্যাপক সেন মহাশয়ের বয়স্য কি না জানি না। তবু সবিনয়ে বলি সাহিত্য চর্চার মত ভাষানুশীলনও সাধনার ধন।

জয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক, কালনা কলেজ

একজিমা রোগ

সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত দাগ সহ আরও অনেক কঠিন কঠিন চর্মরোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ৮০ বৎসরের চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯)। পূরবী সিনেমার পাশে।

উপহারে অনন্য
ব্যক্তিগত সংগ্রহে অবশ্য

বিমল করের
রচনা-সংগ্রহ

দুটি উপন্যাস :
অনন্দের আয়ু । জীবনঘন
চারটি গল্প :
বাঘ, শীতের মাঠ, অম্বথ, ম্যাপ
একটি নাটক : যাতক
এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত।
ঝকঝকে ছাপা। রুচিশীল মনোরম প্রচ্ছদ।
দাম : সাড়ে বারো টাকা

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন
১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯

(সি ৭১৩৪)

রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

"দেশ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের উল্লিখিত নিবন্ধটি আগ্রহ সহকারে পড়লাম। ওই আলোচ্য বিষয়টির সামান্য একজন অনুসন্ধিৎসু পূর্বসূরী হিসাবে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। ১৯৬৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবেদিতা অধ্যাপক হিসাবে আমার বক্তৃতামালার বিষয় ছিল— Nivedita as a link between Rabindranath and Vivekananda. নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থমালাতেও আমি এই বিষয়টি উত্থাপন করি।

বর্তমান প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি বক্তব্য আছে। "উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো আর সিমলের মত জায়গায় এপাড়া ওপাড়ার দূরত্বে ও বয়সের বছর দেড়েক ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের ও নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়াই স্বাভাবিক"। এই হচ্ছে লেখকের অভিমত। হয়তো তাই, কিন্তু হয়েছিল কি তার প্রমাণ কোথায়। ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা যে কিভাবে জীবনযাপন করতেন তার কথা ও কাহিনী রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে, ছেলেবেলায় ও অন্য চিঠিপত্রে পাই। তাঁরা যে কুতারাজতন্ত্র পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তেন, তা মনে হয় না। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সিমলের দত্তবাড়ির যোগাযোগ সম্বন্ধে স্বামীজীর ভ্রাতা ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের স্বামীজী সম্বন্ধে পুস্তকে পড়ি "My mother even in her elderly age used to recite a couplet written by one of the Tagore family.

ধরাতে যথা মরতে বাঁর সোম আর রবি
সেই দেবনিকেতনে বাস করে কবি

এই থেকে এইটুকু প্রমাণিত হয় যে, দত্তবাড়ির ছেলেরা ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল।

লেখক সর্বজনমান্যা হেমলতা দেবীর স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃতি করেছেন "সন্ন্যাস-ধর্ম নেওয়ার আগে তিনি (বিবেকানন্দ) প্রায়ই আমার স্বামীর কাছে আসতেন (অর্থাৎ সহপাঠী দ্বিপদ ঠাকুরের কাছে), কিন্তু পরে দেখা সাক্ষাৎ হতো মধ্যে মধ্যে।" ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন ও প্রথমে প্রেসি ডেন্সী কলেজ ও পরে জেনারেল এসেম্বলী ইনস্টিটিউশানে এফ এ ও বি এ পড়েন। তখন তাঁর বয়স ১৬-১৭। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষেই ছিলেন না। ১৮৭৮ সালের গোড়া হইতেই প্রথমে তিনি বম্বে (আহমেদাবাদ) ও পরে বিলাতে যান (সেপ্টেম্বর ১৮৭৮)। ১৮৮০ সালের পূর্বে তিনি ফেরেননি। অতএব ওই সময়ের মধ্যে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর আলাপ বা পরিচয় হওয়া সম্ভব নয়। পূর্বে বা পরে হতে পারে, হয়েওছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপর বিবেকানন্দের বা বিবেকানন্দের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিল একথা বলা যায় না। তবে বহু দিন পরে নিবেদিতা কর্তৃক আয়োজিত এক চা-পান সভায় দু-জনে মিলিত হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের উপর দু'জনেরই অনুরাগ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আদি ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত এবং বিবেকানন্দের আনুগত্য ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি। এই সময়ে গানের আসরে তাঁরা মিলিত হয়েছেন, এ-কথা ঠিক। কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহের গানের আসরে রবীন্দ্ররচিত গান গীত হয়েছিল। উপাসনা সভায় সংগীতবাহিনী lead করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং ওই choir-এ বিবেকানন্দ একজন সুযোগ্য অংশীদার ছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতি-মোহন সেন বলেছেন যে, প্রথম রবীন্দ্র-সংগীত তিনি শোনেন কাশীতে বিবেকানন্দের কণ্ঠে। "সখী আমার দুয়ারে কেন আসিল নিশিভোরে যোগী ভিখারী"। আজ আমাদের কল্পনা করতে মন রোমাঞ্চিত হয় যে রবীন্দ্রনাথের গান গাইছেন বিবেকানন্দ আর শুনছেন পরমহংসদেব অর্ধসমাহিত হয়ে—"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব-তারা" (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)। তরুণ বয়সেই সুরকার, গীতকার ও কবি বলে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধি।

বিবেকানন্দ জীবনের ১৮৮০ থেকে ১৮৮৬ সাল হচ্ছে তাঁর ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রায় পশ্চাদপসরণ ও দক্ষিণেশ্বরে পরম-হংসদেবের আশ্রয় গ্রহণের কাল। তাঁরই সতীর্থ ও বন্ধু সর্বজনপূজ্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের লেখায় পড়ি যে তাঁর দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত ও পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ ব্রাহ্মসমাজের (শুধু সাধারণ বা নববিধান নয়) অনেকেই খুব ভালো চোখে দেখেননি। তিনি লিখছেন—
High, ardent, pure কিন্তু unconventional, Bohemian—caught in the meshes of supernatural mysticism—(An early stage in Vivekananda's mental development Modern Review 1912) অবশ্য ১৯৩৭ সালে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীতে এই কথাগুলি স্মরণ করে তিনি বলেছিলেন যে, তখন তিনি তাঁকে বুঝতে পারেননি।

হেমলতা দেবীর স্মৃতিকথার উল্লেখ করে লেখক বলছেন যে, বিবেকানন্দ আসছেন মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে এবং "মহর্ষির সঙ্গে এই আলাপ-আলোচনার সূত্র ধরে তাঁর কনিষ্ঠপুত্রের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ আলোচনার সম্ভাবনা যে কত প্রবল তা সহজেই বোঝা যায়।" একটি কথা মনে রাখা উচিত যে আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের খ্যাতিলাভ অনেকটা আকস্মিকভাবে সংঘটিত হওয়ায় ভারতবর্ষে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দারুণ এবং ব্রাহ্ম-সমাজে সামান্য একটু বিরুদ্ধভাবও গড়ে উঠেছিল। তবে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের পুস্তকে আমরা পড়ি (পৃঃ ৪২০)—
"When Narendranath became famous in the U.S.A., Maharshi sent a
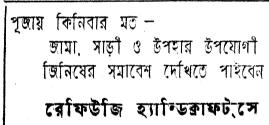
(সি ৬০৮০)

congratulatory letter to the Dutt family at Gourmohan Mukherjee Street. We were living at 7 Ramaratan Bose's Lane and it was destroyed by one of the cousins, notwithstanding the value of the letter he has destroyed in an absent minded way". আমেরিকা থেকে ফেরার পর নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মহর্ষি-সন্দর্শনে গিয়েছিলেন (The Master as I saw Him, 1913 Edn. পৃঃ ১৭০)। এ কথাও আমরা শুনি যে একদিন তাঁর ব্যাকুলতায় নরেন্দ্র গঙ্গাবক্ষে মহর্ষির বোটে ছুটে গিয়েছিলেন এবং প্রশ্ন করেছিলেন যে, তাঁর সাক্ষাৎ ঈশ্বর দর্শন হয়েছে কিনা। সদুত্তর না পাওয়াতেই তিনি হেস্টি সাহেব ও অন্যান্যদের কথা মত দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের কাছে যান—এসব ইতিহাস প্রসিদ্ধ কথা সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। স্বামী বিবেকানন্দ যে জোড়াসাঁকোয় খুব বেশী যেতেন অসতেন তা মনে হয় না, অন্তত তার লিখিত কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া পরমহংসদেবের মহাপ্রয়াণের পরে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের (১৮৮৬-১৮৯২) উদ্ভব, তিনি কলকাতাতেই থাকতেন না, তার অব্যবহিত পরেই তিনি আমেরিকা গেলেন, এবং ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি যুগ প্রবর্তক ঋষি। নিবেদিতাকে নিয়ে মহর্ষিদেবের সঙ্গে দেখা ১৮৯৮ সালে। রবীন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোয় থাকতেন না এবং সেইদিন ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাছাড়া রবীন্দ্রমানসে ১৮৯০-১৯০২ এক বিশিষ্ট ঋতু পরিবর্তনের যুগ। উপনিষদের বাণীতে তপোবনের আদর্শে প্রকৃত ব্রাহ্মণকে তিনি খুঁজেছেন, সন্ন্যাসী সমাজের পরিকল্পনা বর্জন করেছেন কিন্তু মঠাশ্রয়ী শিক্ষাদীক্ষা জীবনকে শুষ্ক, রিক্ত করে এই তাঁর ধারণা। বৈরাগ্যসাধনে মুক্তিতে তাঁর বিশ্বাস নেই—।

বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক কোন পর্যায়ে পড়ে তার আলোচনা করলে দেখা যাবে যে কবি নীরস জ্ঞানমার্গ বা ত্যাগমার্গের পথিক নন—যা দেখেছি যা শুনেছি তুলনা তার নাই—তিনি বিচিত্রের দূত, রূপের মধ্যে অপরূপকে খোঁজেন, তিনি রসিকরঞ্জন সভার সভাপতি, সগুণ ব্রহ্মের উপাসক—রূপ থেকে রূপান্তরে তার গতি—জল পড়ে, পাতা নড়ে, বিস্ময়ে তাঁর প্রাণ জাগে, গান সাড়া দেয়—আকাশে দ্যুলোকে ভূলোকে এই প্রাণকেই তিনি দেখেছেন—জীবনদেবতার উপাসক।

প্রশ্ন উঠেছে রবীন্দ্রনাথ কি নিবেদিতার কাছে স্বামীজীর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলেন। নিবেদিতার কাছে হয়তো নয়, কিন্তু স্বামীজী সম্বন্ধে তিনি উৎসুক ছিলেন তার উক্তি ও ভাষণগুলি স্বল্প হলেও স্পষ্ট, গভীর ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক। আমরা জানি যে, ১৯০২ সালের জুলাই মাসে নিবেদিতার অনুরোধে বিবেকানন্দ শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন (ভবানীপুর Excelsior club-এ অনুষ্ঠিত, এর বিবরণ পাওয়া যায় সেকালের Bengalee পত্রিকায়) বেলুড় মঠেও তিনি একবার যান। পিয়ারসনকে লিখিত কবির চিঠি থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' লেখার মূলে ছিল নিবেদিতার অনুরোধ। এই পুস্তকে নিবেদিতার মাধ্যমে কবির অবচেতনে শিল্পীর রসায়নে বিবেকানন্দের ভাবমূর্তি গোরার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে কিনা সেটা বিবেচ্য। সে "Resurgent nationalism -এর প্রতীক সর্বাঙ্গীন নর-দেবতার (Man-Gods) -এর স্মরণ। যে দুটি উদ্ধৃত লেখক দিয়েছেন তা ছাড়াও ১৩৩৫ সালে প্রবাসীতে প্রকাশিত অমিয় চক্রবর্তী ও ডাক্তার সরসীলাল সরকারের পত্রালাপের মুখবন্ধে কবি বলেন—আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন তাটি কোন আচারগত নয়, তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের মধ্যে আছে ব্রহ্মের শক্তি—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান—এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেছে......বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়। If you want to know India study Vivekananda রোমাঁ রোলাঁকেও তিনি বলেছেন— So far as I can make out,

মুস্তাথ আলির

ক্রিকেটার মুস্তাথ আলির স্মরণীয় ক্রিকেট-জীবনের রোমাঞ্চকর ইতিহাস এই বই বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত ক্রীড়াসাংবাদিক অজয় বসু।

ক্রিকেট খেলি আনন্দে

দাম। ৯·০০

অজয় বসুর

ফুটবল - ক্রিকেটের আইনের বই একসঙ্গে এই প্রথম বেরুল।

ফুটবল ক্রিকেটের আইন

দাম। ৫·০০

ফুটবল শিখতে হলে

প্রকাশিত হল। দাম। ৫·০০

বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল কোচদের লেখা

ফুটবল কোচিংয়ের আধুনিকতম বই। সম্পাদনা করেছেন ক্রীড়াসাংবাদিক শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থপ্রকাশ ঃ C/o. বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলি—১২

রেক্স বেকিং পাউডারে তৈরী

হাল্কা, মুখরোচক কেক সবসময়েই সবাই খুব তৃপ্তি করে খান।"

বলেন, শ্রীমতী সুলোচনা রাও 'হরি নিবাস' ১৫, মারডপল্লী, সেকেন্দ্রাবাদ, অন্ধ্র প্রদেশ

বেকিং পাউডার
দিয়ে তৈরী

রেক্স বেকিং পাউডার আপনার কেক, বিস্কুট, পাকোড়া, পুরি আর গোলাপজামকে বেশ টুসটুসে হাল্কা ক'রে তুলবে। অল্প একটুতেই দিব্যি কাজ হবে।
রেক্স বেকিং পাউডার সবচেয়ে সেরা, কেননা, সেরা জেরা উপাদানে তৈরী এবং অতিযত্নে প্রস্তুত।

উপকরণ :

২ কাপ ময়দা
৩ চা-চামচ ভর্তি রেক্স বেকিং পাউডার
১ কাপ চিনি
½ কাপ মাখন
১ কাপ দুধ
৪ বড় চামচ ভর্তি কোকো
½ চা-চামচ লবণ
১ চা-চামচ ভ্যানিলা এসেন্স
½ কাপ নারিকেলের কুচি
½ কাপ মিহি করে কাটা আখরোট

১. ময়দা লবণ আর রেক্স বেকিং পাউডার একসঙ্গে চেলে নিন। মাখন আর চিনি একসঙ্গে ভালভাবে ফেটান। অল্প একটু গরম দুধে কোকোটা মেশান এবং ফেটানো মাখন আর চিনির সঙ্গে যোগ করুন। ভাল করে ফেটিয়ে নিন।

২. নারকেলের কুঁচিগুলো এক চায়ের-চামচ দিয়ে ভেজে নিন—যতক্ষণ না সোনালী-বাদামী রঙ ধরছে। নারকেল এরপর, ওপরে বর্ণিত কর্নফ্লাওয়ার, বেকিং পাউডার, ফেটানো মাখন ইত্যাদির মিশ্রণের সঙ্গে মেশান। এরপর ভালভাবে সবটা ফেটান।

৩. ½ কাপ মিহি করে কাটা আখরোট আর ভ্যানিলা এসেন্স যোগ করুন। ভাল ক'রে মেশান। তারপর, তেল-মাখানো ছোট ছোট ছাঁচে ঢেলে নিন। বাকি আখরোট ওপরে ছড়িয়ে দিন। এরপর—ওভনে ১২-১৫ মিনিট রাখুন।

CBM—1040 BEN

বিনামূল্যে : পাকপ্রণালী বই নং ৫ বিনামূল্যে এক কপির জন্য এখানে লিখুন :

পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট
কর্ন প্রডাক্টস্ কোম্পানী
(ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
শ্রী নিবাস হাউস, এইচ সোমানি মার্গ, বোম্বাই ৪০০০০১

খাসা জিনিষে খাসা হয় যে খাবার রান্না আপনার তাইত সেরা সবার

Vivekananda's idea was that we must accept the facts of life—we must rise higher in our spiritual experience in the domain where neither good nor evil exists যা দিলীপকে লিখছেন—তোমাদের কি লজ্জা করে না একটুও, জালিনওয়ালাবাগে আমরা পশুর মত মার খেয়েছি—সেই কথা এখানে হাটে-বাজারে প্রচার করতে চাও—এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই গুণ, সেই সেই সম্পদ, সেই সেই সাধনার কথাই বলি যাদের দৌলতে ভারত বড় হয়েছিল, যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাই তো তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। তিনি এদের এসে ডাক দিয়েছিলেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত বলে—কাঁদুনি গাননি আমাদের হাজার দুর্দশার কথা জানিয়ে। আমার মনে আছে নিবেদিতাকে তিনি কি ভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্যকীর্তির তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেননি—আমরা বড় আর্ত, বড় দীন হীন, বলতেন—ভারতের বড় দিকটার পানেই চোখ তুলে তাকাও, তার বাইরের দারিদ্র্যকেই বড় করে দেখো না—আমেরিকানদের সামনে এসে তিনি মাথা উঁচু করেই বলেছিলেন ভারতের ধর্মতত্ত্বের কথা, যদি কেঁদে ভাসাতেন—দুটি ভিক্ষা দাও গো—তাহলে না পেতেন ভিক্ষা, না পেতেন সমাদর (দিলীপ রায়ের স্মৃতিচারণ)।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯

নজরুল ইসলাম

স্কুলের পড়া শেষ না করেই নজরুল ইসলাম প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঙালী পল্টনে যোগদান করে ১৯১৭ সালে মেসোপোটেমিয়ায় গিয়েছিলেন। সে সময় মেসোপোটেমিয়ার বাঙালী মুসলমান সৈনিকদের তদারকের জন্য একজন পাঞ্জাবী মৌলভী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর মুখে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি শুনে নজরুল মুগ্ধ হন। আর তার পর থেকেই তিনি মৌলভীর কাছে ফারসী কবিতা পড়তে শুরু করেন।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তখন 'সবুজপত্র'-এর সঙ্গে যুক্ত। নজরুল করাচি থেকে হাফেজের অনুসরণে 'আশায়' নামে একটি কবিতা পাঠালেন 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশের জন্য। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদক। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় যথাসময় সম্পাদকের কাছে কবিতাটি পেশ করলেন। কিন্তু কবিতাটি প্রমথ চৌধুরীর পছন্দ হল না। অথচ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাল লেগেছে। সেই সঙ্গে দূরপ্রবাসে পরিজনহীন এই বাঙালী যুবকটির জন্য মমতা। ছুটলেন তিনি 'প্রবাসী' অফিসে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় শুনে বললেন, নিশ্চয়ই ছাপাব। ১৩২৬ সালের পৌষ সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হল।

আশায়
(হাফেজ)

নাই বা পেলে নাগাল,
শুধু সৌরভেরই আশে
অবুঝ সবুজ দূর্ব্বা (দূর্বা) যেমন
যুঁই কুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে—তেমনি বিভোর
থাকরে প্রিয়ার আশায়,
তার অলকের একটু সুবাস
পশবে তোরও নাসায়।
বরষ শেষে একটি বারও
প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবে রে তোরও প্রাণে
অমনি অবুঝ হরষ।

(হাবিলদার) কাজী নজরুল ইসলাম।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নজরুলকে সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন। সম্মতি না নিয়ে কবিতাটি 'প্রবাসী'তে ছাপিয়েছেন সেজন্য কবির যদি বা কোন ক্ষোভ থাকে তার দায়িত্ব আগেই স্বীকার করে নিলেন।

আর তার জবাবে নজরুল উচ্ছ্বসিত ভাবে লিখলেন, "'প্রবাসী'তে পরিত্যক্ত 'সবুজপত্র'-এ পাঠানো কবিতা, এতে কবির মর্যাদা বেড়েছে কি কমেছে, তা আমি ভাবতে পারছি না। 'সবুজপত্র'-এর নিজস্ব আভিজাত্য থাকলেও 'প্রবাসী'র মর্যাদা একটুকুও কম নয়। প্রচার আরও বেশী। তা ছাড়া, আমি কবিতা লিখেছি, পারসিক কবি হাফেজের মধ্যে বাঙলার সবুজ দূর্বা ও জুঁই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চূর্ণ কুন্তলের যে মৃদু গন্ধের সন্ধান আমি পেয়েছি, সে সবই তো খাঁটি বাঙলার কথা, বাঙালী জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আনন্দরসের পরিপূর্ণ সমারোহ। কত শত বছর আগের পারস্যের কবি, আর কোথায় আজকের সদ্য শিশির ভেজা সবুজ বাঙলা। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ পরিবেশে মৃত্যুসমারোহের মধ্যে বসে এই যে চিরন্তন প্রেমিক-মনের সমভাব আমি চাক্ষুষ করলাম, আমার ভাষায়, আমার আপনার জন বাঙালীকে সেই কথা জানাবার আকুল আগ্রহই এই এক টুকরো কবিতা হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। জানি না, জুঁই ফুলের মৃদু গন্ধ, ও দূর্বার শ্যামলতা এর মধ্যে ফুটেছে কি না। তবু বাঙালীর সচেতন মনে মানুষের ভাবজীবনের এই

FRENCH
ডাক দ্বারা বিনামূল্যে শিখুন। শিক্ষান্তে Certificate দেওয়া হয়। নিয়মাবলীর জন্য অবশ্য করিয়া ঠিকানা লেখা Postal খাম পাঠান।
Imperial Institutes (D.F.),
New Delhi-110005.
(১০৯২৩)

আজার নাভিতে
শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন
৫৬টি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ১৪টির/৪খানি বই-এ/সবার সব কথার সহজ অনুবাদ
প্রতি বই ২.০০/অনুবাদক—শম্ভু জয়
শ্রীঅরবিন্দ ভবন ৮ সেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৬
চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির
১১৯এ-বি/১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২
(সি ৭১৩৩)

শ্রীমতী ১২শ বর্ষ পূজা সংখ্যা ১৩৮০
৫টি উপন্যাস : জ্যোতির্বিন্দু নন্দী, সত্যেন্দ্র আচার্য, শ্রীপারাবত, আভা দেবী এবং মুস্তাফা সিরাজের চিত্তাকর্ষক রহস্য উপন্যাস।
গল্প • রম্যরচনা • প্রবন্ধ • কবিতা : সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, ফণিভূষণ আচার্য, সমীর রক্ষিত, শংকর মহারাজ, ডঃ চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, শংকরনাথ রায়চৌধুরী, উমাদাস মৈত্র, ডঃ বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রতারকাদের জীবনের চমকপ্রদ কাহিনী, ঠিকানা, ফোন এবং সম্পাদক রাজ্য।
দাম ৪.৫০ ॥ সডাক ৫.৭৫
২৯, ওয়াটার্লু স্ট্রীট, কলিকাতা—১
(সি ৬৭৯৩)

সিন্থলের প্রতিশ্রুতি...

ত্বকের সম্পূর্ণ যত্ন

সবসময়ে তাজা সুগন্ধ

সক্রিয়ভাবে দেহের দুর্গন্ধনাশ

...একমাত্র সিন্থল এই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে

একমাত্র সিন্থল সাবানেই আছে অত্যাশ্চর্য রোগবীজাণুনাশক জি-১১। জি-১১ ত্বকের রোগবীজাণু নাশ ক'রে গায়ের দুর্গন্ধ দূর করে এবং নানান ধরণের দাগ সরিয়ে দেয়। সিন্থল আপনার লাবণ্য নিখুঁতভাবে বজায় রাখে ও সারাদিন আপনাকে তরতাজা ক'রে রাখে।

Interpub/GSC/5.72R Ben

জেলার [illegible]

নদীয়া [illegible] ধারক [illegible] জেলা [illegible] পরিষদ, [illegible] ১০ টাকা।

নদীয়া [illegible] অনেকেই বাংলার অন্যান্য জেলাগুলির চেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই মাটিতে বসেই রাজা-রাজড়ারা যেমন ক্ষমতার খেলা খেলেছিলেন তেমনি জেলা নিজেও আয়তনের দিক থেকে সংকুচিত হয়েছে। ১৭৭২ সালে রেনেলের ম্যাপে জেলার যে সুবৃহৎ বিস্তার ছিল এখন তা কমতে কমতে বর্তমানের চেহারা নিয়েছে—আয়তন ১৫১৪ বর্গ মাইল। এই জেলারই অংশ থেকে খণ্ড খণ্ড নিয়ে যোগ করা হয়েছে ২৪ পরগনায়, হুগলীতে, যশোহর মুর্শিদাবাদ ও-বর্ধমানে। শেষ আঘাত এসেছে দেশ-ভাগের সময়—জেলার বৃহত্তর অংশ চলে গেছে পূর্বপাকিস্তানে—অধুনা বাঙলাদেশে! নদীয়ার অর্থনৈতিক জীবনের

উপর পরিস্থিতির চাপ সব সময়েই বর্তমান। এরই মাঝে বেঁচে আছেন প্রায় তেইশ লক্ষ মানুষ। ধর্মে, শিক্ষায়, সাহিত্য চর্চায় শিল্পে ক্রীড়ায় এই বিভিন্ন বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যেও নদীয়া তার স্বাক্ষর রেখে যেতে চাইছে।

নদীয়া সম্পর্কে ভূ-তাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক কৌতূহলেরও অভাব নেই। নদীয়া হল নদীর দান। এক সময় অসংখ্য নদী অজস্র পলি ফেলে, বারেবারে গতিপথ পরিবর্তন করে নিজেদের খেয়াল খুশী মত এই জেলার ভূ-প্রকৃতি গড়ে তুলেছে। এইসব নদীর অধিকাংশই এখন মজে গেছে, পড়ে আছে ভাগীরথী, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা আর ইছামতী। নদীয়ার নদীদের বিচিত্র খেয়াল খেলা থেকেই শুরু হয়েছিল নদীগবেষণা। ১৮৬০ সালে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞরা রাজ-মহলের কাছে নদী-বাঁধ নির্মাণের কথা বলেছিলেন, ১৯৭১ সালে ফারাক্কায় সেই বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এখন দেখতে বাকি কবে ভাগীরথীর শীর্ণকায়াতে আবার যৌবনের জোয়ার আসে। নদীয়ার মজা নদী সব কূলে কূলে ফেঁপে উঠে। নদীয়ার মাটিতে তাই পলি। অন্যদিকে পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে কালীগঞ্জ ও তেহট্ট থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে, ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মাঝখানে ছড়িয়ে আছে কালো মাটির আঁচল যার নাম, কালান্তর। ভৌগোলিক কৌতূহলের মধ্যে, কর্কটক্রান্তি রেখা এই জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করে পূর্বদিকে মাজদিয়ার সামান্য উত্তর দিয়ে পশ্চিমে বাহাদুরপুরের উপর দিয়ে চলে গেছে। এই ঘটনার ফলে নদীয়ার আবহাওয়া চরম হয়ে উঠেছে, গ্রীষ্মে যেমন গরম শীতে তেমনি হিম-ঠান্ডা।

বিস্মৃত অতীতে কিম্বা হালফিল নদীয়ার মাটিতে যে সমস্ত চরিত্র নানা কারণে স্মরণীয় হয়েছেন তাঁদের কথাও জানতে ইচ্ছে করে। এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে, জেলাপরিচিতি থেকে শুরু করে, অর্থনৈতিক অবস্থা, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা জীবনের সঙ্গে জড়িত সব কিছু আলোচনার পাশাপাশি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি [illegible] ঐতিহাসিক, তবে [illegible] এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তালিকায় আছেন—[illegible]কুমার মৈত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম (সাহিত্য জীবনের শুরু কৃষ্ণনগরে এবং প্রতিষ্ঠাও এই একই অঞ্চলে থেকে), কুমুদনাথ মল্লিক, কৃত্তিবাস ওঝা, জগদানন্দ রায়, জলধর সেন, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দীনবন্ধু মিত্র, দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রমথ চৌধুরী (সাহিত্য জীবন কৃষ্ণনগরের সঙ্গে জড়িত), ভারতচন্দ্র রায়, মনোমোহন ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, রাজশেখর বসু, রামতনু লাহিড়ী, সুরেশচন্দ্র মজুমদার। একটি জেলা থেকে অতগুলি সু-সন্তানের অভ্যুদয় মাটির গুণ ছাড়া আর কি বলা যায়! বৈষ্ণব-কবি তাই গেয়েছেন—নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি। যাহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।

এই গ্রন্থে, নদীয়ার ঘটনাবহুল, বর্ণাঢ্য একটি চিত্র স্বল্প-পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা

(সি ৭২৪৮)

কম দামে শ্রেষ্ঠ বই

১। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে নারী প্রগতি

ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশিষ্ট বই ১৪ টাঃ, রিবেট ৪ টাঃ

৩২টি প্রধান দেশের নারীর সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক এবং চারিত্রিক বিষয়ে (প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত) "এত তথ্য সম্বলিত বই বাংলাসাহিত্যে আর নেই।" —বসুমতী

"প্রামাণ্য পুস্তক হিসাবে ইহা খুব সমাদৃত হইবে।" —দেশ

অন্যান্য সকল পত্রপত্রিকারও ঐরূপ মত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বহু কপি ঐ বই কিনেছেন।

২। The effects of International Re-alignments

K. C. Banerjee Rs. 3.50

Hailed all over the world as "a thoughtful and fascinating book", "a book of international interest", "an important and valuable book, etc." by great Statesmen and the Press: H. Humphrey, McGovern, Golda Meir, Dan Bawly, Hiren Mukherjee (M.P.) and others.

K. C. Banerjee & Co.
192 D, Bidhan Sarani, Calcutta-6

(সি ৪৯৩৪)

অবশ্যই অভিনন্দন যোগ্য। আধুনিক জীবন, তার গতি-প্রগতি এবং অভাব অভিযোগও অনুপস্থিত নয়। পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, পরিপাটি বাঁধাই সবই প্রশংসনীয়। কিন্তু কোথায় যেন প্রচ্ছন্নভাবে একটা প্রচার-প্রচার গন্ধ, কিছুতেই চাপা পড়ছে না। কোন কোন পরিচ্ছেদ বেশ খেটে লেখা, তথ্য-বহুল সুন্দর। কোন কোন বিভাগ নিতান্তই দায়সারা রিপোর্টের মত যেন ফাইলের নোট। কোথাও বিশেষণ আর অলঙ্কারের ছড়াছড়ি কেমন যেন বেমানান, ছেলে মানুষী। উদাহরণ স্বরূপ—'মাতৃজঠর গঙ্গার মতোই নদীয়ার বিদ্যাচর্চার গতি দুর্বার, বিচিত্র এবং উর্বর। 'কাল বৈশাখী। ঈশান কোণে ঘন মেঘ। কানে ভেসে এল —ঐ যে মৈশুরমরম্ বনভুবং। মেঘ কেটে আলো ফুটল। দেখা গেল নবদ্বীপের সিংহাসনে উপবিষ্ট শালপ্রাংশুভুজ সমন্বিত অনিন্দ্যকান্তি নৃপতি...নর্তকীর নূপুর কিংকিনী শিঞ্জিত হ'ল' ইত্যাদি। শব্দের এই ঢক্কানিনাদ সব মাটি করে দিয়েছে।

নদীয়াকাহিনী, 'গেজেটিয়ার', 'সেন-সাস হ্যান্ডবুক' প্রভৃতির পাশে নদীয়ার এই শোভন সংস্করণ একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সকলের কাজে লাগবে। অন্যান্য জেলা থেকেও এই ধরনের তথ্য পুস্তক প্রকাশিত হওয়া উচিত।

'ভুল করিবেন না'

চর্মের সাদা দাগ মাত্রই কঠিন নহে। বিশেষতঃ অল্প বয়সের ছেলেমেয়ে-দের। এ বিষয়ে ৩৩ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

এ, বি, দাস, বি, এস-সি
কেমিস্ট—আয়ুর্বেদশাস্ত্রী (রেজিঃ)
১৯/২, দেবীনিবাস রোড, কলিকাতা-২৮

(সি ৭২১৬)

KEDAR GHOSH
FREEDOM OR FRAUD OF THE PRESS

'Freedom or Fraud of the Press' is a tournament of reason.
Kedar Ghosh was awarded 'Padmashri' by the President of India for championing the cause of honest and bold journalism. He retired from The Statesman as Deputy Editor (News). [12.00]

BENEDETTO CROCE
AESTHETIC
As science of expression and general linguistic.
Translated from the ITALIAN
By
DOUGLAS AINSLIE

'Croce's masterpiece —The Spectator

Rs. 45.00

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700012
Also at
Allahabad : Bombay : Delhi

সুভাষ জীবনী

A Beacon Across Asia : a biography *of Subhas Chandra Bose, Edited by Sisir K. Bose and others.* Orient Longman Ltd., New Delhi. Rs. 40.

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নেতাজীর আবির্ভাব এক যুগান্তসূচক জ্যোতিষ্কের উদয়ের মত। পরাধীনতার জ্বালার যে দারুণ দাবদাহ বুকে নিয়ে তিনি আবির্ভূত হন, সমস্ত স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা তার উত্তাপে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়। সাধারণ কর্মীরূপে ও বিশিষ্ট নায়করূপে যে-কোন সূত্রে যখনই তিনি যে প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্যে এসেছেন—সেই দুঃসহ উত্তাপ তাঁকে বিরাম লাভের অণুমাত্র অবকাশ দেয়নি।

সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের জাতীয় দেহে পেশী যোজনা করেছেন। দাসত্বের প্রভাবে জাতি প্রায় ভুলতে বসেছিল তার শক্তিকে। বিস্মৃত জাতির দেহে মনে তিনি যে শক্তির সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন তারই ফলস্বরূপ আমরা পেলাম আজাদ হিন্দ ফৌজকে। এই ফৌজের মাধ্যমেই সুভাষচন্দ্রের জীবনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ পূর্ণভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ভারতবর্ষের বাইরে অপরিচিত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে নেতাজী কেমন করে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে সত্যকার জাতীয় বাহিনী গঠন করেছিলেন তা জগতের বিস্ময়।

বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঐক্য স্থাপনই ছিল সুভাষচন্দ্রের জীবনের লক্ষ্য। ঐক্য-সাধনার ফলেই সুভাষচন্দ্র নেতাজী। সুভাষচন্দ্রের জন্ম থেকে বিমান-দুর্ঘটনার কাহিনী সমস্তটাই বর্তমান গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন ও কর্মকে কেন্দ্র করে এ-যাবত অনেক গ্রন্থই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে। সংখ্যায় যতই হউক না কেন, সত্য তথ্য-নির্ভর জীবনীর সংখ্যা খুবই কম। বিশেষ করে ইউরোপীয় ভাষায় নেতাজীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ভূমিকাকে বিকৃতভাবে পাঠকসমাজের কাছে বারবার উপস্থিত করা হয়েছে। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কালেও হয়তো কোন কোন বৈদেশিক শক্তির স্বার্থেই এই প্রতিবাদহীন অপপ্রচার চলে এসেছে। এই অপপ্রচারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পাঠক, গবেষক ও ঐতিহাসিকরাও যাতে অতীতের মত নেতাজী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন সেই উদ্দেশ্যেই এই জীবনী রচিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী বা জওহরলাল নেহরুর চেয়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সুভাষের অবদান কম নয়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর লাস্ট ইয়ার্স অব বৃটিশ ইন্ডিয়া গ্রন্থে লিখেছেন "Only one outstanding personality took a different and violent path, and, in a sense, India owes more to him than to any other man...."

ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শক্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য সুভাষচন্দ্রের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের প্রতি অনেকে ইঙ্গিত করেছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামীকে বৈদেশিক সাহায্য নিতে হয়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। ইতালির মুক্তির জন্য গ্যারিবাল্ডি অস্ট্রিয়া থেকে চীনের মুক্তির জন্য সান ইয়াৎ সেন জাপান থেকে, আয়র্লন্ডের মুক্তির জন্য ডি-ভ্যালেরা বিদেশ থেকে আমেরিকার সাহায্যে সংগ্রাম চালিয়েছেন। পৃথিবীর মানুষ এই বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করাকে যদি দূষণীয় মনে না করেন তবে ব্রিটিশ শক্তির বিরোধীপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করে দেশকে মুক্ত করার চেষ্টাই বা দূষণীয় হবে কেন? ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ করেছে যে সুভাষচন্দ্র "....did not act of opportunism. The assumption is also justified that he viewed the Nazi ideology sceptically and was no stooge of Hitler or Mussolini. Bose believed in functioning in accordance with political realism."—Tiger and Schakal by Reimund Schnabel.

আশার কথা এই যে, নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র বসুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে দেশ-বিদেশের মানুষের ধারণা পাল্টাতে শুরু করেছে। আলোচ্য জীবনীটি জার্মান, জাপানী ও ভারতীয় লেখক, ঐতিহাসিক ও সুভাষচন্দ্রের সহকর্মীদের

সমবেত প্রচেষ্টার ফল। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় জার্মান, জাপানী ও ইংরেজী ভাষায় নেতাজীর জীবনী প্রকাশ সম্ভব হলো। বর্তমান জীবনীটিতে সুভাষচন্দ্রের জীবনের সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ছটি পরিচ্ছেদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। পরিশিষ্টে আছে কয়েকটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা ও দলিলের নকল। পরিশিষ্ট, কয়েকটি মূল্যবান ছবি ও গ্রন্থপঞ্জী নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করেছে। এই সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের জীবনের তথ্যপঞ্জী সংযোজিত হলে ভালো হতো। যৌথ প্রচেষ্টায় জীবনীটি রচিত ও সম্পাদিত হয়েছে বলেই আমাদের এই আশা।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লেখিকা হিসেবে শান্তি দাশগুপ্তার নাম একেবারেই পরিচিত নয়। নামপত্রে অবশ্য তাঁর আরও দু-তিনখানি বইয়ের নাম উল্লিখিত, কিন্তু সেগুলি চোখে পড়ে নি। এ-সত্ত্বেও তাঁর **রাতের গভীরে** (পরিবেশক : খত্তায়ন, পাঁচ টাকা) উপন্যাসটি পড়ে বেশ বিস্ময় মেশানো ভালো লাগার অনুভূতি হয়। উপন্যাসের প্রচলিত কাঠামোটি তিনি মেনে চলেন নি, অধ্যায়-বিভাগ করেন নি কোথাও, ফলে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ মেলে না। কিন্তু বিস্ময় এই কারণে যে, তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি। বরং স্বীকার করব, রুদ্ধ নিশ্বাসেই পড়ে ফেলা যায় শ্রীমতী দাশগুপ্তার এই উপন্যাসটি।

রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়—এর কারণ শুধু এই নয় যে, রাতের গভীরে রহস্য-উপন্যাস। রহস্য-উপন্যাসও রচনাগুণে কী সহজে আষাঢ়ে গল্প পরিণত হয় এর দৃষ্টান্ত বাংলাভাষায় কিছু কম নেই। আসল কথা হল, সহজ ভাষায়, গল্পের একটা টান তৈরী করা। এই টান যার লেখায় ফোটে, তার হয়, যার হয় না তার হয় না। শান্তি দাশগুপ্তা কথটা নিশ্চিত জানেন; জানেন বলেই হয়তো খুব বেশি ভণিতা করেন নি। প্রথম থেকেই গল্প তৈরীর কাজে মন দিয়েছেন, এবং মহৎ সাহিত্যকীর্তি করতে না যেয়ে সোজাসুজি একটি অপরাধমূলক গল্পের আবহাওয়ায় পাঠককে নিয়ে ফেলেছেন। রহস্য গল্পের যেটি প্রধান বিষয়—অনেকে যা মনে রাখেন না—সুতো ফেলে-ফেলে যাওয়া এবং পরে সেই সুতো ধরে জট খোলা, এই কাজটি বেশ সহজ নৈপুণ্যে করেছেন তিনি। ফলে গল্পের গোরু গাছে চড়ে নি এবং বড়ো-কিছু না হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাসটি স্বাভাবিক পাঠযোগ্যতা পেয়েছে।

রাতের গভীরের মূল সূত্রটি অবশ্য নতুন নয়। রহস্যগল্পের চিরকেলে প্রিয় ভাসু—যমজের ব্যাপার। কিন্তু নতুনত্ব অনন্য। কোনো ভুখোড় গোয়েন্দা চরিত্র নেই। অসুরের শৌর্য, দেবতার কৌশল, সারমেয়ের ঘ্রাণ ও বৃহস্পতির বুদ্ধি দিয়ে তৈরী বাঙালী গোয়েন্দাচরিত্রগুলির অধিকাংশই অতিমানুষ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ নয়। এদের বাদ দিয়েও যে-রহস্যগল্প হয় এবং কম বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না—রাতের গভীরে উপন্যাসে শ্রীমতী দাশগুপ্তা তা প্রমাণ করলেন।

*

সুনীল সরকারের প্রত্যাবর্তন (মৌসুমী প্রকাশনী, ছ টাকা) মলাটে, ছাপায়, আয়তনে আধুনিক উপন্যাসের মতো দেখতে। এমনকি পিছনের মলাটের লেখক-কৃত ভয়োক্ত উপন্যাসের 'বিষয় সম্পর্কে' আংলোকসম্পাত সমালোচন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পুরো উপন্যাসটি পড়ার পর মনে হতে পারে, বিজ্ঞাপনে শ্রীসরকারের হাত যতটা খোলে, প্রোত্তকল্পনে যতটা বন্ধ, লেখায় সেই কমতার ভগ্নাংশটুকুও থাকলে প্রত্যাবর্তন অন্তত পাঠযোগ্য হয়ে উঠতো।

আসলে, আধুনিক উপন্যাস মানেই

সমরেশ বসুর পেট-ফাটানো হাসির উপন্যাস

রামনাম কেবলম

চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে ॥ প্রকাশিত হল ॥ দাম—৬·০০

রমা সেন-এর উপন্যাস

হৃদয়ে পরবাসী

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে বাংলাদেশের পটভূমিকায় রচিত একজন মহিলা সংগীত-শিল্পীর জীবনের হাহাকারের কাহিনী এই উপন্যাসকে এক গভীর অনুভূতির মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে পাঠক-পাঠিকাদের। প্রকাশিত হল। দাম ঃ পাঁচ টাকা।

টুম্পা পাবলিকেশন্স ॥ ১৫/২এ কলেজ রো ॥ কলকাতা—৯

(৭২৭০)

(সি ৭২১৭)

বাড়ন্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের সাথী-ইনক্রিমিন*!
Incremin
syrup
বাড়ন্ত বয়েস!
বাড়ন্ত বছর কটা সবসময় আপনার
ছেলেমেয়েদের খেতে দিন ইনক্রিমিন
টনিক। ইনক্রিমিন সিরাপে রয়েছে—
উপকারী সব ভিটামিন, আয়রন
আর শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো
অ্যাসিড—স্বাস্থ্যের পক্ষে সব
অপরিহার্য দ্রব্য।
ইনক্রিমিন*
ইনক্রিমিন টনিক—বাড়ন্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্যে অতুলনীয়!
ডাক্তারদের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম Lederle সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ।
*আমেরিকার সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক
SISTAS-INC-3008A BEN

একজন অস্থির, আত্মপ্রবঞ্চিত, উদ্ধত, অবিশ্বাসী যুবকের কাহিনী—এ-কথা মনে রেখে যাঁরা উপন্যাস লিখতে চান তাঁদের দৌড় একটি বিশেষ মসজিদ পর্যন্ত গিয়ে থেমে যেতে বাধ্য। প্রেমহীনতা থেকে প্রেমের স্বর্গে উত্তরণ, অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসের বলয়ে প্রত্যাবর্তন—বড়ো সহজ অঙ্ক-মেলানো পথ। শ্রীসরকার এই পথেই পা বাড়িয়েছেন। ফলে, তাঁর কাছে বেশী কিছু, বড়ো কিছু আশা করার ছিল না। তবু লেখাও যদি সহজ, অকৃত্রিম হয় তাহলে পাঠকের সহানুভূতিটুকু অন্তত থাকে। কিন্তু সুনীল সরকারের নীল সামন্ত নামে নায়ক-চরিত্রটি প্রথম থেকেই বড় বেশী অস্থির। 'ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতির মত যুবতীরা......নিতম্ব নাচিয়ে উল্লসিত ঘুরে বেড়াচ্ছে' দেখে সে ছটফট, বইয়ের দোকানে বসে 'নানাবর্ণের কুমারী-অকুমারীর ভরাট নিতম্বের অসমতল ঢেউ গুনে-গুনে ক্রমশ জুড়িয়ে-আসা শরীরের উষ্ণতা সঞ্চয়' করে সে, ওভারব্রীজে দাঁড়ালেই 'শাড়ী ব্লাউজ মুখ বুক কিছুরই অভাব' হয় না তার—এহেন অস্থির চরিত্র সামলাতে গেলে যে-দক্ষতার দরকার শ্রীসরকারের তা ছিল না। তাই হয় নি।

*

মণি বাগচির **ভারতরত্ন ইন্দিরা** (দি বুক এম্পোরিয়ম, ছ টাকা) সম্ভবত জীবনী-গ্রন্থ। সম্ভবত বললাম এই কারণে যে, এতে ইন্দিরা গান্ধীর জীবন যতটা পাওয়া যায়, লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জীবনী এবং বাংলা-দেশের মুক্তি-যুদ্ধের অনুপুঙ্খময় বর্ণনা তার থেকে কিছু কম পাওয়া যায় না। এ-ছাড়াও এত বেশী উদ্ধৃতি, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাব্যাপী বক্তৃতার অংশ আছে (ইংরেজীও কম নেই) এবং প্রত্যেকটি এত জরুরী বলে জানিয়েছেন শ্রীবাগচি যে ঠিক খেয়াল থাকে না পড়েছি খবরের কাগজের কাটিং পড়ছি না জীবনী।

অথচ শ্রীবাগচি যে ভবিষ্যতে সার্থক জীবনীকার হবেন এ-ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং জর্জ বার্নার্ড শ করে গিয়েছেন আজ থেকে তেইশ বছর আগে। সে-সময় পার হয়ে গিয়েছে না এখনো আদৌ আসে নি তা অবশ্য এই বইটি পড়ে ঠিক বোঝা গেল না।

*

পরেশ মণ্ডলের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ **৪৪৪** (বিশ্বজ্ঞান, তিন টাকা) নামকরণ থেকেই বিষয়বস্তুর খানিকটা আভাস দেবে। তবে বর্তমান সমালোচক যে-ব্যাখ্যা করেছেন, তা সকলে নিশ্চিত মানবেন না। তাঁর মনে হয়েছে ৪৪৪ ছাপার ভুল, ১৪৪ হলে ঠিক হত। বেশী পাঠকের সস্তা ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কবিতার একাশ চুয়াল্লিশ ধারার প্রয়োগে প্রচণ্ড নতুনত্ব আছে সন্দেহ নেই।

নতুনত্ব অবশ্য ভেতরেও প্রচুর। তবে সে-নতুনত্বের নমুনা পাঠকদের কাছে তুলে ধরা সম্ভব নয়। কারণ কম্পোজিশনধর্মী ওই রচনাগুলি ছবির মতো ব্লক করে ছাপা। যে-গুলি অক্ষরে মুদ্রিত তাও এমন অদ্ভুতভাবে বিন্যস্ত যে অনাড়ম্বর উদ্ধৃত করলে কবিতার সমূহ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তা সত্ত্বেও একেবারে শেষ দিকের একটি কবিতা ('জিরো আওয়ারের কবিতা') পুরো তুলে দেওয়া হল, পরেশ মণ্ডলের সাম্প্রতিক মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে: কিচ/কিচ/চিক/চিক/পিক / পিক / কিক / কিক / কিচ। কিচ। চিক / চিক / পিক / পিক। শ্রীমণ্ডল এর পরের গ্রন্থে কী লেখেন দেখবার ঔৎসুক্য রইল।

পত্রিকা

শস্য। সম্পাদক : উৎপল চক্রবর্তী। গভর্নমেন্ট হাউসিং এস্টেট, ৬৭ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য দেড় টাকা।

'বঙ্গ সংস্কৃতি বিষয়ক সাহিত্য সংকলন' বলে প্রচারিত হলেও আলোচ্য তৃতীয় সংকলনটিতে কবিতারই প্রাধান্য দেখা যায়। সংস্কৃতির অন্য বিভাগে এক ধরনের আধুনিক বাংলা গান আখ্যায় যে কাব্যসঙ্গীতের প্রচলন দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, রাজেশ্বর মিত্র, অমিতাভ চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, অনল চট্টোপাধ্যায় ও নিখিল চক্রবর্তী। সঙ্গীত এবং কাব্য রসিক—উভয়েই প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিপিবদ্ধ এই আলোচনা পড়ে লাভবান হবেন। এই সম্পর্কিত ক্রোড়পত্রের প্রস্তাবনায় উৎপল চক্রবর্তী, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ ইন্দ্র ও অজয় নাগ আধুনিক ও লোক সংগীত বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ ও আনন্দ মেলা ১৩৮০, (১৯৭৩)
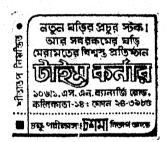
শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ ও আনন্দমেলা (১৩৮০) মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। রেজিস্ট্রি ডাক খরচ সহ সম্পূর্ণ মূল্য ৩১-৮-৭৩ তারিখের মধ্যে অর্ডার সহ এই অফিসে অগ্রিম জমা দিলে অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা হবে। ভি পি ডাকে অথবা আংশিক মূল্যে আমাদের কোন প্রকাশনী পাঠান হয় না। টাকা জমার সর্বশেষ তারিখ ৩১শে আগস্ট, ১৯৭৩।

রেজিস্ট্রী ডাক খরচ সহ—

	ভারতে	বিদেশে জাহাজ ডাকে	বিদেশে আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে
আনন্দবাজার পত্রিকা	... ৯·২০ টাকা	১০·৬৫ টাকা	২৬·০০ টাকা
দেশ	... ৯·২০ টাকা	১০·৬৫ টাকা	২৬·০০ টাকা
আনন্দমেলা	... ৫·২০ টাকা	৬·৬০ টাকা	১৫·০০ টাকা

সারকুলেশন ম্যানেজার
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১

৩টি টেস্ট রেকর্ড রেখে চলে গেলেন জ্যাক গ্রেগরী

একে একে নিভছে দেউটি। গত ৮ জুলাই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড় উইলফ্রেড রোডসের মৃত্যুর পর ৭ আগস্ট আর এক চৌকস খেলোয়াড় জ্যাক গ্রেগরী মারা গেলেন। মাত্র এক মাসের মধ্যে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে স্মৃতি জড়ানো দুই খেলোয়াড়ের জীবন-দীপ নিভে গেল, যাঁরা পরস্পর টেস্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং যৌবনের আলোয় উজ্জ্বল করে রেখেছেন ক্রিকেটকে।

জ্যাক গ্রেগরী রোডসের চেয়ে ১৮ বছরের ছোট ছিলেন। জন্মেছিলেন ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের ১৪ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস শহরের বনেদী ক্রিকেট পরিবারে। মৃত্যুসময়ে বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

প্রায় শতায়ু রোডসের তুলনায় গ্রেগরীর প্রতিষ্ঠা অবশ্যই কম। রোডসের মত কিংবদন্তীরও নায়ক হতে পারেন নি। হবেনই বা কি করে? রোডস যেখানে ৫৮টি টেস্ট খেলেছেন ৯ বছরে—১৯২০-২১ থেকে ১৯২৮-২৯ পর্যন্ত। তাও শেষ মরসুমে একটির বেশী টেস্ট খেলতে পারেননি হাঁটুর ব্যথার জন্য। এবং হাঁটুর ব্যথাই তাঁর আরও দক্ষতা বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবু ৫৮টি টেস্টে রোডসের ২৩২৫ রান ও ১২৭টি উইকেটের তুলনায় ২৪টি টেস্টে গ্রেগরীর ১১৪৬ রন ও ৮৫টি উইকেট বেশী কৃতিত্বেরই পরিচয় দেয়। রোডসের ব্যাটিং অ্যাভারেজ ছিল ৩০·১৯, বোলিং ২৬·৯৬। গ্রেগরীর যথাক্রমে ৩৬·৯৬ এবং ৩১·১৫।

তার চেয়েও বড় কথা, রোডস টেস্টের একটি বিশ্ব রেকর্ড (ফস্টারের সঙ্গে খেলে শেষ উইকেট জুড়ির ১৩০ রান) রেখে চলে গেছেন। পরবর্তী খেলোয়াড়দের দ্বারা ভাঙ্গার জন্য গ্রেগরী রেখে গেলেন তিনটি টেস্ট রেকর্ড। একটি দ্রুততম টেস্ট সেঞ্চুরির একটি সিরিজে ১৫টি ক্যাচ এবং তৃতীয় ফিল্ডার হিসাবে একই টেস্টে ৬টি ক্যাচ।

একটি টেস্ট খেলায় ৬টি ক্যাচ ধরায় বিশ্ব রেকর্ডের ভাগীদার অবশ্য আরও ৬ জন—শ্রুশবেরী, ডগলাস, উলি, মিচেল রিচার্ডসন এবং কাউড্রে। কিন্তু সিরিজে তো ১৫টি ক্যাচ আজ পর্যন্ত কেউই ধরতে পারেনি। সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এই বছরই আমাদের দেশে ভারত—ইংলণ্ড সিরিজে। সোলকার তিনটি টেস্টে ১২টি ক্যাচ ধরে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টির সম্ভাবনার মধ্যে এসেছিল। তখন আমরা বারবার গ্রেগরীর স্মৃতিচারণ করেছি। ভেবেছি, এতদিন পরে—অর্ধশতাব্দী পরে সোলকারই গ্রেগরীর বিশ্ব রেকর্ড ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু পারেনি।

কিন্তু দ্রুততম টেস্ট সেঞ্চুরি করার তাঁর বিশ্ব রেকর্ডটি ভাঙ্গবে কে কতদিনে, কে জানে! ১৯০২ সালের ওভাল টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ৭৫ মিনিটে সেঞ্চুরি করে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মারমুখী খেলোয়াড় জেসপ যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন, ১৯২১-২২এ জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে সে রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলেন জ্যাক গ্রেগরী মাত্র সত্তর মিনিটে শতরান করে। তারপর ৫২ বছরের মধ্যে কেউই তো তার কাছাকাছি আসতে পারেন

জ্যাক গ্রেগরী

নি এক অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো ছাড়া। ১৯৫৪-৫৫ সিরিজে কিংসটনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে বেনো সেঞ্চুরি করেছিলেন ৭৮ মিনিটে। তখনও সবার স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছিল গ্রেগরীর মারমুখী খেলার ছবি! জোহানেসবার্গের ওই টেস্টে ৮৭ মিনিটে গ্রেগরী করেছিলেন ১১৯ রান। ওই টেস্টেই ৩৫ মিনিটে ৫০ রান করায় দ্রুততম অর্ধ সেঞ্চুরি করার রেকর্ডেরও তিনি ভাগীদার হয়েছিলেন। সে রেকর্ডও আজ পর্যন্ত অটুট। প্রথম সেঞ্চুরি করেছিলেন জীবনের দ্বিতীয় টেস্টে মেলবোর্ন মাঠে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। এবং বলবার কথা, ৯ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলতে নেমে। ওই টেস্টেরই প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন ৬৯ রানে ৭টি উইকেট, প্রধানত যার ফলে ইংলণ্ডের ফলোঅন এবং ইনিংস ও ৯১ রানে পরাজয়। ওই সিরিজের শেষ টেস্টে তাঁর ৬টি ক্যাচের রেকর্ড এবং সবসুদ্ধ ১৫টি ক্যাচে সিরিজেরও রেকর্ড। পরের বছর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ওই দ্রুততম সেঞ্চুরি।

কিন্তু ক্রিকেটের ভাগ্যদেবী বোধ হয় চান নি গ্রেগরী কিংবদন্তীর নায়ক হোন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেই হাঁটুর ব্যথায় অস্থির হয়ে ওঠেন গ্রেগরী। কার্টিলেজ অপারেশন করতে হয়। পরে একটানা বেশী সময় বল করতে পারেন নি। ১৯২৮-২৯-এ ব্রিসবেনে অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান সিরিজের প্রথম টেস্টে ৪১ ওভার বল করার পর তিনি খোঁড়াতে আরম্ভ করেন। চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'আবার আমার হাঁটু গেল'। ওটিই তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট এবং ওই টেস্টই অস্ট্রেলিয়ার আর এক খেলোয়াড়ের অভিষেক, যাঁর নাম ডন ব্রাডম্যান।

পুরো নাম জ্যাক মরিসন গ্রেগরী। ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি মাথায় উঁচু, ১৪ স্টোন ওজনের দেহকাণ্ড নিয়ে ৪০ ফুট দূরে থেকে বল হাতে যখন ধেয়ে আসতেন ব্যাটসম্যান তখন বিভীষিকা দেখত। দারুণ ফাস্ট বোলার ছিলেন। যখন স্লিপে দাঁড়িয়ে ফিল্ড করতেন তখন ব্যাটসম্যানের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি হত, কখন কি হয়, কখন ব্যাট ছুঁয়ে বল গিয়ে পড়ে গ্রেগরীর বড় দুই হাতের মধ্যে। আবার বোলার ভয়ে ভয়ে বল করত কখন গ্রেগরীর শালপ্রাংশু দুই হাতের মারে বল বেরিয়ে যায় বাউণ্ডারির বাইরে। ব্যাটে ফুলঝুরি ছোটাতে পারতেন।

আগেই বলেছি, ক্রিকেটের এক বনেদী বংশে জ্যাকের জন্ম। ইংলণ্ডের গ্রেস বা পাকিস্তানের মহম্মদ ঘরোয়ানার মতই ঐতিহ্য। তবে গ্রেগরী পরিবার আরও পুরনো। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের আদিবংশও বলা যেতে পারে।

জ্যাকের বাবা কাকা জ্যাঠারা ছিলেন ৭ ভাই। তাদের মধ্যে দুজন, ডেভিড এবং এডওয়ার্ড পৃথিবীর প্রথম টেস্টে এক সঙ্গে খেলেছেন অস্ট্রেলিয়া দলে এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৮৭৬-এর প্রথম টেস্টে ডেভিড গ্রেগরীই ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। প্রথম টেস্টে বিজয়ী অধিনায়কও বটে। জ্যাকের জ্যাঠতুতো ভাই সিডনি গ্রেগরী ৫৮টি টেস্ট খেলেছেন ১৮৯০ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত। আর এক ভাই রিচার্ড গ্রেগরীও ১৯৩৬-এ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট খেলেছেন। ওই বংশের আর এক খেলোয়াড় সি গ্রেগরীও নিউ সাউথ ওয়েলসের নামী খেলোয়াড় ছিলেন। কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একদিনেই করেছিলেন ৩১৮ রান। ক্রিকেটের এক বর্ণময় পরিবার। সেই পরিবারের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সন্তান জ্যাক ক্রিকেট থেকে বিদায় নেবার পর সিডনি থেকে ২০০ মাইল দূরে নারুমার সমুদ্রতীরের নিভৃত পল্লীতে সময় কাটাতেন। বাড়িটিতে ক্রিকেটের কোন চিহ্ন ছিল না। কেউ বলতে পারত না এইটিই এক বিরাট বিদায়ী ক্রিকেটারের বিশ্রামগৃহ।

মুকুল

খেলার মাঠে

কলকাতার অভিশপ্ত ফুটবল

দীর্ঘকালের মধ্যেও কলকাতার ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরি না হবার ব্যাপারে যেমন একটা অদৃশ্য শক্তির কুপ্রভাব আছে, তেমন ফুটবল খেলায় মাঝে মাঝে গোলমাল সৃষ্টি হওয়াটাও বোধ হয় কলকাতার অদৃষ্ট-লিখন, কলকাতার ফুটবলের অভিশাপ। না হলে বছর বছর এবং প্রতি বছর থেকে থেকেই ফুটবলকে কেন্দ্র করে শহরের শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে কেন? কেন মাঠে ইটপাটকেল পড়বে? কেন তাঁবুর উপর হামলা হবে? কেনই বা সুসভ্য শ্বেত গ্যালারির দর্শকেরা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে খণ্ড যুদ্ধে মেতে উঠবেন? ক্রীড়াঙ্গণের সবুজ ঘাস কেন শান্তিপ্রিয় দর্শক ও রেফারির রক্তে লাল হবে?

অন্যদের বাদ দিয়ে ক্রীড়াসংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়ে যাঁরা গর্ব করেন, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সেই সব সদস্য ও সমর্থকদের সামনে সবিনয়ে আমি প্রশ্নগুলি রাখছি, যাঁদের আচরণে সুপার লীগের শীর্ষ খেলার পর মাঠের অন্তত শ'খানেক মানুষের দেহের রক্ত ঝরেছে নিক্ষিপ্ত ইট কাঠ সোডার বোতলের আঘাতে।

সবার সামনে অবশ্যই আমি প্রশ্নগুলি রাখছি না। কারণ দুই ক্লাবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রকৃত ক্রীড়ামোদী ও শান্তিপ্রিয় সভ্য-সমর্থকের অভাব নেই। তাঁদের সামনেই প্রশ্নগুলি রাখছি, যাঁরা গত ১৪ আগস্টের খেলার পর সাদা আসনের দুদিকে দাঁড়িয়ে পুলিসের নিষ্ক্রিয়তায় বেপরোয়াভাবে আধ ঘণ্টা ধরে মারামারির খেলায় মেতে উঠেছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা যে আচরণ করেছেন সেটা কি সভ্য সমাজের নাগরিকের আচরণ? নাকি তাঁরাই ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাব-ঐতিহ্যের ইজারাদার?

আর প্রশ্ন রাখছি, সবচেয়ে হঠকারী ও ক্ষমাহীন জঘন্য আচরণে অপরাধী মোহন-বাগানের খেলোয়াড় সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারের কাছে, খেলার শেষে যার মুষ্ট্যাঘাতে মুখের অনেকখানি রক্ত ঝরিয়ে রেফারি বিশ্বনাথ দত্তকে হাসপাতালে শয্যা নিতে হয়েছে।

সুকল্যাণ, তুমি মোহনবাগানের অধিনায়ক। পায়ে চোট থাকায় খেলতে পারছ না। ঐদিনও রিজার্ভ তালিকায় ছিলে। তুমি নামী খেলোয়াড়। তোমার চেয়ে অনেক অনেক নামী খেলোয়াড় শৌর্যে বীর্যে ক্রীড়াকুশলতায় তিলে তিলে মোহন-বাগানের ভাবমূর্তিকে মূর্ত করেছে। তুমি নিজের ক্ষতি করতে পার, কিন্তু মোহন-বাগানের ভাবমূর্তি নষ্ট করার কোন অধিকার কি তোমার আছে? একবার করেছ গত বছর ডুরাণ্ড কাপ ফাইনালের পরে রেফারি কুটিনহোর উপর আক্রমণ চালিয়ে। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল তোমার ক্লাব মোহনবাগানকে ডুরাণ্ড কমিটির কাছে দুঃখ প্রকাশ করে। তুমিও ক্লাবের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে ওই ধরনের আচরণ আর করবে না। এই কি প্রতিশ্রুতির নমুনা?

ডুরাণ্ডের ঘটনায় তুমি কি সত্যিই অনুতপ্ত হয়েছিলে? অনুশোচনা প্রকাশ করবার পর কেউ কি ঠাণ্ডা মাথায় দ্বিতীয়-বার রেফারির উপর অমন আক্রমণ চালাতে পারে? তুমি তো খেলোয়াড়-জীবনে দুবার এমন জঘন্য আচরণ করলে। ভেবে দেখ তো মোহনবাগানের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে আর কোন খেলোয়াড় এমন আচরণ করেছে কি? কলকাতার রেফারিরা তোমাকে আজীবন সাসপেন্ড করার দাবি জানিয়েছে? সুকল্যাণ, তুমি যদি কোন শাস্তি নাও পাও বিবেক কি তোমাকে শাস্তি দেবে না? এই ঘটনা কি তোমার খেলোয়াড় জীবনের কলঙ্ক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে না? কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে বেরা মাঠের খেলায় এক কুনজির সৃষ্টির নায়ক হয়ে রইলে তুমি।

স্বীকার করছি, রেফারি বিশ্বনাথ দত্তর ত্রুটি ছিল। রেষারেষির খেলার রাশ টেনে ধরে খেলা পরিচালনা করার মত তার ব্যক্তিত্ব ছিল না। কিন্তু অহেতুক ফাউল এবং রেষারেষির মাত্রা এমন পর্যায়ে চড়েছিল যে, মোহনবাগানের মোহন সিং এবং ইস্ট-বেঙ্গলের গৌতম সরকার ও সুভাষ ভৌমিককে মাঠ থেকে বের করে দিয়েও তো রেফারি খেলোয়াড়দের ঠাণ্ডা করতে পারেন নি। খেলার ১২ মিনিটে মোহনবাগানের শংকর ব্যানার্জির হাঁটু মুচড়ে যাওয়াও তো দৈব দুর্ঘটনার ফল। হাসপাতালে শায়িত বেচারা শংকরের আর খেলার সম্ভাবনায় যে শংকা দেখা দিয়েছে তার জন্যও তো রেফারিকে দায়ী করা যায় না। তবে তার দুর্বল পরিচালনায় দু পক্ষকেই ভুগতে হয়েছে। ফুটবলের কাছে নিশ্চয়ই তার কিছু ঋণ ছিল। ভালবাসার ঋণ। রক্তের মূল্যে তা হয়তো শোধ হল।

খেলার কথায় বলব, তিনজন খেলোয়াড়ের মার্চিং অর্ডারের ফলে মোহনবাগানকে ১০ জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে শেষের ৩৪ মিনিট; ইস্টবেঙ্গলকে ৯ জন নিয়ে

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সুপার লীগের খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারের মুষ্ট্যাঘাতে আহত রেফারি বিশ্বনাথ দত্তর অবস্থা

ফটো—তারাপদ ব্যানার্জি

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠেছে। তবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোলেন মোহনবাগানের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। তেমন্যা পক্ষ হিসাবেই ইস্টবেঙ্গল বিজয়ী হয়েছে সুপার লীগের সবচেয়ে ওই গুরুত্বপূর্ণ খেলায়। তাঁর গোলকিপার তরুণ বসু চমৎকার কৃতিত্বে দুই তিনটি অব্যর্থ গোল না বাঁচালে মোহনবাগানকে হয়তো বেশী গোলে হারতে হত।

মারডেকার তিক্ত অভিজ্ঞতা

সবচেয়ে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতীয় দলকে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকে দেশে ফিরে আসতে হয়েছে, দশ দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ষষ্ঠ স্থান দখল করে। ষষ্ঠ স্থান দখলের জন্য নয়। বরং বলব, যে ভারত অতীতে সর্বশেষ স্থানও পেয়েছে এবং কোনবারই বিজয়ী হতে পারেনি, এবার বাংলার খেলোয়াড় ছাড়া সেই ভারত দলের ষষ্ঠ স্থান দখল ক্রীড়ামানের দিক দিয়ে কিছুটা উন্নতিরই পরিচায়ক। দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কারণ ভিন্ন। আয়োজনকারী দেশ মালয়েশিয়ার খেলোয়াড় তথা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে নির্মম আচরণ। মাঠের খেলায়ও বটে, মাঠের বাইরেও বটে। গ্রুপ লীগে তিনটি খেলার পর ভারতের পয়েন্ট যখন সবচেয়ে বেশী এবং শীর্ষস্থান দখলের সম্ভাবনা, তখন শেষ খেলাটি পড়ল মালয়েশিয়ার সঙ্গে। ওই খেলায় ভারতকে শুধু চারটি গোল খেয়েই পরাজয় স্বীকার করতে হয়নি—পাঁচজন খেলোয়াড়ের পাও জখম হয় ভীষণভাবে। পাঁচজনকেই হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়দের প্রচণ্ড মারের ফলে।

মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়রা ওই মানুষ মারার খেলাতেই মেতে উঠেছিল যার ফলে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল ভারতের উলগানাথম, কোশলরাম, মগন সিং, বার্নার্ড ও চৌধুরীকে। শেষের তিনজনকে অবশ্য প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। হাঁটুর নীচের হাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় উলগানাথমকে এবং হাঁটু ও গোড়ালিতে প্রচণ্ড আঘাত লাগায় কোশলরামকে হাসপাতালেই রেখে দেওয়া হয়।

একটি খেলায় এক দলের পাঁচজন ভীষণভাবে আহত হল, অপর দলের খেলোয়াড়দের গায়ে পায়ে আঁচড় লাগল না এর থেকেই অনুমান করা যেতে পারে কীভাবে মালয়েশিয়া খেলেছিল। বরমার রেফারি কেয়া থিন মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়দের নাকি বার বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু খেলোয়াড়রা তাঁর নির্দেশ না মেনে মারামারিতেই মেতে উঠেছিল।

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে গ্রুপের খেলাতেও নাকি মালয়েশিয়া একইভাবে রাফ ট্যাকটিকস গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কোরীয় খেলোয়াড়দের শক্তি, তৎপরতা [illegible] [illegible] হয়ে পড়ে এবং কোরিয়ানদের [illegible] [illegible] জেতে ২—০ গোলে। [illegible] [illegible] পরিষ্কার পরিকল্পনার অভাবই [illegible] মালয়েশিয়ার রাফ ট্যাকটিকস খেলাটিকে নষ্ট করে দেয়। ভারতের বিরুদ্ধেও মালয়েশিয়া একই নীতি অবলম্বন করে, যে নীতি কোনভাবেই ফেয়ার প্লে অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন ফুটবলের আওতায় পড়ে না।

এ তো গেল খেলার কথা। মালয়েশিয়ার ফুটবল কর্তৃপক্ষের আচরণও অত্যন্ত নির্মম। আহত অতিথি খেলোয়াড়দের কেউ হাসপাতালে একবার চোখের দেখাও দেখতে যান নি, সমবেদনা প্রকাশ তো দূরের কথা। তা ছাড়া ভারতের আহত খেলোয়াড়দের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অর্থ দাবি করেছেন। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সম্পাদক জনাব জিয়াউদ্দিন যিনি ম্যানেজার হিসাবে দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন এক বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছেন, হাসপাতালের দাবির টাকা তিনি দিয়ে দিয়েছেন। এবং ওই মারামারি ও ফাউল-জনিত খেলা সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ জানাননি।

জনাব জিয়াউদ্দিনের এ আচরণ ভারতীয় মহানুভবতার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু মালয়েশিয়ার কাছ থেকে কি আমরা ওই আচরণ প্রত্যাশা করেছিলাম? মারডেকা প্রতিযোগিতা মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা উৎসবের ফুটবল প্রতিযোগিতা। ১৬ বছর আগে এই প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই ভারত প্রতি বছর মারডেকায় যোগ দিচ্ছে শুধু গতবারের ব্যতিক্রম ছাড়া। কিন্তু এবার ভারতের সঙ্গে এমন বৈরীসুলভ আচরণ কেন?

যাই হোক, এবারের ঘটনাকে আমরা ব্যতিক্রম বলেই ধরে নেব এবং সখ্যতার সম্পর্কই বজায় রাখতে চেষ্টা করব। মালয়েশিয়ার একটি দল প্রেসিডেন্ট রাজা কাপ [illegible] এফ এ শীল্ডে খেলতে আসছে। মালয়েশিয়া থেকে গতবার এসেছিল স্টেট অব সেলাঙ্গর ফুটবল ক্লাব। মারডেকার তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] ক্লাবের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে কোন রকম টিটকিরি বা অভদ্র আচরণ হলে ভারতীয় আতিথেয়তার ঐতিহ্য ক্ষুন্ন হবে।

খেলার কথায় আগেই বলেছি, কলকাতার খেলোয়াড়দের না পেয়েও ভারত দল মারডেকায় একরকম ভালই খেলেছে। মালয়েশিয়ার কাছে গ্রুপ লীগে হেরে যাবার পরও ভারতের সেমিফাইনালে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া মালয়েশিয়াকে পরাজিত করার ফলেই ভারতের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। মালয়েশিয়ার সঙ্গে সমান পয়েন্ট পেয়েও গ্রুপে তৃতীয় স্থান দখল করে [illegible] [illegible] এবং গোল [illegible] [illegible]। মালয়েশিয়া দ্বিতীয় স্থান দখল করে সেমিফাইনালে যায়। [illegible] মালয়েশিয়াই শেষ পর্যন্ত বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে সেমিফাইনালে বরমাকে ২—১ গোলে এবং ফাইনালে কোরিয়াকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে। গতবারের বিজয়ী দক্ষিণ কোরিয়াকে সেমিফাইনালে কুয়েতের কাছে ০—১ গোলে হার স্বীকার করতে হয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের খেলায় দক্ষিণ কোরিয়া বরমার কাছে হেরে গিয়ে চতুর্থ স্থান দখল করে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান নির্ণয়ের খেলায় ভারতকে টাইব্রেকারে ৫—৬ গোলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কাছে হার স্বীকার করে ষষ্ঠ স্থান দখল করতে হয়েছে খেলোয়াড়দের চোট আঘাতের ফলে। উলগানাথম, কোশলরাম খেলতে পারলে ভারত অন্তত পঞ্চম স্থান পেতে পারত। গ্রুপ ভাগের প্রাথমিক খেলায় ওই দক্ষিণ ভিয়েৎনামকেই ভারত ২—১ গোলে পরাজিত করে এ গ্রুপে স্থান পেয়েছিল। গ্রুপে তাইল্যাণ্ডকে হারিয়েছিল ২—০ গোলে এবং কাম্বোডিয়াকে ৩—০ গোলে। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে খেলা হয়েছিল গোলশূন্য এবং আগেই বলেছি গ্রুপের শেষ খেলায় ভারত ০—৪ গোলে হেরে গিয়েছিল মালয়েশিয়ার কাছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে ভারতের গোল করেছিল মগন সিং ও নিকোলাস, তাইল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দুটাই অধিনায়ক ইন্দার সিং পেনাল্টি কিক থেকে এবং কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে গোল করেছিল বার্নার্ড, মগন সিং ও উলগানাথম।

মালয়েশিয়া এবার নিয়ে নিজেদের ১৭ বারের এই প্রতিযোগিতায় পাঁচবার বিজয়ীর সম্মান পেল। এর মধ্যে একবার আছে যুগ্ম জয়ের সম্মান। এবারের প্রতিযোগিতায় জাপান, ফিলিপিনস, শ্রীলঙ্কা, হংকং এবং ইন্দোনেশিয়া যোগ দেয়নি। নতুন দেশ হিসাবে ছিল বাংলা দেশ ও কুয়েৎ। কুয়েতের রানার্সের সম্মান লাভ কৃতিত্বের কথা। ফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই তারা হেরে গেছে। গ্রুপ লীগের খেলাতেও অবশ্য মালয়েশিয়ার কাছে হেরেছিল ২—৩ গোলে। কিন্তু মালয়েশিয়াকে যাদের কাছে গ্রুপে হারতে হয়েছিল সেমিফাইনালে গতবারের বিজয়ী সেই দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে কুয়েতের ১—০ গোলে জয় উন্নত ফুটবলের পরিচয়। এবারকার প্রতিযোগিতার দশটি দলের অবস্থান:

১। মালয়েশিয়া, ২। কুয়েৎ, ৩। বরমা, ৪। দক্ষিণ কোরিয়া, ৫। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ৬। ভারত, ৭। তাইল্যাণ্ড, ৮। বাংলাদেশ, ৯। সিঙ্গাপুর ও ১০। কাম্বোডিয়া।

একলব্য

"মেঘের পরে মেঘ" (পরিচালনা : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে জহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

মস্কোর মানুষ ভারতীয় ছবির হল্লা, জেল্লা, নাচগান ভালবাসে। শাড়ি পরিহিত নারী এবং ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত পুরুষ এখনো মস্কোবাসীর কৌতূহল জাগায়। দেশী ছবি "অনুরাগ" (শক্তি সামন্তের) এবং "অনুভব" (বাসু ভট্টাচার্যের) দেখে মস্কোর সাধারণ মানুষ অভিভূত। অন্য সব ছবিও বেশ ভালোই, কিছুই খারাপ নয়: "খারাপ যদি হবে তাহলে তা কেউ পাঠাবে কেন, আর আমাদের কর্তৃপক্ষই বা তা গ্রহণ করবে কেন? ভাল না লাগলেই যে সে জিনিস খারাপ এমন তো কোনো কথা নেই।" কথা ক্রমশ কথাবার্তা বা কথোপকথনের রূপ নিল। মস্কোবাসী বললেন, "দেখুন না এই পৃথিবীতে কত জিনিস ঘটে বা আছে যা সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান বা ধারণা নেই, এখন কোন ভূমিকা ছাড়া যদি সেই সব জিনিসের সামনে হঠাৎ আমাকে উপস্থিত করা হয় তাহলে আমার দুরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এক অসাধারণ কৌতূহল, অন্য নির্ভেজাল নিলিপ্ততা, এই দুয়ের একটাও কিন্তু বাঞ্ছিত নয়, কেবল ব্যক্তিগত ভাললাগা বা খারাপ লাগার ওপর মন্তব্য করাটা বিজ্ঞানসম্মত নয়"। মস্কোবাসীর কথা শুনে দেশী বন্ধু সরল শর্মার তো চক্ষুস্থির। একজন মানুষ তার কর্তৃপক্ষের আচরণকে শ্রদ্ধা করে, নিজের জ্ঞানের বাইরে জগৎ আছে একথা সে জানে। "আমার ভাল না লাগলেই যে সে জিনিস খারাপ এমন কোনো কথা নেই" এমন কথা সে অনায়াসে বলে। সব দেখে-শুনে আমার মনে হচ্ছিল, কী করে ঠিক এই ধরনের মানসিকতা স্বদেশে আমদানী করা যায়। আমদানী রপ্তানির ব্যবসাটা পুরোপুরিই সরকার শাসিত, বিশেষ বিশেষ গুণ না থাকলে লাইসেন্স পাওয়া দুষ্কর, সুতরাং এ প্রসঙ্গ থাক।

কিছুতেই মনে পড়ছে না কথাটা কার সঙ্গে হয়েছিল, তবে এটুকু মনে আছে যার সঙ্গেই হোক, তার দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের অনেক মিল। তাদের দেশের ছবি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, মস্কোভা নদীর তীরে তীরপ্রহরী প্রাচীর হেলান দিয়ে। সেই প্রসঙ্গেই সেন্সরের কথা উঠলো, আমাদের দেশের মত তাদের দেশেও সেন্সর বোর্ড আছে, আমাদের দেশের মত তাদের দেশেও নানা রকম, সামাজিক, অসামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, বস্তুব এবং কাল্পনিক সমস্যা আছে। সে-দেশে সিনেমার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বাস্তবকে নিয়ে বস্তুবাদী ছবি করলেই সে-দেশের সেন্সরের কাল্পনিক বেড়ে যায়, প্রেক্ষাগৃহের বাইরে যা অহরহ ঘটছে প্রেক্ষাগৃহের ভেতরের পর্দায় তার ছায়া পড়লেই নাকি দেশ উচ্ছন্নে যাবে এমন কথা সে দেশের সেন্সরের কর্তারা বলে থাকেন। বললাম, "তবু তো আপনাদের ছবি বেশ বাস্তববাদী"। ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, "এসব হয়েছে এক রসিক চিত্রনির্মাতার কল্যাণে"। জিজ্ঞেস করলাম, "কি রকম?" ভদ্রলোক বললেন, "আমাদেরই সেন্সর বোর্ডের বড় কর্তাকে নিয়ে ঐ রসিক চিত্রনির্মাতা একটি বস্তুবাদী ছবি বানান। সেন্সর বোর্ডের কর্তার বয়স পঞ্চাশটি, কিন্তু সব চুল কাঁচা, অর্থাৎ কালো। তিনি একটি সুন্দরী কিশোরীর সঙ্গে প্রেম করছেন। গল্পের ক্লাইম্যাক্স হল ভদ্রলোক উত্তেজনার বশে সেদিন চুল কালো করতে ভুলে গেছেন, এবং আসল সাদা চুল নিয়েই প্রেমিকার শয়নকক্ষে, চলে এসেছেন। ভদ্রলোককে দেখে প্রেমিকা তো চিৎকার করে উঠল। কিছুতেই মানবে না সে যে, এই পক্বকেশ বৃদ্ধই আসলে সেই কৃষ্ণকেশ)। শেষ অবধি প্রেমটি যখন জমলো, তখন সে বললো, যে প্রেম করছে আসল বুড়ো নকল চুল মাথায়, যে বাস্তবকে বিশ্বাস করে না, তার সঙ্গে পেয়ার মহব্বতের খেলা খেলা যায়, তাকে বিশ্বাস করে বিয়ে করা যায় না, তাকে শ্রদ্ধা করে তার সঙ্গে ঘর করা যায় না'— এই ছবি দেখার পরেই আমাদের দেশে সেন্সর বোর্ডের মন পাল্টেছে'— বললেন বিদেশী ভদ্রলোক।

সরল শর্মা

পরলোকে শান্তি গুপ্তা

বাংলা মঞ্চের এককালের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা গত ১১ আগস্ট রাত তিনটের সময় লোকান্তরিত হয়েছেন। বেশ কিছুদিন যাবত তিনি রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বৎসর।

রঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী গুপ্তা প্রথম নজরে আসেন "অশোক" নাটকে তিষ্যরক্ষিতার

শান্তি গুপ্তা

অভিনয় করে। তারপর থেকে প্রায় শতাধিক নাটকে দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন। রঙ্গমঞ্চে শান্তি গুপ্তা ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জুটির অভিনয় এখনো অনেকের কাছেই সুখস্মৃতি। শ্রীমতী গুপ্তার নাট্যশিক্ষক ছিলেন স্বর্গত নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র। রঙ্গমঞ্চে তাঁর নিয়মিত অভিনয়ের শেষ বিশ্বরূপায় "ক্ষুধা" নাটক। তারপরে একটি সম্মিলিত অভিনয় আসরে "চরিত্রহীন" নাটকে কিরণময়ীর চরিত্রে তাঁর শেষ মঞ্চাভিনয়। বেশ কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্রেও তাঁকে অভিনয় করতে দেখা গেছে। ছবিতে তাঁর শেষ অভিনয় সত্যজিৎ রায়ের "অপরাজিত" চিত্রে।

শ্রীমতী শান্তি গুপ্তার মৃত্যু-সংবাদ পাবার পর তাঁর শ্যামপুকুরস্থ বাসভবনে মঞ্চ ও চিত্রজগতের বহু ব্যক্তি সমবেত হন। নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা করা হয়।

বি এফ জে এ-র নতুন কর্মপরিষদ

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসো-সিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় (৭ আগস্ট) ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য নতুন কর্ম পরিষদ গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়েছেন : সভাপতি—শ্রীনির্মল-কুমার ঘোষ; সম্পাদক—শ্রীদেবব্রত গুপ্ত; সহ-সভাপতি—শ্রীবাগীশ্বর ঝা ও শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়; সহ-সম্পাদক—শ্রীঅশোক মজুমদার ও শ্রীতাপস বন্দ্যোপাধ্যায়; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগোপালচন্দ্র পাল। কর্ম-সমিতির সদস্যবৃন্দ—শ্রীকালীশ মুখো-পাধ্যায়, শ্রীধরেন মল্লিক, শ্রীনির্মল ধর, শ্রীশৈলেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপশুপতি চট্টো-পাধ্যায়, শ্রী বি এল শাহ, শ্রীপ্রফুল্ল বসু, শ্রীরণধীর সাহিত্যালঙ্কার, শ্রী পি এন উপাধ্যায়, শ্রীরইসুদ্দিন ফরিদি, শ্রীঅশিস-তরু মুখোপাধ্যায়, শ্রীমৈনুদ্দিন আহম্মদ ও শ্রীঅরিজিৎ সেন।

"রক্ততিলক" (পরিচালনা : বিশ্বজিৎ) ছবিতে অলকা ও বিশ্বজিৎ ফটো—দেশ

অলীকবাবু

নব গঠিত নাট্যদল সুপার এণ্টারটেনিংস ইউনিট সম্প্রতি তাদের প্রথম নাট্যপ্রযোজনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু' অভিনয় করলেন (স্টার রঙ্গমঞ্চ, ২৪ জুলাই)। ওইদিনের অভিনয় অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল একাশী বছরের বৃদ্ধ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর (ডি জি) নামভূমিকায় অভিনয়। এই বয়সে যুবক অলীক প্রকাশের চরিত্রে অবতীর্ণ হওয়া নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক কাজ। সু-অভি-নেতার অনেক গুণ এখনো তাঁর করায়ত্ত। চতুর গাপ্পাবাজ অলীকপ্রকাশের বেশে নিজের বয়স তিনি যতখানি ঢাকতে পেরেছেন তার চাইতেও বেশি ঢেকে দিয়েছেন অভিনয়-চাতুর্যে। অবশ্য এমন আশা করা উচিত নয় যে, বৃদ্ধ ডি জি অনায়াসেই যুবকোচিত চেহারা ও চাঞ্চল্য যথাযথভাবে প্রকাশ করবেন। বয়সের ভার কখনো কখনো তাঁর কণ্ঠ স্পর্শ করেছে মাত্র, কিন্তু কাবু করতে পারেনি। তিনি স্বচ্ছন্দে গলার কাজ দেখিয়েছেন, প্রয়োজনীয় অভিব্যক্তি প্রকাশেও কোন কার্পণ্য নেই। নায়িকার আঁচল ধরে মঞ্চের ওপর পড়ে যাওয়া, লাফ দিয়ে স্থান পরিবর্তন করা এবং স্বগত উক্তির সময় দ্রুত অভিব্যক্তি বদল করার মধ্য দিয়ে নিঃসংশয়ে ডি জি-র অভিনয় দক্ষতা প্রমাণিত।

রাধামোহন ভট্টাচার্য সেজেছেন 'সত্য-সিন্ধু'। সংযত এবং বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়ে চরিত্রটি সহজেই তিনি উপভোগ্য করে তুলেছেন। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'জগদীশ-বাবু' ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর 'গদাধর' চমৎকার চরিত্রচিত্রণ। রিণা ঘোষের 'হেমাঙ্গিনী' ও সার্থক। মঞ্জুলিকা-কৃত 'প্রসন্ন' আশানুরূপ নয়।

নাট্যপরিচালনার দায়িত্বও ডি জি পালন করেছেন। কিন্তু পরিচালক হিসাবে তাঁর ততখানি প্রশংসা প্রাপ্য নয় যতখানি অভিনয়ের জন্য। প্রযোজনার ছোটখাটো অথচ জরুরী কয়েকটি দিক কেন অবহেলিত হল এ নিয়ে নাট্যনির্দেশককে সবিনয়ে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করা যায়। কেন অধিকাংশ শিল্পী প্রম্পটার-নির্ভর, কেন ঘরের আসবাবে সময়ের তথাকালের ছাপ নেই, কেন শিল্পীদের প্রবেশ-প্রস্থান নিয়মমাফিক নয় এসব প্রশ্ন কিন্তু নাটক দেখার সুখের মধ্যেও অস্বস্তির কাঁটার মতো খচখচ করতে থাকে।

—নাট্য-সমালোচক

শুকনো শুকনো বর্ষার গান

শ্রাবণ এলেই রবীন্দ্রনাথের গানগুলি আবার শিল্পীদের মুখের বচন হয়ে ওঠে। শান্তিনিকেতনে দেখেছি ছেলে-মেয়েরা একরকম মেতে উঠে গাইছে বর্ষার গান। কলকাতায় ব্যাপারটা অনেক হিসেবী। এ সময়ে ও গানের চাহিদা অনেক। সহজেই হল ভরতি হয়। হয়ত তাতেও কোন ত্রুটি হত না যদি এই শহুরে ফ্যাশন-গুলিতে গানগুলির মেজাজ বজায় থাকত। তাতে হয়ত গানের কথায় এবং সুরে শহরের মানুষ কিছুটা ঋতুবৈচিত্র্যের ইঙ্গিতগুলি সম্পর্কে সচেতন হতেন। কিন্তু বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রসংগীতের আসরে সেরকম কোন উপরি-পাওনা ঘটল না। রাস্তায় জল জমলে কিংবা ভারী বৃষ্টির দরুণ অফিস কামাই হলে কলকাতাবাসী যেমন টের পান বর্ষাকাল হাজির, অনেকটা সেরকম নিষ্ঠুরভাবেই সে আসরের শিল্পীরা শ্রোতাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্র-নাথের বেশ কিছু গান বর্ষার অর্চনায় বিরচিত।

একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল পূর্বা দামের গান। 'আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার', 'গহন রাতে পড়িছে ঝরে', 'বাদল মেঘের মাদোল' এবং 'মেঘের পরে মেঘ'—গান-গুলিতে মেজাজ দেখলাম। দৃপ্ত স্বরক্ষেপ, সংযত লয়কারী এবং সুরবিহারে সমবেদনা শ্রীমতী দামের গানে বর্ষার গানের মুডটুকু দিয়েছিল। বর্ষার গানে মুডের ওপরে আর কী আছে ?

এ প্রসঙ্গে না বললে চলে না যে, কবির বর্ষার গানে একটা চাপা, ভারী সুরের ঢং আছে। কিছুটা রাগসংগীতের পরিশীলন ব্যতীত সে ঢঙটা অধরা থেকে যায়। পূর্বা দামের গানেই সে তাৎপর্যগুলি ভাস্বর হয়।

বনানী ঘোষের গানে চিকণতা দেখেছি বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে। ওঁর 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে' গানটিই উপভোগ করলাম, কারণ তাতে শ্রাবণের উপস্থিতি গানের চলনে বোঝা গিয়েছিল। তবে শিল্পী 'নীলাঞ্জন-ছায়া' বেশ খারাপ করেই গাইলেন। এবং

তিনি 'আজি তোমারে আবার চাই শোনাবারে' না শোনালেই পারতেন।

বরং বলা চলে বর্ষার গানে অরবিন্দ বিশ্বাসের মুড সৃষ্টির কিছুটা দক্ষতা আছে যদিও ওঁর ভাল গানগুলি ঠিক এ অঞ্চলের রোমান্টিকতাকে ঘিরে নয়। অরবিন্দবাবুর 'এমন দিনে তারে বলা যায়' এবং 'তিমির অবগুণ্ঠণ' বেশ মনোগ্রাহী নিবেদন। ওঁর বাকি গানের প্রশংসা করতে পারলাম না।

সুমিত্রা রায়ের গলায় 'কে দিল আবার আঘাত' শ্রোতার ভাল লাগা উচিত ছিল। কিন্তু শিল্পীর গলা সব সময়ই সুর এবং মেজাজে স্থির থাকে না। তাই ওঁর গান ভাল লাগতে লাগতেও বেন কীরকম লেগে যায়। 'পাগলা হাওয়া' গানটি ওঁর চলনসই। 'কোথায় উধাও হল মোর প্রাণ' গানে টপ্পাঙ্গীয় কারুকার্যে ওঁর কণ্ঠের দুর্বলতা প্রকট হল।

চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের "এই শ্রাবণের বুকের ভিতর' গানটি সংযত, সুন্দর। চিত্ত আমায় হারালো' নিবেদনটি যেমন-তেমন। শ্রীমতী বাণী ঠাকুরের গানেও বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। অনুষ্ঠানের প্রথমে তিনি গেয়েছিলেন "আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে"।

তাই গান শুনে বর্ষাকালের আমোদ এখনও বিশেষ পেলাম না। তবে আশায় আছি।

—সংগীত-সমালোচক

প্রচ্ছন্ন মহিমা

শ্রীমণ্ড নাট্যসংস্থার নতুন প্রযোজনা বনফুল রচিত কাহিনী 'প্রচ্ছন্ন মহিমা'র নাট্যরূপ। নাট্যরূপদাতা ও পরিচালক গণেশ মুখোপাধ্যায়ের অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করেও প্রযোজনাটি আশানুরূপ উজ্জ্বল নয়। মূল কাহিনীর সারবস্তু নাট্য উপাদান হিসেবে প্রায় জীর্ণ, অথচ সেই জীর্ণতার গায়ে নতুন ভাবনার প্রলেপ নেই, সমস্যার মূল অনুসন্ধানের চেষ্টাও না, চমক আর নাটক সৃষ্টিতেই আগ্রহ বেশি। এক দশক কিংবা দেড় দশক আগে গল্প হিসেবে 'প্রচ্ছন্ন মহিমা'র কিছু মহিমা থাকতে পারে, সত্তর দশকে পৌঁছে নাটক হিসেবে কিন্তু তার আবেদন ও মহিমা প্রচ্ছন্নই থেকে গেল।

কাহিনীতে বলা হচ্ছে, এ যুগে কালোবাজারীরাই রাবণ। অতএব দিকে দিকে রাবণ বধের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নায়ক ব্রজ তার বস্তিবাসী দলবল নিয়ে এমনই এক রাবণকে প্রকাশ্য রাজপথে ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দিল। কাহিনী এই চরম মুহূর্তে পৌঁছুবার আগে আরো অনেক খণ্ড খণ্ড কাহিনী শুনিয়েছেন। সেই সব কাহিনীর মধ্যে দিয়ে নাটকে ব্রজ-র নানাবিধ সৎ, অসৎ কীর্তি আর সমাজব্যবস্থার গলদের

"হিন্দুস্থান কী কসম" (পরিচালনা : চেতন আনন্দ) ছবিতে প্রিয়া

কথা ব্যক্ত। কিন্তু এত করেও একটি নিটোল নাটকের স্বাদ পাওয়া গেল না। নাটকের মধ্যে বাস্তবতা এবং যুক্তিবোধের অভাব অনেক ক্ষেত্রেই মনকে পীড়িত করবে। উচ্চশিক্ষিত জীবন শিয়ালদহ স্টেশনে কুলিগিরি করে, প্রাক্তন বিপ্লবী বরেশ বিশ্বাস, এরাও যেন ঠিক বস্তুর বলে মনে হয় না। নাটকটি জীবনের স্বাদ যতটুকু দিয়েছে তার চাইতেও বেশি দিয়েছে রূপকথার আস্বাদ।

প্রযোজক দল হিসেবে শ্রীমণ্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন নাটকটিকে আকর্ষক করে তুলতে। কয়েকটি দৃশ্য অবশ্যই আকর্ষক। বিশেষ করে বস্তিতে যাত্রা আসরের দৃশ্যটি চমৎকার। নির্দেশকের প্রয়োগ-চাতুর্য এখানে সার্থক। কবি ও ব্রজ'র চিঠি পড়া, ব্রজ'র ঘটনা বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নাটকের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার ব্যাপারগুলো ভালো লেগেছে।

অভিনয়ে একই শিল্পী একাধিক চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। এ'দের মধ্যে কয়েকজনের অভিনয় ভালো লাগবার দাবি রাখে। যেমন সুজিত বসু (ব্রজ), মমতা চট্টোপাধ্যায় (অমিলা সেন ও বাড়ীউলি), সুনীলবরণ (সাঁইবাবা) ও অসীম বসু (বরেশ বিশ্বাস)। দুটি বস্তিবাসী যুবকের চরিত্রে চমৎকার অভিনয় করেছেন দেবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হেমন্ত মিত্র। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরা কাজ চালিয়ে গেছেন। অভিনয় পরিবেশিত হল রঙ্গনা মঞ্চে।

নাট্য-সমালোচক

টেপ-রেকর্ডে 'রামচরিত মানস'

ভারতবর্ষে ভক্তিবাদের বিশিষ্ট শাখা রামভক্তির ধারা উত্তর-ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়েছিল প্রধানত যেসব কাব্যের ভিতর দিয়ে, তুলসীদাসের রামচরিতমানস সেগুলির মধ্যে অন্যতম। এই কাব্যগ্রন্থের চার শত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে 'সৌরভ' সংস্থা 'রামচরিতমানসে'র একটি সাংগীতিক রূপায়ণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র গ্রন্থটি গীত হয়ে টেপ-রেকর্ডে বিধৃত হবে। 'রামচরিতমানসের 'বালকণ্ড' অবলম্বনে এই সুবিশাল কর্মের প্রথম পর্ব সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় 'সৌরভ' কর্তৃক আয়োজিত একটি আসরের উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তা বাজিয়ে শোনানো হল।

তুলসীদাসের কাব্যের কয়েকজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে 'সৌরভের' শিল্পীগোষ্ঠী এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবতীর্ণ হয়েছেন। পণ্ডিত সীতারাম চতুর্বেদীর নির্দেশক্রমে সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেছেন মাণিক্য রায় এবং নিরঞ্জা পোদ্দার। এর সংগীতাংশ পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

তুলসীদাসের রামচরিতের আখ্যানমূলক অংশটিকে বলা হয় চৌপাই। এর একটা বিশেষ সুর আছে যাতে আঞ্চলিক লোকসংগীতের প্রভাব খুব বেশি। পুরোনো ঐতিহ্যবাহী গায়নপদ্ধতির [illegible] ভিত্তি করে কে কে ভার্মার নির্দেশনায় রামচরিতমানসের চৌপাই অংশগুলি মনোজ্ঞ সুরমাধুর্যে সার্থকতা অর্জন করেছে। দোহার অংশসমূহকে বিভিন্ন রাগরাগিণীর সমাবেশে ধ্রুপদী মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন রবি কিচলু। এ ছাড়া কয়েকটি সুনির্বাচিত ভজন সার্থকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলি মর্মস্পর্শীভাবে গেয়েছেন মঞ্জরিক। কানন এবং ললিতা ঘোষ। এই সব গানের ফাঁকে ফাঁকে এবং সংগতে আবহসংগীতও বেশ সমৃদ্ধ। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মাঝে কল্যাণী রায়ের সেতার, গৌর গোস্বামীর বাঁশী আর আলি অহমেদ হোসেনের সানাই চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। বিশিষ্ট সাংগীতিক সম্পদে সমৃদ্ধ 'সৌরভে'র এই অভিনব প্রয়াস শুধু ভক্তমণ্ডলীর কাছে নয়, আশা করা যায় সংগীতরসিকদের কাছেও বিশেষ সমাদর লাভ করবে।

—আনন্দবর্ধন

অরণ্যদেব ✿ লী ফক

নীচ থেকে তীব্র শিসের শব্দ শুনে বাজগুলো অরণ্যদেবকে ফেলে দিল নীচে।
?!

গদির ওপর তিনি আছড়ে পড়লেন
উঃ!

মরুভূমির এক পাহাড়চুড়োয় আছড়ে পড়েছেন অরণ্যদেব এখনও তাঁর মাথা ঘুরছে বনবন করে ....
তোমার কাছে বন্দুক আছে দেখছি। ওগুলো ফেলে দাও।
?

এইবার উঠে দাঁড়াও ... তারপর সোজা এগিয়ে চল।
তুমি কে?!

গোলমাল না করে খাঁচায় ঢুকে পড় নইলে এক গুলিতে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।
?!
12/31

এই অদ্ভুত পোশাক পরে এই মরুভূমিতে তুমি কী করছিলে?
আমি এই বাজগুলোর মালিকের খোঁজ করছিলাম।

খোঁজ আমি পেয়েছি। এইবার বল তো, তোমার পাখিগুলো হলুদ পোশাকের মানুষদের ধরে আকাশে উড়ে যায় কেন?
তোমার বুদ্ধি আছে। কিন্তু তুমি এই অদ্ভুত মুখোশ পরেছ কেন?

আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনও পাই নি।
প্রতিশোধ। বাজগুলোকে শিক্ষা দিয়েছি একটা ঘৃণ্য বদমাসকে খুন করার জন্য।

লোকোকর্মী ধর্মঘটের অবসান এই সপ্তাহের বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয়। ১২ আগস্ট রাত্রে লোকোকর্মীদের ১৯ দিনের ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছে। খবরটি ঘোষণা করেছেন নিখিল ভারত লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীএম রক্সসভাপতি। রেলমন্ত্রী শ্রী এল এন মিশ্র ও শ্রমমন্ত্রী শ্রীরেড্ডির সংগে পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকের পর শ্রীরক্সসভাপতি এক বিবৃতিতে তাঁর সহকর্মীদের কাজে যোগ দিয়ে রেল চলাচলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে আহ্বান জানিয়েছেন। গভীর রাত পর্যন্ত রেলমন্ত্রী শ্রী এল এন মিশ্রের সংগে নিখিল ভারত লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের আলোচনা চলে। লোকোকর্মীদের কাজের সময় কমানোর প্রশ্নটাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। লোকোকর্মীদের কাজের সময় কমিয়ে আট ঘণ্টা করার দাবি নিয়ে আলোচনায় যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তারও একটা সুরাহা হয়েছে। সরকার পালটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আট ঘণ্টা নয়, কাজের সময় দশ ঘণ্টা হোক। লোকো নেতারা নাকি সরকারের এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। সারা ভারত লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন একটি অননুমোদিত সংস্থা। তাঁরা ধর্মঘটের কোন নোটিস দেননি। পি টি আই বলছেন, রানিং কর্মীদের এই ধর্মঘট গত মে মাসে লোকো ধর্মঘটকারী কিছু কর্মীর শাস্তির প্রতিবাদে এবং তাঁদের অ্যাসোসিয়েশনকে স্বীকৃতি দেবার দাবিতেই করা হয়েছে।

দেশী সংবাদ

৬ আগস্ট—নয়াদিল্লিতে একশো টাকার নোট ভাঙানোর দারুণ হিড়িক পড়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির সূত্রেও খবরটি সমর্থিত। ওদিকে বোম্বাইয়ে একশো টাকার নোট ভাঙাতে তার বেসরকারী বাটা পনর টাকা দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ একশো টাকার নোটের বদলে পাওয়া যাচ্ছে পঁচাশী টাকা।

কৃষি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীএ পি সিন্দে আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, বিভিন্ন রাজ্যের সরকার ৪৯০০টি পাইকারী বাজার খুলেছেন। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য কোন স্থানে কোন বাজার খোলেনি। ভারতের খাদ্য করপোরেশন প্রধানত এই বাজারগুলির মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে।

৭ আগস্ট—বেশী দামের নোট বাতিলের কোন প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করছেন না। কালো টাকার সমস্যা নিঃসন্দেহে বিরাট। তবে এর কোন সহজ সমাধানও আমাদের সামনে নেই। একথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী শ্রীচবন। প্রসংগক্রমে তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ক্রেতাদের প্রতিরোধ খুবই ভাল জিনিস। কিন্তু নিজের হাতে আইন নেওয়া কখনই ভাল নয়।

ভিন্ন রাজ্য থেকে হাজার হাজার দুঃস্থ লোক কলকাতা ছেয়ে ফেলছে এবং পথ পারক ফুটপাথ সর্বত্র আস্তানা গেড়ে নগরজীবন বিপন্ন করে তুলেছে। ঘটনাটা কিছুদিন ধরেই নাগরিকদের নজরে আসছিল। তবে মংগলবার কলকাতার এম এল এ-রাই ঘটনাটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তোলেন।

৮ আগস্ট—দিল্লিতে নারীদের সম্মান আজ বিপন্ন। পথের রোমিওদের লোলুপতায় সর্বসহাদের ধৈর্যের বাঁধ আজ ভেঙে গেছে। কিন্তু এঁরা প্রতিবাদে গর্জে ওঠেননি। প্রতিবাদের ভংগটুকুও তাঁদের নিজস্ব। আজকের নীরব শোভাযাত্রার হাতের প্ল্যাকার্ডে শুধু তাঁদের প্রতিবাদের বাণী। "মা-বোনের সম্মান রাখ", নারীদের অপমানের প্রতিকার চাই।

৯ আগস্ট—রাজ্য তদারকি কমিশন রাজ্যের কৃষি অধিকর্তা সম্পর্কে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ সম্বলিত এক রিপোর্ট দিয়েছেন, এবং যে ফাইলটি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় দিল্লি যাওয়ার মুখেই দেখেছেন। প্রকাশ বর্তমান অবস্থায় ওই কৃষি অধিকর্তাকে দীর্ঘদিনের ছুটিতে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার নির্দেশ দিতে এখন প্রস্তুত।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী কর্মীদের প্রায় অর্ধেকের মাসিক বেতন ১৫০ টাকারও কম। মোট কর্মী-সংখ্যা ২৬ লাখ ৯০ হাজার। আজ লোকসভায় শ্রম দফতরের উপমন্ত্রী শ্রীবি কে ভেংকটস্বামী এই তথ্য জানান।

১০ আগস্ট—কেন্দ্র রাজ্য সরকারগুলিকে যে সাহায্য দেন, তার একশ' কোটি টাকা ছাঁটাই হচ্ছে। কেন্দ্র নিজের ব্যয়ও কমাচ্ছে—৩০০ কোটি টাকা। দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাতে এই ব্যবস্থা। এই বরাদ্দ ছাঁটাই উন্নয়নের বাইরের ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ঘটবে, যোজনা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও।

পশ্চিমবঙ্গ চালের কঠিন অবস্থা কাটিয়ে উঠতে আসাম থেকে আউস ধানের ২০ হাজার টন চাল এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে ১ হাজার টন চাল পেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আসামের মুখ্যমন্ত্রীর সংগে ফোনে কথা বলে ২০ হাজার টন চাল পাওয়ার আশ্বাস পেয়েছেন।

১১ আগস্ট—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানান গত কয়েকদিন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সংগে বিভিন্ন বণিকসভার প্রতিনিধিদের বৈঠকের পর বণিকসভাগুলির সদস্যরা বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় মসুর ও মুগডাল এবং সরষের তেল "না-লাভ না-লোকসান" ভিত্তিতে বিক্রি করতে সম্মত হয়েছেন।

ফাটকাবাজদের সোনার নেশা কেটে গেছে। দু'সপ্তাহে সোনা কেনার হিড়িকে দর যেমন চড়চড় করে চড়ে গিয়েছিল, এ সপ্তাহে তেমনি হুহু করে পড়ে যাচ্ছে। বেশী দামের নোট বাতিলের প্রস্তাব সরকারের নেই, অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর থেকে ফাটকাবাজ ও জুয়েলারীকারকরা সোনা বিক্রি করতে শুরু করেছে।

১২ আগস্ট—আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যানড্যার্ড ও দেশ পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র মজুমদারের ঊনবিংশ তিরোধান দিবস উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সভাপতির ভাষণে বলেন:—মহান দেশপ্রেমিক সুরেশচন্দ্র বড় বিপ্লবী ছিলেন। মতপার্থক্য সত্ত্বেও সকলের সংগে সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ রেখে যাঁরা দেশের মুক্তি সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বিদেশী সংবাদ

৬ আগস্ট—দ্বিতীয় স্কাইল্যাবের নভশ্চররা আজ তাঁদের গবেষণা কেন্দ্রের দীর্ঘকাল মহাকাশে অবস্থানের পক্ষে বিপজ্জনক লিক খুঁজে বার করার, সূর্যকিরণ নিবারণের জন্য একটি আচ্ছাদন স্থাপনের এবং চারটি সৌর টেলিস্কোপে ফিল্ম ভরার জন্য মহাকাশে পদচারণা করেন।

৭ আগস্ট—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরের অ্যাটর্নি অফিস থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীস্পাইরো অ্যাগনিউকে জানানো হয়েছে, ঘুষ নেওয়া, জোর করে অর্থ আদায় এবং কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে তাঁরা তদন্তে নামছেন।

৮ আগস্ট—১৯৭১ সালে সারা পৃথিবীতে পথ-দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন প্রায় আড়াই লক্ষ লোক। আহত হয়েছেন ৭৫ লক্ষ। খবরটি রাষ্ট্রপুঞ্জের দিয়েছেন তারা। নিহতদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ ইয়োরোপ, ২৮ শতাংশ উত্তর আমেরিকায় আর বাকি ২৭ শতাংশ অন্যান্য অঞ্চলে।

৯ আগস্ট—মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট স্পিরো অ্যাগনিউ আজ তাঁর বিরুদ্ধে কর ফাঁকি ও উৎকোচ গ্রহণের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন এসব একেবারেই মিথ্যা, নিতান্তই গুজব। এসব অভিযোগ নিয়ে বর্তমানে ফেডারেল তদন্ত চলছে।

১০ আগস্ট—নতুন সং[illegible] অনুসারে শাসক পিপলস পার্টির [illegible] চৌধুরী ফজলে ইলাহি আজ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। এই সংবিধান ১৪ আগস্ট থেকে চালু হবে। শ্রীইলাহি তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী ন্যাপ দলের শ্রীআমির-জাদা খানকে ১৩৯—৪৫ ভোটে পরাজিত করেন।

১১ আগস্ট—বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো আগামীকাল পাক জাতীয় পরিষদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন। গত পনের বছর পাকিস্তানে কোন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। নতুন প্রেসিডেন্টের মত প্রধানমন্ত্রী পদে ভুট্টোর নির্বাচন হবে একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র।

১২ আগস্ট—১৯৭১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুংকে তিনবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই হত্যার ষড়যন্ত্রের পিছনে ছিলেন মারশাল লিন পিয়াও। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আসন্ন সম্মেলনে এ সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করা হবে।

যতই করুন
না কেন
আপনার পায়খানা
এমন ঝকঝকে
পরিষ্কার হবে না—
রাত্রে
ছিটিয়ে দিন
সামান্য
স্যানিফ্রেশ
সব বিশ্রী দাগ
উঠে যাবে
আপনার
পায়খানা
ঝকঝকে
পরিষ্কার
থাকবে—বিনা
মেহনতেই।
আপনার পরিবারের
সকলের স্বাস্থ্য
সুরক্ষিত থাকবে।
PERFUMED
Sani
Fresh
LAVATORY CLEANER
CLEANS!
DEODORISES!
DISINFECTS!
বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক
BALSARA
CHAITRA-BLS-8 BEN

সানরাইজ

হ'ল সেই মশলা-
১০০% খাঁটি-
স্বাদে গন্ধে ভরপুর

EXPORT QUALITY
SUNRISE
TURMERIC 250 Gms.
PURE POWDER SPICES
Manufactured by PRAKASH BROTHERS

শ্ধ্মাত্র স্বাদের জন্যই নয়—মশলা তৈরীর ব্যাপারে আমরা সবার আগে বিশ্দ্ধতার দিকে নজর দিই। খাঁটি কাঁচামাল কেনা হয়—আধ্নিক মেশিনে তৈরী হয় সানরাইজ মশলা—নিজস্ব ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষা করা হয়। তাইতো সানরাইজ আজ দেশের সেরা মশলা।

দোকানে খাঁটি মশলা চাইলেই ▷ সানরাইজ পাবেন।

প্রকাশ ব্রাদার্স ৭৪/এ, নলিনী শেঠ রোড, কলিকাতা-৭ ফোনঃ ৩৩-৮৩০১

Newfields P.B.12.73.

বর্ষ] শনিবার, ১৫ ভাদ্র, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 1st September, 1973 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা ৪৪

পণ্ডস
ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক
ভোরের স্নিগ্ধ পরশের আমেজে সারাদিন আপনাকে ঘিরে রাখে

শীতল জলে স্নানে যেমন সুখের শিহরণ জাগে···শিশির-ধোয়া ভোরে যেমন খুশীর পরশ লাগে···পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক মাখলে তেমনি মনে হবে ঝরঝরে মনোরম···সারাদিন, সারাক্ষণ। হালকা-সুবাস জড়ানো এই ট্যাল্‌ক ঘাম টেনে নেয় নিমেষে আর অঙ্গ সৌরভ আপনাকে ক'রে তোলে প্রিয়-সঙ্গিনী! এই ট্যাল্‌ক সারা বছর সারা শরীরে মাখা যায়।

৩ রকম সাইজে পাওয়া যায়: ফ্যামিলি, লার্জ, মিডিয়াম

পণ্ডস ফেস পাউডার
সব ফেস পাউডারের চেয়ে পণ্ডসই রূপসীদের প্রিয়।

চীজব্রো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড
(সীমিত দায়িত্বসহ ইউ.এস এ.তে সংস্থাপিত)

P-5583

॥ প্রকাশিত হ'ল ॥

তারাশঙ্কর রচনাবলী

পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড

প্রতিটির দাম ১৫.

ভূমিকা লিখেছেন : জগদীশ ভট্টাচার্য : পরিমল গোস্বামী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে। তৃতীয় ও চতুর্থ এখনও পাওয়া যাচ্ছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলীর

গ্রাহক করা হচ্ছে

নভেম্বরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবে।
১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রাহক করা হবে।

শংকরের

সামাবদ্ধ ৬. স্থানীয় সংবাদ ৬.

*

বিমল মিত্রের

আসামী হাজির

॥ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ—ত্রিশ টাকা ॥

*

যাযাবরের নূতন বই

হ্রস্ব ও দীর্ঘ ৫.

পেপার-ব্যাক ক্লাসিক্স্ দ্বিতীয় দফার বই :—

বনফুলের স্থাবর ৬. প্রমথনাথ বিশীর কেরী সাহেবের মুন্সী ৬. অন্নদাশঙ্কর রায়ের পথে-প্রবাসে ৩. প্রবোধকুমার সান্যালের মহাপ্রস্থানের পথে ৩॥

এগুলি সম্পূর্ণ বই : সংক্ষিপ্ত নয়। ভাল কাগজ, ভাল ছাপা, মনোহর প্রচ্ছদপট

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নূতন বই

অশান্ত ঘূর্ণি (আসন্ন প্রকাশিতব্য)

কোমল গান্ধার ৮.

বিমল করের সেতু ৫. দক্ষিণারঞ্জন বসুর প্লাবন ৫.

জ্যোতির্ময়ী দেবীর
এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

সোনা রূপা নয় ১৫.

আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৮. গজেন্দ্রকুমার মিত্রের প্রভাত সূর্য ৫.

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম ১০ ২য় ১০

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

নতুন-ফসফোমিন নির্মাতাদের দ্বারা তৈরী আরেকটি উৎপাদন

ফসফোমিন আয়রন

...কারণ মেয়েদের জন্যে আয়রনের বেশী প্রয়োজন হয়

মেয়েদের জন্তে আয়রনের দরকার অনেক বেশী। কারণ প্রতি-মাসে তাঁদের শরীর থেকে আয়রন বেরিয়ে যায়। শরীরের পক্ষে আয়রন খুবই দরকার। তাই আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করাও প্রয়োজন।
গর্ভাবস্থায় আর শিশুকে স্তন্যপান করাবার সময় প্রত্যেক স্ত্রীলোকের আরো বেশী আয়রনের প্রয়োজন হয়। কারণ সন্তানের জন্তেও তো আয়রনের দরকার!
আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করতে আর শরীরে যথাযথ মাত্রায় আয়রন বজায় রাখতে আপনি নিন ফসফোমিন আয়রন—প্রতিটি নারীর জন্তে একটি অত্যাবশ্যক টনিক।
ফসফোমিন আয়রন স্বাস্থ্যকর লাল রক্ত-কণিকা গড়ে তোলে আর আপনার যৌবনশ্রী ফিরিয়ে আনে।
ফসফোমিন আয়রনে সব ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও পাবেন। ফলে আপনি হয়ে উঠবেন যেমন কর্মঠ তেমনি প্রফুল্ল।
আজ থেকেই ফসফোমিন আয়রন খেতে শুরু করুন। প্রত্যেক দিন নিন ফসফোমিন আয়রন।

সব কেমিস্টের দোকানে ২টি সাইজে পাওয়া যায়:
২৫০ মি. লি. ও ৪৫০ মি. লি.।

নতুন! ফসফোমিন আয়রন-
মেয়েদের জন্যে বিশেষ
ফর্মুলায় তৈরী প্রথম টনিক

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS

® ই. আর. স্কুইব অ্যাণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক আর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকর্তা হলেন কে পি পি এল।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক সাধারণ পাঠাগার ও সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত]

দেবদাস দাশগুপ্তের

দুখানি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

আকাশ ও পৃথিবী ৪৲

পরাভূত প্রকৃতি ৩৲

বি, এড্/বি, টি শিক্ষার্থীদের জন্য

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি

(বিষয় অংশসহ)—অধ্যাপক গৌরমোহন রায় ১০৲

প্রশ্নোত্তরে বি. এড্. সহায়িকা

(১ম হইতে ৪র্থ পত্র)—অধ্যাপক অশোক গুপ্ত ১৮৲

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী ১৫/৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি ৭৮১০)

পূজার পূর্বেই প্রকাশিত হইবে

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

রম্যাণি বীক্ষ্যর

আর একখানি নূতন পর্ব লিখছেন

অবন্তীপর্ব

এই গ্রন্থে কালিদাসের অবন্তী ও বিদিশার কথা নয় বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, ভোজরাজের ধারানগরী, চান্দেল্লাদের মন্দিরময় খাজুরাহো, পাঠানদের দুর্গ মাণ্ডু অহল্যাবাঈ-এর ইন্দোর ও মহেশ্বর, এবং লক্ষ্মীবাঈ-এর ঝাঁসির কথাও পাবেন। আরও পাবেন অমরকণ্টকে নর্মদার উৎস থেকে জব্বলপুরে তার সুন্দর জলপ্রপাত ও ওঙ্কারজীতে তার দুই ধারায় বেষ্টিত দ্বীপে জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বর, পশ্চিমঘাট পাহাড়ে প্রাচীন গুহামন্দির বাঘ ও বিন্ধ্য পর্বতে পাঁচমারি শৈলাবাসের পরিচয়, মানসিংহের গোয়ালিয়র শিবপুরী ও মান্ডুর কথাও আছে আর মধ্যপ্রদেশের ইতিহাস, ভিল প্রভৃতি আদিবাসী ও দস্যুদের কথাও। বহু চিত্রশোভিত মূল্যবান গ্রন্থ।

—এ পর্বগুলি আবার ছাপা হলো—

উৎকল পর্ব—সপ্তম সং ১০·০০

কালিন্দী পর্ব—নবম সং ১০·০০

মগধ পর্ব—চতুর্থ সং ১০·০০

হিমাচল পর্ব—ষষ্ঠ সং ১০·০০

অন্যান্য পর্বগুলি আছে।

* * *

—সবেমাত্র বাহির হইয়াছে—

বাংলার সাধক

দ্বিতীয় খণ্ড : মূল্য ৮.০০

শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্তী

—প্রকাশক—

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা ১২

(সি ৭১১৯)

everest/531.b/PTM BN

১৬০, যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট। এজেন্টস : শিবকুমার ঘোষা, ১১, আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

সূচীপত্র

নিগূঢ়ানন্দের নতুন উপন্যাস

হৃদয়ে নাবিক ৮৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

আর এক সাজে ৬৲

নিখিলচন্দ্র সরকারের নতুন উপন্যাস

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০৲

শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণ-কাহিনী

মধু-বৃন্দাবনে

ব্রজপর্ব ১০৲ ॥ বনপর্ব ১০৲

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

আবার যদি ইচ্ছা কর ১২৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস

পূর্ব পুরুষ

প্রথম খণ্ড ৮৲ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ১২৲

নিমাই ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস

মোগলসরাই জংশন ৮৲

প্রখ্যাত ক্রীড়া-সাংবাদিক চিরঞ্জীবের নতুন খেলার বই

জয় থেকে জয় ক্রিকেটে

দাম বারো টাকা

ভারতের টেস্ট ক্রিকেট খেলার শুরু ১৯৩২ সালে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে। কিন্তু ক্রিকেট টেস্টে জয়যাত্রা শুরু ১৯৫২ সালে, মাদ্রাজের চীপকে বিজয় হাজারের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। তখন থেকে ভারত এ পর্যন্ত জিতেছে ১৯টি টেস্টে—কখনও বিদেশে, কখনও বা স্বদেশের মাটিতে। এই গ্রন্থে প্রতিটি জয়ের 'বল-টু-বল' ধারাবিবরণী—সাথে প্রতিটি ইনিংস-এর স্কোর কার্ড।
ভারতের টেস্ট-জয় নিয়ে এ ধরনের প্রামাণিক গ্রন্থ ইংরেজীতে তো নেই-ই, কোন ভারতীয় ভাষায় আজও লেখা হয়নি। **পাঁচ শতাধিক** পৃষ্ঠার গ্রন্থে আর আছে সর্বশেষ তিন সিরিজের বিজয়ী ভারতীয় খেলোয়াড়দের পরিচয়, ক্রিকেটের রাজা রণজি সম্পর্কে সুদীর্ঘ রচনা। ১৯৩২ সাল থেকে এ পর্যন্ত যে প্রায় দেড়শো ভারতীয় টেস্ট খেলেছেন তাঁদের প্রত্যেকের বোলিং ও ব্যাটিং হিসাব ছাড়াও নানা পরিসংখ্যান। **সঙ্গে কুড়ি পৃষ্ঠার ছবির এলবাম।**

স্পোর্টস ডায়েরী ৭৲ — চিরঞ্জীবের আর একখানি অনবদ্য খেলার বই। ক্রীড়া-জগতের সুপরিচিত নায়ক-নায়িকার ছবিসহ বহু অজানা সংবাদ।

রবীন্দ্র লাইব্রেরী : ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ ॥ ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

হাসি নয় তো,

যেন মুক্তোর ঝিলিক

হ্যাঁ, আপনার হাসিতে সব সময়েই একটি শুভ্র-সুন্দর আভা মুক্তোর মত ঝলমলিয়ে উঠবে। রোজ পেপসোডেন্ট দিয়ে দাঁত মেজে দেখুন, কত সহজে আপনি এধরনের হাসি ছড়াতে পারেন। পেপসোডেন্ট বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী—অপূর্ব এর স্বাদ, এবং দাঁতকে আরও বেশী সাদা ও সুন্দর করে পেপসোডেন্ট।

Pepsodent

পেপসোডেন্ট

ঝকমকে দাঁতের জন্য

হিন্দুস্থান লিভার-এর তৈরী একটি সেরা টুথপেস্ট

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীবদ্রীনারায়ণ

রচনাবলী

বঙ্কিম রচনাবলী ১২৲

[সমগ্র উপন্যাস এক খণ্ডে]

রামমোহন রচনাবলী ১০৲

মধুসূদন রচনাবলী ১১৲

দীনবন্ধু রচনাবলী ৯৲

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ২০৲

প্রতিটি রচনাবলীর জন্য ৫৲ দিয়ে গ্রাহক হোন। বাংলা সাহিত্যে রচনাবলীর প্রকাশনা যে কত উন্নত মানের হতে পারে আমাদের প্রকাশিত রচনাবলীগুলি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। বিশুদ্ধ পাঠ, সুসম্পাদিত, দামী কাগজ, লাইনোটাইপ, সুদৃশ্য রেক্সিন বাঁধাই, স্বর্ণাঙ্কিত নাম, মনোরম আবরণী। আমাদের প্রতিটি রচনাবলী ডিলাক্স এডিশন এবং ৫০ বছর স্থায়ী একটি অমূল্য সম্পদ।

হরফ প্রকাশনী । এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট । কলকাতা-১২

(সি ৭৬১৭)

রূপার বই

॥ প্রবন্ধ ॥

সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত
মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ ১২·০০

অনু বন্দ্যোপাধ্যায়
বহুরূপী গান্ধী ৬·০০

সুনীলকুমার ঘোষ
সম্পাদিত
ভূপেন্দ্রনাথ : জীবনী ও রচনাবলী ৮·০০

নিখিল সেন
ইন্দিরা দূরদর্শিনী ১০·০০

ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু
নৈরাজ্যবাদ ১০·০০

Durga Das
Foreword by
Dr. Zakir Husain
INDIA : FROM CURZON TO NEHRU AND AFTER 10.00

Atulananda Chakrabarty
THE MAHATMA AND HIS MEN— 3.00

Ernest Mandel
Brain Pearce
MARXIST ECONOMIC THEORY
2 volumes in 1 : Nearly 800 pages 22.00

William Warbey
HO-CHI-MINH : The struggle for an independent Vietnam 12.00

C. F. Strong
MODERN POLITICAL CONSTITUTIONS 23.00

Sudhir Ghosh
GANDHI'S EMISSARY
Bound 30.00
Paperback 12.00

রূপা

রূপা অ্যান্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু রচিত ও ময়ূখ চৌধুরী চিত্রিত

চিত্রে গোয়েন্দা-কাহিনী

নিশীথ রাতের আহ্বান

ফোনের মধ্য দিয়ে ভেসে এল অকস্মাৎ এক অপরিচিতা মহিলার আর্ত স্বর। কি ছিল সেই স্বরে, সহকারী এলা মাথুরকে নিয়ে নিশীথ রাতে মহিলাটির নির্দেশমত একটি রাস্তার মোড়ে গোয়েন্দা কুশল চৌধুরী গিয়ে পৌঁছল। আর সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে তাদের চোখের সামনে আততায়ীর নিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হল সেই মহিলা। মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে আততায়ীকে অনুসরণ করল কুশল চৌধুরী আর তখনই শুরু হল নিশীথ রাতের এক রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার। অরণ্যদেব, গোয়েন্দা রিপের মতন যে চিত্রকাহিনী প্রতি দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সাড়া জাগিয়েছিল, তারই গ্রন্থরূপ। ডবল ক্রাউন বড়ো আকারে আগাগোড়া ম্যাপ লিথো কাগজে ছাপা॥

প্রকাশিত হল

দাম ৩·০০

কৃষ্ণা বসুর নেতাজী সম্পর্কিত গ্রন্থ

ইতিহাসের সন্ধানে ৫·০০

বরুণ সেনগুপ্তের পাকিস্তান সম্পর্কে আলোচনা

বিপাক-ই-স্তান ৬·০০

এম আর আখতার (মুকুল)-এর স্মৃতিচিত্র

রূপালী বাতাস ৫·০০

যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভূতিভূষণ স্মৃতিকথা

উপলব্যথিত গতি ৫·০০

দার দাতিয়েনের নরসিংদাস পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ

ডায়েরির ছেঁড়াপাতা ৬·০০

বরুণ সেনগুপ্তের যুক্তফ্রন্ট শাসনের ইতিকথা

পালাবদলের পালা ১২·০০

শ্রীপান্থের ইতিহাস-আখ্যান

ঠগী ৫·০০

রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবহবিজ্ঞানের বই

মেঘ বৃষ্টি রোদ ৩·০০

আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন

কাশ্মীর '৬৫ ১০·০০

শ্রীপান্থের ইতিহাস আখ্যান

হারেম ৫·০০

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের রমণীয় রচনা-সংগ্রহ

ইন্দ্রজিতের আসর ৩·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের শ্রীচৈতন্য জীবনচরিত

শ্রীগৌরাঙ্গ ৩·০০

সাগরময় ঘোষের সাহিত্যিকদের গল্প

সম্পাদকের বৈঠকে ৬·০০

শ্রীপান্থের ইতিহাস-আখ্যান

দেবদাসী ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলি: ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২ ॥ বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলি: ৯

৪০ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৪
শনিবার ১৬ ভাদ্র ১৩৮০
Saturday 1 September 1973

কলকাতার উন্নয়নে সাহায্য

বিশ্ব ব্যাংক কলকাতার উন্নয়নের জন্যে আপাতত ছাব্বিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন শুনে মনে হচ্ছে কলকাতার কিছু পরিবর্তন হয়ত দু এক বছরের মধ্যেই নজরে পড়বে। ছাব্বিশ কোটি টাকা আপাতত আসছে বলেই যে এই পরিবর্তন আশা করা যাচ্ছে তা কিন্তু নয়। টাকা মজুত থাকলেও যে কাজ হয় না তার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সি এম ডি এ টাকার অভাব বোধ করছিলেন বলে জানি না কিন্তু এই সংস্থার হাতে কলকাতার কতটুকু উন্নতি হয়েছে তা গবেষণার বিষয়। কলকাতা উন্নয়নের কথা যখন ওঠে তখন সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি তা হল একটি বড় শহরে জীবনযাপনের উপযুক্ত আধুনিক ব্যবস্থা; এর মধ্যে রাস্তাঘাট, পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশী ব্যবস্থা, শহরের পরিচ্ছন্নতা, যানবাহনের সুব্যবস্থা--এসবই রয়েছে। কলকাতার দিকে তাকালে দেখা যাবে, দু একটি বিশেষ এলাকা ছাড়া শহরের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ এলাকা জীবনযাপনের অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়, পানীয় জলের অভাব, নিকাশী ব্যবস্থা ব্যর্থ, জঞ্জাল আর ময়লার স্তূপে জমছে রাশি রাশি। এই অবস্থার মধ্যেই লোকসংখ্যার চাপ যাচ্ছে বেড়ে। কলকাতার এমন হতশ্রী চেহারার একটি কারণ লোকসংখ্যার চাপ। দ্বিতীয় কারণ, এই শহরে নাগরিক আইন বলে কিছু নেই, যত্রতত্র ভিখিরির সংসার, দোকান-বাজার সর্বত্র গজিয়ে উঠছে, ফেরিওলা বসে যায়, হাজার হাজার গাড়িঘোড়া আপন মর্জিতে আসা-যাওয়া করে। সদর রাস্তায়, গাড়ি বারান্দায় পার্কে, স্টেশনে যেভাবে গৃহহীনদের সংসার সাজানোর ঢালাও ব্যবস্থা এখানে আছে ভারতেরই অন্য কোনো শহরে তা নেই। ভিখিরি আর রাস্তার দোকান কলকাতার এক অভিশাপ।

বিশ্ব ব্যাংক কলকাতাকে টাকা বোধ করি আগেও দিতে পারতেন—কিন্তু তখন কলকাতার জন্যে দরদী কেউ ছিল না। যাই হোক, এখন কলকাতার ওপর কিছুটা নজর অবশ্য পড়েছে। বিশ্ব ব্যাংক জানিয়েছেন যে তাঁদের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাকে বলা হয়েছে, কলকাতার জন্যে ভারত সরকারকে টাকা দাও। আপাতত সোয়া ছাব্বিশ কোটি টাকা। তাঁদের শর্ত হল, টাকাটা নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পে খরচ করতে হবে। এবং তা ঠিক মতন খরচ হচ্ছে কি না, যথাযথ কাজ চলছে কি না তা দেখার জন্যে ব্যাংকের প্রতিনিধিরা কলকাতা পরিদর্শনে আসবেন এবং পাঁচ মাস তাঁরা এখানে থাকবেন।

মনে রাখতে হবে, টাকাটা আমরা দান হিসেবে পাচ্ছি না, পাচ্ছি ঋণ হিসেবে। ঋণের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকারও যেমন কারো নেই, সেই টাকা অন্যভাবে ব্যয় করবারও অধিকার আমরা পাচ্ছি না। কাজেই এই টাকা যে-কারণে পাওয়া যাবে যদি তার জন্যে ব্যয় হয় তবে কয়েকটি কাজ নিশ্চয় হতে পারে। তার মধ্যে রাস্তাঘাট, পানীয় জল ও নিকাশী ব্যবস্থার কাজ যত দ্রুত শেষ করা যায় ততই মঙ্গল। ব্যাংকের প্রতিনিধিদের কাছে কাজ দেখানোর অর্থ হল, সে-সাহায্য আপাতত পাওয়া যাচ্ছে, তার চেয়ে বেশী সাহায্য ভবিষ্যতেও পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি টাকার সদ্ব্যবহার না হয় তবে বিশ্ব ব্যাংক আর এক কপর্দকও দেবেন না।

আমাদের সমস্ত কাজের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা এবং আন্তরিক প্রয়াসের অভাব দেখা যায়। কলকাতাকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর শহর করতে হলে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে যা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হল আন্তরিক প্রয়াস এবং সহযোগিতা। রাজ্য সরকার, পৌরসভা, সি এম ডি এ—যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাজে নামেন তবে এই কলকাতার শ্রী খুব দ্রুতই কিছুটা পালটাতে পারে। প্রসঙ্গত একটি কথা বার বার বলতে হয়, কলকাতা শহরকে রথের মেলা করে ফেলার যে বিশ্রী প্রবণতা আজকাল ভিখিরি আর ফেরিওলাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সরকার আর পৌরসভা তা আর কতকাল সহ্য করবেন? এই ধরনের সহিষ্ণুতা মানুষের নাগরিক বোধকে একেবারেই নষ্ট করে ফেলছে এবং কলকাতাকে আরও আবর্জনাময় শহর করে তুলছে।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম : ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায়
আকাশ বিমান মাশুল
৫ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
৩০-২২৮৩
৩০-৮৫৪১

চাঁদার হার
ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৬.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৮.৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯.৫০

আসামে ও ত্রিপুরায়
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৪৪.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ২২.৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১.৫০

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৮৭.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৪৪.০০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ২২.০০
বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৬০.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৩১.০০

লন্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক — টাঃ ১৭৪.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৮৭.৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৪৪.০০

কী খবর, ফকরুদ্দিন সাহেব!
মজুতদার
মুনাফাশিকারী

পাকিস্তানের ভিতে ফাটল বড় হচ্ছে

কিছুদিন আগে এক বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনাকালে ভুট্টো সাহেব বলেছিলেন : যেদিন থেকে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে সেদিন থেকে ভারতের পতন শুরু হয়েছে।

যেদিন থেকে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে সেদিন থেকে পতন যদি কারু শুরু হয়ে থাকে সেটা কিন্তু পাকিস্তানের। বাংলাদেশ পাকিস্তানের ভিতে কত বড় ফাটল ধরিয়েছে এখনও বিশ্ববাসী তা পুরোপুরি দেখতে পায়নি। পাবে আরও কিছুদিন পরে। হয়ত দু বছর পরে, হয়ত বা দশ বছর পরে।

এক বছর আগে পাকিস্তান গিয়ে আমি এই ফাটল দেখে এসেছি। বেশ ভাল রকমের ফাটল। এবং, যতই দিন যাচ্ছে এই ফাটল বাড়ছে।

বালুচিস্তানে তিন প্রধানের গ্রেফতারী এই ফাটলেরই প্রকাশ। বালুচিস্তানের প্রাক্তন গভরনর, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে আরও বহু বালুচকে। সেখানে সৈন্য পাঠানো হয়েছে। পাক সেনাদের সঙ্গে বালুচদের সংঘর্ষের খবর প্রায় প্রতিদিনই বের হচ্ছে।

ভুট্টো সরকার ঘোষণা করেছে, এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই মামলা করা হবে। সরকার বলছে, এরা কীভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলেন এই সব মামলায় তা প্রকাশিত হবে।

তিন বালুচ নেতার বিরুদ্ধে ভুট্টো

সাহেব কোনও অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবেন কি না জানি না। তবে, তাঁর এই অভিযোগ উত্থাপনের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পাকিস্তানের ভিতে ফাটল ধরেছে। বালুচদের তিনজন প্রধান নেতা যদি সত্যিই পাকিস্তানের বিরোধিতা করেন তা হলে কি তার ফলে এই সত্যই প্রমাণিত হয় না যে পাকিস্তানের ভিতে ফাটল ধরেছে?

*

শুধু ধর্মকে ভিত্তি করে যে একটা রাষ্ট্র টিকতে পারে না পাকিস্তানের জন্মের প্রায় চব্বিশ বছর পরে সেই সত্য আবার বিশ্ববাসীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের জন্ম। বাংলাদেশের জন্ম প্রমাণ করেছে, নানা রকম অত্যাচার আর শোষণ চালিয়ে শুধু ধর্মের নামে জিগির তুলে সবাইকে সব সময় রোখা যায় না। ধর্মান্ধতা মানুষকে কিছুদিন অবশ করে রাখতে পারে ঠিকই, কিন্তু চিরকালের মত ধরে রাখতে পারে না।

বাংলাদেশের জন্মের এই সত্য থেকে পৃথিবীর আর কোন্ দেশের কত লোক শিক্ষা নিয়েছেন জানি না, কিন্তু পাকিস্তান ঘুরে দেখে এসেছি সিন্ধু প্রদেশ, বালুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশের বহু লোক শিক্ষা নিয়েছেন। ধর্মের নামে তাঁরা আর পাঞ্জাবী শাসন ও শোষণ মেনে নিতে রাজী নন। তাঁরাও স্বাধীনতা চান। বাংলাদেশ যেমন পাঞ্জাবী শাসন ও শোষণের কবল থেকে বেরিয়ে এসেছে তাঁরাও তেমনি বেরিয়ে আসতে চান। বাংলাদেশের জন্ম হাজার হাজার সিন্ধী, বালুচ এবং পাঠানের মনে নতুন আশা ও ভরসা এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের জন্ম পাকিস্তানের ভিতে ফাটল ধরিয়েছে।

পাকিস্তান মানেই ছিল পাঞ্জাবী শাসন। চিরকালই তাই। পাঞ্জাবীরা নির্বাচনে জয়লাভের পরও বাঙ্গালী শেখ মুজিবর রহমানের হাতে ক্ষমতা ছাড়তে চাইল না বলেই এত কাণ্ড ঘটে গেল।

তখন কিন্তু সমগ্র পাকিস্তানে পাঞ্জাবীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বাঙ্গালীরা। সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীদেরই পাঞ্জাবীরা কোনও ভাবে স্বীকৃতি দিতে সম্মত ছিল না। আর এখন যে পাকিস্তান সেখানে তো পাঞ্জাবীরাই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই পাকিস্তানে তারা আর কারও সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে কস্মিনকালে রাজী হবে বলে মনে হয় না। এই পাকিস্তানে তারা অবাধ শাসন ও শোষণের অধিকার যে কোনও মূল্যে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই পাকিস্তানে বালুচ, সিন্ধী ও পাঠানদের অবস্থা তাই আরও শোচনীয়।

বলতে পারেন, ভুট্টো তো সিন্ধী, কায়ুম খান তো পাঠান। হ্যাঁ তাই। কিন্তু তাঁদের কারো সাধ্য নেই পাঞ্জাবী আধিপত্য কোনও ভাবে খর্ব করে সিন্ধী স্বার্থ বা পাঠানদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেন। পাকিস্তানে

শ র দি ন্দু র চ না ব লী

শরদিন্দু অম্নিবাস

তৃতীয় খণ্ড

দাম ২৫·০০

প্রকাশিত হল

গোয়েন্দা-কাহিনীকে কি করে সাহিত্য পর্যায়ে আনতে হয় বাংলা সাহিত্যে সে পথ দেখিয়েছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর একটি দিকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—ঐতিহাসিক কাহিনীর পুনরুজ্জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের তিরোধানের পরে ঐতিহাসিক গল্পের স্রোত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ধারাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। সেও পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। সেই লুপ্তপ্রায় ধারাকে পুনরুদ্ধার করেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কালের মন্দিরা' ১৩৫৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তার তিন বছর পরে বেরিয়েছে 'গৌড়মল্লার'। পরে তাঁর আরও কয়েকটি উপন্যাস সমান জনপ্রিয় হয়েছে; তাঁর শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' ১৩৭২ সালে প্রকাশিত হয়। ইতিহাসের উপাদান এবং কিংবদন্তীর সাহায্যে তিনি নিজের কল্পনার রাজ্য সৃষ্টি করেছেন কিন্তু ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেননি। তাঁর ইতিহাসের গল্প প্রধানত সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কাহিনী। গত কুড়ি বছরে দেশে ভাল ঐতিহাসিক উপন্যাস কেউ কেউ লিখেছেন, কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে একটি বিশেষ স্বাদ আছে, অন্য কোথাও তা দুর্লভ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচটি ঐতিহাসিক উপন্যাস—'কালের মন্দিরা' 'গৌড়মল্লার' 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ', 'কুমারসম্ভবের কবি' ও 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'—শরদিন্দু অম্নিবাস-এর তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

আ ন ন্দ পা ব লি শা র্স প্রা ই ভে ট লি মি টে ড

আফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২ ॥ বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিঃ ৯

পাঞ্জাবীরা এক নম্বর নাগরিক। সেই বিশিষ্ট স্থানে যিনি আঘাত করতে যাবেন, যিনি সকল ভাষাভাষী পাকিস্তানীর স্বার্থ সমান করে দেখতে যাবেন তাঁকে বিদায় নিতে হবেই। পাঞ্জাবীরা তাঁকে থাকতে দেবে না। তাঁকে সরাবেই।

এতদিন বালুচ, সিন্ধী, পাঠানরা সবাই বাধ্য হয়ে পাঞ্জাবীদের সেই আধিপত্য মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের জন্মের পর আর তা হওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষা গোষ্ঠীর মনেও নতুন আশার সঞ্চার করেছে। তাঁদের বুকে প্রচণ্ড বল এনে দিয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বালুচিস্তান, সিন্ধু প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে সকলেই কী স্বাধীনতা চায়? তা হলে ওই প্রদেশগুলিতে মুসলিম লীগপন্থীরা নির্বাচনে জয়ী হয়ই বা কী করে এবং সরকারকে সরিয়ে বিকল্প সরকারই বা গঠিত হয় কী করে?

এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। সত্যিই ওই তিনটি প্রদেশে সবাই স্বাধীনতাকামী নয়। সীমান্ত প্রদেশে তো পাকিস্তানপন্থীরা বেশ শক্তিশালী। তবে, বালুচিস্তানে স্বাধীনতাকামীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সিন্ধু প্রদেশে আবার স্বাধীনতাকামীদের মেরুদণ্ড হল শিক্ষিত তরুণ সমাজ—গোটা সিন্ধী সমাজের চোখে যাঁরা আদর্শ।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য আরও একটা পাল্টা প্রশ্ন আছে—বাংলাদেশের সবাই কি স্বাধীনতা চেয়েছিলেন? নির্বাচনের সময়, যখন শেখ সাহেবও পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেননি, শুধু কয়েকটা অধিকার চেয়েছিলেন তখনও কি পূর্ব বাংলার বহু লোক তাঁর দলের বা তাঁর দাবির বিরুদ্ধে ভোট দেননি? এবং, যখন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে তখনও কি বহু বাঙালী পাকিস্তানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নি?

ভারতে যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেছে তখনও কি কিছু লোক ইংরেজের দালালি করে নি?

আসলে যেটা বিচার করার তা হল, মূল সুরটা কী? পূর্ব বাংলার মূল সুর দীর্ঘদিন ধরেই ছিল পাঞ্জাবী শাসন ও শোষণ থেকে বেরিয়ে আসা। সিন্ধু এবং বালুচিস্তানের মূল সুর আজ তাই। সীমান্ত প্রদেশের মূল সুরও তাই—গত বছর অন্তত তা আমার মনে হয় নি। তবে পাঠানদের মধ্যেও যে একটা বেশ বড় অংশ স্বাধীনতার কথা ভাবছেন তা দেখে এসেছি।

*

বালুচিস্তানের সাম্প্রতিক গ্রেফতারী তাই আবার প্রমাণ করল যে ভুট্টো সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করেও বালুচিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করতে পারছে না। এতদিন তিনি এবং পাকিস্তানের আসল শাসক পাঞ্জাবীরা শুধু বালুচিস্তানের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেই ক্ষান্ত ছিলেন। এখন গ্রেফতার করতে বাধ্য হলেন। এবং, প্রাক্তন গভরনর বেজিনজোকেও গ্রেফতার করলেন। এই বেজিনজোর ওপর অবশ্য পাক সরকারের খুব আস্থা ছিল। মেংগল এবং মারিকে পাক শাসকরা চিরকালই খুব খারাপ চোখে দেখতেন। খয়ের বকস মারিকে তো চিরকাল এক নম্বর শত্রু বলে মনে করে এসেছেন।

ভুট্টো সাহেব এবং তাঁর পাঞ্জাবী কর্তারা সম্ভবত এবার এঁদের বিরুদ্ধে বিদেশের সঙ্গে গোপন আঁতাতের অভিযোগ আনবেন। যেমন একদা এনেছিলেন শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে।

এক বছর আগেই আমি কোয়েটায় পাকিস্তানী প্রচার শুনে এসেছিলাম : বালুচিস্তানের ন্যাপপন্থীরা গোপনে রাশিয়ার সঙ্গে আঁতাত করছে। ভুট্টো সাহেব কয়েক সপ্তাহ আগে একজন ভারতীয় সাংবাদিককে বলেছেন : আপনাদের সরকার সিন্ধু প্রদেশ এবং আজাদ কাশ্মীরে গুপ্ত ঘাঁটি করছে।

বিদেশী আঁতাতের অভিযোগ তোলার জন্য পাক কর্তারা আগাম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এইভাবে কি পাকিস্তানকে বাঁচানো যাবে? এই ভাবে কি বালুচিস্তান এবং সিন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধ্বংস করা যাবে?

এইভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধ্বংস করা গিয়েছিল?

আজ পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পাঞ্জাবীরা। তারা যদি তাদের একাধিপত্য করার উগ্র বাসনা ত্যাগ করতে পারে, যদি সকল ভাষাভাষীর সমান অধিকার মেনে নেয়, যদি সিন্ধী, বালুচ এবং পাঠানদের উপর এতদিন যে বৈষম্যমূলক আচরণ চলেছে তার অবসান ঘটিয়ে মোটামুটি সব জাতিকে এক ধাপে, এক পর্যায়ে আনতে পারে তাহলে পাকিস্তান রক্ষা পেতে পারে।

কিন্তু পাকিস্তানী পাঞ্জাবীরা কি তাতে রাজি হবে? যখন তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় তখনই বাঙালীকে ক্ষমতার অংশ দিতে চাইল না, আর এখন যখন তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ তখন কি সেই সুমতি তাদের হবে?

তেমন কোনও লক্ষণ তো এখনও দেখা যাচ্ছে না।

তাই পাকিস্তানের ভিতে ফাটল বাড়ছে এবং আরও বাড়বে।

২১-৮-৭৩।

নবারুণ গুপ্ত

রূপদর্শীর সোচ্চার-চিন্তা

টাকা = পয়সা = !!!

আমার স্ত্রী বাজারের থলিটা রেখেই খবরটা দিলেন, আলুর দাম আজ আরও দশ পয়সা বাড়ল।

এর আগে উনি ক্রমাগত আমাকে বাজার-দর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখবার জন্য যখনই এইরকম ধারাবিবরণী দিয়ে গেছেন, যথা : আজ সরষের তেল আরও একটা লাফ দিল—সাত টাকা পঞ্চাশ, কয়লা আজ রেকরড করল গো—ছ' টাকা আশী, আজ ইলিশ মাছ কাটা তের, এক কেজি পোনা কাটা বার, পেঁপে আজ এক টাকা, চিঁড়ে সাড়ে তিন আজ, ইত্যাদি ইত্যাদি, তখনই দেখতাম আমি কেমন যেন নারভাস হয়ে পড়ছি। আমি দেখতাম গোটা বাজারটা বৃহৎ একটা বেলুন হয়ে উপরে উঠতে লেগেছে আর আমি লাফাচ্ছি লাফাচ্ছি লাফাচ্ছি কিন্তু সে আমার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। আমি আমরা তবুও তার নাগাল পাবার জন্য রাস্তায় ঘাটে আফিসে লাফাচ্ছি লাফাচ্ছি লাফাচ্ছি।

আমাকে কয়েকজন বড় বড় ডাক্তার ভাল করে দেখে বললেন, এটা হল নিউরোসিস—স্নায়ুর ব্যারাম। ট্রাংকুলাইজার খান, ঘুমটা ভাল হলেই দেখবেন আপনার লাফানো কমে গিয়েছে। স্নায়ু স্নিগ্ধকর অনেক বড়ি খেয়েও আমার লাফানো বন্ধ হল না দেখে ডাক্তাররা বললেন, বাজারে যাওয়া বন্ধ করুন।

তারপর থেকে আমার স্ত্রীই বাজার করেন। আর বাড়ি ফিরেই গতিশীল বাজার-দরের ধারাবিবরণী দিতে থাকেন আর আমি লাফাতে থাকি অবিশ্যি ঘরের ভিতর।

অন্য দিনের মত আজও আমার স্ত্রী বাজার থেকে ফিরে জানালেন, আলুর দাম আরও দশ পয়সা বাড়ল।

কিন্তু আজ আর আমাকে তিনি আকাশে হাত তুলে বেলুনটা ধরবার জন্য লাফাতে দেখলেন না।

ঠাণ্ডা গলায় তাঁকে বললাম, ওতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।

উনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এত যে ঠাণ্ডা! বড়ি-টড়ি খেয়েছ নাকি?

না, না। আমি বললাম, ছুটকো ছাটকা জিনিসের দাম বাড়ায় কিছু যায় আসে না। আলু কি মাছ কি কাপড় কি কয়লা কি ডাল কি চাল—ওসবের দাম বাড়লে দেশের ক্ষতিবৃদ্ধি তেমন হয় না। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে হু হু করে বাড়ছে, আমার ভয়ানক দুর্ভাবনা হয়েছিল, ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বুঝি টাকার দামও হু হু করে বেড়ে যাবে। কিন্তু নাঃ! তার কোনও আশঙ্কা নেই জেনে এখন খুব আশ্বস্ত বোধ করছি। অর্থমন্ত্রী শ্রীচোহান লোকসভায় জানিয়েছেন, টাকার দাম বাড়েনি, বাড়বে না। তিনি এবং তাঁর সরকার কৃতিত্বের সঙ্গে এমন সব কড়া ব্যবস্থা নিয়েছেন, যার ফলে আমাদের দেশে যখন অন্য সব জিনিসের দাম বেড়েছে, তখন টাকাই একমাত্র জিনিস যার দাম কেবলই কমেছে।

গিন্নী বললেন, বল কি! সত্যি!

তাঁকে জানালাম, অর্থমন্ত্রীর নিজের কথা। ষোল আনা সত্যি। এই দেখ না, দেখ—

কাগজটা তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলাম এবং যদিও তিনি চোখে চশমা থাকলে এবং কাগজের ছাপাটা স্পষ্ট হলে পড়তে পারেন এবং তখন তাঁর চোখে চশমাও ছিল, তবু আমি উৎসাহ ভরে সবটাই পড়ে দিলাম, "নয়াদিল্লি ড্যাশ ১৯৬২ থেকে ১৯৭৩-এর মধ্যে টাকার দাম শতকরা ৪৭·৮ ভাগ কমে গেছে। এই তথ্য লোকসভায় পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চোহান।"

গিন্নী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, যাক বাবা, টাকাটা যে সস্তা আছে এখনও, তাও রক্ষে! এই ডামাডোলের বাজারে আসল জিনিসটার দামই কিভাবে কমিয়ে রেখেছে! যাই বলো, লোকটাকে কিন্তু বল হরি, থুড়ি বলিহারি দিতে হয়!

অথচ দেখুন, এত বড় একটা কৃতিত্বের জন্য আমরা অর্থমন্ত্রীকে একটা সাধুবাদ পর্যন্ত জানাইনি। ভেবে দেখুন, আলুর মত পচনশীল একটা জিনিস তারও দাম এক মাসের মধ্যে এক টাকা কিলো থেকে এক টাকা তিরিশ পয়সা হয়ে গেল। তাও হিম-ঘরের আলু। নতুন আলু উঠলে কোন না দু টাকা আড়াই টাকা হবে। কিন্তু ভারতীয় টাকা। আপনি আনকোরা একখানা এক টাকার নোট বাজারে নিয়ে ফেলুন, দেখবেন তার দাম এখনও ৫২·২ পয়সা।

শরীরটা বেজুত তাই ইচ্ছে থাকলেও সশরীরে দিল্লি গিয়ে অর্থমন্ত্রীকে অভি-নন্দন জানাতে পারলাম না। সেজন্য দুঃখিত।

দেখা হলে জিজ্ঞাসা করতাম, অর্থমন্ত্রী মহাশয়, আপনি যে টাকার দাম ৫২·২ পয়সায় নামিয়ে এনেছেন, ক'দিন এখানে তাকে রাখতে পারবেন? বড় বড় পুঁজিপতি, কালোবাজারী এবং একচেটিয়া[illegible]দের চক্রান্তে টাকার দাম আবার বেড়ে যাবে না তো?

এবং এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, অর্থমন্ত্রী বলতেন, সব রকম প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকে বানচাল করে দেবার মত প্রচুর ক্ষমতা আমাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির আছে। আমাদের ইকনমি যথেষ্ট শক্তিমান অর্থাৎ কিনা সাউন্ড্। এই অর্থনীতি যতদিন চালু থাকবে, এবং যতদিন আমরা আছি, ততদিন টাকার দাম ·১ পয়সা বাড়াবার ক্ষমতাও কারো হবে না।

প্রশ্ন : অর্থমন্ত্রী মহাশয়, টাকার দাম বর্তমানে ৫২·২ পয়সা। গরিবের পক্ষে এই দাম এখনও বেশ চড়া। ওটা কি আরও সস্তা করা যায় না?

অর্থমন্ত্রী : আমাদের নীতি তাই। সেই কারণেই ধাপে ধাপে আমরা টাকার দাম কমিয়ে যাবার সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের সময়সূচিটা এইরকম : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক যোজনার প্রথম বর্ষে টাকার দাম ৪০ পয়সায় নামিয়ে আনব, দ্বিতীয় বর্ষে ২৫ পয়সায়, তৃতীয় বর্ষে ১০ পয়সায় এবং চতুর্থ বর্ষের বাজেট অধিবেশনেই এই কথা লোকসভায় ঘোষণা করার ইচ্ছা আছে, "ভারতের টাকার দাম আজ থেকে গরিব এবং বড়লোকের কাছে সমান হয়ে গেল, অর্থাৎ যার টাকা আছে আর যার টাকা নেই, সরকারের প্রগতিশীল অর্থনীতির কাছে আজ দুইজনই বরাবর হয়ে গেল, কেননা টাকার দাম আজ থেকে শূন্য পয়সায় বেঁধে দেওয়া হল। ভারতে এতদিনে সমাজবাদ এসে গেল। আনন্দ করুন। নিশান উড়ান।"

অর্থাৎ, আমি ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, ঠাকুর বলতেন, টাকা মাটি মাটি টাকা, আপনারাও টাকাকে মাটি করে দিলেন, এই তো!

অর্থমন্ত্রী : না, মাটির আজকাল বেশ দাম। টাকাকে আমরা মাটির চেয়েও সস্তা করে দিচ্ছি, সেইটেই আমাদের কৃতিত্ব।

(সি ৭৭৬৪/৩)

দেবরাজ

ভুট্টোতন্ত্র
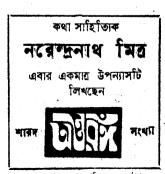
পাকিস্তানের পাঁচ নম্বর সংবিধান চালু হয়েছে ১৪ আগস্ট। তার দু-দিন আগে জমিয়াত-উল-উলেমা-ই পাকিস্তানের প্রার্থী মৌলানা শা আমেদ নুরানিকে হারিয়ে জুলফিকার আলি ভুট্টো হয়েছেন তাঁর দেশের আট নম্বর প্রধানমন্ত্রী। পনেরো বছর ও-পাট পাকিস্তানে ছিল না। আয়ুব খাঁ রাজনীতির আসরে নেমেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাজে তারপর সেটা টেনে ফেলে দিয়ে পরেছিলেন জঙ্গী নায়কের জমকালো পোশাক। সেই থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত চলেছে একটানা ফৌজী রাজত্ব। তা খতম হয়েছে বাংলাদেশ আলাদা হয়ে যাওয়া আর ভারতবর্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে হারের পর। সেই থেকে শুরু হয়েছে ভুট্টোর রবরবা। তিনি অবশ্য পাকিস্তানে রাষ্ট্রপতির মসনদে বসেছিলেন তাঁর নিজের গড়া পিপলস পার্টির প্রধান হিসেবে। অর্থাৎ তিনি লোককে বোঝাতে চেয়েছেন, পাকিস্তানে ফৌজীতন্ত্র তুলে দিয়ে তিনি পত্তন করেছেন গণতন্ত্র। আসলে কিন্তু যা চালু হয়েছে তাকে ভুট্টোতন্ত্র বললেই ঠিক হয়।

চোদ্দই আগস্টও যা চালু হয়েছে তাও ওই ভুট্টোতন্ত্রেরই রকমফের। ভুট্টো চেয়েছেন ক্ষমতা নিজের জন্যে, জনতার জন্যে নয়। পারলে তিনি ইস্কান্দার মির্জা-আয়ুব খাঁ-ইয়াহিয়া খাঁর মতোই দেশের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসতেন। কিন্তু তিনি তো আর ফৌজী প্রধান নন যে আরও পাঁচজন জঙ্গী পাণ্ডা থাকতেও তাঁর হাতেই দেশ শাসনের ভার তুলে দেবে সেনা-সামন্তরা। ডিক্টেটরি ফাঁদতেই যদি হয় তো তা তারা নিজেরাই ফাঁদবে, খামোখা একজন অসামরিক রাজনীতিককে মাথায় মণি করে নাচতে যাবে কেন? ভুট্টোকে তারা দেশের প্রশাসনিক প্রধান বলে মেনে নিয়েছে ফৌজী শাসনের ওপর লোকের ঘেন্না ধরে গেছে দেখে। তাই মাথা হেঁট করে আড়ালে সরে গেছেন জেনারেলদের দল যাতে গণতন্ত্র আবার চালু হয় দেশে। ভুট্টোকেই সেই সঙ্গেই গণতন্ত্রের ঠাট বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। পাকিস্তানে গণতন্ত্র পত্তন করার কড়ার করেই হাতে ক্ষমতা পেয়েছেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। নইলে গণতন্ত্রের ওপর তাঁর যে অচলা ভক্তি আছে এমন নয়।

তাঁর ইচ্ছে ছিল পাকিস্তানে মার্কিনী ধাঁচে রাষ্ট্রপতি-প্রধান-শাসনতন্ত্র চালু করা। তা হলে ডিক্টেটর হয়ে বসতে না পারলেও অনেকটা নির্ঝঞ্ঝাটে তিনি তাঁর ক্ষমতার জুড়িগাড়ি হাঁকাতে পারতেন। তাতেও বাদ সাধলো বিরোধী দলগুলো। তারা বেঁকে বসলো বিলিতী কায়দায় সংসদীয় গণতন্ত্র চাই বলে। দায়ে পড়ে সে দাবি মেনে নিতে হলো ভুট্টোকে। সেই ব্যবস্থাই হয়েছে নতুন সংবিধানে। ইয়াহিয়া খাঁকে বিদেয় দিয়ে ভুট্টো বলেছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি যদিও সংসদীয় গণতন্ত্রের রেওয়াজ মানছে, জাতীয় পরিষদের সবচেয়ে বড় দলের প্রধান হিসেবে তাঁর হওয়া উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে কেঁচে গণ্ডূষ করতে হয়েছে বিরোধী দলগুলোর চাপে। তবে বিরোধীরা যান ডালে ডালে, তিনি যান পাতায় পাতায়। সংবিধানের বয়ান তিনি এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, তাতে তাঁর ক্ষমতা কিছু কমেনি, বেঁচে থাকতে সে ক্ষমতা কমবে কি না সন্দেহ। নির্বাচনের ঝক্কি না পুইয়েই ভুট্টো হয়েছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি। যে নির্বাচনের সুবাদে তিনি গদিতে বসেছিলেন তার রায় মানলে গদিতে বসার কথা শেখ মুজিবর রহমানের, ভুট্টোর হবার কথা বিরোধী দলের নেতা। কিন্তু ক্ষমতা দখল করাই যাঁর লক্ষ্য, তিনি কী আর অত ন্যায়-বিচারের ধার ধারেন?

নতুন শাসনতন্ত্র চালু করার আগে রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিয়ে ভুট্টো দাঁড়িয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের লড়াইয়ে। ব্যাপারটার নতুনত্ব আছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে নিয়ম, নির্বাচনে যে দল, কী জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তার নেতাই হন প্রধানমন্ত্রী। বিলেত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, ভারতবর্ষ, নিউ জিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, মায় বাংলাদেশ, যেখানেই সংসদীয় গণতন্ত্র চালু আছে সেখানেই এই রেওয়াজ। ভোটাভুটি হলে হয় একই দলের দুই প্রার্থীর মধ্যে সংসদে নয়, তার বাইরে। যেখানে পাঁচটা দল নিয়ে মিশ্র সরকার তৈরি হয় সেখানে ভোটাভুটি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে দু দলের প্রার্থীদের মধ্যে হতেও পারে। তা বড় একটা কিন্তু হয় না। যুক্তফ্রন্টের অর্থাৎ মিশ্র সরকারের নেতা নির্বাচনও সাধারণত আপসেই হয়। তবে ভোটাভুটি সরকারী দল আর বিরোধী দলের প্রার্থীদের মধ্যে কখনও হয় না। পাকিস্তানে কিন্তু তাই হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ পিপলস পার্টির নেতার সঙ্গে লড়ে গেছেন বিরোধী দলের একজন নেতা। অঘটন অবশ্য কিছু হয়নি। জিতেছেন জুলফিকার আলি ভুট্টোই। ভোট বরঞ্চ তিনি তাঁর যা পাবার কথা হিসেব মতো, তার চেয়ে কিছু বেশিই পেয়েছেন। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে তাঁর নিজের দল আর তাঁর দলের সঙ্গে আর যে সব দল হাত মিলিয়েছে তাদের মোট সদস্য হচ্ছে ১০৪। আর তিনি ভোট পেয়েছেন ১০৮—অর্থাৎ চারটে বেশী। তাঁর সঙ্গে যিনি দ্বৈরথে নেমেছিলেন সেই মৌলানা নুরানি পেয়েছেন মাত্র ২৮টা ভোট।

লড়াইটা কিন্তু বেআইনী হয়নি। পাকিস্তানের সংবিধানে বলা হয়েছে, স্পীকার আর ডেপুটি স্পীকারের নির্বাচন হয়ে গেলে জাতীয় পরিষদ অন্য সব কাজ ফেলে একজন মুসলিম সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবে। ভোটাভুটি হবে, কিন্তু কোনও বিতর্ক চলবে না। সবচেয়ে বেশী ভোট যিনি পাবেন, জিতবেন তিনিই। ভুট্টোর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচন সেই নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে। তাঁরই দলের ফারুক আলি হয়েছেন স্পীকার, রাষ্ট্রপতি হয়েছেন ফজল ইলাহী। এখন তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর যতটা জয়জয়কার ততটা তাঁর দলের নয়। পিপলস পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কেবল তিনি নন তার প্রাণপুরুষও। নতুন সংবিধান হলে আর এক প্রস্থ নির্বাচন করাই রেওয়াজ। বাংলাদেশেও হয়েছে। ভুট্টো সেদিক দিয়েও যাচ্ছেন না। তবে গেলেই বা কী? তাঁকে হটাবে এমন সাধ্য পাকিস্তানে আজ কোন্ রাজনীতিকের আছে?

যতদিন এ সংবিধান চালু থাকবে ততদিন তিনি বেঁচে থাকতে তাঁকে হটানো অসাধ্য। অন্য দেশে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হলেই প্রধানমন্ত্রীও যান, মন্ত্রিসভাও।। মন্ত্রিসভা তো পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রীর হাতের পুতুল। তিনি তাঁদেরই একজন নন বিলেত-ভারতবর্ষের মতো, তাঁর মর্যাদা আলাদা। তাঁকে নির্বাচন করে জাতীয় পরিষদ। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বাজেট অধিবেশনে আনা যাবে না। অন্য সময় আনতে গেলেও বিকল্প প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তাও খুলে বলতে হবে। তেমন নাম না থাকলে সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে। তার মানে প্রধানমন্ত্রীকে বিদেয় দেওয়া নিয়ে বিরোধীরা একমত হলেই চলবে না, তাঁর বদলে কাকে চাই সে সম্বন্ধেও তাদের একমত হওয়া চাই। তেমন হওয়া খুবই শক্ত। একজন প্রধানমন্ত্রীর তখ্‌তে বসলে তাঁর একেবারে মৌরসি পাট্টা হয়ে যাবে। যতদিন না আর একজন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হচ্ছেন ততদিন আগের লোকই থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। ভুট্টোর বেলা আরও একটা নিয়ম আছে। সংবিধান চালু হবার পর দশ বছর প্রধানমন্ত্রী পালটানো চলবে না—প্রায় এই ধরনেরই একটা নির্দেশ দেওয়া আছে। নির্বিবাদে ভুট্টো দশ বছর অন্তত পাকিস্তানের অধীশ্বর হয়ে থাকার ব্যবস্থাটা এক রকম কায়েম করে নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি জেলে পুরেছেন বিরোধী দুই বাঘা নেতা করিম মহম্মদ বিজেঞ্জো আর আতাউল্লা খান মেঙ্গেল, বুঝিয়ে দিয়েছেন ভুট্টোতন্ত্র আর ফৌজীতন্ত্রে তফাত নেই বললেই চলে।

একালের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্ভার

এই সংখ্যার দুটি বিশেষ রচনা

অপ্রকাশিত পত্রাবলী
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের পাঁচালী, আরণ্যক, অশনি সংকেত প্রভৃতি কালজয়ী গ্রন্থের স্রষ্টা ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রবাদ-তুল্য ব্যক্তিত্ব। মানুষ বিভূতিভূষণ ও তাঁর ব্যক্তিমানস সম্পর্কে জানবার আগ্রহও পাঠকের মনে প্রবল। শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিতব্য পত্রগুচ্ছে ব্যক্তি বিভূতিভূষণ ও তাঁর মানসত্তার এ-যাবৎ অপ্রকাশিত এক উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া যাবে।

আমার যৌবন
বুদ্ধদেব বসু

দেশ শারদীয় সংখ্যায় গত বছরে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর আত্মজৈবনিক রচনা 'আমার ছেলেবেলা'য় এই মণীষী লেখকের বাল্য ও কৈশোরের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এবারে প্রকাশিত হচ্ছে সেই রচনারই দ্বিতীয় অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্ব। বলাবাহুল্য, আত্মজৈবনিক হওয়া ছাড়াও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়-পর্বের বিবরণ হিসেবে এই সুদীর্ঘ নিবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়।

৫টি উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়

(গোয়েন্দা ফেলুদার আর-এক রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস)

শংকর
বিমল কর
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

এঁরা কেউই অন্য কোন পূজা সংখ্যায় উপন্যাস লিখছেন না

গল্প

বনফুল/অন্নদাশঙ্কর রায়/শিবরাম চক্রবর্তী
সুবোধ ঘোষ/বিমল মিত্র/সন্তোষকুমার ঘোষ
সমরেশ বসু/নরেন্দ্রনাথ মিত্র/প্রতিভা বসু
রমাপদ চৌধুরী কপদর্শী দেবেশ রায় প্রভৃতি

এবং কবিতা আর সিনেমা সম্পর্কে রচনা

দাম ৮ টাকা মাত্র/সডাক ৯.২০/সেপ্টেম্বরের গোড়ায় প্রকাশিত হবে।

একটি শান্ত উপন্যাস

আজকাল কোনো উপন্যাসের নাম যদি "উপল উপকূলে" হয়, তবে তা পাঠকদের প্রথমেই চট করে আকৃষ্ট করবে না। এই নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত একটি বেশ মোটা উপন্যাস আমার হাতে এসেছিল। পড়বো কি পড়বো না, দ্বিধা করছিলুম। লেখিকার নাম সামস্ রাশীদ—আগে এ নামও শুনিনি। পড়তে আরম্ভ করার পর বুঝতে পারলুম, যদি অবহেলা করতুম, তাহলে বঞ্চিত হতুম আমিই।

উপন্যাসটির কোনো বিশাল দাবি নেই। আধুনিক সমস্যার ঘনঘটা এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুব ঠাণ্ডাভাবে একজন মহিলা কয়েক বছরের একটি পারিবারিক কাহিনী লিখেছেন। আন্তরিকতাই লেখিকার প্রধান গুণ। কাহিনীকে তিনি কোথাও রোমহর্ষক করার চেষ্টা করেননি।

অথচ এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও পটভূমিতে অভিনবত্ব আছে। ইংরেজি সাহিত্যে বিষয়বস্তুর অভাব নেই, বাংলা সাহিত্যের বিষয় পরিধি সীমাবদ্ধ। যেমন, একজন নাবিকের স্ত্রীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে আগে কোনো বই লেখা হয়েছে কি? আমার তো চোখে পড়ে নি। এই উপন্যাসের নায়িকা রান্না একজন নেভি লেফটেনান্ট-এর স্ত্রী, কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকেই—এবং সন্দেহ কি, এ সম্পর্কে লেখিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে!

উপন্যাসটির প্রধান পটভূমি বোম্বাই। ১৯৪১ সাল থেকে কাহিনী শুরু। অবিভক্ত বাংলার একটি মুসলমান পরিবারের মেয়ে রান্না বিয়ের পর বোম্বাইতে গেল স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে। তাঁর স্বামী লেফটেনান্ট রেশাদ তখন যুদ্ধের কারণে বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত। জাহাজ নিয়ে তাঁকে মাঝে মাঝেই সমুদ্রে ভেসে পড়তে হয়। আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে একা ফ্ল্যাটে পড়ে থাকে তরুণী মেয়ে রান্না। জন্মস্থান থেকে কত দূরে সেই অচেনা শহরে তার একাকিত্ব আরও নির্মম হয়ে ওঠে। তার স্বামী রেশাদ ফিরে এলে আনন্দ ও উৎসাহে সে রোমাঞ্চিত হয়। কয়েকদিন পরেই আবার বিচ্ছেদ। নাবিকের স্ত্রীর জীবন তো এই রকম হবেই।

তবু রান্না আস্তে আস্তে ভালোবেসে ফেলে বোম্বাই শহরকে। তার কিছু কিছু বন্ধু ও সঙ্গী হয়। সামরিক বাহিনীর অফিসারদের একটা আলাদা জগৎ আছে। বাইরের লোকদের সঙ্গে যেমন তাদের মেলামেশার সুযোগ নেই, তেমনই তাদের নিজেদের গণ্ডিটা খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। রান্না তাঁর স্বামীর বন্ধু ও তাদের স্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এরা কেউ পাঞ্জাবী, কেউ বাঙালী, কেউ মারাঠী বা কেউ গুজরাতি। স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মমতাজ আনসারি, ইসরৎ, লেঃ মিত্র এবং তাঁর স্ত্রী নীলা, লেঃ

অনিল মুখার্জি ও নমিতা, হেনরি, দেবদাস ইত্যাদি কত চরিত্র।

রান্না আস্তে আস্তে বুঝতে পারে মানুষের জীবন কত বিচিত্র। সে দেখতে পায়, মমতাজ যাকে ভালোবেসে বিয়ে করলো, যার জন্য সে অনেক কিছু ছাড়তে রাজি, সেই মেয়েটিও একদিন তাকে ছেড়ে চলে যায়। আর মাতাল অনিল মুখার্জি নিজের স্ত্রীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই অপর নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করে। তার স্ত্রী নমিতা সব জেনে শুনেও ছেলেপুলের কথা ভেবে সর্বংসহা হয়ে থাকে। এ ছাড়া কানাঘুষোয় আরও সব ব্যভিচারের কথা তার কানে আসে। এর বিপরীত চিত্র হিসেবে আছে লেঃ দাশগুপ্ত আর তাঁর স্ত্রী—এই বয়স্ক দম্পতি এখনো প্রেমে মশগুল।

রান্না এদের সবার চেয়ে বয়সে ছোট। তার সরল মনে এক একটা ঘটনার আঘাত লাগে আর সে শিউরে ওঠে। তার মন ফুলের মতনই নিষ্পাপ। অথচ তার ব্যবহারে একটা সম্ভ্রান্ত ভাব আছে। সে অত্যন্ত কোমল, কিন্তু তার আত্মসম্মান জ্ঞান প্রখর। সামরিক বাহিনীর ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, আবার বাঙালী সংস্কৃতি তার প্রাণ মন অধিকার করে আছে, তার রুচিকে কখনো ক্ষুণ্ন করে নি।

রেশাদ খুবই ভালোবাসে রান্নাকে। রান্না কখনো তার অতীত সম্পর্কে প্রশ্ন করে নি। কথাতেই বলে, একজন নাবিকের প্রতি বন্দরে একটি করে স্ত্রী থাকে। অবিবাহিত নাবিকদের নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় রান্না নিজেও দেখেছে। কিন্তু রেশাদ একেবারে মুছে ফেলেছে তার অতীতকে। সে অত্যন্ত সহানুভূতিপ্রবণ।

কিন্তু অতীতকে মুছতে চাইলেও একেবারে মুছে ফেলা যায় না। রুথ নাম্নী একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স রেশাদের পেছনে লাগে। এই মেয়েটি আগে লেঃ ঘোষ নামে একজন বাঙালী অফিসারকে বিয়ে করেছিল। সেই বিয়ে সার্থক হয় নি। সেই থেকে তার একটা বাঙালী-প্রীতি জন্মেছে। রেশাদকে সে ভালোবেসে ফেলে এবং রান্নাকে সে বঞ্চিত করার জন্য চক্রান্তের জাল পাতে।

রেশাদ তাকে এড়াবার বহু চেষ্টা করেছে। প্রথম প্রথম সে নিছক ভদ্রতা রক্ষা করেছে। এই স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েটির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে। কিন্তু রুথ আরও বেশী কিছু চায়। রেশাদ পুরুষ মানুষ, মায়াবিনী নারীর আকর্ষণ থেকে বেশী দিন মুক্ত থাকতে পারে না। রেশাদ একদিন ভুল করে ফেলে।

এদিকে দেবদাস মিত্র নামে একজন তরুণ অফিসারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় রান্নার। তার নিঃসঙ্গ মুহূর্তে কিংবা বিপদের সময় দেবদাস এসে পাশে দাঁড়ায়। বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। দেবদাস একটু ভাবুক প্রকৃতির যুবা—রান্নার প্রতি তার ব্যবহার সম্ভ্রমপূর্ণ। ভেতরে ভেতরে দেবদাস যে রান্নাকে অতি প্রিয় জ্ঞান করে—তা কখনো বুঝতে দেয় নি। দেবদাস ও রান্নার সম্পর্কের সূক্ষ্মতা লেখিকা অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন।

রেশাদ ও রুথের ঘটনা রান্না কানাঘুষোয় শুনেছিল। একদিন নিজের চোখে ওদের ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে। সেই মুহূর্তে আর একটি কথাও না বলে রান্না চলে আসে বাংলাদেশে তার দাদার বাড়িতে। এখানে দেখা যায়, রান্নার অভিমান কত তীব্র। কারুকে সে নিজের দুঃখের কথা বলবে না। রেশাদের আটখানা চিঠি সে খুলেও দেখে নি। কিন্তু হঠাৎ জানা গেল রান্নার গর্ভে সন্তান এসেছে। রেশাদ এসে ক্ষমা চাইবার পর রান্না তার কাছে আবার ফিরে যায়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যে একটা অদৃশ্য চিড় রয়ে গেল তা আর কারুর চোখে পড়ে না।

ইতিমধ্যে দেশ কাল জুড়ে কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে। যুদ্ধ শেষে রেশাদের পদোন্নতি হয়, বদলি হয়ে যায় দিল্লিতে। তারপর আসে পাকিস্তান। রেশাদ সস্ত্রীক চলে যায় করাচীতে। সেখানে নতুন সমাজ, নতুন পরিবেশের সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এখানেও পাকিস্তানের নৌবাহিনীর মধ্যে নানা চক্রান্ত, রেশাদকে বদলি করা হয় লণ্ডনের হাইকমিশন অফিসে, হঠাৎ অপমানিত অবস্থায়। সস্ত্রীক রেশাদ লণ্ডনে যাত্রা করার পর জাহাজ এসে আর একবার ভেড়ে বোম্বাইতে। রান্নার সেই আনন্দ ও দুঃখের লীলাভূমি। এখানেই রান্নার সঙ্গে শেষ দেখা হয় দেবদাসের—কেউ একটাও দুঃখের কথা বলে না, অথচ পরস্পরকে বোঝে।

লেখিকার ভাষা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। সামান্য ঘটনাকেও তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করার দক্ষতা আছে তাঁর। বাংলায় সার্থক লেখিকার সংখ্যা এখন কম। সামস রাশীদ তাঁর প্রথম উপন্যাসে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভারী কোমল ও সুমিষ্ট তাঁর বর্ণনাভঙ্গী। অনেকদিন পর একটা আলাদা জগতের উপন্যাস পাঠের স্বাদ পাওয়া গেল।

সনাতন পাঠক

তোমাদের মনের মতো রঙীন পূজাবার্ষিকী
আনন্দমেলা
অন্যতম প্রধান আকর্ষণ
যে খেলা শেষ হবে না
ফুটবলের দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী
মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব নিয়ে
একটি সুদীর্ঘ তথ্য-ও-চিত্রবহুল রচনা
৪টি উপন্যাস
খেলাধুলো নিয়ে/মতি নন্দী
অ্যাডভেঞ্চার/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ডিটেকটিভ/গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু
রূপকথা/শৈলেন ঘোষ
২টি বড় গল্প
সত্যজিৎ রায়
(সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা অনেকগুলি ছবি)
প্রেমেন্দ্র মিত্র
(ঘনাদা'র আর-এক বিচিত্র কীর্তিকাহিনী)
নানা স্বাদের গল্প
আশাপূর্ণা দেবী/বিমল মিত্র/মনোজ বসু
লীলা মজুমদার/শিবরাম চক্রবর্তী/শিবশঙ্কর মিত্র
সতীকান্ত গুহ/সুকুমার দে সরকার
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি
অন্নদাশঙ্কর রায়ের
এক ডজন ছড়ার সঙ্গে
শিশুদের আঁকা এক ডজন ছবি
ধাঁধা/কমিক্স্/প্রতিযোগিতা
দাম ৪ টাকা/সডাক ৫·২০ * সেপ্টেম্বরের গোড়ায় প্রকাশিত হবে

উকুন

হরপ্রসাদ মিত্র

বেশ ভাল লোক আপনারা, বেশ সুখী মনে হয়
বস্তুত কোনো ঝামেলা জীবনে,—কিন্তু কিছুই
যেন কিছুতেই কাবু করছে না, কারণ.....কারণ
প্রারম্ভে ছিল পুণ্য বোধ হয়, তাতেই টাকা
এবং সহজ শক্ত শান্ত আপনারা সব।

আপনি বলেন—
রামকৃষ্ণের ছবির সামনে ঘণ্টা দুয়েক
প্রতি সন্ধ্যায় নাই যদি হয়, প্রতি শনিবার
বসুন, বসুন।

আমি তো বসছি অধুনা—এবং বাতের জন্যে
সকালে থাকছি বসুন বসুন।

মনে ছিল সেই আত্মপ্রকাশ নামক ইচ্ছে
বহু কাটাকুটি করে দু কলম লেখার বিদ্যে।
তাতে প্রধানত একটি কথাই ফুটেছে বলেন—
সমালোচকেরা
অপরিণতির মানসিকতা; তা ঈশ্বরেচ্ছা!

কেউ কাউকে যে ত্রাণ করে না, তা ক্রমশ বুঝছি।
এখন কিছুই লিখছি না, শুধু
দেখছি ... দেখছি।

পিঁপড়ে মাড়িয়ে হাঁটছি যে,—সে কি ইচ্ছাকৃত?
কিরিঙ্গী কালো ভারী জাগ্রত—এবং তাবিজ
কাট কাট করে কাটবে বিপিট,—পরিবর্ত
আমরা যে এই অতি অজ্ঞেয় শক্তিজালে।
সম্পত্তির মানে খুঁজে কাজ নেই,
ধৈর্য ধরুন।

নিমেষ হাওয়ায় বাতাস শান্ত, দেখা নক্ষত্র আকাশ!
চাঁদের কাস্তে মেঘের সাথে সমাক ওড়াই।
এইভাবে ভেতর আত্মরতি—
তামাশখেলা কি?
কি জানি কি জানি বিলাবৃষ্টিশ হংসামানা!
সন্দেহ যেন বাবরি চুলের মধ্যে
উকুন।

শেষ দশকের প্রতিনিধি

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

একটু আগে একটা ট্রেন চলে গেছে, এখন আমি
আর কোনো ট্রেন পাবো না—
আমার আগের কবি অনেক কথাই বলে গেলেন
একটু আগে,—এখন আমি আর কোনো
কথা খুঁজে পাবো না!

অথচ এসেছিলাম ছুটে। আমার ছিল যাবার তাড়া
আগের কবির পূর্বসূরী প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে—
তিনি ঘুম পাড়িয়ে এলেন মাঝের কবিকে
খুব স্বাভাবিক যে আমাকে চিনতে পারলে না
ঘুমে অধীর লেখক পাড়া,
মনীষার তালু ছুঁয়ে কেঁপে যায় মধ্যরাত—
ঘুম নেই কিশোরের,
ট্রেনের হুইসিল তাকে ডেকে নেয় দূর পথে
শ্মশানের চিতা থেকে দূরে তারার নির্জনে—আলেয়ায়
মুখে কোনো কথা নেই,—প্রকাশের ভাষা পর্যন্ত জানা নেই

সবাই যখন ঘুমিয়ে আছে গভীর ঘুমে
আমি একা বেরিয়ে পড়েছি পথে—
চারপাশে ডুবে-থাকা চিরদিনের মুগ্ধতার মধ্যে
আমার অক্সিজেন শুধু কবিতা।

মাথাখারাপ মেয়ে

আবু কায়সার

বনের মধ্যে ঘর বেঁধেছিস ঘরে কী আছে দুয়োর!

হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে মাথাখারাপ মেয়ে
স্বামীসোহাগ ছেড়ে কখনো ভেগালে তোর আসা
সাতগেরামী গেরস্থ তোর জানতো বাপের সুনাম,—
জলে পায়ের মল ডুবিয়ে টিলায় কেন এলি।

বাস্তুভিটের চেয়ে আপন বনকাপাসির উঠোন
মাসিপিসি সেইখানে তোর করলো স্বয়ংবর
ঝোপের মধ্যে বাজারবাটি নীচু ঘরের নীচে
মা মনসার থান রয়েছে দিনে কি রাত্তিরে
ভাইয়েরা তোর পায়ের পাতা স্পর্শ করে পালায়।

সাপেও তোকে ডরায় তারা উসকানিতেও ফণা
দেখতে দেখতে গুটিয়ে নেয়, বলছে প্রতিবেশী:
চাঁদকপালী মেয়ে তুমিই সাপখেলনের মালিক!
সংসারী দুই বরে আবার গোপন বলেই মানুষ
রক্তে তোর মন কি আছে—যে বাড়ে সন্দেহ—

বনের মধ্যে ঘর বেঁধেছিস ঘরে কি আছে দুয়োর
বনের ভেতর বন থাকে তার ভেতরে রাগী শুয়োর।

আজও তাকে প্রতি বছর একবার করে দেখি—ক্যালেন্ডারের কালো একটি তারিখ, কিংবা পাঁজির সজল একটি তিথি।

পঁচিশে বৈশাখ আমাদের দেশে যত মহা-সমারোহে আসে, বাইশে শ্রাবণ—হলেই বা তার গগনে ছড়ানো এলোচুল—ততটা নয়। কারণও আছে। ভারতীয় ধারণা জন্মকেই স্বীকার করে, মৃত্যুকে নয়। দ্বিতীয় কারণটা তাঁর গানেই আছে: "গহন রাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে/ কেন গো মিছে জাগাবে ওরে"; অথবা এই ভাবটাই জীবনানন্দের ভাষায়: "কে হায়, হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে!"

তবু এবারে যখন বেতারে সেই আদি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতিচারণের আমন্ত্রণ পাই তখন একটু বিপন্ন বোধ করি। কেননা সেই দিনটির কথা মনে এলেই আমার চোখে ভেসে ওঠে একটি প্রতিমা-সমা মেয়ের মুখ—মেলার ভিড়ে আমি তাকে একবারই মোটে দেখেছি। কালো ওড়নায় মুখ ঢাকা; ওড়নাটা মাঝে মাঝে সরে যেতে চাইছে বলে, দুটি ভিজে চোখও চোখে পড়ে।

তারপর তার খোঁজে সেই মেলায় আরও কতবার যে গেলাম, কিন্তু সেই ছায়া-প্রতিমাকে আর দেখতে পেলাম না। হয়তো তার রূপ তেমনই আছে—সেই ভুবন ছাপিয়ে এলিয়ে দেওয়া চুল আর পায়ের পাতায় জোনাক-থাকা কোনও তিস্তা পাপড়ি কি ফল—শুধু আমার দেখার চোখ দুটোই গেছে। একটি তিথিরাজার তিথি তখন এক আবির্ভাব হয়ে আমাকে আর আঘাত করে না। বঞ্চনা করে না কোনও শূন্যতা বা দৈন্য, সেই প্রথম বাইশে শ্রাবণ হাহাকারের স্বর যেমন তুলেছিল। কেননা ইতিমধ্যে তিন তিনটি দশক পার—অন্তত দুটি প্রজন্মের ব্যাপার।

আমিও সেখানে থেমে নেই যে। দ্রুত ধেয়ে চলেছি শেষ স্টেশনের দিকে, মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছি তার ধূসমহলে, যেখানে সে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত। আমরা সেই রূপেই তাকে চিনতে চাইছি।

শোকের শ্রাবণ কবে যেন প্রশান্ত শরৎ হয়ে গিয়েছে। ঘন কালো মুছে গিয়ে সে এখন নির্মল, স্নিগ্ধ-নীল।

সেদিন কিন্তু এরকম ছিল না—১৯৪১ সনের সেই ঝরোঝরো অথচ রুক্ষ ৭ই আগস্ট, যার বাংলা নাম বাইশে শ্রাবণ। এই লেখক ছাত্র তখন; তার সেই বয়স যখন মনের মাটিতে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটার দাগ পড়ে। সেই মাটিতে উদাসীন, নির্মম কঠিন কোনও ধাতুতে ইমারত তৈরী করা—কল্পনাও করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় নাম আছে কিন্তু বিশ্বের বিদ্যালয় থেকে ছুটির ক্ষীণতম ঘণ্টাও তখনও কানে আসেনি। সেই বয়স, সেই সময়।

জানতাম তিনি কলকাতায় আনীত, চেতনা-অচেতনের মাঝখানের চৌকাঠে অনিশ্চিত অবস্থায়। আচ্ছন্ন। সেই সময়কার কথা পরে লিখেছেন কয়েকজনে, যাঁরা তাঁর সমীপবর্তিনী, সেবাব্রতচারিণী। "তিথিডোর" নামে উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়েও ধরা আছে একটি দিনান্ত কী করে অনন্ততা প্রাপ্ত হয়, সেই বিবরণী।

প্রতি দিন তাঁর স্বাস্থ্য-সমাচার সহ পত্রিকা বের হয়, তারই উপরে তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ি আমরা যারা দূরবাসী; আচার্য দ্রোণের একলব্য শ্রেণীর। কুয়াশা কেটে ফেটে মাঝে মাঝে যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘার জ্যোতির্ময়-শুভ্র রূপ দেখা দেয়, তেমনই তখনও চলছে মুখে মুখে রচনা—প্রায় প্রত্যহ একটি। আবিশ্বাস্য সেই অসম্ভব ঘটনার সাক্ষী তখনকার প্রভাবী পত্রিকাগুলির কয়েকটি সংখ্যা। "দুঃখের আঁধার রাতি", "তোমার সৃষ্টির পথ" ইত্যাদি; সবই তাঁর শেষ লেখালেখি।

আর অজ্ঞাত অগণিত আমরা তখনও কি এই প্রত্যাশা করছি যে, পরমাশ্চর্য

দাসদাসীর হাট

সুভাষ সমাজদার । ৬.০০

শার্লক হোমস ক্লাব

অদ্রীশ বর্ধন । ৬.০০

জীবনানন্দ দাশের প্রেমের কবিতা ৫.০০

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ও প্রখ্যাত অপরাধ বিশেষজ্ঞ

কিশোর অপরাধী

গ্রন্থপ্রকাশ : C/o বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলি-১২

কোনও প্রত্যাবর্তন ঘটবে? কিংবা সত্য-বানের মতো তাঁরও প্রাণ-প্রত্যর্পণে বাধ্য হবে একালেও সেই মৃত্যু-অধিপতি? শুধু স্মৃতি দিয়ে সাঁকো তৈরী করছি, তাই সঠিক বলতে পারব না। মৌন অন্তরে অন্তরে মহা-আশঙ্কা নিরন্তর জপ করা চলছিল, এইটুকু মনে আছে। সেই সঙ্গে শুক্লা দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার মতো একফালি আশাও। জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে কম্পিত পায়ে তিনি তো দাঁড়িয়েছিলেন আগেও, "প্রান্তিক" এক বিন্দুতে। তবু ফিরেও তো এসেছিলেন সেবার। ইতিহাস কি নিজেকে আবৃত্ত করতে পারে না, আবার?

পারে হয়তো, করেনি। তাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পৌঁছে সেদিন দেখেছি চোখে চোখে আতঙ্ক, ইতস্তত অস্থির গুঞ্জন আর জটলা। একটু পরেই সেই শেষ সংবাদটি এল, ছুটির বাঁশি বাজল তাঁর; আমাদের ক্লাসের পর ক্লাসের। খবরের কাগজের বিশেষ সংস্করণ এই অমোঘ সত্যটাকে শিরোধার্য করে বেরিয়ে এল—"রবি অস্তমিত।"

থেকে থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি—তাঁর যাবার পথটা ধুয়ে ধূলিহীন করে দিচ্ছে। ওরই মধ্যে রাজপথ লোকে লোকারণ্য—সেই মহাযাত্রাপথের কিনারায় সিনেট হাউসের সিঁড়িতে আমরা—কখন তিনি আসবেন। ঢেউয়ের পর আসছে ঢেউ, ভেঙে ভেঙে ঢেউ ছড়িয়েও যাচ্ছে, সেই ঢেউ-এর চূড়োয়, তলায়, ফেনায় ফেনায় মহামান্য নেতা থেকে সামান্য মানুষে মানুষে গড়া জনতা মিলে মিশে একাকার। স্বচক্ষে দেখেছি। ডেথ দি লেভেলার—একটি মহামরণ সেদিন সমাজগত, খ্যাতিগত প্রতিষ্ঠাগত কুলীন-অকুলীনে প্রভেদ রাখেনি।

ওরই মধ্যে কখন একটু বৃষ্টি ধরল, শয়ান বনস্পতিকে বহন করে নিয়ে গেল অগণিত লোক; অথবা সবার আগে আগে ওই যে তিনি নিজেই বুঝি চলেছেন। চলে গেলেন।

সেই বিষাদে লিপ্ত-ব্যাপ্ত ভারাক্রান্ত অপরাহ্ণটিকে আজ এত দিন পরে কলমের আঁচড়ে আঁকা সহজ নয়। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতো ছড়িয়ে আছে স্মৃতি। শবানু-গমন? অসাধ্য আর অর্থহীন বলে করিনি। সন্ধ্যার পর একটি হস্টেলে সমানহৃদয় সতীর্থ-জনকয় শুধু মিলে বসে ছিলাম একটি গোল চক্রে—মৌন, স্তম্ভিত। প্রচণ্ড বিচ্ছেদ, অবধারিত এক-একটা প্রস্থান কখনও কখনও মানুষকে বাকহারা করে দেয়—এও সেই মূক অনুভূতি। ওরই মধ্যে হঠাৎ কে যেন ভারী গলায় তাঁরই গানের একটা কলি গেয়ে উঠল; ওরই মধ্যে টেবিলে চোখে পড়ল তাঁরই নির্বাচিত কবিতার একটি সংগ্রহ—"চয়নিকা", না "সঞ্চয়িতা?"

এতক্ষণ শক্ত ছিলাম, না পারছি সদা-সৃষ্ট শূন্যতাকে অনুধ্যান-অনুভব করতে; না আছে শক্তি "তবু শূন্য-শূন্য নয়" বলতে। ঠিক কী গেল আর কতখানি, তার পরিমাপ করার রুচিও নেই—মন এক অনির্দিষ্ট অন্ধকার দেশের প্রান্তে পৌঁছে স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু যেই চোখে পড়ল ওই কাব্যসংকলনটি, সেই মুহূর্তে নিজেকে আর ধরে রাখা গেল না, একটা আঘাত ভিতরটাকে আমূল কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। যেন এই দেখাটুকুরই অপেক্ষায় ছিলাম, প্রয়োজন ছিল—"সুইট মাই চাইলড, আই লিভ ফর দি" বলে ভেঙে পড়া সেই জননীর মতো। কতবার পড়া তাঁর ওই কবিতাগুলিকে সহসা বোধ হল এতদিনে যেন অনাথ, পিতৃহীন। স্রষ্টার অন্তর্ধানে তাঁর সৃষ্টিকে বড়ো করুণ লাগছে। আস্তে আস্তে বাষ্প জমছে চোখের পাতায়, মনের দিগন্তে আর আভিনা কালো কোমল ছায়ায়, টের পাচ্ছি, ঢেকে যাচ্ছে—সূর্য গ্রাসের সময়ে যেমন ঢাকে।

সবই মনে পড়ছে। পাশের বাড়ির বেতারে শোনা যাচ্ছিল নিমতলা মহাশ্মশান থেকে উদাত্ত-কম্পিত আবেগ-মথিত ধারা-বিবরণী। চলন্তমন্দ্র কণ্ঠস্বর—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের। অঝোর বর্ষণ তখন আর বাইরের প্রকৃতিতে নেই, সেই জল ধারা ঠাঁই নিয়েছে ঘরে ঘরে, টলমল মনের পর মনে। পরিবেশ যখন স্নাত সিক্ত স্নিগ্ধ, তখন বহ্নিমান চিতা জ্বলছিল গঙ্গার কূলে।

সেই চিতা দীর্ঘকাল ধরে নেভেনি। পরে আবেগ প্রশমিত হলে ধীরে ধীরে ভেবে দেখেছি, ভুল, সবই ভুল। ওই চিতায় পোড়ে না কিছুই, পোড়েনি। ভুল সংবাদপত্রের শিরোনামও। রবি অস্তমিত হয়নি। অনাথ, নিরাশ্রয় হয়নি তাঁর কবিতা ও কাহিনী, ছবি আর গান, তাঁর অপরিমাণ অলৌকিক সৃষ্টির পর সৃষ্টি। আসলে তিনি চলে গিয়েছিলেন স-সমারোহে ফিরে আসবেন বলেই। অথবা তিনি যানই-নি কোনও দিন। আসলে এঁদের বিষয়ে স্মরণযোগ্য শুধু আবির্ভাব তিথিটি। কেন না একদিন এঁরা আসেন, সেই সুকুমার-সম্ভবের ঘটনাগুলি অভ্রান্ত সত্য। কিন্তু যান না। রবীন্দ্রনাথও তাই। সেই মহান্ত পুরুষ সম্পর্কে "বেনামি" যদি নাও বলতে পারি, জানি বা নাই জানি, তাঁকে দেখেছি এই অহংকারটুকুই কি কম! রাখার জায়গা নেই। পরবর্তী প্রজন্মের উপর অন্তত ওইখানে আমাদের জয়—যিনি চিরপুরাতন হয়েও চিরনূতন, তাঁকে চোখে দেখাটাও বড় বিস্ময়।

তিনি আছেন, রয়েই গেছেন। আমার বর্ষপঞ্জীতে তাই পঁচিশে বৈশাখটাই সত্য; সোনার জলে জ্বলজ্বল করে; আর বাইশে শ্রাবণের মতো মিথ্যা আর কিছু নেই।

(২২ শ্রাবণ, ১৩৮০)

দেওবনের দিগন্তে
(শ্রেষ্ঠ পর্বত অভিযানের পুরস্কারপ্রাপ্ত) সুনীল চৌধুরী ॥ ৮·০০

মার্কিনী ষড়যন্ত্র
চিরঞ্জীব সেন ॥ ৬·০০

রক্তাক্ত খাইবার
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৯·০০

জানু ভানু কৃশানু
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১২·৫০

এক বিন্দু সুখ
(সিনেমায় আসছে) প্রফুল্ল রায় ॥ ৬·৫০

মোহনা
(মিষ্টি প্রেমের কাহিনী) বিমল কর ॥ ৪·৫০

কে ডাকে আমায়
(জন্মান্তরবাদের উপর লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই) তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ॥ ৭·০০

সাহিত্য প্রকাশ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

(সি ৭৭৫৮)

পূজা সংখ্যা মানেই আনন্দবাজার

এবারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা

রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা

অপঘাতে মৃতা নতুন বৌঠান, অকালমৃত পুত্রকন্যা, পরলোকগতা সহধর্মিণী, জ্যোতিদাদা, সত্যেন দত্ত, সুকুমার রায় প্রমুখ বহু প্রিয়জনের আত্মা বিভিন্ন সময়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেটে। পরলোকের সঙ্গে তাঁর রোমাঞ্চকর আলাপের বিশ্বস্ত বর্ণনা এই প্রথম সংকলিত হলো রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়ার মতো এই সুদীর্ঘ রচনাতে।

মৃত স্বজনদের আত্মার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'প্ল্যানচেট' মিডিয়াম মারফৎ আলোচনা, প্রতিটি প্রশ্ন, প্রতিটি উত্তর লিপিবদ্ধ হয়েও এতোদিন পড়েছিল শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে। লোকচক্ষুর আড়াল থেকে উদ্ধার করে এনে প্রায় দুই শতাধিক গ্রন্থপৃষ্ঠার এই রচনায় রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চার যাবতীয় তথ্য উপহার দিয়েছেন অমিতাভ চৌধুরী।

সঙ্গে মিডিয়াম মারফৎ আত্মার হাতের লেখার প্রতিলিপি।

এই সংখ্যার আরেকটি অবশ্যপাঠ্য সচিত্র রচনা
শ্রীপান্থ লিখিত
বিবাহ করিব সুখে ইংরাজ ললনা

৬টি উপন্যাস
সুবোধ ঘোষ
(দীর্ঘকাল পরে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি উপন্যাস লিখছেন)

সমরেশ বসু
রমাপদ চৌধুরী
দিব্যেন্দু পালিত
বুদ্ধদেব গুহ

শারদীয়া সংখ্যার ৬ষ্ঠ উপন্যাসটির লেখক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য। বিষয় ও রচনারীতিতে এই উপন্যাসটি এতোই অভিনব যে পাঠকগণ তরুণ এই লেখককে সাদর স্বীকৃতি জানাবেন।

একমাত্র আনন্দবাজারেই এঁরা উপন্যাস লিখছেন

২টি বড় গল্প
শংকর / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গল্প

শিবরাম চক্রবর্তী / মনোজ বসু / আশাপূর্ণা দেবী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র / সন্তোষকুমার ঘোষ / বিমল কর
গৌরকিশোর ঘোষ / অসীম রায় / মতি নন্দী
হিমানীশ গোস্বামী / শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি

কবিতা । চলচ্চিত্র

দাম ৮ টাকা মাত্র/সডাক ৯·২০
সেপ্টেম্বরের গোড়ায় প্রকাশিত হবে

ABPC-3 BEN

মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন নির্দেশ

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার বা যে সমস্ত পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস অন্যতম। বর্তমান দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যাচ্ছে তার অন্যতম কারণ হল ব্যাংক-গুলি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থসংস্থানে অতিরিক্ত ঋণ প্রদান; এই ঋণের একটি বড় অংশ উৎপাদন বাড়াবার কাজে ব্যবহৃত হয়নি বলেই অনেকের ধারণা। দেশে মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এ বছরের ৩০শে মে তারিখে রিজার্ভ ব্যাংক কয়েকটি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল; তার মধ্যে ছিল, ব্যাংক রেট ছয় শতাংশ থেকে সাত শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো, এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মোট আমানতের যে অংশ নগদ টাকায় রিজার্ভ রাখার কথা তার পরিমাণ তিন শতাংশ থেকে পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো। ১৯৭৩ সালের ২৯শে জুন থেকে নগদ টাকায় রিজার্ভ রাখার অনুপাত পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর নীতি কার্যকরী হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ২৯শে জুন থেকে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ৪২০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার তহবিল কাজে লাগানো হয়নি। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষ শুক্রবার থেকে আগস্ট মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ খুব বেশী পরিমাণে না বাড়লেও মোটামুটিভাবে বেড়েছে। এই সময়ের মধ্যে ব্যাংকের আমানত বেড়েছিল ৫৭৪ কোটি টাকা; খাদ্য সংগ্রহ নীতির অর্থসংস্থানে ও অন্যান্য কারণে ব্যাংকগুলি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ এই সময়ে ছিল যথাক্রমে ৯১ কোটি টাকা এবং ৪৩ কোটি টাকা। ১৯৭২ সালের অগস্ট মাসে ঋণ ও আমানতের অনুপাত ছিল ৬৯·১ শতাংশ; ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষে এই অনুপাত ছিল ৭০·৩ শতাংশ এবং আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে এই অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৬৭·৫ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে গত ৩০শে মে তারিখে যে সব মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতির সীমাবদ্ধ সফলতাই রিজার্ভ ব্যাংককে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি আরও কঠোর করতে অনুপ্রাণিত করেছে। রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্ট মাসের তিন তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকগুলি প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হয়েছে ১৩৩ কোটি টাকা। গত এক বছরে ব্যাংক আমানতের পরিমাণ বেড়েছে ৯৬৮ কোটি টাকা। এক বছরে প্রায় ২২ শতাংশ ব্যাংক আমানত বেড়ে যাওয়া খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, গত এক বছরে টাকার পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ১৭ শতাংশ। সেজন্য রিজার্ভ ব্যাংকের মতে এখন মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি আরও কঠোর করা দরকার যাতে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা প্রশমিত হতে পারে। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি যে ১৯৭৩-৭৪ সালে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়-সংকোচ করার নীতি গ্রহণ করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতেই রিজার্ভ ব্যাংক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতির আরও পরিবর্তন ঘোষণা করেছে।

মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক যে নতুন নির্দেশ দিয়েছে তার ফলে ব্যাংকগুলিকে তাদের মোট আমানতের পাঁচ শতাংশের পরিবর্তে সাত শতাংশ নগদ টাকায় জমা রাখতে হবে। ১৯৭৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে এই অনুপাত হবে ছয় শতাংশ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে এই অনুপাত হবে সাত শতাংশ। এই নতুন ব্যবস্থায় রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে ব্যাংক রেট অনুযায়ী ঋণ গ্রহণ করতে হলে যে-কোন বাণিজ্যিক ব্যাংককে সর্বনিম্ন net liquidity ratio আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ৪০ শতাংশ রাখতে হবে; ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে সর্বনিম্ন net liquidity ratio হবে ৪১ শতাংশ। ১৯৭৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে।

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য অতীতে রিজার্ভ ব্যাংক আর কখনই মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি এত কঠোর করেনি। মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই কঠোরতার উদ্দেশ্য হল ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কমানো। মুদ্রা-স্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তার মধ্যে টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা একটি অন্যতম গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যবস্থা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সরকার যখন ব্যয়-সংকোচের নীতি গ্রহণ করেছেন তখন একই সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি ঘোষণা করা সমীচীন হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রশ্ন উঠতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি প্রধানত অগ্রাধিকার প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলিতে—যেমন, কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়, খুচরা বিক্রেতা, স্ব-নিয়োজিত ব্যক্তি, রপ্তানি বাণিজ্য প্রভৃতি—যাতে ঋণ দেয় সেজন্য সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংকের দিক থেকে বরাবরের নির্দেশ দেওয়া আছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আমানতের পরিমাণও ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ঋণ নিয়ন্ত্রণ-কল্পে আমানতের ৭ শতাংশ নগদ টাকায় রাখার নিয়ম চালু করেও এবং রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে ব্যাংক রেট অনুযায়ী ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক-গুলিকে ৪১ শতাংশ সর্বনিম্ন net liquidity ratio রাখতে বাধ্য করেও ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির উদ্দেশ্য যে সন্তোষজনক-ভাবে কার্যকরী হবে তা সুনিশ্চিত বলা যায় না। আসল প্রশ্ন হল, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক-গুলি যে অগ্রাধিকার প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলিতে ঋণ দিচ্ছে সেই ঋণ উৎপাদন বাড়াবার কাজে ঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া। যদি অনুৎপাদনমূলক বিনিয়োগে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ ব্যবহৃত হয় এবং সেগুলি যদি সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংক অথবা রিজার্ভ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে তবে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা কঠিন হবে। শুধু মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা বর্তমানে সম্ভব নয়। আমাদের বর্তমান প্রয়োজন হল উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো। এক দিকে সরকারের ব্যয়-সংকোচ ও ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি আরও কঠোর করা এবং অন্য দিকে উৎপাদন বাড়ানো ও বর্ধিত উৎপাদনের সুষম বণ্টন করা—এই নীতিগুলি যদি একসঙ্গে সার্থক-ভাবে কার্যকরী হয় তবেই মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করা সম্ভব হতে পারে। মজুত-দার ও মুনাফাখোরদের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার নীতি প্রতিরোধ করা এবং ন্যায্য মূল্যে ভোগ-সামগ্রী বিক্রি করা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যার মোকাবিলা করার দায়িত্ব হল সরকারী প্রশাসনের। সরকারী প্রশাসন যদি সুদক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত না হয় তবে মজুতদারি ও কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করা সম্ভব হবে না। শুধু সরকারী ব্যয়-সংকোচ ও রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি কঠোরতর করাই সমস্যার সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সুব্রত গুপ্ত

ক্যানভাস আর্টিস্টস্ সার্কল-এর সভ্যবৃন্দ বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁদের একটি যৌথ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে ১৪ জন শিল্পীসভ্যের চিত্র ও ভাস্কর্য সমেত মোট ৩৯টি নিদর্শন দেখা যায়।

শিল্পীসমাজে ক্যানভাস সংস্থার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। গত কয়েক বছর যাবৎ এই সংস্থার শিল্পীসভ্যবৃন্দ কলকাতা ও অন্যান্য শহরে নিয়মিতভাবে প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছেন, সুতরাং এই সংস্থার বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। সম্পূর্ণ নতুন কোনও রীতি বা বিশেষ উল্লেখ্য রচনার সন্ধান না পাওয়া গেলেও প্রদর্শনীর নিদর্শনগুলি সুনির্বাচিত, যদিও দুএকটি দুর্বল রচনাও চোখে পড়ে। প্রগতিবাদী হলেও প্রত্যেক শিল্পী আপন আপন পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কাজ করেছেন এবং প্রদর্শনীতে বিমূর্ত সমবিমূর্ত, প্রতীকমূলক, আলঙ্কারিক ও সাররিয়ালিস্টিক ছবিও দেখা যায়, কয়েকটির কারুকার্যও দ্রষ্টব্য। ভাস্কর্য বিভাগেও বিশেষ উল্লেখ্য কোন নিদর্শন চোখে পড়েনি। সকলেই কাঠ, প্লাস্টার ও অ্যালুমিনিয়ম মাধ্যমে কাজ করেছেন—একজনের কাজে আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রভাব দেখা যায়। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অলোক ভট্টাচার্য, বরেন বসু ও স্বপ্নেশ চৌধুরী। তুমুল ঝড়ের মধ্যে দুজন মাঝি কিভাবে নৌকা ও প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে, প্রথম জন স্টর্ম-এ তাই প্রকাশ করেছেন। ড্রয়িং ও কম্পোজিশনের দিক থেকে এটি চোখে পড়লেও দীর্ঘতর ক্যানভাস ব্যবহার করলে ভয়াবহ পরিবেশ আরও স্পষ্ট হত। ইমপ্রেশনিস্টিক রীতিতে আঁকা কয়েকটি মূর্তির মধ্য দিয়ে বরেন বসু একটি প্যানেলে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন (হরে রাম হরে কৃষ্ণ) ও সেই সঙ্গে ওপরের অপেক্ষাকৃত একটি ছোট প্যানেলে রিলিফ জাতীয় রচনার মধ্য দিয়ে দেশের ঐতিহ্য প্রকাশ করেছেন। ছবিটি অনেকের ভাল লাগে। আন্দামানের প্রাকৃতিক শোভা ও আন্দামানবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই স্বপ্নেশ চৌধুরী এক্সপ্রেশনিস্টিক রীতিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন (গ্লিম্পসেস অব আন্দামানস সি)। এই শিল্পীর রঙ নির্বাচন ও বিশেষ করে বরুশ মাধ্যমে প্রকাশভঙ্গী লক্ষণীয়। রঙ ব্যবহারের কৌশল, সূক্ষ্ম কারুকার্য ও বক্তব্য প্রকাশ করার ভঙ্গীর জন্য সুবীর চৌধুরীর ট্রাপিজ অনেকের চোখে পড়ে—বিশেষ করে শূন্যে দোদুল্যমান মূর্তিটি তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে লাল নীল ও সবুজ রঙ প্রধান অলঙ্কার জাতীয় রিটার্ন-এরও নাম করা চলে। কম্পোজিশন, পরিপ্রেক্ষিত ও সরলতার জন্য শক্তি চৌধুরীর মেজো প্যাটিনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ত্রিদিব চন্দ্রের নিদর্শনগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তবে প্রচেষ্টা হিসাবে সাররিয়ালিস্টিক নিদর্শন গোলডেন ড্রিম-এর নাম করা যায়। টেম্পারা মাধ্যমে বিষ্ণু দাস তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম ও কোমল স্তর ভেদ সৃষ্টি করেছেন—এই প্রসঙ্গে পোর্ট্রেট ২-এর উল্লেখ করা যায়। পরিমল দত্ত তাঁর প্রতীকমূলক রচনার মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন—ড্রয়িং ও প্রকাশভঙ্গীমার জন্য রাইজিং-এর নাম করা চলে। প্রতীকপ্রধান নিদর্শন হিসাবে বলাই কর্মকারের প্রিজনার-এরও নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কারাগারের লোহার গরাদের মধ্যে গভীর রক্তবর্ণ একটি চক্ষুতারকার ভিতর দিয়ে শিল্পী বন্দীজীবনের নিষ্ফল ক্রোধের বার্থতার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। রথীন রায়ের নিদর্শন-

ফুটবল খেলা শিখতে হলে, ফুটবল খেলা শেখাতে হলে,
ফুটবল খেলা বুঝতে হলে এই বইটি চাই-ই চাই।
ক্রীড়া-সাংবাদিক শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ফুটবল শিখতে হলে ৫্

ফিয়োলা, ডকার্টি, বুসবি, হিডেকুটি, হারবারজার, হেরেরা প্রভৃতির মতো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কিভাবে তাঁরা খেলা শেখান তার বিস্তারিত এবং সচিত্র বিবরণ।

মুস্তাক আলির

ক্রিকেটার মুস্তাক আলির স্মরণীয় ক্রিকেটজীবনের রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

ক্রিকেট খেলি আনন্দে ৯্

গ্রন্থপ্রকাশ : C/o বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলি-১২

আসন্ন প্রকাশিতব্য অমর-সাহিত্যের নূতন বই
মন্মথনাথ ঘোষের

ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা

॥ দাম পাঁচ টাকা ॥

আশাপূর্ণা দেবীর

ওরা বড় হয়ে গেল ৫্

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্য সৃষ্টি

অশনি সংকেত

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা মর্মস্পর্শী উপন্যাস ॥ ৫·৫০ ॥

অমর সাহিত্য প্রকাশন : ৭ টেমার লেন, কলি-৯

(সি ৭৭৫০)

আপনার শিশু সন্তানদের জন্য এমন টুথব্রাশ চাই যে দাঁতের পক্ষে ভালো অথচ মাড়ির ক্ষতি করে না

তিন বছরের চেয়ে ছোটদের জন্য বিনাকা বেবি আর তাদের চেয়ে বড় বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বিনাকা জুনিয়র এই দুই ধরনের টুথব্রাশই ছোটদের ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি খেলনার মত দেখতে রঙিন মোড়কেও পাওয়া যায়

বুরুশের ডগা এমন সুচারুভাবে গোল করা যে কচি মাড়ি বা দাঁতের এনামেলের কোনো ক্ষতি হয় না।

CIBA

কোমলতা — বিনাকা টুথব্রাশ

Interpub/CBP-6A/73-BN

গন্ধীর ভাস্কর্য জাতীয়। রঙের স্তরভেদ মাধ্যমে তিনি নানা আকারের সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন—রেড ও ইয়েলো মন্দ লাগেনি। সুর্যেন্দুশেখর রায়ের কাজে আলঙ্কারিক রূপ বিশেষভাবে চোখ পড়ে। লোকচিত্র অবলম্বনে রচিত ওয়ারিয়র এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। নিখিলবরণ সেনগুপ্তের রচনায় কোলাজ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, যেমন ট্রুথ রিলেমস। ভাস্কর্য বিভাগে মাত্র দুজন শিল্পীর কাজ দেখা যায়—সুধীর ধর ও মানিক তালুকদারের। সুধীর ধর প্লাস্টার ব্যবহার করেছেন, দু একটি প্রতিকৃতি মন্দ লাগেনি। এই প্রসঙ্গে পোর্ট্রেট-বি উল্লেখ্য। আর একটি নিদর্শন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—কমপোজিশন-২। নৃত্যরতা যুবতী একটি পায়ের ওপর আর একটি পা রেখে অপরূপ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। পরিকল্পনা, গঠনপদ্ধতি ও বিশেষ করে পেলব ভঙ্গীর জন্য এই ছোট্ট নিদর্শনটি অনেকেরই ভাল লাগে। মানিক তালুকদার তরুণ ভাস্কর হিসাবে সুপরিচিত। বস্তুত, পরীক্ষামূলকভাবে আধুনিক নানা রীতিতে বিভিন্ন নিদর্শন সৃষ্টি করে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রদর্শনীতে প্রথাগত ও আধুনিকধর্মী উভয় নিদর্শনই দেখা যায়। সম্মুখে ও পিছনে বিভিন্ন আকার সৃষ্টি করে পেয়ার-এ তিনি (প্লাস্টার) সুন্দর পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছেন—এটির নিছক আদিম জাতীয় সরলতা সহজেই ধরা পড়ে। পরিকল্পনার দিক থেকে ডিজাইন ফর মনুমেণ্ট-এরও নাম করা যায়, তবে অ্যালুমিনিয়ম পাতে গঠিত আকারবৈচিত্র্য প্রধান নিদর্শনটি উচ্চতর হলে সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ হত। কাঠ ও অ্যালুমিনিয়ম মাধ্যমে তৈরী পেণ্ডুলাম গতিশীল ভাস্কর্য নিদর্শন হিসাবে অনেকের চোখে পড়ে। এটিতে আমেরিকার ভাস্কর্যরীতির প্রভাব সহজেই ধরা পড়ে। একটি [illegible] ফ্রেমের মধ্যে ঝুলন্ত এক [illegible] পেণ্ডুলাম—সেটি সততই আন্দোলিত হচ্ছে। গতিশীল নিদর্শন হিসাবে যদিও উল্লেখ্য কিন্তু পেণ্ডুলামের আকার বিষয়ে শিল্পী অধিকতর সচেতন হলে নিদর্শনটি যে আরও আকর্ষণীয় হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চিত্রপ্রিয়

নোংরা ভান

সুভাষ সিংহ

বন্ধ দরোজার কাছে ওকে ছেড়ে লোকটা মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। আলো লম্বা বারান্দার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এখন বাজে প্রায় সাতটা। রাত নটা পর্যন্ত তাকে এখানে থাকতে হবে। দরোজার গায়ে আঁটা নেমপ্লেট : অশোক মালহোত্রা। শূন্য বারান্দা। কি ভেবে আলোর রূপসী মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে উঠল। আলো বেশ লম্বা, সুন্দর মুখশ্রী। তার বয়স চব্বিশ। সে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে রুমাল বের করে আলতোভাবে মুখ মুছল। তারপর চকিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে বন্ধ দরোজার উপর টোকা মারল কয়েকবার।

দরোজা খুলল অশোক মালহোত্রা হাসি-মুখে ডাকল আলোকে, কাম ইন।

আলো অশোক মালহোত্রাকে অনুসরণ করে সোজা শোবার ঘরে এল। ধবধবে বিছানা, ডানলোপিলোর গদি। ডবল বেড। জানালা বন্ধ। অল্প স্পীডে পাখা ঘুরছে। সুন্দর একটা গন্ধ ছড়িয়ে আছে ঘরের ভিতর। ঘরের এক কোণে ছোট্ট টেবিলের উপর ফ্লাওয়ার ভাসে টাটকা রজনীগন্ধা। টেলিফোন। পাশে স্টীলের আলমারি। দরোজার বাঁ দিকে নরম সোফা, সামনে ছোট্ট গোল টেবিল। টেবিলের উপর স্কচ হুইস্কির বোতল আর দুটো সুদৃশ্য কারুকার্যময় কাচের গ্লাস। ছাইদানির ভিতর থেকে অল্প ধোঁয়া সুতোর মত পাকিয়ে পাকিয়ে উপরে উঠছে।

নিঃশব্দে আলো পোশাক খুলতে যায়। তখন অশোক মালহোত্রা আলোর দু কাঁধে হাত রেখে মিষ্টি হেসে বলে, ডোণ্ট হারি ডিয়ার। কি লক্ষ্মী মেয়ে। কি নাম?

কাঁধের উপর লোমশ দুটি হাত। হাত-ভর্তি যাদের এত কালো চুল হয়, তারা নাকি কামুক। লোকটা অথবা ভদ্রলোকটির ত্রিরিশের উপর বয়স হবে না মনে হয়, চেহারাটা ভাল। হ্যাঁ, সুপুরুষ। পরনে ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা ধবধবে পাজামা।

আলো না হেসে বলে, কি হবে নাম জেনে?

—আপত্তি আছে? অশোক মালহোত্রা আলোর হাত ধরে টেনে পাশাপাশি সোফায় বসে হাসল, ঘরে ঢোকার আগে নিশ্চয়ই আমার নামটা চোখে পড়েছে তোমার। নাম না জানলে কথাবার্তা বলে সুখ নেই। ডিয়ার, তোমার মত একটি সুন্দর মেয়েই আজ রাত্রে আমি চাইছিলাম।

আলো হাসল, আপনি তো আমার নাম জানেন, কেন মিছিমিছি না-জানার ভান করছেন!

আলোর মনে হল এই সুন্দর ঘরটায় এখন বড্ড গুমোট। তার মুহূর্তে দম বন্ধ হয়ে এল। সে দুচোখ বন্ধ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল কয়েকবার।

অশোক মালহোত্রা সঙ্গে সঙ্গে সোফা ছেড়ে উঠে ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিল। তার মুখে মৃদু হাসি। সে দুটো গ্লাসে মদ ঢেলে একটা সিগারেট ধরাল। তখন ক্রিং, ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল।

—ড্যাম্ড ডিসটার্বিং! অনেকটা বিরক্তির সঙ্গে অশোক মালহোত্রা টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায়।

নীচু গলায় টেলিফোনে কথা বলছে অশোক মালহোত্রা। আলো শাড়ি ব্লাউজ ঢিলেঢালা করে অনেকটা স্বস্তি পেল। গ্লাস উপচে উঠছে ফেনায়। দামী মদ। ধবধবে দেয়ালে রুচিসম্মত মিশরের ছবি। আড়চোখে একবার ঘড়ি দেখল আলো। কথা বলেই কি সমস্ত সময় কাটিয়ে দেবে লোকটা? যা খুশি করুক, নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সে চলে যাবে। টাকা তো আগেই পেয়েছে। এক শো টাকা। এই ডিসেম্বরের শীতেও সে ঘামছে কেন?

অশোক মালহোত্রা ফিরে এসে সোফায় বসে একটা গ্লাস আলোর সামনে ধরে বলে, একটু চুমুক দিয়ে দ্যাখ, ভীষণ ভাল লাগবে।

—যদি না খাই...অবশ্য আপনি ফোর্স করলে খেতে হবে।

—অভ্যেস নেই বুঝি? কখনও কি খাওনি?

—যখন কেউ বাধ্য করে...আচ্ছা দিন—বেশি খেতে ইনসিস্ট করবেন না।

এক চুমুকে অনেকটা পান করল আলো। মুখটা সামান্য বিকৃত হয়ে উঠে ওর। এখন বোধ হয় লোকটা ওকে সিগারেট খেতে বলবে। ঘন ঘন গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে অশোক মালহোত্রা। আস্তে আস্তে ওর সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠছে। সে আলোকে দুহাতে শূন্যে তুলে কোলের উপর বসাল। মুখোমুখি।

আলোর ভাবলেশহীন মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন খুঁজে বেড়ায় অশোক মালহোত্রা। ঘন ঘন আলোর মুখে বুকে কাঁধে চুম্বন করল সে।

—বিছানায় চলুন। আলোর কণ্ঠস্বর নিরুত্তাপ। দুচোখের দৃষ্টি মরা মাছের মণির মত।

—এত তাড়া দিচ্ছ কেন! ডিয়ার, কিস মি।

—আমি কিন্তু নটার সময় চলে যাব। আর মাত্র এক ঘণ্টা।

—আঃ মুড নষ্ট ক'রো না! অশোক মালহোত্রা বড় একটা পেগ এক চুমুকে নিঃশেষ করে আলোর কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, সারা রাত তুমি আমার পাশে থাকবে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠতে যায় আলো। পারে না, কেননা সবল দুহাতে ওকে জড়িয়ে আছে অশোক মালহোত্রা। একটা ভয়ঙ্কর অজগর সাপের কঠিন আলিঙ্গনে ডানাভাঙা পাখির মত ছটফট করতে করতে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে ওঠে আলো। কিন্তু এই দুর্বলতা মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে।

—ছাড়ুন! নটার এক মিনিট বেশি আমি থাকবো না।

—ডিয়ার, রাগলেও তোমাকে টপ্ দেখায়। দুষ্টুমী কর না, তোমার জন্যে বড় হোটেল থেকে খাবার এনেছি, জাস্ট আমাকে একটু আনন্দ দাও। জান, দিনরাত এই ব্যবসার পিছনে ঘোরা, বাজে কতগুলি লোকের সঙ্গ, ভারী বিশ্রী এসব।

আলো কর্কশ কণ্ঠে বলে, সারা রাত ধরে আনন্দ...আমি কোনদিন সারা রাত বাড়ির বাইরে থাকিনি। নটা পর্যন্ত থাকতে হবে এই শর্তে এসেছি।

অশোক মালহোত্রার হাত প্রতি মুহূর্তে আলোর সর্বশরীরে জোঁকের মত ঘুরে বেড়ায়। এই লোকটা ভারী বেয়াড়া ধরনের। ডেঞ্জারাস টাইপ। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে ওকে বিছানায় টেনে নিয়ে যেত। এতক্ষণ এড়িয়ে থাকতে পারত না।

—এমন একটা মিষ্টি মেয়েকে ছেড়ে কি রাতে আমার ঘুম আসবে?

আলো কঠিন চোখমুখ করে বলে, লুক মিঃ মালহোত্রা, ডোণ্ট ইনসিস্ট মি টু স্টে উইথ ইউ ফর দি হোল নাইট।

—আই উইল! অশোক মালহোত্রা আলোর ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

—আমি চিৎকার করে লোকজন ডাকবো। বলে আলো শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে অশোক মালহোত্রার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করল।

—কেন এমন করছো ডিয়ার? তোমাকে আমি এক শো টাকা দিয়েছি, আর দু শো টাকা দেব। কি এবার খুশি তো? আর একটু খাও, মেজাজ ফিরে পাবে।

—না! মুখ ফিরিয়ে কান্নার সুরে আলো বলল, প্লীজ, আমাকে সারা রাত থাকতে বলবেন না! আমাকে বাড়ি ফিরে যেতেই হবে।

—স্বামীর কাছে ফিরে যাবে? অশোক মালহোত্রা তীব্র শ্লেষের সুরে বলে, তুমি কি কখনও রাত্রে বাইরে থাকনি? কি ভাব নিজেকে—আফটার অল তুমি একজন...! যাক গে ডিয়ার, ঝগড়া করে এই সুন্দর রাতটাকে নষ্ট করতে চাই না।

আলো বুঝল এই লোকটার সঙ্গেই তাকে সারা রাত থাকতে হবে। সে মনে মনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হল। চিৎকার করে লাভ নেই—এই অচেনা জায়গায় কেউ এগিয়ে আসবে না। বরং বিপদের আশঙ্কা বেশি।

—আমি একটু বাথরুমে যাব। আলো নিচু গলায় বলল।

—আর ইউ সিওর?

—হোয়াট ইউ মিন? দু চোখে আগুন জ্বেলে অশোক মালহোত্রার দিকে তাকাল আলো।

—সুইসাইড করে আমাকে বিপদে ফেলবে না তো? অশোক মালহোত্রা মিটমিট করে তাকায়। ডিয়ার, তুমি এত নরম, এত ইমোশানাল! আই লাইক দিস টাইপ অফ গার্ল।

আলো হাসল, দয়া করে বাথরুমটা দেখাবেন?

বাথরুমে ঢুকে আলো দড়াম করে দরোজা বন্ধ করল। সে জানে, লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে সে না বেরনো পর্যন্ত। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আলো আয়নার সামনে দাঁড়াল। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে। তাকে এভাবে দেখলে অরুণেশ ...আঃ আবার এসব ভাবা কেন! কে অরুণেশ? সে এখন কাউকে চেনে না। অতীত তার কাছে মৃত। ভবিষ্যতের কোন চেহারা তার কাছে স্পষ্ট নয়। জন্মজন্মান্ত বর্তমান নিয়েই তার কারবার। অরুণেশ কেন এখনও তার কাছে আসে? কি আশায়? চমকে এদিক ওদিক তাকাল আলো। দরজায় নক করছে লোকটা। ভয় পেয়েছে ওই বাস্টার্ড মালহোত্রা। সে নাকি সুইসাইড করতে পারে! ইডিয়ট একটা, শালা কোন [illegible] সুইসাইড করবো? [illegible] মত [illegible] পেয়েছে...।

[illegible] জল ছিটিয়ে [illegible] পরে আলো বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

দূর থেকে আলো দেখল বাড়ির সামনে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। মা, তপন, গীতা আর পাশের বাড়ির কয়েকজন। বাবা বেঁচে থাকলে তাকেও [illegible] এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখত সে। এমন শীতের

সিগনেট প্রেসের বই

খাতাঞ্চির খাতা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটদের মনের এক আশ্চর্য খোরাক অবনীন্দ্রনাথের 'খাতাঞ্চির খাতা।' বড়রাও পড়তে পড়তে ছোট হয়ে-যাওয়ার মিষ্টি এক অনুভূতির আস্বাদ পাবেন। অর্ধশতাব্দী পরে প্রকাশিত 'খাতাঞ্চির খাতা' শুধু গল্প নয়, অবনীন্দ্রনাথের কলম-তুলিতে আঁকা এক বিচিত্র রঙিন চিত্র। দাম ৩.৫০

নূতন সংস্করণ : সুকুমার রায়

আবোলতাবোল ২.২৫, ৩, ঝালাপালা ৪,
পাগলা দাশু ২.৫০, ৩.২৫ হযবরল ১.৫০
খাইখাই ২.২৫, ৩, বহুরূপী ২.২৫, ৩,
বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ ২.৫০

সিগনেট বুকশপ : ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

(সে ৭৭০৩)

ভোরে আলো এক ঝলক আন্ত হাওয়ায় কেঁপে উঠল।

—কি ব্যাপার? আলো ভ্রূ কুঁচকে মার দিকে তাকাল, আগে ঘরে চল, তারপর কথা হবে। বলে সে কোন দিকে না তাকিয়ে দ্রুত এগিয়ে যায়।

টালির ছাদ, বাঁশের বেড়া। জবর দখল কলোনী। বাস্তুহারা। আড়াই কাঠা করে প্রত্যেকের জমি। আশেপাশে ক্রমশ মানুষজনের ঘরবাড়ি পাকা হয়ে উঠছে। একতলা দালানের সংখ্যাই বেশি। রাস্তাঘাট ভাল হয়েছে, বিজলীবাতি এসেছে অনেক বাড়িতে।

একটা বড় ঘর। এই ঘরে মা তার দুই ছেলে নিয়ে ঘুমোয়। অন্য ঘরটা ছোট—আলো আর গীতার জন্যে। আলোর থেকে অন্যান্য ভাইবোন অনেক ছোট। আলোর চেয়ে আট বছরের ছোট গীতা, গীতার পর তপন, সবচেয়ে ছোট স্বপন। স্বপন আজ কয়েক বছর শয্যাশায়ী। ক্রমশ ওর পা দুটো শুকিয়ে যাচ্ছে। অন্যের সাহায্য ছাড়া বিছানা থেকে উঠতে পারে না।

বালিশে হেলান দিয়ে স্বপন জানলা দিয়ে বাইরের বিশাল আকাশের সামান্য কিছুটা অংশ দেখছিল। গীতা, তপন আর স্বপন পর পর দু'বছরের ছোট বড়। ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছিল স্বপন। ওর কচি মুখে এখন এক ধরনের বিষাদ ছড়িয়ে আছে।

ঘরের এক কোণে জানালা ঘেঁষে স্বপনের ছোট্ট তক্তপোশ। সস্তা কাঠের একটা টেবিলের উপর কয়েকটা ওষুধের শিশি। আলো ব্যাগের ঠোঙাটা টেবিলের উপর রেখে স্বপনের কপালে হাত দিয়ে জ্বর আছে কিনা দেখল।

—আলো!

মুখ ফিরিয়ে আলো ওদের দেখল মার মুখ থমথমে। গীতা আর তপন গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে। স্বপনের দু'চোখের দৃষ্টিও আশাপ্রদ নয়।

আলো গম্ভীর মুখে বলল, তোর এখানে কি চাস—পড়াশুনা নেই?

গীতা আর তপন সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে চলে যায়।

—মা, আমি জানি, রাত্রে তুমি ঘুমোতে পার নি। আলো সামান্য হাসার চেষ্টা করল, কি করবো বল, রেখা কিছুতেই ছাড়ল না। আঃ, ওভাবে তাকিয়ো না! রেখা আমার সঙ্গে কাজ করে—ওর কথা এর আগেও বলেছি। ওর কালকে বিয়ে হয়ে গেল—আমি কি জানি ও আমাকে এভাবে আটকে রাখবে?

স্বপন ঠোঁট উলটে বলে, মা, বড়দি মিথ্যে কথা বলছে।

—কি বললি? বলে আলো আর

বিমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রকাশিত অপ্রকাশিত যাবতীয় রচনাবলীর একমাত্র প্রামাণ্য সংগ্রহ। ১ম খণ্ড ২০.০০। মোট চার খণ্ডে প্রকাশিতব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দাম : ১৫·০০

যাঁরা পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁরা ২০% কমিশন পাবেন।

তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের **শেষ কোথায়** নতুন উপন্যাস ৪.৫০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **বিদূষক** নতুন মুদ্রণ ৪.৫০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ **অসবর্ণ** দাম : ৫.০০

বনফুলের **অধিকলাল** ২য় মুদ্রণ ৪.৫০
নিমাই ভট্টাচার্যের **উইং কমাণ্ডার** ৩য় মুদ্রণ ৬.০০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **প্রণয়পাশা** ২য় মুদ্রণ ৬.০০

শংকর-এর
এপার বাংলা ওপার বাংলা ২৯শ মুদ্রণ ১০.০০
মানচিত্র ২২শ মুদ্রণ ৬.০০
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ২২শ মুদ্রণ ৫.৫০ **রূপ তাপস** ১০ম মুদ্রণ ৪.৫০

জবরঘুরে ও জানালা ৬·৫০ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী
যত দূর মনে পড়ে ৩·৫০ ॥ নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
অপ্রকাশিত রচনাবলী ৮·৫০ ॥ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রায়ণ ১ম ১২·০০ ॥ পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত
সাংস্কৃতিকী ২য় ৬·৫০ ॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
দেবীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
আধুনিক কবিতার ইতিহাস দাম : ৭.৫০

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শংকরীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত
বিশ্ববিবেক
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীতে পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। ২য় সংস্করণ ১২.০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
নিশিপদ্ম ৯ম মুদ্রণ ৪.৫০
ব্যর্থ নায়িকা ২য় মুদ্রণ ৪.০০

ওংকার গুপ্তের
ব্যাপার বহুতর সুচিত্র ব্যঙ্গ রচনা ৫.০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
পৌষ ফাগুনের পালা ৫ম মুদ্রণ ১৮.০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
গরীয়সী গৌরী ৫ম মুদ্রণ ৬.০০

চাণক্য সেনের
তিন তরঙ্গ ৩য় সং ৭.০০
শুধু কথা ২য় মুদ্রণ ৩.৫০

নমিতা চক্রবর্তীর
অহল্যা রাত্রি ৯.০০

ডঃ নবগোপাল দাসের **দুই নারী** ৬.০০
শৈলেন রায়ের **সোনালী দুপুর** ৪.০০
সমরেশ বসুর **জগদ্দল** ২য় মুদ্রণ ১৫.০০

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯

॥ নাটক ॥

প্রবোধবন্ধু অধিকারী সম্পাদিত

এই দশকের সেরা নাটক

প্রথম খণ্ডতে আছেঃ ডঃ মুনীর চৌধুরীর (বাংলা দেশ) 'রক্তাক্ত প্রান্তর', অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'মারীচ সংবাদ' ও সমরেশ বসুর 'ছুটির ফাঁদে' (নাট্যরূপঃ অসিত ঘোষ) তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংকলনটির দাম মাত্র ৭.০০ (যন্ত্রস্থ)

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য (বাক্স)

অমর শহীদ গদাই ৩.০০

তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (সাসপেন্স)

রক্তে রাঙা সিঁথি ৩.৫০

শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্ত্রী বর্জিত)

সূর্য ওঠার আগে ৩.০০

স্বপন সেনগুপ্ত

সূর্যমুখী ফুল ৩.৫০

শ্যামলতনু দাসগুপ্ত (একাংক)

॥ উপজিত বিসর্জন ॥ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ॥

চারণ দলের ৩টি একাংক

হিমালয়ের থেকেও ভারি ॥ খাজারের

গপ্পো ॥ বাজী ॥ ৩.৫০

শেখর চট্টোপাধ্যায়ের (একাংক) ৩.৫০

॥ পতঙ্গ ॥ প্রতিধ্বনি ॥

সত্যপ্রকাশ দত্ত (যাত্রা নাটক)

আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম ৪.০০

সুনীল দত্ত সম্পাদিত

একালের একাংক

এতে আছে ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাগদি পাড়া দিয়ে' নাট্যরূপ মিহির চট্টোপাধ্যায়। শ্রেণ্ট অবলম্বনে 'ভুবনপুরের পথে' রূপান্তর অরুণ সরকার। ও হেনরীর গল্প অবলম্বনে সৌমেন চট্টোপাধ্যায়ের সূচীপত্র। অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি সমীক্ষা'। ব্রেখ্‌ট অবলম্বনে স্বপনকুমার মিত্রের 'মুক্তির হাইফেন'। নবকুমার ভট্টাচার্যের 'অন্য নাটক'। জগমোহন মজুমদারের 'মোরেটির নাম' বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এরা কারা'। বসন্ত ভট্টাচার্যের 'রূপোলী মাটি'। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 'ঝড়ের পাখী' দীপংকরকুমার নন্দীর 'আমি কি বলবো'। সমরেশ বসুর 'আদাব' নাট্যরূপ শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ভূর্জ খণ্ড ॥ ৮.০০

নাট্যপ্রবন্ধ

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

নাট্যতত্ত্ব পরিচয় ॥ (যন্ত্রস্থ) ১০.০০

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন ঃ ৩৪-২২১৮

নিজেকে সামলাতে পারল না, একটা চড় মারল স্বপনের গালে। স্বপন কাঁদল না। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখল।

মা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আলো সর্বাঙ্গে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করল। দু'চোখ জ্বলে যাচ্ছে। সে নিজের ঘরে এল। ওকে দেখে তপন বই হাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আলো পোশাক খুলতে খুলতে আড়চোখে গীতাকে দেখতে থাকে। গীতার বেশ বাড়ন্ত শরীর। প্রায় ওর সমান লম্বা হয়ে উঠেছে। কিন্তু বড্ড রোগা। পড়াশুনোয় বিশেষ সুবিধের নয়। মা বোধ হয় তার কথা বিশ্বাস করেনি। মা আজকাল তার সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না। মাঝে মাঝে ওর শরীরে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে কি যেন খুঁজে বেড়ায়।

স্নান সেরে চা আর কিছু খেয়ে আলো বিছানায় শুয়ে পড়ল। গীতা ও ঘরে পড়ছে। দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে এল আলোর।

—দিদি।

—কি? আলো প্রাণপণে দু'চোখ খুলে তাকাল। আশাক মালহোত্রা সারারাত তাকে ঘুমোতে দেয়নি। স্বপনটা একটু কাঁদল না কেন? কি চায় গীতা? আর আমাকে বিরক্ত করিস না। তোদের চাহিদার অন্ত নেই। আর আমি পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, একদিন তোদের সবাইকে ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাই। প্রতি মুহূর্তে স্বপন আমাকে পিছন থেকে টেনে ধরে।

গীতা বলল, এই চিঠিটা অরুণদা তোমাকে দিতে বলেছে। বলে সে আলোর হাতের মুঠোয় একটা খাম গুঁজে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

চিঠি মুঠো করে আলো ঘুমিয়ে পড়ল।

দুপুরবেলা ঘুম ভাঙল আলোর। সে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল বিছানায়। হাতের মুঠো থেকে ছিটকে পড়ল কাগজের টুকরো। তখন মনে পড়ল আলোর, গীতা তার হাতের মুঠোয় কি যেন গুঁজে দিয়েছিল; হ্যাঁ, মনে পড়েছে, অরুণদার চিঠি। সে নীচু হয়ে ঝুঁকে কাগজের টুকরো তুলে আস্তে আস্তে খুলতে থাকে।

"আলো, তুমি কোন্ অফিসে চাকরী কর—আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না। অনেকদিন জিজ্ঞেস করেছি তুমি সঠিকভাবে আমাকে কিছু জানাওনি। অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় না। প্রায়ই তোমার জন্যে বসে থাকি, স্বপনের কথা ভাবলে আমার বড় কষ্ট হয়। জান আলো, আমি সম্প্রতি একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছি—মনে হয়, শেষ পর্যন্ত চাকরীটা হয়ে যাবে। এখন আর এ সম্পর্কে কিছু বলবো না। তোমার ঘিরে আমার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা। মনে হয়, মাসীমা আমাকে অপছন্দ করেন না। তুমি ইদানীং ভীষণ বদলে গেছ। আগামীকাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ তোমার জন্যে সেই জায়গাটায় অপেক্ষা করব। প্লীজ এসো, অনেক কথা আছে। ইতি অরুণেশ।"

চিঠিটা পড়ে আলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর সে রান্নাঘরে এল। মা জ্বলন্ত উনুনের সামনে দু'হাঁটুর উপর মুখ রেখে চুপচাপ বসে আছে। একবার মুখ ফিরিয়ে আলোকে দেখে পরক্ষণেই অন্য দিকে তাকাল মা।

—রান্না এখনও হয়নি? আলো একটা পিঁড়ি পেতে বসে বলে তোমার শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গেছে মা, ডাক্তারকে দেখিয়ে ওষুধ খাও।

—আমি আর এভাবে বাঁচতে চাই না! মা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, তোর বাবা বেঁচে থাকলে...কে জানত মানুষটা এভাবে হঠাৎ...একটা পয়সাও রেখে যেতে পারেনি...।

—থামো! আলো তীব্রভাবে বলে, এসব পুরনো কথা বলে কি আনন্দ পাও জানি না। তুমি কথায় কথায় ওভাবে চোখের জল ফেলবে না।

—লক্ষ্মী মা আমার! মা দু'চোখের জল মুছে কাতর কণ্ঠে বলে, আর কোনদিন এভাবে রাত্রে বাইরে থাকবি না। শত হলেও তুই বয়স্থা মেয়ে, লোকের মুখ তো আর বন্ধ করা যায় না।

—লোকের মুখে ঝাঁটা মারি! আলো ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে, বল মা কে আমার সম্পর্কে তোমার কাছে কুৎসা করেছে?

মা সভয়ে বলে, চুপ কর আলো!

—না, আমি অনেক সহ্য করেছি। শোন মা, যারা আমার সম্পর্কে তোমার কাছে কিছু বলতে আসবে—তাদের তুমি ছেড়ে দেবে না, তাড়িয়ে দেবে।

মা চুপচাপ আলোর সামনে ভাত বেড়ে দেয়। আলোর খেতে ভাল লাগে না। অথচ খিদে পেয়েছে খুব। সে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। মা সব বুঝতে পারে। মার দু' চোখের দিকে আলো আজকাল সোজাসুজি তাকাতে পারে না।

—একটা কথা বলবো?

—বল।

—অরুণ রোজ এসে তোর জন্যে বসে থাকে। ওর কোন কথার জবাব দিতে পারি না। আচ্ছা আলো, তোর অফিসের ঠিকানাটা লিখে আমাকে দিস—অরুণ চেয়েছিল।

আলোর দু'চোখের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে ধারালো হয়ে উঠল, অরুণদার কি দরকার

আমার অফিসের ঠিকানা জানার? সে রোজ এখানে আসে কেন?

—তুই বুঝি জানিস না!

—জানতে চাই না। আলো দৃঢ় কণ্ঠে বলে, একটা চাকরির পর্যন্ত জোটাতে পারল না, কত তার ক্ষমতা জানা আছে! তুমি যা ভাবছো তা কোনদিন হবে না। আমার বিয়ের স্বপ্ন দেখছো তুমি—কে খাওয়াবে তোমাদের, কি করে স্বপনের চিকিৎসা হবে? গীতার বিয়ে, তপনের পড়াশোনার খরচ—তোমার অরুণেন্দুর কথা তো কম নয়!

মা আহত কণ্ঠে বলে, অরুণের শীঘ্র একটা চাকরি হবে। ও আমাকে কথা দিয়েছে। আমি অনেকদিন ধরে ওকে দেখছি—ওর ওপর আমার খুব বিশ্বাস আছে।

আলো লক্ষ করল মা তার মুখের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। কি দেখছে অমন করে? সে মাথা নীচু করে ভাত নাড়াচাড়া করতে থাকে।

—তোর চোটটা ফুলে গেছে...চোট পেয়েছিস কিভাবে আলো?

—বাসে উঠতে গিয়ে ধাক্কা লেগেছে। বলে আলো এক গ্লাস জল খেয়ে উঠে পড়ল। আর সে মার সামনে থাকতে পারবে না। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে সে নিজের ঘরে এল।

বিছানার পাশে আলো ছটফট করতে থাকে। সমস্ত বাড়িটা এখন নিস্তব্ধ। সে টের পেল গায়ে অসহ্য ব্যথা। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর সে বিছানা থেকে নেমে পাশের ঘরে এল। স্বপন একবার বড়দির দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আলোর মনে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়। স্বপনও কিভাবে যেন সব কিছু টের পায়!

—পা'টা তোর ভাল হচ্ছে কিনা। বলে আলো ছোট ভাই-এর কপালে হাত দিয়ে [illegible], রাগ করেছিস? লক্ষ্মী ভাই আমার, আর কোনদিন তোকে মারবো না। বলে সে স্বপনের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

স্বপন থমথমে মুখে বলে, কাল সারা-রাত আমরা কেউ ঘুমোতে পারিনি। বড়দি, মাকে তুমি কষ্ট দিয়ো না।

আলো আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। সে স্বপনের একটা হাত জড়িয়ে নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

পায়ের শব্দে আলো সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ মুছে নত মুখে স্বপনের দু'পায়ে মালিশ করতে থাকে। মা টেবিলের উপর ভাতের থালা রেখে চলে যায়।

ভাত মেখে স্বপনকে খাইয়ে দেয় আলো। দুজনের মধ্যে হাসিঠাট্টা কথা-বার্তা শুরু হয়। স্বপনের মুখ এখন উজ্জ্বল।

—বড়দি, আমি বোধ হয় আর ভাল হয়ে উঠবো না কোনদিন।

—বাজে কথা আমার সামনে বলবি না! আলো স্বপনের মুখ ধুইয়ে থালা বাটি গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলে, আর কয়েক মাস পরে তুই সুস্থ হয়ে উঠবি।

স্বপন এক দৃষ্টিতে শুকিয়ে যাওয়া দু'পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে ওর সমস্ত মুখে নৈরাশ্যের ছায়া নেমে এল। সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

—কাঁদছিস কেন? আলো সস্নেহে স্বপনের দু'চোখের জল মুছে বলে, তুই একটা বোকা—এক [illegible], আর ভাল হয়ে উঠবি না! আবার তুই ইস্কুলে ভর্তি হবি, ফুটবল খেলতে পারবি।

—সত্যি বড়দি? স্বপনের দু'চোখ ছল-ছল করতে থাকে। এখানে দিনরাত শুয়ে থাকতে থাকতে আমার কিছু ভাল লাগে না।

আস্তে আস্তে স্বপন ঘুমিয়ে পড়ল। আলো স্বপনের গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে নিজের ঘরে এল। মা সামনে মেঝে বাবার ফটোর সামনে দু'চোখ বুজে বসে আছে। সুগন্ধ ধূপের গন্ধে ঘর ভরপুর।

—আমি বেরুচ্ছি মা। আলো মার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, ঠিকমত স্বপনকে ওষুধ খাইয়ে দেবে।

—এই বললি আজ অফিসে যাবি না!

—দরকার আছে। তাড়াতাড়ি ফিরবো। বলে আলো মাকে কথা বলবার কোন সুযোগ দিল না।

ঘন ঘন ট্রাম বাস বদল করল আলো। জানলার ধারে সীটে বসে শীতের নরম রোদ উপভোগ করল। চোখে পড়ল মানুষের কর্ম-ব্যস্ততা, যানবাহনের দ্রুত আনাগোনা। এভাবে সময় দ্রুত পেরিয়ে যায়। আলো দুঃসহ স্মৃতির উপর তীক্ষ্ণ ছুরি চালায় প্রতি মুহূর্তে।

ওই যে অরুণেশ। সুন্দর নীল রঙের একটা সোয়েটার গায়ে। মানিয়েছে ভারী চমৎকার। দীর্ঘকায় সুপুরুষ চেহারা অরুণেশের। আলো থমকে দাঁড়াল। একবার মনে হল ফিরে যাবে সে। মেলামেশা করে লাভ নেই। অরুণেশকে সে কি আজও ভালবাসে?

কখন যেন অজান্তে আস্তে হেঁটে অরুণেশের মুখোমুখি হল আলো। যেন কেউ তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল এই সুন্দর যুবকটির সামনে। অরুণেশের স্পর্শে সে থরথর করে কেঁপে উঠল।

পরশুরামে'র
পরশুরাম গ্রন্থাবলী
(২য় খণ্ড)
॥ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো ॥
মূল্য ঃ ২০·০০

সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত
পৌরাণিক অভিধান
তৃতীয় সংস্করণ
মূল্য ঃ ২৫·০০

উৎপল দত্ত'র
শেকস্‌পিয়ারের সমাজচেতনা
মূল্য ঃ ১৪·০০

বানী রায়ে'র
পুনরাবৃত্তি ॥ মূল্য ঃ ৬·০০

কানন দেবী'র
সবারে আমি নমি
মূল্য ঃ ৮·০০

প্রবোধকুমার সান্যালে'র
দেবতাত্মা হিমালয়
দুই খণ্ড একত্রে
মূল্য ঃ ২০·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তে'র
কল্লোল যুগ
মূল্য ঃ ৭·৫০

বহু বিতর্কিত উপন্যাসের নতুন পেপারব্যাক সংস্করণ
বুদ্ধদেব বসু'র
রাত ভ'রে বৃষ্টি
মূল্য ঃ ৩·০০

॥ আরও একটি বই ॥
বুদ্ধদেব বসু'র
আমার ছেলেবেলা
মূল্য ঃ ৩·০০

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ঃ কলকাতা-৭০০০১২
(সে ৭৬৮১)

—কি দেখছো অমন করে? আলো ভ্রূ কুঁচকে তাকালো।

—তোমাকে।

—আমাকে নতুন করে দেখার কিছু নেই। বলে আলো গম্ভীর মুখে বলে, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না।

রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। ওরা গঙ্গার পাড় দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। অরুণেশ মন দিয়ে আলোর মুখের দিকে তাকায়। আলো সতর্ক দৃষ্টিতে হাঁটতে হাঁটতে চারদিকে তাকায়। অনেক-দিন পর, সে আর অরুণেশ এভাবে পাশা-পাশি হাঁটছে।

অরুণেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে হাল্কা গলায় বলে, তোমার ব্যাপারটা কি বল তো?

—কোন ব্যাপার? আলো গরম চাদর বুকে ঢাকতে ঢাকতে আড়চোখে একবার অরুণেশকে দেখল। মাঝে মাঝে গঙ্গার বুক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে আসে।

—আজকাল কেমন যেন এড়িয়ে যাচ্ছ আমাকে। অরুণেশ মুচকি হেসে বলে, আমার চান্স আছে তো?

—নো চান্স। আলো হাসার চেষ্টা করল, এসব বাজে কথা রাখ অরুণদা। কি জন্যে ডেকেছো আমাকে?

—অনেক কথা আছে। দূরে। তুমি একটু হেসে কথাটথা বল। তখন থেকে মুখ গোমড়া করে... হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার অফিসের ঠিকানাটা আমাকে দেবে।

—কি দরকার? আলো মনে মনে একটা তীব্র অস্বস্তি টের পেল।

—আপত্তি আছে? অরুণেশ খপ করে আলোর ডান হাত নিজের হাতের মুঠোয় পুরে বলে, তোমার সমস্ত মুখে তীব্র বিষাদ...আলো, কি তোমার দুঃখ, আমাকে বল।

অরুণেশের স্পর্শে আলোর সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড অস্বস্তি জ্বলে ওঠে। সে একরকম জোর করে হাত ছাড়িয়ে বলে, অরুণদা আমাদের আর মেলামেশা করা উচিত নয়।

—আমাদের অপরাধ?

—আমাকে ক্ষমা কর। আলো মাথা নীচু করে বলল ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা ভাববার মত মানসিক অবস্থা আমার নেই। আর তুমি আমাদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ কর। যা হবার নয়, কোনদিনই হবে না...। বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে এল আলোর—অতি কষ্টে সে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত করল।

অরুণেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না। সে আলোর কথাবার্তা, ব্যবহারে রীতিমত অবাক। আলো কি ইয়ার্কি করছে? কি এমন হল... বিক্ষিপ্তভাবে সে আলোর চলাফেরা সম্পর্কে আপত্তিজনক কিছু শুনেছে। অবশ্য সে আদৌ ওসব বিশ্বাস করে না।

আর কিছু বলবে না? অরুণেশ হাসিমুখে আলোর কাঁধে হাত রেখে বলে, এসো এই বেঞ্চিটায় বসা যাক।

আলো আপত্তি জানাল। অরুণেশ ছাড়ল না। হাত ধরে টেনে বেঞ্চির উপর আলোকে বসিয়ে নিজে বসল।

—বাদাম খাবে?

—না। আলো ছটফট করতে করতে বলে, এবার আমাকে ফিরতে হবে অরুণদা। বাড়িতে অনেক কাজ আছে।

—চুপচাপ লক্ষ্মী মেয়ের মত বসে থাক। আমি এখুনি আসছি। বলে অরুণেশ লম্বা লম্বা পা ফেলে এদিকে যায়।

আলো এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় কেঁপে উঠল। সে এধার ওধার তাকিয়ে কয়েক জোড়া বেপরোয়া যুবক যুবতী দেখল। ওরা নিজেদের মধ্যে গোপন আলাপে মত্ত। একটা লোক বেলফুলের মালা ওর সামনে ধরে বলে, মাত্র আট আনা দাম—নিন না একটা!

—লাগবে না! আলো বেশ রুক্ষ কণ্ঠে বলে, ওদিকে যাও।

লোকটা চলে যাবার জন্যে পা বাড়াবে তখন অরুণেশ এল। ওর দুহাতে দুটো ঠোঙা। সে বেঞ্চির উপর ঠোঙা রেখে লোকটাকে বলল, কত দাম?

—আট আনা।

দাম মিটিয়ে অরুণেশ বেল ফুলের মালা আলোর সামনে ধরে বলে, খোঁপায় জড়িয়ে নাও। সুন্দর গন্ধ। বলে সে আলোর পাশে গা ঘেঁষে বসল।

—নিচ্ছ না কেন? অরুণেশ মুচকি হাসল আমি পরিয়ে দেব? দেখি, মাথাটা নীচু কর।

—থাক। আলো নিজেই খোঁপায় জড়িয়ে নিল বেল ফুলের মালা।

—ভীষণ ভাল লাগছে তোমাকে! অরুণেশ আবছা অন্ধকারে আলোর কানের কাছে মুখ এনে বলে, একটা চুমো খেতে দেবে—প্লীজ!

আলো মুখ ফিরিয়ে কঠিন কণ্ঠে বলে, এই জন্যেই কি চিঠি দিয়ে আমাকে ডেকে এনেছো?

উঃ তুমি একটা যাচ্ছেতাই! যাকগে, বাদাম খাও। বলে অরুণেশ আলোর হাতে কয়েকটা বাদাম গুঁজে বলে, এবার আমার ঠিক একটা চাকরি হবে। দারুণ ইন্টারভিউ দিয়েছি।

আলো বাদাম খেতে খেতে অল্প হাসল, কি রকম চাকরি—মাইনে কত হবে?

—এখন বলবো না। জোম, আর কিছু-দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর।

॥ নতুন বই ॥

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস
অভিনয় ১০·০০

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যোপন্যাস
সেদিন শৈলশিখরে ৬·০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
প্রেমে অপ্রেমে ৬·০০

অমলা সেনগুপ্তের ভ্রমণকাহিনী
হিমতীর্থ হিমাদ্রি ৮·০০

প্রকাশিত হয়েছে ভয়ংকর ভৌতিক কাহিনী

শেখর সেনগুপ্ত-র

ডে ভি ল ৬·০০

॥ উপন্যাস/রাজনৈতিক গ্রন্থ ॥

পুরুষ — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫·০০
বাঘবন্দী — কৰ্ণক ॥ ৮·০০
আদিগঙ্গা — আশুতোষ সরকার ॥ ৮·০০
নগশৃঙ্গার — আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·৫০
প্রতিধ্বনি — নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ৫·০০
হিপিসঙ্গমে — রঞ্জন মজুমদার ॥ ৮·০০
নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে — অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম : ১৫·০০; ২য় : ১০·০০
অশ্বত্থপল্লব — দেবেশ ॥ ৯·০০
হেডলাইন চাকা — পার্থ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৮·০০
চেনামুখ — সৌরীন সেন ॥ ৮·০০
অপরিচিতা — সৌরীন সেন ॥ ৮·০০
সৈনিকের ডায়েরী — শেখর সেনগুপ্ত ॥ ৬·৫০
অ্যাঙ্গোলা-আফ্রিকার ভিয়েতনাম — বরুণ রায় ॥ ৯·০০
মানসী মানা ৭·০০ — প্রাণেশ চক্রবর্তীর পর্বত অভিযান কাহিনী
চর্যাচক্রকথা ১৫·০০ — অসীম সোম সম্পাদিত

রূপরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

(সি ৭৭০৮)

সজীবতার উৎফুল্লতার অপূর্ব প্রকাশ

২ রকম সাইজে

কিউটিকুরা ট্যালকাম পাউডারের পনেরোটি সুগন্ধি ফুলের সুরভিত স্নেহস্পর্শে আপনি সারাদিন থাকেন সজীব ও উৎফুল্ল। প্রত্যহ ব্যবহার করলে, কিউটিকুরা আপনার কান্তি ও রূপকে করবে কমনীয়, রমণীয় এবং সরল সুন্দর।

কিউটিকুরা

পরিবারের সকলের জন্য সর্বোপযোগী সুবাসিত পাউডার

JAISONS 2328 BEN R

॥ ৩৫ ॥

বেদে এবং পুরাণে দেবরাজ ইন্দ্রের লাম্পট্য বহুবার বর্ণিত হয়েছে। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী শচীদেবী জাজ্বল্যমানা থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্বর্গলোকের নৃত্যসভা উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, চিত্রলেখা প্রমুখ বহু অপ্সরার আনন্দের কেন্দ্র ছিল। একই পুরুষ বহু নারীর দ্বারা সমাদৃত, এটি ভারতীয় পুরাণে যেখানে-সেখানে পাই। এ ছাড়া মদ্য, গোমাংস, শূকরভক্ষণ, বহুনারী সম্ভোগ—এগুলি বেদ বা পুরাণে নিষিদ্ধ ছিল না। বরং এগুলোর চলাও ব্যবস্থা ছিল।

সুতরাং দেবরাজ একদা স্থির করলেন তাঁর পক্ষে ঋষি গৌতমের গৃহস্থাশ্রমে গিয়ে তাঁর পরম রূপবতী স্ত্রী শ্রীমতী অহল্যার ধর্মনাশ করা দরকার।' অতএব শুভস্য শীঘ্রম্। গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি রূপবান প্রেমিকের বেশে এসে আশ্রমের উপান্তে অহল্যার কাছে দাঁড়িয়ে নারীপ্রশস্তি আরম্ভ করলেন তাঁর মধুর মায়াবী কণ্ঠে : "কাশ্মীর মন্দার পুষ্প পারিজাত গন্ধ এত মধুর নহে, যে-গন্ধ তোমার অস্ফুট প্রণয়বাণীমিশ্রিত নিঃশ্বাসে। ত্রিদিব ভাণ্ডারে মোর এত সুধা নাই, ও রক্তঅধরে যত—"

কঙ্কাবতী পালে গেলেন, শিশির ভাদুড়ী জয়লাভ করলেন। ডি-এল-রায়ের 'পাষাণী' অভিনীত হচ্ছিল নাট্যমন্দিরে।

আরেকদিন দেখছিলুম ক্রন্দনকণ্ঠে আর্তনাদ করছে 'জীবানন্দ' : অলকা, অলকা, আমি ঘর চাই, সংসার চাই, স্ত্রী চাই, সন্তান চাই, মানুষের মধ্যে মানুষের মতন বাঁচতে চাই—"

দর্শকরা আবেগে ও বেদনায় ডুকরিয়ে উঠছিল। শিশিরবাবুর মা দোতলায় তাঁর জন্য সংরক্ষিত 'বক্সটিতে' শান্ত ও অবিচল-ভাবে উপবিষ্ট।

নাট্যমন্দিরে যে কোনও নাটকের যে কোনও অঙ্কের অভিনয়কালে আমি গুটি-গুটি ভিতরে ঢুকে কাছাকাছি কোথাও বসে খানিকক্ষণ অভিনয় দেখে চলে যেতুম। সেদিন 'সীতা' হচ্ছিল। অঙ্কের পর অঙ্ক দেখে যাচ্ছিলুম। বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে 'সীতা'র জুড়ি কম। মুগ্ধচক্ষে চেয়ে ছিলুম মঞ্চের দিকে। 'রামচন্দ্র দণ্ডকবনে স্বর্ণসীতা' নির্মাণ করে তার স্তবে বিভোর : সীতা, সীতা, সমস্ত দণ্ডকবন আজি সীতাতীর্থ !"

এই 'সীতা' দেখে আমাদের অচিন্ত্য একটি কবিতা লেখে, "দীর্ঘ দুই বাহু মেলি আর্তকণ্ঠে ডাক দিলে সীতা, সীতা, সীতা—পলাতকা গোধূলি প্রিয়ারে—"

হঠাৎ পিছন থেকে পিঠের ওপর আঙুলের টিপ পড়ল। ফিরে দেখি, দৌবারিক মিঃ ব্যানার্জি। আমাকে বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

বাইরে এসে দেখি মূর্তিমান শ্রীমান ধীরেন চক্রবর্তী। সোজা আমার পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে সে বলল, আপনার বাড়িতে গিয়েছিলুম। শুনলুম আপনাকে হয়ত এখানে পাব। আমি চারদিন হল জেল থেকে বেরিয়েছি।

গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির বই

গান্ধী রচনা সম্ভার (ছয় খণ্ড)	৩০·০০
গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙ্গালী	৩·০০
টু দি উইমেন (বাংলা)	৬·৫০
গান্ধীজী, কী পেয়েছি তাঁর কাছে	২·০০
গান্ধী কথা	১·০০

৫০ পয়সা সিরিজের বই

আর্থিক সমতা
সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও গান্ধীজি
মাদকদ্রব্য বর্জন
খাদি ও চরখার কথা
সত্যাগ্রহের কথা
অস্পৃশ্যতা বর্জন
নারী উন্নয়ন
গান্ধী বাণী
পল্লী স্বাস্থ্য
কুষ্ঠসেবা
বিনোবার দৃষ্টিতে গান্ধী

২৫ পয়সা সিরিজের বই

প্রাণরক্ষা ও বংশরক্ষার অধিকার
বিপ্লবী গান্ধী
শ্রমিক আন্দোলন ও গান্ধীজী
গরীবের বন্ধু গান্ধীজী
বৈপ্লবিক শক্তির উৎস
দেশবন্ধু ও গান্ধীজি
আধুনিক বিপ্লব ও গান্ধী

* অন্যান্য গান্ধী সাহিত্যও পাওয়া যায়।

গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটি পশ্চিমবঙ্গ

৫৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—২০
(বেলা ১টা — সন্ধ্যা ৭টা)

(সি ৬৯৩৬)

আমি খুব হাসলুম। হাসতে হাসতে ধীরেনকে নিয়ে বাইরে এলুম। কিন্তু আমার হাসির কারণ ছিল। গত বছর এক রাজনীতিক সভায় ধীরেনকে একটি আবৃত্তি করতে বলা হয়। তার কণ্ঠস্বর ছিল দরাজ। কিন্তু আমাকে সে তার মুরুব্বি ঠাউরিয়ে ছিল, এবং আমাকে দিয়ে সে তিন চারবার রবীন্দ্রনাথের 'সুপ্রভাত' কবিতাটি আবৃত্তি করিয়ে নেয়। অতঃপর তার সেই আবেগমিশ্রিত উচ্চকণ্ঠের তেজোব্যঞ্জক 'সুপ্রভাত' আবৃত্তি কর্তৃপক্ষ বরদাস্ত করেনি! সেই রাত্রেই ধীরেনকে টেনে নিয়ে যায়! বিচারে তার জেল হয় এক বছর।

—ব্যাপার কি শুনি? রাত দশটা বাজে—!

ধীরেন বলল, শোভাদি পাঠালেন। আপনি সাত আট দিন ওদিকে যাননি। আপনাকে বিশেষ দরকার—কথা আছে অনেক—

ধীরেন একখানা ছোট্ট চিঠি আমার হাতে দিল। চিঠিখানা একটি কাগজের টুকরো মাত্র। নিচে নামসই নেই, উপরে সম্ভাষণ নেই! শুধু তাঁর হাতের দুলাইন লেখা: 'বামুনে উপস্থিত না হলে ষষ্ঠী শেতলা, মনসা—কোনও পুজোই হয় না!'

হাসিখুশি মুখে ধীরেন বিদায় নিয়ে চলে গেল। ওকে বলে দিলুম, বোলো সামনের মঙ্গলবারে যাব।

আমি অতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলুম। বিশেষ করে বুলির বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি। তার ওপর কোনও কোনও প্রকাশকের কাছে অগ্রিম নিয়েছি, উপন্যাস লিখে সেই দেনা শোধ করতে হবে। এ ছাড়া বড়দা আমার কথায় তাঁর আপিসে দেনা করেছেন, সে-দেনা আমারই। এর আগে পর্যন্ত দিনে চার পাঁচটা সিগারেট খাচ্ছিলুম পানের দোকানে দড়ির আগুনে ধরিয়ে, কিন্তু এখন বিড়ির পয়সাও জুটছে না। আমি এখন আশাহত, ভাগ্যবিড়ম্বিত এবং অনেকটা তিতবিরক্ত। আমার ঔদাসীন্যের অন্যতম কারণ, সাবিত্রী আমার হৃদপিণ্ডের রক্তচলাচলের মধ্যে নিত্য সঞ্চালিত রয়েছেন,—বিষয় বৈভব, অর্থচিন্তা, সামাজিকতা বা অন্য কোনও পার্থিব কিছু আমার কাছে আর প্রিয় মনে হচ্ছে না। সাবিত্রী আমার মধ্যে এনেছেন একপ্রকার অধ্যাত্ম পিপাসা, যেটি আমাকে আর স্থির থাকতে দিচ্ছে না ঘরের মধ্যে। আমাকে ডাকছে হিমালয় অহর্নিশ, ডাকছে সেই রামগঙ্গা আর মোহনচৌরি, ডাকছে কর্ণপ্রয়াগ আর সিরোলি চটি, ডাকছে যোশীমঠ, ভিকিয়াসেন আর বিরহী নদীর কোলে ব্যাসগুহা। আমি সেই বিরাট হিমালয়ের গহনলোকে কীটানুকীটের মতো মিলিয়ে যেতে চাই! কিন্তু জানিনে, এ আমার একপ্রকার শ্মশান-বৈরাগ্য কিনা।

অনিচ্ছুক মন নিয়ে যাচ্ছিলুম হাজরা রোডের দিকে। অনিচ্ছার অন্যতম কারণ, সম্প্রতি পর-পর দু তিনটে 'স্বদেশী' ডাকাতী হয়ে গেছে বিপ্লববাদী ছেলেদের খরচপত্র চালাবার জন্য। একটি ব্যাংকে ডাকাতি হয়েছে প্রায় হাজার তিরিশেক টাকার। তাই নিয়ে হইচই চলছে প্রচুর। এর সংগে একাধিক মহিলা যাঁরা জড়িত রয়েছেন, তাঁরা অনেকে আমার বিশেষ পরিচিত। আমার অনিচ্ছার আরেক কারণ, মহিলা সমাজের ফাইফরমাস খাটতে যাওয়া সকল সময়েই কিছু বায়সাপেক্ষ।

শ্রীমতী শোভা পাচ্ছে তাঁর দিদির মতো মোটা হন্ বলে তাঁর দেহবন্ধ জাতে একটা সতর্ক থাকেন। তাঁর আহারের পরিমাণ কম। একটি বাটি নিয়ে নিজের হাতে সামান্য ভাত-তরকারিসহ একটুকরো মাছ—এই তাঁর মধ্যাহ্নভোজন। এই ভোজনটি সেরে দুপুরে দুটো নাগাদ তিনি সেদিন উপরে উঠছিলেন, এমন সময় আমি গিয়ে হাজির। উনি এখন আমার কুটুম্ব—আমার ভগ্নির খুড়তুতো ননদ! আমি এখন ওঁর নমস্য।

আমাকে দেখামাত্রই উনি চোখ বেঁকিয়ে কটাক্ষিক হাসি হাসলেন। বললেন, রমলা রায় কে বলুন ত?

থমকিয়ে গেলুম। বললুম, নাম শুনে মনে হচ্ছে এক মহিলা!

—আপনাকে তিনি এত খুঁজছেন কেন?

তৎক্ষণাৎ মুখে জবাব এল, মেয়েরা প্রাণের দায়ে পুরুষকে খোঁজে!

শোভা আমার মুখের দিকে তাকালেন। পরে বললেন, চালাকি হচ্ছে, কেমন? ওপরে চলুন—

—আপনি আগে উঠুন—

ওঁর পিছনে-পিছনে দোতলায় উঠলুম। উনি আমাকে সোজা ডেকে নিয়ে গেলেন পশ্চিমের ছোট ঘরে। শীতের দুপুরে উনি চুল এলিয়ে বসলেন পশ্চিমের জানলায়। পরে হাসিমুখে বললেন, আপনাকে নিয়ে আজ পার্কে যাব। এখন শুনি, রমলা রায় আপনার এত খোঁজ করছেন কেন? আপনার

HDC-3035 Ben.

একটা টনিকে ঠিক
কি কি উপাদান থাকে,
সেটা আসল নয়।
আসল হোল, আপনার
দেহ এ থেকে কি পায়।

আপনার দেহকে
অনেক বেশী
কিছু দিতে পারে
সিঙ্কারা
এর ১৪টি দেশীয় গাছ গাছড়ার নির্যাসের প্রাকৃতিক উৎপাদন—রক্ত পুষ্টিসাধনে এবং উত্তম হজমে সাহায্য করে। কাজেই আপনি আপনার খাদ্য থেকে এবং সিঙ্কারার শক্তিদায়ক ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থেকে অনেক বেশী কিছু পেতে পারেন।

বাড়িতে উনি যাচ্ছেন, আপনার মার সঙ্গে ভাব করছেন,—ব্যাপারটা কি? আপনি আমাদের এখানে আসেন, উনি জানলেন কেমন করে?

আমি অকপটে রমলা দেবীর ব্যাপারটা বলে গেলুম শোভার কাছে। আমার বিশ্বাস, উনি আমাকে অবিশ্বাস করলেন না। আমার পক্ষে গোপন করার মতো কিছু ছিল না। রমলা চান একটা অর্থকরী কোনও কাজ। তিনি চান আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে তাঁর জীবনব্যবস্থা গুছিয়ে নিতে। তাঁর আরেকটি চেহারা লক্ষ্য করার মতো। তাঁর মধ্যে স্বভাব-চটুলতা বা প্রজাপতিবৃত্তি নেই। তিনি সংযত প্রকৃতির মেয়ে এবং কতকটা রক্ষণশীলও বটে। আমার মা বোধ করি এই কারণেই রমলার প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। রমলা প্রণয়, ভালবাসা বা প্রেম—এসবের খেলায় মেতে উঠতে চান না। পুরুষের সঙ্গ নিয়ে যৌবনচাঞ্চল্যে মেতে ওঠা বা পুরুষের সংসর্গে জড়োসড়ো হওয়া—এসব তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। সেদিকে তাঁর রুচি, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও শালীনতা—সমস্তই আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। তিনি এক সম্ভ্রান্ত সমাজের কন্যা। মজলন্দে তাঁর পিতার অবহেলা ও ঔদাসীন্য বরদাস্ত করতে না পেরে তিনি কলকাতায় এসে মরীচিকার পিছনে ছুটেছেন।

শোভা তাকালেন আমার দিকে,—মরীচিকা কেন?

কারণ দেখলুম, উনি আমাকে সমগ্রভাবে পেতে চান। ওঁর একান্ত কামনা, আমি ওঁকে বিবাহ করি। উনি আমাকে নিয়ে ঘরকন্না গড়ে তুলতে চান।

—আপনি রাজি হচ্ছেন না কেন?—শোভা একপ্রকার অনুযোগ জানালেন।

—খুব সহজ কথা।—আমি বললুম, আমি লেখক, সাহিত্যের কাজ করি। আমার ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। আশা, আশ্বাস, সংস্থান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—কিছু নেই আমার। প্রতিদিনের অন্ন মুখে তোলার সময় পরের দিনের অন্নসংস্থান আছে কিনা আমাকে ভাবতে হয়। আমি দেখতে দেখতে এসেছি দারিদ্র্য দৈন্য দুঃখ দুর্দশা দুর্গতি কাকে বলে। আমি জানি গরীব-গেরস্থ ঘরের বউ-ঝিরা পুরুষের থালা সাজিয়ে দিয়ে নিজেরা কী খায়। লেখক হওয়াটা এ দেশে অভিশাপ। চেষ্টা করলে এক আধটা অর্থকরী কাজ পেতে পারিনে তা নয়। কিন্তু সাহিত্যের কাজ ছেড়ে ভিন্ন ধর্মে আমার মন যায় না। অনেক লেখকই চাকরি করে, তাই সাহিত্য তাদের কাছে গৌণ, অনেকটা অবসরবিনোদনের ক্ষেত্র।

শ্রীমতী শোভা স্তব্ধ চক্ষে আমার দিকে চেয়ে বসেছিলেন। এবার তিনি বললেন, তাহলে কি আপনি কোনদিনই বিয়ে করবেন না?

এবার আমি হো হো করে হেসে উঠলুম। বললুম, আসল কথায় এবার এসেছেন দেখছি। তাহলে শুনে রাখুন—আমি বরং উচ্ছন্ন যাব, বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরবো—কিন্তু কোনও ভদ্রপরিবারের মেয়েকে কেবলমাত্র দুঃখ-দুর্গতিতে ডুবিয়ে দেবার জন্য ঘরে এনে তুলব না! এদেশে সাহিত্যের পথ আজও কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি।

—কিন্তু রমলা যদি আপনাকে চেপে ধরেন?

—তাহলে তিনি পাথরেই মাথা ঠুকবেন, পাথর ভাঙবে না।

ও ঘর থেকে এতক্ষণ মাঝে মাঝে মেয়েদের কলরব শুনতে পাচ্ছিলুম। এবার দিদির ছোট মেয়েটি দরজার কাছে এসে বলল, মাসিমণি, ওরা ডাকছে।

শংকর

আজ বাংলা সাহিত্য-পাঠকদের মনের দরজায় এসে পৌঁছেছেন বললে কম বলা হবে। তিনি একেবারে তাঁদের মনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেখানের সবচেয়ে লোভনীয় আসনটি দখল করে নিয়েছেন—চিরকালের মতো।

শংকরের

অসামান্য জনপ্রিয়তার মূলে আছে তাঁর গল্প বলার অনন্যসাধারণ দক্ষতা, আশ্চর্য মনোহারী ভাষা—যা ঝরণার মতো ঝরঝরিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায় কাহিনীকে—এবং বর্তমান কাল ও বর্তমান মানুষ সম্বন্ধে তাঁর প্রায় অপ্রাকৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। এই জন্যেই তাঁর রচনার এত জাদু।

*

শংকরের এইসব গুণের সমন্বয়ে
এই দুটি বইও অসাধারণত্ব লাভ করেছে

সীমাবদ্ধ (দ্বাদশ মুদ্রণ) ৬৲

স্থানীয় সংবাদ (সপ্তম মুদ্রণ) ৬৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলি-১২

—হ্যাঁ যাচ্ছি।—শোভা বললেন, শুনুন, ওরা এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। বসে আছে সেই বেলা বারোটা থেকে। হেমপ্রভা মজুমদারের মেয়ে দুটিকে আপনি চেনেন। ওদের সঙ্গে 'পুণ্যাশ্রম'-এর আরেকটি মেয়ে এসেছে। কিন্তু মনে রাখবেন, মেয়েটার একটু মাথার ছিট আছে, একটু লক্ষ্মীছাড়া টাইপ। আপনার ভাগ্নির সঙ্গেই জেল খেটেছিল। কল্যাণী ওকে পুণ্যাশ্রমে রেখেছে। মেয়েটা গান গায় ভাল। চলুন, কিন্তু একটু সাবধানে কথা বলবেন।

ফিরে দাঁড়ালুম—সাবধানে কেন?

—চলুন না, নিজেই দেখবেন।—শোভা এগিয়ে গেলেন।

এ ঘরে তখন মস্ত আসর। দিদি, প্রিয়া, কমলা, অরুণার পাশে বরুণা, এবং ওই নতুন মেয়েটি। অরুণা প্রথমেই বলল, একে আপনি দেখেছেন আপনার ভাগ্নির বিয়ের দিন। এর নাম সাধনা সেন।

হঠাৎ মেয়েটা সঙ্কোচ কাটিয়ে সহজ গলায় বলে উঠল, মহারাজ, সেদিন বিয়ের ভিড়ে তোমার পায়ের ধুলো নিতে গেলুম, তুমি হাত ধরে সরিয়ে দিলে!

সবাই হেসে উঠল ওর 'মহারাজ' সম্ভাষণ শুনে। শ্রীমতী শোভা একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, পাগলামি করিসনে। আমরা সবাই ও'কে আপনি বলি, মা পর্যন্ত বলেন! আর তুই বললি, তুমি? ছি—

তাই বটে,—সাধনা বলল, তোমরা ও'কে কেউ দ্যাখোনি চোখ খুলে। আমি দেখলুম সেইদিন। কাছের মানুষকে তোমরা কাছে ডাকতে চাও না, তাই আপনি-আজ্ঞে বলে দূরে সরাতে চাও! মহারাজ, আজ তোমাকে আমি গান শোনাতে এসেছি!

আমি হাসছিলুম। কিন্তু লক্ষ্য করছি, সবাই ওকে পাগল-ছাগল বলেই ধরে নিয়েছে। সকলের মুখেই কৌতুক পরিহাসের হাসি। সাধনা ওদের ওই হাসি গ্রাহ্যও করল না। নিজের মনেই সে গান ধরল।

"তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া/বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক, ওগো দুখ জাগানিয়া—"

আমি অবাক হয়ে মেয়েটার কণ্ঠের আশ্চর্য সুরময় ধুর্যের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। ঘরসুদ্ধ এবার সবাই চুপ। মেয়েটার বয়স হবে বছর কুড়ি একুশ। অরুণা-বরুণার চেয়ে বয়সে বড়। গায়ের রং মাঝারি, চোখ দুটো একটু যেন বন্যভাবের আভাস দেয়। সর্বাঙ্গে কণামাত্র অলঙ্কার নেই। স্বাস্থ্যটা সাঁওতাল মেয়ের মতো কঠিন। আমি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম। আমার মন ছুটে গিয়েছিল কোনও এক দিনান্ত-কালের হিমালয়ে—যেখানে পাইনবনের তলায় তলায় সাবিত্রী আর আমার চির-বিচ্ছেদের বেদনা ফুঁপিয়ে উঠেছিল।

"আমায় পরশ ক'রে প্রাণ সুধায় ভরে তুমি যাও যে সরে/বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক ওগো দুখ জাগানিয়া।"

সন্দেহ নেই, সেদিন মেয়েটার গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। ওর মুখে পর পর তিন চারটি গান শুনে মনে হয়েছিল, ওর মন দেহতত্ত্বের দিকে ঘেঁষা। ও যখন একটি গানের অন্তরাতে ধরল, "ডাকিলে তারে যায় না পাওয়া, ভাবিলে বোঝা যায় না তারে/শুধু কাঁদিলে তারে মিলিতে পারে/তেমন করে কাঁদতে পারে গো কজন—".

আমি ওর কণ্ঠের সুরলহরী শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। বরুণা বলল, সাধনাদি কিন্তু হারমোনিয়ম বাজাতে জানে না, ও এমনিই গায়।

এতক্ষণ পরে আমি কথা বললুম, তুমি গান শিখেছ কার কাছে?

কে শেখাবে, মহারাজ?—সাধনা বলে উঠল, সব শুনে-শুনে শেখা। জেলে ছিলুম এক বছর তিন মাস, সবাই সেখানে গান গাইতে বলত। আমিও গলাটা শানিয়ে নিতুম।

—জেলে গিয়েছিলে কেন?

হেসে উঠল সাধনা। বলল, ওই শুনুন না শোভাদির মুখে। ও'দের দলের টেররিস্টদের পাল্লায় পড়ে হ্যান্ডবিল বিলি করছিলুম হাজরা পার্কে। আর যাবি কোথা? বোলং টপকিয়ে পালাতে গেলুম। কিন্তু পাকি করে পুলিস গলা টিপে ধরল। কী ছিল হ্যান্ডবিলে, নিজেও পড়িনি। কিন্তু ওতেই বিচার হল—ছ'মাস জেল।

—তারপর?

এবার কিন্তু সবাই হেসে উঠল। শোভা বললেন, ওর কোনও গুণে ঘাট নেই। জেলের মেট্রনকে ফোর ফুঁআলের বালতির মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল তাইতে ওকে 'সলিটারি সেল'-এ রাখে [illegible] মাস!

সাধনা হেসে বলল, মেট্রন-মেয়েছেলেটাকে মেরেছিলুম কেন বললে না তো শোভাদি? আমার ওপর কি ধরনের অত্যাচার করেছিল বললে না তো?

—এই, চুপ কর,—তোর কি লজ্জাশরম কিছু নেই?—শোভা ওকে ধমকে দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, ওর কথা ধরবেন না। ওর এতটুকু জ্ঞানগম্যি হয়নি!

দিদির সঙ্গে অন্য মেয়েরা হাসি চেপে উঠে গিয়েছিলেন। সাধনা বলল, বাঃ, শাস্তি পেলুম আমি আর লজ্জা পেলে তোমরা? শোন মহারাজ, আমি দুদিন ছট-ফট করেছিলুম যন্ত্রণায়—

শ্রীমতী শোভা রাগ করে উঠে গেলেন। ও'রা বোধ হয় ভয় পাচ্ছিলেন, সাধনার মুখে কিছু আটকায় না। মেয়েটা না জানে

ক্যামেল কালিতে গুপ্তচর?

ক্যামেল ডিলাক্স কিম্বা ক্যামেল স্পেশাল কালি ব্যবহার করলে বুঝতে পারবেন আমরা কি বলতে চাই। অদৃশ্য একটি পদার্থ আপনার কলমকে আপনার অগোচরে সুন্দর, সুষ্ঠু, নিখুঁত উপায়ে ঝরঝরে পরিষ্কার করে রাখবে।

অতএব কালির দরকার হলেই কিনুন ক্যামেল কালি। তাহলে কালির সঙ্গে পাবেন আরো একটি জিনিস—আমাদের বহু বছরের বিশেষ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি।

ক্যামেল
কালি

ভালো লেখায় ভালো কালি

VISION 731 Ben

সামাজিক ভব্যতা, না জানে পালিশ-করা কথালাপ। ওর সমস্ত আচরণটাই অমার্জিত।

—পুণ্যাশ্রমে তুমি কতদিন আছ?

—বোধ হয় মাস দুই হবে—সাধনা বলল কিন্তু আমি কল্যাণীদিকে বলেছি, ওখানে আমার মস্ত অসুবিধে। আমি ওদের কেউ না। ওরা শুধু মেয়ে। আমি মেয়ে নই মহারাজ।

সাধনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। সে আবার বলল, বিশ্বাস করো মহারাজ, আমি মেয়ে নয়, মেয়ে হতে চাইনে! আমি তোমার মতন পুরুষই থেকে যেতে চাই—

—কিন্তু তোমার দৈহিক লক্ষণগুলি আগাগোড়া যে মেয়ের! ওগুলো বাদ দেবে কেমন করে?

হেসে উঠল সাধনা। বলল, মহারাজ, এসব একটাও আমার নয়, এ হ'ল সেই কারিগরের! আমার মধ্যে আমি, সেই ত আসল আমি! তোমার ওই চোখ দুটোর মধ্যে দেখছি এক মেয়েকে, বলো ত' সত্যি কিনা! তুমি তখন শোভাদির পেছনে-পেছনে ঘরে ঢুকলে, দেখলুম পা থেকে মাথা পর্যন্ত তুমি কোথাও পুরুষ নও! নিজেকে তুমি কতটুকু জানো মহারাজ?

মেয়েটা এসব কী বলে রে? আমি ওর কথায় যেন খোঁচা খাচ্ছিলুম। কিন্তু প্রথম আলাপ, সেজন্য আমি সতর্ক ছিলুম। শুধু বললুম, তোমার গান খুব ভাল লাগল। আরেকদিন শোনবার ইচ্ছে রইল।

না, মহারাজ—সাধনা বলল, পাঁচজনের পাঁচালির মধ্যে গান শুনতে চেয়ো না! তুমি একা শুনবে, আমি একা গাইব! দল বেঁধে দরবারী গান হয়। কিন্তু কাঁদতে গেলে একা বসে কাঁদো! সে-কান্না অনেক দূর পৌঁছয়!

—সে-গান কোথায় বসে শুনব?

সাধনা বলল, চুপ করে থাকো, আমি তোমায় খুঁজে বার করে নেবো।

ওদিক থেকে শ্রীমতী শোভা তাড়া দিচ্ছিলেন। উনি এদের জলযোগের আয়োজন করেছিলেন। শীতের বেলা পড়ে এসেছে।

এক সময় অরুণা-বরুণাকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটা চলে গেল।

একদা বিজলী আপিসে যাঁরা আমার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলেন সেই দত্ত-বংশীয়রা এখন বৈবাহিক সূত্রে আমার কুটুম্ব মহলে পরিণত। এখন আমি এখানে মামাশ্বশুর এবং লাবণ্যপ্রভা এখন আমার বেয়ান। সুতরাং আমার আচার ব্যবহার ও সর্বপ্রকার কথায় ও কাজে শালীনতা, শোভনতা ও সংযম থাকা দরকার। এখানে হাসিপরিহাস বা চটুল বাক্যালাপ অনেকটাই ইদানীং কমিয়ে দিয়েছি এবং আমার আনাগোনাও কতকটা কমেছে। হেমপ্রভা মাসিমার দুই মেয়েকে আমি আমার দুই মাসতুতো ভগ্নি ছাড়া অন্য কিছু মনে করিনে। আমার বিশ্বাস, এ সব ব্যাপারে আমি ঈষৎ প্রাচীনপন্থী। কিন্তু আমার জীবন-বিধাতার বোধ হয় ইচ্ছা নয়, কারও প্রতি আমার অনুসন্ধিৎসু মন স্থির হয়ে থাকে! সেই কারণে আমার মন ছিন্নশৃঙ্খল হয়ে বেরিয়ে পড়ে একের মন থেকে অন্যের মনে। আমার দরকার, মন নিয়ে জানাজানি। আজ আমি উপলব্ধি করছি আমার মন, আমার চিন্তাধারা—সব সরে গিয়েছে সাবিত্রীর দিকে! আমি যেন তন্দ্রাবে ভাবিতম্। তিনি আমাকে দেখিয়ে গেলেন শান্ত-শুচিতার পথ। তিনি যেন বলে গেলেন, নীল পদ্মের সন্ধান তুমি পাবে, যদি তুমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাকাশলোকে ভ্রমরের মতো অন্বেষণ করে বেড়াও!

সন্ধ্যার সময় শ্রীমতী শোভা পার্কে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং আমাকে নিয়ে উনি বেরিয়ে এলেন। আমি চললুম পিছু পিছু। নিচে নেমে সদর দরজার বাইরে সরু গলিতে পড়ে উনি বললেন, গোয়েন্দার নজর থাকে, সাবধান। আমি আগে আগে যাব, আপনি হাঁটবেন খানিকটা দূরে রেখে।

ল্যান্সডাউন রোডে পড়ে উনি বাঁ হাতি বেঁকলেন। এ পথ নিরিবিলি এবং আলোক সজ্জা কম। শীতের রাত কনকনে ঠাণ্ডা কিন্তু ওঁর পরনে সুন্দর বাসন্তী রংয়ের খদ্দরের শাড়ি, ওতে ঠাণ্ডা লাগে না। উনি হাঁটতে হাঁটতে এসে বাঁ হাতি ছোট্ট পার্কে ঢুকলেন, তারপর আমাকে ডেকে বললেন, আসুন, এখানে একটু বসি।

মুখোমুখি আমরা বসলুম। উনি গায়ে ঢাকা দিলেন। পরে বললেন, এ শাড়ি আপনারই উপহার দেওয়া—বুলির বিয়ের নমস্কারী! এবার শুনুন, রমলা দেবী আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে গেছেন, আপনি অ্যাডভোকেট গিরিজানাথ মুখার্জির সঙ্গে একবারটি কথা বলবেন। তিনি কি এক প্রতিষ্ঠান গড়ছেন, সেখানে রমলা কাজ নিতে চান। ওঁর জন্যে আপনি নিশ্চয় চেষ্টা করবেন।

—বেশ, কথা দিলুম।

শোভা বললেন, আচ্ছা, আপনার সেই হৃষীকেশে গিয়ে আশ্রম গড়বার আইডিয়া কোথায় গেল? সেই যে আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সেখানে?

হাসি মুখে বললুম, না, আমি শূন্যো

বাহির হইল ঃ

মহাত্মা শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত

তন্ত্রতত্ত্ব (দুই খণ্ড একত্রে) কুড়ি টাকা

তাভেরনিয়ে-র

ভারত-ভ্রমণ ১৬·০০

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ORIGIN OF THE BENGALI SCRIPT—15/-

বাঙ্গালার ইতিহাস প্রতি খণ্ড ১২·৫০ ১ম / ২য়

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত দু'খানি বই

ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক প্রণীত

অপরাধ জগতের ভাষা — ৫·০০

অপরাধ জগতের শব্দকোষ — ৫·০০

নবভারত পাবলিশার্স ॥ ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

(সি ৬৯১৯)

ফানুস ওড়াবার কথা ভেবেছিলুম! বরং আপনি যদি পারেন আপনার সেই পুরীর আশ্রম-জীবনে ফিরে যান।

—আপনার এ কথার মানে কি?

—মানে আমার কাছে স্পষ্ট, আপনি হয়ত স্বীকার করবেন না।

—কী শুনি?

—আমি এই রক্তবিপ্লবের ভবিষ্যৎ বিশেষ কিছু খুঁজে পাচ্ছিনে। কোথায় যেন অঙ্কের ভুল থেকে যাচ্ছে। কয়েকজন ইংরেজকে খুন করলে ভয়ে তারা দেশ ছেড়ে পালাবে, এ আমার মনে হচ্ছে না।

শ্রীমতী শোভা হেসে উঠলেন। তাঁর দেশাত্মবোধের বৈপ্লবিক আদর্শে তিনি শুধু অবিচলই নন, ইস্পাতের ফলার মতো তিনি কঠিন। পরিত্রাণায় সাধূনাং এবং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং—এই ধর্মনীতিবোধ তাঁকে সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করে চলেছে। আমার সামান্য দু'একটা কথায় তাঁর তিলমাত্র বিচলিত ভাব আসবে না। বলা বাহুল্য, ও'র ওই অটলতাই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে! আমাকে উনি বার বার খোঁটা দিয়ে সেই একই কথা বলেন, বারীনদা ঠিকই বলেছিলেন! আপনি মনে মনে গান্ধীর চেলা!

আমি রাগ করে বললুম, তা হতে পারে। কিন্তু গান্ধীর পথে বরং কিছু আলো পাই, আপনাদের পথ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে।

শ্রীমতী শোভা চুপ করে কি যেন ভাবলেন। পরে বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, স্পষ্ট জবাব দেবেন? দেবেন ত?

—বলুন—

—কম-বেশি মাস ছয়েক হতে চলল, আপনার মনোভাব একটু বিগড়েছে, একি সত্যি?

—এর জন্যে আপনিই দায়ী।—আমি বললুম, আপনাদের বাড়ির কয়েকটি অপ্রিয় ঘটনার কথা আপনিই আমাকে বলেছেন।

উনি বললেন, এই সব কারণেই আমরা শীগগিরই বাড়ি বদলাচ্ছি, আপনি কি জানেন?

—জানি—আমি বললুম, আপনারা অনেক বড় বাড়ি ভাড়া নিচ্ছেন এবং আপনাদের অবস্থা ফিরে যাচ্ছে! আপনারা কোন্ কোন্ দোকানে ফার্নিচার অর্ডার দিয়েছেন, তাও আমার জানা! চলুন, এবার উঠি—

—আপনি ত সাংঘাতিক লোক?—এই বলে উনি হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন।

এবার উনি প্রায় আমার গা ঘেঁষে চললেন, কারণ সন্ধ্যার পর থেকে এ পাড়ার চেহারাটা খারাপ হতে থাকে। আমি যখন ও'কে ও'র বাড়ির গলিতে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলুম, উনি বললেন, না, এখন যাওয়া হবে না। ওপরে চলুন—

কথায় কথায় চিঠি চালাচালি করা আমার ধাতে নেই। ও আমি পারিনে। রমলা দেবীর চিঠি একের পর এক পাচ্ছিলুম, কিন্তু প্রতি চিঠির জবাব দেবার দায় আমি স্বীকার করিনে। সুতরাং শ্রীমতী শোভার নির্দেশমতো এবং আমার সুবিধামতো ভবানীপুরের বকুলবাগানের ওদিকে একদিন বিকালের দিকে শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দর বাসস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। এখানে থাকেন রমলা।

শ্রীমতী লাবণ্যলতা একজন প্রসিদ্ধ সমাজসেবিকা। তাঁকে এবং রমলা দেবীকে বাড়ির নিচের তলাতেই পাওয়া গেল। লাবণ্যলতা আমার চেয়ে কিছু বয়োজ্যেষ্ঠা এবং আমাকে উনি নামে চেনেন। উনি অবিবাহিতা, এবং ওদিক থেকে সম্ভবত তিনি ব্রতচারিণী। কিন্তু আমি ঠিক জানিনে, সম্ভবত রমলা ও'কে আমার সম্বন্ধে এমন কিছু বলে থাকবেন, যার জন্য লাবণ্যলতা প্রথমেই আমাকে বললেন, রমলাকে সর্বপ্রকার সহায়তা করা আপনারই দায়িত্ব এবং আপনারই কর্তব্য।

লাবণ্যলতা একজন বিশেষ শ্রদ্ধেয়া মহিলা। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে এবম্প্রকার প্রচ্ছন্ন উপদেশ শোনবার জন্য আমি আসিনি, সেজন্য আমি দুঃখিত বোধ করলুম। ও'র সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ। কিন্তু এইটুকুতেই আমার মনে হল উনি কতকটা 'প্রেজুডিস্ড' হয়ে আছেন। আমি হাসিমুখে বললুম, ক্ষমা করবেন, আপনার তুলনায় আমি সামান্য ব্যক্তি। কিন্তু আমি আমার কর্তব্য ও দায়িত্বের শিক্ষা নেবার জন্য গাড়ি ভাড়া খরচ করে এতদূরে আসিনি। আমার অন্য কাজ ছিল।

রমলা দেবী নতমুখে বসে ছিলেন। বুঝতেই পারছিলুম আমাকে জড়িয়ে এই অপ্রিয় পরিস্থিতি তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

লাবণ্যলতা ঈষৎ জোর দিয়েই বললেন, আপনার সঙ্গে রমলার তিন বছরের ঘনিষ্ঠতা। অথচ উনি যখন আজ এইভাবে

বিপন্ন বোধ করছেন, তখন আপনার নিশ্চয়ই উচিত ওর পাশে দাঁড়ানো।

—ক্ষমা করবেন, শ্রীমতী চন্দ—আমি বললুম, ঘনিষ্ঠতার কথা একেবারেই সত্য নয়। আপনার বাড়িতে বসে আপনাকে কঠিন বাক্য বলে যাওয়া আমার রুচিতে বাধে। আমাকে না জেনে আমার প্রতি আপনি অহেতুক বিরক্তি পোষণ করছেন এ আমি জানতুম না। আচ্ছা, আজ উঠি।

—না, না, বসুন, রাগ করবেন না—আমি আপনাদের ভালোর জন্যেই বলছি—

—কে আমরা?—ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমি বললুম, কতটুকু আমাদের চেনা-শোনা? ওঁর প্রতি আমার কর্তব্য কিসের? কেনই বা দায়িত্ব পালনের কথা ওঠে? আমাকে ওঁর সমস্যায় জড়াবারই বা এ চেষ্টা কেন? এ সব দুর্বোধ্য প্রশ্ন রয়েছে আমার সামনে! ইংরেজী 'ব্ল্যাক-মেইল' কথাটার বাংলা আমি জানিনে, কিন্তু ওটা যদি আমার মনে আসে, ক্ষমা করবেন। আচ্ছা, নমস্কার—

আমি উঠে দাঁড়ালুম। আমার গলাে জ্বালা ধরেছিল। পুনরায় বললুম, আর একবার ক্ষমা করবেন, মিস চন্দ। শুনেছি আপনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবিকা। তা হবে। তবে মেয়ে-সমাজে এ ধরনের লেকচার আপনি দিতে পারেন যে, বেশি বয়স পর্যন্ত কুমারী হয়ে থাকলে মেয়েরা অনেকে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে!—নমস্কার—

আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলুম।

সেজা হাঁটতে হাঁটতে এসে ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে ভবানীপুর থানার সামনে দাঁড়িয়ে যখন বাসের জন্য অপেক্ষা করছি, দেখি রমলা দেবী আমাকে একপ্রকার দ্রুতপদে অনুসরণ করে বড় রাস্তা পেরিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমি বললুম দেখুন, এ সব বাজে বিতর্কের মধ্যে আমাকে টানাটানি করবেন না! আপনাকে আবার বলছি, আপনি মরীচিকার পেছনে ছুটছেন! আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি মালদায় বা বগুড়ায় আপনার বাবার কাছে ফিরে যান।

সেই লোক-চলাচলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রমলা বললেন, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকলে আমার অনেক সমস্যার সুরাহা হয়ে যায়!

—আমি অপ্রসন্ন কে বললে? কিন্তু আমি জড়িত হতে পারব না আপনার সমস্যায়। আমি স্পষ্টই বলি, কোনও মহিলা আমার পিছু নেন, এ আমার পছন্দ নয়। আপনার এবং আমার পথ এক নয়!

রমলা কি যেন ভাবলেন, পরে বললেন, আপনি দয়া করে আমাকে গিরিজা মুখার্জির ওখানে একবারটি নিয়ে চলুন, তিনি আপনাকে ভালোই চেনেন। ওঁর প্রতিষ্ঠানে আমি হয়ত একটা কাজ পেতে পারি। আপনার একটু সময় হবে কি?

—চলুন, দেখি—। আমার মনে বিশেষ বিরক্তি ছিল।

চক্রবেড়িয়ায় এসে গিরিজাবাবুর বাড়িতে ঢুকলুম। উনি বোধ হয় জানতেন আমি আসব। তখন সন্ধ্যাকাল। এক প্রবীণ বয়সী ভদ্রলোক সামনে এসে বিশেষ সমাদর সহকারে আমাদেরকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। উনি আমার কিছু কিছু রচনার সঙ্গে পরিচিত এবং একটা বিশেষ সূত্র ধরে এইভাবে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটবে, এ তিনি আশা করেননি। উনি ওঁর স্ত্রীকে ডাকলেন এবং আমাদের জলযোগের আয়োজন করলেন।

শ্রীমতী রমলা গিরিজাবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই আলাপ আলোচনা করতে বসলেন। আমি পাশেই বসেছিলুম। কিন্তু ওই মহিলা প্রথম থেকেই যেভাবে আমাদের উভয়কে নিরীক্ষণ করছিলেন, সেটি আমার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দদায়ক হচ্ছিল না! ওঁর চোখের মধ্যে বিশেষ এক অনুমানের আভাস ছিল।

গিরিজাবাবু মেদিনীপুর জেলায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে যাচ্ছেন, যার প্রধান উদ্দেশ্য যে সমস্ত শিশু-বালক-বালিকা মানসিক পঙ্গুতায় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, তাদেরকে ওই প্রতিষ্ঠানে রেখে প্রতিপালন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি নিজে হাজার কয়েক টাকা নিয়ে নামছেন এবং সরকারী সাহায্যের জন্য ইতিমধ্যেই আবেদন করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম হবে 'বোধনা নিকেতন'।

আমি উৎসাহ বোধ করলুম এবং গিরিজাবাবুর নিকট আবেদন জানালুম, শ্রীমতী রমলা রায়কে যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গভর্নেস বা মেট্রন নিযুক্ত করেন, তবে আপনাদের পরিচালনা ব্যবস্থার সুবিধা হয় কিনা।

গিরিজাবাবু খুশী হয়ে বললেন, আপনার প্রস্তাব উত্তম। তা ছাড়া আপনি নিজে যখন রমলা দেবীকে সঙ্গে করে এনেছেন, তখন ওঁকে অবশ্যই নেবো 'বোধনা নিকেতন'-এ।

(ক্রমশ)

সুধীসমাজে একটি শ্রদ্ধেয় নাম

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

নিভৃত সাধনার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর

রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন

রবীন্দ্রদর্শন ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ পথনির্দেশ

মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা

প্রকাশিকা : কল্পনা মুখোপাধ্যায়, ২৯/১১, নারায়ণ রায় রোড, কলি-৮।
প্রাপ্তিস্থান : দি বুক এক্সচেঞ্জ, ২১৭ বিধান সরণি, কলি-৬; সিগনেট বুক শপ, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২, ফরোয়ার্ড পাবলিশার্স, ৪৫-বি এস. পি. মুখার্জি রোড, কলি-২৬।

সি ৬৪৪৬)

পশ্চিমবঙ্গের ডিস্ট্রিবিউটর

নুরতমল শোভাচাঁদ, ১৩৪/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-

॥ আট ॥

রুলটানা কাগজে হালকা রঙের কালিতে, গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। কোনো সম্বোধন নেই :

যা ভয় করেছিলাম, তাই হয়েছে। আজ আশ্বিনের ১২ তারিখ, কিছু হয়নি। তুমি যে কোথায় গেছ, কিছুই জানি না। তোমাদের বাড়ি গেছলাম, তোমাকে দেখলাম না। তোমার বউদির মুখে শুনলাম, কয়েকদিন তোমার কোন সংবাদ নেই। বাড়িতে আস না থাক না। কেউ তোমার খবর জানে না। বরানগরেও যাও না। আমার খুব ভয় করছে, অস্থির অস্থির করছে। তুমি তো আমাকে কিছু বলনি কোথাও চলে যাবে। ৭ তারিখ বিকালে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখনো তুমি কিছু বলনি, খালি বলেছিলে, একটা চাকরি বাকরি না পেলে আর চলছে না। যেমন করেই হোক যোগাড় করতে হবে। তা আমিও বুঝি। ভাবছি চাকরি যোগাড় করতেই কোথাও চলে গেলে নাকি? তা হলেও কিছু বলে যাবে তো। কেউ তোমার কোন খবর বলতে পারে না। আমি কি করব কিছু বুঝতে পারছি না। ৭ তারিখে তোমাকে বলেছিলাম ৯ তারিখে দিন। আজ ১২ তারিখ। হাত-পা কেঁপে যাচ্ছে। কাল রাত্রে সাইরেন বেজেছিল। আমার হাত পা এমন ঠকঠক করে কাঁপছিল! অথচ এরকম কতবার শুনেছি। বোমা কখনো পড়েনি। কতগুলো এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেছল, মনে হয় গঙ্গার ধারের দিকে। কিন্তু তাতেও আমার ভয় লাগেনি। তবু এমন কাঁপুনি লেগেছিল ঠিক যেন শীতের সময় কালো ঠাণ্ডা জলে ডুব দিয়ে ওঠার মত। এরকম আমার কখনো হয় না। মনে হচ্ছিল, আমার শরীরের মধ্যে কী যেন একটা হচ্ছে। আমি আর বেলি তো এক খাটে শুই। এরোপ্লেনগুলোর শব্দ শুনে বেলি ভয় পেয়ে আমাকে ডেকেছিল। দিদি, দিদি! আমি কথা বলতে পারছিলাম না। বেলি গড়িয়ে আমার কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছিল। আমি কোন রকমে একটু শব্দ করেছিলাম। বেলি ভয় পেয়ে বলেছিল, দিদি তুই কাঁদছিস নাকি? আমি কোন রকমে বলেছিলাম, না, আমার শরীরের মধ্যে কেমন করছে। ও তাড়াতাড়ি মাকে ডাকতে যাচ্ছিল, আমি ধরে রেখেছিলাম। তুই আমাকে একটু চেপে ধরে রাখ।

জানি না কী হবে। দাদা বউদিকে একটা ওষুধ এনে দিয়েছিল, ঐসব ব্যাপারের জন্য। কোথায় রাখা আছে আমি জানতাম। বউদির মুখে শুনেছিলাম আগেই। বউদি বলেছিল, ছাই, ওতে কিছু হয় না। তবু সেই ওষুধ আমি কাল খেয়েছিলাম। গোলা গোলা বড়ি, হিঙের গন্ধ। নিয়ম-কানুন কিছুই জানি না, খেয়ে ফেলেছি। আরো খাব ভাবছি। এখন তলপেটের কাছে কুন্‌কুন্‌ করে একটা ব্যথা হচ্ছে। বউদিকে দেখেছি, গরম জলের বোতলের সেঁক দিতে। আজ রাত্রে দেব। কিন্তু ভয় আমার একটুও কাটছে না। তুমি শহরে না থাকায়, আমার আরো বেশি ভয় লাগছে। এখন আর কারোর কথা মনে পড়ে না। সব সময় তোমার কথা মনে হয়। বাবা মা দাদা ভাই বোন, কারোর কথাই মনে আসে না। দিনের বেলাটা তবু এক রকম কেটে যায়। রাত্তিরগুলো কিছুতেই কাটতে চায় না। অথচ এমন না যে তোমার সঙ্গে আমি রাত্রে কখনো থেকেছি। জান, এক এক সময় ভীষণ কান্না পাচ্ছে। আমি কারোকে একটি কথা বলতে পারি না। তুমি ছাড়া কাকে বলব। সুষমা, নতুনবউদি, রেখা তাদের একথা বলতে সাহস পাই না, বলতেও চাই না। মায়ের চোখের দিকে তাকালেই আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে। আজ হোক কাল হোক, মা জিজ্ঞেস করবে। প্রত্যেক মাসেই ঠিক সময়ে, মা একবার জিজ্ঞেস করবেই করবে। আমি অবশ্য কিছু বুঝতে দিচ্ছি না। তবে মায়ের চোখকে আমার বড় ভয় লাগে। বউদির অতশত খেয়াল থাকে না। ছেলেমেয়ে নিয়েই হিমসিম খাচ্ছে। বাবা দাদার কথা বাদই দিচ্ছি। তোমাকে নিয়ে মা আমাকে বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখে। মা যে বলে, খারাপ কেউ ইচ্ছা করে হয় না, অবস্থায় পড়ে হয়ে যায়। মেয়েদের বড় হলে, তাদের সাবধানে থাকতে হয়। বিপদ তাদেরই হয়, পুরুষদের না। তোমাকে আগেও বলেছি, মা আমাকে অনেকবার একথা বলেছে। তার জন্য ভেব না, আমি তোমাকে কিছু বলছি। আমি জানি, আমি খারাপ হয়ে যাই নি। তুমি থাকতে আমার কোন বিপদ নেই। আমার বিপদ, তোমারো বিপদ। কিন্তু তুমি যদি বিপদের কথা না জানতে পার, তা হলে কি হবে। কি করে তোমাকে জানাই। কেউ তোমার খবর জানে না। শেষটায় ভাবলাম, একমাত্র মোহনের সঙ্গে তোমার হয় তো দেখা হতে পারে। মোহন

হয় তো জানে, ওকে হয় তো বলে গেছ, তুমি কোথায় আছ। তাই এ চিঠি লিখে আজ মোহনদের বাড়ি যাব। ওকে চিঠিটা দিয়ে বলব, তোমাকে যেন পৌঁছে দেয়। যদি নাও বলে গিয়ে থাক, ওর সঙ্গে তোমার দেখা তো হবেই। ও তোমার সব থেকে বেশি বন্ধু, আমাদের সব কথাই জানে।

চিঠি পাওয়া মাত্র দেখা করবে না হয়তো লিখে জানাবে। আমার অবস্থা তো বুঝতেই পারছ। বেশি করে লিখে আর কি হবে। যা হয় ব্যবস্থা করবে। আর ঈশ্বরের দয়ায় তোমার যদি একটা চাকরি হয়ে যায়, তা হলে তো কথাই নেই। তোমার খবর পেতে দেরি হলে, আমি কি করব জানি না। আমার এখন আর কেউ নেই। প্রণাম নিও। ইতি

তোমার শিউলী।'

খামের মুখ খোলার সময়, মোহনের কপালের কাছে যেমন শির ফুলে উঠেছিল, এখন সেইরকম শির কপালের দু'পাশে ফোলা। ওর সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ও চিঠি থেকে মুখ তুলে সামনে তাকায়, সন্টু। কিন্তু সন্টুর মুখ ওর দৃষ্টিতে নেই, শিউলীর মুখ। ওর দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা আর কৌতূহল। সন্টুর চোখেও জিজ্ঞাসা এবং কৌতূহল কিন্তু ভিন্ন রকম। ওর অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা, কী চিঠি কী লেখা আছে। মোহনের চোখে অমীমাংসিত প্রশ্নের তীব্র জিজ্ঞাসা; অমীমাংসিত, কারণ ওর মনে কী প্রশ্ন জাগে, তা-ই পরিষ্কার না ঝাপসা। সন্টুর ধারণা, চিঠিটা পার্টির কোনো বিষয়ে কী না। কিন্তু মুহূর্তে' মোহনের অন্যমনস্ক গাম্ভীর্য দেখে, হঠাৎ কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। মোহন আবার চিঠিটা প্রথম থেকে পড়ে বিশেষ বিশেষ জায়গায়।

বাইরে বাতাস থেকে থেকে উতলা হয়। আশেপাশের গাছের পাতায় ঝাপটার শব্দ শোনা যায়। ঠাকুরের পটের কাছে জ্বালানো প্রদীপ থেকে থেকে মুছে যায় যখন বাতাস আসে, আর তখন গন্ধ আসে কৃষ্ণকলি ফুলের, মিশে যায় প্রদীপের তেলের আর হ্যারিকেনের কেরোসিনের ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে। এই সময়ে পদ্মাবতী এ ঘরে আসেন। দু হাতে দুটি কাচের গেলাসে ধূমায়িত চা। মোহন ওঁর দিকে ফিরে তাকায়, আর তৎক্ষণাৎ ওর উজ্জ্বল চোখে একটি ঝিলিক খেলে যায়, আবার শিউলীর মুখ ওর চোখের সামনে জাগে, এবং হৃদিবেশেরও এবং যেন ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এক অদ্ভুত দৃশ্যে যা একটা কষ্ট আর আঘাতের মতো বাজে। শিউলী আর হৃদিবেশ এক অপরের প্রেমে, প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। শিউলী-হৃদিবেশ, ওরা দুজন! বিস্ময়ের আঘাত মোহনের চোখে মুখে।

'কী রে মোহন? কী হলো তের? হাতে কী?' পদ্মাবতী দুটি গেলাস ওদের সামনে রাখেন।

মোহন তাড়াতাড়ি ছেঁড়া খামের মধ্যে চিঠি রাখতে রাখতে বলে 'কিছু না।'

পদ্মাবতী নুয়ে পড়ে চিঠিটা নিতে যান, তাঁর লাল ডোরা খসে পড়ে বুকে থেকে বলেন, 'দেখি।'

মোহন তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে, 'এ আপনার দেখবার মতো না।'

পদ্মাবতী আঁচল ঠিক করে বলেন, 'কোনো মিতেন জুটিয়েছিস বুঝি?'

মোহন কিছু না বলে চায়ের গেলাস তুলে চুমুক দেয়, পদ্মাবতীর দিকে তাকায়, যেন তাঁর মধ্যেই কিছু খোঁজে। পদ্মাবতীর কালো সরু ভুরু কুঁচকে ওঠে, সন্টুর দিকে একবার তাকান, মোহনকে জিগ্যেস করেন 'আমাকে কী দেখছিস অমন হাঁ করে?'

মোহন লজ্জা পেয়ে হেসে অপ্রস্তুত। বলে, 'আপনার কথা কিছু ভাবছি না।'

পদ্মাবতী দাঁড়ান না, চলে যেতে যেতে বলেন, 'বেস আসছি, আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

শিশেরও লাবণ্য থাকে এবং ঝলক যা উচ্ছ্বাস তেমন না, নদীর মাঝখানের ঢেউয়ের মতো তেমনি ঢেউয়ের মতো পদ্মাবতী চলে যান। সন্টু জিজ্ঞেস করে 'কার চিঠি রে?'

মোহন হঠাৎ কিছু বলে না, চায়ের গেলাসে চুমুক দেয়, তারপরে বলে, 'পরে বলব।'

সন্টু তথাপি জিজ্ঞেস করে, 'পার্টির কোনো চিঠি নাকি?'

'না'।

সামান্য এই একটি কথায় সন্টুর মন অশান্ত হয়, রাগও হয়। বলে, 'আগে বললি, পরে বলবি, এখনো বলছিস পরে বলবি, কী ব্যাপার?'

মোহনের মনে এখন অপরাধ আর অনুতাপ বোধ। ও শিউলীর বিশ্বাসের মূল্য রাখতে পারেনি। চিঠির শেষ কথা মনে পড়ে যায়। 'ও তোমার সব থেকে বেশি বন্ধু, আমাদের সব কথা জানে।' এখনো অন্য কেউ জানে না। মোহন ছাড়া কিন্তু চিঠির কথা শিউলী মোহনকেও জানাতে চায় নি, তাই খাম বন্ধ করা চিঠি দিয়েছে। আরো মনে পড়ে যায় 'আমার এখন আর কেউ নেই।' মোহনের আঠারোর বুক যেন বিদীর্ণ হয়, এবং তৎক্ষণাৎ একটা উদ্বেগে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠে। কোথায় হৃদিবেশ, শিউলীর কী হবে?

সন্টুও এবার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, ওর মুখে দুশ্চিন্তা ফোটে। মোহনকে দেখে, ওর নির্বাক আচ্ছন্নতায় একটা গুরুতর ঘটনার সংকেত পায় যেন। সেই কারণেই ওর কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। পদ্মাবতী এ ঘরে আসেন, বাঁ কাঁখে একটি চুপড়ি, ডান হাতে তাঁর চায়ের গেলাস। নিচু হয়ে আগে চায়ের গেলাস রাখেন তারপরে চুপড়ি যার মাথা কাঁচা কলাপাতায় ঢাকা, ওপরে বড় ঢাকা দেওয়া।

বসতে বসতে বলেন, 'ঘণ্টের আঁচে চা করে নিয়েছি। কয়লা চাপিয়ে দিয়েছি, এবার কুটনো কেটে নিই। হ্যাঁ, এবার বলতো কার চিঠি পড়ছিলি? সন্টু বল্।'

তিনি সন্টুর দিকে তাকান। সন্টু মোহনের দিকে তাকায়, মোহন বলে, 'ও জানে না।'

পদ্মাবতী অবাক হয়ে বলেন, 'বন্ধুও জানে না? চোরাই মাল নাকি রে?'

মোহন জিজ্ঞেস করে, 'চোরাই মাল মানে?'

পদ্মাবতী হেসে বলেন, 'কারোর চিঠি চুরি করে এনে পড়ছিস বোধ হয়?'

মোহন যেন একটু থতিয়ে যায়, আগেই বলে 'না' কিন্তু অনেকটা যেন সত্যিই চুরি এরকম ওর মুখের অভিব্যক্তি। চুরি করে আনা না, কিন্তু চুরি করে পড়া নিঃসন্দেহে। পদ্মাবতী মোহনের মুখের ভাব লক্ষ করেন না, চায়ের গেলাসে চুমুক দেন, তারপরে বলেন, 'আমরা অনেক চিঠি চুরি করে পড়েছি।'

মোহন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তাই নাকি?'

পদ্মাবতীর মাথায় ঘোমটা নেই, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেন 'হ্যাঁ, বন্ধুদের চিঠি। আমাদের আগে যাদের বিয়ে হয়ে গেছল তাদের বরেদের লেখা চিঠি, আমরা চুরি করে পড়তাম।'

মোহন সরলভাবেই জিজ্ঞেস করে, 'কী লেখা থাকতো সেই সব চিঠিতে?'

মোহনের সরলতার পিছনে আসলে অন্য জিজ্ঞাসা, শিউলীর বিপদ থেকে উদ্ধারের কোনো ইঙ্গিত মেলে কী না। পদ্মাবতী হাত তুলে মারতে উদ্যত হয়ে বলেন, 'তোকে তা বলবো কেন রে ছোঁড়া? খুব পেকে উঠেছিস দেখছি।'

মারটা ঘাড়ের ওপর পড়তে পারে ভেবে, মোহন মাথা নিচু করে শক্ত ঘাড় নামায়। সন্টু হাসে। পদ্মাবতী বঁটিটা মেঝেয় নামিয়ে বলেন, 'সে সব কত্তো কথা লেখা থাকতো। বিয়ে হলে, বউ কাছে না থাকলে তোরাও এইরকম লিখে চিঠি দিবি, মিছি-মিছি বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা লিখবি।'

মোহন আবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মিছিমিছি বানিয়ে বানিয়ে?'

পদ্মাবতী হাসতে হাসতে বলেন, 'তা ছাড়া আবার কী। ব্যাটাছেলেরা বউদের যা বলে সব বানিয়ে বানিয়ে মিছিমিছি বলে। মেঘদূতের যক্ষের মতো। ওসব ব্যাটা-ছেলেরাই পারে। ভাগ্যিস্, আমার কপালে তেমন হয়নি।'

সন্টু একটু কৌতূহলিত হয়, জিজ্ঞেস করে, 'পণ্ডিতমশাই আপনাকে কোনো চিঠি দেন না?'

পদ্মাবতী বলেন, 'দেবে না কেন। ইস্কুল থেকে এটা সেটা চেয়ে ছাত্রদের দিয়ে চিঠি পাঠান, খোলা চিঠি। তাতে তো আর,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে

বিভূতি-সাহিত্যানুরাগীদের বিশেষ সুবিধা

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভূতিভূষণের জন্মদিন উপলক্ষে বিভূতিভূষণের নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি এবং

বিভূতি রচনাবলী

খুচরা বা সম্পূর্ণ সেট সাধারণ ক্রেতাদের বিশেষ কমিশনে দেওয়া হইবে।

রচনাবলীর সম্পূর্ণ সেট লইলে মোট ১৮১, টাকার বই ১৪৪·৮০ পয়সায় (শতকরা ২০ টাকা অর্থাৎ ২০% কমিশন বাদ দিয়া) পাইবেন। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন খণ্ড ফুরাইয়া যায়—সেই খণ্ড বাদে পুরো সেট লইলেও ঐ কমিশন পাইবেন। রচনাবলীর খুচরা খণ্ড ও নিম্নোক্ত যে কোন বইতে শতকরা ১৫, টাকা কমিশন পাইবেন। ভিঃ পিঃ যোগে যাঁহারা এক সেট রচনাবলী সংগ্রহ করিতে চান তাঁহাদের অর্ডারের সঙ্গে ২৫, টাকা অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে হইবে। ডাকব্যয় আলাদা লাগিবে।

এজেন্টগণ পূর্ণ সেট লইলে শতকরা ২৫, টাকা কমিশন পাইবেন। মফঃস্বলের এজেন্টগণ অর্ডারের সহিত অবশ্যই ৩০, টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

পথের পাঁচালী ৮, অপরাজিত ১২, অনুবর্তন ৬, আরণ্যক ৭॥ অথৈজল ৫॥ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৬, ঐ (নাটক) ২॥ ইছামতী ৯, কিন্নর দল ৩, কুশল পাহাড়ী ৫, দেবযান ৭॥ মেঘমল্লার ৪॥ শ্রেষ্ঠ গল্প ৬॥ নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব ৪, দৃষ্টি প্রদীপ ৭,

অশনি সংকেত ৫॥

আরো একটি ২, পথের পাঁচালী (পেপার ব্যাক) ৪, অভিযাত্রিক ৫॥ অরণ্যমর্মর ৭॥

এই সুবিধা ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেওয়া হইবে।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২ ফোন ৩৪-৩৪৯২/৩৪-৮৭৯১

আপনার মুখ-শ্রীর অনুরাগী অনেক
আপনার ত্বকের শত্রু-ও বহু
পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার মস্ত সহায়
নতুন রূপে পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম
আদর্শ পাউডার বেস
POND'S
VANISHING CREAM
চীজব্রো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড

রাত্রে ঘুম নেই, কতোদিন তোমাকে একটু আদর করি নি, এসব লেখা থাকে না।'

মোহনের মনে তখন অন্য জিজ্ঞাসা উপস্থিত। জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা কাকিমা, আপনার বন্ধুরা তাঁদের বরকে চিঠিতে জিজ্ঞেস করতেন না, পেটে বাচ্চা এসে গেলে কী করবে?'

প্রশ্নে কেবল পদ্মাবতী না, সন্টুও অবাক চোখে বন্ধুর দিকে তাকায়। পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করেন, 'সেটা আবার কী?'

মোহনের জিজ্ঞাসা এখন পাত্র পরিবেশ ভুলে যায়, বলে, 'যদি বাচ্চা ইয়ে করতে হয়, ওই মানে, নষ্ট করতে চায়?'

পদ্মাবতী প্রথমে সত্যি কথা বলতে পারেন না, এতো অবাক হন, তারপরেই হাত বাড়িয়ে মোহনের চুলের মুঠি টেনে ধরে বলেন, 'তবে রে বদমাইস্, আমাকে এইসব জিজ্ঞেস করা হচ্ছে?'

মোহন তাড়াতাড়ি পদ্মাবতীর হাত শক্ত ধরে বলে, 'উহ্ কাকীমা লাগছে, সত্যি বলছি।'

পদ্মাবতী চুলের ঝুঁটি টেনে টেনে বলেন, 'তবে কি তোকে আদর করছি, পাজী ছুঁচো কোথাকার। বল্, কোথায় কী করেছিস্। নিশ্চয়ই কিছু একটা গণ্ডগোল করেছিস।'

সন্টু হাসে। মোহন বলে, 'ছি ছি, কাকীমা এসব কী বলছেন? আমি এমনি জিজ্ঞেস করলাম।' পদ্মাবতী চুল ছেড়ে দিয়ে সন্টুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'পাজীটার কথা শুনেছিস, দিনকে দিন এটা কী হচ্ছে?'

সন্টু এবার জোরে হেসে ওঠে। পদ্মাবতী বলেন, 'আমার পেছনে লাগা হচ্ছে না?'

মোহন এতক্ষণে চেতনা ফিরে পায়। এরকম সোজাসুজি জিজ্ঞেস করা উচিত হয় নি। ও বলে, 'কিন্তু আপনিই তো একদিন বলছিলেন, আর ছেলেপিলে হতে দেবেন না, কী সব খাবেন।'

পদ্মাবতী বলেন, 'বলেছি তো জ্বালায়, বলেছি, পেটপোড়া খাবো। আর যেন ছেলেমেয়ে না হয়। তা বলে কি আমার বন্ধুরা বরেদের কাছে পেটপোড়ার কথা জিজ্ঞেস করতো? তারা কেউ নষ্ট করার কথা চিন্তা করতো না। ওসব হলো ভগবানের দান।'

মোহন প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'একগোটা হলেও ভগবানের দান হবে?'

পদ্মাবতী খিলখিল করে হেসে ওঠেন, বলেন, 'ফাজিল কোথাকার। আমরা কি গান্ধারী নাকি যে একশোটা ছেলে হবে? তবে হলে, ভগবানের দান বলতেই হবে। তোদের পণ্ডিতমশাই ওসব আবার মানে না। সাহেব মেমদের কথা বলে। সাহেব মেমদের

॥ অনন্যা মৌসুমী এবারেও অনন্য ॥

৬টি বিভাগে ৬টি করে অতুলনীয় রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে ৬ষ্ঠ বর্ষের শারদ অর্ঘ্য সব বয়সের সবার মনোহারিণী হবে কারণ

যুগোপযোগী উপন্যাস লিখেছেন — আশাপূর্ণা দেবী ॥ আশুতোষ মুখোঃ নিমাই ভট্টাচার্য ॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ বিক্রমাদিত্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শীর্ষেন্দু মুখোঃ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ বরেন গঙ্গোঃ শক্তিপদ রাজগুরু ॥ তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী — ভিন্ন স্বাদের বড় গল্প লিখেছেন

সমরেশ বসু। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আশা দেবী ॥ শৈলেন রায় সুভাষ সমাজদার ॥ শংকর দাশগুপ্ত ॥ কুমার মিত্র ॥ অশোক সেনগুপ্ত ॥ আদিত্য সেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় — মিঠে মিঠে গল্প লিখেছেন

বিরূপাক্ষ ॥ কুমারেশ ঘোষ ॥ অমল গঙ্গোঃ এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ জ্যোতির্ময় দাশ বীরেন দাশ — বৈচিত্র্যময় রম্যরচনা লিখেছেন

মননশীল বিশেষ রচনা লিখেছেন — চন্দ্রাবতী দেবী ॥ সরযূ দেবী ॥ মতি নন্দী রাসবিহারী সরকার ॥ দেবনারায়ণ গুপ্ত সুবিনয় রায় ॥ অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সুধীনকুমার মিত্র ॥ শঙ্কু মহারাজ ॥ পি. জি. সমরজিৎ কর ॥ শুক্রাচার্য ॥ অমিতাভ চৌধুরী — উপভোগ্য বিচিত্র রচনা লিখেছেন

—এ ছাড়া—

চলচ্চিত্র জগতের আকর্ষণীয় সংবাদ ও মনোমুগ্ধকর রচনা লিখেছেন—অশোক মজুমদার। নির্মল ধর। বাংলা, হিন্দী, বিদেশী, বাংলাদেশের ছবি ও বিচার।

দাম—সাড়ে ছ'টাকা • সডাক—সাত টাকা আশি পয়সা

॥ মৌসুমী প্রকাশন ॥

১০।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ • ফোন: ৩৪—৩৩০৮

[সি ৭৬৯৪]

কথা আমরা কী জানি? আমরা কি সাহেব মেম?'

মোহনের মুখে তৎক্ষণাৎ নতুন প্রশ্ন উচ্চারিত হয়, 'সাহেবমেমরা কিন্তু একটা করে, না?' পদ্মাবতী তাঁর লাল ঠোঁট উলটে বলেন, 'কী জানি ছাই কী করে। তোদের পণ্ডিতমশাই-ই জানে।' বলে তিনি আবার হাসেন। মোহন আবার জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা কাকীমা, পেটপোড়া জিনিসটা কী?' পদ্মাবতী বলেন, 'আমি কি কোনোদিন খেয়েছি যে জানবো? গুগুলিকে জিজ্ঞেস করিস ও বলতে পারবে। শুনেছি, ও নাকি পেটপোড়া দেয়।'

মোহনের চোখ সন্টুর দিকে, সন্টুও ওর দিকে তাকায়। দুজনেই যেন লজ্জা পায়, পদ্মাবতীর অনায়াস কথায়। গুগুলি নাম সর্বত্র অনায়াসে উচ্চারণ করা যায় না। পদ্মাবতী অনায়াসে তা করেন। গুগুলি ওস্তাগার গলির মেয়ে না, তথাপি তার নামের সঙ্গে সেইরকম একটা নিষিদ্ধ সংকেত আছে। এ শহরে এখনো গ্রামের চিন্তা ভাবনা মন বর্তমান। গুগুলি নামে ঠিক না, গুগুলির বাড়ি বললেই তা ওস্তাগার গলির মতো নিষিদ্ধ হয়ে ওঠে। অভিজাত রমণবস্তির সঙ্গে গুগুলির বাড়ির তুলনা হয় না। গুগুলি জাত বিচারে, নিচের তলার স্ত্রীলোক, গঙ্গার ধারের কাছাকাছি, ক্যাওড়া পাড়ায় নিজগৃহে বাস করে। অতীতে কখনো হয় তো সে বিবাহিতা ছিল, পরবর্তী কালে সে ইচ্ছা মতো পুরুষের সঙ্গে বাস করেছে। তার একটি মেয়ে, সেও সেইরকম ইচ্ছাময়ী, ইচ্ছামতো পুরুষকে নিয়ে জীবনযাপন করে। এবং আরো কিছু, সেই রকম ইচ্ছাময়ী মেয়ে যে গুগুলির আশ্রয় থাকে শহরের সবাই তা জানে এবং বয়স্কা গুগুলি পাড়ায় পাড়ায় ইতর ভদ্র সকলের পরিচিতা। একদা গ্রাম, এই শিল্প শহর, বস্তি বাদ দিলে, এই মধ্যবিত্তের সীমানায় অনেকেরই গুগুলির বাড়ি যাতায়াত আছে কারণ গুগুলির বৃহৎ সংসার অচল না। যদিও সেখানে গাভী গোয়াল আছে, দুধ ঘুঁটে ইত্যাদি বিক্রী হয়, তথাপি গুগুলির বাড়িতে নানা পুরুষের যাতায়াত। হারমোনিয়াম সহযোগে গান শোনা যায়, আরো আরো বহুতর রঙ্গ, তবে সদ্বৃত্তের মার নেই, তবু গুগুলির বাড়ি মানেই নিষিদ্ধ বাড়ি। গুগুলি নামও অনায়াসে উচ্চারিত হয় না।
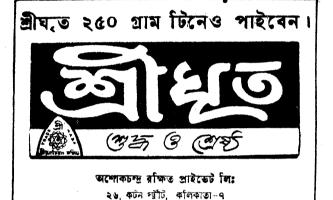
সব ঋতুতেই পরে আরাম
আলপনা
হাওয়াই চপ্পল
গ্যারান্টিযুক্ত
রেজিঃ ট্রেডমার্ক নং ২২১০৯৬

পেটের বেদনা রোগে

রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লপিত্ত, পিত্তশূল, লিভার ব্যথা, মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বুকজ্বালা, মন্দাগ্নি, আহারে অরুচি ইত্যাদি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। বিফলে মূল্য ফেরৎ
৩৮৪ গ্রামের কৌটা ৪ টাকা। ডাঃ মাঃ ও পাইকারীদর পৃথক। সর্বত্র পাওয়া যায়
দি বাক্‌লা ঔষধালয় ১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭

মোহন জিজ্ঞেস করে, 'পেটপোড়া খেলে পেট নষ্ট হয়ে যায়?'

পদ্মাবতী হেসে, ধমকে ওঠার মতো করে বলেন, 'দূর বোকা! পেটপোড়া খেলে, ছেলেপিলে মোটেই হয় না। দেখিস্ না, ওদের কারোর ছেলেপিলে হয় না?'

মোহন তা মনে করতে পারে না, গুগুলির বাড়ির মেয়েদের সন্তান দেখেছে কী না। ও জিজ্ঞেস করে 'কিন্তু যদি হয়ে বন্ধ হয়ে যায় মানে পেটে বাচ্চা এসে যায়?'

পদ্মাবতী আবার মারতে উদ্যত হয়ে বলেন 'এই দ্যাখ্ মোহন, জ্বালাস্ নে। বাজে বাজে কথা খালি। আমি কি ওসব জানি নাকি? কী হয়েছে সত্যি করে বল্ তো? কিছু হয়েছে নাকি?'

পদ্মাবতীর ডাগর চোখে অকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা। মোহন এবার হেসে ওঠে, বলে, 'আপনি যে কী বলেন কাকীমা! এমনি আপনি বলেই জিজ্ঞেস করলাম।'

পদ্মাবতী হাতে এক ফালি কুমড়ো নিয়ে বলেন, 'কী জানি বাপু, তোদের আজকালকার ছেলেমেয়েদের কিছু বিশ্বাস নেই।'

এ সময়ে পণ্ডিতমশাইয়ের মেয়ে বাড়ি ফেরে একজনের সঙ্গে। মোহন উঠে দাঁড়ায় সঙ্গে সন্টুও। পদ্মাবতী মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন, 'এত দেরি করলি? জানিস তো

আমি সন্ধেবাতি দিতে পারবো না, গঙ্গা-জল ছিটোতে পারবো না। নে, তাড়াতাড়ি হাত পা ধুইয়ে আগে চারদিকে একটু গঙ্গা জল ছিটিয়ে দে।'

মোহন বলে, 'যাচ্ছি কাকীমা।'

পদ্মাবতী বলেন, 'আয়। আবার আসিস। সন্টু আসিস।'

সন্টু বলে, 'আসবো।'

দুজনেই বাইরে বেরিয়ে আসে। অন্ধকার নিবিড় রাস্তার আলোগুলো আলোর ইশারা মাত্র, তার সাহায্যে কিছুই দেখা যায় না। মানুষের সব কিছু অভ্যাস হয়ে যায়, আস্তে আস্তে অন্ধকারে চলতে সকলেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। আকাশ দেখা যায় না, মেঘে ঢাকা তারারা অদৃশ্য, বাতাস সেই একরকম, মাঝে মাঝে উতল জলো বাতাস। ওরা শহরের বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ায়, কলকাতার সঙ্গে যার যোগাযোগ। হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা জীপ দ্রুত চলে যায়, মিলিটারি জীপ। মোহন বাঁ দিকে হাঁটে।

সন্টু জিজ্ঞেস করে, 'বকুলতলায় যাবি না?'

মোহন বলে, 'না।'

ছোট একটা বিড়ি সিগারেটের দোকান থেকে মোহন দুটি সিগারেট কেনে। একটা সন্টুকে দেয় আর একটা নিজে জ্বলন্ত দড়ি থেকে ধরায়। সন্টুও সিগারেট ধরায়। মোহন কয়েক পা এগিয়ে বলে, 'চিঠিটা শিউলীর। ত্রিদিবেশকে লিখছে। আমি খুলে পড়ে ফেললাম। কারোকে যেন বলিস না।'

ওর কথার বৃত্তান্ত এমন-ই আকস্মিক সন্টু চমকে যায়, হঠাৎ কিছু বলতে পারে না। ওরা কেউ কারোর মুখ ভালো করে দেখতে পায় না। আরো কয়েক পা চলবার পরে, সন্টু জিজ্ঞেস করে 'এখন কোথায় যাবি?'

মোহন বলে, 'বুঝতে পারছি না। শিউলীর খুব বিপদ। ত্রিদিবেশকে খুঁজে বের করতেই হবে।'

সন্টু জিজ্ঞেস করে, 'কী বিপদ?'

মোহন বলে, 'ভয়ংকর। আমি কী করবো, বুঝতে পারছি না।'

সন্টু জিজ্ঞেস করে, 'ত্রিদিবেশ ছাড়া কোনো উপায় নেই?'

মোহন একটু চুপ করে থাকে। হাঁটতে ভুলে যায়, তারপরে বলে, 'ত্রিদিবেশই বা কী করবে, আমি বুঝতে পারছি না। ও কোথায় কে জানে? আমি কী করবো? আমি কি এখনই একবার শিউলীদের বাড়ি যাবো?'

সন্টু মোহনকে এরকম নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার মতো কথা বলতে কখনো শোনেনি, আর এমন অস্থির উদ্বিগ্নও না। ও অবাক চোখে মোহনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ক্রমশ

লাইব্রেরীতে রাখার মত বই

বিমল মিত্র-র
সর্বাধুনিক উপন্যাস
লজ্জাহরণ ৬·০০

চাণক্য সেন-এর
সর্বাধুনিক উপন্যাস
সবে শুরু ৬·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর
সর্বাধুনিক রহস্য উপন্যাস
অন্ধ গ্রাস ৬·০০ সবুজ নক্ষত্র ৬·০০

দেবেশ রায়-এর
সর্বাধুনিক রহস্য উপন্যাস
আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে ৫·০০

সৈয়দ মুজতবা আলী ও রঞ্জন-এর
সেই বিখ্যাত গ্রন্থ
দ্বন্দ্ব মধুর ৬·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর
একমাত্র রহস্য উপন্যাস
অচেনা মানুষ ৫·০০

বিক্রমাদিত্য-র
আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস
রিভলুশন ৮·০০

চিরঞ্জীব সেন-এর
বিচিত্র সব স্পাইদের ঘটনা
যুদ্ধ আর যুদ্ধ ৮·০০ শিরায় শিরায় পাপ ৬·০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯

(সি ৭৭৭৪/১)

মায়াময়ী
হয়ে
বিজয়িনীর
রূপ
ধরুন
লক্ষ্মী
বিষ্ণু ও
TERENE
'টেরীন'-এর
অবদান—
মনোহর
সুন্দর
বহু
রকমের
১০০%
'টেরীন'
শাড়ী

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কাল-চারের ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউস। লিফটের 'দু' নম্বর বোতাম টিপে তিন-তলায় উঠলাম। ষোল নম্বর কামরায় টোকা দিতে শ্রীমতী ভারতী মুখার্জি দরজা খুলে হাসিমুখে বললেন,—আসুন আসুন।

কলকাতার মেয়ে ভারতী "দি টাইগারস ডটার" লিখে মারকিন মুলুক জুড়ে নাম করেছেন। নিউজ উইক, নিউ ইয়রক টাইমস, ওয়াশিংটন পোসট ও নিউ স্টেটসম্যান প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে তাঁর উপন্যাসের। টাইম ম্যাগাজিনেও তাঁর ছবি সমেত "রিভিউ" করা হয়েছে। ওয়াল স্ট্রীট জারনালের বিচারে উনিশ শ' বাহাত্তর সালে প্রকাশিত সেরা উপন্যাসগুলির মধ্যে "দি টাইগারস ডটার" অন্যতম। প্রচুর বিক্রি হয়েছে। এ বছর জুন মাসে লনডন থেকেও বিলিতি সংস্করণ বেরিয়েছে। "দেশ" পত্রিকাতেও তাঁর উপন্যাস সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। কলকাতার সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র নিয়ে লেখা তাঁর এই প্রথম উপন্যাসেই তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের সংস্কার, সাবেকী মানসিকতা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়ার ছবি এঁকেছেন। তাঁর মতে এটা সামাজিক বিপ্লব। বিপ্লবের জোয়ারে নানা সংস্কার, পুরনো দিনের চিন্তাধারা, শ্রেণী, সব কিছু ভেসে যাচ্ছে। এক সময় ব্রাহ্মণরা ছিলেন "বাংলার বাঘ"। তাঁরা আর বাঘ নেই। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ব্রাহ্মণ-কন্যা দেখছেন তাঁর পরিবারের কাহিনী চিত্র, অন্তর্জ্বালা। দীর্ঘদিন আমেরিকায় বাস করছেন। আমেরিকান বিয়ে করেছেন। তবুও সেই জ্বালা থেকে তাঁর রেহাই নেই।

ব্যক্তিগত জীবনে ভারতী আর মুখার্জি

ভারতী ব্লেজ (মুখার্জী)

নান। কানাডাবাসী শ্রীক্লারক ব্লেজকে বিয়ে করে মিসেস ভারতী ব্লেজ হয়েছেন। দু'জনেই কানাডায় দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক। দু'জনই লেখক। ভারতী মিগেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষার অধ্যাপক ও গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম বিভাগের ডিরেকটর। আর ক্লারক মনট্রিল শহরের স্যার জরজ উইলিয়মস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর-ইন-ইংলিশ ক্রিয়েটিভ রাইটিং বা ইংরাজি সৃজনশীল রচনা বিষয়ের অধ্যাপক। দুটি ছেলে। বড় ছেলেটি নয় বছরের। নাম বর্ট আনন্দ। ছোটটি পাঁচ বছরের। নাম বারনার্ড সুধীরণ। ভারতী ও ক্লারক দু'জনে মিলে ছেলে দুটির নাম দিয়েছেন। ইংরাজি ও বাংলা মিশিয়ে। নামের ইংরাজি অংশ ক্লারকের দেওয়া। আর বাংলা ভারতীর। আমেরিকায় শিকাগোর কাছাকাছি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাইটারস ওয়ারকশপে একষট্টি সালে আলাপ। বাষট্টিতে বিয়ে। দুজনেই সেখানে পড়তে গিয়েছিলেন।

আগেই যাব বলে রেখেছিলাম। নির্দিষ্ট সময়ে কর্তা-গিন্নী অপেক্ষা করছিলেন। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে ওঁদের আসার খবর পাই। অগাস্ট মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত ওঁরা কলকাতায় ছিলেন। এখান থেকে দিল্লি গিয়েছেন। ডায়েরীর রীতিতে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন সম্পর্কে তথ্যবহুল বই "বেঙ্গল জারনাল" লেখার জন্য ওঁরা এখানে এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন। জানুয়ারি-ফেবরুয়ারি মাসে আবার আসবেন। দু'জনে মিলে বইটি লিখছেন।

ক্লারক জীবনে প্রথম কলকাতা এসেছিলেন। আর ভারতী চৌদ্দ বছর পর। এই চৌদ্দ বছরের মধ্যে বারো বছর বিদেশে। দীর্ঘদিন বিদেশে অন্য পরিবেশ, অন্য সমাজে থেকেও তাঁর কলকাতা সম্বন্ধে ভালবাসা কমেনি। "কলকাতাকে ভালবাসি। এখানে এলে সব কিছু নিজের মনে হয়। এখানকার মানুষ, এখানকার রাস্তাঘাট, গাছপালা যেন নিজের। কিছু বড় বড় বাড়ি হওয়া ছাড়া শহরটা আগের মত আছে। কেবল ভিড় বেড়েছে এই যা।"

চৌদ্দ বছর আগে বাবার সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে বরদা চলে যান। এখানে লোরেটোয় লেখাপড়া করেছেন। লোরেটো মানে ইংরাজী মাধ্যমে শিক্ষা। কথাবার্তা, চালচলনে ইংরাজিপনা। বাংলা বা হিন্দির জায়গা বিশেষ নেই। ভারতীর ইংরাজী শিক্ষা সেখানে। উচ্চারণটাও বিলিতি।

বরদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরজী ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে এম-এ পাশ করে ভারতী আমেরিকা যান। সেখানে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃজনশীল রচনা বিষয়ে এম-এফ-এ বা মাস্টার অব ফাইন

একটা নতুন খবর!
মহালয়ার আগেই ঘরে বসে রেডিও এবং ট্রানজিস্টর সেট
নির্মাণ ও মেরামত করে নিন!
বেতার বিজ্ঞান
সম্পাদনা—এস সি শীল
দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রতিখণ্ড মূল্য দশ টাকা
শুধুমাত্র ট্রানজিস্টর সেট নির্মাণ ও মেরামতের জন্য সংগ্রহ করুন
আধুনিক ট্রানজিস্টর
রচনা ও সম্পাদনা : এস সি শীল
মূল্য আট টাকা
এখন সারা ভারতে সমস্ত বইয়ের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে।
পাবলিশার্স ওর্নাল ॥ ২৭/এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫
(সি ৭৬৪২)

আর্টস ক্লাসে ভর্তি হন। এম-এফ-এ পাশ করার পর পি-এইচ-ডি। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাইটার্স ওয়ারকশপে ভর্তি হন। ওয়ারকশপের তিনটি শাখা—গল্প-উপন্যাস, কবিতা ও অনুবাদ। ভারতী গল্প-উপন্যাস শাখায় যোগ দেন। নানাদেশ থেকে যেসব কবি ও লেখক এই ওয়ারকশপে যোগ দিতে যান, আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। একই সময়ে কানাডা থেকে ক্লারকও ওই ওয়ারকশপে যোগ দেন।

কানাডার ছেলে ক্লারক। কানাডা ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াতে বিধিনিষেধ নেই। দু'দেশের মানুষের মধ্যেও চালচলন, মেজাজে বিশেষ তফাৎ নেই। মোটামুটি-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রকমের জটপাকানো লোকাচার ও সংস্কৃতিতেও মিল আছে। ভাষাও এক—ইংরাজি। তবে কানাডায় কিছু লোকের মধ্যে ফরাসী ভাষা নিয়ে মাতামাতির প্রবণতা আছে। দু'দেশেই বাইরের নানা জায়গা থেকে মানুষ গিয়ে নীড় বেঁধেছেন। নানা ধরনের মানুষ, নানা ধরনের লোকাচার ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে আজকের কানাডা, আজকের আমেরিকা। আমেরিকার মানুষ বলতে সাধারণত বিশেষ কিছু ভেবে থাকি। যাঁদের চালচলন, হাবভাব, জীবনযাপন রীতি চোখ ধাঁধানোর মত হবে। তাঁদের মনের রঙে থাকবে কিছুটা উগ্রতা ও জীবনের গতিতে অসম্ভব উচ্ছ্বাস। কানাডা সম্বন্ধেও একই ধারণা। আমরা দূরের মানুষ—কানাডা ও আমেরিকাকে ঠিক আলাদা চোখে দেখি না।

ক্লারকে দেখলে এই ধারণায় মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। বেশবাসে চাকচিক্য নেই, সাদাসিধে আপনভোলা মানুষ। লেখা আর অধ্যাপনা নিয়ে আছেন। তাতেই জীবনটা ভরিয়ে তুলেছেন। দু'মিনিট কথা বললে মানুষটাকে কাছের বলে মনে হয়। জানতে ও জানাতে সমান আগ্রহ। "ড্রিমিং অব রকেট উই শট" বই লিখে বেশ নাম করেছেন। এখন "নর্থ আমেরিকান এডুকেশন" ও "ট্রাইবাল জাসটিস" নামে দুটি বই লিখছেন। আর ভারতীর সঙ্গে "বেঙ্গল জারনাল" লেখায় মন দিয়েছেন। কলকাতায় যে ক'দিন ছিলেন, সে ক'দিনই বাড়ি বাড়ি নেমতন্ন খেয়েছেন, লাইব্রেরী ঘুরেছেন আর গম্ভীর মাতৃভাষা বাংলা শেখার চেষ্টা করেছেন। আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগের মুহূর্তেও বাংলায় গোটা গোটা অক্ষরে কাকিমা, মাসিমা ইত্যাদি লিখছিলেন। তাঁর বাংলা হাতের লেখার খাতা দেখলাম। ভারতী সেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, মুশকিল হয়েছে যুক্তাক্ষর নিয়ে। ওকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

কলকাতায় জামাই আদর ক্লারকের খুব ভাল লেগেছে। ভারতীর আত্মীয়, বন্ধু যাঁর বাড়িতে গিয়েছেন, সেখানেই তাঁকে পরম আত্মীয়ের মত গ্রহণ করা হয়েছে। খাতিরের চোটে মাঝে মাঝে কুণ্ঠাবোধ করেছেন। লাজুক স্বভাবের মানুষ, কুণ্ঠাও কিছুটা বেশি। স্ত্রীকে তাঁর কুণ্ঠার কথা জানিয়েছেন। ভারতী হেসে বলেছেন—বাংলাদেশে জামাইকে এভাবেই আদর করা হয়। জামাইআদর মানে প্রচুর খাতির ও রাশি রাশি খাওয়া। জামাই খেতে বসলে তাঁর চারদিকে বাড়ির সবাই ভিড় করে থাকবেন। কলকাতায় এসে ক্লারক দু'চারদিনের মধ্যে এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে ভিন্নরুচির খাদ্য ও চারপাশে অপরিচিত মানুষের ভিড়ে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। তারপর ভিড় করা মানুষগুলোর আন্তরিকতার খোঁজ পেয়ে তাঁদের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন।

দীর্ঘদিন বিদেশে। সেখানে বিদেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বিদেশী বিয়ে করেছেন। তবুও ভারতী খুব একটা বদলান নি। চালচলন, কথাবার্তায় এখনও বাঙালী ভাব পুরোপুরি ঘোচেনি। সাজসজ্জায় আধিক্য নেই। পরণে হালকা রঙের ছাপা শাড়ি। কানে পাথর বসানো দুল, গলায় সরু হার। কপালে ফিকে লাল রঙের টিপ। চোখ দুটো ভরা ভরা, উদাস উদাস ভাব। সব মিলিয়ে কমনীয় ব্যক্তিত্ব।

কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার অনুমতি চাইলাম। ভারতী হেসে বললেন, আপনার যা ইচ্ছে করতে পারেন। অবশ্য উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ওপর নির্ভর করছে। জানতে চাইলাম, ক্লারকের সঙ্গে কোথায় এবং কবে ভাব হ'ল?

—একবর্ষটিতে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ারকশপে। পরের বছর আমাদের বিয়ে হয়।—মুখস্থ বলার মত এ কথাগুলো বলে ভারতীর ক্লারকের দিকে তাকালেন। ক্লারক হেসে ফেললেন।

হাসিটা ভাল লাগলো। লজ্জাজড়ানো নতুন নতুন ভাব, ভারতীকে বললাম—এর বেশি কিছু বলবেন না?

—এর বেশি কী আর বলবো। পরিচয় হ'ল, ভাব হ'ল, আমরা ভালবাসলাম। তারপর বিয়ে হ'ল। এখন দু'ছেলে নিয়ে বেশ আছি।

বিদেশী বিয়ে করে নতুন পরিবেশে কেমন লাগছে, এই প্রশ্ন করতে ভারতী বললেন—আসলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ব্যাপার। দু'জনকেই কিছু না কিছু ছাড়তে হয়। ইংরাজিতে যাকে বলে "অ্যাডজাস্টমেন্ট, স্বামী বিদেশী হোন আর স্বদেশী হোন, মূলে ব্যাপারটা একই থেকে যায়।

নতুন পরিবেশের প্রশ্নে ভারতী বললেন, —কলকাতার মেয়ে। বিয়ে করেছি কানাডায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দু'দেশের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ভারতে স্বামীরা যতই প্রগতিশীল হোন না কেন, স্ত্রীদের ওপর পুরোপুরি আধিপত্য বজায় রাখতে চান। রান্নাঘর ও বাড়ির খরচপত্তরের ব্যাপারে বউই প্রধান। কিন্তু সেই পর্যন্ত। তার বাইরে আর কিছু নয়। অন্য সব ব্যাপারে স্বামীর কথা বেদ-

প্রকাশিত হল

এ কালের অন্যতম ঔপন্যাসিক

প্রফুল্ল রায়ের নতুন উপন্যাস

সুখের পাখি অনেকদূরে ৭৲

এই লেখকের অন্যান্য বই

নয়না ৪৲ আলোয় ফেরা ৯৲

আমার নাম বকুল ৭৲

দে'জ পাবলিশিং C/o দে বুক স্টোর,
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৫০৩৫

(সি ৭৬৮০)

[illegible]। দুজনেতেই হবে। এখানে স্বামীদের মনোভাব প্রভুত্বসুলভ, একনায়ক-তন্ত্রী। কানাডা বা আমেরিকায় তা নয়। ওখানে বউদের ভূমিকা সব ক্ষেত্রে না হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বামীদের সমান সমান। আক্ষরিক অর্থে কেউ কারও অধীন নয়।

কিচেন থেকে চা দিয়ে গেল। ক্লার্ক চা পরিবেশন করতে উঠে [illegible] জিজ্ঞাসা করলেন,—দুধ?

—[illegible], হ্যাঁ।

—কত চিনি?

—এক। ওয়ান অ্যান্ড হাফ।

আমার সহকর্মী ফটোগ্রাফার অলক মিত্র ভারতীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—উনি কতদিন বাংলা শিখছেন?

প্রকাশিত হলো। জনপদ ৬.

[illegible] বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রফুল্লকুমার সিংহের নতুন উপন্যাস

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনবেদ
[illegible] চৌধুরী (পুরস্কারপ্রাপ্ত) ১০.

অজানিতার সন্ধানে : গর্ডন ডিকসন
(অনু: আদিত্য আচার্য) ৪.৫০

[illegible] : ডঃ অসীম বর্ধন ২.৫০

[illegible] পাবলিকেশনস লিঃ
৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২

(পি ৭৬০০)

—কলকাতায় আসার পর থেকে। ওদেশে কখনও আগ্রহ দেখান নি। এখানে এসে পাঁচজনের সংগে মিশে গোগ্রাসে বাংলা শিখতে লেগে গিয়েছেন। হাজার হলেও শ্বশুরবাড়ির দেশ তো। দিনরাত আমাকে বাংলা শেখাতে হচ্ছে। ও'র প্রচণ্ড আগ্রহের সংগে তাল রাখতে পারছি না।

তারপর আমার দিকে চেয়ে ভারতী বিদেশে নতুন পরিবেশ সম্পর্কে তার বক্তব্যের জের টেনে বললেন,—দেখুন, আর পাঁচটা মেয়ের মত এদেশেও আমার বিয়ে হতে পারতো। বাবা মা ইচ্ছে করলে দিতে পারতেন। কোন বাধা ছিল না। যদি দিতেন তবে নিশ্চয়ই এদেশের পরিবেশে মানিয়ে নিতে হ'ত। হয়ত থেকে থেকে খারাপও লাগতো না। কিন্তু হয় নি বলে এখন ভাবতে ভাল লাগে না। ওদেশে ভিন্ন পরিবেশে থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেড়ে গিয়েছে।

ভারতী বলে চললেন,—ওদেশে গিন্নীরা সাধারণত "পার্ট টাইম" কাজ করেন। চাকরিতে সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বেশির ভাগ জায়গায় তুলনায় মেয়েদের প্রোমোশনের সুযোগ কম, গ্রেড কম। এর প্রতিবাদে ওখানকার মেয়েরা ক্রমেই মুখর হয়ে উঠছেন। বেতনের পার্থক্য পারিবারিক জীবনেও কিছুটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ভারতী নিজের প্রসংগে বললেন,—আমাদের এ ঝামেলা নেই। কর্মক্ষেত্রে ও'র আর আমার মর্যাদা এক। দুজনেই প্রফেসর। এ ছাড়া আবার দুজনেই লেখক।

ওদেশে অধ্যাপকদের সাত বছর পর পর এক বছর পুরো বেতনে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সেই ছুটি নিয়ে ও'রা এদেশে এসেছেন। বেড়ানো ও লেখার উপাদান দুই-ই যোগাড় হবে। ভারতী ইংরাজি ভাষায় ভারতীয় লেখকদের সম্বন্ধেও একটি বই লিখবেন। কানাডা কাউনসিল তাঁদের কিছু সাহায্য মঞ্জুর করেছেন।

ভারতীকে প্রশ্ন করলাম,—আপনি কি নিয়মিত রুটিন করে লেখেন?

—না না নিয়মিত লেখার সুযোগ কোথায়। ছেলেদের সামলে, সংসার সামলে চাকরিতে যেতে হয়। তিনদিক সামলে লেখা মুশকিল। ছুটির সময় লেখায় হাত দেই। আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি জুন থেকে আগস্ট। আর বড়দিনের ছুটি এক মাস। এখন যে উপন্যাসটা লিখছি সেটির নায়িকা কলকাতার একটি মেয়ে। কলকাতায় বড় হয়ে তার বিয়ে হয়। তারপর সে গেল আমেরিকায়। সেখানে নিউ ইয়রক শহরে নতুন পরিবেশে তার দৃষ্টিভঙ্গি পালটে গেল। কলকাতা ও নিউ ইয়রকের জীবনের মধ্যে ঢের ব্যবধান। কলকাতায় যে পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে, নিউ ইয়রকের পরিবেশ তার উলটো। নতুন পরিবেশে সে নিজেকে মানিয়ে নিল। কলকাতার কোন এক ঘরের সেই কুলবধূ দ্রুত বদলেও গেল। নতুন পরিবেশে নতুন জীবনে এল নানা সংঘাত, গণ্ডগোল। যার পরিণতি হবে "ট্র্যাজিক"। দুঃখজনক ঘটনার মধ্যেই আমার দ্বিতীয় উপন্যাসের যবনিকা পড়বে।

চোদ্দ বছর পর কলকাতা এসে শহরটাকে নতুন লাগছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতী বললেন,—ঠিক নতুন লাগছে না। নতুন নতুন বাড়ি, কিছু অট্টালিকা ছাড়া শহরটা আগের মতই আছে। অবশ্য ভিড় বেড়েছে প্রচুর। বহু মানুষ পথে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। রাস্তাঘাটে এখানে সেখানে আবর্জনাও পড়ে থাকে। তাই বলে আমি কলকাতাকে নোংরা শহর বলতে রাজি নই। কলকাতাকে যতটা নোংরা শহর বলে প্রচার করা হয়ে থাকে, আসলে তা নয়।

একটু থেমে বললেন,—কলকাতাকে আমি ভালবাসি। বোমবাই, দিল্লির চেয়েও কলকাতা আমার ভাল লাগে। এখানে এসে পুনর্মিলনের আনন্দ উপভোগ করছি। এখানকার মানুষ খুব বন্ধুবৎসল। আগে যখন এখানে ছিলাম তখন বুঝতাম না। এবার দীর্ঘদিন পরে বিদেশ থেকে এসে বুঝতে পারছি। কলকাতাকে আরও ভাল-

লাগছে। কলকাতার পথঘাট, গাছপালা, মানুষ সবাই যেন আমার আপনজন।

কলকাতার সমস্যা সম্পর্কে তিনি কী ভাবছেন, প্রশ্ন করলাম। ভারতী বললেন,—এখানে মধ্যবিত্তের নানা সমস্যা। জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ রেশন। কখন আলো জ্বলে কখন নেবে—ঠিক নেই। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা নেওয়া সম্বন্ধেও স্থিরতা নেই। পরীক্ষা হলেও রেজাল্ট বেরতে মাসের পর মাস কেটে যায়। শিক্ষিত বেকার যুবকরা কাজ পান না। তাঁদের মধ্যে ক্রমশ হতাশা বাড়ছে। এদেশে কর্মসংস্থান বিরাট সমস্যা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঝামেলার শেষ নেই।

ভারতীর দ্বিতীয় উপন্যাসের নায়িকা কলকাতার মেয়ে। এখানকার সংস্কার, মানসিকতায় অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক কুলবধূর নিউইয়র্ক শহরে গিয়ে সেখানকার সমাজ ও জীবন যন্ত্রণার কাহিনী।

প্রথম উপন্যাস "দি টাইগারস ডটার"-এর নায়িকাও কলকাতার এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। দীর্ঘদিন পর আমেরিকা থেকে কলকাতা ফিরে সে কী দেখল তাই নিয়ে কাহিনীর বিন্যাস। এখানে এসে পরিচিত সমাজের সার্বিক জীবনের ক্ষয়ে যাওয়া চেহারা তার সামনে প্রকট হয়ে উঠল। দেখা দিল নানা প্রশ্ন, নানা দ্বন্দ্ব। কি করা যেত কি করা উচিত, এ নিয়ে চিন্তার জট পাকিয়ে চলল। সমাজের তত্ত্বকথা তিনি সার্থকভাবে তাঁর প্রথম উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজ বিজ্ঞানীর চোখ নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু উপন্যাসের নান্দনিক মূল্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। দ্বিতীয় উপন্যাসেও তিনি সামাজিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক অন্তর্জ্বালার বিষয় বেছে নিয়েছেন। কলকাতা ও আমেরিকার জীবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কেন্দ্র করে লিখেছেন। উপন্যাস লিখতে গেলে সব সময় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, এমন নয়। লেখক কল্পনা দিয়ে অনেক কিছু ভরিয়ে তোলেন। এই কল্পনা শক্তিই লেখক-শিল্পীর বৈশিষ্ট্য, সম্পদ। কিন্তু ভারতী যা নিয়ে লিখেছেন তাতে অভিজ্ঞতা একটা বড় কথা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও অন্তত সমাজবিজ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টি চাই এতে।

মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। ভাই নেই। তিন বোন। বাবা মা তাঁদের ভালভাবে মানুষ করার চেষ্টা করেছেন। ভারতী কলকাতায় লোরেটো হাউসে পড়েছেন। কলকাতা থেকে বরোদা এবং সেখান থেকে আমেরিকায় পড়তে যাওয়া। তারপর বিয়ে করে কানাডায় ঘর বাঁধা। কলকাতার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাদের কথা জানা তাঁর হয়নি। এবারও কলকাতায় এসে সেই সুযোগ তিনি ঠিক পাননি। যাঁদের সঙ্গে মিশেছেন, যাঁদের বাড়ি নেমতন্ন খেয়েছেন, তাঁরা আর যাই হোন এদেশের বিচারে সাধারণ নন। মোটামুটি খেয়ে পরে থাকার ব্যবস্থা তাঁদের আছে।

ভারতী তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবলুপ্তির প্রক্রিয়ার কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি নতুন কিছু যে সৃষ্টি হচ্ছে, তা তাঁর লেখায় ফোটেনি। "দি টাইগারস ডটার" লেখার সময় কলকাতা থেকে অনেক দূরে ছিলেন। চৌদ্দ বছর কলকাতা ছাড়া। এই চৌদ্দ বছরে কলকাতার জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে, খোলস বদলেছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা পরম্পরায় কলকাতার সমাজও পাল্টে গিয়েছে। সেইসঙ্গে নানা শ্রেণীর চরিত্রেও পরিবর্তন এসেছে। কলকাতার সমাজ বলতে একক কিছু বোঝায় না। নানা শ্রেণীর চিন্তাধারা, জীবনযাপন ও যন্ত্রণা নিয়েই কলকাতার সমাজের সার্বিক রূপের কল্পনা করা হয়। এই নানা শ্রেণীর মধ্যে একটি ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

দ্বিতীয় উপন্যাসে হাত দেওয়ার আগে ভারতী কলকাতা ঘুরে গেলেন। চৌদ্দ বছর আগেও স্বামী হিসাবে কোন বিদেশীকে সঙ্গে করে এখানে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ঠিক যাওয়া বলতে গেলে প্রতিক্রিয়া হত মিশ্র। কেউ খোলা মনে অভ্যর্থনা জানাতেন, কেউ বা জানাতেন না। এখন সে ঝামেলা নেই। বাড়ি বাড়ি ক্লারকের জামাইআদর তার প্রমাণ। মনে হয়, দ্বিতীয় উপন্যাসে কলকাতার বদলে যাওয়া জীবনের সত্যিকার রূপ কিছুটা ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। যদি না পারেন, তবে তাঁর কলকাতা আসা সার্থক হবে না।

একথা তিনি জানেন। তাই জানুয়ারি-ফেবরুয়ারিতে আবার কলকাতা আসছেন।

হিন্দুস্থান ডেয়ারীর
সুরভী
বিশুদ্ধ ঘৃত
Suravi
PURE GHEE
স্বাদে * গন্ধে * পুষ্টিতে
একত্র সমন্বয়
সব বড় দোকানেই পাবেন
হিন্দুস্থান ডেয়ারী এণ্ড ফার্ম
কলিকাতা-২৮

প্রকাশিত হল
তরুণ লেখকের প্রথম আত্মপ্রকাশেই প্রতিষ্ঠা।
এক রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস।
রোমাঞ্চে ভরপুর।
অমলেন্দু দত্তের
স্বপ্নটপ্ন
আদতে
দাম ৫·০০
মিষ্টিমধুর প্রেমের অসাধারণ উপন্যাস
জ্যোতির্ময় নন্দীর
রাঙ্গা শিমুল
দাম ৫·০০
মানবিক আখ্যান-সমৃদ্ধ উপন্যাস
শ্রীপারাবতের
শ্যামল দেশে সূর্য ওঠে
দাম ৫·০০
পুস্তক প্রকাশনী
৮২/১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলি-৯

অবশেষে এসেই গেল-সিন্থেটিক কাপড়ের জন্যে
একটি হোয়াইটনার
টিনোপাল-এস

'টেরীন', 'টেরীন'/কটন, নাইলন প্রভৃতি জামাকাপড়ের জন্যে

Tinopal® S

আপনার সিন্থেটিক ও ব্লেণ্ডেড কাপড়চোপড় পরিষ্কার করার পর শেষ বার ধোয়ার সময় জলে সামান্য টিনোপাল-এস মিশিয়ে দিন। তারপর দেখুন প্রত্যেক বার টিনোপাল-এস ব্যবহার করার পর আপনার সাদা জামাকাপড় হয়ে উঠছে কেমন সাদা... ধবধবে সাদা... আরো বেশী ধবধবে সাদা।

আজই টিনোপাল-এস কিনে নিন

সিন্থেটিক কাপড় সবচেয়ে সাদা করার জন্যে টিনোপাল®-এস

® টিনোপাল সুইজারল্যাণ্ডের সীবা-গায়গী লিমিটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক
[R] কেমী-এর রেজিঃ ট্রেডমার্ক
সুহৃদ গায়গী লিঃ, পোঃ অঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আর.

Shilpi HPT-Anil8 8/72 Ben

॥ ছাব্বিশ ॥

একরকম ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়েই ম্যাডাম পাভলোভা শক্তিকে সে দুর্নাম করে বাতিল করে দিয়েছেন সে কথা বুঝতে ট্রুপের অন্যান্য ছেলেমেয়েদেরও দেরি হল না। একটু-আধটু ফিসফাস গুজগুজ করা ছাড়া বিশেষ কিছুই কেউ আর বলাবলি করতে সাহস করল না, কারণ ট্রুপের কর্ত্রী পাভলোভা, তাঁর নিন্দে করার সাহস কার! সকলের ভবিষ্যৎ তো তাঁরই হাতে। আর তা ছাড়া আরও এক আশায় উন্মুখ হয়ে অনেকে বসে আছে। এখানকার অনুষ্ঠান শেষ হলেই পাভলোভা পাড়ি দেবেন আমেরিকায়। সে মহাদেশের একটা আলাদা আকর্ষণ তো আছেই। এইসব ভেবে চুপচাপ থাকল সকলে। এবং শক্তির ব্যাপার নিয়ে কেউই আর মাথা ঘামাল না।

কিন্তু উদয়শঙ্কর কিছুতেই কথাটা ভুলতে পারল না। এত বড় একটা দল পাভলোভার, যা দিনে দিনে আরও সুন্দর হয়ে উঠছে প্রত্যেক শিল্পীর ঐকান্তিক আগ্রহে এবং কঠোর পরিশ্রমে—সেখানে ঈর্ষা থাকবে কেন! উদয়শঙ্কর ভাবল, শিল্পক্ষেত্র হবে মুক্ত, অবারিত। আর শিল্পীরা হবে উদার। তা না হলে তাদের অগ্রগমন অসম্ভব। এবং তাদের পরিধিও হয়ে থাকবে সীমায়িত। ঈর্ষা সাপের মত। শিল্পীর মনে তার সঞ্চরণ মৃত্যুরই স্পষ্ট সঙ্কেত।

এই রকম চিন্তায়-চিন্তায় বিব্রত হয়ে উদয়শঙ্কর আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে সেই ইতালীয় দু বোনের সামনে দাঁড়িয়ে সাহস করে পরিষ্কার বলল, "আমি আশা করতে পারি নি যে, ম্যাডাম এমন নীচ মনের পরিচয় দেবেন—"

দু বোন উদয়শঙ্করের দুঃসাহসিক উক্তি শুনে মনে মনে খুব খুশী হলেও অ্যাডেলেড বলল, "চুপ, চুপ!"

তার কথায় চুপ করল না উদয়শঙ্কর, বলল, "শিল্পীর মনে ঈর্ষা থাকলে সে কখনো বড় হতে পারে না, ট্রুপেও সে ফাটল ধরিয়ে দেয়।"

শক্তি উদয়শঙ্করের এই মত সমর্থন করে বলল, "তোমার কথা হয়তো ঠিক।"

"ঠিক।" অ্যাডেলেড কি যেন ভাবল কিছু সময়, "তোমার তো বেশ নাম হয়েছে, শঙ্কর। আরও হবে নিশ্চয়ই—"

উদয়শঙ্কর হাসল, "কে জানে!"

অ্যাডেলেড হালকা স্বরে বলল, "পরে তুমি যদি নিজের দল খোল তা হলে দেখো সেখানে যেন কারুর মনে হিংসে-টিংসে না থাকে।"

নিজে আলাদাভাবে কিছু করবার কথা এখনি মনে হওয়ার সময় হয় নি উদয়শঙ্করের, তা হলেও অ্যাডেলেডের কথা ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে সে বেশ জোরে বলে উঠল, "না, থাকবে না—আমি থাকতে দেব না।"

শক্তি হেসে বলল, "বাঃ! তোমার ট্রুপে তা হলে আমরা তো বেশ আনন্দের সঙ্গেই কাজ করতে পারব।"

উদয়শঙ্করও হাসল, "নিশ্চয়ই।"

কিন্তু অল্প পরেই উদয়শঙ্কর পাভ-

আস ও উদয়শঙ্কর

আমেরিকায় উদয়শঙ্কর

লোভার আর এক মূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তিনি যে তাকে স্নেহ করেন সে তা জানে তবে সে স্নেহের পরিমাণ তার জানা ছিল না। পয়লা ডিসেম্বর উদয়শঙ্করের জন্মদিন।

উনিশ শো বাইশ সালের পয়লা ডিসেম্বর উদয়শঙ্করের সামনে এসে দাঁড়ালেন পাভলোভা। তাঁর হাতে ছোট একটি বাক্স। প্রসন্ন হাসি হেসে তিনি বললেন, "এই দিন ফিরে ফিরে আসুক! তোমার জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই!" পাভলোভা সেই ছোট বাক্সটা দিলেন উদয়শঙ্করকে। দিয়ে বললেন, "আমার সামান্য উপহার গ্রহণ কর, শঙ্কর!"

উদয়শঙ্কর কৃতার্থ হয়ে গেল। গভীর স্বরে তাঁকে বলল, "ম্যাডাম, অনেক ধন্যবাদ।"

তার জন্মদিনে পাভলোভা তাকে উপহার দিয়েছেন সোনার ঘড়ি।

বড়দিনের সময় পাভলোভা তাঁর ট্রুপের প্রত্যেককেই কোন না কোন উপহার দেন। মেয়েদের বেশির ভাগ তিনি দেন বোনবার কিংবা সেলাই করবার সরঞ্জাম। কেননা দূরে যাবার সময় ট্রেনে বসে-বসে মেয়েদের বিরক্তি আসে, বই-টই-ও সব সময় হাতের কাছে থাকে না, তখন তারা বোনা কিংবা সেলাই নিয়ে মেতে থাকতে পারবে।

ট্রুপের ছেলেমেয়েদের মেলামেশার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি পাভলোভার। মেয়েদের সাজ-ঘরে ঢোকে পুরু পর্দা। দরজাও বন্ধ থাকে বেশ ভাল করে। কেননা পাভলোভা মনে করেন তাঁর ট্রুপের মেয়েদের সব দায়িত্বই তাঁর। কিছু এদিক-ওদিক হলে তাঁকেই কৈফিয়ত দিতে হবে অভিভাবকদের কাছে। মেয়েদের বয়েস অল্প বলে স্বভাবতই তারা ভাবপ্রবণ। স্বপন কিংবা নানা রঙীন কল্পনা এখন তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তাই পাভলোভার এই সতর্কতা।

মেয়েদের কাছ থেকে সব সময় শোভন আচরণ আশা করেন বলেই কাউকে তাঁর ট্রুপে নিয়োগ করার আগে তিনি বেশ ভাল করে জেনে নেন তার বংশপরিচয়। ভাল ঘরের মেয়ে না হলে পাভলোভার প্রতিষ্ঠানে তার যোগ দেওয়া মুশকিল।

সব সময় মেয়েদের চলাফেরার ওপর পাভলোভার থাকে সতর্ক দৃষ্টি। ভুল করে কারুর-কারুর প্রতি তিনি অবিচারও করেন। একবার ট্রেনে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার সময় একটি মেয়ে বারবার চোখ ফিরিয়ে দেখছিল ছেলেদের, কারণ তাদের কাছাকাছিই তাকে বসতে হয়েছিল। মেয়েটি ছিল খুবই নিরীহ এবং সম্ভবত ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার তার কোন ইচ্ছে ছিল না। এই সামান্য কারণে মেয়েটির চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাভলোভা তাকে বিদায় করে দিলেন। কিছুতেই তার সঙ্গে আর নতুন করে চুক্তি করতে রাজী হলেন না।

বলা বাহুল্য, দর্শকসাধারণ যতই আধুনিক হোক, প্রেক্ষাগৃহে জোর হাততালি দিলেও নর্তক-নর্তকীর প্রতি তাদের একটা মজ্জাগত অবজ্ঞা থাকে। পাভলোভার কালে সে দেশের দর্শকসাধারণেরও এই বোধ আরও তীব্র ছিল।

বায়বহুল এক মস্ত জাহাজে একবার সদলবলে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিলেন পাভলোভা। সে জাহাজের যাত্রী ছিল অনেক উচ্চবংশের সম্ভ্রান্ত পরিবার। ব্যালে ট্রুপের সঙ্গে পাড়ি দিতে হবে বলে তারা নাক কুঁচকে বসে থাকল বিরস মুখে। যেন তাদের সমুদ্র-যাত্রার সব আনন্দ নষ্ট হয়ে যাবে। জাহাজে সারাক্ষণ চলবে হইহুল্লোড়, ঠাট্টা-তামাশা।

কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অভিজাত এবং উচ্চবংশীয় যাত্রীদের ধারণার আমূল পরিবর্তন হল। বন্দরে নামবার আগে পাভলোভার অসামান্য ব্যক্তিত্বের জন্যে তারা তাঁকে জানিয়ে গেল আন্তরিক ধন্যবাদ। ব্যালের দলের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা যে এত সুখের হবে তা ছিল তাদের কল্পনারও অতীত।

যা হোক, কভেন্ট গার্ডেন বয়াল অপেরা হাউসে পাভলোভার অনুষ্ঠানের শেষ রজনী আসন্ন। এর পরেই তাঁর আমেরিকা যাত্রা। কিন্তু কি করা যায় উদয়শঙ্করকে নিয়ে? পাভলোভা তাঁর ব্যালেতে ওরিয়েন্টাল ইম্প্রেশন্স দেখাতে চেয়েছিলেন শুধু একটা নতুন কিছু করার আগ্রহে। তিনি ভাবতে পারেন নি সম্পূর্ণ ভারতীয় ভঙ্গির এই দুটি নাচ এত প্রিয় হবে এ দেশে। এবং তাঁর মত দূরদ্রষ্টার পক্ষে কল্পনা করে নেওয়া কঠিন হল না যে, মার্কিন মুলুকেও 'হিন্দু বিবাহ' ও 'রাধাকৃষ্ণ' সাড়া জাগাবে।

সুতরাং উদয়শঙ্করকে এখনি ছেড়ে দেওয়া যায় না। পাভলোভা স্থির করলেন তাকেও নিয়ে যাবেন আমেরিকায়। সময় আর নেই, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেই পাড়ি দিতে হবে। পাভলোভা এই সুসংবাদ দিলেন উদয়শঙ্করকে।

তিনি বললেন, "শঙ্কর, তোমার নাচ এ দেশের মত আমেরিকায়ও প্রশংসা পাবে

আমেরিকায় চিত্রতারকাদের সঙ্গে উদয়শঙ্কর

বলে আমার বিশ্বাস। আমি ঠিক করেছি তোমাকেও নিয়ে যাব আমেরিকায়। তোমার আপত্তি নেই তো?"

আপত্তি! এত বড় একটা আনন্দের খবর শুনে প্রথমে উদয়শঙ্কর বুঝতে পারল না সে স্বপ্ন দেখছে কিনা। মধুর একটা অনুভূতি রিনরিন করে উঠছে তার মনে। মাথার মধ্যে একটিই শব্দ খেলা করে বেড়াচ্ছে, আমেরিকা!

উচ্ছ্বাস দমন করবার চেষ্টা করতে করতে উদয়শঙ্কর বলল, "ধন্যবাদ। আমি খুশী হয়ে আপনাদের সঙ্গে যাব, ম্যাডাম!"

পাভলোভা হাসলেন। হেসে তিনিও বললেন, "ধন্যবাদ। শঙ্কর, তোমাকে আমি এবার থেকে সপ্তাহে দু-শো ডলার পারিশ্রমিক দেব। ঠিক আছে?"

দু-শো ডলার! সপ্তাহে-সপ্তাহে! সে যে অনেক টাকা! স্বাধীনভাবে এত টাকা উপার্জন করতে পারবে ভেবে একটা আবেগের ঘোরে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল উদয়শঙ্কর। সে ভাবছিল, বিদেশে তার খরচ চালাবার জন্যে বাবার টাকার দরকার হবে না। মহারাজাকেও আর কিছু পাঠাতে হবে না। দু-শো ডলার! এত টাকা দিয়ে সে করবে কি!

ঘোর কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেরার কথা মনে পড়ে গেল উদয়শঙ্করের। পাভলোভা তার কথা কিছু বলেন নি। উদয়শঙ্করই তো তাকে শিখিয়েছে ভারতীয় নাচ। সে যাবে আমেরিকায়, আর ভেরা একা পড়ে থাকবে এখানে—তার কথা ভেবে বড় মন খারাপ হয়ে গেল উদয়শঙ্করের।

সে একটু ইতস্তত করে বলল পাভলোভাকে, "ম্যাডাম, একটা কথা বলব?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বল না!"

"বলছিলাম, ভেরাও তো জানে ভারতীয় নাচ। মানে, সে আমার পার্টনার। আমিই তাকে শিখিয়েছি। মানে, বলছিলাম কি—"

উদয়শঙ্করের ইতস্তত ভাব দেখে পাভলোভা আবার হাসলেন, "ভেরাকে নিয়ে যেতে চাও আমেরিকায়? বেশ তো, সে-ও যাবে।"

পাভলোভার মার্কিন অনুষ্ঠানের ইম্প্রেসারিও এক উৎসাহী যুবক, তার নাম সলোমন হ্যুরক। সংক্ষেপে সল্ হ্যুরক। তার বসবাস বর্তমানে আমেরিকায়। তাকে পাভলোভা দেখেন বেশ স্নেহের দৃষ্টিতে। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার সাধ হ্যুরকের অনেক কালের। তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে কয়েক বছর আগে আমেরিকাতেই।

পাভলোভা তখন মার্কিন মুলুকে চীনে খেলোয়াড় ও এক পাল হাতির নানা কসরতের সঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন করছিলেন, সেই সময় জীবিকা অর্জনের একটা নতুন ভাবনা উঁকি দিয়েছিল হ্যুরকের মনে। সে-ও গ্রহণ করবে ইম্প্রেসারিওর পেশা এবং অদূর ভবিষ্যতে একদিন পাভলোভাকে নিয়ে আসবে এই আমেরিকায়।

যদিও পাভলোভার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠা মোটেই কঠিন ছিল না হ্যুরকের পক্ষে। কেননা, জাতিতে সে-ও রুশ। যারা জারের আমলের লোক এবং নানা কারণে দেশত্যাগী তারা ইউরোপ ও আমেরিকায় শ্বেত রুশ নামে পরিচিত। পাভলোভা, দানস্বে ও হ্যুরক—সকলেই এক পালকের পাখি। অর্থাৎ শ্বেত রুশ। তা ছাড়া পাভলোভার অজ্ঞাত পিতা ছিলেন ইহুদী, হ্যুরকও তাই।

প্রথম দিন তার এক বন্ধুকে ধরে হ্যুরক গুটি-গুটি গিয়েছিল পাভলোভার ড্রেসিং রুমে। গিয়ে পাভলোভার মত প্রতিভাময়ী ব্যালেরিনাকে দেখে তার বুক দুপদুপ করে উঠল। সে হঠাৎ ঠিক করতে পারল না কোন ভাষায় কথা বলবে পাভলোভার সঙ্গে—ইংরেজীতে, না তার মাতৃভাষায়?

কিন্তু হ্যুরকের জড়তা কেটে যেতে বেশী দেরি হল না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পাভলোভা তাকে বড় আপনার করে নিলেন। আলাপের প্রথম রাতেই নাচ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাকে নিয়ে বাইরে খেতে বেরুলেন।

ব্যালেরিনার আহারের বহর দেখে চক্ষু স্থির সলোমন হ্যুরকের। যেন খাদ্যের পাহাড় জড়ো করা হয়েছে পাভলোভার প্লেটের ওপর। খেতে খেতে হ্যুরকের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

এক রাতে পাভলোভার সাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল হ্যুরক। ম্যানহাটন অপেরা হাউসে গান গাইবে বিখ্যাত নিগ্রো গায়িকা ফ্লোরেন্স মিলস। পাভলোভার খুব আগ্রহ তার গান শোনার। নাচের পর তিনি হ্যুরককে বললেন, "চল, ফ্লোরেন্স মিলস্-এর গান শুনে আসি?"

"চলুন।"

কিন্তু সেদিন অপেরা হাউসের গতিক ভাল ছিল না। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। সম্ভবত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কর্মচারীদের মাইনে-পত্র নিয়ে বচসা হয়ে গিয়েছিল। একটু পরে শোনা গেল বোমার আওয়াজ। কর্মচারীরা মালিকের আচরণের প্রতিবাদ করেছে বোমা নিক্ষেপ করে।

গান-টান মাথায় উঠল, রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল হ্যুরক। ভয়ে ভয়ে সে বলল পাভলোভাকে, "চলুন, এই বেলা এখান থেকে সরে পড়ি—"

পাভলোভা তাকে থামিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে তাঁর আসনে বসে নির্বিকারভাবে বললেন, "দূর! সরে পড়ব কেন এখুনি? গান শুনতে এসেছি, ফ্লোরেন্স মিলস্-এর গান না শুনে এখান থেকে এক পাও নড়ছি না বাপু!"

হ্যুরককে লণ্ডনে দু-একবার দেখেছে উদয়শঙ্কর। প্রথমে যে বুঝতে পারেনি যে, সে-ই পাভলোভার ইম্প্রেসারিও। বুঝল পরে। আমেরিকায় গিয়ে। সল হ্যুরক ভীষণ ব্যস্ত তখন। তার ন' মাসের চুক্তি পাভলোভার সঙ্গে। এই সময়ের মধ্যে নৃত্যপ্রদর্শনী হবে নিউইয়র্কে, শিকাগোয়, কানাডায়, ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বহু শহরে।

উদয়শঙ্করের সঙ্গেও পাভলোভার চুক্তি ন' মাসের—মার্কিন সফর যতদিন চলবে ততদিন। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমেরিকা যাত্রার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। পণ্ডিত শ্যামশঙ্করকে জানিয়ে দিয়েছে উদয়শঙ্কর, তার আর খরচপত্রের দরকার নেই। ব্যালে করছে বলেই সে এত তাড়াতাড়ি এ দেশে নিজে উপার্জন করতে পারছে। হেমাঙ্গিনী দেবীকেও এসব কথা লিখেছে উদয়শঙ্কর।

শব্দযন্ত্রী তিন-চারজন। সঙ্গীত পরিচালক নিয়মমত একজন। নর্তক-নর্তকী মিলিয়ে প্রায় শদেড়েক যাবে আমেরিকায়। আরও অনেক লোকের দরকার। সবসুদ্ধ দু শো আড়াই শো লোক পাভলোভার গ্রুপে। কিন্তু সকলকে নিয়ে যাওয়া বড় ব্যয়সাপেক্ষ। দরকারমত স্থানীয় শব্দযন্ত্রী কিংবা নর্তক নর্তকী নিয়োগ করা হবে। গৎ তো বাঁধাই। কাজের কোন অসুবিধা হবে না। শর্কি আর অ্যাডেলেড—ইতালীয় দু বোন দলছাড়া হয়ে থেকে গেল লণ্ডনে। তাদের চুক্তি শেষ হয়ে গেছে। আমেরিকায় যাওয়ার সুযোগ ওদের হল না।

জাহাজের নাম এস-এস ওয়াশিংটন। ইংল্যাণ্ডের বন্দর থেকে আমেরিকার উপকূলে নোঙর ফেলল দিন চার-পাঁচ পরে। নিউ ইয়র্কের ঘরবাড়ি, সেখানকার রাস্তাঘাট, যন্ত্রপাতি, যানবাহন দেখে উদয়শঙ্কর হকচকিয়ে গেল। ... মনে হল সে যেন একটা অজ পাড়াগাঁ থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে মস্ত এক শহরে—মনে হল, ইংল্যাণ্ড যেন আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে পিছিয়ে আছে তিরিশ চল্লিশ বছর।

পাভলোভার প্রথম অনুষ্ঠান হবে নিউ ইয়র্কের রয়্যাল অপেরা হাউসে। এ খবর বিজ্ঞাপিত হয়েছে কাগজে কাগজে, পোস্টার পড়েছে। এ দেশেও খুব নাম পাভলোভার। তাঁর কোন ভাবনা নেই, কিন্তু ভাবনায় পড়ল উদয়শঙ্কর। তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে আমেরিকা!

পাভলোভার সঙ্গে উদয়শঙ্কর আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছেছিল নতুন বছরের আগে আগে। উনিশ শো বাইশ সালের ডিসেম্বরের শেষ রজনী মনে রাখবার মত। নববর্ষ বরণ শুরু হল ঠিক রাত বারোটার সময়। বন্দরের সব জাহাজের বাঁশি মধ্যরাত্রে বেজে উঠল। টাইমস স্কোয়ারে জড়ো

দাদ, চুলকানি, নালী ঘা, একজিমা, ফুস্কুড়ি, গায়ে গোটা, ঠাণ্ডায় হাত পা ফাটা, জীবজন্তুর দেহের ক্ষতে অব্যর্থ মহৌষধ।

বি-টেক্স, নবসারী গুজরাট

হয়েছে অসংখ্য ছেলেমেয়ে। কি প্রচণ্ড উল্লাস ওদের!

পাভলোভা সদলবলে উঠেছিলেন নিউ ইয়র্কের একটা হোটেলে। সেখানেও বর্ষবরণের ধুমে পড়ে গেছে। তবে হোটেলে বেশীক্ষণ থাকল না উদয়শঙ্কর, টাইমস স্কোয়ার তাকে টানছিল। সেখানে সেও গিয়ে উঠল। এবং মেতে উঠল মধ্যরাতের বর্ষবরণ উৎসবে।

লণ্ডনে যা হয়েছিল, ঠিক তাই হল নিউ ইয়র্কে। উদয়শঙ্করের জয়জয়কার আর অজন্তা ব্যালের বিরূপ সমালোচনা। লোকের মুখে অকুণ্ঠ প্রশংসা শুনে, কাগজপত্রে অনুকূল সমালোচনা পড়ে উদয়শঙ্করের আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হল এবং নিজেকে সে আপন মনে স্বাধীন শিল্পী বলে স্বীকার করে নিতে পারল। একটু গর্বও হল তার।

সে ভাবল, শুধু এইটুকুতে হবে না, আরও অনেক কিছু করতে হবে তাকে। দূর-দূরান্ত অবধি ছড়িয়ে দিতে হবে তার কল্পনা—নতুন সৃষ্টির স্বপ্ন দেখতে হবে সারা দিন, সারা রাত। এবং প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হবে। কুসুমশয্যায় অলস শয়ানে আর যা-ই পাওয়া যাক, যশোলাভ যে করা যায় না—সে কথা এই অল্প সময় পাভলোভার সঙ্গে থেকেই বেশ ভাল করে বুঝে নিতে পেরেছে উদয়শঙ্কর।

এক ফটোগ্রাফার এসেছিল পাভলোভার ছবি তুলতে। কাজ শেষ করে সে বলল, "ম্যাডাম, আট বছর আগেও আমি আপনার ছবি তুলেছিলাম। আশ্চর্য, তখন আপনি যেমন ছিলেন, এখনো ঠিক তেমন আছেন।"

পাভলোভা হেসে সেই ফটোগ্রাফারকে বললেন, "ওহে যুবক, তুমি নিজে যদি আমার মত হাড়ভাঙা পরিশ্রম কর সকাল থেকে রাত অবধি, তা হলে আজ তুমি যে রকম আছ, দেখবে আট বছর পরে সেই এক রকমই থাকবে।"

পাভলোভার ঠাণ্ডার ধাত। প্রচণ্ড শীতে ধ্রুপদী ব্যালের স্বল্প আবরণে যে-কোন মুহূর্তে ঠাণ্ডা লেগে তাঁর কঠিন রোগ হতে পারে। তবুও কাজের বিরাম নেই পাভলোভার। উদয়শঙ্কর কতবার দেখেছে তাঁর ড্রেসিং রুমে তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে থাকে পরিচারিকা—তাঁর বুকে গরম সেঁক দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের এক শহর থেকে আর এক শহরে যাতায়াতের জন্যে তরুণ ইম্প্রেসারিও সল হুরোক ব্যবস্থা করেছে এক বিশেষ ট্রেনের। তার গায়ে সোনালী অক্ষরে লেখা : আনা পাভলোভা এক্সপ্রেস। একবার এই ট্রেনের এক কামরায় একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে গেল উদয়শঙ্করের সামনে।

আনা পাভলোভা এক্সপ্রেস শিকাগোয় পৌঁছবে বেলা চারটেয়। পাভলোভার অনুষ্ঠান ছটায়। তিনি অত্যন্ত সময়-সচেতন। পর্দা উঠবে ঠিক সময়ে। এক মিনিট এদিক ওদিক হবে না।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। চারটে প্রায় বাজে-বাজে। এমন সময় উদয়শঙ্কর দেখল তাদের গ্রুপের দুটি ছেলে বচসা শুরু করেছে। দুজনেই শ্বেত রুশ। রুশ ভাষা জানে না উদয়শঙ্কর, তবে তাদের ভাবভঙ্গি দেখে সে বুঝে নিল যে, তারা তুমুল কলহ করছে।

ছেলে দুটি অংশ গ্রহণ করে হাঙ্গেরীয় ব্যালেতে। এক বিয়েবাড়িতে এরা বরের দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর ভূমিকায় নামে। কি হাসাহাসি, গলাগলি তখন—উদয়শঙ্কর দেখেছে।

কিন্তু ট্রেনের কামরায় তাদের কাণ্ড দেখে ঘাবড়ে গেল উদয়শঙ্কর। সেই দু বন্ধু হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে। একজন আর একজনকে গালাগালি দিচ্ছে চীৎকার করে! ঘুষোঘুষি চলেছে। গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে একজনের, আর একজনের কপাল ফুলে উঠেছে বিশ্রীভাবে। দু একজন বাধা দিতে গিয়ে ছিটকে সরে এল।

বিমর্ষ হয়ে বসে থাকল উদয়শঙ্কর। ট্রেন চলছে হু-হু করে। আর একটু পরেই এসে যাবে স্টেশন। কি হবে আজ? হাঙ্গেরীয় ব্যালে পণ্ড হবে নিশ্চয়ই।

ছেলে দুটির দ্বন্দ্বযুদ্ধ তখনও চলছে।

(ক্রমশ)

'ভাবনা'র বই

প্রকাশিত হলো

ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা অনুবাদ অনুষঙ্গ/শঙ্খ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিজয়া'কে লিখেছিলেন একবার, 'পূরবীর কবিতাগুলি যারা পড়বে, জানতেও পাবে না তোমার প্রতি কত তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।' সত্যি, অল্পই আমরা জানি তাঁর কথা অথবা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা তাঁর ছোটো বইখানির কথা। সে-বইটির প্রথম পূর্ণ অনুবাদ। সঙ্গে রয়েছে বিজয়া-বিষয়ে নতুন কোনো-কোনো তথ্য, আর শেষ পনেরো বছরের রবীন্দ্রনাথকে জানবার মতো অনুষঙ্গী নানা বিবরণ। দাম ৮.০০

ইতিপূর্বে প্রকাশিত

পিচ্ছিল গুহার জল । ৪.০০

সুনীলকুমার নন্দী

"এক ধরনের ঋজু আভরণহীন অথচ সূক্ষ্ম শৈল্পিকতা আছে 'পিচ্ছিল গুহার জল'-এ। ...তার চাপা দ্যুতি ক্রমশ অনবগুণ্ঠিত হতে থাকে, নাটুকেপনা নয় এক গভীর নাটকীয়তা কবিতার কাটা কাটা পংক্তিগুলির হীরের মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়...।"

অমিতাভ দাশগুপ্ত/যুগান্তর।

জীবনানন্দ দাশের গল্প । ৫.০০

"ভাষা ও পর্যবেক্ষণে কবি জীবনানন্দকে নির্ভুল চেনা যায়...।" সনাতন পাঠক/দেশ।

প্রকাশিত হচ্ছে

গত শতকের প্রেম । ৮.০০

পূর্ণেন্দু পত্রী

নতুন বাঁশির সুর নতুন কালের যমুনায়।

পরিবেশক । দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি, ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২

বেনারসী
সিল্ক · তাঁত · পোষাক
ঈশ্বর চন্দ্র পাল
গঙ্গা প্রসাদ পাল
বড়বাজার, কলিকাতা-৭

প্রত্যেকেরই দরকার নিজেকে সুরক্ষিত রাখার

বীজাণুর বিরুদ্ধে, ঘামের দুর্গন্ধের বিরুদ্ধে, বিরক্তিভাবের বিরুদ্ধে, নিজের এবং অন্যের **সিন্থল টয়লেট পাউডার** জি-১১ যুক্ত এই সবের বিরুদ্ধে আপনাকে নিরাপদ রাখবে এবং দেবে··· আরও সুগন্ধ···তাজা ফুলের সুগন্ধ

সিন্থল

সেই টয়লেট পাউডার যেটি আপনাকে সম্পূর্ণ দুর্গন্ধনাশের নিরাপত্তা দেয়

Interpub/GSP-6/72 Ben

আজ হতে শতবর্ষ পরে

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে রবীন্দ্রসংগীতের যে প্রচলন দেখেছি, আজ নানাদিক থেকে তার বহুল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে একটি প্রধান ব্যতিক্রম হল, রবীন্দ্র সংগীতের ওজঃশক্তির বিলুপ্তি সাধন। নিস্তেজ কণ্ঠে শ্লথ, বিলম্বিত গতিতে রবীন্দ্রসংগীতের রূপায়ণ আজকে একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এটি কোনও সময়েই কবিগুরুর অভিপ্রেত ছিল না। অপর একটি ব্যতিক্রম হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের গানে যত্রতত্র টপ্পার প্রয়োগ এবং কেউ কেউ টপ্পার দানা এত অধিক প্রয়োগ করেন যে তাতে গানের মূল সংগঠনটিই তরল হয়ে পড়ে। আর একটি রীতি দেখা যাচ্ছে যাতে সংগীতের ভারসাম্য আদৌ রক্ষিত হয় না, গানের কোনও সত্তার অতিরিক্ত ভাবালুতার স্ফীতি এবং অন্যত্র অনুভূতির একান্ত অভাবে গানটি সামগ্রিকভাবে আবেদনহীন বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উচ্ছল প্রাণশক্তি এবং একটি স্বাভাবিক উদ্দীপনা। দিনেন্দ্রনাথের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন তিনি এই দুটি বস্তু তাঁর গানে কত সুন্দরভাবে রক্ষা করতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন গাইতেন তখনও একটি বলিষ্ঠ প্রকাশভংগী সর্বথা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকত। চড়া গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে দৃঢ়ভাবে তিনি গান করে গেছেন, কখনই এর ব্যত্যয় ঘটেনি। কলকাতার স্টেজের উপরেও যেখানেই তিনি তাঁর গানে স্তিমিত ভাব লক্ষ্য করতেন সেখানেই শিল্পীকে ইঙ্গিত করে বলিষ্ঠতা অবলম্বন করতে বলতেন, উদ্বুদ্ধ করতেন। জানি না কোন আদর্শে আজ সেই রীতি একেবারে অনুপস্থিত এবং তার বদলে এক প্রকার করুণ, দুর্বল, উচ্ছ্বাসসর্বস্ব রীতি শিল্পীদের একান্তভাবে অধিকার করে বসেছে। আজকাল রবীন্দ্রসংগীতে একটি রসই প্রাধান্য লাভ করেছে—সেটি করুণ রস;—কোনও গানেই যেন আনন্দের অনুভূতিকে উপভোগ করবার অবকাশ নেই। কেউ কেউ যেন গান করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন বলে মনে হয়। এক এক সময় মনে হয় বহু শিল্পী গানের অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন না, গানের মূল ভাবটি কি তাও তাঁদের কাছে স্পষ্ট নয়। নইলে তাঁদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের এই গতি হবে কেন? বিশেষ করে পুরুষ শিল্পীদের কণ্ঠে এই নির্বীর্য ভাবটি অত্যন্ত বিসদৃশ লাগে। সর্বাপেক্ষা পরিতাপজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন এঁরা [illegible]

করেন। চণ্ডালিকার গানগুলি শুনে অনেক সময় ধিক্কার দিয়ে বলতে ইচ্ছা করে, কবিগুরুর রচনাকে এমনি হীন অপদার্থ ভঙ্গীতে প্রচার করবার কোন অধিকার নেই এঁদের। অযোগ্যতার বোধ করি এঁরাই শেষ সীমা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে স্টীম রোলার চালাতে বারণ করেছিলেন অনেক অনুনয় করে, আজকের শিল্পীদের ততটা ক্ষমতা নেই, কিন্তু তাঁরা তার পরিবর্তে প্রত্যেকটি গানকে রাঙা আলুর পিঠের মত তুলতুলে করে ন্যাকামির রসে ডুবিয়ে রেখে তাদের সত্তাকে আর অবশিষ্ট রাখছেন না। এই অপপ্রচার কর্ণগোচর হবার আগেই কবিগুরু দেহরক্ষা করে মুক্তি পেয়েছেন।

গত তিরিশ বছরে কতিপয় রবীন্দ্রসংগীতকে ঘিরে টপ্পা যেন তেঁতুল বিছের আকার ধারণ করেছে। উক্ত বৃশ্চিক এই গানগুলির মধ্যে যত্রতত্র নিরলস ভাবে বিসর্পিল বক্র গতিতে বিচরণ করছে এবং তাদের দংশন অনুভব করতে হচ্ছে শ্রোতাদের। টপ্পা যে কি বস্তু এবং এক শতাব্দীর অধিককাল ধরে তো এতদ্দেশীয় সংগীতে কিভাবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে সে সম্বন্ধে সুযোগ্য শিক্ষার অবকাশ অনেকেরই ঘটেনি। ফলে এর সীমিত প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেকেই অবহিত নন, কিন্তু যেহেতু এঁরা শুনে থাকেন যে রবীন্দ্রনাথ টপ্পার প্রয়োগে সিদ্ধ ছিলেন, সেহেতু এক প্রকার কণ্ঠকম্পনকে টপ্পার পর্যায়ে ফেলে প্রভূত উদাম সংস্কারে সেই প্রক্রিয়াকে যৎপরোনাস্তি প্রলম্বিতভাবে তাঁদের গানে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সচেষ্ট হন। অথচ রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ ছিল বিপরীত। স্থান বিশেষে টপ্পার স্বল্প প্রয়োগ তিনি করতেন, কিন্তু তা অতিশয় বিদগ্ধ এবং সুচারু। বাংলা টপ্পার গতি প্রকৃতি যদি এযুগের শিল্পীরা অনুধাবন করতেন তাহলে তাঁরাও এর সীমিত প্রয়োগে অভ্যস্ত হতে পারতেন। একপেশে শিক্ষার কুফল রেকর্ড, রেডিওর পয়লা নম্বরের আর্টিস্ট বলেই তো আর

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
সার্বজনীন ৭৲

শক্তিপদ রাজগুরু
আমি শুধু একা ৭৲

বনফুল-এর
মানদণ্ড ৭৲

বনফুল-এর
শ্রেষ্ঠ গল্প ৮৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের রহস্য উপন্যাস
ক্লান্ত বিহঙ্গ ৫৲
তারা ওঠার আগে ৬৲
দূর বলাকা ৫৲
প্রজাপতি রঙ ৬৲

চিরঞ্জীব সেন (রহস্য)
অদৃশ্য হাত ৬৲

বনফুল-এর নাটক
আসন্ন ৪৲

বিশ্বনাথ বসু (উপন্যাস)
অরণ্য গভীরে ৭৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
অগ্নিগড় ৫৲

শক্তিপদ রাজগুরু (উপন্যাস)
প্রতি ঘরে ঘরে ১০৲

কিরীটী রায় (রহস্য)
অপরাধী ৭৲

নিশাচর-এর রহস্য উপন্যাস
অন্ধ অতীত ৬৲
ডেড বাড ৬৲

ডি. জি. পাবলিশার্স C/o আধুনিক
১১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন ৩৪-৩৩৭২

অব্যাহতি দেবে না—তার অপপ্রভাব বিস্তার করবেই।

প্রত্যেক গানের একটি নির্দিষ্ট সুষম গতি আছে। রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে অতিশয় সচেতন ছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর অনেকের বোধ হয় মনে হয়েছে এতে গানের উপর যথেষ্ট ন্যায়সাধন হয় না, অনেক গানকে বোধ হয় আবেগের আধিক্যে দীর্ঘায়িত করতে পারলে যথোপযুক্ত কর্তব্য সাধিত হয়। এই মনোভাব নিয়ে গাওয়া যে সব গান শোনা যায় সে সব গানে ভাবের অভাব অবশ্যই অনুভূত হয় না, কিন্তু গান বস্তুটির স্বরূপ যে কি সেটি অনুভব করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। রবারের তৈরি কোনও কোমল জিনিসকে অনেকখানি টেনে ধরলে যেমন তার আকৃতির বিকৃতি ঘটে—এ উদ্যমও অনেকটা সেই প্রকার। তাছাড়া এর ফলশ্রুতিটিও কম ক্ষতিকর নয়। "মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে"—এই লাইনটি অত দীর্ঘকাল ধরে না গাইলেও আঁধার করে আসবার মত যথেষ্ট মেঘ জমবার যে অবকাশ ঘটবে সে বিষয়ে শিল্পীর সংশয় না থাকাই ভাল। এতটা বিলম্বিত গতিতে গান ধরবার পর এক সময় শিল্পী যখন দেখতে পান উইংগাসের অন্তরাল থেকে তাঁকে তাড়াতাড়ি সারতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—বা বেতারের প্রচারের সময় তেমন বেশী নেই, তখন সঞ্চারী থেকে সঞ্চরণ সহসা দ্রুততর হয়ে ওঠে এবং অবশেষে দেখা যায় আরম্ভ এবং অবসানের মধ্যে গতির তারতম্য অতি বিসদৃশ আকার ধারণ করেছে। এরকম কারণ না ঘটলেও অনেকের অভ্যাসই এই ধরনের। এক ধরনের লোক আছেন যাঁরা লিখতে বসলে লাইনটা কিছুতেই সোজা রাখতে পারেন না, তেমন এক ধরনের শিল্পী আছেন যাঁরা গাইতে বসলে গানকে কিছুতেই সরল স্বচ্ছন্দ গতিতে রাখতে পারেন না, তাকে বিকৃতির একটা অবসাদজনক পর্যায়ে এনে ফেলাটাই তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রসংগীতকেই তাঁরা আঁকড়ে ধরে আছেন।

মোট কথা, স্বাভাবিক নিয়মে গান যেরকম হওয়া উচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতকেও সেইরকম করে গাওয়াই ভাল। রবীন্দ্রনাথ কখনও আতিশয্য চাননি—যেটুকু অলংকার তিনি যোগ করতেন তার বেশী ভূষণও তাঁর কাম্য ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা—কৃত্রিমতা, ন্যাকামি, ভাবালুতা, অস্পষ্টতা ও দুর্বলতা পরিহার না করলে রবীন্দ্রসংগীতে প্রবেশ করা অসম্ভব।

রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

সম্প্রতি এক সুধীজন তথাকথিত রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধায় পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যথোচিত ভাষণ প্রদানের পর নজরুল সম্বন্ধে কিছু বলে ক্ষান্ত হলে শ্রোতাদের এক অংশ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে বলেন, নজরুল সম্বন্ধে অনুপাতিকভাবে এত কম বলা হল কেন? জনগণের কবি সম্বন্ধে এইরূপ অনুদার মনোভাব তাঁদের কাছে অত্যন্ত পরিতাপজনক মনে হয়। বেচারি বক্তা গম্ভীর বিনয়সহকারে জানালেন, রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুল সম্বন্ধে এর বেশী বলবার আর স্কোপ ছিল না। কোনও প্রতিষ্ঠান যদি "কালিদাস-জয়দেব সন্ধ্যা"-র আয়োজন করতেন তাহলে জয়দেবকেও এরম্বিধ [illegible] সম্মুখীন হতে হত। যাই হোক ব্যাপারটি আর বেশী গড়ায়নি। অতঃপর পাঁচটি রবীন্দ্রসংগীত এবং পোনেরটি নজরুল-গীতি গাওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের গানে "চেওনা সুনয়না", "[illegible] কথা কও", "বাগিচায় বুলবুলি তুই", "[illegible]", "কে বিদেশী [illegible]" খুবই সমাদৃত হয়। একজন গায়ক যখন "[illegible] পরিতে আমারে [illegible]" এবং "[illegible]" গাইছিলেন তখন শ্রোতাগণ [illegible] এবং করতালিতে মুখর হয়ে ওঠেন। "বাগিচায় বুলবুলি তুই" গানটি একটি মনোহারী কাওয়ালীতে পরিণত হয়। এটিও কম প্রশংসাধন্য হয়নি। নজরুল সুস্থ থাকলে এই গায়ককে বুলবুলির মতই সমাদর করতেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

যাই হোক—এরূপ সন্ধ্যায় ভবিষ্যতে সুধী বক্তাগণ একটু হুঁশিয়ার হয়ে বক্তৃতা দেবেন, এইটি আমাদের অনুরোধ এবং সেটা তাঁদের হিতার্থেই।

শার্ঙ্গদেব

সংগীতে ধ্বনিবিজ্ঞান

যে যুগে সংগীত কেবলমাত্র প্র্যাকটিক্যালভিত্তিক ছিল সে যুগে ধ্বনিবিজ্ঞান নিয়ে মাতামাতি করার প্রয়োজন হয়ত ছিল না—কিন্তু এ যুগে সংগীত যখন পরীক্ষাভিত্তিক রূপ নিয়েছে তখন থিওরি বা ঔপপত্তিকের নানান কচকচির মধ্যে ধ্বনিবিজ্ঞান একটি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মজার কথা, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েই হোক আর প্রভাকর, সুধাকর জাতীয় বিভিন্ন ডিপ্লোমা পর্যায়েই হোক, এই ধ্বনিবিজ্ঞান অধ্যায়টি সম্বন্ধে ছাত্র শিক্ষক, কোন পক্ষই কোনরকম গুরুত্ব দেওয়ারই প্রয়োজন বোধ করেন না। পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত এই শাখাটি সম্বন্ধে (যদিও অন্যায়, তবুও না বলে পারছি না) অনেক শিক্ষকেরই স্পষ্ট কোন জ্ঞান নেই। তার ফলে কাকে [illegible] বলে, কাকে [illegible] বলে, কাকে [illegible] সংখ্যা বলে ইত্যাদি বিষয়গুলি শিক্ষকমহাশয়রা ছাত্র-ছাত্রীদের সম্যকভাবে বোঝাতে পারেন না। হয় [illegible] দিয়ে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করানো হয়, নয়ত অধ্যায়টি বাদ দিয়ে [illegible] [illegible] বোধহয় [illegible]।

সংগীতের শাস্ত্রীয় [illegible] ধ্বনিবিজ্ঞান অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা [illegible] গেলে একটি বীক্ষণাগার অবশ্যই প্রয়োজন। ভাইব্রেশান, ফ্রিকোয়েন্সি, সেন্ট ভ্যালু, ইন্টারভ্যাল প্রভৃতি যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা শিখতে হয় সেগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে বোঝানো যেমন সহজ, তেমনি বোঝাও সহজ। কিন্তু ধ্বনিবিজ্ঞানের কোন বীক্ষণাগারের প্রয়োজনীয়তা আজও পর্যন্ত অনুভব করেননি কোনও কোনও সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেখানে এগুলি শিক্ষণীয় বিষয়। ছাত্রদের তরফে মাঝে মাঝে দাবী ওঠা সত্ত্বেও সঙ্গীত-পণ্ডিতগণ নির্বাক নিশ্চুপ। এই অবস্থায় সংগীতের সিলেবাসে এই নেহাৎ অপ্রয়োজনীয় বিষয়টি রেখে শুধু শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের কাঁধে চাপ সৃষ্টি কেন করা হয় বুঝি না। ইতি—
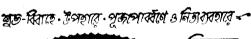
—পঞ্চানন রায়চৌধুরী
হাওড়া।

● সিন্দুর
● আলতা
● কুমকুম

চকোলেটের জন্মকথা

চকোলেট চিরকালই বড় লোকের বিলাস বলেই গণ্য। এখন তো সে-বিলাসের মূল্য এমন মানে পৌঁছেছে যে প্রায় মরীচিকা বলেই মনে হয়। তবে শুনেছি দেশে কোকো উৎপাদনের চেষ্টা চলেছে। গত সাত বছর ধরে দক্ষিণ ভারতে ৪,০০০ একর জমিতে বিখ্যাত কোকো-চকোলেট প্রস্তুতকর্তা ক্যাডবেরি কোম্পানী চাষ চালাচ্ছেন। ১৯৮০ সাল নাগাদ আমরা কোকো রপ্তানিও করতে পারি।

খাদ্য হিসাবে চকোলেট এবং কোকো অতি উত্তম। প্রত্যেক ৫০০ গ্রাম কোকো পাউডারে প্রায় আড়াই হাজারের কাছাকাছি ক্যালরি মেলে। দুধ মিশিয়ে যে চকোলেট হয় তার ক্যালরি মূল্য আরও বেশী। থিয়োব্রোমিন নামে এর খাদ্যগুণে চা ও কফির মধ্যে বর্তমান ক্যাফিনের মতই উদ্দীপক। অল্প পরিমাণে এত চমৎকার পুষ্টি আর কম জিনিস থেকে পাওয়া যায়। আমাদের সৈন্য যেমন সম্মুখ সমরে মেওয়া ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে রাখেন, পাহাড়ে ওঠার পথে তেমন চকোলেটের টুকরো থেকে পুষ্টি গ্রহণ প্রশস্ত বলে ধরা হয়। ভারতীয় মিঠাইয়ে চকোলেট সংযোগ করাও আরম্ভ হয়েছে।

কোকোর জন্ম রূপকথার উপন্যাসের মত। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস আমেরিকা পৌঁছলেন। তিনি সঙ্গে করে দেশে নিয়ে এসেছিলেন অনেক জিনিস। তার মধ্যে কোকো বীজের থলেও ছিল। কিন্তু [illegible] কিছুই হল না। স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ উপহার পেয়ে যে খুব কিছু খুশী হয়েছিলেন তাও মনে হয় না। কারণ, স্পেনে চকোলেট বা কোকো পানের প্রথার প্রবর্তন হয় আরও অনেক পরে।

মেক্সিকোর রাজা মন্টেজুমা কিন্তু তার আগে কোকো খেতেন। মেক্সিকো তখন সোনার দেশ। তার রাজা মন্টেজুমার বৈভব অপরিসীম। সে সময় ইংলণ্ডে রাজা ছিলেন অষ্টম হেনরি। অষ্টম হেনরির মত মন্টেজুমা ভোজনবিলাসী ছিলেন। রাজার প্রাসাদে নিত্য বসতো ভোজের আসর। আসরে শত সুখাদ্যের শেষে আসতো সোনার পাত্রে কোকো!

কোকো অবশ্য তারও আগে মেক্সিকোবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা পেয়েছিল। তাদের রূপকথা কোকো দিয়ে ভরা। কোকো স্বর্গের গাছ। দেবতারা দিয়েছেন এই গাছ। দেবদূত এনেছেন ধরণীতে স্বর্গের উদ্যান থেকে। কোকো খেয়ে দেবদূতের অপার জ্ঞান ও বিচক্ষণতা হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় মেক্সিকোবাসী কোকোর কত কদর করতেন! এমন কি এক সময় কোকো

বীন কড়ির মত অর্থের বিনিময়ে ব্যবহার হতো।

সেকালেও কোকো ছিল বড়লোকের খাদ্য। গরীবরা মসলার মতই ছিটিয়ে একটু পেলে বর্তে যেতেন তখন। ধনীর পানীয় যা ছিল তাও ছিল একেবারে ভিন্ন। ভুট্টার দানার সঙ্গে কুটে সিদ্ধ করে লাল টকটকে লংকা সহযোগে পান করার রেওয়াজ ছিল। প্রথম প্রথম আমেরিকার স্প্যানিশ বিজেতারা কোকো পছন্দই করতে পারেন নি। পরে যখনি তাঁদের ভাল লাগলো তখন কোকোর রহস্য গোপন রাখার চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্পেনে কোকো-বিন কোন না কোন রাস্তা দিয়ে পৌঁছলো ঠিকই। স্পেন থেকে ইটালি ও ফ্রান্সে কোকো গিয়েছিল। ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই-এর স্প্যানিশ রানী মারিয়া থেরেসা রাজসভায় কোকো পানের প্রচলন করেন। মারিয়া থেরেসা কোকোর এত ভক্ত হয়ে উঠেছেন যে এক ফরাসী ঐতিহাসিক লিখলেন "The King and chocolate were the only two loves of Maria Thereda."—মারিয়া থেরেসার ভালবাসার পাত্র ছিল দু'টি—রাজা এবং চকোলেট!

লণ্ডনের ইতিহাসে দেখা যায় ১৬৫৭ সালে কোকো হাউস খোলা হলো। কিন্তু কফি হাউসের মত কোকো হাউসের প্রভাব

যে বইগুলি বি. এড., বি. টি'র জন্য অবশ্যই চাই

১।	শিক্ষাতত্ত্বের রূপরেখা	—গুহ, দত্ত, ভট্টাচার্য ও ঘোষ ...	১২·০০
২।	শিক্ষা মনোবিদ্যা	—অধ্যাপক সুশীল রায়	১৪·০০
৩।	শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ	—রণজিৎ ঘোষ	১২·০০
৪।	শিক্ষাদর্শ পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস	—রণজিৎ ঘোষ	১৫·০০
৫।	নবভারতের শিক্ষা কমিশন	—রণজিৎ ঘোষ	৫·০০
৬।	বাঙলা পড়ানো রীতি ও পদ্ধতি	সত্যগোপাল মিশ্র	১২·০০
৭।	সংস্কৃত শিক্ষার পথনির্দেশ	—অধ্যাপক প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১২·০০
৮।	গণিত-শিক্ষণ পদ্ধতি	—অধ্যাপক শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ ...	১২·০০
৯।	সমাজবিদ্যা শিক্ষণ পদ্ধতি	—কুণ্ডু ও অধ্যাপক মুখার্জি ...	৯·০০
১০।	মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা	—ডঃ জগদিন্দ্র মণ্ডল ...	১২·০০
১১।	শিশু ভোলানাথের রাজত্বে	—অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ	১৪·০০
১২।	তুলনামূলক শিক্ষা	—অধ্যাপক ঊষাকান্ত দত্ত	১২·০০

—: পরিবেশক :—

জবরাজ ভাণ্ডার
১২৭-এ, এস পি মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬

সঞ্চয়
৩০/১বি কলেজ রো
কলিকাতা-৯

(সি ৭৭৭৩)

আম সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। কারণ, কোকোর দাম ছিল বেজায় বেশী। মাত্র ধনী অভিজাতের মিলনস্থান হলো কোকো হাউসগুলি। Cocoa Tree নামে ক্লাবটি লর্ড বায়রনের প্রিয় ছিল এবং সাহিত্যচক্র নামে বিখ্যাত হয়েছিল।

কিছুদিন পরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কোকোর চাষ আরম্ভ হলো। ১৮৭৯ সালে ঘানায় (তদানীন্তন গোল্ড কোস্ট) এক কামার, নাম তেতে কোয়েসি, কিছু কোকোবীন ঘরে নিয়েছিলেন। তা' থেকে ঘানায় কোকো উৎপাদনের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে পৃথিবীর সমস্ত কোকো উৎপাদনের অর্ধেক ঘানায় উৎপন্ন হয়।

ইংলণ্ডে প্রথম প্রথম কোকোর উপর শুল্ক এত বেশী ছিল যে চোরাচালানে দেশ ভরে উঠেছিল। ১৮৫৩ সালে গ্লাডস্টোন শুল্ক কমিয়ে দিলেন যাতে সাধারণ লোকও কোকো পান করতে পারে। ১৮২৪ সালে বার্মিংহামে জন ক্যাডবেরির মুদিখানাতে কোকো ও চকোলেট বিক্রি আরম্ভ হয়। হামানদিস্তা অর্থাৎ খল ও নুড়ির সাহায্যে দোকানে বসে তিনি কোকো গুঁড়ো করতেন। অল্পদিনে তাঁর কোকো এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে ক্যাডবেরি সাহেব দোকান সংলগ্ন এক কারখানাই খুলে ফেললেন। কোকো থেকে চকোলেটের টুকরো বিক্রিও আরম্ভ হলো। ক্রমে ফ্যাক্টরি বড় হয়ে উঠলো এবং বাষ্পচালিত এঞ্জিনে গুঁড়ো করা আরম্ভ হলো। তখন কারখানায় কর্মীরা দিনে দশ ঘণ্টা কাজ করতেন। মেয়েদের জন্যে সপ্তাহের পারিশ্রমিক ছিল পাঁচ শিলিং-এর মত! অবশ্য সে সময় এই পারিশ্রমিককেই যথেষ্ট মনে করা হতো। তার উপর ক্যাডবেরি সাহেব শ্রমিকদের দিতেন সপ্তাহে অর্ধেক দিনের ছুটি। তা' আর কেউ দিত না।

কোকোগাছের উদ্ভিদবিদ্যাগত নাম Theobroma cacao। ইণ্ডিয়ানরা বহুযুগ ধরে কোকো চিনতেন। পেরুতে ইনকা, মেক্সিকোর আজটেক—সবাই কোকোর রসাস্বাদন করেছিলেন। আজটেক শব্দ Cacanati থেকে কোকো কথাটি এসেছে। Cacanati মানে কোকো গাছ। Chocolati থেকে এসেছে চকোলেট। এটিও আজটেক শব্দ। মানে হয়েছে কোকো থেকে প্রস্তুত পানীয়।

দুধ সহযোগে চকোলেট আবিষ্কার করেছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক স্লোন সাহেব অষ্টাদশ শতাব্দীতে। অবশ্য একথাই সর্বজনবিদিত। কিন্তু সাদামাটা দুধ দিয়ে চকোলেটের টুকরো সুইজারল্যাণ্ডে আবিষ্কার হয়।

কোকোর খাদ্য থেকে রাজনীতিতে প্রবেশও বেশ চিত্তাকর্ষক ঘটনা। যে ঘানাতে সেদিন কোকোর প্রবেশ হলো সেখানে সমস্ত রাজনীতি এখন কারও কোকোর কাছে হার মানে না। অথচ ঘানা সোনা, ম্যাঙ্গানীজ, হীরে ইত্যাদি বহু মূল্যবান জিনিসের রপ্তানিকারক দেশ। সুইজারল্যাণ্ডের নেসলে কোম্পানী সে দেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী।

কোকো থেকে কোকো মাখন প্রস্তুত হয় বলে মিষ্টান্ন করা সহজ। কোকো যখন গুঁড়ো করা হয় তখন ক্রীমের মত এই স্নেহ বের হয়ে আসে। পানীয় কোকোর জন্য এর এক অংশ বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু মিষ্টান্ন চকোলেটে স্নেহের স্বাদ ও গুণ বজায় রাখা হয়। কখনও-বা পানীয় চকোলেটের যে স্নেহ বের করে নেওয়া হয় তার অংশ চকোলেটের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

হয়তো পশ্চিমের ছেলেমেয়েরাই কোকোর টুকরো চিবিয়ে চকোলেটের সূত্রপাত করেছিলেন। আজও সারা জগতে ছেলেমেয়েরা চকোলেট পাগল। ১৯৮০তে আশা করছি আমাদের ছেলেমেয়েরা এই মিষ্টান্নের মধুর স্বাদ পাবার সুযোগ পাবে। ততদিনে যারা বড় হয়ে যাবে তাদেরও বঞ্চিত হতে হবে না। কারণ, বড়দের মুখেও চকোলেটের নামে জল আসে

শ্রীমতী

অদ্য প্রকাশিত উৎপল দত্তের নাটক **দিল্লী চলো ৪.৫০**

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল :	শরৎচন্দ্রের স্বপন নিবরণী	৬.০০
ঐ	শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা	২.৭৫
ডঃ অজিতকুমার ঘোষ :	শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার	১৩.০০
Prof. Humayun Kabir :	Sarat Chandra Chatterjee	3.00
Sefali Nundy :	Bengali For Foreigners	4.00
ডাঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য :	ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা	৬.০০
অধ্যাপক ত্রিপুরাশংকর সেন :	উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য	৯.০০

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় : হ্যামলেট (নাট্যানুবাদ) ৩.৫০, জগন্নাথের রথ ৩.০০

পপুলার লাইব্রেরী : ১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

(সি ৭৭৬১)

অদিতি গ্রন্থালয়ের বই **প্রকাশিত হল**

নিমাই ভট্টাচার্য-র
আধুনিকতম উপন্যাস
হরেরাম হরেকৃষ্ণ

বর্তমানকালের যুবক-যুবতীদের ভয়ংকর সুখ-দুঃখ, হতাশা, হাহাকার ও যুগ-যন্ত্রণার স্বাক্ষর হিসাবে এ উপন্যাস পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলবে। দাম ঃ আট টাকা।

নিমাই ভট্টাচার্য-র
রোমান্টিক উপন্যাস
অনুভব

বাংলা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে ॥ দাম ঃ ছয় টাকা

পরিবেশক ঃ সাথ ব্রাদার্স ॥ ১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা-১২

(সি ৭৭৬৬)

দিদির বাড়ী থেকে
ঘুরে আসার পর
এই মহিলা
অনিন্দ্যসুন্দর
হয়ে উঠেছেন।
Lakmé
SATIN GLOW
LIQUID
MAKE-UP
ল্যাকমে
সাটিন গ্লো
লিকুইড মেকআপ
সাটিন গ্লো মেকআপ লাগালে অঙ্গে

ইলেকট্রোনিকস
এবং
জাতীয় ভৌত-গবেষণাগার

পনের বছর আগে এক টুকরো ট্রানজিসটার সংগ্রহের জন্যে আমাদের বিদেশে ছুটতে হতো। তখনও এদেশের অনেকেই কিন্তু ভাবতে পারেন নি তার এক দশক পর অদ্ভুত ছোট সাইজের ট্রানজিসটার রেডিও কাঁধে ঝুলিয়ে মেঠো পথে মানুষ হেঁটে চলেছে। আর, এখন? পান বিড়ির দোকান, গ্রামের বটতলার আড্ডা অথবা রূপনারায়ণের বুকে যাত্রীবাহী নৌকা যেখানেই যান ক্ষুদে ক্ষুদে ট্রানজিসটার রেডিও সেটের রাজত্ব সর্বত্র। অথচ পঁচিশ বছর আগে ঘরে রেডিও সেট রাখা যেন একটি সাংঘাতিক রকমের ব্যাপার। এক মাত্র বড়লোকেরই সাধ্য। এখন নয়। এবং সেটা সম্ভব হয়েছে শুধু একটি কারণেই। ভারত নিজেই এখন ট্রানজিসটার তৈরি করছে। ট্রানজিসটার রেডিও তৈরির প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ যন্ত্রাংশ বা সাজ সরঞ্জাম এদেশের কারখানাতেই উৎপাদিত হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছে রেডিও তৈরির ছোট-বড় হাজারো শিল্প প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক উদ্যোগে যাদের মূল্য এখন অপরিসীম।

শুধু ট্রানজিসটার নয়, ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে তাৎক্ষণিক কাজে লাগান যায় এমন ধরনের গবেষণা, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় অ্যাপ্লায়েড রিসার্চ এবং সেই সংগে ওই সব গবেষণালব্ধ যন্ত্রপাতির মৌলিক উন্নয়নের জন্যে গবেষণা, যার নাম রাখা হয়েছে বেসিক রিসার্চ—এ দুয়ের ওপরেই জোর দিয়েছিলেন। সুখের কথা প্রচুর বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যতখানি দেশকে এ পর্যন্ত তাঁরা দিতে পেরেছেন এক কথায় তা অভূতপূর্ব।

যেমন ধরুন, আমাদের জাতীয় ভৌত-গবেষণাগার। অর্থাৎ ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবোরেটরি, নতুন দিল্লি।
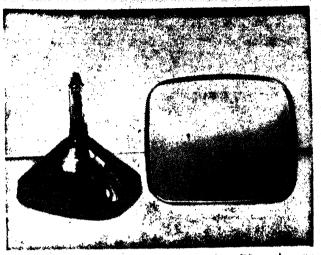
সম্প্রতি ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির পরিচালক, ডঃ এ আর ভার্মার প্রতিবেদন : গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে এই গবেষণাগার ইলেকট্রোনিক যন্ত্রপাতি, তার জন্যে প্রয়োজনীয় নানা রকম যন্ত্রাংশ এবং সাজ সরঞ্জাম এবং সেই সংগে আধুনিকতম পর্যায়ের এমন কিছু কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি করেছেন আন্তর্জাতিক সমমূল্যতার দিক দিয়ে যাদের স্থান সমপর্যায়ের। এই একটি গবেষণাগারই ওই সময়ের মধ্যে প্রায় ৫০ রকমের নতুন পদ্ধতি বের করেছেন। দেশের ৮০টিরও বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের কাজে লাগিয়েছে।

দিল্লির ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবোরেটরির তৈরি টেলিভিশন টিউব (বাঁ পাশে)। ডান পাশে টেলিভিশনের পর্দা। নিজেদের উদ্ভাবনা এবং দেশজ কাঁচামালের সাহায্যে তৈরি এই টিউব অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভারতের কোন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এটির উৎপাদনে সচেষ্ট। ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির পরিচালক ডঃ এ আর ভার্মার মতে এই পদক্ষেপ টেলিভিশন সেটের দাম অনেক কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে

সংবাদ : ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির মুখ্য চেষ্টার ফলে দেশের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটানর মত 'ফেরাইটস' উৎপাদনক্ষম শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এবং তাদের তৈরি করা হচ্ছে পুরোপুরি দেশজ কাঁচামালে এবং আমাদের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে। উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, নিকেল-জিংক ফেরাইটস, লো ফ্রিকোয়েন্সি বা মৃদু বেতার তরংগ ব্যবহারের উপযোগী ফেরাইটস, স্কয়ার লুপ ফেরাইটস, ম্যাঙ্গানিজ জিংক ফেরাইটস, ডাই-ইলেকট্রিক এবং পিয়েজো ইলেকট্রিক বস্তুসামগ্রী, সেমি-কনডাকটার বা প্রায় পরিবাহীদের সিলিকন, ফসফোরাস, হাইড্যান্ড কমপোজিশন রেজিসটরস, থার্মোইলেকট্রিক বা তাপ-বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম রূপোর পরিবাহী সিমেন্ট, প্রভৃতি।

জাতীয় ভৌত গবেষণাগার যে সব ফেরাইট তৈরি করেছেন, সুবিধে এই দেশজ আকরিক লোহা থেকেই তাদের তৈরি করা যায়। ফলে বিদেশ থেকে আমদানি করা ফেরাইটস থেকে এদের দাম অনেক কম। অবশ্য গোড়ার দিকে নরম ফেরাইটস তৈরির জন্যে যে মিক্সেল

ছোট বড় সবার পড়ার মত বই

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর
এসো এসো গল্প বলি ২·৫০
অমরনাথ রায়ের
টলস্টয়ের সেরা গল্প ৩·০০
হরেন ঘটকের
সাগর পারের ছড়া ১·৬০
প্রসিত রায়চৌধুরীর কিশোর বই
আকাশ, পৃথিবী, বিজ্ঞান, জন্ম ২·২৫
প্রকাশক ও পরিবেশক—গ্রন্থলোক
৫৮, বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলি-৬
প্রাপ্তিস্থান : প্রগতি লাইব্রেরী
৮বি, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

(দে ৫/৬৩১)

অকসাইড দরকার হতো তার সবটাই আমদানি করতে হতো বিদেশ থেকে। খরচও পড়ত অনেক। পরে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বিকল্প বস্তুর সন্ধান করতে থাকেন। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যে নতুন একটি পদ্ধতিও বের করে ফেললেন তাঁরা। এই পদ্ধতিতে ফেরাইটস তৈরি করার জন্যে নিকেল অকসাইড-এর পরিবর্তে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অকসাইড নিলেই চলে। এবং শেষোক্ত বস্তুটি সম্পূর্ণ ভারতীয়। উল্লেখ করা যেতে পারে আপনার ট্রানজিসটার রেডিও খুললেই দেখতে পাবেন তার ভেতর কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা কালো একটি রড দুটি ধাতব-দানের ওপর বসানো। ওই রডটিই এক ধরনের ফেরাইট। যার কাজ বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রসারিত বেতার তরঙ্গ সুষ্ঠুভাবে শোষণ করা। অথবা বলতে পারেন গ্রহণ করা। অত্যন্ত সংবেদনশীল 'এরিয়াল'-এর মতই এটি কাজ করে। ফেরাইটস-এর রকমভেদে কার্যকারিতা অবশ্য পাল্টায় এবং তাদের প্রভাবে আধুনিক ইলেকট্রনিকস, সে কমপ্যুটার বা যন্ত্রগণকই হোক, অথবা টেলিকম্যুনিকেশন যন্ত্রপাতি, মাইক্রোওয়েভ বা ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ বিষয়ক যন্ত্রপাতি, টেপ-রেকর্ডার এমন অনেক অনেক রকম সাজ সরঞ্জামের যত্রতত্র।

বলাবাহুল্য, প্রযুক্তির দিক দিয়ে উপযুক্ত মানের ফেরাইট তৈরির ব্যাপারটা খুবই জটিল। এর জন্যে দরকার বিশেষ ধরনের চুল্লি। যার মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে বাতাস প্রবাহিত করতে হয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা রক্ষা করতে হয়। এবং পদ্ধতির প্রতিটি পর্যায় নিখুঁত সময় ধরে শেষ করা। এমন অনেক সব ব্যাপার একমাত্র নিখুঁত এবং অতিমাত্রায় সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির পক্ষে সম্পন্ন করা যা একমাত্র সম্ভবপর।

অবশেষে আরাধ্য বস্তুটি যখন তৈরি হল তখন যা চাওয়া হয়েছে সত্যিই সেটা তেমনটি হল কী না, অর্থাৎ যাকে বলে ফিনিসড প্রোডাকট স্পেশিফিকেশন মত দাঁড়াল কী না, সেটা দেখে নেয়া দরকার। এর জন্যে আবার যে সব যন্ত্রপাতি কাজে লাগান হয়, তাদের মধ্যে আছে মসবয়ার স্পেকট্রোস্কোপ, মাস স্পেকট্রোস্কোপ, একস-রশ্মি বিশ্লেষণ যন্ত্র প্রভৃতি। জানা গেছে ইতিমধ্যে ন্যাশনাল ফিজিকেল ল্যাবরেটরির যে সমস্ত নমুনা তৈরি করেছেন সেগুলি আমাদের টেলিকম্যুনিকেশন গবেষণা কেন্দ্র প্রভৃতিতে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পরীক্ষালব্ধ ফলাফল যেমনটি আশা করা গিয়েছিল তেমনটিই হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ওই সমস্ত ফেরাইট আন্তর্জাতিক মানের সমপর্যায়ের অনুরূপ।

*

আধুনিকতম ইলেকট্রন শিল্পের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সিলিকন। মৌলিক পদার্থ না হলেও সিলিকনের অতিপরিচিত একটি যোগের সঙ্গে সকলেই আপনারা পরিচিত। যোগটির রাসায়নিক নাম সিলিকন ডাই-অকসাইড। সাধারণভাবে যাকে বালু বলা হয় তাই। কিন্তু মুশকিল এই, বালু থেকে সিলিকন নামক মৌলিক পদার্থটির পৃথকীকরণ এবং অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে পৃথকীকরণ গত তিন দশক আগেও রীতিমত একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। পরে মহাকাশ গবেষণার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন এবং সোভিয়েত দেশ মৌল-সিলিকন প্রস্তুত করার কাজে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। শেষ পর্যন্ত সিলিকন তৈরি করাও গেল। কিন্তু এক এক পাউণ্ড সিলিকন তৈরি করতে খরচ পড়ল, অন্তত মার্কিন দেশের হিসেবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলারের মত।

তবু এত খরচ সত্ত্বেও একমাত্র, মহাকাশ গবেষণার তাগিদে কাজটি তাঁরা ফেলে রাখেন নি। কারণ মহাকাশ গবেষণার জন্যে দরকার অতি সংবেদনশীল যন্ত্রগণক, টেলিকম্যুনিকেশান যন্ত্রপাতি, যন্ত্রগণক চালিত টেলিভিশন, ক্যামেরা, আবহাওয়া-জ্ঞাপক যন্ত্র প্রভৃতি। আর, এসব যন্ত্রপাতির অভূতপূর্ব কার্যক্ষমতার অন্যতম চাবিকাঠি সিলিকন। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই, মহাকাশযানের নানারকম যন্ত্র চালনা থেকে শুরু করে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—সেসবের জন্যে যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি দরকার তার যোগান দেবার ব্যাপারেও সিলিকন যেন এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে বসল। তৈরি হল হাজার হাজার সিলিকন সোলার সেল বা সিলিকনযুক্ত সৌর কোষ। তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেটাও এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা। ১৯৫৪ সালে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরি প্রথম সিলিকন সৌর কোষ তৈরি করেন। এর জন্যে বিশুদ্ধ সিলিকনের পিণ্ডকে কেটে পাত প্রস্তুত করা হয়। পাতটিকে পরে মসৃণ করে নিয়ে পাতলা কাঁচের উপর যেমন রঙের প্রলেপ লাগান হয়, ঠিক সেইভাবে ওই পাতের গায়ে লাগান হল বোরনের প্রলেপ। এবার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এক টুকরো সূক্ষ্ম তার জুড়ে দেওয়া হল বোরন প্রলেপের গায়ে। এটি হল পজিটিভ সংযোগ। আর এক টুকরো তার জুড়ে দেওয়া হল সিলিকনের সঙ্গে, এটি নেগেটিভ তড়িৎ-দ্বার। সিলিকনের পাতটিকে এবার সূর্যের আলোর রেখে দিয়ে তড়িৎদ্বারে সংযোগ ঘটান। অমনি তার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চলতে শুরু করে। একেবারে সরাসরি সূর্যরশ্মি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সূর্য যতদিন কিরণ দেবে, ওই কোষ ততদিন বিদ্যুৎ-শক্তি যুগিয়ে যাবে। এর জন্যে কোন জ্বালানির দরকার হবে না। অতএব কোষ তৈরি করার প্রাথমিক ব্যয়ভার ছাড়া আর কোন খরচ নেই। যদিও সেই প্রাথমিক ব্যয়ভারের বোঝাটা সাধারণের কাছে এত বেশি, যেন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মত। কারণ একটু আগেই উল্লেখ করেছি, বিশুদ্ধ সিলিকন তৈরির খরচ অত্যন্ত বেশি।

উল্লেখ করা যেতে পারে সৌর শক্তি থেকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তি তৈরির প্রথম নজির স্থাপন করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বেকুয়েরেল ১৮৩৯ সালে। সেলেনিয়ামের সাহায্যে তিনি সৌর-রশ্মি থেকে তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করেছিলেন। মাঝে এক শতাব্দীরও বেশি এ নিয়ে তেমন কাজ হয়নি। বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি আবিষ্কৃত হল ট্রানজিসটারের কার্যকলাপ। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ উইলিয়াম স্কিলি। ১৯৫৪ সালে সিলিকন সৌর তড়িৎ কোষ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সমাজে সাহিত্যে ১০·০০

"সমাজ ও সাহিত্য" এর চিন্তা, সাহিত্য-তত্ত্বের মূল্যায়ন, সাহিত্যের সাথে সমাজের যোগসূত্র প্রভৃতি চিন্তার নিরিখে যাচাই ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ডঃ ভবতারণ দত্ত

দুই-পারের ছড়া ৫·০০

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে উৎসর্গীকৃত দুই-বাঙলার অনেক অনেক বছর আগের মা, ঠাকুমা, মাসি, পিসির হৃদয়ের স্বতোৎসারিত গুঞ্জনের মিল এতে শোনা যাবে।

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

[ডেপুটি কমিশনার (প্রাক্তন) অব এগ্রিকালচার অব বেঙ্গল]।

শাক সবজীর বাগান ২·৫০

চাষের পাঁজি ২·৫০

ফলের চাষের ক, খ, গ, ৩·০০

চাষবাস সম্পর্কে অনুরাগীদের অবশ্য পাঠ্য

দি বুক ট্রাস্ট

৫৭বি, কলেজ স্ট্রীট, কলি-১২

(সি ৭৭৫২)

তৈরি করার পর দেখা গেল সিলিকন ছাড়াও আরও কিছু কিছু পদার্থ সৌর-তড়িৎ কোষের ব্যাপারে আরও বেশি কার্য-ক্ষম। যাদের মধ্যে প্রথম স্থান গেলিয়াম আর্সেনাইডের। সুবিধে এই বস্তুটির সাহায্যে তৈরি কোষ অনেক বেশি উচ্চ তাপমাত্রায় নিজস্ব কার্যক্ষমতা অটুট রাখতে পারে। তুলনায় সিলিকনের কার্যক্ষমতা শূন্য ডিগ্রি ফারেনহাইটের ৬৫ ডিগ্রি নিচে এবং ১৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট এই দুই সীমার মধ্যেই সক্রিয় থাকে। কিন্তু মুশকিল এই, খরচায় গেলিয়াম আর্সেনাইড সিলিকনকে আরও ছাপিয়ে যায়।

ক্যাডমিয়াম সালফাইড সৌর-কোষের ব্যাপারে আরও একটি আদর্শ পদার্থ। কিন্তু এটির ব্যবহারেও খরচ পড়ে অনেক বেশি।

*

যাই হোক গত প্রায় দুই দশকের মধ্যে সিলিকন প্রায় সব রকমের ইলেকট্রোনিক যন্ত্রপাতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসেছে। ট্রানজিসটার, রেকটিফায়ার, ইনটিগ্রেটেড-সার্কিট এ সব তৈরির জন্যে সিলিকন দরকার। মার্কিন, সোভিয়েত দেশ, এবং দু একটি পশ্চিমী দেশ ছাড়াও জাপান এবং চীন এখন বিশুদ্ধ সিলিকন তৈরি করতে সক্ষম। বলা বাহুল্য ভারতকে এই বস্তুটির জন্য এখনও পুরোপুরি বিদেশী-দের মুখ চেয়ে থাকতে হচ্ছে।

এ সব কথা ভেবেই আমাদের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি বিশুদ্ধ সিলিকন উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট বস্তুসামগ্রী তৈরির ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এখানকার বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে একক্রেলাস এবং বহুক্রেলাস বিশিষ্ট বিশুদ্ধ সিলিকন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। যা দেশের ইলেকট্রোনিকস শিল্পের চাহিদা ইতিমধ্যেই মেটাতে শুরু করেছে। ৫০—৬০ অ্যামপেয়ারের সিলিকন রেকটিফায়ার, সিলিকনের টুকরো আটকে রাখার জন্য রুপা এবং টাংস্টেনের ধাতুখণ্ড এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেমিকনডাকটার বিষয়ক সাজ সরঞ্জামও তৈরি করেছেন তাঁরা।

আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতে টেলিভিশন ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করার যে ব্যাপক পরিকল্পনা নিচ্ছে তার মোকাবিলা করার কথাও ভাবছেন দিল্লির জাতীয় ভৌত গবেষণাগার। ফসফোর ঘটিত অত্যন্ত বিশুদ্ধ মানের জিঙ্ক সালফাইড এবং ক্যাডমিয়াম সালফাইড তৈরির ব্যাপারে এখন সেখানকার বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছেন। এই বস্তুগুলি টেলিভিশনের ওসসিলোস্কোপ টিউব, টেলিভিশন এবং এক্স-রে-এর পর্দা এবং

পূজা সংখ্যা

উল্টোরথ

॥ উপন্যাস ॥

বনফুল, আশাপূর্ণা দেবী, বুদ্ধদেব বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শংকু মহারাজ ও চাণক্য সেন

॥ বড় গল্প ॥

সমরেশ বসু, নিমাই ভট্টাচার্য

॥ গল্প ॥

অন্নদাশংকর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জরাসন্ধ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, মনোজ বসু, শংকর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ ও বিমল মিত্র

॥ রম্য রচনা ॥

প্রমথনাথ বিশী, ইন্দ্রামিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, শ্রীপান্থ, কুমারেশ ঘোষ, শ্রীবিরূপাক্ষ, শ্রীকাল্কে

॥ বিশেষ রচনা ॥

গুরুদাস ভট্টাচার্য, তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী, ইন্দ্রধনু, অমিতাভ বসু, ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত, পার্থসারথি

॥ সিনেমার ফিচার ॥

কুশল চৌধুরী, বিমান দত্ত, রামকৃষ্ণ রায়, কলিন পাল, বিমল চক্রবর্তী, সন্ধ্যা সেন, শ্যামল বসু, পুলক ব্যানার্জী, প্রফুল্ল বসু স্বনামে লিখছেন বহু শিল্পী ও কলাকুশলী

এছাড়া

সিনেমার ছবি ও ছবির ফিচার

দাম ৭·০০ টাকা/সডাক ৮·২৫ পঃ
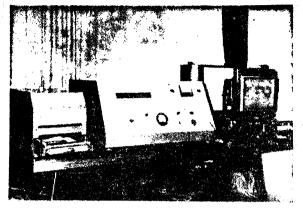
দি ম্যাগাজিনস প্রাঃ লিঃ

১২৪বি, বিবেকানন্দ রোড । কলিকাতা-৬

[illegible]

স্থির-বিদ্যুৎ নকলকারী যন্ত্র জাতীয় ভৌত গবেষণাগারের আরও একটি অসামান্য কৃতিত্ব। বই, চিঠিপত্র প্রভৃতির অনুলিপি এই যন্ত্রটির সাহায্যে সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেন্ড এবং সেটা সাধারণ কাগজের ওপরই করা যায়। তার জন্যে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক প্রলেপ লাগান কাগজের দরকার হয় না। ভৌত গবেষণাগারে তৈরি এই যন্ত্রটির দাম পড়ছে কুড়ি হাজার টাকা অথচ বিদেশ থেকে এ ধরনের এক-একটি যন্ত্র আনার খরচ এক লক্ষ টাকা। ভারতের তিনটি শিল্প প্রতিষ্ঠান এটির উৎপাদনের কাজে হাত দিয়েছেন এবং এরইমধ্যে ২০০টি যন্ত্র বিক্রিও করেছেন তাঁরা।

তাড়িৎ প্রতিপ্রভা বা ইলেকট্রোলুমিনিসেন্ট প্যানেল তৈরিতে কাজে লাগবে।

ডঃ এ আর ভার্মার প্রতিবেদন : জিংক-সালফাইড এবং তামা ফসফস ঘটিত তাড়িৎ-প্রতিপ্রভা প্যানেল যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য-ভাবে তৈরি হয়েছে। সম্পূর্ণ দেশজ কাঁচা মালে ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটারির বিজ্ঞানীরা ২৩,৩০·৫ এবং ৪১ সেন্টিমিটার পর্দা বিশিষ্ট টেলিভিশন ছবির টিউব তৈরি করেছেন। এই উদ্যোগ টেলিভিশন সেটের দাম এখনকার তুলনায় অনেক কমিয়ে আনবে।

*

জাতীয় ভৌত গবেষণাগার আধুনিকতম ইলেকট্রোনিকস যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যাপারে নতুন অর্থনৈতিক দিগন্ত সৃষ্টি করছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং গবেষকদের এখনও পর্যন্ত বড় রকমের একটি অসুবিধেয় ভুগতে হচ্ছে। সমস্যাটি লাইব্রেরি ঘটিত। সেখানে অনেক সময় সব কিছু পড়ে ওঠা সম্ভব হয় না। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অথবা রেফারেন্স বই থেকে নোট টুকে কাজটি বাড়ি এসে সারতে হয়। কিন্তু মুশকিল এই, পাতার পর পাতা কত আর নোট নেবেন? বিদেশে এর জন্যে ফটোকপিং যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। বই-এর যে অংশ আপনার দরকার, সেই অংশটি যন্ত্রে [illegible]

তার ছাপান কপি হাতে এসে পড়বে। মার্কিন দেশে 'জেরক্স' নামে এই ধরনের মেশিনের চল সবার। পাঠাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস যেখানেই কাগজপত্র, বই প্রভৃতির নকল দরকার এই যন্ত্র সেখানে ব্যবহার করা হয়। ভারতে একটি জেরক্স আমদানি করতে গেলে খরচ পড়ে প্রায় এক লক্ষ টাকা। সুখের কথা সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় জাতীয় ভৌত গবেষণাগার ওই ধরনের নকলকারী যন্ত্র তৈরি করেছেন। যার দাম পড়বে মাত্র ২০,০০০ টাকা। তাঁদের তৈরি যন্ত্রের আরও একটি সুবিধে নকলের কাজটা সাধারণ কাগজেই সারা যায়, কোন রাসায়নিক প্রলেপ লাগান কাগজের দরকার হয় না। যন্ত্রটি তৈরির কলাকৌশল ইতিমধ্যে ভারতের তিনটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে। ওই সব প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে ২০০টি যন্ত্র তৈরি করে বাজারেও ছেড়েছেন।

শব্দ এবং তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের সাহায্যে অন্ধরা যাতে পথ চিনে চলতে পারেন তেমন যন্ত্রপাতি তৈরি করে কয়েকটি অন্ধ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন জাতীয় ভৌত গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা। অন্যান্য আধুনিকতম যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে বাঁকান-কেলাসযুক্ত বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র, ইনফ্রারেড স্পেকট্রোমিটার বা অব-লোহিত-বর্ণালী বীক্ষণযন্ত্র, ল্যাঙ্গ ক্যামেরা যার সাহায্যে এক কেলাস বিশিষ্ট সিলিকনের পুনঃপুনঃ বা ক্ষতিরোধ পরীক্ষা করা [illegible]

আছে বিশেষ ধরনের ভ্যাকুয়াম যন্ত্রপাতি, ধাতুর বাষ্পীভবন যন্ত্র, প্রতিরক্ষা বিষয়ক নানা রকম যন্ত্রপাতি, প্রভৃতি।

গত এক দশকে জাতীয় ভৌত গবেষণাগারের কাজকর্মের ধারাই যেন পালটে গেছে। সীমিত এই সময়ে দেশের ইলেকট্রোনিকস শিল্প উৎপাদন এবং জাতীয় প্রয়োজন ভিত্তিক গবেষণায় ভৌত বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম তাঁরা তৈরি করেছেন স্বয়ম্ভরতার দিক দিয়ে তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে একটা কথা হয়ত বললে বেশি বলা হবে না। এই গবেষণাগারটি ইতিমধ্যে এমন কিছু কিছু সাজ সরঞ্জাম তৈরি করেছেন যা শুধু আন্তর্জাতিক মানেরই সমতুল্য নয়, পুরোপুরির এদেশের জল হাওয়ার উপযুক্ত বলে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

বাংলা ভাষায় উচ্চতর গণিতের বই

বাস্তব সংখ্যা ও সহযোগীতত্ত্ব এই উচ্চতর একটি বই হাতে এল সম্প্রতি। তিনটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই বইটিতে স্থান পেয়েছে মূলদ এবং অমূলদ রাশির সংজ্ঞা, ডেডিকেণ্ডের বিভাগীকরণ, দুটি রাশির মধ্যে ক্রমিক সম্পর্ক, প্রতিফলনীয়তা, প্রতিসাম্য, সংক্রামনীয়তা এ সব নিয়ে আলোচনা। এ ছাড়া আছে ডেডিকেণ্ডের তত্ত্ব, কয়েকটি তত্ত্বের তুলনামূলক বিচার প্রভৃতি। মনে হয় অনার্স এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ঠিক যে ভাবে বিশুদ্ধ গণিত পর্যায়ে পড়ানর সময় বাস্তব সংখ্যা এবং সহযোগী তত্ত্বগুলি তুলে ধরা হয়, বইটির লেখক প্রদীপকুমার মজুমদার সে কাজটি পুরোপুরি বাংলা ভাষায় সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন। বলা চলে এ ধরনের চেষ্টায় কিছুটা দুঃসাহসিকতা আছে। কারণ এখন বেশির ভাগ অধ্যাপকদেরই ধারণা উচ্চতর বিজ্ঞান, গণিত এ সব ইংরেজি ছাড়া বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য করে প্রকাশ করা যায় না। অবশ্য যখন এমন এবং পরিভাষার সোনার খাঁচা তৈরি করতে এখনও যেখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়, ঠিক সেই সময়ে সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় এমন একটি প্রয়াস অভিনন্দনীয়। লেখকের ভাষার সাবলীলতায় গণিতের মত দুরূহ তত্ত্ব আরও কাছের হয়ে দাঁড়িয়েছে এই গ্রন্থে। এ ধরনের উদ্যোগে বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। যৎসামান্য ত্রুটি যেটা চোখে পড়েছে সেটা হল, তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করার সময় লেখক যদি আরও কয়েকটি বেশি উদাহরণ ব্যবহার করতেন পাঠক পাঠিকাদের পক্ষে আর একটু সুবিধে হতো।

সমরজিৎ কর

মানুষ মানুষ মানুষ

বিশ্ববিজ্ঞান-এ 'মানুষ মানুষ মানুষ' প্রবন্ধে (দেশ, ২৬ শ্রাবণ ১৩৮০) মানব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনসটিটিউটের অ্যানথ্র-পমেট্রি অ্যানড হিউম্যান জেনেটিকস ইউ-নিটের কিছু কাজকর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা দেখলাম। ওই ইউনিটের একজন বৈজ্ঞানিক কর্মী হিসবে এবং পেশাগতভাবে একজন নৃবিজ্ঞানী হিসাবে এই প্রবন্ধের কিছু মন্তব্যের অপ্রাসঙ্গিকতা ও অসঙ্গতি এবং তথ্যগত ভুলভ্রান্তির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেস জারক রস বা এনজাইমের রাসায়নিক গঠন অনু-যায়ী বৈশিষ্টাযুক্ত ক্যালকাটা-২ রূপ বা ভেরিয়্যানট একটা বাঙ্গালী মুসলমান পরিবারে পাওয়া গেছে একথা তথ্যগতভাবে সঠিক হলেও অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, এখানে প্রশ্নটা হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান বা বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সংক্রান্ত নয়, মূলে প্রশ্ন ক্যাল-কাটা-২ এল ডি এইচ ভেরিয়্যানটের রাসায়-নিক বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যের সম্ভাব্য বাহ্যিক অভিব্যক্তি ও এর বংশগতির ধরণ সংক্রান্ত।

আলোচনার শুরুতেই প্রাদেশিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর অপ্রয়োজনীয় উল্লেখ সাধারণ পাঠকের কাছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালীন জার্মানীর জাতিবর্ণবৈষম্যমূলক বা রেসিস্ট মনোভাবের পরিচায়ক মনে হতে পারে, যে মনোভাবের আরও, হয়তো অনিচ্ছাকৃত, আভাষ পাওয়া যাবে যেখানে বলা হচ্ছে 'সৃষ্টির পর দুটি জাতি ক্রমেই স্পষ্টভাবে বিকশিত হতে শুরু করে। এক, একস-প্লয়েটারস। দুই, একসপ্লয়েটেড। জৈবিক এবং মানসিক ক্ষমতা প্রথম দলে বেশী ছিল। পরবর্তী দলে কম।' স্পষ্টতই, শোষক ও শোষিত গোষ্ঠীর মধ্যে জৈবিক ও মানসিক ক্ষমতায় পার্থক্য সম্বন্ধে উদ্ধৃত মন্তব্য প্রামাণ্য তথ্যভিত্তিক নয় এবং নৃবিজ্ঞানের বর্তমান চিন্তাধারার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। ২। এই ক্যালকাটা-২ ভেরিয়্যানটের আবি-ষ্কারক হিসাবে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা অনেকেই জৈবিক নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল্যবান গবেষণা কৃতিত্ব অর্জন করলেও এই আবিষ্কারের কৃতিত্বের অংশীদার নন। ৩। আমাদের সহকর্মিণীর নাম মানসী রায় নয়, মনামী রায়। ৪। মানুষের জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে ক্যালকাটা-২ বা এ জাতীয় তুলনা-মূলকভাবে বিরল জৈবিক বৈশিষ্ট্যের তাৎ-পর্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। পুরাতনধর্মী নৃবিজ্ঞানীদের কাছে অতি মূল্যবান হলেও শ্রেণীবিন্যাসের প্রচেষ্টার বৈজ্ঞানিক সার্থকতা সম্বন্ধেই বর্তমান যুগের বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানীরা সন্দেহ পোষণ করেন। ৫। পুরাতনধর্মী নৃবিজ্ঞানেও আর্য, মঙ্গোল, নিগ্রো, প্রভৃতি এক ধরনের গোষ্ঠী নয়। মঙ্গোলীয়, নিগ্রোজাতীয়, ককেশীয় ও অস্ট্রেলীয় জৈবিক শ্রেণী-বিন্যাস পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত চারটি প্রাথমিক গোষ্ঠী। আর্য জৈবিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্ধারিত গোষ্ঠী নয়। ৬। ক্রোমো-সোমের ভিত্তিতে যদি মানব নামক প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে স্থূল দৈহিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে আর্য, মঙ্গোল প্রভৃতি যে ধরনের শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে নানা রকম উপ-শ্রেণী রয়েছে' এই মন্তব্যের সপক্ষে প্রামাণ্য সত্যের একান্ত অভাব। ক্রোমো-সোমের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস করা আদৌ সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধেই সন্দেহের অবকাশ আছে, সুতরাং প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রোমোসোম ভিত্তিক উপ-শ্রেণীবিন্যাসের প্রশ্নই ওঠে না। ৭। মানুষের রক্ত এ বি ও সিস্টেম অনুযায়ী তিন নয় চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা, এ, বি, এবি, ও। অন্যান্য বহু সিস্টেমও আছে। ৮। 'হিমোগ্লোবিনের উপর নির্ভর করে মানব নামক প্রাণীরও শ্রেণী বিভাগ করা সম্ভব' বা যুক্তিযুক্ত কিনা সে সম্বন্ধে দ্বিমত হতে পারে। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হিমোগ্লোবিনের একটা ভেরিয়্যান্টের প্রাদুর্ভাবের পার্থক্য যে মনের ক্রমবিবর্তনের চর্চায় একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের সন্ধান দেয় একথা উল্লেখ করা প্রয়ো-জন। ৯। 'এক ধরনের এনজাইম অ্যামে-রিকার কিছু লোকের মধ্যে দেখা গেল। অতএব যেহেতু এনজাইমের সঙ্গে বংশধারার সম্পর্ক নিকটের, নিশ্চয় বলা চলে অ্যাম্যা-রিকার এবং ভারতের ওই সব লোকদের মধ্যে বংশগতির কোন সম্পর্ক রয়েছে। নিশ্চয় তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন না কোন সময়ে জৈবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।' এ

ছোটদের উপন্যাস

'সানসা' শব্দ শুনলেই দক্ষিণ আমেরিকার সারা অরণ্য অঞ্চল শুধু নয়, সুসভ্য মানুষের জগতেই ভয়ঙ্কর আতঙ্ক জেগে ওঠে। 'সানসা' এক রহস্যময় মমি-মুণ্ডু। আদিম হিংস্র জীভারো গোষ্ঠী এই মমিমুণ্ডু বানায়। আজ পর্যন্ত খুব কম লোকেই আমাজন নদের সেই গহন অরণ্যবাসী জীভারোদের সংস্পর্শে গিয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছেন। বাঙালী অভিযাত্রী হিরণবাবু ও তাঁর ভাগ্নে দুরন্ত ছেলে শ্রীমান টিটো জীভারোদের গুপ্তধনের সন্ধানে গিয়ে ভয়ঙ্কর গুহাদানব চুন্ডোর পাল্লায় পড়েছিল। এ কাহিনী নিছক অ্যাডভেঞ্চার নয়। বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রহস্যে রোমাঞ্চে ভরা ছোট-বড়ো সকলেরই পাঠ্য এক আশ্চর্য বই। দাম ৪

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

আমাজনের অরণ্যে

লেখকের প্রথম বই

কলকাতার কেঁদো ৪

শৈব্যা পুস্তকালয়, কলি-১২

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

বঙ্গসাহিত্যে রূপদর্শীর এক মোক্ষম অবদান গপ্পো। (গপ্পো=গুল+গল্প)। এ-হেন সরস এবং উপাদেয় বস্তু বঙ্গ-সাহিত্য পাঠকেরা যে আর কখনও চাখবার সুযোগ পাননি—এ কথা হলফ করে বলা যায়। এ-যাবৎ রচিত ব্রজদার সমুদয় গপ্পো-সম্ভারের সংগ্রহ ॥

রূপদর্শীর

ব্রজদার গপ্পো-সমগ্র

দাম ৬·০০

গৌরকিশোর ঘোষের বই :

পশ্চিমবঙ্গের ব্রিজের উপর থেকে, দুজনে ৪·০০ আমরা যেখানে ৫·০০ বাগিনা মারাতো ৪·০০ লোকটা ৩·০০ নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি ৫·০০ ॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

ধরনের মন্তব্য অযৌক্তিক। কোন একটা এনজাইম বা অন্য যে কোন একটা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জৈবিক সম্পর্ক সংক্রান্ত এ ধরনের সিদ্ধান্ত বর্তমান যুগের নৃবিজ্ঞানের চিন্তাধারার পরিপন্থী। জৈবিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে নিশ্চিত আছে এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। কিন্তু এ সম্পর্ক সাধারণভাবে মানব সমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সমস্যার বিশ্বজনীনতার ভিত্তিতে সৃষ্ট। এই সূত্রে এনজাইমগত সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের প্রশ্ন আমি অবান্তর মনে করি। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের শেষ বক্তব্যের প্রতিও আপত্তি জানাচ্ছি, যেখানে বলা হয়েছে 'মানব কল্যাণে যদি কাজ করতে হয় মানুষের শ্রেণীবিভাগ তার প্রজননগত কাঠামো যেমন রক্ত, এনজাইম প্রভৃতির উপর নির্ভর করেই করতে হবে।' মানব কল্যাণে জাতিগত শ্রেণীবিভাগের আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এ প্রশ্ন সংগত কারণেই উঠতে পারে। ১০। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রচ্ছন্নভাবে নৃবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হিসাবে জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। এবং অত্যন্ত দুঃখজনকভাবেই বর্তমান যুগের নৃবিজ্ঞানের যা অন্যতম লক্ষ, অর্থাৎ, জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য বা পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধানের বিশ্লেষণধর্মী প্রচেষ্টা এবং জনপ্রজননবিজ্ঞান বা পপুলেশন জেনেটিকসের দৃষ্টিকোণ থেকে মানব ক্রমবিবর্তনের চর্চা, তার উল্লেখও করা হয় নি।

পরিশেষে, সমরজিৎবাবুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি নৃবিজ্ঞানের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

অমিতাভ বসু
কলিকাতা-৩৫

পূজা সংখ্যা

সিনেমা জগৎ

॥ উপন্যাস ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র · জরাসন্ধ
নীহাররঞ্জন গুপ্ত · বারীন্দ্রনাথ দাশ
বরেন গঙ্গোপাধ্যায় · নিমাই ভট্টাচার্য
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী · ধনঞ্জয় বৈরাগী

॥ বড়গল্প ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
কণিষ্ক

॥ হাসির গল্প ॥

কুমারেশ ঘোষ

॥ গল্প ॥

বনফুল · সমরেশ বসু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় · গজেন্দ্রকুমার মিত্র
শক্তিপদ রাজগুরু · মায়া বসু
মহাশ্বেতা দেবী · আশাপূর্ণা দেবী

॥ বিশেষ রচনা, সিনেমার ফিচার ও নিয়মিত বিভাগ ॥

লিখছেন ঃ

বিমল মিত্র ● শ্রীপান্থ ● শংকর ● সুনীল চৌধুরী
সুভাষ সমাজদার ● চিত্রগুপ্ত ● উৎপল রায়
পার্থসারথি ● বিমান দত্ত ● গুরুদাস ভট্টাচার্য
শ্যামল বসু ● সন্ধ্যা সেন ● কুশল চৌধুরী ● দুর্বাসা
রামকৃষ্ণ রায় ● তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ● দোভাষী
ও সিনেমা শিল্পী-কলাকুশলী

দাম ৬·৫০ সডাক ৭·৭৫

দি ম্যাগাজিনস্ প্রাঃ লিঃ
১২৪বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

(সি ৭৭৬৫/১)

মীর মশাররফ হোসেন

আমার প্রবন্ধটির শেষভাগে নিম্নোক্ত পদটি, "এমন মধুর খাঁটি বাংলা গদ্য পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে অদ্বিতীয় সৈয়দ মুজতবা আলী ছাড়া আর কোন মুসলমান লেখক লিখতে পেরেছেন?" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত আলম আপত্তি জানিয়েছেন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, শ্রীযুক্ত আলম আরও যে সমস্ত মুসলমান লেখকদের নাম করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের লেখা ইতিপূর্বে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেছি। তাঁরা প্রত্যেকেই শক্তিমান লেখক ও খাঁটি বাংলা গদ্য লিখেছেন একথা অবশ্য স্বীকার করি। (অবশ্য শ্রীযুক্ত আলম কেন কাজী নজরুলকে এই প্রসঙ্গে টেনে আনলেন বুঝলাম না। কাজী নজরুল অসামান্য কবি ও সুরস্রষ্টা বটে, তাঁর বাংলা গদ্য কি [illegible] উল্লেখযোগ্য?) দুর্ভাগ্যবশত [illegible] উত্তেজনায় শ্রীযুক্ত আলম আমার লেখা পুরো পদটি লক্ষ্য করেন নি। আমি তো কেবল "খাঁটি বাংলা গদ্য" কথাটির ব্যবহার করিনি, লিখেছি "এমন মধুর খাঁটি বাংলা গদ্য।"

কেবল "খাঁটি বাংলা গদ্য" কথাটা ব্যবহার করলে আমার অপরাধ হতো। মীর মশাররফ হোসেন ও সৈয়দ মুজতবা আলী ছাড়াও আরও অনেক মুসলমান লেখক যে খাঁটি বাংলা গদ্য লিখেছেন বা লিখছেন, সেকথা কে অস্বীকার করে? আমি কিন্তু "এমন মধুর" কথাটায় জোর দিয়েছি।

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত
কলিকাতা-৭

বনস্পতির বৈঠক

'দেশ'-এর গত ২৬শে শ্রাবণ তারিখের সংখ্যায় প্রবোধবাবু লিখছেন ঃ—

"১৯৩২ এর বসন্তকাল। ডালহৌসি

নতুন নাটক

এখন বাজার মাৎ করেছে

রাজদূতে রচিত

স্ত্রী-বর্জিত নাটক

বাবার বিয়ে ২৲

(দম ফাটানো হাসির নাটক)

ওস্তাদ ২৲

জবাব ২৲

॥ পাবলিশার্স ওনলি ॥

২৭/এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫

(সি ৭৬৪১)

শারদ চৌরঙ্গী সংখ্যা

উপন্যাস নয় কিন্তু উপন্যাসের মতই বড় গল্প লিখছেন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশ্বেতা দেবী

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু

(সি ৭৭৬৪/২)

ঢেকায়ার বোমার মামলার আসামী দীনেশ মজুমদার ও চট্টগ্রামের কল্পনা দত্ত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। শ্রীমতী কল্যাণীর ছোট বোন বীণা সেনেট হাউসে গভর্নর জ্যাকসনকে মারতে গিয়ে হাত ফসকেছে। হাসান সুরাবার্দি ওকে ধরে ফেলেন। ঢাকার কর্তা লোম্যানকে হত্যা করে বিনয় বোস এখন পলাতক।"

দীনেশ মজুমদার ও কল্পনা দত্ত ১৯৩২ সালের বসন্তকালে পলাতক ছিলেন এটা সত্য কথা।

কিন্তু বিপ্লবী বিনয় বসু ১৯৩২-এর বসন্তকালে পলাতক থাকবেন কি করে? ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট লোম্যান হত্যার পর বিনয় পলাতক হন, এটা সত্য কথা। কিন্তু ওই ১৯৩০ সালেরই ৮ই ডিসেম্বর তারিখে ওই বীর বিপ্লবী তাঁর সহযোগী দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্তসহ রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেন এবং সেখানে কারাসমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনকে নিহত করেন। ওই সময়ে মিঃ নেলসন এবং মিঃ টাইসন নামক দুইজন উচ্চপদস্থ আই সি এস অফিসারও আক্রমণকারী বিপ্লবীদের গুলীতে আহত হন। পুলিসের সাথে যুদ্ধে বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত গুরুতররূপে আহত হন। তাঁদের গ্রেপ্তার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাদল পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৯৩০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে বীর বিপ্লবী বিনয় বসুর জীবনান্ত ঘটে। দীনেশ গুপ্তের জীবন রক্ষা পায় এবং পরে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

সুতরাং যে বিনয় বসু ১৯৩০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর অমরলোকে মহাপ্রয়াণ করেন তাঁর পক্ষে ১৯৩২-এর বসন্তকালে পলাতক থাকা সম্ভব নয়।

আর একটি কথা। লোম্যান সাহেব ওই সময়ে "ঢাকার কর্তা" ছিলেন না যদিও ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালেই তিনি বিনয় বসুর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর সাথে ঢাকা জেলার পুলিশের বড় কর্তা হডসন্ সাহেবও গুলিবিদ্ধ হন। কিন্তু তাঁর জীবন রক্ষা পায়।

প্রবোধবাবুকে পুনরায় অনুরোধ করি রাজনৈতিক ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাগুলি লেখার মধ্যে উল্লেখ করতে ইচ্ছা হলে তিনি যেন সঠিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন।

তারাপদ লাহিড়ী
কলিকাতা-৪৭

॥ ২ ॥

"......রাজনৈতিক ইতিহাস জাতীয় সম্পত্তি। সে সম্পর্কে খেয়ালখুশি মাফিক বিকৃত বা ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশনের অধিকার কারও নেই।" —২৬শে শ্রাবণ সংখ্যার 'দেশে'

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত

বাংলা অনুবাদে প্রথম

রচনাবলী

শেকস্‌পীয়ার

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ

মপাসাঁ

তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ

বিশ্ববিশ্রুত অমর কথাশিল্পী গী দ্য মপাসাঁর সমস্ত উপন্যাস ও ছোট গল্পের যথাযথ বঙ্গানুবাদ। প্রতি খণ্ড গ্রাহকদের জন্য দশ টাকা। পাঁচ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে প্রতি রচনাবলীর জন্য। ডঃ সুখেন্দুবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ প্রীতি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। সুখেন্দুরঞ্জন ঘোষ অনূদিত।

কুমারেশ ঘোষের ভ্রমণ কাহিনী
দমদম থেকে দামাস্কাস ৫৲

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ-এর
যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর ৫৲

সুনীল চক্রবর্তীর উপন্যাস
আমি মন্ত্রী হব ৮৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস
রিপু সংহার ৬৲

কৌটিল্য গুপ্তের উপন্যাস
ফুল ও স্ফুলিঙ্গ ৭৲
চৌরঙ্গী কনট সার্কাস ৬৲

শান্তিপদ রাজগুরুর ভ্রমণ কাহিনী
নীল সমুদ্র সবুজ দেশ ৮৲

প্রবোধ সরকারের উপন্যাস
রূপ-পসারিণী ১২৲

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ
রক্তের মূল্যে মুক্তি ৮৲

অজাতশত্রুর উপন্যাস
কামনার রঙ ৮৲

অশোক মুখোপাধ্যায়
ফ্যাসীবাদ দেশে দেশে ৬৲

কণিষ্ক
জঙ্গল জ্বলছে ৮৲

তুলি-কলম : ফোন ৩৪-৮১৮০
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

(সি ৭৭১০)

রত্নোজ্জ্বল ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা রচনাবলী

ত্রৈলোক্য রচনাসমগ্র [দুই খণ্ডে]

গ্রাহক মূল্য ১৮ টাকা; গ্রাহকভুক্তি ৬ টাকা
প্রথম খণ্ড ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে পাওয়া যাবে

রবীন্দ্র যুগের বিশিষ্ট লেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরাণীর

শরৎকুমারী রচনাসমগ্র [এক খণ্ডে]

গ্রাহক মূল্য ৮ টাকা; গ্রাহকভুক্তি ৩ টাকা
মাইকেলের সহপাঠী রাজনারায়ণ বসুর রচনাবলী

রাজনারায়ণ রচনাসংগ্রহ [এক খণ্ডে]

গ্রাহক মূল্য ১০ টাকা; গ্রাহকভুক্তি ৪ টাকা
সম্পাদনা : ডঃ নির্মল দাশ, শ্যামল সেনগুপ্ত, দিব্যজ্যোতি মজুমদার

প্রতিটি রচনাবলী সুসম্পাদিত, রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ
গ্রন্থমেলা/এ-১২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

(সি ৭৭০১)

রামায়ণী প্রকাশ ভবন

[১০৬/১ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

একটি বিস্ময়কর অসাধারণ উপন্যাস

শেষ প্রহরে শান্তি

শিশির লাহিড়ী

(সি ৭৭৫৪)

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের লেখা 'বনস্পতির বৈঠক'-এর প্রতিবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন শ্রীতারাপদ লাহিড়ী। কথাটা যুক্তিযুক্ত এবং সত্য। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্বাধীনতা দিবসের কথা প্রসঙ্গে তারাপদবাবুও ভুল করে বসেছেন। ১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারী প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়, তারাপদবাবুর এ-কথা ঠিক। কিন্তু ১৯৩০-এ সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা দিবস পালন করতে গিয়ে পুলিসের নৃশংস আক্রমণের সম্মুখীন হন এবং কারারুদ্ধ হন, এ তথ্য ঠিক নয়। ১৯৩০-এ সুভাষচন্দ্র বন্দী হন বন্দী-মুক্তি আন্দোলন পরিচালনার জন্য। এবং রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর দণ্ড হয়। তাঁর সঙ্গী ছিলেন ডাঃ জে এস দাশগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সত্য গুপ্ত, ধীরেন মুখার্জি প্রভৃতি। ওঁদের কারাদণ্ডের তারিখটা ছিল ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩০। মুক্তি পান ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।

বিভিন্ন তারিখে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থান করে নিয়েছিলেন আরও কয়েকজন : যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, লিবার্টি পত্রিকার সম্পাদক সত্যরঞ্জন বক্সী এবং অধ্যাপক নৃপেন বাঁড়ুজ্যে। সবাই রাজদ্রোহী। ১২৪ক ধারার আসামী। জেলের সুপার ছিলেন মেজর সোমদত্ত। এঁরই প্রতাপে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রকে অজ্ঞান অবস্থায় থাকতে হয়েছিল কয়েক ঘণ্টা। তারাপদবাবু লবণ সত্যাগ্রহে বন্দী হয়ে আলিপুর জেলে এসে এঁদের দেখেছিলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমিও ওই সময় আলিপুর জেলেই ছিলাম। এবং ১৯৩১-এর স্বাধীনতা দিবসের সামিল হবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল। পুলিসের উদ্যত লাঠির আঘাত থেকে সুভাষচন্দ্রকে বাঁচাতে যেয়ে লাঠি পড়েছিল আমার মাথায়। আমাকে হাসপাতালে আমাদের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স-এ নিয়ে গিয়েছিলেন অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী। সুভাষচন্দ্র ছাড়া ওই দিন আর কাউকে পুলিস বন্দী করেনি।

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী
কলিকাতা-৩৯

॥ ৩ ॥

দেশ পত্রিকায় (১৬-৮-৭৩) চিত্তরঞ্জন দাশ (সম্পাদক, সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটি) মহাশয়ের বিবৃতির প্রতিবাদে আমি তাঁহাকে জানাইতেছি যে, Public Prosecutor নগেন ব্যানার্জি মহাশয় Chittagong armoury raid case-এর Tribunal-এর নিকট উপস্থাপিত নির্মল সেনের ডাইরীটির বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রবোধবাবুর বিবরণী ঠিক অসত্য নয়।

বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
কলিকাতা-২৬

নতুন ঘড়ির প্রচুর স্টক।
আর সবরকমের ঘড়ি
মেরামতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
টাইম কর্নার
১০৬/১, এস. এন. ব্যানার্জি রোড,
কলিকাতা-১৪ : ফোন ২৪-৩৮৮৫
চক্ষু পরীক্ষাসহ চশমা বিভাগ আছে

বিহারের বাংলা

দেশ এর ৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসুবিমল বসাক এর 'বিহারের বাংলা' শীর্ষক লেখাতে একটি ভুল সংশোধন করে দেওয়াটা, একজন বিহারের বাঙালী হিসেবে উচিত মনে করছি। শ্রী বসাক মগহী এবং মৈথিলী বাক্যগুলি ঠিকই প্রয়োগ করেছেন কিন্তু ভোজপুরী বাক্য 'রোয়া তোরে কা নাম পড়ু?' সম্পূর্ণ ভুল। কারণ 'রোয়া'=আপনি; 'পড়ু'=হও (তুমি) আর 'তোরে' শব্দ ভোজপুরীতে নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে বাক্য-গঠন হওয়া সম্ভব নয়। আসলে বাক্যটা হওয়া উচিত 'রাউর কা নাম বাটে?'। যাই হোক সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে এ রকম লেখা উচিত নয়।

দ্বিতীয় কথা বাংলা ভাষার সহিত বিহারের উত্তরাঞ্চলের মগহী, মৈথিলী ভোজপুরী এবং হিন্দী ভাষার সমন্বয় নিয়ে দুজন পাঠক লিখেছেন কিন্তু বিহারের দক্ষিণাঞ্চলে হিন্দীর সহিত বাংলার অথবা ওড়িয়ার সহিত বাংলার সমন্বয়ে যে নূতন ধরনের বাংলার সৃষ্টি হয়েছে তার কথা এঁরা কেউই উল্লেখ করেন নি। বিহারে রাঁচী জেলার তামাড়, বুণ্ডু এবং সিলি অঞ্চল জুড়ে হিন্দী এবং বাংলার সংমিশ্রণে এক শংকর ভাষার সৃষ্টি হয়েছে যাকে 'পাঁচ পরগনিয়া' ভাষা বলা হয়। এর উৎপত্তি বা ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমার বিশেষ জানা নেই। তেমনি সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমার পূর্বাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ জুড়ে ওড়িয়া এবং বাংলার সমন্বয়ে আর একটি শংকর ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এগুলিকে সঠিক ভাষা না বলে উপভাষা বলা যেতে পারে কারণ এতে কোন হরফ (স্ক্রিপ্ট) নেই। এই ভাষা-ভাষীরা বাংলাতেই লেখাপড়া করেন এবং মূলত এঁরা বাঙালী। লেখকও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অসিতবরণ পাল
জামশেদপুর-৬

চলচ্চিত্রে কবিতা

১৬ই জুন প্রকাশিত আমার নিরীক্ষা-ধর্মী প্রবন্ধ 'চলচ্চিত্রে কবিতা : কয়েকটি প্রস্তাব'-এর স্বপক্ষে এবং ২১শে জুলাই প্রকাশিত শ্রীভাস্কর মিত্রের এই সম্পর্কিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমি দ্বিতীয় পর্যায়ের কিছু বক্তব্য এখানে পেশ করছি। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমার প্রবন্ধের একটা বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যেই ছিল কিছু উক্ত বিতর্কের অব-তারণা করা।

ভাস্করবাবুর চিঠির উত্তরে বলি, উনি বেতারে আলোচনায় ঠিক বলিয়েছেন—

বিনা ওষুধে
মনের গভীর রূপ ও দেহ। অতি সরল বই। এতে আছে—মোটা হবেন, কালো রং ফর্সা, চুল ওঠা, কফ ইত্যাদি অনেক বিষয়। কোন ধোঁকাবাজি নয়।
প্রাপ্তিস্থান : এইচ কে মজুমদার, নতুনপাড়া, পোঃ বারুইপুর, জেলা ২৪ পরগণা।
বিঃ দ্রঃ—এজেন্টরা যোগাযোগ করুন।

(সি/এম ১০১৬)

খেলার মত খেলা
৫.০০
সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, অ্যাথলেটিকস প্রভৃতি কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতার বিবরণ। দুর্দান্তভাবে পড়তে হবে।
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা—১২

(সি ৭৭২৯)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভৌতিক গল্প ১০.০০
মরণের ডঙ্কা বাজে ৩.৫০
জিম করবেটের
রুদ্রপ্রয়াগের চিতা ৫.০০
জাঙ্গল লোর ৫.০০
সম্পূর্ণ তালিকার জন্যে লিখুন।
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা—১২

(সি ৭৭৬৮)

সেরা 'টেরিন' স্যুটিং-এর নিশানা এস. কুমারের নাম!

নতুন যুগের তালে তাল রেখে উৎকৃষ্ট বুনটের আকর্ষণীয় মনলোভা কাপড় তৈরী হয় ক্যাফি, মাদুরা আর লক্ষ্মী বিষ্ণুর মত স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে! আর এই সব সুন্দর 'টেরিন' স্যুটিং, শার্টিং আর শাড়ী আপনাদের জন্যে এনেছেন এস. কুমার! সারা দেশে আমাদের ধুরন্ধর সহযোগী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক আর সুব্যবস্থিত গবেষণার ব্যবস্থা থাকার ফলে আমরা জানি আপনাদের পছন্দ ঠিক কি—কারণ, আপনাদের পছন্দই আমাদের পছন্দ! জীবন রঙীন করে তুলুন···পরুন আপনার পছন্দমত কাপড়···উপভোগ করুন এক অপূর্ব অনুভূতি···আর এই অনুভূতিরই অন্য নাম—এস. কুমার!

'টেরিন' স্যুটিং, শার্টিং ও শাড়ীর ক্ষেত্রে
এক নির্ভরযোগ্য নাম!

এস. কুমার, নিরঞ্জন, ৯৯, মেরীন ড্রাইভ, বম্বে ৪০০ ০০২

GISTA'S-SK-3027-BEN

'সিনেমা সিনেমাই হোক অথবা কবিতা কবিতা'—এ-জাতীয় শ্লোগানধর্মী অনায়াস সিদ্ধান্ত গড়ার প্রবণতা আমার প্রবন্ধে ছিল না, ছিল কিছু বিতর্কগামী প্রস্তাবের খসড়া। একটা কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য হবে যে, কবিতা তার কোনো-একটা ঐশ্বর্য (প্রতিমা, বিষয়, আঙ্গিক) নিয়ে মুভীতে এলে তার মেজাজ যাবে বদলে, কিন্তু মেজাজের ওই হেরফের ঘটানোতেই তো যে-কোনো শিল্পের সিদ্ধি। চিত্র-হিসেবে 'পথের পাঁচালী' অ-সাধারণ; ওই নামের বিভূতিভূষণের উপন্যাসও অনন্য; কিন্তু সত্যজিতের কৃতিত্ব যে মেজাজবদল ঘটানোয় তার মধ্যে 'নিরুক্তিকরণই' কি ঠিক পুরোপুরি তার সবটুকু মেজাজ, কাম্যময়তা ও পরিবেশ নিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছে?—হয়তো কম, হয়তো বেশী। এই অনুবাদকর্মের মধ্যে আবিকল নিখুঁত যথার্থতা দাবী করা যায় না, যেহেতু অনুপুঙ্খ অনুকৃতি শিল্পের মর্যাদাহানি ঘটায়, যেহেতু শিল্প থেকে শিল্পান্তরে উত্তরণের পথ ধরেই নতুন শিল্পসম্ভাবনায় হেঁটে যাওয়া। দ্বিতীয়ত, দুর্ভাগ্যবশত, আমার 'পছন্দমতো' কিছু লাইন উদ্ধৃত করে নিবারণ গড়ায় নাজিরকে যে আক্রমণ করেছেন সে-আক্রমণের শিকার হওয়া থেকে নিজেকে কিন্তু বাঁচাতে পারেননি। তাঁকেও কিছু পছন্দসই অতি-মাত্রায় ব্যঞ্জনাধর্মী পঙ্‌ক্তি উদ্ধারে সিদ্ধান্তে নামতে হয়েছে যে, পর্দার বুকে এদের অনুবাদ সম্ভব নয়। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক পছন্দ-অপছন্দের নয়, বরং নির্বাচনের। এবং আমার মনে হয়, যে-কোনো শিল্প-প্রসঙ্গেই নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী। যে-কারণে সব উপন্যাস বা ছোটগল্পই চলচ্চিত্রে গ্রহণ-যোগ্য হতে পারে না, কিছু কিছু হয়। কবিতাকেও সে নির্বাচন জরুরী। তৃতীয়ত, চলচ্চিত্র যেহেতু চলমান চিত্র, সেখানে কবিতার বিশেষ চরণগুলোর সন্ধান আমাকে করতেই হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করবার মত ঘটনা হল এই যে, প্রস্তাবগুলো বিতর্কের স্তরে পৌঁছুক বা না পৌঁছুক, কবিতার পঙ্‌ক্তি-ব্যঞ্জনাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ছবি তৈরী হয়েছে। 'এক কন্যা রাঁধে বাড়ে, এক কন্যা খায়/আরেক কন্যা রাগ করে বাপের বাড়ী যায়'—এমন একটি চলতি আটপৌরে গ্রাম্য ছড়াকে বিচ্ছিন্ন গল্পত্রয়ীর সূত্র হিসেবে বেঁধে 'তিনকন্যা'র পরিকল্পনা করা হয়েছিল; 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র pros quarter sequence-এ অব্যর্থ কায়দায় নেগেটিভ শট বুনে ধরে রাখা হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরই বিখ্যাত কবিতার কটি লাইন: "...খাঁটি/কলকাতার স্নানাগারের ঘরে মাথা ডুব দিয়ে দেখেছি দেশলাই জ্বেলে—/(ও গাঁয়ে আমার কোনো ঘরবাড়ি নেই।)"; 'কলকাতা-৭১'-এ হাওড়া ব্রিজের লং শট দিয়ে শুরু করার পর কলকাতার স্কাইলাইনের slow track শট intercut করে যেখানে সাংগীতিক মুহূর্ত রচনা করছেন মৃণালবাবু, সেই conceptual দৃশ্যটি—'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'—লাইনের স্মারক; কিংবা কথিত পাষাণের প্রেরণা প্রচ্ছন্ন ছিল ধরা থাক্ মহার্ঘ্যবির সেই নাটকীয় উচ্চারণকেই ঘিরে—'There are more things in heaven and earth . . .than are dreampt of in your philosophy.' হয় ছবি-দৃশ্যের বাক্য গড়ার কাজে কবিতা এইভাবে এখানে-সেখানে ব্যবহৃত হয়। আবার কবিতার শরীরে খাস চলচ্চিত্রগত ভাবনার দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। 'চোরাবালি'র বিষ্ণু দে লেখেন—'দেখলুম তোমার ক্লোস্-আপ মুখ জানলায়/—একটা ক্লিক—/শুনলুম যেন জোয়ানেরকার ভৈরবী'; কাব্য-গুণসম্পন্ন স্বীয় পত্র-পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী তার একটি কবিতায় নিটোল সিনেমাটিক ইমেজ গড়ছেন এইভাবে: 'লাইটস বার্নিং।/মাধবী, মেক-আপ, আলো/এবার টেকিং।/মাধবী, নিশ্চয়ই মনে আছে সংক্ষিপ্ত সংলাপটুকু/'কিছু লাভ আছে মনে রেখে?'" কিংবা হয়তো Gold Rush-এর চ্যাপলিনী কায়দায় স্মার্টলিভাবে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উপহার দিচ্ছেন একটা ছোট ছবি: '......নিয়ন-মণ্ডলে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন।/আমাদের দেখেই তিনি ভীষণভাবে ডানা ঝাপটাতে লাগলেন; এবং/তৎক্ষণাৎ সেই মুরগীর উপমা আমাদের মাথায় এল,/যে কিনা এক্ষুনি একটা ডিম পাড়তে ইচ্ছুক।/কিন্তু ডিম না-পেড়েই তিনি বললেন,/"আগে কি তোমরা একটা ওমলেট খেতে চাও?"—ইত্যাদি।

নিরীক্ষা-পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নয়, প্রস্তাব অভ্যর্থিত হয় সব সময়েই। এবং সেই প্রস্তাব দিয়েই শেষ করি: কবিতা যেখানে বিতর্কের আগেই অগোচরে মুহূর্তবিশেষে উপস্থিত হয়েছে সেলুলয়েডের বুকে, সেখানে আশা করাই যাক্ না আগামী কোনো দিনে চ্যাপলিনের নির্বাক ছবির Caption-এর মত কিংবা অ-রাবীন্দ্রিক ছবিতে রবীন্দ্র-সংগীতের নিখুঁত প্রয়োগের মত কবিতাকেও তার সকল মহিমা-ঐশ্বর্য সমেত হাজির করানো হবে।

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-৬

মিত্র ঘোষের সগর্ব ঘোষণা!

যাযাবর-এর

হ্রস্ব ও দীর্ঘ

মাত্র এক সপ্তাহে
প্রথম মুদ্রণ
নিঃশেষিত
দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল
।। পাঁচ টাকা ।।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলি—১২

এক্স্-রে জ্যোতির্বিজ্ঞান

সূর্যেন্দুবিকাশ কর

জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় একস্‌রে বা রঞ্জন রশ্মির অস্তিত্ব একটি আধুনিকতম আবিষ্কার। একসরের সঙ্গে আমাদের অল্প বিস্তর পরিচয় আছে। আলো ও অতিবেগুনী রশ্মির চেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ দৈর্ঘের এই বিকিরণের পার্থিব উৎস হল ভারী পরমাণু। উচ্চগতি-বেগ সম্পন্ন কণিকার আঘাতে এইসব পরমাণু উত্তেজিত হলে একসরে বিকিরণ করে। আমরা এই পদ্ধতিতেই একসরে যন্ত্র তৈরী করে ব্যবহার করি। মহাকাশ বিজ্ঞানের কল্যাণে জানা গেছে যে, মহাকাশ থেকে এই বিকিরণ স্বাভাবিক ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভূপৃষ্ঠের গবেষণা-গারে নক্ষত্র জগতের আলো ও কিছু বেতার তরঙ্গ নিয়ে এতদিন আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করেছি—কারণ পৃথিবীর আবহমণ্ডল ভেদ করে এরাই পৃথিবীতে পৌঁছুতে পারে। একসরে শক্তিশালী বিকিরণ হলেও আবহমণ্ডলে তা শোষিত হয়ে যায়। তাই নক্ষত্র জগত যে একসরের একটি স্বাভাবিক উৎস হতে পারে, গবেষণাগারে তা ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

১৯৬২ খৃঃ জুন মাসে একটি এরোবী রকেট মহাকাশে একসরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম মূল্যবান তথ্য নিয়ে আসে। তারপর আরও অনেকগুলি রকেট বিভিন্ন সময়ে মহাকাশে পাঠিয়ে বিশদভাবে গবেষণা চালানো হয়েছে। ১৯৭০ খৃঃ ডিসেম্বরে কেনিয়া থেকে ভারত মহাসাগরের উপকূলে নাসা (NASA) একটি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে তুলে দিয়েছে—যার কাজ হল শুধু একসরে অনুসন্ধান করা। কেনিয়বাসীদের আতিথেয়তার স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের 'সোয়া-হিলি' ভাষায় এই উপগ্রহটির নামকরণ হয়েছে 'উহুরু' (UHURU) বা স্বাধীনতা।

এই উপগ্রহটি এখনও তার কাজ করে চলেছে। এতে আলাদা আলাদা দুটি গণক যন্ত্র আছে—সূর্যের একসরে একটিতে ও অন্যটিতে নক্ষত্র জগতের একসরে ধরা পড়ে। যান্ত্রিক এই উপগ্রহটি একসরে সম্পর্কীয় সব খবর পৃথিবীর গবেষণাগারে

১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ৭ মার্চ গ্রহণের পর রকেট থেকে নেওয়া সূর্যের একস্-রে চিত্র। এতে সূর্যের উজ্জ্বল সম্পূর্ণ চাকতিটি অনুপস্থিত। অধিকতর উত্তপ্ত যে অংশটি একস্‌রের উৎস, ছবিতে সেই অংশটুকু দেখা যাচ্ছে। কী ধরনের সৌর চুম্বক ক্ষেত্র এই উত্তপ্ত প্লাজমাকে ধরে রেখেছে, এই ছবি থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

সিগন্যাস্ একস্ ১ থেকে একস-রে বিকিরণের কল্পিত রূপ। এই দ্বৈত নক্ষত্রের ১ চিহ্নিত বিন্দুটি মৃত নক্ষত্র কালো ছিদ্র ও ৩ চিহ্নিত বস্তুটি একটি সাধারণ নক্ষত্র। সাধারণ নক্ষত্র থেকে 'কালো ছিদ্র' তার প্রচণ্ড মহাকর্ষশক্তির জোরে যে বস্তুপুঞ্জ চক্রাকারে নিজের দিকে টেনে আনে, সেই চক্রাকার কুণ্ডলীগুলিই (২) হল একস্‌রের উৎস

পাঠিয়ে চলেছে।

এইসব মহাকাশ গবেষণায় জানা গেছে যে শুধু সূর্যই নয়, প্রায় একশোর বেশী নক্ষত্র থেকে একস্‌রে বিকীর্ণ হয়। বরং সূর্যের একস্‌রে বিকিরণ কমই বলতে হবে। সূর্য সব রকম বিকিরণ মিলিয়ে মোট যে শক্তি বাইরে ছড়িয়ে দেয়, একস্‌রে তার দশ লক্ষ ভাগেরও কম। সূর্যের বাইরের ক্রোমোস্ফিয়ার করোনা অঞ্চল থেকেই এই সব একস্‌রে বিকীর্ণ হয়। ১৯৭০ খৃঃ ৭ই মার্চ সূর্য গ্রহণের ঠিক পরে একটি রকেট সূর্যের যে একস্‌রে ছবি নিয়ে আসে, তাতে সূর্যের প্লাজমা ও চুম্বক ক্ষেত্রের স্বরূপ সম্পর্কে অনেক স্পষ্টতর ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

আমাদের ছায়াপথটিকে মহাকাশের মানচিত্রের বিষুবরেখার সমতলে রেখে গোটা মহাকাশকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ ভাগ করে কোথায় কোন্ নক্ষত্র রয়েছে দেখা যেতে পারে। আমাদের ছায়াপথে ৩০° দ্রাঘিমাংশের মধ্যে দেখা যায় অধিকাংশ একস্‌রে নক্ষত্রগুচ্ছ ভীড় করে আছে। অন্যগুলি ৯০° দ্রাঘিমাংশে সিগন্যাস ও ৩০০° দ্রাঘিমাংশে সেণ্টাউরি নক্ষত্রমণ্ডলে দেখা যায়। আমাদের ছায়াপথ ছাড়া বাইরের ছায়াপথের কিছু একস্‌রে নক্ষত্রও মহাকাশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা গেছে।

এইসব একস্‌রে নক্ষত্রের বিকিরণ থেকে নক্ষত্র জগত সম্পর্কে এমন সব তথ্য জানা গেছে যা আলো বা বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান দিয়ে সম্ভব হত না।

আমাদের ছায়াপথে বেশ কয়েকটি অতিনব-তারা বা সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। কোনো নক্ষত্র সূর্যের মত সাধারণ অবস্থার নক্ষত্র থেকে ক্রমশ শক্তি বিকিরণের ফলে যখন বার্ধক্যে পৌঁছায়, তখন তার কেন্দ্রের নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনগুলি আর পরমাণু অবস্থায় থাকে না—এগুলি মৃত নক্ষত্র শ্বেতবামন। এই অবস্থায় আসার আগেই কোনো কোনো নক্ষত্র ভারসাম্য হারিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড শক্তিতে বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা থেকে নবতারা বা নোভা এবং অতিনব-তারা বা সুপারনোভা নামে অভিহিত হয়।

আমাদের ছায়াপথে ক্র্যাব নীহারিকা এ রকম একটি অতিনব-তারার ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন। আলো ও বেতার তরঙ্গের সাথে এই উজ্জ্বল নীহারিকা একস্‌রেও বিকিরণ করে। এর কেন্দ্রে রয়েছে একটি নিউট্রন নক্ষত্র—যাতে প্রোটন ও ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে আধানহীন নিউট্রন কণা। শ্বেতবামন থেকে ক্ষুদ্রতর এই সব নক্ষত্রে নিউক্লিয়াসের অস্তিত্বও থাকে না, সেখানে প্রোটন থেকে নিউট্রন মৌলিক কণার সৃষ্টি হয়। ক্র্যাব নীহারিকার এই নিউট্রন নক্ষত্র একটি বেতার স্পন্দক (radio pulsar) নক্ষত্র, এ তথ্যটিও আধুনিককালে জানা সম্ভব হয়েছে। বেতার তরঙ্গের সঙ্গে এই নক্ষত্রটিও সমানে সেকেণ্ডে ৩০ বার একস্‌রে স্পন্দন বিকিরণ করে।

প্রায় সব অতিনব-তারার ধ্বংসাবশেষই একস্‌রে বিকিরণ করে, কিন্তু তাদের বিকিরণের ধরন এক রকম নয়। যেমন সিগন্যাস নক্ষত্রমণ্ডলীতে অতিনব-তারার অবশেষ থেকে যে একস্‌রে পাওয়া যায়, তা আসে তার বাইরের উত্তপ্ত গ্যাসীয় অঞ্চল থেকে।

আজ পর্যন্ত যে সব একস্‌রে নক্ষত্র ধরা পড়েছে, তার প্রায় এক দশমাংশ হল অতিনব-তারার ধ্বংসাবশেষ, অন্যগুলি বিভিন্ন নক্ষত্র জগতের অধিবাসী। একটি অজানা দ্বৈত নক্ষত্রে (binary star) সন্ধান পাওয়া গেছে, যার একটি হল সাধারণ নক্ষত্র ও অন্যটি নিউট্রন নক্ষত্র। সাধারণ বৃহৎ নক্ষত্র থেকে বস্তুপুঞ্জ সঙ্গী নিউট্রন নক্ষত্রে অনবরত এসে পড়ার ফলে একস্‌রে বিকিরণ হয়। নিউট্রন নক্ষত্রে মহাকর্ষশক্তিরই প্রাধান্য— তাই এতে পদার্থের সংযোগ হলেই শক্তি বিকিরণ করে। নিউট্রন নক্ষত্র আবার মহাকর্ষের চাপে ক্রমশ এত সংকুচিত হয়ে পড়ে যে, তাতে আর পদার্থ বলে বিশেষ কিছু থাকে না, অথচ তীব্র মহাকর্ষশক্তি প্রধান হয়ে পড়ে। এদের কালো ছিদ্র (black hole) আখ্যা দেওয়া হয়। পদার্থের সংযোগে এরা শক্তি বিকিরণ করতে পারে।

সিগন্যাস্ একস-১ নক্ষত্রটি যে একস্‌রে বিকিরণ করে, তার তীব্রতার দ্রুত হ্রাসবৃদ্ধি থেকে মনে করা হয় যে এটি একটি কালো ছিদ্র। কারণ এরকম তীব্রতার ঘনঘন হ্রাসবৃদ্ধি একটি ক্ষুদ্রাকার বস্তুতেই সম্ভব হতে পারে। হারকিউলিস্ একস-১ ও সেণ্টাউরাস একস-৩ নক্ষত্র দুটিই এক একটি নিউট্রন নক্ষত্র সঙ্গী সহ দ্বৈত নক্ষত্র রূপে একস্‌রে বিকিরণ করে। এই একস্‌রে অবিরাম নয়। নিয়মিত স্পন্দন আকারে বিকীর্ণ হয়।

আমাদের ছায়াপথের বাইরে তীব্র একস্‌রে বিকিরণকারী বহু ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে কোয়াসারও আছে। একস্‌রে গণক যন্ত্র আরও উন্নতমানের হলে ভবিষ্যতে ক্ষীণ একস্‌রে বিকিরণকারী আরও বহু নক্ষত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

আগামী ১৯৭৬ খৃঃ নাসা আর একটি বৃহদাকার কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছে যা লম্বায় হবে ১০ মিটার ও ওজনে ১০০০০ কিলোগ্রাম। এতে ক্ষীণতর একস্‌রে ধরারও যন্ত্রপাতি থাকবে।

মহাকাশ বিজ্ঞানের গবেষণায় নক্ষত্রলোকের একস্‌রে বিকিরণ ও তার সঙ্গে গামা রশ্মি, নক্ষত্ররশ্মির গবেষণা যুক্ত করতে পারলে, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বলোকের স্বরূপ আমাদের কাছে স্পষ্টতর রূপে প্রতিভাত হবে।

প্রবন্ধ

ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস-চর্চা। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা-৬। তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ইতিহাস। শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য অদ্যাবধি অনালোচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বাংলা সাহিত্যানুরাগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটি বিশেষ প্রশংসনীয় কাজ। গ্রন্থনামে ঊনবিংশ শতকের উল্লেখ করা হয়েছে বটে, কিন্তু ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখককে অষ্টাদশ শতকের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করতে হয়েছে। হালহেড বা তাঁর পরবর্তী উইলিয়ম কেরি রচনা করেছেন ব্যাকরণ ও অভিধান, কিন্তু বিভিন্ন প্রসঙ্গে সেইসব বইয়ে বাংলা সাহিত্যের কথাও উত্থাপিত হয়েছে। সেসব আলোচনা যথার্থভাবে সাহিত্যের ইতিহাস না-হতে পারে, কিন্তু তার থেকে বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় অনেকটাই। বঙ্কিমচন্দ্রের আক্ষেপের কথা মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।' কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ ইতিহাস রচিত হওয়ার অনেক আগেই বাঙালী তার সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী যে হয়েছিলেন এই গ্রন্থে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করেছেন অমিত্রসূদন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪) গ্রন্থটিকে বাংলাদেশের প্রথম উল্লেখযোগ্য সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ পুরাবৃত্ত রূপে স্বীকার করা যায়। কিন্তু এর অনেক আগে থেকেই বাঙালী তার সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে উদ্যোগী হন। ১৮৩০ খৃস্টাব্দে লিটারারি গেজেটে কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজিতে 'বেঙ্গলি ওয়ার্কস অ্যান্ড রাইটার্স' বিষয়ে যে আলোচনা করেন তাকেই বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে আদি রচনা রূপে এই গ্রন্থে লেখক চিহ্নিত করেছেন। তারপর আর-আর যাঁদের রচিত ইতিহাস সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, গজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন।

এই গ্রন্থ ইতিহাসের ইতিহাস বটে, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত সংবাদও এতে আছে। উনিশ শতকের সমালোচকের চোখে সেই যুগের লেখকবর্গ কিভাবে সমালোচিত

হয়েছেন, তার নিদর্শনও এতে আছে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। তাঁর যাবতীয় বক্তব্যই তথ্য নির্ভর—এটা গবেষণা নৈপুণ্যেরই পরিচয়।

উপন্যাস

জীবন জোনাকি। শিশির গুহ। প্রকাশনী, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯। দাম—৭ টাকা।

উত্তরবঙ্গের পটভূমিকায় লেখা একটি মিষ্টি স্বাদের উপন্যাস। আধুনিক সাহিত্যে গ্রাম বাঙলার মানুষ এবং তাদের জীবন-যাত্রা যখন প্রায় অপাংক্তেয় হতে চলেছে তখন এই গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। গাছ-গাছালি, নদী, নৌকা, পাখপাখালি, বাউল, ভাটিয়ালি, জাল-জেলে, মাছ সব মিলিয়ে গ্রাম বাঙলার একটি পরিপূর্ণ ছবি ফুটে উঠেছে। মূলতঃ একটি প্রেমের কাহিনী। আত্মভোলা পরাণ এক বিচিত্র মানুষ। ভাটি অঞ্চলের গান গায়। তার গান শুনে সবাই মোহিত। পরাণের স্ত্রীর নাম সোহাগী, মঙ্গল গ্রামবধূ। স্বামীঅন্ত প্রাণ। পরাণ যাত্রাদলে অভিনয় করে। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় দলের সঙ্গে। ওই দলেরই একটি মেয়ে কাজলের সঙ্গে তাকে অভিনয় করতে হয়। পরাণ সাজে রাম, কাজল সীতা। কাজল শহরের মেয়ে। যে পরিবেশ থেকে সে এসেছে তাকে ভদ্র-পরিবেশ বলা চলে না। জীবনে গোত্তাখাওয়া

গত পনেরো বছরের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বি এড, বি টির পরীক্ষার্থীদের একমাত্র সহায়ক গ্রন্থ স্কলার প্রণীত

বেদ বের হোল

বি. এড., বি. টি. কোশ্চেন অ্যাণ্ড অ্যানসার

[বাংলা] ২০, প্রথম হইতে চতুর্থ পত্র [ইংরাজী] ১৬,

প্রথম হইতে চতুর্থ পত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নতুন করে লেখা সম্পূর্ণ নবতম সংস্করণ

স্কলারের প্রশ্নোত্তর সিরিজ:—

মেথড পেপার

১। বাংলা	৭·০০	৬। সমাজবিদ্যা	৭·০০
২। ইংরাজী	৭·০০	৭। সংস্কৃত	৫·০০
৩। ইতিহাস	৭·০০	৮। তর্কবিদ্যা (ইং)	৫·০০
৪। ভূগোল	৭·০০	৯। অর্থবিদ্যা	৭·০০
৫। অংক	৭·০০	১০। পদার্থ বিদ্যা	৭·৫০

স্পেশাল পেপার

১। মানসিক স্বাস্থ্য	৭·০০	৩। মান ও পরিসংখ্যান	৭·০০
২। মানসিক স্বাস্থ্য (ইং)	৭·০০	৪। মান ও পরিসংখ্যান (ইং)	৬·০০

পরিবেশক:

স্বরাজ ভাণ্ডার
১২৭এ, এস পি মুখার্জী রোড়, কলিকাতা-২৬

সঞ্চয়
৩০।১বি, কলেজ রো কলিকাতা-৯

প্রে ৮০৩

মেয়ে। পরাণকে দেখে ঘর বাঁধার ইচ্ছে হয়। নানাভাবে সে পরাণকে জয় করার চেষ্টা করে। একদিকে সহজ সরল সোহাগীর আকর্ষণ, অন্যদিকে কাজল—চটপটে, ঝকঝকে, শহুরে মেয়ে ছলাকলায় পটু, পরাণের মন ভেঙে দু'টুকরো হল। কাজল তার অভিনয় জীবনের শিক্ষাগুরুও বলা চলে। কাজলের প্রতি পরাণের আকর্ষণ যতখানি না তার চেয়েও বেশী কৃতজ্ঞতাবোধ। কাজলই তাকে আধুনিক শহুরে অভিনয়ের, শহুরে বাচনভঙ্গির কায়দা কানুন শিখিয়েছে। পরাণকে যশস্বী অভিনেতা হতে সাহায্য করেছে। কাজল আর পরাণ অভিনয়-জীবনে সুন্দর জুটি হয়েছে।

এরপর এক বিচিত্র ঘটনার মধ্যে কাজল আর পরাণ শুধু দল ছাড়েনি গ্রাম ছেড়েছে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেছে দূরে কোন শহরে। সেখানে দুজনে স্বামী স্ত্রীর মত সংসার পেতেছে। আবার বিরোধও এসেছে।

পরাণের মোহভঙ্গ হল। কাজলের লালসার শৃংখল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সে ফিরে গেল তার নিজের গ্রামে, তার সহজ, সরল জীবনের কোলে।

শিশিরবাবুর হাতে ভারি ভাল জমেছে এই সব মানুষের কাহিনী। বিভিন্ন চরিত্র হয়ত আমাদের খুবই চেনা—সেই বৈষ্ণবীর আখড়া, গোসাইজি, যাত্রাদলের অধিকারী, পিতৃতুল্য শিবেন ঠাকুর, ভাল-মন্দয় মেশানো নানা চরিত্র। পরিবেশনের গুণে জীবন জোনাকি একটি সুখপাঠ্য উপন্যাসের চেহারা নিতে পেরেছে।

অস্বাধীনতার আবোল-তাবোল"-এর
'বিদ্রোহী' লেখক
সুনীলকুমার গুহের
আরও বিদ্রোহী লেখা নূতন বই
১। ইতিহাস ৬·০০
২। বঙ্গসন্তান ৫·০০
জিজ্ঞাসা
৩৩, কলেজ রো, কলি-৯

শারদীয়া ক্রাইম
বড় গল্প
প্রেমেন্দ্র মিত্র ● সমরেশ বসু ● কবিতা সিংহ
ছোট ও মাঝারি গল্প
। ক্রাইম পাবলিকেশন । কলিকাতা-৯

একজিমা রোগ
সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত দাগ সহ আরও অনেক কঠিন কঠিন চর্মরোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ৮০ বৎসরের চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন। **হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর**, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯)। পূরবী সিনেমার পাশে।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তরুণতর কবিদের মধ্যে বয়সের দিক থেকে কনিষ্ঠতম কবি অনন্য রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ **দৃষ্টি অনুভূতি ইত্যাকার প্রবাহ এবং আরো কিছু** (নবপত্র প্রকাশন, তিন টাকা) সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কনিষ্ঠতম বিশেষণটি অবশ্যই আপেক্ষিক এবং সর্বক্ষেত্রে বিশেষ গুণবাচক নয়। কিন্তু অনন্য রায়ের ক্ষেত্রে বয়সের এই বিশেষণ পাঠককে নিশ্চিত একটি অতিরিক্ত বিস্ময়ের অভিঘাতে আলোড়িত করবে। তাঁর এই প্রথম কাব্যগ্রন্থটি সর্ব অর্থেই নতুন। একটিমাত্র সুদীর্ঘ কবিতা নিয়ে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ তরুণ কবিদের ক্ষেত্রে দুর্লভতম ঘটনা, একমাত্র ঘটনাও হতে পারে। দীর্ঘ কবিতারচনার শ্রম ও প্রযত্নের কথা বাদ দিয়েও পৌর্বাপর্ব বজায় রাখা, পৌনঃপুনিকতা পরিহার ও অনিবার্যতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রশ্নও কম জরুরী নয়। ব্যর্থতার উদাহরণ বড়ো কম নেই। এ-সত্ত্বেও এক তরুণতম কবি কীভাবে সাহসী হলেন সুদীর্ঘ কবিতা রচনায় ও প্রথম কাব্যগ্রন্থের কুণ্ঠাজড়িত পদক্ষেপকে বিস্মৃত হয়ে সেই কবিতাকেই তুলে দিলেন আত্মপ্রত্যয়ের দ্বিধাহীন অভিজ্ঞানরূপে তা নিশ্চয়ই ভেবে দেখবার। এবং সেই সঙ্গে এ-কথাও সানন্দে স্বীকার্য যে, 'দৃষ্টি অনুভূতি ইত্যাকার প্রবাহ এবং আরো কিছু' দুঃসাহসের দৃষ্টান্ত মাত্র নয়, শুদ্ধতম আবেগের স্পন্দনে জ্বলন্ত। গূঢ়তম কাব্য-ভাষায় জীবন্ত এই কবিতার প্রতিটি পংক্তিই আশ্চর্য বেগবান এবং দৈবী প্রেরণার এক বাঙ্ময় নিদর্শন।

তাঁর কাব্যচেতনার নেপথ্যলোকের আভাস আখ্যাপত্রেই দিয়েছেন টি এস এলিঅটের 'রাজর্ষিদের যাত্রা' কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত ক'রে। বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদের আশ্রয় নিয়ে পংক্তি কটি উদ্ধৃত হল : "জন্ম হয়েছিল এক, নিশ্চিত তা/প্রমাণ পেয়েছি, নেই কোনোই সংশয়। আমি তো দেখেছি দুইই জন্ম ও মরণ/আমার ধারণা ছিল ও দুটি স্বতন্ত্র; এই জন্ম এল/আমাদের ক্ষুরধার কঠিন যন্ত্রণা, মরণের মতো, আমাদের আপন মরণ।" অনন্যও মৃত্যুপ্রতিম এই সভ্যতার জন্ম-যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করেছে : 'আমার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে গিয়েছে, হায়, সুনিবিড় মৃত্যুর জঙ্গলে।' সে দেখেছে, 'ডানা-কাটা জটায়ুর মতো এই সভ্যতার আকাশের দেহে/রক্ত, হায়, রক্ত লেগে আছে!' তিনটি প্রবাহে বিন্যস্ত এই দীর্ঘ কবিতার প্রতিটি প্রবাহের আরম্ভে তাই তার অমোঘ জিজ্ঞাসা : 'আকাশের নীলিমার দেহে রক্ত—কেন?' অথচ ঈশ্বরেও নেই কোনো আরক্ত বিশ্বাস, কেননা ঈশ্বর বিভ্রম ছদ্ম, তিনি ভালবাসাকে ভালোবাসেন, ঘৃণা করেন ঘৃণাকে, কবন্ধ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে 'ঈশ্বর লণ্ঠন হাতে নেমে যান মৃত্যুর জঙ্গলে', তাই বিদ্রোহী মানবাত্মা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে ঘোষণা করেছে : 'আমিই অসুখ, আমি বিশল্যকরণী।' অনন্য জানেন, অন্ধকার সমুদ্রে স্নান করে, মৃত্যুর ইতিহাস পার হয়ে মানুষের অভিলষ্ট আনন্দলোকের পথে নিরন্তর যাত্রা। 'মৃত্যুকে পরিহার করে আবার এসেছি ফিরে/ জীবনের কাছে, আর দুর্জ্ঞেয় দুর্জয় মানুষের কাছে'—এই স্বীকারোক্তিতেই তাই শেষ হয়েছে অনন্যের দুঃসাহসিক একক ভ্রমণ।

*

তীর্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **কাঁচা রং** (পরিবেশক : কথা ও কাহিনী, ছ টাকা) তাঁর প্রথম উপন্যাস। সুখেন্দু ও পৃথা দুটি মুখ্য চরিত্র। সুখেন্দু আদর্শবান, দৃঢ়চেতা ও সংযমী। জীবনের প্রথম নারী মন্দিরাকে সে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হঠকারীর মতো ব্যর্থতা দিয়ে ফেরায় নি। নিজের মনোনীত ডাক্তার বন্ধুর হাতে মন্দিরাকে তুলে দিয়েছে। আত্মত্যাগীর মতো নিজে যাকে বিয়ে করতে বাধ্য হল সেই পৃথা কিন্তু সুখেন্দুকে বুঝতে পারে নি। অতৃপ্ত ভ্রমরের মতো ফুল থেকে ফুলে মধুপান করতে গিয়ে পৃথা হল গৃহত্যাগিনী। পৃথার জীবনের এই স্খলন খুব সহজভাবে চিত্রিত করেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত পৃথা তার ভুলের মাশুল দিয়েছে, কিন্তু তখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে। শেষের অংশ হয়তো একটু

অতি-নাটকীয়। তবু বিষাদাত্মক পরিসমাপ্তির তরুণ লেখকের পক্ষে লোভহীনতারই নিদর্শন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা একটু উচ্ছ্বাসময়, অধ্যায়বিভাগও সর্বত্র নিপুণ নয়, তবু সুখ-দুঃখে মেশানো একটি বড়ো কাহিনীকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পেরেছেন—এটুকু কৃতিত্ব স্বীকার্য।

*

ষোলটি ছোটগল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে হরেন ঘোষের গল্পসংগ্রহ **মনের অন্ধকার** (বিশ্বজ্ঞান, ছ টাকা)। নামপত্রে উল্লিখিত উপন্যাসের তালিকা থেকে জানা গেল, শ্রীঘোষ একেবারে নবাগত নন। খান আট-নয় উপন্যাস ইতিমধ্যে প্রকাশিত। কিন্তু শ্রীঘোষের গল্পগুলি কিন্তু সেই তুলনায় প্রত্যাশিত মানে পৌঁছতে পারে নি। উপন্যাস ও ছোটগল্প অবশ্যই একই ধরনের মনস্বীয়না দাবি করে না। কিন্তু আধারভেদের সীমাবন্ধতা বাদ দিলেও সার্থক উপন্যাস-রচয়িতার ছোটগল্পে কতগুলি সাধারণ প্রত্যাশা থাকে। যেমন সিচুয়েশন ফোটানোর দক্ষতা অথবা সংলাপের স্বাভাবিকতা। শ্রীঘোষের গল্পে এর কোনোটিই তেমনভাবে জমে নি। অথচ তিনি যে, ব্যর্থ তাও নয়। আসলে এই এক ধরনের গল্প, ভালোও নয়, মন্দও নয়, মাঝারি ধরনের।

প্রথম গল্পটির কথাই ধরা যাক। 'রঙ বদল'—এই গল্পের নায়িকা মিস্ ব্যানার্জি, বিয়েকে যিনি মনে করতেন 'অতি সাধারণ একটি নোংরা প্রথা।' বিয়ে মানেই 'সুন্দর, নিষ্পাপ পবিত্র স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহকে' কামার্ত পুরুষের ভোগের সামগ্রী করে তুলে সন্তান-উৎপাদন। এহেন মিস ব্যানার্জি শেষ পর্যন্ত বিয়েতে মত দিলেন 'কছুটা একাকিত্বের দুর্বহ ভারের ভরে, বাকিটুকু এক শিশুকে দেখে জেগে-ওঠা বাৎসল্যের চাপে।' শেষটুকু অতিসরলীকৃত। তা ছাড়া মিস ব্যানার্জির এই উদ্ভট বিবাহ-ভীতির কোনো সঙ্গত মনস্তাত্ত্বিক কারণ হাজির করেন নি শ্রীঘোষ। ফলে পুরোটাই একটা গল্প হয়ে গেছে। গল্প হয়ে ওঠে নি।

এরই মধ্যে 'সোনার হরিণ' ও 'সন্ধ্যা-রাগ' গল্প দুটি তুলনামূলকভাবে সার্থক।

পত্রিকা

জন্মিবন্ত। সম্পাদক: বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ৯/১/১ লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য তিন টাকা।

মূলত সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক হলেও আলোচ্য চতুর্দশ সংকলনটি (জুলাই '৭৩) 'বিশেষ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত হয়েছে। বাঙলার গর্ব করার মত লোকশিল্পটি বর্তমানের 'অন্তঃসলিল ফল্গুধারা'-র অবস্থা কাটিয়ে সমসাময়িক জীবনধারার সঙ্গে কিভাবে ওতপ্রোত হয়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে প্রকৃত দরদীজনের আলোচনা সংখ্যাখানির বৈশিষ্ট্য। কেবলমাত্র পটশিল্প ও পটুয়াদের নিয়ে সম্পূর্ণ একটি সংখ্যা বলেই নয়—শিল্প-প্রিয় মাত্রেরই অনেক কিছু জানবার এবং নতুন করে ভাববার উপাদানও প্রচুর পাওয়া যায় এতে। সাধারণের পক্ষেও সংখ্যাখানি পঠিতব্য।

চেতনালোক। সম্পাদক: অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কাঁদি, মুর্শিদাবাদ। মূল্য ছ' টাকা।

বিদেশী প্রভাবমুক্ত এদেশের সমাজচিত্র তুলে ধরার প্রয়াসে এই ত্রৈমাসিকখানির আবির্ভাব। আলোচ্য প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম এই। মফঃস্বলের সাহিত্যগোষ্ঠীর এই উদ্দেশ্যটি অবশ্যই প্রশংসার্হ। লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্থানীয় এবং অনেকের মধ্যেই সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

শারদীয়া

একটি নতুন স্বাদের অভিনব সাহিত্য ও চলচ্চিত্র মাসিক পত্রিকা। আগাগোড়া লাইনো ফেস টাইপে ঝকঝকে ছাপা।

সাতটি উপন্যাস : সাতটি গল্প : দুটি সুদীর্ঘ গল্প :
দুটি রম্য রচনা লিখছেন :

বুদ্ধদেব বসু : প্রেমেন্দ্র মিত্র : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আশাপূর্ণা দেবী : শিবরাম চক্রবর্তী : বিমল কর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : নরেন্দ্রনাথ মিত্র : মতি নন্দী : বুদ্ধদেব গুহ : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় : শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় : তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী : নটরাজন : শঙ্কু মহারাজ : বাসুদেব বসু এবং অন্নদাশঙ্কর রায়।

সমরেশ বসু'র 'অসহযোগ'

যে সব শিল্পীরা নিজেদের কথা লিখবেন :
হেমা মালিনী : সঞ্জীবকুমার : জিনত আমন : শত্রুঘ্ন সিনহা : তনুজা ও রাজেন্দ্র সিং বেদী।

এবং 'চোখের আলোয়' ফিচারে সত্যজিৎ রায়, উত্তমকুমার, সৌমিত্র, ওয়াহিদা রেহমানকে নিয়ে লিখবেন মাধবী দেবী, শর্মিলা, সন্ধ্যা রায় এবং রঞ্জিত মল্লিক।

এছাড়া বহু আকর্ষণীয় ফিচার: শিল্পীদের সাক্ষাৎকার নিয়মিত বিভাগ এবং মন মাতানো রঙীন ছবির ফিচার।
প্রতি কপির মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা।

১০, রাণী রাসমণি রোড ॥ কলিকাতা-১৩

উচ্চ প্রশংসিত

ক: বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রীতিলতা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত "আয়ুর্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য" গ্রন্থটিতে আয়ুর্বেদের মূলতত্ত্ব নূতন জ্ঞানধারায় ও নূতন ভাবধারায় সরল বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

মূল্য—মাত্র ৫.০০

প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, দে বুক স্টোর, ডি এম লাইব্রেরী, ভারত সাহিত্য ভবন প্রভৃতি।

ফুটবল জীবনের সংকটক্ষণে শঙ্কর

কলকাতার মাঠে পরিচয়ের আগেই ফুটবলের বালক বীর হিসাবে শঙ্কর ব্যানার্জীর সর্বভারতীয় সুনাম। আবার গৌরবদীপ্ত ফুটবলে ভারত বিখ্যাত হবার মুখে বড় বিপর্যয়।

শঙ্কর ব্যানার্জী

ফুটবল জীবনে ইতি পড়ারই আশঙ্কা। মুচড়ে যাওয়া ডান পায়ে আগাগোড়া প্লাস্টার করা অবস্থায় শঙ্কর এখন সুখলাল কারনানী হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের বেডে শুয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আছে। ভগবান ও ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিজেই দেখছে নিজের স্বল্প-পরিসর ক্রীড়া-জীবনের চলচ্ছবি, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

১৯৬৪ থেকে ১৯৭০-এর ১৪ আগস্ট পর্যন্ত ৯ বছরের চলচ্ছবি। এই সঙ্গেই ছাপ হচ্ছে শুরু ও শেষের দুটি মুহূর্তের চিত্র। একখানি সর্বভারতীয় স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে রানী রাসমণি স্কুলকে হারিয়ে সুব্রত কাপ জয়ের পর বাটানগর স্কুলের ১৬ বছর বয়সী ছাত্রটির ছবি। আর একখানি সুখলাল কারনানী হাসপাতালের শয্যায় শায়িত পঁচিশ বছর বয়সী মোহনবাগানের সবচেয়ে নির্ভর-যোগ্য এবং ফুটবলে আত্মনিবেদিতপ্রাণ অহংকারশূন্য খেলোয়াড়টির অসহায় অবস্থার দৃশ্য।

প্রথম ছবিটি এই 'দেশ'-এর পৃষ্ঠা থেকেই পুনঃমুদ্রিত—সুব্রত কাপ জয়ের পর ১৯৬৪ সালে যেটি বাটানগর স্কুলের একাদশ খেলোয়াড়ের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল একটি ফুলের মালার মধ্যে। সম্ভবত কোন সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রে ছাপা ওটিই শঙ্করের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম ছবি। পরে ওর প্রচুর ছবি ছাপা হয়েছে। যা ছাপা হয়নি তার ছাপ রয়েছে সাংবাদিক ও ক্রীড়ামোদীদের মনের পর্দায়।

ধরা যাক পাটনায় শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপে বার্নপুর ইউনাইটেড ও ইস্টার্ন রেলওয়ের খেলায় শঙ্করের ক্রীড়ানৈপুণ্যের কথা। বাটা, হাওড়া ইউনিয়ন ও স্পোর্টিং ইউনিয়নে এক বছর করে খেলে অন্ন ও ভাগ্যের অন্বেষণে শঙ্কর চলে গিয়েছিল বার্নপুরে ১৯৬৭ সালে। সেই সুবাদেই বার্নপুর ইউনাইটেড ক্লাবে খেলার সুযোগ। শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপে ওর খেলা দেখে ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের তখনকার সহ সম্পাদক শ্রীদিলীপ রায় বললেন, তুমি কলকাতার ছেলে। এত ভাল খেল। অথচ ফুটবলের পীঠস্থান ছেড়ে চলে এলে বার্নপুরে? শঙ্কর বলল, আমি তো কলকাতাতেই খেলতে চাই। কিন্তু আমি সচ্ছল পরিবারের সন্তান নই। বাঁচার জন্য বাবাকে রীতিমত লড়াই করতে হচ্ছে। সুযোগ পেলে কলকাতায় যেতে আপত্তি কি? ওখান থেকেই যোগাযোগ। পরের বছর শঙ্কর এল ইস্টার্ন রেলে। টিকিট কালেক্টরের চাকরী আর খেলা। নিখিল নন্দী এবং প্রদীপ ব্যানার্জির কোচিংয়ে আরও কুশলী হয়ে উঠল। খেলত লেফট ইনে. ১৯৬৯-এ লীগের খেলায় বাঁ পায়ের এমন একটি বুলেট শটে ইস্টবেঙ্গলের

হাসপাতালে শুয়ে ক্রীড়া পত্রিকা পড়ছে শঙ্কর ব্যানার্জী

ফটো—তারাপদ ব্যানার্জী

গোলকিপার থঙ্গরাজকে পরাজিত করেছিল যে, খেলার শেষে শঙ্করকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিল থঙ্গরাজ। ওই গোলের জন্যই হোক কিংবা সারা মরসুমে ভাল খেলার আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্যই হোক, ১৯৭০এ ইস্টবেঙ্গল থেকে ডাক এল। এক বছর পরে ৭১এ ডাক পেল মোহনবাগানের। কিন্তু লাল-হলুদ ও পোড়খাওয়া-সবুজ জার্সি গায়ে দেবার নামী দামী দাবিদারদের ভিড়ে দু বছর বেশীর ভাগ খেলাতেই শঙ্করকে বসে থাকতে হয়েছে মাঠের টাচলাইনের বাইরে। ৭২-এর প্রথম দিকেও কিছু খেলা বাদ গেছে। মাঝ মরসুম থেকে মাঠের মধ্যে বিক্রম এবং আই এফ এ শীল্ডের সেমি-ফাইনালে অল ইন্দোনেশিয়া দলের বিরুদ্ধে অপূর্ব ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয়। আমার মতে ওটিই শঙ্করের জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা এবং প্রধানত ওর ভূমিকায় মোহনবাগান ইন্দোনেশিয়াকে নাস্তানাবুদ করে ৩—০ গোলে জিতেছিল।

বেশ মনে আছে রেডিও কমেন্টারি বক্সের পাশে বসে শুনেছিলাম শঙ্কর ব্যানার্জি সম্পর্কে কোচ পি কে ব্যানার্জির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী বেতার তরঙ্গে চালিত হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। খেলা দেখে পি কে-কে ওভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে কমই দেখেছি। শঙ্কর সেদিন মাঠের হীরো। দুরন্ত গতিতে ছুটে বল নিয়ে ধাবিত হয়ে ইন্দোনেশিয়ার রক্ষণব্যূহ বার বার ভেঙে দিচ্ছিল। তারপর থেকেই শঙ্কর হয়ে উঠল মোহনবাগান একাদশের অপরিহার্য একজন।

লেফট ইন থেকে লেফট হাফ এবং লেফট হাফ থেকে লেফট ব্যাকে এসে শঙ্কর আরও পরিমার্জিত। রক্ষণভাগের শক্ত স্তম্ভ, আবার আক্রমণে শাণিত ফলা। সুপার লীগে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর সঙ্গে খেলাতেও তার প্রমাণ মেলে। ৬৬ মিনিট পর্যন্ত টালিগঞ্জ ১—০ গোলে অগ্রগামী। মোহনবাগান হেরে যাচ্ছে। নিদারুণ নিরাশার মধ্যেও একটু আশার আলো জ্বালাল শঙ্কর ব্যাক থেকে এগিয়ে এসে গোলটি শোধ করে।

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সুপার লীগের শীর্ষ খেলায় ১২ মিনিটের সময়, শঙ্করের চোট লাগার মুহূর্তেও মোহনবাগানের পতন ঘটতে পারত, যদি সুভাষ ভৌমিকের জোরালো তীব্র শট শঙ্করের বাড়ানো পায়ে আটকে না যেত। অবশ্যই সদাজাগ্রত তরুণ বসু গোলে ছিল। গোল না-ও হতে পারত। কিন্তু একটি সম্ভাব্য গোল বাঁচাতে গিয়েই শঙ্করের ওই বিপর্যয়। দেহের টালে বাড়ানো পায়ে বেধে সুভাষ শঙ্কর দুজনই ভূপাতিত। সুভাষ উঠে দাঁড়াল। শঙ্কর উঠতে পারল না। দু' হাত তুলে আর্তনাদ করে উঠল। প্রেসবক্সে আমার পাশে বসেই খেলা দেখছিল চুনী গোস্বামী। সেও 'টেরিফিক ইনজুরি' বলে আর্তনাদ করে উঠল। অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা স্ট্রেচার নিয়ে ছুটে গেল মাঠের মধ্যে। শঙ্করকে সবাই

রাধীর জন্য স্টেচারে তুলে দিল। নিষ্ঠুর বধাক্তা এবং মাঠের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলার প্রথায় জানিয়ে শঙ্কর যখন স্টেচার বাহিত হয়ে মাঠ থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিল তখন সবারই চোখ ছলছল। জল গড়িয়ে পড়ছে স্বপক্ষ বিপক্ষ খেলোয়াড়ের গণ্ড বেয়ে।

ওই দিনই বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ মণীন্দ্র চন্দ্র অস্ত্রোপচারের পর প্লাস্টার দিয়ে তাঁর পা মুড়ে দেন। ৬ সপ্তাহ পরে আবার অপারেশন হবে। ওই অপারেশনের উপরই নাকি নির্ভর করছে হাঁটুর ছেঁড়া গ্রন্থিগুলি কতদিনে জোড়া লাগবে এবং শঙ্কর কতদিনে খেলার মাঠে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারবে। ময়দানে এবং হাসপাতালে শঙ্করের জন্য হায় হায় অভিব্যক্তি, ক্রীড়ামোদিদের সঙ্গে তার আত্মিক গ্রন্থি আরও দৃঢ়।

ভালবাসার মতই ছেলে, বিশ্বস্ত খেলোয়াড়—আন্তরিকতায় তার কোন ফাঁক নেই। দেশ বিভাগের পর বরিশাল সদর মহকুমার রতনপুর গ্রাম ছেড়ে বাবা ভোলানাথ ব্যানার্জী বাসা বেঁধেছিলেন বাটানগরে। সেখানেই ১৯৪৮ সালের ১৫ এপ্রিল শঙ্কর জন্মগ্রহণ করে। বাবার উৎসাহে বজবজ ইয়ং ক্লাবে ফুটবল শুরু। বিনয়নম্র ব্যবহার এবং বিশেষ ক্রীড়াগুণে বাটানগর স্কুলের মাস্টারমশাইরা ছিপছিপে শ্যামলা ছেলেটির প্রতি বিশেষ নজর রেখেছিলেন। সুব্রত কাপে খেলেছিলও চমৎকার। একাই করেছিল ৬টি গোল। গৌরবে কোনদিন মাথা গুলিয়ে ফেলেনি। গুরু এবং গুণীকে যথাযোগ্য সম্মানে সমাদর করেছে। অনুশীলনে ফাঁকি দেয়নি।

এখনো শঙ্করের সেই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। "ফুটবল খেলায় চোট আঘাত? ও তো স্বাভাবিক ঘটনা।" কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। নিষ্ঠুর নিয়তির বিরুদ্ধেও না। "আমি শীগ্গিরই সেরে উঠবো। ডাক্তারবাবু প্লাস্টার কেটে দিলেই মাঠে ছুটে যাব।"

ফুটবলের মারামারি হানাহানি, নোংরা রেষারেষির মধ্যেও যদি খেলাধূলার আনন্দময় অভিব্যক্তি বলে কিছু থাকে—যদি চারিত্রিক মাধুর্য বলে ময়দানের মানুষের মধ্যে এখনো অবশিষ্ট কিছু থাকে, তাহলে এই ধরনের খেলোয়াড়ের মধ্যেই তা আছে, যারা খেলোয়াড় জীবনের মহাসংকট সময়েও প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব দেখাতে পারে। এই জন্যই বোধহয় ওদের ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা এত বেশী। ওদের জন্য সবারই অনুশোচনা। সবার প্রার্থনা, শঙ্কর শীগ্গির সেরে উঠে বাংলা ফুটবলের শূন্য স্থান পূর্ণ করুক।

—মুকুল

সুপার লীগের শব ব্যবচ্ছেদের সময় এসেছে

এ লেখা যখন পাঠকদের হাতে পড়বে তার আগেই হয়তো ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কলকাতার ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষিত হবে। উপর্যুপরি চার বছর লীগ জয় যেমন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সমর্থকদের কাছে সুখ-স্মৃতি হয়ে থাকবে, তেমন ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলায় সুসভ্য স্বরে গ্যালারির দর্শকদের হাতা-হাতি মারামারি, রেফারির উপর আক্রমণ এবং ওরই পরিপ্রেক্ষিতে রেফারিদের খেলা বয়কট প্রভৃতি ঘটনায় ১৯৭৩-এর লীগ ফুটবলের কালো স্মৃতি ক্রীড়ামোদিদের মনে বার বার ভেসে উঠবে। আর বোধহয় সার্থকভাবে আরম্ভ হবে সুপার লীগ থিওরির ব্যর্থতার শব ব্যবচ্ছেদ।

এ বছরই সুপার লীগ পুনঃ প্রবর্তনের প্রস্তাব তুলতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ নৃপেন দাস আই এফ এ গভর্নিং বডির সভায় বলেছিলেন, লীগের শবের উপর দিয়ে আমরা অনেক অস্ত্র চালিয়েছি। ডাবল লীগের এক পা কেটে লীগকে একঠেঙ্গে করেছি এক ঠ্যাংকে শক্ত করতে গিয়ে সুপার লীগের লেজুড় জুড়েছি। একঠেঙ্গে লীগের পা-হারা বিহীন সুপার লীগ, পকেটযন্ত্র সুপার লীগের কাঠামো খাড়া করতে চেষ্টা করেছি। এবার আবার শুধু সুপার লীগকে দু' পায়ে দাঁড় করানোর পরিকল্পনা করছি। এ পর্যন্ত একটি অস্ত্রোপচারও সার্থক হয়নি। লীগের কঙ্কাল কুৎসিত চেহারায় কলকাতা ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই কঙ্কালের উপর মাংস জুড়ে, রক্ত সঞ্চালন করে তাকে সুস্থ সবল করতে হলে দুর্বল হাড়গুলিকে আগে সরিয়ে ফেলতে হবে।

চিকিৎসকের পরিভাষায় ডাক্তার দাসের এই ব্যঙ্গ বিদ্রুপের অর্থ ছিল : কলকাতার ফুটবল লীগের আকর্ষণ বাড়াতে হলে, তাকে আবার স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে

হলে প্রথম ডিভিশন থেকে দুর্বল দল-গুলিকে ছেঁটে বাদ দিয়ে ১২টি কি ১৩টি দলের মধ্যে আবার ডাবল লীগের প্রবর্তন করতে হবে।

সুপার লীগের থিওরি যে সত্যিই ভুল বার বার সে কথা প্রমাণিত হল। কোনবার ঠিকভাবে সুপার লীগের সব খেলা শেষ হয়েছে? যে ক'বছর সুপার লীগ খেলা হয়েছে প্রতি বছরই শেষ মুখে সেইসব দল রণে ভঙ্গ দিয়েছে যাদের লীগ জয়ের সম্ভাবনা আগেই শেষ হয়ে গেছে। এবার তো অর্ধেক খেলাও শেষ হল না। সত্যিই এবার সুপার লীগের শব ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ফুটবল প্রশাসনের ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, এর পরেও তাঁরা সুপার লীগ নামক আজগুবি ব্যবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ন-শিপের ফয়সালা করবেন কিনা।

গোদের উপর বিষফোঁড়া

সুপার লীগে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলার শেষে রেফারি বিশ্ব-নাথ দত্তর উপর আক্রমণের প্রতিবাদে কলকাতার রেফারিদের খেলা পরিচালনা না করার সিদ্ধান্ত হয়তো কিছুটা হঠকারিতা। কিন্তু প্রতিনিয়ত মার খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত বড় রকমের হিংস্র আক্রমণে রেফারিদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নৈরাশ্যবোধ জাগ্রত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ভাবাবেগ সব সময় যুক্তির বাঁধ মানে না। তাছাড়া এ কথাও সত্যি যে, খেলোয়াড়দের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ক্ষেত্রে আই এফ এর নরম নীতি উচ্ছৃঙ্খল হবার ইন্ধন জুগিয়েছে। সেজন্যও আই এফ এর বিরুদ্ধে রেফারিদের অভিযোগ আছে। রেফারিরা খেলা পরিচালনার আগে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন, দোষী খেলোয়াড়ের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করে-ছিলেন।

আই এফ এও কর্তব্য থেকে সরে গিয়েছিলেন, এমন নয়। তাঁদের ক্ষমতা অনুযায়ী নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে-ছিলেন এবং রেফারির রিপোর্ট পাবার পর অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তিবিধান করা হবে জানিয়েছিলেন। ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষুব্ধ রেফারিদের মনোভাব নরম হবার মুখেই খবর বের হল বাইরে থেকে রেফারি আসছে খেলা পরিচালনা করতে। গভর্নিং বডিও খেলা চালু করার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা অর্পণ করেছেন সম্পাদকের উপর।

স্বভাবতই এতে রেফারিদের আত্ম-

সুপার লীগের প্রহসন—শূন্য মাঠ, অনুপস্থিত প্রতিপক্ষ, বাইরের রেফারির সঙ্গে করমর্দনরত ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক স্বপন সেনগুপ্ত
ফটো—দেশ

মর্যাদায় আঘাত লাগল, অভিমান বেড়ে গেল। হ্যাঁ, আমি অভিমানই বলব। কেননা ফুটবলের পরিচালক সংস্থা আই এফ এর অধীনস্থ সংস্থা হচ্ছে রেফারি অ্যাসোসিয়েশন। ভিন রাজ্য থেকে রেফারি আনার সংবাদে কলকাতার রেফারিদের অভিমান স্বাভাবিক। এবং অভিমান বহু ক্ষেত্রেই যুক্তিহীন হয়। তাঁরা আরও বেঁকে বসলেন এবং বয়কট সিদ্ধান্তে অবিচল থাকলেন।

আমার নিজের ধারণা, রেফারিরা হঠাৎ খেলা পরিচালনা বয়কট করে যেমন হঠকারিতা করেছেন তেমন একটা অনিশ্চিত এবং উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বাইরে থেকে রেফারি আনার সিদ্ধান্তও হঠকারিতার পরিচয়।

যেখানে অভিযোগের সংগত কারণ আছে এবং প্রশাসকরা সে অভিযোগ প্রকারান্তরে স্বীকারও করছেন সেখানে একটু ভুল বোঝাবুঝির জন্য মতবিরোধ মোটেই কাম্য নয়। ফুটবলের প্রশাসক এবং ফুটবলের সেবকদের মধ্যে এই মত-পার্থক্য সামগ্রিকভাবে ফুটবলের উন্নতি এবং সুষ্ঠু পরিচালনার পরিপন্থী।

আই এফ এর প্রেসিডেন্ট কিংবা **সেক্রেটারির ছাড়াও ফুটবল খেলা চলতে পারে। কিন্তু রেফারীর ছাড়া ফুটবল** চলতে পারে না। কথাটা প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি না জানেন এমন নয়। তাঁরা ভালভাবেই জানেন বাইরে থেকে রেফারি আমদানীও সমস্যার সমাধান নয়, সাময়িক ব্যবস্থা। সুতরাং ভুল বোঝাবুঝির অবসান হতে বাধ্য। সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

নতুন পরিকল্পনায় শীল্ডের খেলা

আই এফ এ শীল্ডের খেলা শুধু কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মফঃস্বল শহরেও ছড়িয়ে দেওয়ায় কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সম্ভবত এই পরিকল্পনা নিয়েই ১৮৯৩ সালে আই এফ এ শীল্ডের খেলা শুরু হয়েছিল। প্রথম বছরের খেলা হয়েছিল ভারতের দুটি কেন্দ্রে, এলাহাবাদে এবং কলকাতায়। কিন্তু তারপরে শীল্ডের খেলা কলকাতার মধ্যেই আটকে থাকে। শুধু কলকাতায়ই নয়, কর্তৃপক্ষ ময়দান এলাকার বাইরেও শীল্ডের কোন আসর বসাতে রাজি হন নি। অন্তত আর কোন জায়গায় না হোক অতীতে ব্যারাকপুরে, কাঁচড়াপাড়ায় কিংবা হাওড়ায় খেলার ব্যবস্থা করা যেত। দক্ষিণ কলকাতায় **রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম তৈরী হবার পর সেখানেও কিছু কিছু খেলা হতে পারত।**

আগ্রহী ছিল অনেক মফঃস্বল শহরই। পুরুলিয়া, দুর্গাপুর, হুগলী এবং জলপাইগুড়ির ফুটবল সংস্থাও শীল্ডের প্রাথমিক নক আউটের খেলা নিজ নিজ কেন্দ্রে আয়োজন করার আবেদন পেশ করেছিল। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম বছর বেশী জেলায় বা কেন্দ্রে খেলার ব্যবস্থা করার ঝুঁকি নেননি আই এফ এ কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষা-মূলকভাবে শুধু বার্নপুর ও কৃষ্ণনগরে দুটি গ্রুপের ব্যবস্থা করেছেন। ভালই করেছেন। কারণ বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে মফঃস্বল শহরে ছয় সাতটি দল ও তাদের কর্মকর্তাদের থাকা-খাওয়া, যাতায়াত ব্যবস্থারও ঝামেলা আছে।

প্রথম পর্যায়ে নক আউট, দ্বিতীয় পর্যায়ে লীগ এবং শেষ পর্যায়ে আবার নক আউট বেসিসে শীল্ডের যে নতুন পরিকল্পনা এটাও পরীক্ষামূলক বলা যেতে পারে। খেলার মান এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার আকর্ষণের দিক দিয়ে এ পরিকল্পনা সার্থক হবারই সম্ভাবনা। এ পরিকল্পনায় দর্শকরা ভাল খেলা দেখার বেশী সুযোগ পাবে। মধ্য পর্যায়ে কোন ভাল দল হেরে গেলেও শীল্ড থেকে বিদায় নেবে না এবং বাইরের দলগুলিকে শক্তিহীন দলের সঙ্গে বেশী ম্যাচ খেলতে হবে না।

একলব্য

হোক, তাতে আপত্তির কিছু নেই। তবে সমকালীন বিষয়টা বড় কঠিন। এ-বিষয়ে ছবি করার বিশেষ ক্ষমতা থাকা দরকার। নাটকীয় গল্পের মাধ্যে কিছু সস্তা বুলি কিংবা বক্তৃতা ঢুকিয়ে দিলেই সেটা সমসাময়িক ছবি হয় না। জনসাধারণের মানসিকতা বুঝে মামুলি ধারায় কিছু বক্তব্য উপস্থিত করলেই ছবি সমকালীন হয় না। ছবিকে জনপ্রিয়ও করা যায় না। সস্তায় বাজিমাৎ করার চেষ্টাতে বাংলা ছবির যে বেশ কিছুটা ক্ষতি হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

* * *

ইদানীং কিছু পুরোনো বাংলা ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে—এখনকার সাধারণ বাংলা ছবির প্রকৃত দুর্বলতা কোথায়? যে-সব পুরোনো ছবি সম্প্রতি খুব ভাল চলেছে সেগুলি মহৎ বা অসাধারণ নয়। তবে দর্শককে আনন্দ দেবার মতো ছবি। ছবি দেখে সেই আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটাই এখন বাতিল হতে গেছে। ছবি দেখার অভ্যাসটা আপেক্ষিক। এক্সপেরিমেন্টাল ছবি কিংবা যাতে সেরকম কোনো গল্পই নেই তা দেখেও অনেকে আনন্দ পেতে পারেন। আবার মাঝামাঝি দর্শকের কাছে সেই ছবি ক্লান্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু যে-সব ছবি মূলত দর্শকের চিত্তবিনোদনের জন্য এবং লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় যেখানে নিছক নাটক সেই সব ছবিও দর্শককে কেন খুশি করতে পারে না তার কারণও খুঁজে দেখা যেতে পারে। এই ধরনের ছবিতে প্রকাশ বা ট্রিটমেন্ট-এর খুব একটা অভিনবত্ব কিংবা উৎকর্ষ না থাকলেও চলে। এই সব ছবি চলে গল্পের জোরে। দর্শককে হাসাবার কিংবা কাঁদাবার অব্যর্থ কৌশলটা জানা থাকা দরকার। আন্তরিকতাই এই কৌশল। সম্প্রতি কয়েকটি নতুন বাংলা ছবির ব্যবসায়িক অসাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আন্তরিকতার অভাব তার মধ্যে একটি। কলাকুশলীদের অক্ষমতা সেইসঙ্গে আরও বড় কারণ। যে-কোনো গল্প বা উপকরণ ব্যাপারে দর্শককে খুশি করা ফাঁকির রাস্তা। অসংগত ও অলৌকিক বিষয় দিয়ে শিশুকে ভোলানো যেতে পারে, সিনেমার বয়স্ক দর্শককে নয়। তাঁদের খুশি করতে হলে বাংলা সিনেমাকেও বয়স্ক হতে হবে।

৭ সেপ্টেম্বর । ৬|৩০টা
রচনা/প্রয়োগ : অরুণ মুখোপাধ্যায়
চেতনা প্রযোজনা
হলে টিকিট । ১১—৭টা
(সি ৭২৩৪)

সূত্রধারের
॥ নতুন নাটক ॥
নীলাম
রবিবার ॥ ৯ সেপ্টেম্বর ॥ সকাল ১০টা
রঙ্গনা
(সি ৭৪৭৬)

অ্যাকাডেমী মঞ্চে—৫ই সেপ্টেম্বর
সন্ধ্যা ৬টায়
তরুণ অপেরা নিবেদিত
কার্ল মার্কস
রচনা— শম্ভু বাগ
নির্দেশনা— অমর ঘোষ
সুর— প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য
হলে টিকিট
(সি ৭৪৮৭)

দর্শক অভিনন্দিত
সি. পি. এ. টি. প্রযোজনা
রঙ্গনা- ৪ঠা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ৭টা
কলকাতার হ্যামলেট
হলে টিকিট

"বিলেত ফেরত"/নির্মলকুমার ও সোহাগ সেন

এখানে মানুষের মন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার দায়িত্বটা পরিচালক দর্শকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

ষাঁড়-পর্বের তুলনায় গাধা-পর্বটি একটু নিষ্প্রাণ। আমেরিকা-ফেরত গোবিন্দ (অনিল চট্টোপাধ্যায়) যে প্রতি রাত্রে গাধার চিৎকারে অতিষ্ঠ সেটা গল্প নয়, নিছক একটা সিচুয়েশন। এখানে শুধু মোৎসার্ট বা বিঠোফেনের সংগীতের সংগে গাধার ডাকের যন্ত্রণাকর ঐকতান রচনা ছাড়া পরিচালকের সমস্তে কিছুই তেমন দেখাবার ছিল না।

বার্লিন বিশ্ব যুব উৎসবে বিশ্বের
শ্রেষ্ঠ মূকাভিনেতার পদকপ্রাপ্ত
যোগেশ দত্ত
রাজধানী দিল্লীতে একক অনুষ্ঠান :
আইফ্যাক্স হল : ১, ২, ৪ সেপ্টেম্বর
প্রযোজনা : নবোদয় গোষ্ঠী : দিল্লী
(সি ৭৭২৪)

একাডেমীতে থিয়েটার ওয়ার্কশপ
চাকভাঙা
মধু
১ সেপ্টেম্বর ৭৩
শনিবার সাড়ে সাতটা
(সি ৭৭৭৬)

বিলেত ফেরত-এর পর্বগুলি কিংবা তিনটি গল্প কেবল সিনেমারই জন্য। গল্পের গুণ বা বিশেষ কোন তাৎপর্য এখানে খুঁজে নেওয়ার প্রয়োজনও নেই, খুঁজে পাওয়া সম্ভবও নয়। সিনেমা মিডিয়াম যেটুকু খাপ খায় সেটুকুই গল্প। এবং সিনেমার আঙ্গিকটুকুই বিলেত ফেরত-এ দেখবার বস্তু। ধ্রুবজ্যোতি বসুর চমৎকার ক্যামেরার কাজ এবং প্রশান্ত দে'র সুন্দর সম্পাদনার উপর পরিচালকের বিশেষ নির্ভরতা ছিল বলেই বিলেত ফেরত-এর সিনেমাটিক ও দৃশ্যগঠনগত গুণ সকল পর্বেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পরিচালক তার অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছেন পরিবেশ ও অ্যাটমসফিয়ার রচনায়—যা শেষ পর্ব "রক্ত"-তে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'রক্ত' নিঃসন্দেহে ছবির শ্রেষ্ঠ পর্ব। 'রক্ত' কমেডির আঙ্গিকে তৈরি হলেও তাতে গম্ভীর সুর আছে। 'রক্ত'-র নায়ক অকসফোরড-ফেরত গোপাল অনেকটা শেষের কবিতার অমিত রায়ের স্বভাবের হলেও তার ভিতরে কিছুটা গম্ভীরতা আছে। সে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সিরিয়স। অন্য দশজন যা করে না সে রকম অস্বাভাবিক কিছু করার ঝোঁক গোপালেরও—অমিত রায়ের মত। যখন ইতিহাস পড়বার কথা তখন সে ভূগোল পড়ে। পরিচালক কিন্তু এহেন গোপালের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও একটি করুণ সুর নিয়ে এসেছেন, কমেডির অন্তরালে যা বেশ অনুভব করা যায়। গোপালকে যখন তার বন্ধু সুভাষ (শ্যামল ঘোষ) পাগল বলেছে ওই মুহূর্তে গোপাল কিন্তু হাসতে পারে নি। এইখানেই গল্পের গাম্ভীর মেজাজ। **বড়দের বিলেত ফেরত দুর্ভাগ্যক্রমে মুছেলে**

যে রক্তের ব্যবসা—রক্ত জাল দিয়ে রোদে শুকিয়ে সার তৈরির কারখানা—খুলে নিয়েছে সেটাও যেন একটা ট্র্যাজেডি। তবে খবরটা নামতেই গোপাল রক্ত জাল দেবার ও শুকোবার ব্যাপারে নাজেহাল হয়। গোপালের এই সংকটে অবশ্য রংগের রসদ আছে, এবং সেটাও কিছুটা করুণ রস মিশ্রিত। তবু কমেডির মূল উপাদান এই অংশেই, যা পরিচালক অতি চমৎকার দেখিয়েছেন।

'রক্ত' গোপালের একক গল্প নয়—এতে তার বাবা (কৃষ্ণ কুণ্ডু) ও বোন উমার (অপর্ণা সেন) কথাও আছে। বিশেষভাবে দর্শনীয় ওই বাড়ির পারিবারিক জীবনের পরিচয় ও পরিবেশ রচনা। ওই বাড়িতে গুরুদেবের উপস্থিতি, পুজো-পাঠ, রোজ ভোরে পিসিমার গংগাস্নান থেকে ফেরা ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে পারিবারিক চিত্রটি নিখুঁত। এই গল্পে এবং অন্যত্র পলিতপক্ব বৃদ্ধ বা বিশেষ চেহারার ব্যক্তি ও তাদের বিশেষ ভঙ্গিতে কথা বলা দেখানো হয়েছে—সূক্ষ্ম হিউমারের ওই নজির এখন আর বাংলা ছবিতে নতুন নয়।

ওই বাড়িতে পিতা-পুত্রের দেখা-সাক্ষাত এবং বিশেষত ভাই-বোনের মধুর সম্পর্কের মধ্যে অবশ্য পরিচিত ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। তার উপর উচ্চাভিলাষিনী অপর্ণা সেনের আচরণে ও বলন-চলনে কেমন যেন ফিলম স্টার ফিলম স্টার ভাব। এ ছবির পরিশীলিত রুচির তুলনায় এই অভিনয় অস্বাভাবিক। ছবির অন্য প্রধান স্ত্রী-চরিত্র নায়িকার (প্রথম পর্বে) ভূমিকায় সোহাগ সেনের চরিত্র চিত্রণ বা কথা বলার ভঙ্গি খুব স্বাভাবিক। ফিলম অভিনয় বোধ হয় তাঁর এই প্রথম এবং সেটা সত্যিই ফিলম অভিনয়।

অভিনয়ের যথেষ্ট সুযোগ এ-ছবিতে অনেকেই পাননি—একটি মাত্র সিচুয়েশনে নির্মলকুমার বা অনিল চট্টোপাধ্যায় কী-ই বা অভিনয় করবেন। তবু তাঁরা স্বচ্ছন্দ; অনিল চট্টোপাধ্যায়ের মেক-আপটি তাঁকে অনেকখানি সাহায্য করেছে। কৃষ্ণ কুণ্ডুর অভিনয়ে গোপালের বাবার চরিত্রটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ। সুভাষের চরিত্রে শ্যামল ঘোষের অভিনয় ভাল, তবে একটি জায়গায় তাঁর হাসির মাত্রা আরও কম হলে ভাল হত। রক্ত-তে বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় গোপালকে প্রাণবন্ত ও বাস্তবের চরিত্র করে তুলেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

রক্ত-র গোড়ায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মেক-আপ চমৎকার। স্বভাবের পরিবর্তনের সংগে সংগে মেক-আপটিও পালটেছে। ছবির আরম্ভের ওই দৃশ্য-গুলি—গোপাল যখন অকসফোর্ডে—কল্পনা বোধের পরিচয় দেয়। তেমনি **বিশেষ শিল্পবোধের পরিচয় ষাঁড়-এর**

টাইটেল-এ। তখন জয়দেবের গানও—রতি-সুখসারে গতমভিসারে—নেপথ্যে গীত (জয়শ্রী দাশগুপ্ত)। সোহাগ চাঁদবদনী গানটিও গাধা-পর্বে সংযুক্ত। ওই গানেরই সুরের মতো শুনতে মিউজিক কন্ডাক্টর পরিকল্পনাটি সংগীত পরিচালক হিসাবে চিদানন্দবাবুর একটি খেয়াল হয়ত, তবে মুহূর্তটি বেশ লেগেছে। গাধার ডাক যে-পর্বে সংগীতও সেখানে বেশি—একটু আইরনির মতো। এই কমেডিতে সংগীত, যা অন্যত্রও পরিমিত, একটি বিশেষ ভূমিকা পেয়েছে। বিলেত ফেরত-এ আসল ভূমিকা কিন্তু চরিত্রদেরও ততটা নয়—গল্পের তো নয়ই,—যতটা ফিল্মের, অর্থাৎ ফিল্মের নিজস্ব স্বভাব ও গুণের। ছবির ফিল্মিক চরিত্র যে চিদানন্দ দাশগুপ্ত অনায়াসে গড়ে নিতে জানেন এটা প্রথম ছবিতে জানার পর তাঁর কাছে প্রত্যাশা আরও বাড়ল।

পনেরো বছর আগে সত্যজিৎ রায়ের পরশ পাথর প্রথম মুক্তি পেয়েছিল, আবার মেট্রোয় আসছে। ছবিতে রেণুকা দেবী ও তুলসী চক্রবর্তী

"দানব বধ"ও "তলিয়ে যাবার আগে"

নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম সাফল্যের মূলে চাবিকাঠি সন্দেহ নেই, তবুও দেখা যায় ওই দুটি বস্তু সম্বল করেও সাফল্য অনেক সময় আয়ত্তের মধ্যে আসে না। কেন না শিল্পের ক্ষেত্রে আরো একটি বস্তু চাই যার নাম রসবোধ। মুক্তাঙ্গনে হাওড়া দক্ষিণায়ন নাট্যগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক নাটক 'দানব বধ' ও 'তলিয়ে যাবার আগে' সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। বিশেষ করে 'দানব বধ' সম্পর্কে।

নাট্যকার অমিত মৈত্র কিছু প্রতীক আর কিছু অসংলগ্ন চিন্তার মিশ্রণে একটি নাটক দাঁড় করাতে চেয়েছেন যার নাম 'দানব বধ'। অথচ আশ্চর্য, পঞ্চাশ মিনিটের এই একাঙ্কিকার প্রায় কুড়ি মিনিট বিরক্তিকর গান শোনার যন্ত্রণা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। প্রধান চরিত্র 'ম্যাজিকওয়ালা' বেশে নাট্যকারের অভিনয়ও তেমন উচ্চকণ্ঠে প্রশংসার যোগ্য নয়। আস্ফালন আর চিৎকার দিয়ে চরিত্রটির আক্রোশ হয়ত বা কিছু ফোটে, যন্ত্রণা ফোটে কি? বানের জলে ছেলে ভেসে যাওয়ার শোকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিকওয়ালা সারা দুনিয়ার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। তাঁর প্রচণ্ড আক্রোশের কারণ যদি ওই হয়ে থাকে তবে বলবার কিছু নেই। কিন্তু নাট্যকাহিনীর কোন ব্যাপারটাই যে আমাদের মনকে স্পর্শ তথা আলোড়িত করতে পারল না সে দায় অবশ্য নাট্যকার ও দলের শিল্পীদের। শিল্পীদের মধ্যে মুসলমান গ্রামবাসীরূপে কুনাল মুখার্জীর অভিনয় মর্মস্পর্শী। নাটকের মধ্যে যতটুকু গতি ছিল তারও সর্বনাশ ঘটিয়েছে ইমলি ও ছিমালের গান।

দ্বিতীয় নাটক 'তলিয়ে যাবার আগে' গৌরকিশোর ঘোষের রচনা। নাট্যরূপ দিয়েছেন রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য, প্রথমটির তুলনায় সর্বাংশে দ্বিতীয় নাট্যপ্রযোজনাটি উন্নত মানের। নাট্য-কাহিনীর কষ্টকল্পিত অবাস্তবতাকে ভুলতে পারলে এই নাটক অনেককেই খুশী করবে। ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, জনৈক পদস্থ সরকারী অফিসার যখন তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে গেছেন ঠিক সেই সময় চার-জন যুবক তাদের ঘিরে ধরে। যুবকদলের একজনের হাতে খোলা ছোরা, অন্যজনের কাছে বোমাজাতীয় একটা কিছু। নাটকের নায়িকা নীলার জবানী থেকে জানা যাচ্ছে ওই যুবকরা তাঁকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে একের পর এক ধর্ষণ করেছে। চারজন যুবক দ্বারা একজন মহিলার সম্ভ্রম নষ্ট করার ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটতে পারে কিন্তু সেই চারজন যুবক কারা? নাটকের এই যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের যন্ত্রণা আছে, সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণাও আছে," কিন্তু তারা তো সমাজচ্যুত নয়। বউদির কথায় এখনও এদের অভিমান হয়, এরা এখনো নারীর প্রেমে আগ্রহী, সবুজ ধান ক্ষেত, শাল পিয়ালের বন আর পাখির গান এদের এখনো হাতছানি দেয়, অথচ এরাই মুহূর্তের ঝোঁকে এইরকম কাণ্ড করে ফেলবে এটা নাটকেও অবাস্তব নাটকীয় মনে হয়।

নাট্যকাহিনীর এই অবাস্তবতা আমাদের কখনোই স্বস্তি দিল না। অন্যথায় প্রযোজনাটি মোটামুটি ভাল। কিছু কিছু দৃশ্যের কম্পোজিশনও প্রশংসার। প্রথম দৃশ্যে অসিতের অফিস দৃশ্য খুবই ছেলে-মানুষী। তিনজন রাজনৈতিক নেতাকে দিয়ে নাটকের আরম্ভটি ভালো। কিন্তু তারা একসঙ্গে কেন? তিনটি জায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে এমন হলে কেমন হতো? ধর্ষণ দৃশ্যের আগে নজরুলের 'বাগিচায় বুলবুলি' গানটি মোটেই মানাচ্ছিল না। নাটকের শেষ মুহূর্তটিও আকর্ষক।

অভিনয়ে প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখিয়েছেন তপন মুখোপাধ্যায় (অসিত), দিলীপ বসু (গুরু), কুনাল মুখোপাধ্যায় (রবীন), মানবেশ লাহিড়ী (সমীর), রঞ্জিত মুখো-পাধ্যায় (শ্যামল) ও অমিতা লাহিড়ী (নীলা)। দুটি নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন তপন মুখোপাধ্যায়।

—নাট্য-সমালোচক

রামমোহন-স্মরণে

রামমোহনের দ্বিশতবার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ গত ২৯শে জুলাই সকালে রবীন্দ্রসদনে একটি ভাব-গম্ভীর সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে রামমোহন এবং রবীন্দ্র-রচিত গান গেয়ে শোনান শান্তিদেব ঘোষ, দেবব্রত বিশ্বাস, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে সেদিন একটা শান্ত সমাহিত পরিবেশ গড়ে উঠে-ছিল যার মধ্যে শিল্পীরা কয়েকটি সুনির্বাচিত পূজার গানের অর্ঘ্য নিবেদন করে বিগত শতাব্দীর মহামানবের কথা স্মরণ করেছেন। কোনো শিল্পীর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের চেয়েও এই পরিবেশ রচনার মধ্যেই এই ধরনের আয়োজনের সার্থকতা। একাধিক শিল্পীদের [illegible]

"বিন্দুর ছেলে" (পরিচালনা : গুরুদাস বাগচী) ছবিতে মাধবী চক্রবর্তী ও সন্ধ্যারাণী

বেদনায় পরিবেশ গড়ে ওঠে, আর একদিকে সেই পরিবেশের গাম্ভীর্য শিল্পীদের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্বটুকুকে অনুপ্রাণিত করে, আকৃষ্ট করে।

এই ঘটনাই ঘটেছিল সেদিনকার প্রভাতী অনুষ্ঠান। নীলাঞ্জনা সেনের "যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি" থেকেই মহাপুরুষকে স্মরণ করবার মতো উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম। সেটুকু অব্যাহত ছিল সর্বশেষ শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুন্দর সাবলীল অথচ সংযত আবেগে লীলায়িত গানগুলির সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

এর মাঝখানে শান্তিদেব ঘোষের 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে', গীতা সেনের 'দীপপাসা হায় নাহি মিটিল', নীলিমা সেনের 'ধায় যেন মোর'—এই সব গানের সুর ধূপের মতন সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছিল, প্রেক্ষাগৃহকে রূপান্তরিত করেছিল প্রার্থনা-মন্দিরে। তবে শান্তিদেব ঘোষের 'কৃষ্ণকলি' এই পরিবেশে যেন একটু বিবাদী সুরের মতন মনে হয়েছিল। কিন্তু এই ভিন্ন স্বাদটুকু তাঁর গাওয়ার স্বকীয় ভঙ্গির গুণে বেশ উপভোগ্যও হয়েছিল। অবশ্য এঁদের সকলের মধ্যে সেদিন অন্যান্য করে মনে পড়বেই কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। 'দয়া দিয়ে হবে গো' কিংবা 'পথ চেয়ে কেটে গেল'—এ গান দুটি তো এর আগেও অনেকবার শুনেছি। কিন্তু সেদিন ওই শিল্পী যেন নতুন করে সৃষ্টি করলেন গান দুখানি। এই নতুন রচনার স্বাদ দেবার জন্য কিন্তু একটিও নতুন পর্দা লাগাতে হয়নি গানের পরিচিত সুরে কিংবা আনতে হয়নি ছন্দের কোনো রূপান্তর। যা তিনি লাগিয়েছেন, তা হল তাঁর অনুভূতির স্পর্শ। এই অনুভূতির ছোঁয়া লেগে তাঁর গাওয়া চারখানি গানই অনির্বচনীয় মাধুর্যে ভরে উঠেছিল।

পর পর কয়েকটি গানের মালা গেয়েছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। তিনি গানগুলি ক্লান্তিহীন গেয়েছিলেন কিন্তু প্রত্যেকটি গানই ছিল আবেগে উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ প্রকাশ-ভঙ্গিতে প্রাণবন্ত। সার্থক ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ ছিল সেদিন ঋতুগুরুর গানও। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর গাওয়া রামমোহনের গানগুলি বিশেষত উল্লেখযোগ্য।

—আনন্দবর্ধন

গান্ধর্বীর উৎসব

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে 'গান্ধর্বী' নামে সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাদশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিক উৎসব এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হল। এই উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উদয়শংকর এবং মালতী ঘোষালকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে নৃত্য গীত এবং 'রামায়ণ'র অংশবিশেষ অবলম্বনে একটি নৃত্যনাট্যের আয়োজন ছিল।

সংগীতানুষ্ঠানে প্রধানত 'গান্ধর্বী'র ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বহু শিল্পীর সম্মেলক কণ্ঠে তিনটি রবীন্দ্রসংগীতের পরিবেষণা তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। 'ওগো শেফালীবনের মনের কামনা' গানটি এঁরা ভালই গেয়েছেন কিন্তু অন্য দুটি গানের সঙ্গে নেপথ্য ধ্বনিত তালবাদ্যের সংগতের সঠিক সংগতি ছিল না। ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যান্য অনুষ্ঠানে কিছু নৃত্যের আয়োজন ছিল। 'রামের বনবাস' নৃত্যাভিনয়ের পরিকল্পনা অতীনলালের। নৃত্য-পরিচালনার দায়িত্ব ছিল মুকুন্দ চক্রবর্তীর।

এঁদের সঙ্গে কিছু প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বর্ষাসংগীত শুনিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের এই পর্বে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কিছু প্রত্যাশা ছিল শিল্পীদের কাছ থেকে। সুমিত্রা সেনের দুটি গানে, 'নীলাঞ্জনচ্ছায়া' এবং 'শেষ গানেরই রেশ নিয়ে', সে-প্রত্যাশা পুরোপুরি মিটেছে। বর্ষার গানের অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন বাণী ঠাকুর। তিনিও তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন দুটি গানে। তাঁর প্রথম গান 'বন্ধু, রহো রহো' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সন্তোষ ঠাকুর 'কোথা যে উধাও হোলো'র মতন সূক্ষ্ম সুরে গাঁথা গানটির প্রতি আদৌ সুবিচার করতে পারেননি।

অবশ্য সেদিনকার নির্ধারিত অনুষ্ঠানের অতিরিক্ত দুটি গান 'গান্ধর্বী'র সমগ্র অনুষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় মুহূর্তটি রচনা করেছিল। গান দুটি গেয়েছিলেন সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে প্রবীণা শিল্পী মালতী ঘোষাল। 'দিন যায় দিন যায়' এবং 'খেলার সাথী এবার বিদায় দ্বার খোলো'। এই গান দুটি গেয়ে তিনি যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তা ভোলবার মতন নয়।

আনন্দবর্ধন

বার্লিনে বাঙালী শিল্পীদের কৃতিত্ব

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বার্লিনে দশম বিশ্ব যুব উৎসবে বাঙালী [illegible] কার। উৎসবে যে ভারতীয় সংস্কৃতি দলটি যোগ দিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে মুকাভিনেতা শ্রীযোগেশ দত্ত চারটি প্রতিযোগিতায় যোগদান করে চারটি পদক লাভ করেন। এছাড়া তিনি একটি বিশেষ পদকের অধিকারী হন ওই উৎসবে।

কণ্ঠশিল্পী শ্রীঅনুপ ঘোষালও চারটি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে চারটি পদক পেয়েছেন। কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে আরও যাঁরা পদক পান তাঁরা হলেন আর্য চৌধুরী ও স্বপন গুপ্ত। নৃত্যে পদক পেয়েছেন শ্রীমতী মায়া চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী বন্দনা সেন। ভূপেন হাজারিকাও উৎসবে পুরস্কৃত।

রঙ্গনা ৫৫-৬৮৪৬ নান্দীকার প্রযোজিত

১লা সেপ্টেম্বর শনিবার ৬॥টায়
নটী বিনোদিনী
২রা রবিবার ৩টে ও ৬॥টায়
তিন পয়সার পালা
৬ই বৃহস্পতিবার ৬॥টায়
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(সি ৭৯০৮)

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

বাজপাখির নখ থেকে অরণ্যদেব আছড়ে পড়লেন পাহাড়চুড়োয়।
!?
ধপাস্!

খাঁচায় বন্দী হবার পর তিনি প্রথম বাজপাখির মালিকের সঙ্গে কথা বলছেন।
তুমি কে?
তুমিই বা কে?

তুমি বলছ, এই বাজগুলোকে শিক্ষা দিয়ে তুমি একটা ঘৃণ্য, নোংরা মানুষকে হত্যা করতে চাও প্রতিশোধ হিসেবে। কেন?
কোন বিখ্যাত লোক আমি নই ...আমার জীবনের কাহিনীও খুব সরল... আমি তোমায় বলব ...

'আমি পাখির খেলা দেখাতাম...আমার স্ত্রী ছিল আমার সহকারী।'

'আমরা ছিলাম সুখী, সুখী। পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল।'

'যে দেশে আমি থাকতাম, সে-দেশের শাসক নিজেকে আর দেশের সুন্দরী মেয়েদের ছাড়া কাউকে ভালবাসত না।'

সে আমাদের খেলা দেখতে এসেছিল। আমার স্ত্রী তার নজরে পড়ল।'
ঐ যে সে!
বাঃ, খুব সুন্দরী তো!

সেই রাত্রেই আমার স্ত্রী অপহৃত হল।
গ্রেফতার করছ কেন? আমার স্ত্রী কি করেছে--উঃ---
চুপ কর বোকা।
একী!

ভারতের স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী আলোচ্য সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য বিষয়। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আকাশবাণী-মারফত প্রচারিত এক বাণীতে দেশবাসীর সামনে আবেদন ও আহ্বান রেখেছেন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি। তিনি বলেন, দেশে অর্থনৈতিক অবস্থা যখন চরম তখন ধর্মঘট ডেকে, লক আউট ঘোষণা করে কখনই কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। সুতরাং জাতীয় স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত লাভলোভের কথা মনে রেখে শ্রমিকরা অন্ততে তিন বছর ধর্মঘটের কথা ভুলে যান। এগিয়ে আসুন মালিকরাও। তারাও অন্তত তিন বছর লক অউট থেকে বিরত থাকুন। দেশ ও বিদেশে অবস্থিত ভারতের সব নাগরিকের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি তাঁর অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এই দিন বিচার করতে হবে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটা পালন করা গিয়েছে। দারিদ্র্য অজ্ঞতা ও ব্যাধি কতটা হঠানো গিয়েছে এবং সমানাধিকারের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার কাজ কত দূরে এগিয়েছে।

দেশী সংবাদ

১৩ আগস্ট—বাইশ দফা আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ পর্যালোচনার জন্য শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবেন।

রেলমন্ত্রী শ্রীললিতনারায়ণ মিশ্র আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, লোকো রানিং কর্মীদের কাজের সময় ১৪ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে এখন ১০ ঘণ্টা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ধর্মঘট তুলে নেওয়ায় সরকার ধৃত সকল কর্মীকে মুক্তিদানের ও সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১৪ আগস্ট—অকমুনিস্ট বিরোধী দলগুলিকে সংযুক্ত করার একটি চেষ্টা করা হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে সে চেষ্টা কিছুদিনের জন্য ত্যাগ করা হয়েছে। কয়েকজন বিরোধী নেতাদের নিয়ে গতকাল অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকের সভাপতি শ্রীজে বি কৃপালনী সংযুক্তির কথা কোথাও উল্লেখ করেন নি।

সুপার লীগের শীর্ষ খেলায় ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করে লীগ জয়ের স্বর্ণ-সম্ভাবনার মধ্যে এসে গেছে। কিন্তু মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে অনুষ্ঠিত এই খেলায় মাঠের মধ্যে খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে মারামারি এবং মাঠের বাইরে দুই শিবিরের সমর্থকদের বে-পরোয়া খণ্ড যুদ্ধকে কেন্দ্র করে খেলা দেখার আনন্দ উবে গেছে। হারজিতের প্রশ্ন এখানে বড় হয়ে দেখা দেয়নি—বরং হাজার মানুষের বার বার মনে হয়েছে তারা কত অসহায়।

১৬ আগস্ট—মজুত উদ্ধার অভিযানে কলকাতায় যে-সব গুদাম সিল করে দেওয়া হয়েছে তার মধ্য থেকে সাতটি গুদামের মজুতদার তেল এবং ডাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার [illegible]

ধার্য করছেন তা হলো এই—সরষের তেল কিলো প্রতি ৬.৭৫ টাকা, মুগ ডাল কিলো প্রতি ২.৪০ টাকা, মুসুর অরহর ছোলা এবং মটর ডাল কিলো প্রতি ২.৫০ টাকা।

আজ শেয়ালদা স্টেশনে তিনজন স্ত্রীলোক মারা গিয়েছেন। দুজনের মৃত্যু হয় নরথ স্টেশনের গায়ে ডিভিশনাল সুপারিনটেনডেনটের অফিসের সামনে। তৃতীয়জন মারা যান পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফরমে ঢুকবার মুখেই। জনৈক পদস্থ রেল কর্মচারী দাবি করেন তিনটি মৃত্যুই অপুষ্টির জন্য। কিন্তু রেল পুলিশের বক্তব্য—তিনজনের মৃত্যুই স্বাভাবিক। তিনজনের বয়স যথাক্রমে ৪০, ৪৫ ও ৬০ বলে রেল পুলিশ বলেন।

১৭ আগস্ট—১৯৬২ থেকে ১৯৭৩-এর মধ্যে টাকার দাম শতকরা ৪৭.৮ ভাগ কমে গেছে। এই তথ্য দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী লোকসভায়। অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন :—বাজারে প্রায় তিন কোটি ১০০ টাকার নোট রয়েছে। এর সামগ্রিক মূল্য প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা। ১ হাজার টাকার নোট বাজারে রয়েছে ৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৮৯। ৫৭৯৫৭ খানি ৫ হাজার টাকা মূল্যের নোট এবং ২৯৯২৪টি ১০ হাজার টাকা দামের নোট রয়েছে।

কলকাতা স্টেট ট্রানস্পোর্ট করপোরেশনের (কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা) পরিচালনা সম্পর্কে সম্প্রতি নানা অভিযোগ উঠছে। এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধান করে দেখা যায়, স্টেট ট্রানসপোর্ট করপোরেশনে একদিকে চলছে লাখ লাখ টাকার অপচয়, আর একদিকে চলছে কিছু অফিসারের যথেচ্ছ আচরণ।

১৮ আগস্ট—বণিক সভাগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে এক সপ্তাহ আগে মুগ ও মসুর ডাল এবং সরষের তেল বিক্রয়ের যে বাজার দর স্থির হয়েছিল তা আরও কমানোর সম্ভাবনা সম্পর্কে রাজ্য সরকার পুনর্বিবেচনা শুরু করেছেন। কারণ না-লাভ না-লোকসান-এর ভিত্তিতে [illegible]

খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তা প্রচলিত বাজার দর থেকে বেশ কিছুটা বেশী বলে খাদ্য দফতর তথ্যাদি পাচ্ছেন।

আজ বেলা দশটা একত্রিশ মিনিটে দমদম সাউথ কেবিনের কাছে অতিকায় পাইলিং মেশিনের গর্তে ছুঁড়ে দেওয়া হল কিছু কংক্রিট এবং ভেঙে দেওয়া হল কয়েকটি নারকেল। শুরু হল শঙ্খধ্বনি। শুভ উদ্বোধন হল পাতাল রেলের আনুষ্ঠানিক কাজের।

১৯ আগস্ট—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আজ বলেছেন, কালোবাজারি, মুনাফাখোর এবং খাদ্যদ্রব্যে ভেজালদাররা সমাজের শত্রু। তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত এমন কি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও। তিনি বলেন, কেন্দ্রের সঙ্গে তিনি এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলবেন।

বিদেশী সংবাদ

১৩ আগস্ট—বাংলাদেশে ছোট কিন্তু সুসংগঠিত একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী নিয়মিতভাবে ভারতবিরোধী প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ওই দলের লোকদের একমাত্র লক্ষ্য বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানের কবজায় ঠেলে দেওয়া। ওই মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী শ্রীতাজুদ্দিন আমেদ।

১৫ আগস্ট—গতকাল প্রকাশ্য দিবালোকে আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত একদল দুর্বৃত্ত বাংলাদেশের বরিশাল জেলার ইন্দরহাট পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণ করে। জায়গাটি স্বরূপকাঠি পুলিশ থানায়। ব্যবসা বাণিজ্যের বিখ্যাত কেন্দ্র। তাদের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে চারজন পুলিশ মারা যান। একজন গ্রামবাসীও মারা গিয়েছেন। দুর্বৃত্তরা অস্ত্রাগার লুট করে। তার পরে তারা রাষ্ট্রায়ত্ত দুটি ব্যাঙ্কের শাখায় হানা দিয়ে সেই ভেঙে কত টাকা লুট করেছে তা জানা যায় নি।

১৬ আগস্ট—প্রেসিডেন্ট নিক্সন গতকাল জাতির উদ্দেশে এক টেলিভিশন ভাষণে ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারীর ব্যাপারে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। তিনি বলেন যে, অভিযোগের ব্যাপারটি [illegible] চাপা দেবার বদলে তিনি আসল ঘটনা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন।

১৭ আগস্ট—যক্ষ্মা রোগ নিরাময়ের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ স্ট্রেপটোমাইসিন এবং নিওমাইসিনের আবিষ্কর্তা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ সেলমান ওয়াকসম্যান ৮৫ বছর বয়সে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ রোগে মারা গিয়েছেন। নিউ জার্সি থেকে সংবাদটি দিয়েছেন সংবাদ সংস্থা এ পি।

১৮ আগস্ট—জাতীয় আওয়ামি দলের প্রধান খান আবদুল ওয়ালি খান এই বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, বালুচিস্তানের সাংবিধানিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না হলে সেখানকার পরিস্থিতি আগেকার পূর্ব পাকিস্তানের মত হতে পারে।

১৯ আগস্ট—আফগানিস্তানের উপ-বিদেশমন্ত্রী সঈদ ওয়াহিদ আবদাল্লা, পাকিস্তান রাষ্ট্রদূত ইসফাহানিকে তাঁর অফিসে ডেকে বালুচিস্তানের আওয়ামি দলের বড় বড় নেতাদের গ্রেফতারের ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দাবি করেন। তিনি তাঁর সরকার এই সব গ্রেফতারের ব্যাপারে [illegible]

যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা আর কষ্টের ঝঞ্ঝাটও আসে

জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন আপনার অসময়ে কাজে আসে

আপনি নিশ্চয়ই কলেজের কোনো উৎসব থেকে বাদ পড়তে চান না! ধরুন কলেজে কোনো ভালো ফিল্ম দেখানো হচ্ছে—আর আপনি কোমরের যন্ত্রণা আর অস্বস্তির দরুণ প্রায় শয্যাশায়ী! এ হেন অসহায় অবস্থায় আপনাকে সাহায্য করবে জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন!

অ্যানাসিনের গুণ অনেক। এ যে শুধু যন্ত্রণা থেকে আরাম দেয় তাই নয়—যন্ত্রণার দরুণ যে হতাশভাব আসে তাও দূর করে দেয়। আপনাকে চটপট আরাম আর স্বস্তি দিয়ে, অ্যানাসিন আপনার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে।

এই অসহায় দিনগুলিতে যন্ত্রণা আর অস্বস্তি ভোগ করে পড়ে থাকবেন না। আজ যুগ অনেক এগিয়ে গেছে। জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন আপনাকে চটপট আরাম দেয়, চাঙ্গা করে তোলে। আপনি অক্লেশে আপনার রোজকার কাজকর্ম করতে পারেন।

মেয়ে হয়ে জন্মানো মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝাট বলে মনে হয়। কিন্তু আজ এই অসময়ে আপনি অ্যানাসিনের সাহায্যে সে ঝঞ্ঝাট দূর করে—জীবনের সকল আনন্দ পুরো উপভোগ করতে পারেন। প্রয়োজনের জন্যে হ্যাণ্ডব্যাগে সবসময় অ্যানাসিন রাখুন—মস্ত বড় সুবিধে!

জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

অ্যানাসিন

ভারতে ব্যথা-বেদনার উপশমকারী ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়

Regd. User of TM : Geoffrey Manners & Co. Ltd.

A-59 A

REGD. NO. C 2109

তোয়ালে এত সুন্দর যে পরতে আপনার মন চাইবে।

mcm/dcm/726

দেশ

৪০ বর্ষ] শনিবার, ২২ ভাদ্র, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 8th September, 1973 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা ৪৫

গোপন কথাটি রহে
না গোপনে, রূপ
হয়ে সে যে ফোটে !

শিশির-সিক্ত কুসুম আননে
(যেন) দীপ-শিখা জ্বলে ওঠে !
এ ক্রীম লাগালে পরম যতনে,
মুখেতে ফোটে লাবণ্য,

যে দেখে শুধায়, এ হল কেমনে ?
ধন্য এ রূপ ধন্য !

CIBA

mcm/cv/23/ben

উপন্যাস ও গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মৃগমদ ৮৷৷৹ ইন্দ্রাণী ৩৲
টলটল কাঁচা ৬৷৷৹

অবধূত

উদ্ধারণপুরের ঘাট ৫৷৷৹ পিয়ারী ৪৲
বহুব্রীহি ৫৷৷৹ হিংলাজের পরে ৫৷৷৹

অনুরূপা দেবী

মা ৭৷৷৹ জ্যোতিঃহারা ৭৲ মন্ত্রশক্তি ৭৲

আবদুল জব্বার

বাংলার চালচিত্র ১১৲ মুখের মেলা ৮৲

আশাপূর্ণা দেবী

প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৪৲ সুবর্ণলতা ১৩৲
অগ্নিপরীক্ষা ৪৲ উড়োপাখি ৬৲
যার দা দাম ৫৲
নয় ছয় ৬৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শত রূপে দেখা ১৪৲ স্বয়ংবৃতা ৬৲
নগরপারে রূপনগর ১৮৲
কাল, তুমি আলেয়া ১২৷৷৹
শিলাপটে লেখা ৮৲
সাথি, তুমি কার ৫৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

হিমালয়ের পথে পথে ৮৲
কাবেরী কাহিনী ৫৲
মণিমহেশ ৬৷৷৹

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কলকাতার কাছেই ৯৲ উপকণ্ঠে ১০৲
আমি কান পেতে রই ১২৲
বহ্নিবন্যা ১১৲ জন্মেছি এই দেশে ৪৷৷৹
নারী ও নিয়তি ৩৲
মনে ছিল আশা ৪৷৷৹
রাত্রির তপস্যা ৮৲
একদা কী করিয়া ১৩৲

জরাসন্ধ

লৌহকপাট (সম্পূর্ণ) ২০৲
ছায়াতীর ৫৷৷৹ বন্যা ৫৲
নিঃসঙ্গ পথিক ১০৲

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৭১ ৬৷৷৹ গন্না বেগম ৯৲
সংকেত ৫৲ অভিযান ৭ কবি ৬৷৷৹
রাধা ৮৲ কালিন্দী ১০৲

দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

ছায়া মিছিল ৬৲ ভৃগুজাতক ৫৷৷৹

নলিনীকান্ত সরকার

দাদাঠাকুর ৬৷৷৹ শ্রদ্ধাস্পদেষু ৫৲
হাসির অন্তরালে ৬

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭৷৷৹
অরণ্য ৬৷৷৹ কোমল গান্ধার ৮৲
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ৯৲ ঝড় ১০৲
কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৮৲ ছিন্নপত্র ৫৷৷৹
রাতের রজনীগন্ধা ৫৷৷৹ মুখোশ ৬৲
মধুমিতা ৫৷৷৹ লালুভুলু ৫৲
কাজললতা ৬৷৷৹ সেই মরুপ্রান্তে ১১৲
মেঘ কালো ৪৷৷৹ হাসপাতাল ৮৷৷৹

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

উপচ্ছায়া ৫৲ যাত্রাপথ ৪৷৷৹
দ্বৈতসঙ্গীত ৩৷৷৹

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কলধ্বনি ৪৷৷৹ নতুন তোরণ ৪৷৷৹

জ্যোতির্ময় মৌলিক

নরক থেকে ফিরে ৩৷৷৹

প্রফুল্ল রায়

বাতাসে প্রতিধ্বনি ৭৷৷৹
পূর্ব পার্বতী ১১৲ তটিনী তরঙ্গে ৬৲

প্রবোধকুমার সান্যাল

আঁকাবাঁকা ৫৷৷৹ উত্তরকাল ৫৲ তুচ্ছ ৪৷৷৹
জলকল্লোল ৫৷৷৹ বেলোয়ারী ৭৲
মনে রেখো ৮৲ এক চামচ গঙ্গা ৪৲

প্রশান্ত চৌধুরী

কান পেতে শুনি ৫৲
নদী থেকে সাগরে ৮৲

প্রমথনাথ বিশী

পূর্ণাবতার ১১৲ লালকেল্লা ১৮৲
কেরী সাহেবের মুন্সী ১২৲
বিপাশা সুন্দর তুমি যে ৭৷৷৹
সিন্ধুনদের প্রহরী ৩৷৷৹
শাহী শিরোপা ৩৷৷৹

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পা বাড়ালেই রাস্তা ৫৷৷৹ স্বপ্নপ্রতনু ৪৷৷৹
হার মানলেন পরাশর বর্মা ৪৷৷৹

বিমল কর

সীমারেখা ৪৷৷৹ পরবাস ৪৷৷৹
সঙ্গিনী ৪৲ সেতু ৫৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের পাঁচালী ৮৲ অপরাজিত ১২৲
অনুবর্তন ৬৲ আরণ্যক ৭৷৷৹
দেবযান ৭৷৷৹ ইছামতী ৯৲
আদর্শ হিন্দু হোটেল ৬৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

একই পথের দুই প্রান্তে ৪৲
স্বর্গাদপি গরীয়সী ১৯৷৷৹
নয়ান বৌ ৬৲ আর এক সাবিত্রী ৫৲

বিমল মিত্র

আসামী হাজির ৩০৲
সখী সমাচার ৬৲ বেনারসী ৬৲
একক দশক শতক ১৮৲ স্ত্রী ৬৲
কড়ি দিয়ে কিনলাম ৩৮৲
শ্রেষ্ঠগল্প ৫৷৷৹ কুমারী ব্রত ৫৲

মনোজ বসু

সাজবদল ৫৷৷৹ বন কেটে বসত ১০৲

মহাশ্বেতা দেবী

আঁধার মানিক ১২৷৷৹
সন্ধ্যার কুয়াশা ৫৷৷৹

মৈনাক

বহ্নিবলয় ৯৲ সুবর্ণরেখার তীরে ৫৷৷৹

যাযাবর

হ্রস্ব ও দীর্ঘ ৫৲

লীলা মজুমদার

পাখী ৫৷৷৹ আর কোনখানে ৫৷৷৹

শংকর

সীমাবদ্ধ ৬৲ স্থানীয় সংবাদ ৬৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মগ্ন মৈনাক ৪৷৷৹

সত্যজিৎ রায়

কাঞ্চনজঙ্ঘা ৪৲

সন্তোষকুমার ঘোষ

ত্রিনয়ন ৪৲

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কাঞ্চনময়ী ৬৲ মঞ্জীরাণী ৫৷৷৹

সুমথনাথ ঘোষ

বাঁকা স্রোত ৬৷৷৹ সোহাগরাত ৪৲
রোশনাই ৪৲ বনরাজিনীলা ৮৲
নীলাঞ্জনা ৭৷৷৹ দিগন্তের ডাক ৩৲
সর্বংসহা ৫৲

সৈয়দ মুজতবা আলী

টুনিমেম ১০৲ পছন্দসই ৭৲
রাজা উজীর ৮৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

আঁধি ৮৲ আলোর অরণ্য ৭৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ক্লান্ত বিহঙ্গী ১১৲ তরঙ্গের পর ৫৲
পূর্বাচল ১১৲ মেঘ ও মৃত্তিকা ৫৲
শুক্লাসমজ্জা ৫ ভোরের আকাশ ৬৷৷৹

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট [illegible] ফোন [illegible]

সাফল্য কি ওঁর মাথায় চড়ে বসেছে?

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার হেসে বললেন .

"সাধারণতঃ মাথায় আমি অন্য কিছু চড়তেই দিই না—একমাত্র প্রোটীন-সমৃদ্ধ ব্রিলক্রীম ছাড়া। এতে আমার চুল সজীব আর পরিপাটী থাকে। ঠিক যেমনটি আমার পছন্দ।"

ব্রিলক্রীমের প্রোটীন চুলের গোড়াকে শক্ত করে, চুলের পুষ্টি যোগায়। সারাদিন চুলকে সুন্দরভাবে বশে রাখে। তাছাড়া, এতে চুল চট্‌চট করে না। চুলে তেলতেল ভাব হয় না। এটি এক আধুনিক কেশ-প্রসাধন।

ফারুকের মত আপনিও একটা কাজের কাজ করুন। প্রোটীন-সমৃদ্ধ ব্রিলক্রীম ব্যবহার করুন।

প্রোটীন-সমৃদ্ধ

ব্রিলক্রীম সুন্দর চুলের স্বাস্থ্যকর প্রসাধন

সূচীপত্র

সংগীত-চিন্তা

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এবং সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এই গ্রন্থে সংকলিত। মূল্য ৭·০০ টাকা

রূপান্তর

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত থেকে তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাবলী। মূল্য ৭·০০ টাকা

লেখন

রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্যসুন্দর হাতের লেখায় তাঁর কবি-মানসের অপরূপ পরিচয়লিপি। এই গ্রন্থের বাংলা ও ইংরেজি কবিতাগুলি সংখ্যায় আড়াই শতের অধিক। জাপানী বাঁধাই, মূল্য ১০·০০ টাকা

বনবাণী

স্মৃতি ও প্রকৃতিকে নিয়ে রচিত কবিতা ও গান। বনবাণী, নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা, বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপন-উৎসব, নবীন—এই চার অংশে প্রকৃতির রসরূপের প্রকাশ। মূল্য ৭·০০ টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট । কলিকাতা ১৬
ফোন ঃ ৪৪-৯৮৩৮-৩৯

পূজার পূর্বেই প্রকাশিত হইবে।
শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

রম্যাণি বীক্ষ্যর

আর একখানি নূতন পর্ব লিখলেন
অবন্তীপর্ব

অন্যান্য পর্বগুলি পাওয়া যাইতেছে।

●

রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ

রবীন্দ্র সংগীত সাধনা ৭·০০
শ্রীসুবিনয় রায়

বাংলা সঙ্গীত সম্বন্ধে তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ

বাংলা সংগীতের রূপ
শ্রীসুকুমার রায়

সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ও সমালোচনা গ্রন্থ

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ৭·০০

বাংলা সমালোচনা পরিচয় ১২·৫০
ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সাহিত্য ও শিল্পলোক ৬·০০
অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

সমালোচনা সাহিত্য ১৬·০০
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পাল

কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ১২·৫০
ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

শরৎ-চেতনা ১৬·০০
ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা-১২

(সি ৮৫৭০)

আমাদের অভিজ্ঞতা—
আপনার লাভ

প্রমোদানুষ্ঠানের জন্যে অনেক প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রনিক চালিত ইউনিট তৈরি
করেন কিন্তু **কসমিক** রেডিও কেবলমাত্র উন্নত ধরনের স্টিরিও সিস্টেম
তৈরি করতেই তাঁদের মনোযোগ ও শক্তি অর্পণ করেছেন।
যখনই আপনি একটি **কসমিক** স্টিরিও সিস্টেম কিনছেন তখনই সেই সঙ্গে
আপনার অতিরিক্ত কিছু লাভ হচ্ছে—আমাদের বিশেষ
লব্ধ জ্ঞানের ভাগ আপনিও পাচ্ছেন।
বিভিন্ন স্বরের জন্য বিভিন্ন অ্যাম্প্লিফায়ার--ব্যক্তিগত রুচি
ও ক্রয়ক্ষমতার অনুকূলে।
সর্বপ্রকার ধ্বনিবিস্তারের জন্য নানা রকম স্পিকার পাবেন।
আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বা সঙ্গীতগুলি তুলে নেবার জন্য
স্টিরিও ক্যাসেট টেপ-ডেক।
দেখুন ! শুনুন ! কিনে তৃপ্তি পাবেন।

COSMIC

Stereo
Solid State

COSMIC RADIO 9B, Mahal Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (East)
Bombay-400 093 TEL: 573361/62 GRAMS: SOLID STATE

ADVERTS-CA-

—আমাদের অনুমোদিত ডীলার—

পার্ক স্ট্রীট : মেসার্স হারমনি হাউস, মেসার্স শব্দগেনস্, মেসার্স ইস্টার্ন ইলেকট্রিক অ্যান্ড ট্রেডিং কোং। **এসপ্ল্যানেড :** মেসার্স সি সি সাহা, মেসার্স রেডিও অ্যান্ড অ্যালায়েড স্টোর্স। **নিউ মার্কেট :** মেসার্স রেডিও ডিস্ট্রিবিউটরস্, মেসার্স ব্যানারিনো। **বিবেকানন্দ রোড :** মেসার্স বসন্ত ট্রেডিং কোং। **গড়িয়াহাট :** মেসার্স ব্যানারিনো।

ব্যবসা সংক্রান্ত খোঁজখবরের জন্যে যোগাযোগ করুন :
শ্রীঅরবিন্দ দত্ত, ১২৮, ১৮, হাজরা রোড, কলিকাতা—৭০০০২৬। ফোন : ৪৭-৬২৭৮

সূচীপত্র

নিগূঢ়ানন্দের নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস

হৃদয়ে নাবিক ৮৲

জীবন বড় জটিল। জীবনে প্রেম জটিলতর। অথচ প্রেম এমন এক মহৎ শক্তি যার আলোয় নীহারিকাপুঞ্জের রহস্যও ভেদ হতে পারে। প্রেম সীমা থেকে অসীমে নিয়ে যায় প্রেমিকের আত্মাকে, নিজের আত্মার আলোয় সুপ্রকাশ করে নিকটতর এবং দূর-নিকটকে। ভালবাসার আলোয় আধুনিক মানসের এক জটিল গ্রন্থিমোচন বর্তমান উপন্যাস, যে আলো ইতিহাস আর বিজ্ঞান রাজনীতি আর সাহিত্য, জীববিদ্যা আর স্থাপত্যকে এক করে মিলিয়েছে একটি বসন্ত-পুষ্পের মধ্যে।

শঙ্কু মহারাজ-এর অসাধারণ ভ্রমণ-কাহিনী

মধু-বৃন্দাবনে ব্রজ পর্ব ১০৲ বন পর্ব ১০৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সর্বাধুনিক ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি

পূর্ব পুরুষ [দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ]

প্রথম খণ্ড ৮৲ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ১২৲

ডঃ জয়গুরু গোস্বামী প্রণীত
চারণকবি মুকুন্দদাস ২৫৲
[মুকুন্দদাসের সমগ্র রচনাবলী]

সুবোধ ঘোষের গল্পগ্রন্থ
গল্প মণিঘর ১৪৲

নিমাই ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস
মোগলসরাই জংশন ৪৲

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নতুন উপন্যাস
যুগস্বাক্ষর ১০৲

নীলকণ্ঠের গল্পগ্রন্থ
নীলকণ্ঠ বিচিত্রা ১০৲

রাহুল সাংকৃত্যায়নের
উত্তরাংশ ৯৲

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস
গন্ধ পেলেন পরাশর বর্মা ৫৲

ফণিভূষণ আচার্যের উপন্যাস
পঞ্চকন্যা ১২৲

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নতুন উপন্যাস
বিশ্বাসের বাইরে ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
নীলাঙ্গুরীয় ১০৲

শঙ্কু মহারাজের অনবদ্য ভ্রমণ-কাহিনী
চতুরঙ্গীর প্রাঙ্গণে ১০৲

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস
যদি জানতেম ১০৲

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভ্রমণ-কাহিনী
রূপসী প্রতিবেশী ১২৲
[নেপাল ভ্রমণ কথা]

দীপক চৌধুরীর উপন্যাস
কুমারী কন্যা ৮৲

সুনীলকুমার ঘোষের রহস্য উপন্যাস
ড্যাফোডিল হাউস ৮৲

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ঃ ১৩/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ।। ফোন ঃ ৩৪-৪৩৫৬

নতুন যুগের নবীনারা ঃ উপযুক্ত সৌন্দর্য প্রসাধনে তাঁদের রূপ হয়ে ওঠে অপরূপ!

আজকের আধুনিকারা সবসময়ে ব্যস্ত থাকলেও রূপের ছটায় দেখতে কত সুন্দর আর মনোহর। তাঁরা রূপের চর্চায় ও পরিচর্যায় ব্যবহার করেন—পণ্ডস এঞ্জেল ফেস কম্প্রেসড পাউডার। এটি একাধারে ফাউণ্ডেশন আর পাউডার—দুই-ই। একটি ছোট্ট কৌটোর মধ্যে লুকোনো আছে আপনার রূপের রহস্য। আপনার সুবিধার জন্যে তার মধ্যে একটি আয়নাও বসানো আছে।

সবসময়ে এটি সঙ্গে রাখুন। সূক্ষ্ম রেশমের মত মোলায়েম। ব্যবহার করলে আপনার কোমল সৌন্দর্য অপরূপ হয়ে উঠবে।

আপনার পছন্দমত ৬টি রঙের ছটা: আইভরী, গোল্ডেন, টীনী, সান ট্যান, ন্যাচারাল ও ন্যাচারাল পিংক।

পণ্ডস এঞ্জেল ফেস

চীজব্রো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড
(সীমিত দায়িত্বসহ ইউ.এস.এ.-তে সংগঠিত)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসমীর দত্তগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ

গর্ব ও গৌরবের সঙ্গে সংগ্রহে রাখার মত রাজ-সংস্করণ

বঙ্কিম রচনাবলী

এক খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস। গ্রাহক মূল্য ১২, । ৫, দিয়ে গ্রাহক হোন। নামমাত্র মূল্যে অন্ততঃ ৫০ বছর স্থায়ী এই দুর্লভ অভিজাত সংস্করণটি আমরা বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। পৃষ্ঠা এক হাজারের উপর। লাইনো টাইপ, দামী কাগজ, রেক্সিন বাঁধাই, মনোরম আবরণী, বিশাল ভূমিকা, বিশুদ্ধ পাঠ, জীবনী প্রভৃতিতে সুসম্পাদিত এবং উন্নত মানের প্রকাশনা।

রামমোহন, মধুসূদন, দীনবন্ধু এবং দ্বিজেন্দ্র রচনাবলীরও গ্রাহক করা হচ্ছে। প্রতিটির জন্য ৫, দিয়ে গ্রাহক হোন।

হরফ প্রকাশনী। এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২

(স ৮৩১৪)

সৌরীন সেন

দিল্লীতে এসেই

রাজনৈতিক উপন্যাস ॥ ১৩.০০

নিমাই ভট্টাচার্য

ওয়ান আপ টু ডাউন

উপন্যাস ॥ ৬.০০

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

বরফের রঙ লাল

উপন্যাস ॥ ৮.০০

সারদা বন্দ্যোপাধ্যায়

কালোর রাজা হরিশ্চন্দ্র

আদিবাসী সম্পর্কে উপন্যাস ॥ ৪.৫০

হো-চি মিন

ভিয়েতনাম সম্পর্কে

রাজনৈতিক প্রবন্ধ ॥ ৪.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কয়েকটি মুহূর্ত

গল্প-সংগ্রহ ॥ ৩.০০

চিরঞ্জীব সেন

কালোটাকা চোরাপথ

স্মাগলিং-এর কাহিনী ॥ ৩.০০

অমিতাভ গুপ্ত

গতিবেগ-চঞ্চল বাংলাদেশ

মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব

জীবনী ॥ ২৫.০০

নারায়ণ সান্যাল

আমি নেতাজীকে দেখেছি

প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা ॥ ১৫.০০

আমি রাসবিহারীকে দেখেছি

প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা ॥ ১২.৫০

কলিঙ্গের দেব-দেউল

(নরসিংহদাস পুরস্কারপ্রাপ্ত)

মন্দির ভাস্কর্যের ইতিহাস ॥ ১২.০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চতুষ্ক

উপন্যাস ॥ ১৪.০০

বন্যাকন্যা

উপন্যাস ॥ ১৪.০০

আসামী ঈশ্বর

গল্প সংগ্রহ ॥ ৬.০০

রত্নাকর গিরিশচন্দ্র

জীবনী ॥ ২০.০০

: শংখ প্রকাশন :

২৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

(স ৮২৮৩)

পার্থসারথি চক্রবর্তীর

অভিনব বই

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা

দাম ৪·০০

চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রায় অতি প্রাচীন হলেও, এখনও এমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়নি, যাতে যে-কোনও রোগকে সে অবহেলে জয় করতে পারে। তবুও পূর্ণতার পথে এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস যেমন

প্রকাশিত হল

বিচিত্র, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক এর উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি—যার ফলে আবিষ্কৃত শরীর ও তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত নানা তথ্য, শরীরের অসুস্থতা ও বিভিন্ন রোগের কারণ, সেগুলির প্রতিকার ও ওষুধসমূহ, চিকিৎসার সহায়ক নানারকম যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা প্রভৃতি। এ বইয়ে লেখক গল্পের মত হৃদয়গ্রাহী করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সেইসব রোমাঞ্চকর আবিষ্কার ও অগ্রগতির কথা ছোটদের জন্য লিখেছেন। অজস্র ছবিতে ভরা এই বই যে-কোনও গল্প-উপন্যাসের চেয়েও অনেক বেশী আকর্ষক। এমন বই শুধু ছোটদের কেন, বড়দের জন্যেও বাংলা ভাষায় এত পর্যন্ত লেখা হয়নি॥

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস

যে যেখানে দাঁড়িয়ে ৫·০০

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

চাঁদের জানালা ৬·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস

দেহ নয় মন ৪·০০

বিমল করের উপন্যাস

যদুবংশ ৭·০০

বিমল মিত্রের উপন্যাস

চলো কলকাতা ৫·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস

তুঙ্গভদ্রার তীরে ৬·০০

সুবোধ ঘোষের উপন্যাস

জিয়া ভরলি ৮·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস

প্রতিধ্বনি ফেরে ৪·০০

মনোজ বসুর উপন্যাস

প্রেম নয়, মিছে কথা ৪·০০

বিমল করের উপন্যাস

ভুবনেশ্বরী ৪·০০

প্রতিভা বসুর উপন্যাস

দ্বিতীয় দর্পণ ৮·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস

সেতুবন্ধন ৫·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্পের সংকলন

ঘরণীর বিকল্প ৩·০০

সমরেশ বসুর উপন্যাস

দুই অরণ্য ৬·০০

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

দোলনা ৫·০০

সুবোধ ঘোষের মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যান

ভারত প্রেমকথা ৮·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২ ॥ বিক্রয়কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিঃ ৯

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোন্নয়নের দৌড়

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোন্নয়ন কী হারে এগিয়ে চলেছে তার একটি চমকপ্রদ তথ্য সম্প্রতি পাওয়া গেল। আমাদের সকলেরই হয়ত জানা আছে, এই রাজ্যে বড় ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্যে কিছু বড় কল-কারখানা গড়ে উঠছে বলে বর্তমান সরকার জানিয়েছিলেন। তার মধ্যে পুরুলিয়ায় দুটি কারখানা খোলার কথা : একটি সিমেণ্টের, অন্যটি অ্যালয় স্টিলের। তা ছাড়া কথা ছিল, একটি কারখানা হবে স্কুটার তৈরীর, একটি টায়ার-টিউবের, আর একটি টেলিভিশন সেট তৈরীর। নাইলন সুতোর কারখানা খোলারও প্রস্তাব ছিল। এই কারখানাগুলি খোলা হলে বহু বেকার ছেলে চাকরি পাবে এমন প্রতিশ্রুতিও সরকার দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবিত কারখানাগুলি খোলার কতটা কী হয়েছে তা আমরা প্রায় জানি না। একমাত্র টেলিভিসন কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে বলে সংবাদপত্রে দেখেছি।

কেন্দ্র এই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিরোধিতা করেন এটা সব সময় আমরা বলে থাকি। অন্তত তাই ভাবি। সেটা ঠিক নয়। গত দেড় বছরে কেন্দ্র যা যা মঞ্জুর করেছিলেন তার মধ্যে এই ছটি শিল্প কারখানা চালু হবার কথা ছিল। পুরুলিয়ায় অ্যালয় স্টিলের কারখানায় আটত্রিশ কোটি টাকা আপাতত বিনিয়োগ হবার কথা। এই কারখানার প্রাথমিক প্রজেক্ট রিপোর্ট এখনও দাখিল করা হয়নি। একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে পুরুলিয়ায় সিমেণ্ট কারখানা খোলার যে সম্মতিসূচক চিঠি কেন্দ্র দিয়েছিলেন সেই কারখানার বা কী হল? শ্রীসুব্রহ্মণ্যম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে জরুরী চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছেন, কারখানাটি খোলার কী ব্যবস্থা এ-যাবৎ করা হয়েছে তা তাঁদের জানানো হোক। এই কারখানায় সাড়ে সাত কোটি টাকা বিনিয়োগ হবার কথা। গত দেড় বছরে এই প্রকল্পটির কাজ বলতে একটি রিপোর্ট মাত্র জমা পড়েছে। মোটর টায়ার টিউব কারখানার কাজ কিছুমাত্র এগোয়নি। অর্থাৎ তার রিপোর্ট পর্যন্ত পেশ করা হয়নি। নাইলন সুতো তৈরীর কারখানার ব্যাপারেও একই অবস্থা—এখনও তার কোনো অন্তর্বর্তী রিপোর্ট জমা পড়েনি। টেলিভিসন সেট নির্মাণের ব্যাপারে কাজ হয়েছে কিছুটা, কারখানা প্রতিষ্ঠার কাজ হচ্ছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে আলোচ্য কারখানাগুলিতে মোট সাড়ে নব্বই কোটি টাকা বিনিয়োগ হবার কথা। যদি কারখানাগুলির অন্তত প্রাথমিক কাজও শেষ হত তবু ভরসার কিছু থাকত। কিন্তু গত দেড় বছরে তাও হয়নি। লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষের অন্তত একটি অংশ এতোদিনে এইসব কারখানায় রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারত। এ-ব্যাপারে কেন যে এ-যাবৎ কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি আমরা জানি না। প্রাথমিক রিপোর্টগুলি পাবার পর কারখানার জায়গা পছন্দ, জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি আমদানি এবং তা বসানো—এই সব কাজ করতে করতে কম করেও আরও দু-তিন বছর কেটে যাবে বলে মনে হয়। তার ওপর আছে মূলধন যোগাড়ের সমস্যা। অর্থাৎ কাগজে-কলমে সাড়ে নব্বই কোটি টাকার প্রকল্প ও নানা ধরনের কারখানা খোলার প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত হাস্যকর এক অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। এর জন্যে দায়ী আমাদের

৪০ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৫
শনিবার ২৩ ভাদ্র ১৩৮০
Saturday 8 September 1973

রাজ্য শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন। এই সংস্থাই রাজ্যের বড় ও মাঝারি শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি করে থাকে। এরা এ-যাবৎ কোনো কাজই করতে পারেনি, শুধু সঙের পুতুলের মতন বসে আছে, এবং ঘরোয়া ঝগড়া করেছে। আমাদের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ রাজ্যের শিল্পোন্নতির জন্যে কতদূর মাথা ঘামাচ্ছেন তা আশা করি বুঝতে কষ্ট হবে না। তাঁর কথার দৌড় যতটা কাজের চেষ্টা কী ততটা? অন্যান্য রাজ্য, বিশেষ করে মহারাষ্ট্র এই ধরনের কর্পোরেশনের পরিকল্পনায় আজ সার্থক ও সফল শিল্পোন্নত রাজ্য হয়ে উঠেছে, আর আমরা শুধু কথা বলেই খালাস, কাজ করছি না। সে আগ্রহ আমাদের নেই।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম ঃ ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৬·০০
ষান্মাসিক — টাঃ ১৮·৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯·৫০

আসামে ও ত্রিপুরায়
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৪৪·০০
ষান্মাসিক — টাঃ ২২·৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১·৫০

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৮৭·০০
ষান্মাসিক — টাঃ ৪৪·০০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ২২·০০
বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৬০·০০
ষান্মাসিক — টাঃ ৩১·০০

লণ্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক — টাঃ ১৭৪·০০
ষান্মাসিক — টাঃ ৮৭·৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৪৪·০০

শ্রীকামরাজকে নব কংগ্রেসের
আওতায় আনার
চেষ্টা চলছে।
সি সুব্রামানিয়ম

ইন্দিরা-কামরাজ সাক্ষাৎকার

শ্রীমতী গান্ধী ও কামরাজের আলোচনা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। নানা নেতা এই নিয়ে নানা বিবৃতি দিয়েছেন। মোরারজী বলেছেন: এ আলোচনার তেমন কোনও গুরুত্ব নেই। শ্রীমতী গান্ধীর দল ভেঙে পড়ছে, তাই তিনি এখন নানা খেলা দেখাচ্ছেন। এস কে পাতিল বলেছেন তিনি খবর পেয়েছেন: কামরাজ শ্রীমতী গান্ধীকে পরিষ্কার জানিয়েছেন যদি দুই কংগ্রেসে ঐক্য করতেই হয় তাহলে তা হতে পারে জাতীয় ভিত্তিতে—তামিলনাড়ুর জন্য কোনও আলাদা ঐক্য হতে পারে না। প্রফুল্ল সেন বলেছেন: দুই কংগ্রেসে যদি আবার মিলন হয়ই তাহলে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কংগ্রেস থেকে গুণ্ডা-বদমাসদের আগে বের করতে হবে। শ্রীঅশোক মেটা বলেছেন: মিলন হতে হলে ইন্দিরা গান্ধীর অপসারণ চাই-ই।

এ তো গেল সংগঠন কংগ্রেসের নেতাদের মতামত। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে ডঃ শঙ্কর-দয়াল শর্মা বলেছেন: দুই কংগ্রেসের মিলনের কোন প্রশ্নই নেই। সিদ্ধার্থ রায় বলেছেন: দুই কংগ্রেসের মিলন অন্তত পশ্চিমবঙ্গে দলের কোনও শক্তি বাড়াবে না। আর শশিভূষণ মন্তব্য করেছেন: কামরাজ ভাল, তাঁকে দলে ফিরে পেতে অনেকেই উৎসাহী। কিন্তু সংগঠন কংগ্রেসের অনেকেই ভাল নয়। তাঁদের কংগ্রেসে আবার নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

পত্রপত্রিকায়ও প্রধানমন্ত্রী এবং কাম-রাজের আলোচনা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। মাদ্রাজ থেকে, দিল্লি থেকে, উত্তর প্রদেশ থেকে নানা গবেষণালব্ধ ফলাফলের খবর আসছে প্রায় প্রতিদিনই। কেউ বলছেন: ডি এম কে সরকারের বিরুদ্ধে একটা বড় রকমের অভিযান পরিচালনার জন্য প্রধান-মন্ত্রী কামরাজের সাহায্য চান। তিনি বুঝেছেন যে এ অভিযানে সাফল্যলাভ না তাঁর [illegible] না। [illegible] তামিলনাড়ুতে [illegible] শক্তি তিনি বাড়াতে পারছেন না। তাই এখন কামরাজের সাহায্য চান। প্রধানমন্ত্রী নাকি মনে করছেন যে কামরাজের সাহায্য পেলে তিনি ডি এম কে সরকারকে উচ্ছেদ করতে পারবেন।

কেউ বা এই প্রসঙ্গে গোটা দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিরই প্রশ্ন তুলছেন। তাঁদের বক্তব্য: কার্যত গোটা দক্ষিণ ভারতটাই কংগ্রেসের হাতছাড়া। তামিলনাড়ু তো পুরোপুরি ডি এম কের হাতে। কেরলে সি পি আই, মুসলীম লীগ এবং অন্য এস পি ছাড়া গতি নেই। অন্ধ্রে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে।

। যে কোনও সময় আবার দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলে উঠতে পারে। মহীশূরের অবস্থাও বেশ খারাপ। শ্রীমতী গান্ধী তাই দাক্ষি-ণাত্যকে আবার কংগ্রেস দলের প্রভাবে আনার জন্য কামরাজ ও সঞ্জীব রেড্ডি দুজনারই সাহায্য চান।

উত্তর প্রদেশ থেকে যেসব ব্যাখ্যা আসছে সেগুলি আবার প্রধানত ওই রাজ্যের রাজ-নীতির পটভূমিকায় দেখা। সেখানে নির্বাচন আসছে। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের অবস্থা খুব ভাল হবে বলে কেউ আশা করছেন না—যদি না বিরোধী দলগুলি সবাই মারামারি করে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করে। অনেকেরই আশঙ্কা, ওখানে যদি একটা বড় রকমের বিরোধী ঐক্য হয় এবং এখনও ও-রাজ্যের মুসলমানরা সাধারণভাবে যতটা কংগ্রেস-বিরোধী আছেন ভোট পর্যন্ত যদি তাই থাকেন তাহলে কংগ্রেসের পরাজয় নিশ্চিত।

তাই উত্তর প্রদেশ থেকে কামরাজ-ইন্দিরা বৈঠকের যত ব্যাখ্যা আসছে তাতে বলা যাচ্ছে এই বৈঠকে উত্তর প্রদেশ রাজ-নীতিও আলোচিত হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী কামরাজের মাধ্যমে উত্তর প্রদেশে ফিরিয়ে পেতে চান চন্দ্রভান গুপ্তকে এবং তাঁর দলকে। আর অন্যদিকে সাহায্য পেতে চান শেখ আবদুল্লার। এই দুই পক্ষের সাহায্য পাওয়া গেলে কংগ্রেস যে অনায়াসে উত্তর প্রদেশের নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

দিল্লি থেকে আরও কতকগুলি খবর আসছে। একটা খবর হল: প্রধানমন্ত্রী কামরাজকে ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি করতে চান। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আগামী বছর। আর একটা খবর: শ্রীমতী গান্ধী কামরাজকে কংগ্রেস সভাপতি করে সংগঠনটা মজবুত করার পূর্ণ দায়িত্ব দিতে চান।

এত সব জল্পনা-কল্পনার অবসান করে দিতে পারেন যাঁরা দুজন তাঁরা কিন্তু কিছুই বলছেন না। তাঁরা একজন হলেন প্রধানমন্ত্রী এবং আর একজন কামরাজ। দুজনে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেন নি। এরা যে কেউ একজন অনায়াসে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটাতে পারেন, জানিয়ে দিতে পারেন কী আলোচনা হয়েছে এবং প্রস্তাব বা পাল্টা প্রস্তাব কিছু উত্থাপিত হয়েছে কি না।

কিন্তু আজ পর্যন্ত (২৬-৮-৭৩) তা তাঁরা করেন নি এবং নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে বলেই করেন নি। দুজনেরই যদি কোনও উদ্দেশ্য না থাকত তা হলে এতদিনে নিশ্চয়ই মুখ খুলতেন।

এই মুখ না খোলার ব্যাপারে এবং কাউকে কিছু বুঝতে না দেওয়ার ব্যাপারে কামরাজ এবং শ্রীমতী গান্ধী দুজনেই তুলনাহীন। এরা দুজনে যদি সত্যিই এক হয়ে কিছু করবেন বলে স্থির করেন তাহলে ভারতের অন্য কোনও রাজনীতিবিদের পক্ষে তা ঠেকানো অত্যন্ত কঠিন।

এই যোগাযোগ ঘটেছিল একবার মাত্র। শাস্ত্রীজী যখন মারা গেলেন তখন। শাস্ত্রী মারা যাওয়ার পরই কামরাজ এবং শ্রীমতী গান্ধীর গোপন আলোচনায় স্থির হল, শ্রীমতী গান্ধীই প্রধানমন্ত্রী হবেন। আরও ঠিক হল যে এ ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী কিছু বলবেন না বা করবেন না। চুপচাপ থাকবেন। যা করার কামরাজ করবেন। সব

কবি নিশিকান্ত রচিত
কালজয়ী কাব্য

লীলায়ন

কৃষ্ণলীলা অফুরান
ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত আটখানি বহুবর্ণ
চিত্রে এবং বহুবিধ রেখাচিত্রে অলংকৃত ॥
দাম : বারো টাকা

শ্রী অ র বি ন্দ আ শ্র ম
প্রকাশনী বিভাগ, পণ্ডিচেরী ২
: প রি বে শ ক :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট । কলকাতা ১২
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন । কলকাতা ৯

নেতা যান কামরাজের কাছে। নন্দা প্রার্থী। মোরারজী প্রার্থী। নন্দ প্রার্থী। প্রকাশচন্দ্র শেঠী প্রচার করতে নেমেছেন সঞ্জীব রেড্ডির হয়ে। সঞ্জীব রেড্ডি তখন ইস্পাত মন্ত্রী এবং শেঠী তাঁর দফতরে উপমন্ত্রী। প্রফুল্ল সেন, নিজলিঙ্গাপ্পা এবং অতুল্য ঘোষ প্রথমেই গিয়ে কামরাজকে বললেন, আপনিই প্রধানমন্ত্রী হোন।

কামরাজ প্রথমেই নিজের নামটা বাতিল করে দিলেন। কিন্তু অন্য কে হলে ভাল হয় তা কিছুই বললেন না। প্রায় শেষ পর্যন্ত চুপচাপ থাকলেন।

এদিকে কিন্তু কামরাজ আস্তে আস্তে জাল গুটিয়ে আনছেন। সঙ্গে আছেন শুধু মধ্যপ্রদেশের ডি পি মিশ্র। ডি পি মিশ্রকে দিয়ে সব মুখ্যমন্ত্রীকে একজোট করলেন এবং তাঁদের দিয়ে একযোগে প্রস্তাব করালেন: প্রধানমন্ত্রী হোন শ্রীমতী গান্ধী।

মাস্টার স্ট্রোক! এক ধাক্কায় সবাই চিৎপাত! এই দৃশ্য আমি নিজে দেখেছি দিল্লিতে। তখনও পর্যন্ত অনেকেই ভাবতে পারেননি শাস্ত্রীর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন শ্রীমতী গান্ধী।

তবে, সেবার শ্রীমতী গান্ধী এবং কামরাজ এক হয়ে রাজনীতিতে নেমেছিলেন। এখন তাঁরা এক নন। দল ভাগ হওয়ার সময় এবং তারপর কামরাজ শ্রীমতী গান্ধীর উপর ভীষণ চটে ছিলেন। আর সে উষ্মা তিনি খুব গোপনও করতেন না।

গত বছর জুন মাসে কামরাজের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম অনেকক্ষণ। মাদ্রাজে। তখনও শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে কামরাজের গোপন আলাপ-আলোচনার কথা শোনা যাচ্ছিল।

কামরাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: আসলে ব্যাপারটা কী?

জবাব দিয়েছিলেন: সব বাজে কথা।

তখনও আম্মা ডি এম কে হয়নি। তখনও মাদ্রাজে সি পি আই, কংগ্রেস সবাই বলছেন, কামরাজের সাহায্য ছাড়া এই ডি এম কে শাসনের অবসান ঘটানো যাবে না। তার কয়েকদিন আগে মাদুরাইতে একটা কংগ্রেস অধিবেশন হয়ে গিয়েছে। সেই অধিবেশনে সিদ্ধার্থ রায় কামরাজের বিরুদ্ধে কতকগুলি কথা বলেছিলেন। দেখলাম, মাদ্রাজে সি পি আই ও কংগ্রেসের অনেকেই সেজন্য ক্ষুব্ধ।

দেখলাম কামরাজ তখনও শ্রীমতী গান্ধীর উপর বেশ চটা। এবং তিনি ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও বেশ চিন্তিত। তিনি মূলে যে কথাটা বললেন তা হল: দেখ, উনি কংগ্রেস ভেঙে দিয়েছেন। রাতারাতি বিভিন্ন রাজ্যে এমন সব নেতাকে বসিয়েছেন যাঁদের সেই সব রাজ্যে কোনও প্রতিষ্ঠা নেই। একটা ঝটকা এলে তাঁরা তো সামলাতে পারবে না। এখন দল ও সরকার চলছে একটা পিলারের উপর ভরসা করে। সে পিলারটা হল দিল্লিতে। ইন্দিরা পিলার। আগে কিন্তু প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে একটা করে পিলার ছিল। সব পিলার মিলে দল ও দেশের ভার বহন করত। এক আধটা পিলার দুর্বল হলেও ভয়ের কিছু ছিল না। ঝটকা এলে সামলানো যেত। আর এখন? এখন একটা পিলার। কোনও রাজ্যে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে, একটা ভাষা-দাঙ্গা হলে কে তার চোট সামলাবে? সব চোট সামলাতে হবে দিল্লির সেই পিলারটাকে। এত বড় দেশ, এত ভাষা ও এত ধর্মের দেশ কি একটা পিলারে চলতে পারে? "ওয়ান পিলার নো গুড। মোর পিলার, মোর বিগ স্মল পিলার, মোর স্ট্রেংথ।"

শ্রীমতী গান্ধী কি আবার মোর পিলার চান? না, কামরাজই আবার মোর পিলারস ব্যবস্থা চালু করার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর কাছে কোনও প্রস্তাব দিয়েছেন?

✻

শ্রীমতী গান্ধীর সামনে [illegible] সামনে আজ যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা তা হল অর্থনৈতিক। দেশের অর্থনীতি প্রয়োজনমত এগোতেই পারছে না। শিল্প ও কৃষি দুই ক্ষেত্রেই বড় সংকট। দ্রব্যমূল্য ভীষণভাবে বেড়ে চলেছে। মুদ্রাস্ফীতি প্রচণ্ড।

এই সমস্যার সমাধান আজ সবচেয়ে আগে দরকার।

কামরাজকে দলে এনে বা দুই কংগ্রেসের মিলন ঘটিয়ে কি এই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যাবে?

এটা অবশ্য ঠিকই যে কামরাজকে সঙ্গে পেলে ডি এম কে উচ্ছেদ সম্ভব হলেও হতে পারে। অথবা, চন্দ্রভান গুপ্তকে পেলে উত্তর প্রদেশের নির্বাচনটা কংগ্রেসের পক্ষে অনেক সহজ হবে।

কিন্তু দুই কংগ্রেসের মিলন বা কামরাজ ও চন্দ্রভানের সাহায্য অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।

সেজন্য প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধি। যে-কোনও ভাবে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন এখন আমাদের প্রচণ্ড গতিতে বাড়িয়ে যেতেই হবে। না হলে শুধু অর্থনৈতিক আবর্তেই ভারত এক বড় রকমের সংকটের মধ্যে পড়বে এবং সেই সংকট থেকে রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে বেরিয়ে আসা যাবে না।

২৬-৮-৭৩।

নবারুণ গুপ্ত

॥ লাইব্রেরীতে রাখার মত বই ॥

রাহুল সাংকৃত্যায়ন-এর
বিখ্যাত গ্রন্থ

নতুন মানব সমাজ ৪·০০

আনন্দ ভট্টাচার্য-র
রহস্য উপন্যাস

কামনা নিশ্বাসে বিষ ৬·০০

চিরঞ্জীব সেন-এর
রহস্য কাহিনী

শিরায় শিরায় পাপ ৬·০০

অর্ণব দে সম্পাদিত

একুশ বছরের প্রেমের গল্প ১৫·০০

বুক ফেয়ার ॥ C/O বিশ্বনাথ প্রকাশনী
৭৯, ১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা—৯

একালের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্ভার

এই সংখ্যার দুটি বিশেষ রচনা

অপ্রকাশিত পত্রাবলী
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার যৌবন * বুদ্ধদেব বসু

কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী / বিষ্ণু দে / অজিত দত্ত
অরুণ মিত্র / দিনেশ দাস / সুভাষ মুখোপাধ্যায়
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী / অরুণকুমার সরকার
শক্তি চট্টোপাধ্যায় / শঙ্খ ঘোষ / রাজলক্ষ্মী দেবী
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় / নবনীতা দেব সেন
কবিতা সিংহ এবং আরো অনেকে

সিনেমা এবং নাটক সম্পর্কে প্রবন্ধ

অসিত চৌধুরী / সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
তরুণ মজুমদার / তরুণ রায় / তৃপ্তি মিত্র

রঙীন আর্টপ্লেট

শ্রীশ্রী দুর্গা (ওড়িষার পটচিত্র)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / নন্দলাল বসু

৫টি উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়
শংকর
বিমল কর
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

এঁরা কেউই অন্য কোন পূজা সংখ্যায়
উপন্যাস লিখছেন না

গল্প

বনফুল/অন্নদাশঙ্কর রায়/শিবরাম চক্রবর্তী
সুবোধ ঘোষ/বিমল মিত্র/সন্তোষকুমার ঘোষ
সমরেশ বসু/নরেন্দ্রনাথ মিত্র/প্রতিভা বসু
রমাপদ চৌধুরী/রূপদর্শী/দিবেশ রায়

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮০

দাম ৮ টাকা মাত্র/সডাক ৯.২০

ADPC-4 BEN

মুখ্যমন্ত্রীর হাত

"মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করুন"—এই মর্মে যে কাতর আবেদন আমাদের চির-তরুণ শিল্পমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসে মনুমেনটের তলায় দাঁড়িয়ে প্রচার করেছেন, এতদিনে তা নিশ্চয়ই দেশবাসীর অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করেছে। অবস্থা যে এতটা গুরুতর, সত্যি বলতে কি এর আগে আমি তা বুঝতেই পারিনি। মাঝে মাঝে রাস্তা-ঘাটে চলতে ফিরতে কখনও-সখনও দেওয়ালের গায়ে আলকাতরার লিখন—"মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করুন"—যে নজরে পড়েনি এমন নয়। কিন্তু দেওয়ালের গায়ে তো কত কিছুই লেখা থাকে। ওসব কথায় আর কেই বা তেমন গুরুত্ব দেয়।

কিন্তু শিল্পমন্ত্রী হেঁজিপেঁজি লোক নন। কেবিনেটের সিনিয়র মেমবার। এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক লেভেলে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। তাঁর ইনস্ আনড আউট তিনি জানেন। তাই তিনি যখন উদ্বেগাকুল কণ্ঠে পাবলিককে ডেকে বলেন, "মুখ্য-মন্ত্রীর হাত শক্ত করুন," তখন বুঝতে হয় অবস্থা সত্যিই সিরিয়াস। বিশেষ করে স্বাধীনতা দিবসে তিনি যখন "মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করুন" এই কথাটা উচ্চারণ কর-ছিলেন তখন তাঁর কাতর কণ্ঠস্বরে মুখ্য-মন্ত্রীর হাত সম্পর্কে যে উদ্বেগ, যে আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছিল তাতে যে বিচলিত বোধ না করবে, বুঝতে হবে সে নিতান্তই পাষাণহৃদয়।

শিল্পমন্ত্রীর করুণ কাতর সেই আবেদন শুনে মুখ্যমন্ত্রীর হাত সম্পর্কে আমার উদ্বেগও বেড়ে গেল। আর মনে পড়ল সেইদিনের কথা, যেদিন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অ-ব্যাচেলর মুখ্যমন্ত্রী টেরিকট প্যান্ট আর গাঢ় নীল স্পোরটস গেঞ্জি পরে দিল্লির পাঞ্জা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে নামলেন। চলনে বলনে বুদ্ধিতে ভাবনায় সদাচঞ্চল তারুণ্য যেন উপচে পড়ছে। তিনি স্বয়ং যেন তারুণ্যের স্বপ্ন।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেইদিন যে জিনিসটা প্রথমে আমার নজরে পড়েছিল, সেটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর হাত। স্পোরটস গেঞ্জির খাটো হাতার বাইরে সেই শালপ্রাংশু হাত দুখানির প্রায় সবটাই বেরিয়ে ছিল। বেশ শক্ত সমর্থ পুরুষ্টু দুখানি হাত। এই তো সেদিনের কথা! এর মধ্যে কি এমন হল তাঁর হাতে যে, তাকে শক্ত করতে হবে?

জনৈক প্রসিদ্ধ অসটিওপাথ বা হাড়-বদ্যি বললেন, হাত শক্ত করার কথা যখন উঠছে, তখন তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কি হয়েছে! বাবুর হাতের হাড় নির্ঘাত নরম হয়ে গেছে। টিপে দেখুন গে।

হাজিক-উল-মুলুক্‌ বিন দে কমান নুরুল্লা গজন ফরুল্লা অল হাকিম য়ুনানী—স্বয়ং রাজশেখর বসু যাঁর কাছে নন্দ-বাবুকে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছিলেন—সব শুনে বললেন, হাড্ডি পিলপিলায় গয়া হোগা জরুর।

কলকাতার বিশিষ্ট অরথোপিডিক সারজনদের দ্বারস্থ হতে তাঁরা অস্থি ও অস্থিরোগ সম্পর্কে যে আলোকপাত করলেন তা হচ্ছে সংক্ষেপে এই : মুখ্য-মন্ত্রীর হাত আর সাধারণ মানুষের হাতে কৌলীন্যগত পার্থক্য কিছুটা থাকলেও মূলত প্রভেদ কিছু আছে বলে চিকিৎসা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের চোখে পৃথিবীর যাবতীয় হাতকে মাত্র দুইটি শ্রেণীতেই ভাগ করা চলে। যথা (এক) হাতুড়ে হাত এবং (দুই) বিশেষজ্ঞের হাত। যে হাত রোগী মারবার জন্য কোনও ডিগ্রির বা লাইসেনসের ধার ধারে না তাকে বলা হয় হাতুড়ে হাত, আর যে হাত রোগীকে বধ করার জন্য যথা-বিহিত লাইসেনস প্রাপ্ত তাকেই বলা হয় বিশেষজ্ঞের হাত। ডাক্তারদের মধ্যে এই দুই ধরনের হাতই বিদ্যমান। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী হতে গেলে কোনও বিশেষ বিষয়ের উপর দখল থাকার দরকার হয় না, তাই মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে প্রথমোক্ত শ্রেণীতেই ফেলা হয়েছে।

গভীর গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর হাত, অ্যানাটমি অনুসারে, মাংসপেশী এবং অস্থি এই দুই প্রকার উপাদানে গঠিত। অস্থি অথবা হাড় অথবা বোন-এর দৃঢ়তার হেরফেরেই হাত শক্ত অথবা নরম হয়। অস্থি বা হাড় বা বোন এবং পেশী বা মাসল্‌-এর মৌলিক প্রোটিন সাবস্টানস এক হলেও হাড় যে পেশী অপেক্ষা শক্ত হয়, তা এই কারণে যে, হাড়ে ক্যালসিয়াম ফসফেট জমে তাকে শক্ত করে তোলে। কাজেই কোনও কারণে ক্যালসিয়াম ফসফেট-এর যদি তেমন মারাত্মক অভাব ঘটে যায়, তবে শক্ত সমর্থ লোহার মত হাতও ময়দার তালের মত নরম লদলদে হয়ে যেতে পারে।

জিজ্ঞেস করলাম, বলেন কি! একেবারে ময়দার তালের মত লদলদে!

অরথোপিডিক সারজনদের মুখপাত্র বললেন, ময়দার তাল কি বলছেন, পারথিস্ ডিজিজ্ হলে হিপের হাড় নরম হয়ে ব্যাঙের ছাতার মত চেপ্টে যায়, তা জানেন? কি ধরনে অসটিও ক্ল্যাসটোমা হয়েছে। তা হলে ব্যস্, ঐ শক্ত শক্ত হাড় একেবারে সাবানের ফেনার মত বুজবুজে হয়ে উঠবে মশাই। হাড়ের ব্যামো কি সোজা জিনিস!

বললাম, সর্বনাশ! তা হলে আমাদের উপায়? অবিশ্যি বাইরে থেকে দেখে তো মনে হয় না মুখ্যমন্ত্রীর হাতের অবস্থা সত্যিই এত নরম। পেপারে যা ছবি বেরুচ্ছে তাতে তো—

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, সুডো হাইপারট্রফিক মাসকুলার ডিসট্রফি যদি হয়ে থাকে, বাইরে থেকে দেখে কি বুঝবেন? বাইরে থেকে পেশীর চেহারা দেখে ভাবছেন হাত বেশ তাগড়াই আছে। টিপে দেখুন একেবারে স্পন্‌জ্।

জিজ্ঞেস করলাম, কি হতে পারে, বলুন তো?

মুখপাত্র বললেন, অনেক কিছুই হতে পারে। তবে অসটিও ম্যালাশিয়া নয় বলেই মনে হয়, যদিও এই রোগটা ভারতেরই রোগ। মেয়েদেরই হয়। যে-সব মেয়েছেলে পর্দানশিন, গায়ে রোদ লাগে না বলে ভিটামিন বি সিনথিসিস হতে পারে না, এ রোগ সাধারণত তাদেরই হয়। এতেও শরীরের হাড় নরম হয়ে যায়, এমন নরম যে বডির প্রেসারে পেলভিস ছোট হয়ে যায়। আমার মনে হয় না, মুখ্যমন্ত্রীর এই জাতীয় কিছু হয়েছে। তবে অসটি-আইসিস ফাইব্রোসা সিসটিকাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছিনে। এটি অতি পাজী রোগ। হাড়ে ঘুণ ধরিয়ে [illegible] পাথরের মত শক্ত হাড়কেও ময়দার তালের মত লদকাদে করে তোলে। তবে কি জানেন, যা বললাম সবই আন্দাজে। পেশেন্টকে না দেখে সিওর হওয়া মুশকিল যে, সত্যিই কি হয়েছে।

বিভিন্ন মহলে ঘোরাফেরা করে দেখা গেল, শিল্পমন্ত্রীর কাতর আবেদনে সকলেই মুখ্যমন্ত্রীর হাত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। এবং সকলেই এ বিষয়ে একমত হলেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর অবিলম্বে উচিত ডাক্তার দেখানো। প্রথমে এ-দেশে এবং তারপর বিদেশে। তিনি ভালমত চিকিৎসা করিয়ে তাঁর হাত আবার শক্ত করে ফিরে আসুন। এবং এর জন্য যা করা দরকার তা আমরা করব, পাবলিকের পক্ষ থেকে সেই গ্যারানটি শিল্পমন্ত্রীর মাধ্যমে তাঁকে আমি দিয়ে রাখছি।

পূজা সংখ্যা মানেই আনন্দবাজার

রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানচেট করেছিলেন...

অপঘাতে মৃতা নতুন বৌঠান, অকালমৃত পুত্রকন্যা, পরলোকগতা সহধর্মিণী, জ্যোতিদাদা, সত্যেন দত্ত, সুকুমার রায় প্রমুখ বহু প্রিয়জনের আত্মা বিভিন্ন সময়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেটে। পরলোকের সঙ্গে তাঁর রোমাঞ্চকর আলাপের বিশ্বস্ত বর্ণনা এই প্রথম সংকলিত হলো রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়ার মতো 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা' শীর্ষক এই সুদীর্ঘ রচনাতে মৃত স্বজনদের আত্মার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'প্ল্যানচেট' মিডিয়াম মারফৎ আলোচনা, প্রতিটি প্রশ্ন, প্রতিটি উত্তর লিপিবদ্ধ হয়েও এতোদিন পড়েছিল শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে। লোকচক্ষুর আড়াল থেকে উদ্ধার করে এনে প্রায় শতাধিক গ্রন্থপৃষ্ঠার এই রচনায় রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চার যাবতীয় তথ্য উপহার দিয়েছেন অমিতাভ চৌধুরী। সঙ্গে মিডিয়াম মারফৎ আত্মার হাতের লেখার প্রতিলিপি।

এই সংখ্যার আরেকটি অবশ্যপাঠ্য সচিত্র রচনা
শ্রীপান্থ লিখিত

বিবাহ করিব সুখে ইংরাজ ললনা

ABC-1 SEN

৬টি উপন্যাস

সুবোধ ঘোষ
সমরেশ বসু
রমাপদ চৌধুরী
দিব্যেন্দু পালিত
বুদ্ধদেব গুহ
শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

একমাত্র আনন্দবাজারেই এঁরা উপন্যাস লিখছেন

৩টি বড় গল্প

শংকর * বিমল কর
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত / শিবরাম চক্রবর্তী / মনোজ বসু
সন্তোষকুমার ঘোষ / গৌরকিশোর ঘোষ
অসীম রায় / ইন্দ্র মিত্র / শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কবিতা / চলচ্চিত্র

দাম ৮ টাকা মাত্র/সডাক ৯.২০

দেবরাজ

নিরুদ্দেশ রহস্য

এক মাস আগেও দক্ষিণ কোরিয়ার বাইরে কিম দায় জুং-এর নাম বিশেষ কেউ জানতো না তাঁর দু' পাঁচ জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া। দু' বছর আগে ১৯৭১ সালে যখন দক্ষিণ কোরিয়াতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় তখন সে ভোটযুদ্ধে যিনি জিতেছিলেন সেই পার্ক চুং হীর সঙ্গে এক হাত তিনি শুধু লড়ে যাননি, পার্ককে রীতিমত বেগ দিয়েছিলেন। সে নির্বাচনে তাঁর বাক্সে ভোট পড়েছিল ৪৬ শতক। খুব বেঁচে গিয়েছিলেন সেবারে রাষ্ট্রপতি পার্ক চুং হী। দেশে-বিদেশে লোকে তারিফ করেছিল কিমের। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছিল, এর পরের বারে বাজীমাত তিনিই করবেন, বসবেন পার্ক চুং হীর পরে রাষ্ট্রপতির গদিতে। তেমন আশা কিম নিজে কিন্তু করেননি। তিনি বলেছিলেন পার্ক চুং হীর যা মতিগতি তাতে দক্ষিণ কোরিয়ায় গণতন্ত্র টিকলে হয়, কোনদিন তিনি না দেশে একনায়কত্ব পত্তন করে ক্ষুদে ডিক্টেটর বনে যান। কিম জোর গলায় বলেছিলেন, দক্ষিণ কোরিয়ায় স্বৈরাচারী শাসন রোখবার জন্যে তিনি আপোসহীন লড়াই চালিয়ে যাবেন।

তারপর কিমের সাড়াশব্দ বিশেষ পাওয়া যায়নি কী দেশে কী বিদেশে। পার্ক এখন দক্ষিণ কোরিয়ায় সর্বেসর্বা যদিও গণতন্ত্র বাতিল করে একনায়কত্ব সে দেশে তিনি চালু করেননি। তবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোনও দেশেই বিরোধীদের সরকার সুনজরে দেখেন না, তাদের ইচ্ছে মতো রাজনৈতিক কাজকর্ম করতেও দেন না। বিনা বিচারে তাদের আটক রাখা এ সব দেশে কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। পার্ক সরকার অবশ্য কিমকে গারদে পোরেননি। কিন্তু তাতে বিশেষ ভরসা কিম পাননি। পালিয়ে জান বাঁচাবার পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর দ্বীপান্তরের হুকুম না হলেও তিনি লুকিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বিদেশে, আড্ডা গেড়েছিলেন আমেরিকায়-জাপানে। সে সব দেশ থেকে তিনি মদত দিতেন দেশের সরকার বিরোধী দলগুলোকে আর প্রচার চালাতেন পার্ক সরকারের বিরুদ্ধে। পার্ক চুং হীকে তিনি নাম দিয়েছিলেন এশিয়ার হিটলার। শাসিয়েছিলেন তাঁকে একদিন না একদিন উচ্ছেদ করবেন বলে।

বিদেশে গিয়েও কিন্তু ভয় কাটেনি কিমের। তাঁর ধারণা ছিল পার্ক সরকার তক্কে তক্কে আছেন, সুবিধে পেলেই তাঁকে গুম খুন করবেন নয় জোর করে দেশে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে লটকাবেন। এক শহরে তিনি তাই বেশী দিন থাকতেন না, থাকলেও হোটেল বদলাতেন ঘন ঘন যাতে অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করার সুযোগ তাঁর শত্রুরা কেউ না পায়। মার্কিন সি আই এ-র মতো দক্ষিণ কোরিয়াতেও সি আই এ অর্থাৎ গুপ্তচর সংস্থা আছে, তাদের দাপটও খুব। ১৯৬৭ সনে সতেরো জন দক্ষিণ কোরিয়ার বাসিন্দাকে পশ্চিম জার্মানি থেকে পাকড়ে গুপ্তচর বলে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানীতে তারা পাঠিয়ে দিয়েছিল দেশের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করছিল এই অভিযোগ করে। তা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে পশ্চিম জার্মানিতে। চটে গিয়ে পশ্চিম জার্মান সরকার শাসানি দেন তাঁরা দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের পাট তুলে দেবেন বলে। অনেক কষ্টে সেবার সামাল দেন পার্ক সরকার।

চাল তবুও তাঁরা অবশ্য পাল্টাননি। ও ঘটনার দু' বছর পরে একজন দক্ষিণ কোরিয়ার ধনী ব্যবসায়ীকে বিদেশ থেকে গায়েব করে নিয়ে আসা হয় সিউলে। এমনই ভাবে চুপিসাড়ে বিদেশ থেকে সরকার বিরোধী দক্ষিণ কোরিয়ার বাসিন্দাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার কাহিনী শোনা যায় মাঝে মাঝে। সেই কাহিনীই সকলের মনে পড়লো যখন কারা যেন ৮ আগস্ট বেলা দেড়টার সময় ধরে নিয়ে গেল কিমকে টোকিওর গ্র্যাণ্ড প্যালেস হোটেলের তেইশ তলা থেকে। সে হোটেলে ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার দু' জন রাজনীতিক—ইয়াং ইল ডং, আর কিম কিয়ং। এঁরা দু' জনেই দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার বিরোধী ডেমোক্র্যাটিক ইউনিফিকেশান পার্টি অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সংযুক্তিকরণ দলের চাঁই। সে দলের প্রধান ইয়াং ইল ডং। তাঁদের সঙ্গে খানাপিনা আর সলা পরামর্শ করার জন্যে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল কিমকে। খানাপিনা সেরে বাইরে যেই তিনি পা দিয়েছেন পাঁচ জন লোক তাঁকে নিয়ে পুরে ফেললেন পাশের একটা ঘরে, আটক করে রাখলো তাঁর দুই বন্ধুকে।

বন্ধুরা যখন ছাড়া পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন তখন পাখী উড়ে গেছে। হৈ চৈ পড়ে গেল জাপানে। সবাই বললো এ পার্ক সরকারের সি আই এ-র কীর্তি। তাঁরা কিন্তু কথাটা বেমালুম অস্বীকার করলেন, উলটে অনুরোধ জানালেন জাপানী সরকারকে চটপট খুঁজে বের করতে কিমকে। পাত্তা তাঁর পাওয়া গেল তবে টোকিওতে কী অন্য কোনও জাপানী শহরে নয়, খোদ দক্ষিণ কোরিয়ায় সিউলে, কিমের নিজের বাড়ীতে ১৩ আগস্ট। যারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল, খেতে দেয়নি, ঘুমোতে দেয়নি, এমন কী খুন করবে বলে শাসিয়েছিলও। তাঁকে হোটেল থেকে পাকড়াও করে ঘণ্টা পাঁচেক লুকিয়ে রাখে জাপানে, তারপর জাহাজের খোলে হাত পা চোখ বেঁধে ফেলে রেখে নিয়ে আসে সিউলে। সেখানে চোখ বেঁধে তাঁকে ছেড়ে দেয় তাঁর বাড়ীর সদর দরজার সামনে রাত সাড়ে দশটায়। এখনও তিনি নিজের বাড়ীতেই আছেন, কিন্তু একরকম বন্দী হয়ে। বাইরে বেরুবার তাঁর হুকুম নেই। তাঁকে বাঁচবার জন্যেই নাকি এই ব্যবস্থা।

কারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল কিমকে? ছেড়েই বা তাঁকে দিল কেন খুন না করে? কিম বলছেন তারা বলেছে তারা জাতীয় মুক্তি সমিতির সভ্য, কিমকে তারা গুম করেছে তিনি দেশদ্রোহী বলে। কিম যখন তাদের বলেন, তিনি সরকারের বিরোধী দেশের শত্রু নন তখন তারা নাকি বলে ও একই কথা। অমন কোনও গুপ্ত সমিতির খবর কিন্তু কেউ জানে না। কী করে তারা যে কড়া সরকারী পাহারা এড়িয়ে কিমকে নিয়ে এলো দক্ষিণ কোরিয়ায় সে-ও এক রহস্য। কেউ বলছে এটা কোরিয়ার সি আই এ-র কাজ, সব জেনেশুনে পার্ক সরকার ন্যাকা সাজছেন। কিমেরও নাকি তাই ধারণা যদিও স্পষ্ট করে সে কথা তিনি বলেননি। তাঁর বিশ্বাস তিনি যে বেঁচে গিয়েছেন তা নেহাত ভগবানের দয়া। কেউ কেউ আবার বলছেন এর মধ্যে উত্তর কোরিয়ার হাত আছে। যে ঘর থেকে লোপাট হন কিম সেখানে উত্তর কোরিয়ার তৈরি সিগারেট পাওয়া গেছে এ অভিযোগ উত্তর কোরিয়ার সরকার আজগুবি বলে উড়িয়ে দিয়েছে। আর একদল বলছেন সব ব্যাপারটা সাজানো, কিমই আগাগোড়া ঘটনাটা সাজিয়েছেন পার্ক সরকারের বদনাম করার জন্যে। এ সব রাজনীতির খেলা—সরকার বিরোধী এক চতুর প্রচার।

মৌসুমী-র ঘোষণা

এবার পূজার বিশেষ আকর্ষণ

অমিতাভ চৌধুরী-র লেখা

রবীন্দ্রনাথের অখ্যাত দাদা-রা

রবীন্দ্রনাথের এক দাদা পুকুরে ডুবে মারা যান, আর এক দাদাকে বেঁধে রাখা হত ঘরে, আর একজনের ধারণা, তাঁর লেখা চুরি করেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান। অনেক অজ্ঞাত তথ্যে সমৃদ্ধ অপ্রকৃতিস্থ দাদাদের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

শীঘ্রই বেরুচ্ছে!

মৌসুমী প্রকাশন, ১০/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

১৩৮০ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ শারদীয়া

কেন এ সংখ্যাটি আপনি কিনবেন?

এক অ জগতের বিতর্কিত লেখক সমরেশ বসু ডিটেকটিভ পত্রিকা জগতে সর্ব প্রথম কলম ধরছেন।

দুই যাঁর লেখা শুধু পাঠক মনে হাসির ফোয়ারা এনে দিয়েছে সেই রসিক লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর নতুন গোয়েন্দা নভেলেট, এই প্রথম ডিটেকটিভ পত্রিকায় লিখছেন। এবার দেখুন রসরাজের গোয়েন্দা কিসে কি করে বসে। তবে হাসতে আপনাকে হবেই।

তিন কবিতা রচনায় যাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল। সেই কবিতা সিংহের রহস্য কাহিনী।

চার প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই সংখ্যার লেখাটি একটি অমর সৃষ্টি।

পাঁচ সিলেবর নরমুণ্ড শিকারীদের ফটোগ্রাফসহ বীভৎস কাহিনী।

ছয় নীহাররঞ্জন গুপ্তের অমর গোয়েন্দা কিরীটি রায় এবার অবসর নিচ্ছেন। কিরীটির কর্মজীবনের সর্বশেষ উপন্যাস এই সংখ্যাটিতে স্থান পাচ্ছে।

সাত বর্স্টপসাস, ড্রাকুলার সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন ও ড্রাকুলার ভয়াল ভয়ংকর জীবনের সমাপ্তি।

আট জেমস হেডলি চেজের অনন্য সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক রহস্য উপন্যাস।

নয় অপরাধ জগতের দুষ্প্রাপ্য রঙীন ফটোগ্রাফ, যা আজও কোন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় নি।

দশ সমস্ত লেখাই গতানুগতিক পথ থেকে নতুন পথে বাঁক নিচ্ছে।

মোট কথা এই সংখ্যাটি ডিটেকটিভ পত্রিকা জগতে সাইক্লোনের সৃষ্টি করবে।

ক্রাইম :: ৯১/৩/১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

(দে ৮৬৯০)

হোক, বেশী লোক পড়ুক। এখন, দেশের অধিকাংশ পাঠকই যদি বক্তব্যপ্রধান রচনা চান, তবে তাঁরাও কড়া বক্তব্যমূলক বই ভুরি ভুরি লেখেন না কেন?

কারুর কারুর ধারণা লেখকরা আসলে কোনও কোনও সম্পাদক বা প্রকাশক বা এস্টাব্লিশমেণ্টের কাছে আত্মবিক্রয় করে থাকে। তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী লেখে। এটা যে অত্যন্ত ভুল ধারণা তা বলাই বাহুল্য। যে লেখকের বই বিক্রী হয় না বা জনপ্রিয়তা কমে যায়—তাহলে এস্টাব্লিশমেণ্ট তাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দেয়।

এক শ্রেণীর লেখক কড়া বক্তব্যমূলক বইও লেখেন। তাঁদের বই জনপ্রিয় হয় না কেন? কেন এই ধরনের কোনো সত্যিয় তাঁদের নাম শোনা যায় না? কেন এই সব পাঠকরা বলেন না, আমরা আপনাদের বই আর পড়বোই না, এবার থেকে পড়বো শুধু অমুক অমুকের লেখা যাঁর লেখা সৎ উপদেশে ভর্তি?

তাহলে কি ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে, এখনকার যুবকরা প্রেমের কাহিনীই পড়ে এবং সন্তুষ্ট হয়। আর যে-সব বইতে সমাজ সংগঠনমূলক বক্তব্য থাকে সেগুলো ছুঁয়েও দেখে না?

রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা জীবনানন্দ দাশের কবিতা কিংবা 'শস্যের কবিতা' বা পুতুল নাচের ইতিকথার মতন উপন্যাস কিংবা হ্যামলেট বা ওয়েটিং ফর গোডোর মতন নাটক—এলোমেলো উদাহরণ দিলাম—এগুলিতে সামাজিক সংস্কারের কোনো বক্তব্যই নেই। সুতরাং এ সব কি আর পড়বার দরকার নেই? আবার এই সব রচনা কি মানুষকে জীবনে সুখী হতে শেখায় না?

সাহিত্য বা শিল্পের মান কি হবে বা নতুনভাবে বদলাবে কি? বর্তমান পর্যন্ত সাহিত্য ও শিল্পের যে মান সেই অনুসারে গোর্কির 'মাদার' কিংবা দীনবন্ধু মিত্রর নীলদর্পণ-এর সামাজিক উপযোগিতা থাকলেও লেখাটি উচ্চস্তরের সৃষ্টি নয়। এগুলিকে বলা যায়, টাইম সার্ভার। অথচ প্রতিটি লেখকেরই আগ্রহ থাকে, পারুক বা না পারুক শিল্প সৃষ্টি করবারই।

মানুষের প্রেম যদি পৃথিবীর কোনও ক্ষতি না করে তা হলে প্রেমের কাহিনী কি কারুর ক্ষতি করে? প্রেমের কাহিনী যদি দারিদ্র্য, বেকারত্ব বা বিপ্লবের স্বপ্নকে ভুলিয়ে দেয় কারুর মন থেকে, তাহলে কি স্বীকার করতে হবে না যে ঐ সব মন বিস্মরণের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল? নীতি কথাতেও ওরা জাগরিত হয় না!

এই সব প্রশ্নই শুধু আমার মনে জাগে। উত্তর জানি না।

সনাতন পাঠক

কুলকন্যা

কালী সরকার

অস্তায়মান সূর্যের তির্যক রশ্মির রক্তিম আভা কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োকে করে তুলেছে স্বর্ণময়। সেই স্বর্ণময় আভা ছড়িয়ে পড়ছে হিমকূট পর্বতমালায়। ধূসর ড্রাগনের ধোঁয়ার মত নীচের দিক থেকে উঠে আসছে কুয়াশা, উপরের আকাশে কালো মেঘ। বাতাস বয়ে চলেছে জোরে। সে বাতাস ঠেলে তুলছে কুয়াশা—ঢেকে দিচ্ছে সামনের পর্বতমালা, গাছ বাড়ী—সব কিছু। নীচের ঘন কুয়াশা উপরে এসে ক্রমে দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যেন মিলিয়ে দিতে লাগল অনন্ত বিশ্বে। চারিদিকের ঘন কুয়াশায় সমস্ত পৃথিবী যেন বিচ্ছিন্ন। সেই মিলিয়ে যাওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেওবাহাদুর তার বসার ঘরের জানালা দিয়ে। খোলা জানালা দিয়ে কুয়াশা এসে ঘর ভরে দিচ্ছে। কোন দিকে খেয়াল নেই দেওবাহাদুরের। শুধু একটা কথা তোলপাড় করছে তার বুকের মধ্যে। সেই অব্যক্ত কথাটির ব্যথায় মাঝে মাঝে সে বলছে অস্পষ্ট স্বরে—না, এ হতে পারে না। কিছুতেই না।

খোলা জানালার পাল্লাটা বাতাসের ধাক্কায় দেয়ালে লেগে শব্দ করছে—ঘট্‌ ঘট্‌। বৃষ্টির ছাট এসে দেওবাহাদুরের মুখে পড়লেও খেয়াল নেই। সে তখনও উদাস ভাবে তাকিয়ে আছে কুয়াশায় ঢেকে যাওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে। তার চারপাশের পৃথিবী আজ যেন অচেনা। দূরে গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। মনমায়া ঘরে ঢুকে একবার দেওবাহাদুরের দিকে, একবার খোলা জানালাটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে জানালার ছিটকিনিটা দিয়ে বললো, ঘরে জল ঢুকছে খেয়াল নেই? চুপচাপ বসে কি ভাবছ?

যেন সম্বিৎ চেতনা ফিরে পেয়েছে এমনভাবে একবার মনমায়ার দিকে তাকিয়ে দেওবাহাদুর সামনের টেবিলের সিগারেট

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে আগুনে ধরিয়ে উত্তর দিল, না, কিছু না। বসন্তের কথাটা ভাবছিলাম।

মনমায়া সামনের একটা চেয়ারে বসল, বললে, বসন্তের কথা এতে কি ভাববার আছে! আজকাল আকছার এসব হচ্ছে। তোমার রাজী না হবার কোন কারণ দেখি না।

দেওবাহাদুর একদৃষ্টে মনমায়ার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর গম্ভীর গলায় বললে, এ হতে পারে না। আমি কিছুতেই এ হতে দেব না।

অবাক বিস্ময়ে মনমায়া দেওবাহাদুরের মুখের দিকে কোন কথা না বলে তাকিয়ে ভাবতে থাকে। তারপর উঠে চলে যায়।

বসন্তের কাছ থেকে আজ কথাটা শোনার পর থেকেই দেওবাহাদুরের মনে শুরু হয়েছে কালবৈশাখীর ঝড়। সে যেন পাগল হয়ে যাবে। আগে কিছু কিছু সন্দেহ করেছে, লক্ষ্যও করেছে—কিন্তু দুর্যোগ যে এত তাড়াতাড়ি আসবে দেওবাহাদুর ভাবতে পারেনি। ভেবেছিল সমস্যার সমাধান সে করে ফেলবে। তার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু আজ বসন্ত নিজে থেকে তাকে কথাটা বলাতে তার সমস্ত কিছু পরিকল্পনা বানচাল হতে চলেছে। বসন্তের প্রস্তাবে দেওবাহাদুর ফেটে পড়েছে রাগে, গালাগাল করেছে—কিন্তু রাজী না হবার কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। দেওবাহাদুর জানে তার না বলার কারণ সে মনমায়া বা বসন্ত কাউকেই দিতে পারবে না। এত বছর পরে সে কথা আজ দেওবাহাদুরের পক্ষে প্রকাশ করাও সম্ভব নয়।

বসবার ঘর। বেশ বড়ই। এক পাশে সোফা সেট, জানালার কাছে বড় কাঠের টেবিলের উপর টাইপ মেশিন আর টেবিলটাকে ঘিরে ছখানা নরম গদি দেওয়া কাঠের চেয়ার। দেওবাহাদুর ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। মাঝে মাঝে দু হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরেছে। তার মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে যেন আগুনের হলকা। পায়চারি করছে, আর বিড়বিড় করে বলছে না এ হতে পারে না—হতে পারে না। দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধা কয়েকটা ছবি। পায়চারি করতে করতে দেওবাহাদুর একটা ছবির সামনে এসে দাঁড়ায়। অনেক বছর আগে তোলা ছবি। ছবির দিকে তাকিয়ে দেওবাহাদুর ভাবতে থাকে। মনে মনে হিসাব করে—হ্যাঁ, প্রায় পঁচিশ বছর হবে। তার কনট্রাকটারী জীবনের প্রথম কাজ শেষ করার ছবি। তার জীবনের এ ছবির মূল্য অনেক। সস্তা ক্যামেরায় তোলা ছবি। ছবিতে বিশেষ কিছু নেই। প্রায় দশ-বার জন মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে দেওবাহাদুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। পেছনে পাহাড়ের একটা দিক, কয়েকটা ধুপী গাছের মধ্যে।

সস্তা ক্যামেরায় তোলা এই ছবিটি দেওবাহাদুরের জীবনের এক বড় অংশের ইতিহাস। ম্যাট্রিক পাস করার পর ছোটখাট কয়েকটা চাকরি দেওবাহাদুর করে, কিন্তু তার মন বসে না। বয়স বাড়তে থাকে, বিয়েও হয়ে যায় মনমায়ার সাথে। দুটি মেয়ের পর বসন্ত জন্মাবার সাথে সংসারের বাড়তি খরচ মেটাতে দেওবাহাদুর হয়ে পড়ল বিব্রত। মনে মনে ভাবে একটা কিছু উপায় করতেই হবে অনেক টাকা রোজগার করতেই হবে। এমনি এক দিনের বিকেলে দেওবাহাদুর মাঠের একটা কোণে বসে চুপচাপ ভাবছিল সংসারের দারিদ্র্যের কথা। ভগবান যেন সেদিন তার কাছে এনে দিল তার স্কুলের বন্ধু জঙ্গবাহাদুরকে। দেওবাহাদুর জানত জঙ্গবাহাদুর ম্যাট্রিক পাস না করেই তার বাপের সঙ্গে কনট্রাকটারী করে এর মধ্যেই অনেক পয়সা করেছে। একটা দামী স্যুট পরে জঙ্গবাহাদুর মাঠ দিয়ে কোথায় যেতে যেতে হঠাৎ চোখ পড়ে বোধ হয় দেওবাহাদুরের উপর। পাশে দাঁড়িয়ে বলে আরে, দেওবাহাদুর কি করছিস বসে?

ম্রিয়মাণ দেওবাহাদুর বহু কষ্টে একটু হেসে বললে, কি আর করব ভাই, চুপচাপ বসে আছি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একবার জঙ্গবাহাদুরকে ভালভাবে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—তোকে দেখাই যায় না। আজকাল কোথায় কাজ হচ্ছে তোর।

দেওবাহাদুরের কাঁধে একটা হাত রেখে জঙ্গবাহাদুর বললে—নানা জায়গায় ভাই; আর সামলে দিতে পারছি না। তারপর দেওবাহাদুরের একটা হাত ধরে বেঞ্চিতে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আজকাল কি করছিস

শিকলি কাটা পাখি	আশাপূর্ণা দেবী	৫·০০
বেকসুর খালাস	অমরেন্দ্র দাস	৫·০০
রহস্যের অন্তরালে	নিশাচর	৫·০০
গোয়েন্দার দপ্তর	অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫·০০
পারিজাত রহস্য	চিরঞ্জীব সেন	৬·০০
মাটির পুতুল	শক্তিপদ রাজগুরু	৬·০০
তমসা	ঐ	৬·০০
মুক্ত ত্রিবেণী	ঐ	৫·০০
সামনে সাগর	ঐ	৫·০০
পথের পানে চেয়ে	ঐ	৫·০০
চেনামুখ	ঐ	৩·০০
আমায় বাঁচতে দাও	বেদুইন	৮·০০
রাজনীতির পটভূমি	বেদুইন	৮·০০
নর্তকীর আত্মকথা	ঐ	৮·০০
বিক্ষোভ বিদ্রোহ বিপ্লব	ঐ	৮·০০
কলকাতার ইতিকথা	ঐ	৮·০০
মোজাম্বিক	ঐ	৬·০০
হারেম থেকে বলছি	[illegible]	৭·০০
দুর্ধর্ষ তাতার	ঐ	৬·০০
দেব দেউলে ভারত	ঐ	৪·০০
স্ব-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠগল্প	মণিলাল বন্দ্যোঃ	১০·০০
বাসর বাসনা	প্রাণতোষ ঘটক	৬·০০
বহুদর্শীর নকশা	বহুদর্শী	৬·০০
অরণ্য আদিম	[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়	৫·০০
ত্রয়ী	বিবেক মৈত্র	৪·০০
লুপ্ত গান্ধার	নটরাজন	৬·০০
বলয়গ্রাস	ঐ	৫·০০
নেপথ্য নায়িকা	সুনীলকুমার ঘোষ	৫·০০
প্রণয় বিচিত্রা	বিভূতিভূষণ মুখো:	৪·০০
ঝোড়ো হাওয়া	সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮·০০

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস । [illegible], কলেজ রো, কলিকাতা—৯

অন্যান্য দিনের মত এও একটি দিন...অথচ ঠিক যেন তা নয়। আপনি চান যদি আপনার এমন একজন বন্ধু থাকতো যে আপনার অসুখের কথা বুঝতে পারে। যে আপনাকে ব্যথাবেদনা, অস্বাচ্ছন্দ্য ও অবসাদ থেকে রেহাই দিতে পারে। এমন একজন বন্ধু যে এদিনের অসুখের কথা ভুলিয়ে দিতে আপনাকে মুহূর্তে সাহায্য করতে পারে। আপনার এরকম একজন বন্ধু হতে পারে একমাত্র মাইক্রোফাইন করা অ্যাসপ্রো যেটি গ্রহণ করলে আপনার সব যন্ত্রণা থেকে দ্রুত আরাম পাওয়া যায়। অ্যাসপ্রো অনেক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করে কারণ তা মাইক্রোফাইন করা। এর আরামদায়ক উপকরণগুলিকে ৩০ গুণ সূক্ষ্ম করা হয়েছে যাতে শরীর আরও তাড়াতাড়ি সেগুলি গ্রহণ করতে পারে, যাতে আরও দ্রুত ও আরও বেশিক্ষণ আরাম পাওয়া যায়। আজ যতরকম পাওয়া যায় তারমধ্যে অ্যাসপ্রো হচ্ছে সবচেয়ে আধুনিক ধরণের ব্যথাবেদনা উপশমকারী। ছিমছাম কয়েন স্ট্রিপে এটি পাওয়া যায়।

**মাইক্রোফাইন করা অ্যাসপ্রো ব্যথাবেদনা দূর করে
ও তাড়াতাড়ি অস্বাচ্ছন্দ্য কমায়**

অ্যাসপ্রো রাখুন—খুশিতে থাকুন

নিকোলাস এর তৈরী

তুই? তোর চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। অসুখ করেছিল না কি?

ম্লান হেসে দেওবাহাদুর বললে, না ভাই, অসুখ করেনি। তিনটে ছেলেমেয়ে তারপর মা আর বোন—সংসার চালাতে পারছি না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ভক্তবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুই কিছু করতে পারিস ভাই?

কনট্রাকটারী কর না।

হাত নেড়ে দেওবাহাদুর উত্তর দেয়—দূর! কনট্রাকটারী করব কি? কনট্রাকটারীর কিছু জানিও না আর তার উপর সে পয়সাও নেই।

হুঁ, বলে ভক্তবাহাদুর চুপ করে যায়। একটু ভেবে, তারপর বললে—তুই যদি সত্যিই করতে চাস তবে টাকা-পয়সার জন্য ভাবতে হবে না। আমি ডিসট্রিকট বোর্ডের রাস্তার একটা কাজ পেয়েছি পেডংয়ের দিকে। তুই যদি কাজ করতে চাস তবে তোকে সাব-কনট্রাকটারী দেবো। টাকা-পয়সা আমি প্রথম দিকে দিয়ে তোকে সাহায্য করব।

এর পরেই আরম্ভ হয় দেওবাহাদুরের কনট্রাকটারী জীবন। কি কষ্টই না করেছে দেওবাহাদুর। দার্জিলিং থেকে হেঁটে কালিমপং, তারপর ওখান থেকে হেঁটে আরও কুড়ি মাইল। কনট্রাকটারী জীবনের তার প্রথম কাজ ছিল সামান্য মাটি কাটার। মোট আট জন কুলি নিয়ে নিজেও মাটি কাটত। থাকত রাস্তার পাশে বাঁশ আর গাছের পাতা দিয়ে তৈরী খুপরীর মধ্যে। সকালে খেত চা আর খানিকটা ভুট্টা ভাজা। রাতে খেত ভাত আর শাক। হ্যাঁ, সেবার দু মাস কাজ করেই দেওবাহাদুরের লাভ হয়েছিল পাঁচ শ টাকার উপর।......

দেওবাহাদুর তাকিয়ে থাকে ছবিটার দিকে। ছবিতে যারা আছে সকলকেই দেওবাহাদুর ভুলে গিয়েছে। ভুলতে পারেনি শুধু ধনকুমারীকে। তার প্রথম কনট্রাকটারীর খুপরীর জীবনে কি যত্নই না করেছে ধনকুমারী। ধনকুমারী না থাকলে সেবার রক্তামাশয় রোগে বোধ হয় মরেই যেত দেওবাহাদুর। ছবিটার মধ্যে মাটির দিকে চোখ নামান বাইশ বছরের মুখটির দিকে দেওবাহাদুর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে দেওবাহাদুরের চোখ দুটো আবছা হয়ে আসে দু চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল নামতে থাকে গাল বেয়ে। চোখের জল হাত দিয়ে মুছে ফিসফিস করে দেওবাহাদুর বললে—ধনকুমারী, আমার কথা রেখেছি। তোমার মেয়েকে বড় করেছি' মানুষ করেছি। এম এ পাস করে সে দাঁড়িয়েছে নিজের পায়। তুমি কোন চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখে নিও আমি সব ঠিক করে দেব।

দেওবাহাদুর অকৃতজ্ঞ নয়। তার কুলিরা সবাই তাকে ভালবাসে দয়ালু বলে। ধনকুমারীর সেবার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রেখেছে দেওবাহাদুর। তার কনট্রাকটারী জীবন শুরু করার দু বছর পর ধনকুমারী মারা যায় এক মেয়ের জন্ম দেবার পরই। দেওবাহাদুর যত্নে সে মে[illegible]ক কোলে তুলে নেয়। সকলে বলে—ঠিকাদার সাহেব এই কামীর মেয়ে নিয়ে তুমি কি করবে? তুমি ছেত্রী, তোমার ঘরে ও মানুষ হতে পারবে না। অন্য কোন কামীকে দিয়ে দাও। তুমি বরং খরচা দিয়ো।

তাই করেছিল দেওবাহাদুর, মেয়ের নাম রেখেছিল বিমলা। পরে বিমলাকে মিশনারী স্কুলের হোস্টেলে রেখে বড় করে। এম এ পাস করে চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত সব খরচই দেওবাহাদুর যুগিয়েছে। বিমলার কোন কষ্ট হতে দেয়নি। বুঝতে দেয়নি তার মা নেই, বাবাও নেই। বিমলাকে মানুষ করেছে নিজের মেয়ের মত। বিমলাও দেওবাহাদুরকে ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে আপন বাবার মত। বিমলার এম এ পাসের খবর আসার পর দেওবাহাদুরের সে কি আনন্দ!! রাস্তায় যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই বলে—আমার বিমলা মা এম এ পাস করেছে।

নেতাজী স্পিকস্

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাষণ ও রচনা ইংরাজীতে ও বাংলায় সুলভ মূল্যে প্রকাশের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা জয়শ্রী প্রকাশন করছে।

প্রথম খণ্ড (ইংরাজী) প্রকাশিত হয়েছে আজই সংগ্রহ করুন। প্রতি খণ্ড সাধারণ ৪, বাঁধাই ৫। শুধুমাত্র গ্রাহকরাই প্রতি খণ্ডে ২০% কমিশন পাবেন।

জয়শ্রী প্রকাশন, ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬ ও জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

(সি ৮৩১১/২)

লাইব্রেরীর জন্য মনের মতো বই

সমরেশ বসুর	বরুণ সেন-এর
বিকালে ভোরের ফুল ৫·০০	রক্তাক্ত একুশে ৫·০০
ভানুমতীর নবরঙ্গ ৯·০০	ইয়েনান থেকে শ্রীকাকুলাম ৯·০০
ছেঁড়া তমসুক ৫·০০	হো চি মিন ও ভিয়েতনাম ৭·০০
ছুটির ফাঁদে ৬·০০	আমরা কোথায় চলেছি ১২·০০
তিন ভুবনের পারে ৫·০০	সাজানো সেনাপতি ৯·০০
রূপকথা ৪·৫০	জতুগৃহের জ্বালা ৯·০০

বন্দী পরবাস ॥ উপন্যাস ॥ মানস গুহ ॥ ৯·০০
এক ফোঁটা বিষ ॥ সায়ান্স ফিকশন ॥ সমরজিৎ কর ॥ ৬·০০
সেরা সেরা খেলোয়াড় ॥ ক্রীড়া-বিষয়ক ॥ চিরঞ্জীব ॥ ৬·০০
পৃথিবী থেকে চাঁদে ॥ বিজ্ঞান-বিষয়ক ॥ সমরজিৎ কর ॥ ১৫·০০
দুঁপা থেকে ব্যোমকেশ ॥ রহস্য ॥ কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৫·০০
লাভার্স লেন ॥ উপন্যাস ॥ শ্রীপারাবত ॥ ১০·০০
বাঁশীধ্বনি বেণুবনে ॥ ভ্রমণ ॥ কালকূট ॥ ৫·০০
যুবক যুবতীরা ॥ উপন্যাস ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৭·০০
সর্পিল ॥ উপন্যাস ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ ৫·০০
জীবনের জটিলতা ॥ উপন্যাস ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৪·০০
কানোজি আংরে ॥ অভিযান ॥ চিরঞ্জীব ॥ ৮·০০
নায়ক আমি ॥ উপন্যাস ॥ বীরু চট্টোপাধ্যায় ॥ ৬·৫০
ভূস্বর্গের পথে ॥ ভ্রমণ ॥ বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৭·০০
প্রত্যাবর্তন ॥ উপন্যাস ॥ সুনীল সরকার ॥ ৬·০০
একাকী অন্ধকারে ॥ ঐতিহাসিক উপন্যাস ॥ দ্বৈপায়ন ॥ ৭·০০
কমবোডিয়া ॥ রাজনৈতিক ॥ অমিতাভ রায় ॥ ৯·০০
হারেমের কোহিনূর ॥ ঐতিহাসিক উপন্যাস ॥ দ্বৈপায়ন ॥ ৬·০০

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ ১৫/২এ কলেজ রো ॥ কলকাতা-৯

(সি ৮৩১৮)

ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। দেওবাহাদুরের বাড়িতে সপ্তাহ ধরে চলল সেই আনন্দ উৎসব—যে উৎসব নিজের ছেলে বসন্ত পাস করার সময় হয়নি। দেওবাহাদুরের কয়েকজন কনট্রাকটার বন্ধু ওর বসার ঘরে বসে গ্লাসে গ্লাস ঢালতে ঢালতে বললে,—ডি বি, তুমি কামী কুলির মেয়ের জন্য যা করলে, এ কেউ করে না।

বন্ধুদের কথা শুনে দেওবাহাদুর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বলে—কামী কি ভাই, মানুষের আবার জাত কি। আমি ওসব মানি-টানি না। মানুষের জন্য মানুষ না করলে কে করবে

দেওবাহাদুরের বন্ধুরা চুপ করে যায়। তাকে রাগাতে সাহস পায় না। দেওবাহাদুর এখন ফার্স্ট ক্লাস কনট্রাকটার। বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। সকলেই দেও-বাহাদুরকে দানশীল উদার লোক বলে ভাল-বাসে, শ্রদ্ধা করে। তার মতামতকে দাম দেয়

বন্ধুরা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—তা ভাই তুমি যা বলেছ খাঁটি কথা। তোমার মত এমন উদার মানুষ কজন আছে বল।

হেসে দেওবাহাদুর বলে—ভাই আমি মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ বিশ্বাস করি না। তোমরা জান এ বিশ্বাস করি বলেই আমার এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছি লিম্বু ছেলের সঙ্গে আর এক মেয়ে কলকাতায় এক বাঙ্গালী ছেলেকে বিয়ে করেছে। একটু থেমে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আবার বলে—তোমরা আমার দুই জামাই সম্বন্ধে জান। ভাল ছেলে, ভাল কাজ করে—ব্যাস তাই যথেষ্ট। জাত-মাত কি? মানুষের রক্তে কি জাত লেখা আছে?......

দেওবাহাদুর আবার এসে ছবির কাছে দাঁড়ায়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ধনকুমারীর দিকে। বিড়বিড় করে আপন মনেই ছবির দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে—এ হবে না, হতে পারে না। বনকুমারী তুমি দেখে নিও আমি সব ঠিক করে দেবো। তুমি কিছু ভেবো না।

মনমায়া কখন ঘরে আবার ঢুকেছে দেও-বাহাদুর টের পায়নি। দেওবাহাদুরকে আপন মনে বিড়বিড় করতে দেখে মনমায়া বললে, কি বকছ আপন মনে?

—না, কিছু না। বলে দেওবাহাদুর সোফাটায় গিয়ে বসে।

মনমায়া পাশে বসে দেওবাহাদুরের একটা হাত টেনে নিয়ে আঙ্গুলগুলো নাড়তে নাড়তে বললে, জান, বসন্ত খুব মনমরা হয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে। বেচারী আজ দুপুরে কিছু খায়ও নি।

দেওবাহাদুর কোন উত্তর দেয় না। শুধু বলে, হুঁ।

খানিকটা কুপিত স্বরে মনমায়া বলে ওঠে—তুমি তো খালি হুঁ হুঁ করছ। কিন্তু আমি তোমার আপত্তির কোন কারণ দেখছি না। মেয়েদের বিয়ের বেলায় তোমার কোন আপত্তি হয়নি অন্য জাতে বলে—আজ ছেলের বেলায় কামী মেয়ে বলে আপত্তি?

কোন উত্তর না দিয়ে দেওবাহাদুর বড় বড় চোখ করে মনমায়ার দিকে তাকায়। তার-পর মাথা নীচু করে আবার ভাবতে থাকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর মন-মায়া আবার বললে, আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি এতে খুশীই হবে। বসন্তের সাথে বিমলার কি সুন্দর মানাত। ছোট থেকে বেচারী এ বাড়িতে আসে—আমারও ঠিক মেয়ের মত। স্কুল-কলেজে পড়বার সময় ওদের সকলে এক বাড়ির ছেলেমেয়ে বলেই ভাবত। অনেকেই বলত, ভাই-বোন।

দেওবাহাদুর "আঁ" করে একটা শব্দ করে উঠল। তার সমস্ত শরীর দিয়ে যেন একটা তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল। একটা ঝটকা দিয়ে দেওবাহাদুর সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আবার খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল মনমায়ার মুখের দিকে। তারপর আর একবার দেয়ালের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রাস্তায় বের হবার দরজার দিকে আস্তে আস্তে এগুতে থাকে।

মনমায়া তাড়াতাড়ি তার পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলে, এই সন্ধ্যাবেলায় বৃষ্টির মধ্যে কোথায় চললে?

—বাইরে।

—বাইরে? কোথাও কোন জরুরী কাজ আছে না কি?

—হুঁ।

মনমায়া দেওবাহাদুরের একটা হাত ধরে বললে, তোমার এখানেই কি যেন জরুরী কাজ আছে বসন্ত বললে। আমাকে বলতে বলেছে তোমার টেবিলে কি সব কনট্রাক্ট ফর্ম ঠিক করে রেখেছে। তোমাকে দেখতে বলেছে।

ভ্রূ কুঁচকে একবার টেবিলের দিকে, একবার মনমায়ার দিকে দেওবাহাদুর তাকাল। তার মনে পড়ল একটা দশ লাখ টাকার টেণ্ডার ফর্ম কাল জমা দিতে হবে। কিন্তু আজ আর তার টেণ্ডার ফর্মের দিকে কোন আকর্ষণ নেই। কাজের কথা তার মন

অবনীন্দ্র রচনাবলী দাম : ১৪.০০

যাঁরা ১০.০০ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হয়েছেন, তাঁরা প্রথম খণ্ড ১৪.০০ টাকার স্থলে ১২.০০ ও অন্যান্য খণ্ডে ২০% কমিশন পাবেন।

চট্‌জলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প ৪.০০

শিবনারায়ণ রায়ের নতুন বই

কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা ৭.৫০

নারায়ণ সান্যালের **নাগচম্পা** ১০.০০ — 'যদি জানতেম' নামে ছায়াচিত্রে আসছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর **জাগরী** — ১২শ মুদ্রণ ৭.০০

চাণক্য সেনের **রাজপথ জনপথ** — নতুন অঙ্গসজ্জায় নতুন সংস্করণ ১০.০০

দেবল দেববর্মার নতুন উপন্যাস **বাড়ি** ৮.০০

বিনয় ঘোষের **বাংলার বিদ্বৎ সমাজ** ৭.৫০

বৈদেশিকী ৫.৫০ ॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ৪.৫০ ॥ প্রমথনাথ বিশী
বাংলা গল্পবিচিত্রা ৫.০০ ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ন ১২.০০ ॥ বিমলকৃষ্ণ সরকার
আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা ১৫.০০ ॥ বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **হাঁসের আকাশ** দাম : ৪.০০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **মন্দাক্রান্তা** দাম : ৬.০০
প্রবোধকুমার সান্যালের **অগ্নিসাক্ষী** দাম : ৪.৫০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **আবার আমি আসব** ২য় মুদ্রণ ৭.০০
বিমল মিত্রের **কথা চরিত মানস** ২য় মুদ্রণ ৬.০০

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা—১২

থেকে মুছে গিয়েছে। দেওবাহাদুরে মনে মনে হাসছে, আর ভাবছে, কি হবে আর কাজ করে—যথেষ্ট হয়েছে। অথচ টেন্ডার জমা দেবার সময় আসলেই দেওবাহাদুরে ক'দিন আগেও তারই চিন্তায় খাবার কথা ভুলে যেত। রাত জেগে হিসাব করত কত পারসেন্ট রেট দিলে কত পারসেন্ট লাভ থাকবে। এই কাজটা পাবার জন্য কত তদবিরই না দেওবাহাদুরে এই কয়দিন ধরে করেছে। মনে মনে হিসাব করে দেখেছে কাজটা পেলে এক লাখ টাকার উপর লাভ থাকবে। কিন্তু না, দেওবাহাদুর মনে মনে ঠিক করে ফেলে। টেন্ডার, কাজ, কনট্রাক্ট অনেক আসবে। এ দশ লাখ টাকার কাজ হাতছাড়া হলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আবার বিড়বিড় করে বলে, এ হতে পারে না। হতে পারে না। মনমায়ার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে, বসন্তকে বলো এখন থেকে সব নিজে দেখতে। আমি ম্যাট্রিক পাস করে এত বড় ব্যবসা গড়ে তুলেছি। ও এম এ পাস করেছে—নিজে সব দেখবে, আমি কিছু দেখব না।

—কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাচ্ছ? বসন্ত সে কাজ করতে পারবে তো? ওকে পাঠিয়ে দাও না? মনমায়ার সুরে আকুলতা ফুটে ওঠে।

—না, তা হয় না। এ বসন্তের কাজ নয়। দেওবাহাদুরে দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে।

মনমায়া ছুটে এসে দেওবাহাদুরের হাত চেপে ধরে। তারপর উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, গাড়ি নেবে না? হেঁটে যাবে?

দেওবাহাদুরে রাস্তার দিকে তাকায়। সমস্ত শহর ঘন কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে। বৃষ্টিও হচ্ছে মুষলধারে। রাস্তা ফাঁকা। মাঝে মাঝে গাড়ি চলেছে রাস্তা দিয়ে সমস্ত আলো জেবলে। বাতাসে একটা সোঁ, সোঁ শব্দ। চড়বড় করে বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ। এই সন্ধ্যাতেই সমস্ত শহর যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

মনমায়া দেওবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললে, এই দুর্যোগের মধ্যে বের হবে। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

অস্ফুটস্বরে দেওবাহাদুর উত্তর দিল, মাথা বোধ হয় এখন আমার সব থেকে পরিষ্কার। রাস্তায় নামার জন্য পা বাড়াতে বাড়াতে আপনমনে বললে, উপায় আমি খুঁজে পেয়েছি।

ঘরের মধ্যে ঢুকতে মনমায়া চিৎকার করে বললে, এক মিনিট দাঁড়াও—আমি ছাতা আর বর্ষাতি নিয়ে আসছি।

দেওবাহাদুরে একবার মনমায়ার দিকে ঘুরে দেখে রাস্তায় নেমে হাঁটতে আরম্ভ করে। দীপ্ত পদক্ষেপে আপন মনে দেও-বাহাদুর হাঁটছে আর মনে মনে বলছে, আজ বিমলাকে সব খুলে বলতে হবে। হাঁ হাঁ, আমার বিমলা মা বুঝবে। সে বুঝবে কেন হতে পারে না। আর কাউকে তো এ কথা বলা যাবে না। বিমলা জানুক। তার জানা দরকার

দূরে কোথায় যেন বাজ পড়ল কড়-কড় করে। একটা প্রচণ্ড শব্দ। বিদ্যুৎ চমকের আলোতে যেন হঠাৎ একটা লাল আলোর রেশ নেমে এসে সামনের দিকে থেমে গেল।

চমকে দেওবাহাদুরের মনে হল বিদ্যুৎ চমকের আলোয় বিমলার কোয়ার্টার্স যেন সহস্র-লক্ষ আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

দরজা খুলে সামনে দেওবাহাদুরকে দেখে বিমলা ভূত দেখার মত চিৎকার করে উঠল, বললে, বাবু আপনি?

—হ্যাঁ, মা।

দেওবাহাদুরের তখন সমস্ত শরীর গড়িয়ে পড়ছে জল। সিক্ত চুলের রাশি চোখ ঢেকে নাক অবধি এসে পড়েছে। সেখান থেকেও টপ টপ করে জল পড়ছে বিমলার কোয়ার্টার্সের মেঝেতে। দেওবাহাদুরের সিক্ত চোখের জলের ধারা হারিয়ে গেল বৃষ্টির জলের ধারায়। বিমলা দেখতে পেল না। বিমলা তাড়াতাড়ি দেওবাহাদুরের হাত ধরে টেনে একটা চেয়ারে বসিয়ে হিটার জ্বালিয়ে দিয়ে রাগ-রাগ মুখে বললে, আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। এই প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কোথা থেকে আসছেন? একটা ছাতা পর্যন্ত নেননি।

বিমলা দেওবাহাদুরের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে দৌড়ে বাথরুম থেকে একটা তোয়ালে নিয়ে এসে দেওবাহাদুরের মাথা মুছতে আরম্ভ করে দিল। আগের প্রশ্নের জের তুলে আবার বললে, ভিজতে ভিজতে কোথা থেকে আসছেন? অসুখ করে যাবে যে।

হেসে দেওবাহাদুর উত্তর দিল—কিছু হবে না মা। এ শরীর ঝড় বৃষ্টি, রোদ অনেক সহ্য করেছে। তারপর নিজের পাশের চেয়ারে বিমলাকে বসতে বলে খুব কোমল স্বরে বললে, বিমলা মা আমি তোমার কাছে একটা ভিক্ষা চাইতেই এই বৃষ্টির মধ্যে এসেছি।

চমকে উঠে বিমলা দেওবাহাদুরের দিকে তাকায়। এক অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে ওঠে। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসে। সব যেন অন্ধকার। নিয়নের আলোটা যেন নিবে গেছে। সমস্ত শরীর এক অজানা ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। কথা বলার শক্তিও যেন বিমলার নেই। দেও-বাহাদুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেও কিছু দেখতে পায় না। এক অজানা যন্ত্রণার বেদনা তার হৃৎপিণ্ডের চার ধারে ঘুরপাক খেতে থাকে। বার বার মনে হতে থাকে গত সন্ধ্যার বসন্তের কথা। বসন্ত তার হাত দুটি ধরে বলেছিল, মার যখন আপত্তি নেই, তখন বাবারও হবে না—তাই না বিমলা? বাবা তোমাকে নিজের মেয়ের মত দেখেন। তারপর বিমলার আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলেছিল বাবা উদার মানুষ। আমার প্রস্তাবে বাবা খুশীই হবে।

আজ সমস্ত দিন বিমলা গুন গুন করে গান করেছে মনের আনন্দে। মনে হয়েছে এ

প্রকাশিত হয়েছে

বাংলা ক্রাইম উপন্যাস কত দ্রুত টেক্‌নিক পাল্টাচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

অনিল রায়-এর

নতুন উপন্যাস

সোনার পাতায় রক্ত ৮·০০

সাহিত্য সংস্থা, ১৮সি টেমার লেন, কলি—৯

(স ৮৩০৬)

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস : শতাব্দীর মৃত্যু : দাম পনের টাকা : দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল : শুদ্ধসত্ত্ব বসুর রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায় দাম : চোদ্দ টাকা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : স্বাধীনতার স্বাদ : দাম : আট টাকা : নজরুল ইসলাম : কাব্য সংগ্রহ দাম : দশ টাকা : সাধন চৌধুরী : লণ্ডনে ললিতা লাহিড়ী : দাম : সাত টাকা : রঞ্জন সেন : এক দিন অনেক রাত : দাম : পাঁচ টাকা : জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় : বৈষ্ণব কাব্যে প্রেম : দাম : পাঁচ টাকা

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা-৯

পৃথিবীটা কত ভাল, কত মিষ্টি। পাখীর গান, রজত শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা, দূরের গাঢ় সবুজ পাহাড়, দিনের সোনালী রোদ—সব মিলে বিমলার মনে হচ্ছিল জীবনটা যেন কাব্যময়। তার কল্পনার কাব্যময় জীবন কি ছন্দহারা হয়ে পড়বে? দেওবাহাদুরের কথা কি তারই ইঙ্গিত। বিমলা ভাবে। ঘোর কেটে যায়। দেওবাহাদুর আবার জিজ্ঞাসা করে—বল মা তুমি আমাকে একটা ভিক্ষা দেবে তো?

কান্নামাখানো সুরে বিমলা উত্তর দেয়—আপনাকে ভিক্ষা? কি বলছেন? আমি আপনার মেয়ের মত, আমি আপনাকে কি ভিক্ষা দিতে পারি?

ম্লান হেসে দেওবাহাদুর বললে—তুমি আমার মেয়ের মত বললে না? তাই তো তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। তুমিই আমাকে সে ভিক্ষা দিতে পার মা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে বিমলা। কোন উত্তর দেয় না। তারপর মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে বললে বসন্তের সঙ্গে যদি......

একটা হাত তুলে দেওবাহাদুর বিমলাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে—না, না, না আমি সে কথা বলছি না। আমি একটা কথা শুধু বলব যা তুমিই একমাত্র জানবে, পৃথিবীর আর কেউ সে কথা জানবে না। বিমলার মাথায় একটা হাত রেখে ব্যাকুল কণ্ঠে আবার দেওবাহাদুর বললে, এই প্রতিজ্ঞাটা শুধু তোমাকে করতে হবে। আজকে আমি তোমাকে যে কথা বলব সে কথা কাউকে তুমি বলতে পারবে না। একটু থেমে আবার বলে—বসন্তকে কখনই না। বিমলার মুখের দিকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বড় বড় চোখ করে দেওবাহাদুর তাকিয়ে থাকে।

দেওবাহাদুরের কথায় বিমলা আশ্চর্য হয়ে যায়। তাবে, বসন্তের সঙ্গে তার বিয়েতে তবে আপত্তি নেই। এতক্ষণের তার চিন্তা শুধু অমূলক। তার কল্পনার জীবনের ছন্দ হারিয়ে যাবে না। বিমলা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বিমলার মুখে ফুটে ওঠে হাসি। মুখ হয় রক্তিম। একটু নড়ে বসে বিমলা বলে, বলুন, আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।

বিমলা তাকিয়ে [illegible] গভীর চিন্তায় মগ্ন দেওবাহাদুর। সে যেন অন্য জগতে চলে গিয়েছে। বহুদূর থেকে একটা ক্ষীণ কণ্ঠ যেন তার কানে ভেসে আসছে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বহুদিন আগেকার ফেলে আসা জীবনের একটা ছবি। সে ছবি তাকে বিহ্বল করে তোলে। হঠাৎ খাপছাড়াভাবে দেওবাহাদুর বলে ওঠে—বিশ্বাস কর, আমাকে বিশ্বাস কর, তোমার অসম্মান হতে দেবে না।

—কি বলছেন বাবু? দেওবাহাদুরের গায়ে হালকা করে ধাক্কা দিয়ে বিমলা আবার বললে—কি বলছেন বাবু? আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন?

—হ্যাঁ, বোধ হয় স্বপ্নই দেখছি মা। সব কিছু মনে হচ্ছে একটা স্বপ্ন। বিমলার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে দেওবাহাদুর আবার বললে, তুমিই একমাত্র বলতে পার মা এটা কি স্বপ্ন।

বিমলা হেসে বললে, আমি কি বলব বাবা। আপনি কি বলতে চেয়েছিলেন তাই এখনও বললেন না।

মথাটা চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে দেওয়ালের দিকে যেখানে বিমলার বড় ছবি, টাঙ্গানো রয়েছে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে দেওবাহাদুর। তারপর আস্তে আস্তে বলে, আমার কনট্রাক্টরী জীবনের প্রথম কাজ পেলাম পেডংয়ের কাছে। ছোট কাজ। অল্প পুঁজি। ওখানেই থাকি। তোমার মার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় প্রথম ওখানেই। আমার অসুখ করল, তোমার মার সেবায় বেঁচে গেলাম। তারপর আরও দু বছর ওই এলাকাতেই কাজ করেছি। তোমার মা আমার সঙ্গেই থাকত।

দেওবাহাদুর থামতেই বিমলা রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল—তারপর?

—তারপর। তারপর তোমার মা মারা গেল তুমি জন্মাবার পরেই।

একটা আর্ত চিৎকার করে বিমলা বললে, আমার বাবা। আমার বাবা, সে......

বিমলার কথা শেষ হবার আগেই দেওবাহাদুর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে দেওবাহাদুর বললে, আমি তোমার বাবা। লোকে বলে আমি খুব মহৎ, খুব মহানুভব—একটা কুলির মেয়েকে নিজের মেয়ের মত মানুষ করেছি। আমি তাদের বলতে পারিনি তুমি আমারই মেয়ে। নীচু হয়ে দেওবাহাদুর বিমলার মাথা দুই হাত দিয়ে চেপে ধরল। দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বিমলার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে আবার বললে আমি তোমার বাবা। বসন্ত তোমার দাদা।

বিমলা একটা আর্ত চিৎকার করে টেবিলে মাথা ঠুকছে আর হা হা করে হাসছে। এ হাসি যেন কোন এক প্রেত আর ভয়ংকর হাসি। আবার হা হা চিৎকার করে এক ভয়ংকর গলায় বিমলা বলে উঠল, —আপনি আমার বাবা। বসন্ত আমার দাদা।

দেওবাহাদুর বিমলার মাথায় একটা হাত রেখে বললে আমাদের নেপালী সমাজে দুটো বিয়ে কিছু বেমানান নয়, তবু আমাদের শেষ পর্যন্ত নানা সামাজিক প্রশ্নে হয়নি। লোকে জানে, তোমাকে মানুষ করেছি—সেই পরিচয়ই লোকে জানুক। বিমলা, এই তোমার কাছে আমার ভিক্ষা। একটু থেমে দেওবাহাদুর আবার বললে, আমি এখন যাচ্ছি। তোমার বিচার বিবেচনায় যা ভাল মনে কর তাই করবে। আমার আর বলার কিছু নেই।

মাথা নীচু করে দরজার কাছে এসে দেওবাহাদুর ছিটকিনি খুলে ঘুরে বললে, তোমাকে আইনমতে আমার মেয়ে বলে দত্তক নিয়েছি। এখন থেকে আমার মেয়ে বলে নিজের পরিচয় দিতে পার।

দেওবাহাদুরের কথায় বিমলার হাসি থেমে যায়। ছুটে দেওবাহাদুরের কাছে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললে, আমার পরিচয় কুলির মেয়ে হিসাবেই থাক। আপনার মেয়ের পরিচয় আমার লাগবে না। দু হাতে মুখ ঢেকে বিমলা কাঁদতে থাকে। চিৎকার করে ওঠে—আপনি আমার বাবা। বসন্ত আমার দাদা। জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বিমলা আবার চিৎকার করে উঠল—না না না, আমার নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। মহৎ, মহানুভব বলেই আপনার পরিচয় থাকুক। বিমলা আবার কাঁদতে থাকে।

বিমলার মুখের দিকে দেওবাহাদুর তাকিয়ে থাকে। ওর চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে। এক ব্যথায় তখন তার সমস্ত হৃদয় মথিত করে তুলল। দেওবাহাদুর সান্ত্বনার কোন ভাষা খুঁজে পেল না। বিমলাকে কি যে বলতে গেল। একটা ঘড় ঘড় শব্দই শুধু বের হল মুখ দিয়ে। আরও মিনিটখানেক দেওবাহাদুর দাঁড়ায়। তারপর বিমলার মুখের দিকে তাকিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল।

এক পা এক পা করে যেন দেওবাহাদুরের জীবাশ্ম হেঁটে চলছে। বিমলার হাসি তার কানে ভেসে আসছে। বিমলা তখনও হাসছে আর বলছে, আপনি আমার বাবা। বসন্ত আমার দাদা। আমার পরিচয় আমি কুলির মেয়ে। দেওবাহাদুর হেঁটে চলেছে। তার মনে হল যেন কোন এক প্রেতভবন থেকে বিমলার হাসি তার কানে ভেসে আসছে।

বৃষ্টি আর নেই। আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে কুয়াশা। বৃষ্টিতে ভেজা পীচ বাঁধানো রাস্তা চিক চিক করে উঠছে কুয়াশার মাঝ দিয়ে চাঁদের আলো এসে। দেওবাহাদুর মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। কুয়াশা উড়ে চলেছে দ্রুত। ঘন কুয়াশা আবার নতুন করে ঢেকে দিচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে।

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

ডঃ জে এন ব্যানার্জী

—ডঃ ব্যানার্জী, আপনি তো কলকাতায় যাচ্ছেন, একবার সিদ্ধার্থর সঙ্গে দেখা করবেন না, ও এ ব্যাপারে রিয়েলি ইনটারেসটেড।

—মিঃ বড়ুয়া আমি যাচ্ছি তো মোটে দেড় দিনের জন্য। তারই মধ্যে সেমিনার অ্যাটেনড করতে হবে, নিজের কোমপানির কলকাতা ব্রানচের লোকজনদের মিট করতে হবে, তাছাড়া পুরোনো বন্ধুবান্ধব যাঁরা আছেন তাঁরাও ছাড়বেন না। বিসাইডস, অ্যাপয়েনটমেনট না করে চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হয়তো শুনব তিনি নেই, বাইরে গেছেন।

—ডঃ ব্যানার্জী অ্যাপয়নটমেনটের দায়িত্ব আমার। আপনি কালই ওকে মিট করুন।

বিহারের সেই প্রাক্তন রাজ্যপাল যিনি অসমীয়া কবি ও সতীনাথ ভাদুড়ীর স্মরণিকা গ্রন্থের প্রকাশন ব্যাপারে নিজে থেকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন, সেই মানুষটি আজ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। নাম—দেবকান্ত বড়ুয়া। দিল্লীতে তাঁরই অফিসে বসে কথাবার্তা চলছিল। হচ্ছিল যাঁর সঙ্গে তাঁকে ভারতের ওষুধ নির্মাণ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সব মানুষই এক ডাকে চেনেন—ডক্টর জয়ন্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রিসিভারটা তুলে অপারেটরকে বললেন বড়ুয়াসাহেব—সি এম ওয়েসট বেঙ্গলকে একটু দিন তো। তারপর আবার ধরলেন পুরোনো কথার খেই—যে সাহায্য আপনারা চাইবেন, তাই পাবেন। এবার একটু পুবের দিকে তাকান। দেশের সব কটা ওষুধের কারখানা আজ বম্বে ও গুজরাটে। ইসটারন রিজিয়ন তো শেষ হতে চলল। সব টাকা পশ্চিমে না ঢেলে, কিছুটা অন্তত কলকাতায় ইনভেসট করুন। ভুলে যাবেন না, একদিন বেঙ্গলেই ছিল ওষুধ তৈরির ব্যবসায় পাইওনিয়ার। আর এ ব্যাপারে ডি পি'র (দুর্গাপ্রসাদ ধর) সঙ্গে আমার কথা হয়েছে—সব রকম কো-অপারেশন পাবেন।

—বড়ুয়াসাহেব এ সব ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সাহায্য এসেনসিয়াল, বললেন ডঃ ব্যানার্জী।

—আরে সেইজন্যই তো আমি চাই আপনি সিদ্ধার্থকে মিট করুন।

কথার মাঝখানেই ফোন বেজে উঠল—স্যার ওয়েস্ট বেঙ্গলের সি এম-এর লাইন পাওয়া যাচ্ছে না।

ফোনের ওপরই গর্জে উঠলেন বড়ুয়া সাহেব—অর্ডিনারি, আরজেনট কিছু না পান তো লাইটনিং কল বুক করুন।

মিনিট দুয়েকও পেরোল না ফোনে ভেসে এল সেই ভারী পরিচিত গলাটি—সিদ্ধার্থ রায় বলছি।

—সিদ্ধার্থ, ডঃ ব্যানার্জীর কথা অনেকবার বলেছি। ফারমাসিউটিকাল জগৎটা ওঁর নখদর্পণে। আমি ওঁকে বলেছিলাম ওয়েসট বেঙ্গলের ওষুধ বানানোর শিল্পকে কি করে জোরদার করে তোলা যায় সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে। তাছাড়া উনি আমাদের প্ল্যানিং কমিশনের ফারমাসিউটিকাল ডিভিসনের টাসক ফোরসের একজন সদস্য। ডঃ ব্যানার্জী কাল কলকাতায় যাচ্ছেন, একবার কথা বল ওঁর সঙ্গে।

সেই কথা বলাতে ও একটা সেমিনার অ্যাটেনড করতে ডঃ ব্যানার্জী কলকাতায় এসেছিলেন গত ১৩ অগস্ট। হাতে সময় ছিল না মোটেও। কারণ সিদ্ধার্থবাবু তাঁর জন্য বাসায় অপেক্ষা করবেন। ডঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করেই চিফ মিনিসটারকে ছুটতে হবে সময়মত—

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

রচিত সমগ্র ভারতের তীর্থস্থানের সম্পূর্ণ পরিচয়

তীর্থের পথে

ভারতের অগণিত পুণ্যার্থী তীর্থকামীর জন্য বিশেষভাবে লিখিত ও অসংখ্য চিত্রশোভিত এই গ্রন্থ যেমন তীর্থযাত্রীদের পরম সহায়ক হবে, তেমনি গৃহে বন্দী পাঠকও তীর্থদর্শনের আনন্দ উপভোগ করবে।

দাম ১৪·০০

ভারত ভ্রমণ

চিত্র সেন

টুরিস্ট গাইড

দাম। ৭·০০

ভারতের মানচিত্র নিয়ে পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ :

আমাদের প্রকাশিত এই গাইড বইতে আছে ভারতের প্রতিটি দর্শনীয় স্থানের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় তথ্য।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

আপনার চুলের জন্যে তেলের চেয়ে ভালো আর কিছু কি হতে পারে ?

পারে বৈকি, তেল আর পিওর সিলভিক্রিনের মিশ্রণ।

কেন ?
কারণ,

তেল কি করে :
সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং-এ মেশানো তেল আপনার চুলকে তেলচিটে করে না, অথচ সুন্দর সুবিন্যস্ত রাখতে সাহায্য করে।

পিওর সিলভিক্রিন কি করে :
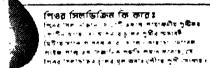
পিওর সিলভিক্রিন আর তেলের সমন্বয়—একমাত্র সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং-ই আপনার চুল ঘন করে বাড়িয়ে তোলে।

চুলের যত্ন করুন সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং দিয়ে— আপনার চুল থাকবে সুন্দর, সুবিন্যস্ত।

ঘন রেশমকোমল সুবিন্যস্ত চুলের জন্যে

সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং

কালিমপং যাবেন, প্লেন সকাল এগারোটায়।

বিমান থেকে নেমে এক মিনিটও রেসট নেন নি ডঃ ব্যানার্জী। সোজা চলে গেছেন দক্ষিণ কলকাতায় বেলতলায় সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যায় ওষুধ শিল্পের ভূমিকা কি হতে পারে, এই মুমূর্ষু প্রায় শিল্পটিকে কি করে সারিয়ে তোলা যায়, পশ্চিম ভারতের শিল্পপতিদের (ওষুধ ব্যবসায়) কি করে কলকাতায় টেনে আনা যায়—এ সব নানান বিষয়ে আলোচনা করতে করতে দুজনের কেউই টের পান নি যে মুখ্যমন্ত্রীর প্লেন ছাড়ার সময় পেরিয়ে গেছে। সেদিন এক ঘণ্টা লেটে সিদ্ধার্থবাবু কালিমপং যান। যাওয়ার আগে রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি শ্রীঅ মহলানবিশ ও বাণিজ্য এবং শিল্প সচিব শ্রী এস কে বিশ্বনাথকে বলে যান ডঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে আরো কথাবার্তা চালাতে।

দুপুরে হোটেলে ফেরা হলো না। ডঃ ব্যানার্জী বেলতলা থেকে সোজা চলে গেলেন রাইটার্সে। ঘণ্টা দুয়েক আলোচনা হলো ওঁর রাজ্যের মুখ্য সচিব ও বাণিজ্য সচিব এর সঙ্গে।

সেদিন সন্ধ্যায় গ্র্যান্ড হোটেলের বাংকোয়েট হলে রাজ্যের নামীদামী ওষুধ কোম্পানির কর্তা ও ডাক্তারবাবুদের সামনে ভারতের ও বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ওষুধ নির্মাণ শিল্পের সমস্যা ও প্রসার প্ল্যানে সরকারী ইচ্ছা ও উদ্যোগের একটি বিশদ চিত্র তুলে ধরলেন ডঃ ব্যানার্জী।

মায়ের দুধ ছাড়ার পর পুষ্টিকর খাদ্য যে-শিশু পায় না তার দেহ ও মেধা দুটোই হয় খর্বাকার। সে কি করে সমবয়সী খেতে-পাওয়া-ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে? পারা অসম্ভব। আর এই অসম্ভবের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে দেশে আর যাই আনা যাক, সমাজতন্ত্র আনা যাবে না।

খাদের অভাব দেশের সর্বত্র। ওই বলে কথায় কথায় মানুষকে তার চির পরিচিত খাবার ছেড়ে ভিনদেশী বা অল্প পরিচিত খাদ্য গ্রহণ করতে বলাও ঠিক নয়। অভ্যাস মানুষ চট করে ছাড়তে পারে না। তাই অভ্যস্ত খাদ্য যদি পরিমাণে কমও হয়, ক্ষতি নেই, ওই খাদ্যকে ওষুধ কোম্পানিগুলি নানা গুণে জোরদার করে তুলতে পারে, তাতে পুষ্টির কোন অভাব আর ঘটবে না। আর আধুনিক ওষুধ নির্মাণ শিল্পের ভূমিকা ভারতের মত খাদ্যাভাব পীড়িত দেশে তাই হওয়া উচিত।

বলতে বলতে পেছনে ব্ল্যাক বোর্ডে টাঙ্গানো চার্টগুলি একটির পর একটি উল্টে যাচ্ছিলেন ডঃ ব্যানার্জী। ডান হাতে সিগারেটের প্যাকেট সাইজের হ্যান্ড মাইক, বাঁ হাতে একটা সরু লাঠি। লাঠিটা গিয়ে একটা চার্টের ওপর নির্দিষ্ট সময়েরও বেশী স্থির হয়ে রইল। ডঃ ব্যানার্জীর পাতলা অথচ ধারালো গলা ঢেউয়ের মত সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো—

আধুনিক পৃথিবীতে, মানুষ মানুষের জীবন ধারণের মান কতটা উন্নত বা অবনত তার হিসাব করা হয় মাথাপিছু খাদ্য, বিদ্যুৎ কাপড়, লোহা, সিমেন্ট, ওষুধ ইত্যাদির ব্যবহারের মাত্রায়। অন্য বিষয়গুলির ব্যাপারে

২৪শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর) হইতে ৭ই আশ্বিন
(২৪শে সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত

অপরাজেয় কথাশিল্পী
শরৎচন্দ্রের
পুণ্য আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে
তাঁর সমগ্র রচনাবলীর সংকলন

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

শতকরা ১৫·০০ টাকা হারে কমিশনে ক্রয়ের অপূর্ব সুযোগ
॥ সমগ্র রচনাবলী ১৩ খণ্ডে সমাপ্ত ॥ প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৪·০০

উল্লিখিত তারিখের মধ্যে রচনাবলীর সমগ্র ও স্বতন্ত্র খণ্ড যাঁহারা ক্রয় করিবেন, তাঁহারা প্রতি খণ্ড ১৪·০০ টাকার স্থলে ১১·৯০ পয়সায় ও সমগ্র খণ্ড ১৮২·০০ টাকার স্থলে ১৫৪·৭০ পয়সায় পাইবেন। ঐ সময়ে অনিবার্যকারণবশতঃ যদি কোনও খণ্ড সরবরাহ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পরবর্তীকালে অপ্রাপ্ত খণ্ডগুলির উপরও তাঁহারা সমহারে কমিশন পাইবেন। ডাকমাশুল বা ভাড়া স্বতন্ত্র।

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলকাতা-৭০০০১২ : ফোন : ৩৪-১৭৮২

(সি ৮২০৩)

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল
অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার প্রখ্যাত অপরাধ বিশেষজ্ঞ

কিশোর অপরাধী

সমাজের সেই সব কিশোর যারা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, যারা হত্যা, রাহাজানি, যৌন অপরাধ, চুরি প্রভৃতি অসামাজিক কাজে অপরাধী। বর্তমান গ্রন্থ তাদের এই নেপথ্য কাহিনীর দলিল। দাম ৬·০০

কিরো অবলম্বনে পরীক্ষিতের

কিরোর বহুবিখ্যাত বই "You & Your Star"এর অবলম্বনে পরীক্ষিত রচিত এই বই আপনার ভবিষ্যতের সঠিক নির্দেশ দেবে।

বছরের প্রতিটি দিন
ও আপনার ভাগ্য দাম ১২·০০

গ্রন্থপ্রকাশ, C/o বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ । ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি-১২

কথা বলবেন অন্যরা, আমি বলছি শুধু ওষুধের কথা। যেমন, পশ্চিম ইউরোপের অন্যতম দরিদ্র দেশ, সেখানে মাথাপিছু বছরে ওষুধ ব্যবহারের পরিমাণ চুরাত্তর টাকা। এশিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ জাপানে একশ সাতাশ টাকা। ফ্রান্সে একশ একচল্লিশ।

একের পর এক দেশের হিসেব দিয়ে চলেছেন ডঃ ব্যানার্জী। আর আমার বুকের ভেতর একটা অস্বস্তি মাথা কুটছে, ভারতের হিসেবটা কত? আর ঠিক তখনি কানে এল, ১৯৭২ সালে একজন ভারতীয় বছরে পাঁচ টাকার ওষুধ ব্যবহার করেছেন। আজ থেকে ছ বছর বাদে, পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে ১৯৭৮-৭৯ সালে যখন দেশের ওষুধ নির্মাণ শিল্পের কারবার পরিমাণ এখনকার তুলনায় দু গুণেরও বেশী হবে, তখন এই মাথাপিছু ব্যয় দাঁড়াবে দশ টাকা। মাথাপিছু হিসাব শেষ করে ওষুধ শিল্পের ভেতরের আনাচেকানাচে প্রবেশ করলেন ডঃ ব্যানার্জী। সারা ভারতে বছরে এখন আড়াই শ কোটি টাকার ওষুধ কেনা বেচা হয় এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অংশ মাত্র পঁচিশ কোটি টাকা, অর্থাৎ সর্ব-ভারতীয় অংশের শতকরা দশ ভাগ। অথচ পঁচিশ বছর আগে ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তখন পশ্চিমবঙ্গের শেয়ার ছিল শতকরা নব্বই ভাগ আর অন্য সব রাজ্যের দশ ভাগ। আর আজ পশ্চিমবঙ্গের মাথার মুকুট কমল মথায়—পাশে গুজরাটও স্ফীত হয়েছে।

কেন এই অবনতি? কেন সকালের আগে এই শিল্প মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেও আজ পশ্চিমবঙ্গ পেছিয়ে পড়ল? কেন ডি শ সব পদ্ধতি করে ছিলেন তাঁরা কোনদিন চেষ্টা এনেছেন ডঃ ব্যানার্জীকে? কেন অবসরের বছরে শিল্পের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে এই মানুষটিকে অনুরোধ করেন?—এই কেন-গুলির জবাব জানতে পরদিন সকালে গিয়ে হাজির হলাম গ্রানাডের একশ পনেরো নম্বর কামরায়।

সকাল ৮টা। বিকেল ৫টায় প্লেনে ডঃ ব্যানার্জী বম্বে ফিরে যাবেন। সময় নেই মোটেও। ঘন ঘন ফোন বাজছে। মিনিটে মিনিটে নতুন নতুন মুখ ঢুকছে ঘরে। সকলের সঙ্গে কথা বলছেন অথচ একটুও ক্লান্ত নন। শুধু এক ফাঁকে আমায় বললেন, কাল রাত দেড়টায় শুয়েছিলাম। ভোরে ওঠার অভ্যাস চিরদিনের। সকাল পাঁচটায় উঠে যোগ ব্যায়াম করেছি আধ ঘণ্টা। তারপর স্নান সেরে পোশাক পরতে না পরতে ...।

এই ভোরে ওঠার অভ্যাস বরাবরই ছিল। ডক্টর ব্যানার্জীর বাবা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর দেশ ২৪ পরগনার গোবরডাঙায়। কর্মজীবনের বৃহত্তর অংশ কেটেছে বাংলার বাইরে। কিছুদিন এলাহাবাদে এইট স্কুলে ফার্মাকোলজি পড়ান জ্ঞানেন্দ্রনাথ। ১৯২১ সালে যখন আরো পড়াশোনার জন্য বিলাতে গেলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ, তখন তাঁর কৃতী সন্তান জয়ন্তের বয়স মোটে দুই। জয়ন্তর ছেলেবেলাটা কেটেছে জলপাইগুড়িতে মামার বাড়িতে, মামা ব্যারিস্টার অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

বিলেত ও জার্মানী থেকে মাইক্রোস্কোপ সম্পর্কে পড়াশোনা করে ফিরে এসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ আবার এলাহাবাদেই কাজ করলেন। ধীরে ধীরে পরিবার বাড়তে লাগল। তিন ছেলে, তিন মেয়ে। কলেজের অধ্যাপনার চাকরিতে সাংসারিক প্রয়োজন মেটে না। তাই বাংলার একটি বিখ্যাত ওষুধের কোম্পানিতে চাকরি নিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। সেই থেকেই বাংলার প্রবাসী বাঙালী এই ব্যানার্জীরা। শুধু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে বছর কয়েক লাহোরে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

বাবার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তরাও ঘুরেছেন এলাহাবাদ, লাহোর ও বম্বে। জয়ন্তনাথ ম্যাট্রিক পাশ করেন বম্বের কিং জর্জেস হাই স্কুল থেকে। আই এস সি পাশ করেছেন লাহোরের দয়াল সিং কলেজে পড়ে। ফার্মাকোলজিতে বি এস সি পড়বার জন্য ভর্তি হলেন লাহোরের কিং এডোয়ার্ড কলেজে। সেকেন্ড ইয়ার শেষ করে থার্ড ইয়ারে উঠবেন এমন সময় এল স্বাধীনতা। পার্টিশনের ধাক্কায় হিন্দুরা লাহোর ছাড়তে বাধ্য হলেন।

সেদিন যদি ডঃ রাধাকৃষ্ণন আমায় দয়া না করতেন, তাহলে আজকের ডঃ ব্যানার্জীকে ফার্মাকোলজিস্ট হিসাবে বোধ হয় আপনারা দেখতেন না, বললেন জয়ন্তনাথ। তখন ফার্মাকোলজি বিষয়টা খুব অল্প জায়গায় পড়ানো হতো। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করলাম শেষ বছরটা পড়তে দেওয়ার জন্য। ডঃ রাধাকৃষ্ণন তখন উপাচার্য। উনি আমায় জায়গা দিলেন।

সারাজীবনই অধ্যাপকদের স্নেহ ও ভালবাসা আমি পেয়েছি। আজ যে পৃথিবী বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানি স্যানডোজ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ভারতীয় শাখার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করছি এর জন্যও আমি কৃতজ্ঞ আমার অধ্যাপকদের কাছে। কারণ সেটুকু কাজ শিখেছি, সে তো ওঁদের কাছেই।

আটচল্লিশ সালে বি এস সি পাশ করে বম্বের হফকিন্স ইনস্টিটিউটে অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরিতে ঢুকলাম। মাইনে ছিল একশ কুড়ি টাকা।

এক বছর বাদে কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষায় পাশ করে সিনিয়র সায়েন্টিস্টের চাকরি পেলাম। মাইনের বহর — সাড়ে চারশো। কিন্তু চাকরি পছন্দ হচ্ছিল না। চাইছিলাম গবেষণা করতে।

একসময়ে একটা সুযোগও এসে গেল। চান্স পেলাম ব্রাউনের শীতসাক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে থাকতে থাকতে দুটি ওষুধের ওপর কাজ করি—(ক) রাউলফিয়া সারপেনটিনা (খ) এর্গট অ্যালকালয়েড।

চাকরির টাকা জমিয়ে বিলাত গিয়েছিলাম। বাবা তখন চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে পঞ্চান্ন বছর বয়সে নতুন করে কর্মজীবন শুরু করেছেন—ব্যবসা। তাই তাঁর কাছে হাত পাততে পারি নি। নিজের হাতে যা ছিল, তাতে বড় জোর চলত এক বছর। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মাস্টারমশাই অধ্যাপক লুইস জুটিয়ে দিলেন একটা ফেলোশিপ। তিন বছরের জন্য নিশ্চিন্ত হলাম — কাজ করা যাবে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞান পত্রিকায় জার্নাল কয়েকটায় নিয়মিত লেখাও বেরোতে লাগল।

ইতিমধ্যে মাস্টারমশাই চলে গেলেন

আপনি যা করুন না কেন ফিলিপ্‌স স্ট্রিপলাইট আপনাকে তা আরও ভাল করে করতে সাহায্য করে।

ফিলিপ্‌স স্ট্রিপলাইট একটি ১০০ ওয়াট বাল্বের দ্বিগুণ আলো দিলেও এর বিজলী খরচ ৪০ ওয়াট বাল্বের সমান। ফিলিপ্‌স স্ট্রিপলাইট জ্বালুন—বিজলী খরচ কমান। গুণ এবং কার্য্যকরীতার প্রশ্নে ফিলিপ্‌স স্ট্রিপলাইট নিঃসন্দেহে আপনার শ্রেষ্ঠ সওদা। সুসংবদ্ধ ফিলিপ্‌স স্ট্রিপলাইটে রয়েছে তারে জড়ানো প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ, বসানো সহজ-ব্যবহারে কম খরচ। দোকানে বা বাড়ীতে যেখানেই হোক, এই স্ট্রিপলাইটে আপনার কাজ হবে আরও নিখুঁত।

যখুনি ভালো আলোর দরকার হয়, ফিলিপ্‌সই সবচেয়ে আগে তা নিয়ে আসে

ফিলিপ্‌স

ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

জলাপাহাড় ও বার্চ হিলের ওপার তখনই জুঁই ফুলের মতো তুষারশুভ্র ছড়িয়েছিল। টাইগার হিল তখন বনময় পথ। ঘুম-শহরে ঠান্ডা প্রচুরতরো। দার্জিলিঙে তখন আমাদের তরুণ কবিবন্ধু ও সৌম্যদর্শন অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ওকালতি প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছে কিনা আমার মনে পড়ছে না।

আমার চেষ্টা ছিল দার্জিলিং দিয়ে নেপালের কাঠমাণ্ডু শহরে পৌঁছনোর সহজ পথ আছে কিনা এটির খোঁজ-খবর নেওয়া। তখন কোনও মতে থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে শিয়ালদা থেকে রওনা হওয়া। ট্রেন যেত তখন কুষ্টিয়ার ভিতর দিয়ে সাঁড়া ব্রিজ পেরিয়ে পার্বতীপুর হয়ে সোজা শিলিগুড়ি। যাতায়াত মিলিয়ে টাকা পনেরোর মধ্যে দার্জিলিং ভ্রমণ আমার হয়ে যেত। তখন আর্থিক দারিদ্র্য ছিল প্রচুর, কিন্তু খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্যে দেশ ভরে থাকত। দৈনিক জীবনযাত্রা কোথাও জটিল সমস্যায় কণ্টকাকীর্ণ ছিল না। ছিল শুধু অনড়, অবিচল অর্থাভাব।

দিন দশের মধ্যে ফিরে এলুম কলকাতায়। পরবর্তী কয়েক দিনের ভিতরে তিন চারটে ছোট গল্প লিখে ফেললুম

॥ ৩৬ ॥

১৯৩২ সাল শেষ হল। এই বছরটাকে কাবার করতে আমার ঘাড়ে দুবেলা গড়িয়ে গেল। ইংরেজিতে বলে, যে পাথর গড়িয়ে যেতে থাকে, তার গায়ে শ্যাওলা ধরে না। কিন্তু আমি যখনই কলকাতায় স্থাণু হয়ে যাই, তখনই আমার পায়ে-পায়ে জঞ্জাল জমে ওঠে। আমি একদম বেকার, তাই আমাকে দিয়ে নানা কাজের টানাটানি। আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম।

কনকনে ঠান্ডায় দার্জিলিঙে কেমন বরফ পড়ে, এ দৃশ্য আমার দেখা দরকার। দার্জিলিঙে আসল ঠান্ডা জানুয়ারীতে আরম্ভ। কিন্তু দার্জিলিঙ আমার অতি পরিচিত। বছরে দুবার প্রায়ই আসি। ওখানে আমার কুটুম্ব মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের একচেটিয়া মোটর যানবাহনের কারবার। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম 'দার্জিলিঙ মোটর সার্ভিস।' নানা ধরনের মোটর কার, প্রাইভেট ট্যাক্সি, লরী ও ট্রাক, মোটর বাস ইত্যাদির সামগ্রিক মালিক তিনি। বাংলার বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকেই চেনেন। দার্জিলিঙে তাঁর তিন-চারখানা বাড়ি, কয়েকটি গ্যারেজ, একটি অতিথি ভবন ইত্যাদি। তিনি ফিটফাট সাহেব। কয়েকটি নাবালক ছেলেমেয়ে তাঁর। তারা সবাই আমার নাতি-নাতনী সুবাদ। চৌধুরী সাহেবের বাড়ি চাঁদমারি বাজারের সামান্য একটু নিচে,— লাইব্রেরি আর থিয়েটার হলের সামনে। উনি আমার জামাই সুবাদ হলে কি হবে,— আমার বাপ-খুড়োর বয়সী উনি। এমন সজ্জন, মিষ্টভাষী, অমায়িক এবং অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি তখন দার্জিলিঙে কমই ছিল। আমার বাঁধা বরাত ছিল ওঁর বাড়িতে। এর ওপর উনি ছিলেন বিলেতী চালচলনের একনিষ্ঠ অনুরাগী। সাহেবী লাঞ্চ বা ডিনারে যখন তখন তাঁর ডাক পড়ত।

প্রকাশিত হল

কবিতা সিংহের নতুন স্বাদের উপন্যাস

চারজন রাগী যুবতী ৫.০০

বাংলা সাহিত্যের রাগী যুবকদের চরিত্র অনেকেই এঁকেছেন। কিন্তু রাগী যুবতী? এই প্রথম, এই জ্বলন্ত সময়ের শিকার, এই অস্থির সময়ের সঙ্গে সংগ্রামরত, সন উনিশশো তিরাত্তরে যারা সতেরো পেরিয়ে আঠারোয় পড়ছে, তেমনি চারজন রাগী যুবতীর কথা লিখেছেন কবিতা সিংহ। তাদের প্রেম, ঘৃণা, প্রয়োজন, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, প্রতিহিংসা ও সময়চেতনার বর্ণচ্ছটাময় একটি বিস্ফোরিত মুহূর্তে লেখিকা জ্বালিয়ে দিয়েছেন, তাঁর তীক্ষ্ণ, তীব্র তপ্ত গদ্যে।

অমরনাথ রায়ের নতুন গল্পগ্রন্থ

রাশিয়ার ভালো ভালো গল্প ৩.০০

সুশীলকুমার নাগের নতুন উপন্যাস

দ্রৌপদী প্রেম ৬.০০

বাসুদেব বসুর সার্থক রচনা

রাজগৃহে রাজা নেই ৪.

নহরুপেরীর দুটি অনবদ্য গ্রন্থ

লৌকিকতার পরিবর্তে ৫.

একটি শিশির বিন্দু ৫.০০

কাঁদিছে মৃত্তিকা ৫.০০

নিখিলচন্দ্র সরকারের নতুন উপন্যাস

স্বপ্নের ধ্বনি ৮.০০

ফণিভূষণ আচার্যের সাড়াজাগানো নতুন উপন্যাস

জ্যোৎস্নায় বাঘবন্দী খেলা ৫.০০

পূর্ণ প্রকাশন : ৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ ॥ ফোন ৩৪-৯৫৯২

(সি ৪৩৬১)

ওগুলো হাতে থাক। ওরই ভিতরে হঠাৎ একদিন এক যুবক এসে হাজির। তাঁর নাম অক্ষয়কুমার সরকার। তিনি এক সাপ্তাহিক বার করেছেন বা করছেন। নাম 'খেয়ালী'। তাঁর কণ্ঠস্বর একটু মেয়েলী ধরনের। আমার কাছে তাঁর আসবার খেয়াল কেন চাপলো—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিশদ-ভাবে তাঁর বক্তব্য বর্ণনা করলেন। তাঁর সম্পর্কে মামা হলেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁরই রাজনীতিক আদর্শের অনুপন্থী হল এই 'খেয়ালী'। সম্প্রতি সুভাষচন্দ্র গিয়েছেন বোম্বাইয়ের ওদিকে। সেখান থেকে ভাগিনেয়কে এক পত্রে জানিয়েছেন, অমুক লেখকের কাছ থেকে লেখা নাও, এবং তাদেরকে পারিশ্রমিক দাও—সে যত সামান্যই হোক। আমি নাকি সেই প্রস্তাবিত লেখক-দের অন্যতম। বলা বাহুল্য, আমি অক্ষয়-বাবুর অনুরোধ স্বীকার করে নিলুম এবং কথা দিলুম, প্রতি সপ্তাহের 'খেয়ালী' সাপ্তাহিকে আমি ছোট ছোট ভ্রমণ-কাহিনী লিখব এবং প্রতি কিস্তির জন্য ও'রা আমাকে দশটি করে টাকা দেবেন। মন্দ নয়, সুভাষবাবুর একখানা চিঠিতে আমার অবস্থা ফিরে গেল। পরবর্তী কালে এই ছোট ছোট লেখা একত্র করে যে বইখানা ছাপা হয়, তার নাম 'দেশ-দেশান্তর'। যাই হোক, অক্ষয়-বাবুকে কথা দিলুম, নেপাল থেকে ফিরে আপনাকে জানাব, কবে থেকে আমি লিখতে আরম্ভ করব।

সুভাষবাবু সম্বন্ধে এখানে দু-এক কথা বলি। তিনি সম্প্রতি ব্রিটিশ ভারত গভর্ন-মেণ্টকে 'জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে' খাচ্ছিলেন! এই সম্প্রতি কিছুকাল আগে তিনি কলকাতার জেলে আমরণ উপবাস আরম্ভ করেছিলেন। চারিদিকে হই-চই, ইট-পাটকেল, লাঠি চার্জ, ১৪৪ ধারা! তখন কাঁদানে গ্যাস জন্মায়নি। কিন্তু এত বড় স্পর্ধা ব্রিটিশ-পুঙ্গবের' যে, নব্য বাঙলার তারুণ্যের প্রতীক সুভাষচন্দ্র তাদের অত্যাচারে না খেয়ে মরবেন? সুতরাং আলীপুরে সেণ্ট্রাল আর প্রেসিডেন্সী জেলের চারিদিক ঘিরে নব্য বাঙলা দিবারাত্র চিৎকার করতে লাগল, 'সুভাষের দাবি মানতে হবে, নইলে ভারত ছাড়তে হবে।' বন্-দে-এ মাতরম্!

সুভাষচন্দ্রের অনশনকালে অনেকের সঙ্গে একে একে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শোভা জেলে গিয়ে সুভাষবাবুকে খাদ্য গ্রহণে রাজি করানোর চেষ্টা করে-ছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ভিন্ন ধাতুর তৈরি, ও'রা বুঝতে পারেননি! শ্রীমতী শোভা সেদিন সুভাষচন্দ্রের সামনে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন। কিন্তু মোমবাতির আগুনে লোহা গলেনি! অতঃপর কর্তৃপক্ষ সুভাষ-চন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

আমি জানতুম, তৎকালীন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একটি নিগূঢ় কারণে বিপ্লববাদিনী শোভাকে জেলের মধ্যে ঢুকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একান্তে দেখা সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ও পক্ষের সেই চাতুরী ব্যর্থ হয়!

আমার সঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় সেটি ১৯৩৯। যখন বাঙলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদে সুভাষ-চন্দ্রকে বসাবার জন্য তুমুল হই-চই ওঠে। বাঙলা কংগ্রেস হবে গান্ধীপন্থী, না সুভাষ-চন্দ্রের কর্মধারাপন্থী? সুতরাং আত্মকলহ ও উত্তেজনাপ্রিয় বাঙালী সেদিন কাগজে-কাগজে উভয়পক্ষের প্রচারকার্যে রস পেতে লাগল। সুভাষচন্দ্রকে ভোটে জিতিয়ে দেবার জন্য শ্রীমতী শোভা প্রচুর সংখ্যক কংগ্রেস সভ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সেই আমি প্রথম কংগ্রেসের চার-আনার প্রাথমিক সভ্য হই। সেই বছরেই প্রথম বুঝতে পারি, সাহিত্য-কর্মীর পক্ষে রাজনীতি স্বাস্থ্যকর নয়। সেবার সুভাষচন্দ্রই জয়লাভ করেন।

আমার পক্ষে তখন স্বস্তির কারণ ছিল এই, শ্রীমতী রমলা আমাকে মুক্তি দিয়ে 'বোধনা নিকেতন'-এ কাজ নিয়ে চলে গেছেন। সেখানে তিনি মাসিক হাতখরচ তিরিশ টাকা করে পাবেন। গিরিজা মুখোপাধ্যায় মহ

শয়ের বিশেষ অনুরোধে আমাকে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ও'দেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে হয়েছিল। কিন্তু আসলে অনুরোধটি ছিল রমলার—ওটা গিরিজাবাবুর মুখ দিয়ে এসেছিল!

ও'রা সে-অঞ্চলে গিয়ে 'বোধনা নিকেতন' প্রতিষ্ঠা করলেন, সে-অঞ্চল আমার বিশেষ পরিচিত। এটি ঝাড়গ্রামের কাছাকাছি। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে আমি স্থির করেছিলুম, কলকাতা থেকে দূরে কোথাও গিয়ে নিরিবিলি কোনও বনপ্রান্ত খুঁজে নিয়ে এক আশ্রম বানাবো! পাশে থাকবে জলাশয়, সেখানে ফুটে থাকবে রক্তকমলের দল। আশ্রমের উপান্তে হরিণ ছুটবে, ময়ূর চরবে পেখম মেলে এবং 'কোকিলের কুহুরবে আতুর হবে মধ্যাহ্ন।'

সুতরাং আমার এই আশ্রম রচনার সহায়কস্বরূপ সাঁতরাগাছি থেকে আমার ভাগিনেয় সম্পর্কে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীমান ধনুকে সঙ্গে নিয়েছিলুম। ধনুরা লৌহ ব্যবসায়ী এবং ধনাঢ্য। কিন্তু সে মামার উপযুক্ত ভাগ্নে। সে বলল, আমি দেবো তোমার আশ্রম রচনার উপযুক্ত জমি। মেদিনীপুর জেলায় আমাদের অনেক জমি আছে। আগে চলো ঝাড়গ্রামে। সুতরাং ধনুর প্রস্তাবে সেই প্রথম গেলুম ঝাড়গ্রামে। তখন ঝাড়গ্রামে অন্ধকারের যুগ। স্টেশনের পাশে বড় বড় শাল গাঁড়ির আড়ৎ। চারিদিক জুড়ে আছে অরণ্য। জনবসতি অতি সামান্য। আদিবাসী, সাঁওতালী আর জংলীদের দেখা যায় এখানে ওখানে। পূর্বদিক ধরে একটি পথ গিয়েছে রাজবাড়ির দিকে। রাজার নাম নরসিংহ মল্লদেব 'উগালষণ্ড'। রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার হলেন দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। সেইকালে আমি দেবেনবাবুর সঙ্গে গিয়ে রাজার সঙ্গে আলাপ করি এবং আমার মনের কথা বলি। রাজা অতি অমায়িক, সুভদ্র, বন্ধুবৎসল এবং হাস্যপ্রিয়। লক্ষ্য করলুম তিনি প্রায় আমারই সমবয়সী। তিনি আমাকে এই কাছাকাছি একশ' বিঘা শালবন বিনামূল্যে দিতে চাইলেন। তবে দেবেনবাবু জানালেন, প্রতি বিঘায় আমাকে মাত্র তিন টাকা বাৎসরিক খাজনা দিতে হবে। বন্দোবস্ত হবে চিরস্থায়ী। আমরা জলযোগ সেরে উঠে এলুম।

আমি তখন সর্বহারা। বছরে তিনশ' টাকা খাজনা জোগাব কোত্থেকে? সুতরাং সেলাম ঠুকে সেবার পালিয়ে বাঁচলুম। মাথায় থাক আমার আশ্রম!

যাই হোক, এই ঝাড়গ্রামেরই কাছাকাছি রেলপথের নিকটবর্তী জঙ্গলের ধারে গিরিজাবাবু তাঁর 'বোধনা নিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ওখানেই 'বোধনা-হল্ট' নামক একটি স্টেশনও কালক্রমে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গিরিজাবাবুর ভাগ্য ছিল বিরূপ। একদা সেই 'বোধনা নিকেতন' ও [illegible]

গেল। একালে ওটার নাম হয়েছে 'বাঁশ-তলা'। ওটা রাজ-এস্টেটেরই অন্তর্গত। আমার সেদিনের রোমান্টিক রসকল্পনাও ওই শালবনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে!

'চিত্রমন্দির'-এর রতিকান্ত পালিতকে সঙ্গে নিয়ে যখন শিবরাত্রি উপলক্ষে পশুপতিনাথ তীর্থে যাব স্থির করেছি এবং এই তীর্থযাত্রায় যাতায়াতের রাহাখরচ ও খাইখরচ সব মিলিয়ে মোট টাকা তিরিশেকের বেশি লাগবে কিনা—এই সব নিয়ে যখন তাঁর ফটোগ্রাফির কেন্দ্র দোতলায় ক'দিন ধরে আলোচনায় বসেছি, তখন একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন শ্রীমতী কল্যাণী দাস এবং তাঁর সঙ্গে সেই সুগায়িকা মেয়েটি—যার নাম সাধনা। স্পষ্টত, আমার এই আড্ডার ঠিকানাটা কল্যাণী পেয়েছেন শ্রীমতী শোভার কাছে। কল্যাণী দাস তখনও বোধ হয় 'ভট্টাচার্য' হয়ে ওঠেননি!

সাধনা আমাকে দেখামাত্রই উদ্দীপ্ত হয়ে বলল, মহারাজ, মনে আছে? সেই প্রথম দিন যে বলেছিলুম, তোমাকে আমিই খুঁজে নেবো—সেকথা কি ভুলেছ?

আমাকে একপ্রকার নিকট-সম্ভাষণ করে 'তুমি' বলছে একজন মেয়ে, এটি কল্যাণী বা রতিবাবুর পক্ষে অভাবনীয় ছিল। ও'রা দুজনেই অবাক হলেন। কিন্তু আমি হাসি মুখে বললুম, না, ভুলিনি। তোমার সেই প্রথম গানটিও ভুলিনি।

মিষ্টভাষিণী ও শান্তমুখী কল্যাণী সহাস্যে বললেন, আপনি কিছু মনে করবেন না, সাধনা অমনি করেই কথা বলে। ও একটু পাগল!

—কিন্তু গানগুলো তো ঠিক পাগলের গাওয়া নয়?

উচ্চকণ্ঠে হেসে আনন্দে ও উল্লাসে সাধনা আমাদেরকে যেন প্রাণবন্ত করে তুলল। রতিবাবু এমন নতুন ধরনের মেয়ে দেখে ঈষৎ হতচকিত। এবার আমি বললুম, হঠাৎ এলেন যে? কিছু বলবার আছে?

—হ্যাঁ, বিশেষ জরুরি—কল্যাণী তাকালেন রতিবাবুর দিকে।

ইঙ্গিতটি বুঝে আমি রতিবাবুকে বললুম, আপনার কাজ রয়েছে অনেক ডার্ক-রুমে। মিনিট পনেরো সময় দিচ্ছি, কাজ সারুন গে।

ইঙ্গিত রতিবাবুও বুঝলেন, এবং তিনি ডার্ক-রুমের দিকে চলে গেলেন।

এবার কল্যাণী বললেন, ধরুন, কল্পনা করুন, আপনাদের এই হলটায় প্রায়ই লেখকরা আসেন! অন্নদাশংকর, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজাবাবু—সবাই আসেন! আমরা কেউ কেউ যদি এখানে আনাগোনা করি, সে শুধুমাত্র আপনাদেরকেই দেখবার জন্যে। সুতরাং পুলিস যদি কিছু জানতে চায়, এইটিই জানবে! আপনারাও সেটি মনে রাখতে পারবেন!

—বেশ, তারপর?

—আপনাদের ঠিক সামনে ট্রাম রাস্তার ওপারে 'চিত্রা' সিনেমার ঠিক অপোজিটে যে উঁচু বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন, ওর টপ ফ্লোরে একটি ছেলে এসে থাকবে, আপনি তাকে জানেন।
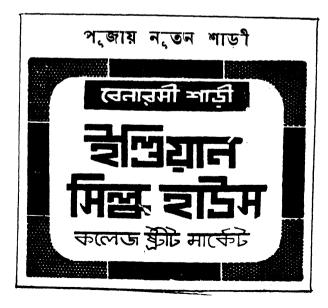
আমার গা একটু রোমাঞ্চ হল। উনি না বললেও বুঝতে পারছি, উনি দীনেশ মজুম-

দারের কথা বলছেন। সে এখনও পলাতক অবস্থায় টালিগঞ্জে রয়েছে, এবং যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

বললুম, সে দাক্ষিণ ছেড়ে উত্তরে আসতে চায় কেন?

সে চায় না—কল্যাণী বললেন, আমরা চাইছি! ওখানে ডাক্তার আর ওষুধপত্র আনা-নেওয়ার জন্য একটু জানাজানি হয়েছে আশেপাশে। ওকে শীঘ্রই সরানো দরকার। দিনের বেলায় ওর খাবারের বন্দোবস্ত হয়েছে এই নতুন জায়গায়। কিন্তু ওর রাতের খাবারটা পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবে সাধনা। টিফিন ক্যারিয়ারে আনবে, আবার ওটা খালি করে ফেরৎ নিয়ে যাবে। সাধনা হয়ত মাঝে মাঝে আপনাদের এখানে আসতে পারে! রান্না করা খাবার আমাদের বালীগঞ্জের বাড়ি থেকেই পাঠাবো।

বললুম, কিন্তু রতিবাবু আর আমি দুজনে শীঘ্রই যাচ্ছি নেপালে—কিছুদিন আমরা এখানে থাকব না—

সাধনা বলল, নেপালে যাচ্ছ? কেন মহারাজ?

আমি হাসলুম—মাঝে মাঝে আমাকে ভূতে পায়! ভূত ছাড়াতে যাচ্ছি।

—কিভাবে যাবে?

হাসিমুখে বললুম, ভাগ্যবিধাতা দু'খানা ঠ্যাং দিয়েছেন, এরই ভরসা। লোটা-কম্বল নিয়ে তীর্থে বেরিয়ে পড়ব।

কল্যাণী বললেন, আবার যাচ্ছেন পাহাড়ের দেশে?

—আজ্ঞে হাাঁ, ওটা আমার নেশা। যাই হোক, আপনারা যা ব্যবস্থা করবেন তাই হবে। এখানে অবশ্য কেউ-না-কেউ থাকবে। সাধনা মাঝে মাঝে এসে দু-এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে যেতে পারবে!

অসুস্থ দীনেশ সম্বন্ধে কথাবার্তা স্থির হবার পর আমি ধরে বসলুম, সাধনা, তোমার সেই সেদিনের গানের কথা আমি ভুলিনি। আজ একটা গান গেয়ে শুনিয়ে যাও না কেন?

হেসে উঠল সাধনা। বলল, মহারাজ তুমি আমাকে খুনী মেয়ে বলেই ধরে নিয়েছ। কিন্তু সেদিন তোমার চোখের মধ্যেই আমার গানের সুখ্যাতি দেখেছিলুম। আচ্ছা, আজ পুরনো একটা গান শোন—

বলতে বলতে সাধনা গুনগুনিয়ে একটা গান ধরল—"নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে তারই মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না—।

গান শুনে রতি পণ্ডিত এসে অদূরে দাঁড়ালেন। কল্যাণী নতমুখে চুপ করে রইলেন। আমি গায়িকার কণ্ঠে আন্তরিক ব্যাকুলতার আর্তকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলুম। মেয়েটা যখন উচ্চতানে ধরল, "বিশ্বকমল ফুটে চরণ চুম্বনে সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে আমার চিত্তকমলটিরে সেই রসে কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয় চাওয়াও না?"

সবাই বলবে মেয়েটা হাড়ে আর্টিস্ট, তা বলুক। আমি নিজে সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু আমার দুই কানের মধ্য দিয়ে মেয়েটার সমস্ত প্রাণের আকুলতা যেন মর্মের মধ্যে ঠাঁই নিল। ওর গানের সঙ্গে ওর নামটিও মেলে।

এবার আমি বললুম, কল্যাণী দেবী পুণ্যাশ্রমে এই মেয়ে থাকতে আপনি এরে নিলেন কেন আপনাদের এই কঠিন কাজে অথচ সেদিন শুনে এলুম, সাধনাকে অনেকে পাগল ঠাওরায়?

শ্রীমতী কল্যাণী সস্নেহে সাধনার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ওকে পাগল বললে ও খুশী থাকে! আমি জানি সাধনা আমার সবচেয়ে বিশ্বাসী আর সবচেয়ে দুঃসাহসী।

সাধনা এবার খুব হেসে উঠল। বলল, আমিই বলছি মহারাজ। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো? আমার মধ্যে পুরুষের পরিমাণ বেশি!

রতিবাবু পর্যন্ত হেসে উঠলেন। বললেন, কিন্তু গানে যে আপনি এক দুষ্টু মেয়ে, আপনি মহাবিদ্যা! আপনার তুলনা আমি দেখিনি।

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করলে আর মাড়ি মালিশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করা যায়

যাঁরা নিয়মিত ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করেন, অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখেছেন:

"ফরহ্যান্স টুথপেষ্টের কাছে এবং যে ডাক্তার আমাকে এই টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে বলেছিলেন তাঁর কাছে, আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ..."

—বিভূতি ভূষণ বোস, কলকাতা

"একেবারে ছেলেবেলা থেকেই আপনাদের বিশ্ববিখ্যাত টুথপেষ্ট আমি নিয়মিত ব্যবহার করে আসছি। আজ আমার প্রত্যেকটি দাঁত অটুট, মজবুত! ফরহ্যান্সকে আমি সবকিছু থেকে ওপরে ঠাঁই দিই, কারণ এই টুথপেষ্ট একজন দাঁতের ডাক্তারের সৃষ্টি—এই তো বড় কথা!"

—এন্ এন্ চ্যাটার্জি, কোয়েম্বাটুর

(এই প্রশংসাপত্রগুলির প্রতিচ্ছবি (ফোটোস্ট্যাট) জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ-র যেকোনো অফিসে দেখতে পাবেন।)

ভালোভাবে দাঁতের যত্ন নিতে হলে রোজ রাত্রে আর সকালে ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ও ফরহ্যান্স ডবল্ অ্যাকশন টুথব্রাশ ব্যবহার করুন—আর নিয়মিত আপনার দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নিন!

বিনামূল্যে! অপূর্ব রঙীন পুস্তিকা, "দাঁত ও মাড়ির যত্ন"।

এর এক কপি* পেতে হলে, এই কুপনের সঙ্গে ২০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান, এই ঠিকানায়—ম্যানার্স ডেন্টাল এডভাইসরী ব্যুরো, পোস্ট ব্যাগ নং ১০০৩১, বম্বে ১। D 1

নাম ______ বয়েস ______

ঠিকানা ______

* অনুগ্রহ করে যে ভাষায় চান তার নিচে দাগ কেটে দিন: ইংরিজি, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, উর্দু, বাংলা, অসমিয়া, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ী।

ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট—এক দাঁতের ডাক্তারের তৈরী

105F-182 BenR

এ'রা দু'জন সেদিন বিদায় নেবার আগে আমি বলে দিলুম, আমাদের যাবার এখনও দিন কয়েক দেরি। তবে ফিরে আসতে আমাদের হপ্তা তিনেক লাগবে।

অতঃপর কয়েকদিন আমি লেখাপড়ার কাজ নিয়ে বসে গিয়েছিলুম। 'ভারতবর্ষ'-এ এ মাস থেকে আমার কেদার-বদরী নিয়ে লেখা ভ্রমণ কাহিনী ছাপা হচ্ছে। ওটার নাম দিয়েছি 'মহাপ্রস্থানের পথে।' ওটা যেন আমার আগাগোড়া মুখস্থ, সেজন্য অনর্গল ঝরঝরিয়ে লিখে যাচ্ছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তিও 'ভারতবর্ষ' আপিসে গচ্ছিত করে দিয়ে যাবার চেষ্টা রয়েছে। ওর উপরে আরও গোটা দুই ছোট গল্প লেখার ফরমাস আছে। টাকাকড়ি কিছু পাব নিশ্চয়ই। কিন্তু যাবার আগে অনেক রকমের খরচা চালিয়ে হয়ত দশ পনেরো টাকা হাতে থাকবে। ওতে দু'পিঠের রাহাখরচই কুলোবে না, খাইখরচ ত' দূরের কথা। মোকামায় গিয়ে গঙ্গা পার হবো, তারপর উত্তর বিহারের ভিতর দিয়ে সগৌলি। সেখান থেকে আবার রক্সৌল। তারপর বীরগঞ্জ, অমলেকগঞ্জ, ভীমপেড়ি। অতঃপর পাহাড়ের পর পাহাড়।—লিখতে লিখতে আমি ভাবছিলুম, হয় পথেঘাটে অর্থাভাবে না খেয়ে মরব, আর নয়ত বাগমতীর ঠাণ্ডা জল খেয়ে বাঁচব! কিন্তু যেতে আমাকে হবেই। হিমালয় টানলে অন্য কিছু আর আমাকে টানে না!

শিবরাত্রির আর কয়েকদিন মাত্র বাকি। সুতরাং দিন আষ্টেক পরে রতিবাবুকে একবারটি তালিম দিতে গেলুম। আজ মঙ্গলবার, সামনের শুক্রবারে আমাদের যাত্রা। এবার তৈরি হোন, মশাই।

রতিবাবু দেখি হাসিখুশীতে গদগদ। বললেন, বলি ওহে মশাই, ওই গাইয়ে মেয়েটার কানে আপনি কী বীজমন্তর ফু'কেছেন বলুন দেখি?

বললুম, কেন, কি হয়েছে?

—কাল পর্যন্ত মেয়েটি তিনবার আপনার খোঁজে এল! হয়ত আজও আসতে পারে।

—কারণ কি?

—তাই যদি জানব তা হলে তো হাত গোনা শিখতুম!—রতিবাবু বললেন, প্রথম দিন এসেই আপনার কথা তুলল। বলল, লোটা-কম্বল নয়ে ত' সন্ন্যিসিরা যায় চিমটে বাজিয়ে। ও'র সম্বল বুঝি কিছু নেই? আমি হেসে বললুম, লেখকরা ত' দিন-ভিখিরি! তাদের আবার সম্বল কিসের? ও'র ওসব পথেঘাটে উপোস করার অভ্যেস আছে!

বললুম, কিন্তু এতবার খোঁজ করছে কেন আমার? কাজের কথা কিছু বলে গেছে?—আমার ঔৎসুক্য ছিল অন্য কারণে।

আহ্লাদে-আমোদে রতিবাবু যেন গলে পড়ছিলেন। বললেন, কথাই ত' তাই, মশাই। আপনি পথেঘাটে না খেয়ে মরবেন, একি তার সহ্য হয়? আমার কাছে গতকাল কে'দে-কেটে,—এই দেখুন না, আপনার সব ব্যবস্থা করে গেছেন! এই দেখুন—

রতিবাবু নিজের গলা থেকে এক ছড়া সোনার সরু বিছে-হার খুলে আমার সামনে ধরলেন। ওজনে হয়ত দেড় বা দু'ভরি হতে পারে।

—এ আবার কি?—আমি বললুম, সোনার হার নিয়ে আমার কি হবে? আপনি ওটা নিতে গেলেন কেন?

—নিলুম কি মশাই?—রতিবাবু আবার বললেন গদগদ কণ্ঠে, নাঃ আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না! আপনি একেবারে কাঠখোট্টা! বুঝলেন মশাই, 'রমণীর মন সহস্র বর্ষের সখা, সাধনার ধন।' উনি কাকুতি মিনতি করে এটি আমার হাতে গ'জে দিয়ে গেলেন,—আপনার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য! গরীব লেখক আপনি, কপাল আপনার ফিরে গেল! তা বেশ, এটা এখন আমিই রেখে দিই! পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা ত' বটে। এ আপনারই সাধনার ধন!

রতিবাবু সযত্নে ও সানন্দে হারগাছটা নিজের গলায় প'রে নিলেন।

যাই হোক, যথানির্দিষ্ট দিনে আমরা দুজন নেপালের উদ্দেশ্যে রওনা হই এবং পথঘাট তৎকালে আদিম অবস্থায় থাকার জন্য অনেক দুঃখ দুর্যোগ পরিশ্রম ও অর্ধাহারের মধ্য দিয়ে কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে পৌঁছই। তখন শিবরাত্রির কাল, এবং পশুপতিনাথ দর্শনের হুড়োহুড়ি। সেখানে দিন দুই থাকার পর আমি বোধ করি নিউ-মোনিয়ায় আক্রান্ত হই। আমার রোগের অবস্থায় ক্রমশ খারাপ লক্ষণ দেখে তখনকার হাসপাতালের ডাঃ সুধীন্দ্রলাল দাশগুপ্ত ও নরেন্দ্রনাথ মুস্তফী—এ'রা দু'জন আমাকে কুড়ি টাকা ধার দিয়ে এক 'ঝাম্পানে' তুলে দেন। সেটা প্রায় মড়ার খাটের মতো।

৪০ গ্রাম ও ৭৫ গ্রাম, ২ সাইজেই পাওয়া যায়

Licensed User of TM : Geoffrey Manners & Co. Ltd.

HR 152 Ben

ওরা যমজ,—দুজনেই প্রাণবন্ত, উচ্ছল

মা এমন এক বেবী ফুড খুঁজছিলেন যা আমাদের দুজনের পক্ষেই খুব ভাল।

মা নিয়ে এলেন আমূলস্প্রে। আমাদেরও মনে হচ্ছে এটি দারুণ ভাল।

জীত সবসময় উৎসাহে যেন টগবগ করছে। আর গামাক শিখছে সবসময়, প্রতিদিনই নতুন কিছু আবিষ্কার করছে।

ওদের দুজনের মধ্যেই কিছু মিল আছে · দুজনেই খায় আমূলস্প্রে, দুজনেরই স্বাস্থ্য খুব ভাল।

আপনিও আপনার বাচ্চাকে একেবারে প্রথম সপ্তাহ থেকেই আমূলস্প্রে খাওয়াতে শুরু করুন। হজম করা সহজ—আমূলস্প্রে যোগায় সুষম পুষ্টিগুণ। কারণ, এতে আছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন আর খনিজপদার্থ। আর আছে, বাচ্চার সঠিক বৃদ্ধির জন্য বেশী পরিমাণে ভালো মানের প্রোটিন: তাই, যেমন মায়েদের, তেমনি ডাক্তারদেরও আমূলস্প্রে'র ওপর এত বেশী আস্থা। এটিই ভারতে সবচেয়ে বেশী বিক্রীর বেবী ফুড।

আমূলস্প্রে

মায়ের দুধের আদর্শ বিকল্প

কাইরা ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিঃ, আনন্দ, গুজরাট।

ASP/AS/24

আমি অর্ধচেতন অবস্থায় চিত হয়ে শুয়ে যখন 'শিশাগাড়ি' ও 'চন্দ্রাগাড়ি' পাহাড় পেরোচ্ছিলুম, তখন আকাশ থেকে ঈশ্বর আমাকে দর্শন করে পুণ্যসঞ্চয় করছিলেন! রতিবাবু কাঠমাণ্ডুতে থেকে গেলেন তাঁর গলায় ওই হারগাছটা ঝুলিয়ে।

ভীমপেড়িতে আমাকে বাগমতীর ঘাটে নামিয়ে কুড়িটা টাকা আমার মাথার তলা থেকে নিয়ে কুলীরা চলে গেল। আমি বেপরোয়ার মতো বাগমতীর বরফগলা জলে স্নান করে নিউমোনিয়া সারালুম এবং উক্ত ডঃ দাশগুপ্ত ও মুস্তফী—যাঁরা আমার আরোগ্যলাভ কল্পনাও করেননি, কলকাতায় ফিরে তাঁদের টাকা মনি অর্ডার-যোগে পাঠিয়ে দিলুম। অতঃপর কিছুকাল পরে সেই হারটি গলায় পরেই রতিবাবু দেশে ফিরলেন। শ্রীমতী সাধনা বহু হয়রানির পর সেই হারগাছটি কিভাবে রতিবাবুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সে এক হাস্যকর কাহিনী। যাই হোক, এর আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত আমি 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

নেপাল থেকে ফিরে লেখাপড়ায় যখন মনঃসংযোগ করছিলুম তখন কানে এল, আমার এই কেদার-বদরীর ভ্রমণ কাহিনীর প্রথম কিস্তি তার নতুনত্বের জন্য একটা সাড়া তুলেছে! ভ্রমণ কাহিনী তখন বাংলা সাহিত্যে খুবই কম এবং কতকটা গতানুগতিক। তবু এর মধ্যে জলধর সেনের 'হিমালয়' এবং প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক 'হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানস সরোবর'—এ দুটি বই খুবই মূল্যবান। ওঁরা দুজন পথিকৃৎ, সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে আমি আমার বাহাদুরী একেবারেই স্বীকার করিনে। তবে এটি লক্ষ্য করছিলুম, 'মহাপ্রস্থানের পথে' ভারতবর্ষে প্রতি মাসে এক-এক কিস্তি বেরোয়, আর পাঠকমহলে যেন ঝড় ওঠে! বইখানা বোধ হয় গতানুগতিকতার পথ ধরে চলেনি, তাই সম্ভবত সাহিত্য সমাজপতিদের তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল।

আমি আমার আশ্রম-রচনার চিন্তা কতকটা ছেড়েছি, কিন্তু বাগান-বাড়ি বানাবার কল্পনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। পাখি আকাশে উড়ুক, তার ডানায় যত জোর আছে তাই নিয়ে ঘুরুক শূন্যে-শূন্যে। কিন্তু কোথাও কোনও অরণ্যে, কান্তারে, কোথাও এক বৃক্ষচূড়ায় তার একটি নীড় বাঁধা থাক। এই রস-কল্পনা মনে নিয়ে যখন নিঃসম্বল অবস্থায় এখানে-ওখানে ঘুরছি তখন আমার সাংবাদিক বন্ধু বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত একটি খবর দিলেন। বরিশালের হরিদাস মজুমদার মহাশয়—যিনি কোনও একটি স্টেটের ম্যানেজার—তাঁর বাড়ি আছে দমদম বিমান ঘাঁটির গায়ে পূর্বদিকে—ওটার নাম নারায়ণপুর। ওখানে তিনি আমাকে কিছু জায়গা দিতে পারেন। খবর শুনে পরদিনই বিজয়বাবুকে নিয়ে পাতিপুকুর স্টেশন থেকে ছোট ট্রেন ধ'রে মাত্র কয়েক মাইল গিয়ে নারায়ণপুরে নামলুম। নিঝুম সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন গ্রাম। মশা, ডোবা, ম্যালেরিয়া—এসব নেই। সাদা শালুক ফুটে রয়েছে বড় বড় স্বচ্ছ দীঘিতে। কলকাতার অতি সন্নিকট। ওখানে হরিদাসবাবু সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁর সুবৃহৎ অট্টালিকায় তুললেন। তিনি অতি ভদ্র, সৌম্যদর্শন এবং মিষ্টভাষী। 'অমৃত সমাজ' এবং 'গীতাভবন'-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই 'অমৃত' নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদক হলেন বিজয়বাবু। এ ছাড়া হরিদাসবাবু কড়েয়া-রাসমণি বাজারের ওদিকে একটি মহিলা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন—সেখানে সহায়-সম্বলহীনা মহিলারা থাকতে পারেন। হরিদাসবাবু উচ্চশিক্ষিত এবং এম-এ, বি-এল। তিনি খুব সামান্য অবস্থার মানুষ, তখন কলকাতায় এসে পূর্বোক্ত স্টেটে চাকরি নেন।

এখানে নারায়ণপুরে তিনি আমাকে একটি চমৎকার তিন বিঘার প্লট বিনামূল্যে দিতে চাইলেন, এবং একটি বাংলো তৈরির সর্বপ্রকার উপকরণ ও মালমসলা তিনি সরবরাহ করবেন ও তাঁরই মিস্ত্রির মজুরে আমার সব কাজ ক'রে দেবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি আমাকে জমিটি দেখালেন। বাংলোটি নির্মাণের জন্য আমার যে ঋণ হবে, হয়ত হাজার দুই আড়াইয়ের মতো—সেটা ধীরে সুস্থে পরিশোধ করলেই চলবে। এমন লোভনীয় প্রস্তাব তিনি করছেন কেন—আমার এই সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, আপনাকে এখানে এনে বসাতে পারলে আমি আট দশটি পার্টিকে প্রভাবিত ক'রে এই গ্রামে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। আপনি রাজি হয়ে যান। বলা বাহুল্য, আমি হরিদাসবাবুর তিনতলা অট্টালিকার উপরে উঠে ওরই গায়ে বিস্তীর্ণ বিমান ঘাঁটির সুন্দর দৃশ্য দেখে তখনই রাজি হয়ে গেলুম। যদি কখনও এদেশে যুদ্ধ বাধে এবং এই বিমানঘাঁটি আক্রান্ত হয়, তবে প্রথম মৃত্যু হবে আমার! ইংরেজ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আমার সেই গৌরবজনক অপমৃত্যুর সম্ভাবনা স্মরণ ক'রে আমার রোমাঞ্চ পুলক হচ্ছিল!

যাই হোক, আমার এই রাজি হবার সংবাদটি পেয়েছিলেন আমার বন্ধু রবি রায় —যিনি নাট্যমন্দিরের এক বিশিষ্ট অভিনেতা। তিনি ও তাঁর ভাই গিয়ে নারায়ণপুরে জমি নিয়ে ঘর তুলে বসবাস আরম্ভ করেন। আমার কপাল পোড়া, হরিদাসবাবুর স্নেহের দান আমি নিতে পারিনি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই সূত্রে আমার বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়ে গেল। আমার মধ্যে বৈরাগ্য ও বিষয়াসক্তি একই সঙ্গে কাজ করছিল। আজ যেটা পরম আসক্তির সঙ্গে প্রাণপণে আঁকড়িয়ে ধরি, আগামী-কাল সেটা আমার কাছে তার সব অর্থ হারায়! আমি সম্ভোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসের কথা ভাবি।

যতদূর মনে পড়ছে এমনি একটা সময়ে দার্জিলিঙে লেবং-এর রেসকোর্সে বাঙ্গালার তদানীন্তন গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসনকে গুলী করে হত্যা করার চেষ্টা করতে গিয়ে দুটি তরুণ যুবক ধরা পড়ে যায়। তাদের মধ্যে একটি ছেলের নাম রবীন ব্যানার্জি। ওদের সঙ্গে একটি মেয়েও জড়িত ছিল। তার নাম উজ্জ্বলা মজুমদার। এই সংবাদটি শোনার পর আমি আপাতত আমার নতুন কুটুম্ব শ্রীমতী শোভার ওখানে যাতায়াত বন্ধ করেছিলুম!

এর মধ্যে কিছুকাল আগে আমার দু'খানা নবপ্রকাশিত বই 'নিশিপদ্ম' ও 'কলরব' অসীম সাহসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলুম—যেমন অনেকেই তখন পাঠাতো। তখনকার দিনে কালিকলম, কল্লোল ও প্রগতির লেখকগোষ্ঠীর রচনাকে 'তরুণ সাহিত্য' বলা হত। এই সাহিত্যের তথাকথিত 'দুর্নাম' ছিল প্রচুর। কিন্তু সম্প্রতি নবলেখক ও কবিদের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ও গল্প-উপন্যাস প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করার ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছিল।

কবিকে বই পাঠিয়েছি, বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। প্রথমটা আমার বুক দুরু দুরু করছিল, এখন সে অস্বস্তি সয়ে গেছে। বই নিশ্চয় তাঁর হাতে পড়েনি, নয়ত তাঁর আশেপাশের লোক তাঁকে পড়তে মানা করেছে। আর নয়ত তাঁর বিশ্বজোড়া কাজের মধ্যে আমার সামান্য বই কোথায় তলিয়ে গেছে! আমি ভাবছিলুম, কবিকে বই না পাঠালেই হত!

এমনি সময় বৈশাখের প্রারম্ভে একদিন হঠাৎ একখানা খামের চিঠি এল। উত্তরায়ণ শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছেন শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। চিঠিখানা এই প্রকার : "সবিনয় নিবেদন, কবি মনে করেছিলেন আপনাকে কিছু না জানিয়ে প্রথমেই আপনার বই সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসা বাক্য কাগজে বার করবেন। "পরিচয়" পত্রিকা কি আপনার হাতে পৌঁছয়নি? তাতে উনি অন্য প্রসঙ্গে আপনার বই সম্বন্ধে বলেচেন। আপনার লেখা তাঁর বিশেষ রকম ভালো লেগেচে। আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন। ভবদীয়..." ১৯।৪।৩৩।

কবি অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তখন রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি। খামের চিঠিতে তখন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ মার্কা এক

চুলের পরিচর্যায় নতুন কিছু ভাবতে হবে...

নতুন হ্যালো কস্‌মেটিক শ্যাম্পূ ব্যবহার করে দেখুন,
আপনার চুল কতো বেশী নরম ও রেশমের মতো চিকন হয়ে ওঠে।

আধুনিক বিনাসাবানের শ্যাম্পু এতে রয়েছে বিশেষ সুসমঞ্জস উপাদান।

New Halo SHAMPOO COSMETIC

তিনটি সুবিধাজনক সাইজে পাওয়া যাচ্ছে

হাল ফ্যাশানের জন্যে দরকার নরম, রেশমের মত মসৃণ আর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঝরঝরে ঝলমলে চুল। কিন্তু আজকের শহরগুলোর ধোঁয়া ধুলো বালি তেল কালি চুলের [illegible] নষ্ট করে দেয়। সেজন্য সেকেলে ধরনের শ্যাম্পু ব্যবহার করলে তেমন ভালো ফল পাওয়া যায় না। এখন আপনার দরকার হ্যালো কসমেটিক শ্যাম্পু—বিশেষ সুসমঞ্জস ফর্মুলায় আধুনিক বিনাসাবানের শ্যাম্পু। এটি দুভাবেই কাজ করে—এক দিকে সব তেল বালি ঝেঁটিয়ে তাড়ায় আর অন্য দিকে আপনার চুলের [illegible] কমনীয়তা ফিরিয়ে এনে স্বাভাবিক সৌন্দর্যে উজ্জ্বল ক'রে তোলে। আপনার [illegible] এই রকম চুলই চায়—হাল ফ্যাশানের [illegible] আপনার। তাই এর নাম রাখা হয়েছে হ্যালো কসমেটিক শ্যাম্পু—আধুনিক যুগের আধুনিক কেশপরিচর্যা। ব্যবহার ক'রেই দেখুন না।

সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সারা পৃথিবী জুড়ে হ্যালোর জুড়ি নেই!

MCS.8.1 BN

আনা অথবা এক আনা তিন পাই দামের স্ট্যাম্প মারা হ'ত। সে সময়ে কলকাতার সরকারি আপিসে খাঁটি তামার পাই-পয়সা চলত। বারো পাই হলে এক আনা হ'ত।

সে যাই হোক, তৎকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তরুণ সাহিত্যের মানসপ্রকৃতি ও সাহিত্যনীতি নিয়ে এখানে-সেখানে আভাস-ইঙ্গিতে একটু-আধটু মন্তব্য করেছেন মাত্র। কিন্তু সেদিন অবধি কোনও তরুণ লেখকের কোনও বিশেষ বই নিয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোথাও সমালোচনা বা আলোচনা করেছেন কিনা আমার মনে পড়ছে না। সেই কারণে আমার বই দুখানাকে কেন্দ্র ক'রে তরুণ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর এই প্রথম প্রত্যক্ষ অভিমত একটি ছোটখাটো ইতিহাস সৃষ্টি ক'রেছিল, তাই জন্য তাঁর সমালোচনার এই অংশটি এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

"ঠিক এই সময়েই প্রবোধ সান্যালের "কলরব" আর "নিশিপদ্ম" বই দুটি আমার হাতে পড়ল। এরা সম্পূর্ণ অন্য জাতের। এরা নিছক আধুনিক।

"রিয়ালিজম এবং আইডিয়ালিজমকে প্রাকৃতিকতা এবং ভাবিকতা নাম দেওয়া যেতে পারে। এই দুটোকে নিয়েই মানুষের কারবার। প্রকৃতিকেও সে স্বীকার করতে বাধ্য, তার সঙ্গে তার আপন ভাবের সৃষ্টিও আপনি এসে মেশে। দুইয়ে মিলেই তার রিয়ালিটি; কোনো একটা সাহিত্যিক মতবাদ নিয়ে বলা চলবে না যে মহাভারতের শকুনিই সত্য আর অর্জুন তা নয়, কিম্বা কর্ণের মধ্যে যে অংশে নীচতা সেই অংশে সে রিয়াল, যে অংশে মহত্ত্ব সেই অংশটাই বানানো।

"মহাভারতে প্রাকৃতিক এবং ভাবিক অনায়াসে মিশে গেছে, এমন কি অপ্রাকৃতও আপন জায়গা নিয়েছে বিনা কৈফিয়তে। এত বড় সর্বগ্রাহী গল্প জগতের আর কোনো সাহিত্যে লেখা হয়নি। এর মধ্যে সাহসের সীমা নেই।

"কিন্তু নবীন মতবাদওয়ালাদের সাহিত্যে ভীরুতা আছে যথেষ্ট। এর সুন্দরকে ভয় করে পাছে কেউ গাল দিয়ে বসে এসব মন ভোলাবার ছল, ভালোকে সরিয়ে ফেলে পাছে সেটাতে গুরুগিরির অপবাদ লাগে। এমনি করে এরা কিছুতেই অসংকোচে সহজ হতে পারে না। সাহিত্যে ভালোটা মন্দর চেয়ে ভালো এমন কথা যদি বা অশ্রদ্ধেয় হয় তবু সাহিত্যে ভালোমন্দর একই দর অন্তত এও তো মানতে হবে। কিন্তু এমন ব্যবহার করলে তো চলবে না যে মন্দটার দর ভালোর চেয়ে বেশি—যেহেতু মন্দটাই রিয়াল। সাহিত্যে এরা এমন একটা জাল পাততে চায়, যে জালে চুনো-পুঁটি পড়ে, এড়িয়ে যায় রুই কাৎলা। রুই কাৎলাকে গাল দিয়ে বলে ওগুলো উঁচ-কপালে সৌখিনদের মাছ। কোনো কারণে কোনো ভোজে বা কোনো তরকারীতে চুনোপুঁটির যদি বিশেষ ফরমাস থাকে তাহলে আপত্তি করব না কিন্তু কুলবন্ধনের নতুন নিয়মে বড়ো মাছকে যদি একঘরে করা হয় তা হলে বলতেই হবে খাঁটি রিয়ালিজম্ এ নয়, এটা বিশেষ দলের ঘরগড়া রীতি, অর্থাৎ কনভেনশন, নীচতাকেই কৌলিন্যের একমাত্র মর্যাদা দেওয়া। এটাকে বাইরে দেখতে মনে হয় সাহসিকতা কিন্তু বস্তুতই এটা ভীরুতা। এটা বাঁধা রাস্তার আধুনিকতাগিরি।

"প্রবোধ সান্যালের "কলরব" পড়লুম। পড়ে তাঁর রচনা ও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হোলো। এই বইয়ে নানা চরিত্র ও নানা ঘটনার ভিড়। কোনটাকেই মনে হয় না যে বেঠিক। এতগুলো মেয়ে পুরুষকে স্পষ্ট করে গড়ে তুলতে ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতা আছে লেখকের।

"লেখক ইচ্ছে করেই এই বইয়ে দেখাতে চেয়েছেন, একটা বাড়িতে অত্যন্ত সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার একটা ঘোলা আবর্ত। তারা পরস্পর কাছাকাছি আছে এই পর্যন্ত, কিন্তু তার চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের নেই। যেমন অনাদৃত গলি যত রকম আবর্জনায় নোংরা দুর্গন্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে এ বাড়িতে তেমনি বহুলোকের চিত্তদৈন্য ও অবস্থাদৈন্যের যত কিছু উচ্ছিষ্ট স্তূপাকার হয়ে বাতাসকে মলিন করে তুলেচে। এর মধ্যে অসামান্যতা কোনো চরিত্রে কিছুমাত্র নেই তা নয়—কিন্তু সে কেমন, হাসপাতালে মাঝে মাঝে যেমন দেখা যায় নার্স কিম্বা ডাক্তার কিম্বা ছাত্র। তারা মুখ্য নয় তারা গৌণ।

"হাসপাতালটা সাধারণ সংসারের প্রতিরূপ নয়। সাধারণ সংসার স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যে মেশানো; সেইটাকেই বলা যেতে পারে রিয়াল। হাসপাতাল রিয়াল নয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়, ও একটা ছেঁকে আনা জিনিস। তবু ওর স্বীকৃতির দাবী আছে, কেবল প্রয়োজনের দিক থেকে নয়,

রমাপদ চৌধুরীর সাম্প্রতিক বই

চোখে চোখে ৬·০০

রঙমিছিল ৫, স্বর্ণলতার প্রেমপত্র ৬,

প্রফুল্ল রায়ের নতুন উপন্যাস

স্বপ্নের সীমা ৫·০০

কেয়াপাতার নৌকো ১ম ১২·৫০ ২য় ১১·০০ জন্মভূমি ৮·৫০ রাজা ৪·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

নদীর ওপার ৭·০০

দৃষ্টিকোণ ৭, বেঁচে থাকার নেশা ৫,

বুদ্ধদেব গুহর সদ্য প্রকাশিত বই

আয়নার সামনে ৪·০০

কোয়েলের কাছে ৯, পারিধী ৬, জলছবি ৫॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলি-১২

অস্তিত্বের দিক থেকে। ওটা একটা-কিছু হয়ে দাঁড়িয়েছে অতএব সেই মূল্য তাকে দেওয়া চাই। 'কলরবের' বাসাখানাও নিছক অসুস্থদেরই বাসা। সংসারে তারা এ-গলিতে ও-গলিতে ছড়িয়ে থাকে। তাদের ছেঁকে এনে একটা জায়গায় সংহত রূপে দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ যা ছিল ক্ষেত্রের মধ্যে তাকে টিনের মধ্যে বিশেষ জারক রসে ডুবিয়ে প্যাক করা হোলো। আচ্ছা তাই সই।

"হাঁসপাতাল সংসার থেকে দূরের জিনিস, স্বতন্ত্র করা তার সত্তা। সেই দূরের দৃশ্য বিশেষ দিনে দেখতে যাওয়া চাই, রোগীরূপে নয়, ডাক্তাররূপে নয়, নিরাসক্ত দর্শকরূপে। সেই হিসাবে এই হাঁসপাতালী গল্পটাকেও কি রোমান্স বলব না। কিন্তু যদি বলি রোমান্টিক তাহলে আধুনিক মতওয়ালারা লজ্জা পাবেন, কেননা ও শব্দটাকে তাঁরা পছন্দ করেন না। উপায় নেই, পাঠক গল্প শুনতে চেয়েছে, লেখক গল্প জুগিয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক সংসার থেকে দূরের দৃশ্য। মনটা ছুটিতে দূরে যেতেই চায়—গল্প ছুটির জন্যেই। এই দূরের হাওয়া বিচিত্রবর্ণ বসন্তের হতে পারে, হতে পারে ফ্যাকাশে রঙের দারিদ্র্য শীতের।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪০

রাজনীতির দিক থেকে এই সময়টা তখন খুব ঘোরালো।

বাংলার বিপ্লববাদকে শুধু দমন নয়, ওটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য বাংলার বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছে ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়। বস্তুত, তৎকালে বাংলার লাট, বাংলার গভর্নমেণ্ট, লালবাজারের পুলিস ঘাঁটি, ফোর্ট উইলিয়মের বৃটিশ সামরিক অফিসার, বৃটিস ব্যবসায়ী সমাজ এবং ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর গোয়েন্দা বিভাগ—এরা সবাই একযোগে বাংলার বিপ্লববাদকে শায়েস্তা করার জন্য সর্বপ্রকার কৌশলকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। এঁদের গোপন বৈঠক বসত রাত্রের দিকে গভর্নমেণ্ট হাউসের নিভৃত অংশে। এঁরা বিশ্বাস করতেন, বাংলার এই বিপ্লববাদী এবং বৃটিশ বিরোধী চিন্তাধারাকে যদি উচ্ছেদ করা যায় তবে সব ভারতকে মুঠোর মধ্যে আনা সহজ হবে। বাংলা হল নাটের গুরু। বাঙালীকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারলে তারপর নিজের থেকেই জুড়িয়ে যাবে।

সেই কারণে বাংলায় দমননীতির চেহারা এ বছরে ছিল প্রচণ্ড। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, রাজনৈতিক সম্মেলনের উপর [illegible] কাগজে না বেরোয় তার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী, [illegible] বাজেয়াপ্ত করা, সামান্য সন্দেহে যে কোনও ছেলেকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা বিভাগে নিয়ে যাওয়া, এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক বন্দীদের উপর নির্দয় উৎপীড়ন। এগুলি সব একত্র করে যা দাঁড়ায় সে হল একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব। বিপ্লববাদীরা যখন হাসিমুখে জেলে ও দ্বীপান্তরে যাচ্ছে, যখন হাসিমুখে ফাঁসীর দড়ি গলায় নিচ্ছে, ইংরেজের চক্ষু তখন প্রতিহিংসায় রক্তবর্ণ!

একদিকে এইভাবে সমগ্র বঙ্গভূমি যখন বন্ধু, অপমানে, অত্যাচারে, দেশাত্মবোধের উন্মাদনায় জাতীয় হৃদয়াবেগে এবং নির্দয় উৎপীড়নে আলোড়িত তখন অন্যদিকে দেখি একই কালে বাঙালীর সাংস্কৃতিক কর্মযাত্রা। রবীন্দ্রনাথের নবতম রসের চিত্রকলা, সঙ্গীত ও নাটকের [illegible] রায়, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের চিত্র-

"করকরে সেকেলে দাঁতের মাজন আপনার মাড়ি ও দাঁতের অনিষ্ট করতে পারে..."

কলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন—আর সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধ বন্ধ করুন!

সেকেলে করকরে দাঁতের মাজনগুলো আপনার মাড়ির ক্ষতি করতে ও দাঁতের এনামেল ক্ষয়িয়ে দিতে পারে। কলগেট টুথ পাউডার বেজায় মিহি। এর চকচকে করার মৃদু উপাদান দিয়ে দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে দাঁতগুলিকে আরও পরিষ্কার আরও সাদা করার সময় এটি সযত্নে আপনার মাড়ি মালিশ কোরে দেয়। কলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকেফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী বীজাণুগুলিকে দূর করে। সেই জন্যেই কলগেট টুথ পাউডার সঙ্গেসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধ বন্ধ করে ও দাঁতের ক্ষয় রুখে দেয়। এর মিষ্ট তাজা স্বাদটিও আপনার ভাল লাগবে।

প্রদর্শনী, নিউ থিয়েটার্সের এক একটি সাফল্যমণ্ডিত সবাক চিত্র, নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটারের যুগান্তকারী এক একখানি নাটক, শরৎচন্দ্রের একটির পর একটি উপন্যাস, নজরুলের চিত্তাকর্ষক শ্যামা-সঙ্গীত, এবং কল্লোল-কালি কলম-প্রগতির প্রত্যেক লেখকের কবিতায়, উপন্যাসে, প্রবন্ধে নব নব সাহিত্য ও জীবনচিন্তার মৌলিক অভিব্যক্তি—সমগ্র বিদগ্ধ বাঙ্গালীর মনকে অভিভূত করে তুলেছে।

এই বছরটি ছিল রাজা রামমোহনের মৃত্যুশতবার্ষিকী উদযাপনের বছর। শুধু বাংলায় নয়, ভারতের বহু অঞ্চলে এবং বিলাতের ব্রিস্টল নগরের উপান্তে যেখানে রামমোহনের সমাধিক্ষেত্র—সেখানেও রাজা রামমোহনের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দানের আয়োজন করা হয়। যতদূর মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় এই উপলক্ষে 'ভারত পথিক রামমোহন' নামক তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধটি রচনা করেন। কলকাতা নগরী রামমোহনের প্রসঙ্গে সর্বত্র মুখরিত হয়েছিল। চারিদিকে রামমোহনের উদ্দেশে এই শ্রদ্ধাঞ্জলির মধ্যে আমারও শ্রদ্ধা যোগ করেছিলুম একটি বেতার ভাষণে। লেখাটি ছাপা হয়েছিল নানা একটি কাগজে।

অন্য দিকে এই বছরের প্রারম্ভে ব্রিটিশ শক্তির উৎপীড়ন যখন চরমে ওঠে সেই সময় কংগ্রেস ঘোষণা করে, কলকাতায় এই জাতীয় মহাসভার চরমতম অধিবেশন বসবে এপ্রিলের প্রথমে। তখন গান্ধীজী প্রমুখ বহু সর্বভারতীয় নেতা কারাগারে এবং বাংলার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বন্দী অবস্থায় এবং অসুস্থ দেহে পুলিস পাহারায় রয়েছেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বলা বাহুল্য, ১৯৩৩-এর এই কংগ্রেস অধিবেশনকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। তৎকালীন পুলিসের সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন মিঃ রবার্টসন এবং তাঁর খ্যাতি ছিল এই যে তিনি নাকি দুর্ধর্ষ। তাঁর নির্দেশ ছিল, এই অধিবেশন উপলক্ষে কোথাও প্যাণ্ডাল বা আটচালা বাঁধা চলবে না।

এই জাতীয় সংকটকালে তৎকালীন 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলনের' অসমসাহসিক কর্মীরা অগ্রসর হয়ে এসেছিল, কিন্তু প্রথমেই তাদের অনেককে 'বঙ্গীয় নিরাপত্তা আইনে' গ্রেপ্তার করা হয়। এই ছাত্র সম্মেলন ও 'ছাত্রী সংঘের' প্রথম জন্ম ঘটে ১৯২৮ সালে এবং তাদের মুখপত্রটির নাম দেওয়া হয় 'ছাত্র'। এদের উভয়ের সম্মিলিত প্রথম অধিবেশনে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র যোগদান করেন—এই খবরটি পেয়েছিলুম আমি যখন রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় পার্বত্য শহর মারী পাহাড়ে বাস করছিলুম। যাই হোক, ছাত্র সম্মেলনের প্রথম সভাপতি, সহ-সভাপতি ও জেনারল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন যথাক্রমে প্রমোদ-কুমার ঘোষাল, শচীন্দ্রনাথ মিত্র ও বীরেন্দ্র-নাথ দাশগুপ্ত। অতঃপর 'ছাত্রী সংঘের' সভানেত্রী ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীমতী সুরমা মিত্র, কল্যাণী দাস এবং তাঁদেরই সঙ্গে যুক্ত হন বীণা দাস, ইলা সেনগুপ্ত, রেণুকা সেনগুপ্ত প্রভৃতি। কালক্রমে এই দুই সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিপুল কর্মশক্তির পরিচয় দেয়।

ইংরেজ পুলিস ১৯৩২ সালের দিল্লীর কংগ্রেস ভেঙে দেয়। প্রত্যেক নেতাকে জেলে ঢোকায়। অর্থাৎ বিগত ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারিতে যখন লাহোর কংগ্রেসে প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করা হয় এবং করাচীতে সেই বছরের ছোট কংগ্রেসে সেই দাবি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকেই ব্রিটিশ রাজশক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এরা দুই নির্দয় বড়লাট ও ছোট-লাটকে পাঠায় দিল্লীতে ও কলকাতায়। একজনের নাম লর্ড উইলিংডন, অন্যজনের নাম স্যর জন অ্যাণ্ডারসন। রবীন্দ্রনাথ এই সময় বোধ হয় তাঁর 'কালান্তর' নামক প্রবন্ধে একটি উক্তি করেছিলেন, "দিল্লীশ্বরো বা উইলিংডনেশ্বরো বা।"

যাই হোক, এটি ১৯৩৩। এ বছরে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে একটির পর একটি অর্ডিনান্স, একটির পর একটি জন-বিরোধী আইন। তারা এখন প্রবল পরাক্রান্ত, নির্মম, দানবীয়, মারমুখী ও হত্যাগ্রহী। তারা ২৬ জানুয়ারির প্রতিটি মিছিল, সভা-সমিতি, জনসমাবেশ ইত্যাদিকে বলপ্রয়োগের দ্বারা ছারখার করেছে এবং রক্ত ঝরিয়েছে অনেক। আবার দু মাস পরে এই কংগ্রেস অধিবেশন। কথা ছিল, এই অধিবেশনের মূল সভাপতি হবেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। ওঁরা সবাই ট্রেনযোগে আসছিলেন কলকাতায়। এম এস অ্যানে, জওয়াহরলালের জননী স্বরূপরানী, ডাঃ সইয়েদ মাহমুদ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, রফি আহমেদ কিদোয়াই, কে ডি মালবীয়, চন্দ্রভান গুপ্ত এবং আরও অনেকে। তাঁদের সবাইকে মাঝপথেই গ্রেপ্তার করা হয়। অন্য দিক থেকে হাজারে-হাজারে প্রতিনিধি কলকাতায় বিভিন্ন প্রকার যানবাহনে, এমন কি পায়ে হেঁটেও জড়ো হতে থাকেন। এই অগণিত সংখ্যক প্রতি-নিধিদের জন্য বাংলার ছাত্র ও ছাত্রী সমাজ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৪৫ খানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। বলা বাহুল্য, ভারতের মধ্যে গোয়েন্দা পুলিসের সর্বপ্রধান কেন্দ্র হল কলকাতার ইলিসিয়ম রো ওরফে লর্ড সিংহ রোড এবং ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দারা হলেন বাঙ্গালী! বাঙ্গালীর অপরাজেয় প্রতিভা এদিকেও সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু এদের চক্ষুকেও ফাঁকি দিয়ে ছাত্রসমাজ সংগোপনে এই অধিবেশনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা পেয়েছিল।

ব্রিটিশ প্রশাসন অনেক আগে থেকে এই কংগ্রেস বা যে কোনও স্থলের জন-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছিল। দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চতুর, গোয়েন্দা-বিভাগ চতুরতর, কিন্তু কংগ্রেসী ছাত্রসমাজ চতুরতম! ইতিমধ্যে তারা সেনগুপ্তের পত্নী নেলী সেনগুপ্তাকে মূল সভাপতির পদে নির্বাচিত করে রাখে। স্বনামধন্যা অ্যানি বেসান্ত সকল জাতি ও সমাজের ঊর্ধ্বে ছিলেন—যেমন ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়া মাদার ব্লাভাটস্কি। আজ এক ইংরেজ মহিলা সকলের মাঝখানে এসে উপস্থিত হলেন এই জাতীয় সংকট-মুহূর্তে।

আজ এই বিয়োগান্ত নাটকটি কি প্রকারে শেষ হবে এই উৎকণ্ঠায় ধর্মতলা ও চৌরঙ্গীর মোড়ে ব্রিস্টল হোটেলের দোতলায় উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। এটা নিরপদ, হবে এটি পুলিস কর্তৃক আক্রান্ত হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

আমার ঠিক সামনে চৌরঙ্গীর মোড়ের কাছেই তখন ট্রামওয়ে কোম্পানির ছয়-চালা গুমটি। ওর ঠিক পাশেই বসবে কংগ্রেসের অধিবেশন—এই সংবাদটি গোপনে রাখা হয়েছিল। ঠিক বেলা তিনটার সময় তার-স্বরে এক বিউগল বেজে উঠল এবং তারই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে হাজারে-হাজারে প্রতিনিধি ও শত শত ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক পিলপিল করে ছুটে চলল গুমটির দিকে এবং দেখতে দেখতে আশে-পাশে লাখ দুই জনসাধারণ! ট্রাম, মোটর, ট্যাক্সি, ট্রাক—সমস্ত আটকিয়ে গেল। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল মতি শীলের গলিতে। তিনি অগ্রসর হয়ে-ছিলেন ট্রাম-গুমটির দিকে। "বন্দে-এ-এ মাতরম!"

সেই ক্ষণের মুহুর্মুহু বন্দে মাতরম্ ধ্বনি ও চারিদিকের জাতীয় পতাকার গোচ্ছা মিঃ রবার্টসনের কম্পিত হৃৎপিণ্ডে প্রচণ্ড রক্তের পিপাসা জাগিয়ে তুলেছিল। মেয়েরা গিয়েছিল কোলে-কাঁকালে শিশুকে নিয়ে। পুলিস তখনই বক্তৃতারতা নেলী সেনগুপ্তা ও গোপিকাবিলাস সেনকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তুলে নিল। অতঃপর প্রহার-নাট্যের আরম্ভ। যখন এক একজন প্রতিনিধি প্রস্তাব-বাক্য পাঠকালে পুলিসের লাঠির আঘাত খাচ্ছিলেন এবং লাঠির ঘায়ে কপাল বেয়ে রক্তধারা নামছিল, তখন দেখা যাচ্ছিল, এক-খানা হাত ভেঙে যাওয়ার ফলে অসীম যন্ত্রণার মধ্যেও অন্য হাতে কাগজ ধরে তাঁরা শপথ-বাক্য পাঠ করছিলেন। এ দৃশ্য দুর্লভ। এমন একটির পর একটি। অবিমিশ্র অহিংসার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড হিংসার সেই আক্রমণের ফলে সেদিন যে-রক্তস্রোত বয়েছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সেটি স্মরণীয়।

(ক্রমশ)

ব্রেকফাস্টে চাই নেস্‌কাফে
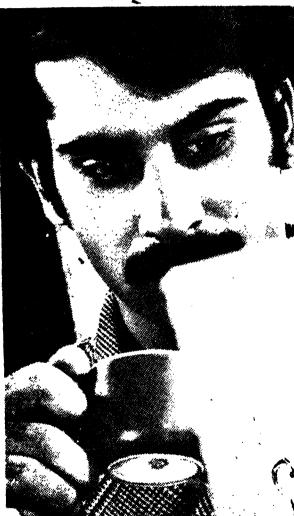
কাজে ঠাসা সারাটা দিন
শুরু হবার আগের
আলস্য মধুর
কয়েকটা মুহূর্ত।
মোহ কিছুতেই কাটে না
কাটে না পছন্দসই
এক কাপ কফির আকর্ষণ।
নেস্‌কাফে—উষ্ণ,
প্রাণরসে ভরপুর।

ব্রেকফাস্টের জন্য
এমন চমৎকার পানী[illegible]
সারা পৃথিবীতে আ[illegible]নেই।

সব সময়েই লাগবে ভাল দেখুন খেয়ে নেস্‌কাফে

ACIL—114

॥ সাতাশ ॥

শ্বেত রুশ ছেলে দুটি কি করবে এখন ?

উদয়শঙ্করের বুকে একটা অদম্য কৌতূহলে ভরে উঠেছিল। সময়ের এক চুল এদিক-ওদিক কখনো করেন না পাভলোভা। কাঁটায় কাঁটায় ছটার সময় ঠিক পর্দা উঠেছে। প্রোগ্রাম অনুযায়ী নাচ হয়েছে একে একে।

এইবার হবে হাঙ্গেরীয় ব্যালে। পণ্ড তো হবে নিশ্চয়ই। ওই ছেলে দুটি এই ব্যালে জমিয়ে দেয়। ওদের এখন মুখ দেখা-দেখি বন্ধ। কেউ কারুর সঙ্গে কথাও বলবে না। একটু আগে উদয়শঙ্কর দেখেছিল, হাতাহাতি করে একজনের গাল ছড়ে গেছে, আর একজনের কপালে প্লাস্টার সাঁটা। কাজেই বিয়েবাড়িতে বরের দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর ভাবভঙ্গি যে কাঠ-কাঠ হয়ে যাবে সে বিষয়ে উদয়শঙ্করের কোন সন্দেহ ছিল না। তবুও হাঙ্গেরীয় ব্যালে আজ কেমন হয় তা দেখবার জন্যে সে উৎসুক হয়ে থাকল।

ঐকতান বেজে উঠল। যথাসময়ে শুরু হল সেই ব্যালে। এবং ছেলে দুটিও এল আসরে। কিন্তু এরা কারা? এরাই কি তারা—যারা মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পরস্পরকে গালাগাল করতে করতে ওই রকম মারামারি করছিল ট্রেনের কামরায়?

একটা অভূতপূর্ব বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে থাকল উদয়শঙ্কর। সে দেখল, ভাল করে দেখল। হ্যাঁ, তারাই। সেই দুটি শ্বেত রুশ তরুণ। কে বলবে তাদের মনের কোথাও কোন জ্বালা, কোন বিদ্বেষ আছে এখন। দুই পরম বন্ধুর মত তারা ঢলে পড়ছে এ ওর গায়ে। হাসছে। ভঙ্গি করছে অন্তরঙ্গতার। উদয়শঙ্করের মনে হল আগের চেয়ে এই সন্ধ্যায় ওদের ভাবভঙ্গি যেন অনেক বেশী সজীব, আরও স্বতঃস্ফূর্ত।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে মঞ্চের ওপর দুই বন্ধুকে দেখতে দেখতে শিল্পী কথাটা একটা ব্যাপক অর্থ বহন করে আনল উদয়শঙ্করের মনে। সে ভাবল, প্রকৃত শিল্পী তো এরাই—এই দুটি শ্বেত রুশ তরুণ—পাদপ্রদীপের আলোর আভায় যারা ভুলেছে স্বার্থ দ্বেষ মানুষী হীনতা। একমাত্র সত্য প্রধান হয়ে উঠেছে তাদের কাছে। সে তাদের শিল্পী-সত্তা।

যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে এসেছে উদয়শঙ্কর। তার মনে হয় এখানেও অক্ষুন্ন থাকবে তার সুনাম। এ শহরের বাতাসে কার তেজ! আলোয় কার দীপ্তি! তার জন্মের মাত্র কয়েক বছর আগে শিকাগোর জনগণের হৃদয়ে সাড়া জাগিয়ে গিয়েছেন বাঙলার এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। উদয়শঙ্করের মনে পড়ে যায় শিকাগোবাসীর উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দর অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের উদাত্ত সম্বোধন : 'ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স'!'

শো আরম্ভ হওয়ার আগে আগে একটা কৌতূহলের বশে উদয়শঙ্কর চলে আসে বুকিং অফিসের সামনে। যেন শহর ভেঙে পড়েছে এই প্রেক্ষাগৃহে। উদয়শঙ্কর অবাক হয়ে দেখে, শুধু মানুষ আর মানুষ! সব টিকিট শেষ। উদয়শঙ্কর অফিসের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং অল্প হেসে কাউন্টারের একজনকে জিজ্ঞেস করে, "কত ডলারের টিকিট বিক্রি হল?"

লোকটি বেশ জোরে বলে ওঠে, "বেয়াল্লিশ হাজার ডলারের।"

কি সাংঘাতিক বিক্রি! মাত্র আড়াই ঘণ্টার অনুষ্ঠানের জন্যে টিকিট বিক্রি হয়েছে বেয়াল্লিশ হাজার ডলারের! পাভলোভাকে নতুন করে আর একবার অসামান্যা প্রতিভাময়ী বলে মনে হয় উদয়শঙ্করের।

কয়েকদিন ধরে একটু অস্বস্তি হচ্ছে উদয়শঙ্করের। মনে হচ্ছে তাঁর পরিশ্রমের তুলনায় পাভলোভা তাকে অনেক বেশী পারিশ্রমিক দিচ্ছেন। সে পায় সপ্তাহে দু'শো ডলার। কাজ তো তার সামান্য। বিবেকে বাধছে উদয়শঙ্করের এত পারিশ্রমিক নিতে।

একদিন সে পাভলোভাকে বলল, "ম্যাডাম, যদি অনুমতি করেন, একটা কথা বলব?"

পাভলোভা স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন উদয়শঙ্করকে। পরে হেসে বললেন, "বল শঙ্কর, কি বলবে!"

"ম্যাডাম, আমার মনে হয়, কাজের তুলনায় আপনার কাছ থেকে আমি অনেক বেশী পারিশ্রমিক পাই, তাই বলছিলাম—"

উদয়শঙ্করের কথা শুনতে ভাল লাগছিল পাভলোভার। তিনি তাকে বড় মধুর করে বললেন, "বল..."

উদয়শঙ্কর বলল, "আমি আর একটু বেশী কাজ চাই। ম্যাডাম, আপনি তো সব সময় অনেক স্থানীয় শিল্পী নেন। আমাকেও ইউরোপীয় ক্লাসিক্যাল ব্যালে শিখিয়ে দিন না! মানে, তাহলে আমি অন্য কিছু কাজকর্ম করে আপনাকে আরো একটু সাহায্য করতে পারব।"

উদয়শঙ্কর তার কথা শেষ করে লক্ষ করল পাভলোভার চেহারা হঠাৎ যেন বদলে গেছে। এতক্ষণ তাঁর মুখে যে কোমল ভাব ছিল তা আর নেই। তাঁর দৃষ্টিও কঠিন হয়ে উঠেছে।

তিনি ধমক দেওয়ার মত রুক্ষ স্বরে উদয়শঙ্করকে বললেন, "থাম! কি বলছ তুমি! আমাদের ব্যালে তুমি জীবনে শিখতে

উদয়শঙ্কর

উদয়শঙ্কর

পারবে না। কেন শিখবে? জান না তোমার নিজের দেশে কি আছে!"

অপেক্ষাকৃত সংযত স্বরে পাভলোভা বলতে লাগলেন, "ভারতীয় নৃত্য, ভারতীয় সঙ্গীতের একটা বিশেষ মাধুর্য আছে। আমরা বেশী কিছু জানি না। তুমি, ভবিষ্যতে নিজের দল গঠন করে আবার আসবে এ দেশে। তোমাদের নাচ-গানের মূল ভাবধারার সঙ্গে এ দেশের মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হবে তোমার কাজ—বুঝেছ?"

শুধু যে উদয়শঙ্কর পাভলোভার কথা বুঝেছে তা নয়, তার বলা প্রত্যেকটি শব্দ নাড়া দিয়ে গেছে তার মন। ঠিক এইরকম কথাই তাকে বলেছিলেন আর একজন। তিনি তার শিল্পগুরু, স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইন। তার কথা ভাবল উদয়শঙ্কর। এবং শাক আর অ্যাডেলেডকেও তার মনে পড়ে গেল। লণ্ডনে তারাও তাকে একদিন খেলার ছলে নিজের দল খোলার কথা বলেছিল।

পাভলোভা বললেন, "আন্তরিকতা ছাড়া কোন শিল্পসাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। অদম্য উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে মনে-প্রাণে তোমাকে শিল্পের সাধনা করতে হবে।"

ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে পাভলোভা আরও বললেন, "তোমাদের দেশের মেয়েরা এত আনন্দদায়িনী যে, আমি তাদের দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। তারা সত্যিই সৌন্দর্যময়ী। তাদের লাবণ্য, গতিভঙ্গি—সবই যেন ছন্দোময়। শাড়ির মত এত সুন্দর বেশ পৃথিবীতে আমি আর কোথাও দেখিনি।"

এক দিকে স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইন, অন্য দিকে ম্যাডাম আনা পাভলোভা। এই দুই ইউরোপীয় ভিন্নমুখী প্রতিভা সুদূর সিন্ধুপারে ভারতীয় নৃত্য ও শিল্পকলার অপার মাধুর্য ও অসীম সম্ভাবনার দিকে উদয়শঙ্করের দৃষ্টি উন্মুক্ত করে দিলেন।

স্যার উইলিয়ম ইউরোপীয় চিত্রকলা সম্পর্কে উদয়শঙ্করকে বলতে গিয়ে যেমন প্রয়োগ করেছিলেন 'বোধ' সেইরকম ম্যাডাম পাভলোভাও বলেছেন, "আজকের অন্ধকার পৃথিবী অনির্দেশ্য একটা কিছু আঁকড়ে ধরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এই মনোভাব গত মহাযুদ্ধেরই প্রতিক্রিয়া। মানুষ স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারছে না কি তারা করবে, শুধু অনুভব
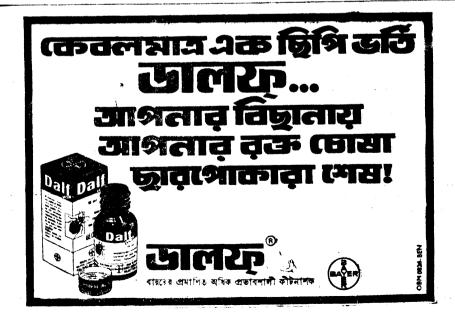
করছে একটা কিছু তাদের করা দরকার। এই মনোভাবেরই ফল 'সাজ্' নৃত্য।

"মহাযুদ্ধের সময় মানুষ শুধু একটা ভাবের ঘোরে এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে, রণলিপ্সা ছাড়া তারা অন্য কোন দিকে মন দিতে পারেনি। কিন্তু আজ তারা উপলব্ধি করতে পারছে যে, তাদের জীবন থেকে কি যেন এক অমূল্য সম্পদ তারা হারিয়ে ফেলেছে। এই অতৃপ্তির জন্যে মানুষ শান্তির সন্ধান করছে নাচ-গানের আসরে।

"আমি ব্যক্তিগতভাবে 'সাজ্' নৃত্য পছন্দ করি না, শিল্পের দিক থেকেও একে আমি ঘৃণা করি। বোধ হয় আমার মত অনেকেই এইরকম ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছে। মহাযুদ্ধের ফলে আমাদের চিন্তাধারার সাম্য আপাতত নেই। যে শান্তি, যে সাম্য আমরা হারিয়ে ফেলেছি তা ফিরে পাবার জন্যে দিশাহারার মত আমরা ছুটে চলেছি এক উগ্র আকাঙ্ক্ষা-পরিচালিত হয়ে।

"আমার মনে হয় না যে, মনীষাসম্পন্ন কোন লোক আধুনিকতার এই উগ্র রূপ পছন্দ করবে। পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত ধারণা আছে বলেই 'সাজ্' নৃত্যের জন্যে তাদের এত ব্যাকুলতা। প্রাচীন পরিমার্জিত শিল্পকলার মধ্যে যে আর্ট আছে, আধুনিক উচ্ছৃংখলতাকে তা আবার প্রশমিত করবেই। প্রকৃত চারুকলা যেন নষ্ট না হয়ে যায় এবং পৃথিবীর একটি মহত্তম প্রকাশের ধারা যেন প্রবাহিত থাকে সেদিকে শিল্পী মাত্রেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

"এই শ্রমশিল্পের যুগে, এই কলকারখানার আবহাওয়ায় আমরা শিল্পের প্রকৃত আদর্শকে যেন হারিয়ে ফেলেছি। আজকাল খবরের কাগজ খুললেই বিমানপোতের কথা চোখে পড়ে আর বিমানপোতের আকাশভ্রমণ নিয়ে পাঠকসাধারণের মনে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যান্ত্রিকতার এই চীৎকার থেমে যাবে এবং আমার বিশ্বাস পৃথিবীতে এমন একদিন আসবে যখন মানবের আত্মা প্রকৃত চারুশিল্পের রস গ্রহণ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে।"

পাভলোভার উপদেশই প্রথম উদয়শঙ্করের মনে রোপণ করে দিল সংগঠনের বীজ। এবং তাঁর দলে থাকতে থাকতেই তার দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম হয়ে এল। সে বুঝল সুশৃংখলভাবে নৃত্যের একটা দল পরিচালনা করতে হলে সবচেয়ে প্রথম অমানুষিক পরিশ্রম করা দরকার। নিয়মানুবর্তিতা, মঞ্চসজ্জা, সময়-সচেতনতা এবং শিল্পীদের কিভাবে মঞ্চে উপস্থিত করতে হবে—এসব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেল উদয়শঙ্করের।

উদয়শঙ্কর

পাভলোভার কাজ দেখে দেখেই সম্পূর্ণতা কথাটির অর্থ তার কাছে স্পষ্ট হল। তার মনে এই বোধ জন্মাল যে, আধ ঘণ্টা ধরে যা প্রদর্শন করা যেতে পারে তা যদি সর্বাঙ্গসুন্দর করে পাঁচ কিংবা সাত মিনিটে দেখানো যায় তা হলে কখনো দর্শকসাধারণের বিরক্তি আসে না—তাদের আগ্রহ অম্লান থাকে প্রদর্শনী শেষ হয়ে যাবার পরেও।

পাভলোভার সঙ্গে উদয়শঙ্করের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেল ঠিক ন' মাস পরে। তাঁর দল ছেড়ে বেরিয়ে এল উদয়শঙ্কর। সে আবার লণ্ডনে একা। বেলসাইজ পার্ক অঞ্চলে সে একটা ঘর নিয়ে আছে। তার ল্যাণ্ডলেডি খাঁটি ইংরেজ। মহিলার স্বভাব বড় মধুর। প্রথম থেকেই তিনি স্নেহের চোখে দেখতে লাগলেন উদয়শঙ্করকে।

পাভলোভার দল ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর প্রথম প্রথম মধুর একটা আশায় উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল উদয়শঙ্কর। এ দেশেই সে সংগঠন করবে তার নিজের একটা দল। পাভলোভার কথামত সে ইউরোপে দেখাবে ভারতীয় নৃত্য। পাভলোভার দলে বিদেশী ছেলেমেয়েদের সে যেমন শিখিয়েছে ভারতীয় নাচের মুদ্রা, তেমন শিখিয়ে নেবে আরও অনেককে।

কিন্তু কে আসবে উদয়শঙ্করের সঙ্গে সহযোগিতা করতে? কে তাকে দেবে প্রেরণা, দেবে সাহস? ভেরা? তার ওপর উদয়শঙ্কর ঠিক নির্ভর করতে পারে না।

পরিতোষ ঠাকুর সম্পাদিত
বেদগ্রন্থমালা
সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত
মূল অন্বয় অনুবাদ, তাৎপর্য, শব্দার্থ ব্যাখ্যা, সায়ণভাষ্য ও অন্যান্য ভাষ্য সহ।
প্রতি খণ্ড : তিন টাকা
অষ্টম খণ্ড বাহির হইয়াছে।
মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
(সি-৭৪০৫)

মনে হয়, তার রসবোধ সূক্ষ্ম নয়। উদয়শংকরই এখন ভেরার কাছ থেকে দূরে সরে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে, সিনেমা-থিয়েটার দেখে খরচ করবার মত পয়সা আর নেই উদয়শংকরের।

বস্তুত, তার আর্থিক অবস্থা এখন রীতিমত খারাপ। কি করে দিন চালাবে তা স্থির করতে না পেরে একটা দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় সে ছটফট করে। পাভলোভার সঙ্গে যতদিন ছিল ততদিন সে কাটিয়েছে রাজার মত। সপ্তাহে সপ্তাহে দু'শো ডলার! কিন্তু এখন? তার সব সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর পয়সা নেই।

জীবনে আর কখনো এমন দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েনি উদয়শংকর। চারপাশে অন্ধকার থমথম করছে। চিন্তায় চিন্তায় মাথা যেন বিকল হয়ে যাচ্ছে—কাজ করছে না। মা-বাবাকে কয়েক মাস আগে সে ফলাও করে লিখেছে তার দু'শো ডলার করে *সপ্তাহে সপ্তাহে উপার্জন করার কথা—এখন তাঁদের কিছু লেখা যায় না। তা ছাড়া সে তো আর ছাত্রও নয়। ইংল্যাণ্ড আর* আমেরিকায় এত যশ লাভ করবার পরে মহারাজাকেই বা সে তার দৈন্যের কথা জানাবে কেমন করে!

ভেরার স্বপ্নে বেশ কিছু দিন বিভোর ছিল উদয়শংকর। প্রবাসের এই দিনগুলি সে ভরে দিয়েছিল সুধায়, মধুরতায়। সে স্বপ্নও এখন ভেঙে গেছে তার। কেননা ভেরার আগ্রহ বেশী পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে। সে ধরে নিয়েছিল উদয়শংকর রাজার মতই ধনবান। তাকে নিঃস্ব দেখে ভেরা বড় হতাশ হল।

বেঁচে থাকার আগ্রহ প্রবল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে এখনো উজ্জ্বল, তবু যেন জীবনধারণ আর সম্ভব নয়। অসংযত স্বরে ভেরাকে একদিন বলল উদয়শংকর, "ভেরা, আমি একেবারে শেষ হয়ে গেছি।"

ভেরা বিরস মুখে বলল, "কি তুমি বলতে চাও?"

"বলতে চাই যে, আমি নিঃস্ব, আমার আর কিছু নেই।"

"সে তো জানি।"

"দেখ ভেরা, টাকা-পয়সার ভাবনায় আমি এখন এত বেশী বিব্রত যে, অন্য কোন চিন্তা আমি আর করতে পারি না।"

ভেরা বলল, "বুঝেছি।"

"আমার মনে হয়, প্রেম-ভালবাসা—আমার এইসব বৃত্তি একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

ভেরা উদয়শংকরের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলল, "আমাকে কি বলতে চাও তুমি স্পষ্ট করে বল।"

উদয়শংকর ম্লান মুখে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, "আমাদের এইরকম দেখা-সাক্ষাতের আর কি মানে হয়?"

ভেরা বলল, "কোন মানে হয় না। আর কিছু বলবে?"

উদয়শংকর করুণ করে হাসল। হেসে খুব ছোট একটি কথা বলল শুধু, "বিদায়!"

ভেরাও বলল, "বিদায়!"

বলে ভেরা চলে গেল। পিছন ফিরে সে আর দেখল না। উদয়শংকর একা বসে থাকল সেই পার্কে ঘাসের ওপর। যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল প্রথম যৌবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কল্পনা মিশিয়ে এতদিন ধরে, তা ভেঙে যেতে লাগল মাত্র কয়েক মুহূর্ত সময়। কিন্তু উদয়শংকরের বুক চিরে বেরিয়ে এল না একটি করুণ দীর্ঘশ্বাসও। বন্ধনমুক্তির অতি তীব্র আনন্দ সে অনুভব করল নিবিড় করে। তার দেহমন যেন অনেক হালকা হয়ে গেছে। মুছে গেছে সব গ্লানি, সব অবসাদ। উদয়শংকর একটা আবেগে ছোট ছেলের মত গড়িয়ে পড়ল ঘন ঘাসের ওপর।

শেষ বসন্তের আকাশ-ঢালা অপরাহ্ন বেলা তখন একটি একটি করে পাপড়ি খসিয়ে ফুটে উঠছে ফুলের মতন।

উদয়শংকরের ল্যাণ্ডলেডি তাকে ডাকলেন। বললেন, "ব্রেকফাস্ট তৈরী। এস।"

ইচ্ছে করেই খাবার ঘরে উদয়শংকর এল একটু দেরিতে। এসে দেখল টেবিলের ওপর ল্যাণ্ডলেডি তার প্রাতরাশ সাজিয়ে রেখেছেন। খাবার ইচ্ছে থাকলেও খেতে সংকোচ হচ্ছিল উদয়শংকরের। পয়সাকড়ি তার সব ফুরিয়ে গেছে। গত সপ্তাহের ভাড়া বাকি। কবে দিতে পারবে, আরও কত সপ্তাহের ভাড়া বাকি পড়বে সে জানে না। খাবে সে কোন মুখে!

"কি হল?" ল্যাণ্ডলেডি বললেন, "খাও।"

তা হলেও ইতস্তত করল উদয়শংকর। বলল, "থাক, খাব না।"

"কেন বল তো? কি হয়েছে, শরীর খারাপ?"

"না-না।"

"তবে?"

উদয়শংকর ম্লান করুণ মুখে, "ভাড়া-টাড়া কবে দিতে পারব জানি না। খাওয়া-দাওয়া করলে আপনারই বেশী লোকসান—"

উদয়শংকরের সততায় মুগ্ধ হলেন ইংরেজ মহিলা। কিন্তু পরেই তাকে মধুর শাসন করার মত বললেন, "থাম বাছা! চুপচাপ খাও দেখি!"

"দেখুন, সত্যি বলছি, আমি এখন একেবারে নিঃস্ব—"

"তা বলে ব্রেকফাস্ট খাবে না?" ল্যাণ্ডলেডি বড় নরম করে বললেন উদয়শংকরকে, "মানুষ চিনতে আমার দেরি হয় না। তোমাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি তুমি বড় ঘরের ছেলে। বিদেশে হঠাৎ না হয় একটু মুশকিলে পড়েছ। তাতে কি হয়েছে! টাকা আমাকে না দিতে পারলে, দেবে না। তোমার যতদিন খুশি তুমি থাক আমার এখানে। কোন ভাবনা নেই তোমার।"

স্বল্পপরিচিত এক বিদেশী মহিলার এইরকম সদয় ব্যবহার, তার স্নেহপূর্ণ এক-একটি কথা উদয়শংকরকে অভিভূত করে দিল বেদনায়। কৃতজ্ঞতার ভারে তার চোখ সজল হয়ে এল। মুখ তুলে সে তাকাতে পারল না তার ল্যান্ডলেডির দিকে।

উদয়শংকর খুব আস্তে শুধু বলল, "ধন্যবাদ!"

কিন্তু এইরকম করে তো চলে না। বিনা পয়সায় প্রাতরাশ আর থাকবার আস্তানা পেলেই কি জীবনধারণের আর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়? ভাবতে-ভাবতে উদয়শংকর সত্যিই অপ্রকৃতিস্থের মতন হয়ে ওঠে। এমন করে সে বেঁচে থাকতে পারবে না কিছুতেই।

এ সময় থেকে একটা মোটা টাকা যদি পাওয়া যেত তা হলে সে একবার শেষ চেষ্টা করত তার জীবনের চাকাটাকে ঘুরিয়ে দিতে। কিন্তু এসব কল্পনাও তার এখন ছেলেমানুষি মনে হয়। কে তাকে দেবে টাকা! সে অবসন্ন হয়ে যায়। ভেঙে পড়ে। লন্ডনের পথে-পথে ঘুরে বেড়ায় পাগলের মত। এবং থেকে থেকে তার আত্মহত্যা করার ইচ্ছেও জাগে।

হঠাৎ উদয়শংকরের মনে ঝলসে ওঠে আশার আলো। তার বিষণ্ণ মুখে খুশির একটা আভা বিচ্ছুরিত হয়। আশ্চর্য, এতদিন তাঁর কথা মনে হয়নি কেন! রানী মৃণালিনী সেন! তার কাছে গেলে হয়তো সে মুক্ত হতে পারবে এই ভয়ংকর আর্থিক সংকট থেকে! তিনিই তো তাকে চিনিয়ে দিয়েছেন লন্ডনকে। তাকে নিয়ে গেছেন ওয়েস্ট থিয়েটারে ভারতদিবসে। যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন পাভলোভার সঙ্গে।

উদয়শংকর দেরী করল না, চলল রানী মৃণালিনী সেনের কাছে। তিনি থাকেন দূরে, লন্ডনের আর এক প্রান্তে। বাস কিংবা টিউব ট্রেনে চড়ার পয়সা নেই উদয়শংকরের। তার পকেট একেবারে শূন্য। কিন্তু চলার শক্তি যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে তার। সে হেঁটেই যাবে রানী মৃণালিনীর বাড়িতে মোটারকম অর্থ সংগ্রহ করতে।

অনেকটা পথ হেঁটে এক সময় উদয়শংকর এসে পৌঁছল রানী মৃণালিনী সেনের বাড়িতে। দিন বড় পরিষ্কার। মিষ্টি রোদ উঠেছে। এতটা পথ হেঁটে বেশ ক্ষিধে পেয়েছে উদয়শংকরের। কিন্তু এই মুহূর্তে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা সে ভুলে গেল।

রানী মৃণালিনী এতদিন পর উদয়শংকরকে দেখে খুব খুশী হলেন। বললেন, "হ্যাল্লো! কি খবর? কেমন আছ? কবে এলে লন্ডনে?"

"কিছু দিন আগে এসেছি—" উদয়শংকর বলল।

"তোমার তো খুব নাম হয়েছে আমেরিকায়—" রানী মৃণালিনী হেসে বললেন, "আমরা সকলে খুব খুশী হয়েছি। কি করছ এখন?"

উদয়শংকর একটু ইতস্তত করল। পরে বলল, "আমি নিজে একটা ভারতীয় নাচের দল খুলব ঠিক করেছিলাম—"

"বেশ তো।"

"তবে এখন একটু অসুবিধায় আছি। তাই আপনার কাছে এলাম।"

রানী মৃণালিনী জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার?"

উদয়শংকর মুখ নামিয়ে একটু ভাবল। ভেবে বলল, "আমি এখন খুব খারাপ অবস্থায় আছি। টাকা-পয়সা কিছু নেই—"

এতটা বলবার পর সে দেখল রানী মৃণালিনীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে গেছেন। একটু পরে রানী মৃণালিনী বললেন, "অনেক টাকা তো রোজগার করেছ যখন পাভলোভার ট্রুপে ছিলে!"

"সব শেষ হয়ে গেছে। এখন আপনিই ভরসা।"

রানী মৃণালিনী নীরস স্বরে বললেন, "আমি কি করব!"

উদয়শংকর বাঁচবার শেষ চেষ্টা করার মত কাতর স্বরে রানী মৃণালিনীকে বলল, "আপনি এখন কিছু টাকা দিন আমাকে। আমি পরে ঠিক শোধ করে দেব। দেখুন মিসেস সেন, আমি সব কথা আপনাকে ভাল করে বলতে পারছি না—"

নিরস মুখে উঠে অন্য ঘরে গেলেন রানী মৃণালিনী। একটু পরেই ফিরে এসে উপদেশ দেওয়ার মত বললেন উদয়শংকরকে, "দেখ, একটু সাবধানে থেকো। অনেক ভারতীয় ছেলে এ দেশে এসে বড় উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে। মদ-টদ খায়। মেয়েদের পেছনে টাকা ওড়ায়। এসব আমি তো প্রশ্রয় দিতে পারি না। একটু বুঝে শুনে চ'লো—বুঝলে?"

সামনেই একটা টেবিল ছিল। ওপরটা মার্বেলের। কথা শেষ করে রানী মৃণালিনী একটা মুদ্রা ফেললেন টেবিলের ওপর। ঠং করে শব্দ হল। উদয়শংকর দেখল রানী মৃণালিনী মাত্র দু শিলিং-এর একটা মুদ্রা রেখেছেন টেবিলের ওপর।

আত্মাধিক্কারের গ্লানিতে কাঠ হয়ে থাকল উদয়শংকর কয়েক মুহূর্ত। এত বলার পর রানী মৃণালিনী তাকে দিলেন মাত্র দু শিলিং। ঠং শব্দটা উদয়শংকরের কানে বাজতে লাগল বড় বেসুরো হয়ে। সে উঠে দাঁড়াল। দু শিলিং পড়ে থাকল রানী মৃণালিনীর টেবিলের ওপর যেমনকার তেমন। আর মুদ্রার সেই ঠং শব্দের রেশ উদয়শংকরকে তাড়িয়ে নিয়ে এল রাস্তায়।

(ক্রমশ)

"ও পাঁচটা দিন আমি সকলকে এড়িয়ে চলতাম
এখন পেয়েছি 'কেয়ারফ্রী'—মাসে
গোটা ৩০ দিনই এখন আমি নিশ্চিন্ত।"
নতুন "কেয়ারফ্রী" স্যানিটারী ন্যাপকিন, আর সেই সঙ্গে ওয়াণ্ডাররাপ স্ত্রীলোকদের শরীর পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ, পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখে।
মাসে পাঁচ দিন স্ত্রীলোকদের শরীরের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয়। সে প্রয়োজন মেটাতে আপনি এখন পাচ্ছেন "কেয়ারফ্রী"।
অদ্ভুত ওয়াণ্ডাররাপ সব জলীয় পদার্থ ভেতরের স্তরের মধ্যে টেনে নেয় নিমেষে। তাই আপনার গায়ের ত্বক শুকনো ঝরঝরে থাকে আর কোন অস্বস্তিও বোধ হয় না।
একমাত্র "কেয়ারফ্রী" এমন জিনিস দিয়ে তৈরী যা সব জলীয় পদার্থ সারা ন্যাপকিনের ভেতরে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। তাই ন্যাপকিনের এক জায়গায় সব জমে থাকে না। নীল রঙের একটি রক্ষা কবচ এর পুরো তলা আর দু'পাশ ঘিরে থাকে। তাই আপনার কাপড়ে দাগ লাগার কোন ভয় নেই।
"কেয়ারফ্রী" ফেলে দিতেও কোন অসুবিধা নেই—বাথরুমে ফেলে দিয়ে জল ঢেলে দিলেই সব অদৃশ্য। বাইরে কাজে বেরুলে কিম্বা বেড়াতে গেলে আর কোন চিন্তার কারণ নেই আপনার।
তাছাড়া "কেয়ারফ্রী" আপনার শরীরের গঠন অনুযায়ী ঠিক ক'রে খাপ খাইয়ে পরে নিতে পারবেন। এই সঙ্গে প্যাকের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে একটি "কেয়ারফ্রী" বেল্ট।
এখন আপনি মাসে গোটা ৩০ দিনই নিশ্চিন্ত
Carefree
জনসন অ্যাণ্ড জনসন
একমাত্র স্ত্রীলোকদের সুরক্ষার জন্যে

॥ নয় ॥

'ডেকেছিলেন, জ্যাঠামশাই?'

দীপেন্দ্রনাথ চোখ তুলে তাকান, চন্দ্রনাথকে দরজার সামনে দেখে তাঁর যেন মনে পড়ে যায়, গড়গড়ার নলটা অনেকক্ষণ হাতে তোলা হয় নি, অতএব ফরাসের ওপর থেকে নলটা তুলে নিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ। বসো।'

চন্দ্রনাথ ফরাসের এক পাশে বসেন। দীপেন্দ্রনাথের হাতে সংবাদপত্র। চন্দ্রনাথের থেকে তিনি লম্বা-চওড়া মানুষ, ছেলেবেলায় ওঁকে গোরা দীপু বলা হতো, অত্যন্ত ফরসা ছিলেন। বংশগত আয়ুর সীমা হিসাবে ওঁকে দীর্ঘজীবী বলা যায়, বয়স আটষট্টি। ওঁর দু ভাই পঞ্চাশের আগেই মারা গিয়েছেন—চন্দ্রনাথের বাবা এবং এক কাকা। কনিষ্ঠতম বেঁচে আছেন, এক ধরনের উন্মাদ। উন্মাদ বলতেই ঠিক যে রকম বোঝায়, তা না—মৃগেন্দ্রনাথের বাহ্যিক উন্মাদনা কিছু দেখা যায় না, কোনো মত্ততাও নেই। চুপচাপ, শান্ত, সবদাই যেন কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন, এবং কারোর সঙ্গেই বিশেষ কথা বলেন না, সামনে দিয়ে চলে গেলে তাকিয়ে দেখেন না, অথচ এমন না যে নীরবে নিরালায় বসে থাকেন, পড়াশোনা করেন বা কোনো কাজে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু কখনো কখনো, অতর্কিতে নিঃশব্দে হাসেন, ঘাড় ঝাঁকান, যেন কোনো জটিল সমস্যার জট, সেই মাত্র খুলতে পেরেছেন, সেইভাবে তর্জনী নাড়েন এবং তখন কেউ পাশ দিয়ে গেলে বলে ওঠেন, বলেছিলাম কী না! হতেই হবে, হতেই হবে।' পাশ দিয়ে যারা যায়, বাড়ির ছেলেমেয়েরা হলে, জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো ছোটকা?' অথবা 'কী বলছো ছোটঠাকুদ্দা?' বাড়ির ঝি চাকেরা কিছু বলে না, শোনে, দেখে মুখ টিপে হেসে চলে যায়, মনে মনে বলে, 'পাগলের ডিম।' মৃগেন্দ্রনাথও পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই এবং দীপেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দীনেন্দ্রনাথ প্রায় তাঁর সমবয়সী।

দীপেন্দ্রনাথকে একটু ব্যতিক্রম পুরুষ বলা যায়। এই বংশের পুরুষ হিসাবে, তাঁর স্বাস্থ্য এখনো উজ্জ্বল, দেহ খুব শক্ত আড়া, মোটা ভুরুর নিচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুসন্ধিৎসু চোখ, শাণিত নাসা, মাথায় বড় রকমের টাকের চার পাশে ধূসর চুল, গোঁফ-দাড়ি কামানো। ধুতির ওপরে, কনুই পর্যন্ত হাতা বোতাম লাগানো গলাবন্ধ হোসিয়ারির তৈরি গেঞ্জি—যাকে নাইটকুর্তা বলা যায়, কারণ তাঁর মতে ভাইয়েরাও বেনিয়ান পরতেন এবং দীপেন্দ্রনাথ দাড়ি কামাবার পরে মুখে ভেসলিন ঘষেন। তিনি এখনো নিজের দাঁতের সাহায্যে খাবার চিবোন। সমগ্র পরিবারের হাল, বলতে গেলে, তাঁরই হাতে। নেই নেই করেও এখনো বকুলতলা বাড়ির যা কিছু সম্পত্তি, নিজের এবং বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের এবং কিছু কর্মচারির সাহায্যে, নিজেই দেখা শোনা করেন।

'কাগজ দেখেছিস, আজকের?' দীপেন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের দিকে তাকান। একটু হাসি হাসি চিন্তা চিন্তা ভাব তাঁর মুখে।

চন্দ্রনাথ বলেন, 'দেখেছি। মেদিনীপুরের কথা—।'

'না, মেদিনীপুরের না, আজ তো সব থেকে বড় দেখছি আসামে জাপানী বোমা।' দীপেন্দ্রনাথ গড়গড়ার নল দিয়ে, সংবাদপত্রের বাঁ দিকের সংবাদ শিরোনামা দেখান এবং ঠোঁট উলটে বলেন, 'ইংরেজ ব্যাটারা কি পারবে এ লড়াই জিততে? মনে হয় না।'

চন্দ্রনাথ বলেন, 'স্টেটসম্যান তো লিখেছে, ব্রিটিশ আর ভারতীয় বাহিনী আস্তে আস্তে বারমার দিকে আবার এগোচ্ছে।'

'ধুস্‌, মিথ্যে কথা।' দীপেন্দ্রনাথ খবরের কাগজটা কোলের ওপর থেকে ফরাসের ওপর সরিয়ে দিয়ে বলেন, 'স্টেটস্‌ম্যান তো ওসব কথা লিখবেই। স্টেটস্‌মান তো কোন্‌ ছার, ইংরেজের হয়ে ছাড়া, কোনো সংবাদপত্রেরই সত্যি কথা লেখবার কোনো উপায় নেই। গভর্নমেন্ট চারদিকে পোস্টার মারছে গুজবে কান দেবেন না, গুজব রটাবেন না, আসলে গুজব রটাচ্ছে ওরাই। সত্যি মিথ্যা জানি না, আমি তো খবর পেয়েছি, আসাম আর চাটগাঁ নাকি জাপানীদের দখলে চলে গেছে।'

বলতে বলতে তাঁর কপালে দুশ্চিন্তার রেখা প্রকট হয়। চন্দ্রনাথ হাসেন, বলেন, 'এটা বোধ হয় ঠিক শোনেন নি জ্যাঠামশাই। আসাম চাটগাঁ জাপানীদের দখলে গেলে এখানকার চেহারা অন্যরকম হয়ে যেতো।'

'কী হয়ে যেতো?' দীপেন্দ্রনাথ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চন্দ্রনাথের চোখের দিকে তাকান।

চন্দ্রনাথ জ্যাঠামশাইয়ের দৃষ্টির সামনে একটু অস্বস্তি বোধ করেন, তবু হেসে বলেন, 'মানে, আমার ধারণা, আমাদের
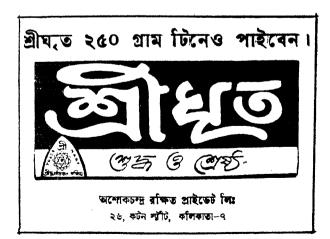
এসব অঞ্চলে তা হলে ওয়ার অ্যাকটিভিটি অনেক বেড়ে যেতো। সে রকম তো কিছু দেখছি না।'

দীপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কী করে জানছো, অ্যাকটিভিটি বাড়ছে না? হয় তো আমরা জানতে পারছি না, ওরা ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছে।'

চন্দ্রনাথ হাসেন, কিছু বলেন না। দীপেন্দ্রনাথ তেমন কান-পাতলা লোক নন, হয়তো এমন কারোর কাছ থেকে কিছু শুনেছেন, অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিতে পারেন না। আবার বলেন, 'এই সব এ আর পি বা সিভিক গার্ড-ফার্ডদের জানার ব্যাপার না। আমি অবিশ্যি জানি না সংবাদপত্রগুলো পণ্ডিতদের জনযুদ্ধ কতোটা ঠিক সংবাদ দেয়, ওরা তো খালি রাশিয়ার কথাই বলে। স্টালিনগ্রাড ছাড়া, অন্য জায়গায় যে লড়াই হচ্ছে, ওদের কাগজ পড়লে বোঝা যায় না।

চন্দ্রনাথ তথাপি চুপ, জানেন এসব কথা বলবার জন্য তিনি মোটেই চন্দ্রনাথকে ডাকেননি, ভিন্নতর কিছু আছে, কিন্তু অষ্টম এবং নবম বাহিনীর লড়াইয়ের কিছু সংবাদ জনযুদ্ধেও থাকে এবং এমন কি মার্কিন একাদশ বাহিনীর খবরও। সে কথা জ্যাঠামশাইকে বলে কোনো লাভ নেই, চন্দ্রনাথের তেমন কোনো বিশ্বাস বা মর্যাদার প্রশ্নও নেই যে প্রমাণ করতেই হবে। চন্দ্রনাথ ডেলি টেলিগ্রাফের উদ্ধৃত সংবাদ বাংলা সংবাদপত্রে দেখেছেন। স্টালিনগ্রাডে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে, হাতাহাতি লড়াই।

দীপেন্দ্রনাথ গড়গড়ার নল তুলে নিয়ে টান দেন, ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ হয়, ধোঁয়া বেরোয় না। চন্দ্রনাথ বলেন, কলকেটা বদলে দিতে বলি?'

'থাক।' দীপেন্দ্রনাথ গড়গড়ার নল রেখে পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই তুলে নেন। তিনি সিগারেটও পান করেন, তবে যে-সিগারেট পান করেন এ সে ব্রান্ড না, সবুজ প্যাকেটের গায়ে মিলিটারির ছাপ মারা। আজকাল অনেকের হাতেই মিলিটারি সিগারেটের প্যাকেট দেখা যায়, নানানভাবেই তা আসে, বিশেষ করে আমেরিকান। দীপেন্দ্রনাথ বলেন, 'আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কলকাতায় শীগ্‌গিরই জাপানীরা বোমা ফেলবে। কলকাতায় ফেলা মানেই আমাদের এসব এলাকা বাদ যাবে না। কলকাতায় কী আছে? ফোর্ট উইলিয়ম আর পোর্ট, কিন্তু আমাদের কাছে-পিঠেই রয়েছে পুলিস মিলিটারি ব্যারাক, কলকারখানা, পাওয়ার হাউস, অর্ডনান্স ফ্যাক্টরি।'

দীপেন্দ্রনাথ সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে একটু কাশেন, আবার বলেন, 'তারপরে ধরো আমেরিকান বেস্ চাঁদমারি, হাবড়ার ব্রিটিশ বেস্। সবই বলতে গেলে বেশ কাছাকাছি। জাপানীদের নজর এসবের ওপরেই বেশি থাকবে, এ সবই ওরা ধ্বংস করতে চাইবে। কলকাতায় গৃহস্থের বাড়ির ওপর বোমা ফেলে কিছুই হবে না। অবিশ্যি কলকাতার লোকেরও অনেক ভয় আছে, কলকাতা শহর বলে কথা। শুনেছি বিহারী ওড়িয়ারা নাকি অনেকেই কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।'

চন্দ্রনাথ বলেন, 'হ্যাঁ, সেদিন তো খবরের কাগজে দেখলাম, কলকাতায় রিকশা টানার লোকের অভাবে রিকশা বিশেষ চলছে না।'

দীপেন্দ্রনাথ মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, প্রাণের ভয় সকলেরই আছে। কেবল বিহারী ওড়িয়া বলে না, বাঙালীও কিছু কিছু বাইরে গেছে। এই ধরো, শান্তিপুর কেষ্টনগর ওসব দিকে যাদের বাড়ি তারা পরিবারের লোকজন সব পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা চাকরির দায়ে কলকাতায় থাকছে। বড় খোকার (দীনেন্দ্রনাথ) সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ও বলেছে এ বিষয়ে তোর

সংগে একটু কথাবার্তা বলতে। ওহ্, হ্যাঁ—।'

দীপেন্দ্রনাথ থেমে সিগারেটসহ ডান হাতটা তোলেন, জিজ্ঞেস করেন 'গতকাল মোল্লারহাট থেকে এসে শুনলাম বৈঠকখানা বাড়িতে নাকি পুলিস এসেছিল, মিশিরের ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেছে?'

চন্দ্রনাথ বলেন, 'হ্যাঁ। ওকে আগের থেকেই ফলো করেছিল, পুলিস ওর জন্য ওঁত পেতেই ছিল।' দীপেন্দ্রনাথের মুখে উদ্বেগের ছায়া, মাথা নেড়ে বলেন, 'না না ওসব কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোসালিস্ট দলের ছেলেদের এখন বৈঠকখানা বাড়িতে ঢুকতে দিস না। দিনকাল খুব খারাপ, কিসের থেকে কী হয়ে যাবে কিছুই বলা যায় না। বৈঠকখানা বাড়িতে তোরা ক্লাব কর, খেলাধুলো কর, যাত্রা থিয়েটারের মহড়া দে, কিন্তু ওসব একেবারেই ঢুকতে দিবি না।'

চন্দ্রনাথ বলেন, 'ক্লাবে তো কেউ পলিটিকস করতে আসে না। দয়াল এসেছিল, চলেও যেতো, যাবার আগে ক্লাবে একবার দেখা করতে এসেছিল। তার মধ্যেই পুলিস এসে পড়ে।'

'শুনলাম, ছেলেটাকে মারধোর করেছে?' দীপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন।

চন্দ্রনাথ বলেন, 'হ্যাঁ।'

দীপেন্দ্রনাথ বলেন, 'যাই হোক, বৈঠকখানা বাড়ির সব দায়িত্ব তো তোর, দেখবি সেখানে যেন কোনো রকম ঝামেলা না হয়। সবিতা পণ্ডিতের খবর কী? শুনলাম, বাড়ির ছেলেমেয়েদের কদিন পড়াতে আসছে না?'

চন্দ্রনাথ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, কলকাতায় গেছে, কদিন ফেরে নি।'

দীপেন্দ্রনাথ একটু হেসে বলেন, 'ওরে সবিতা পণ্ডিতকে নিয়ে এখন কোনো পলিটিক্যাল ঝামেলার ভয় নেই। ও ও কলকাতায় গিয়ে বসে আছে কেন?'

চন্দ্রনাথ অনুমান করেন, [illegible] ওর বাড়ির [illegible] কাছে আছে, না আসার কারণ কিছু জানি না, বলেন, 'হয়তো কোনো কারণে আটকে গেছে।'

দীপেন্দ্রনাথ সিগারেটে টান দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, যদি আমরা এখান থেকে সবাই চলে যাই, তা হলে তোকেও চলে যেতে হতে পারে।'

চন্দ্রনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কোথায় যাবেন?'

'কেন জানিস, মোল্লারহাটের বাড়িতেও আমাদের মতো [illegible] থেকে আশংকা আছে।'

দীপেন্দ্রনাথ বলেন, 'ও ছাড়া, জশি-ডিতেও বাড়িটা রয়েছে, সেখানে যেতে পারি। যুদ্ধের পরিস্থিতি ক্রমে যেরকম খারাপ হয়ে উঠছে, এসব অঞ্চলে বেশি দিন থাকা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

চন্দ্রনাথ, এ বিষয়ে কোনো চিন্তাই করেন নি। মোল্লারহাট দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়, বাদা অঞ্চলে, সুন্দরবনের হাতায়। জমিজমা সম্পত্তির পরিমাণ, চন্দ্রনাথ কিছুই জানেন না, তবে দু একবার গিয়েছেন। হাট থেকে কাছে। একটি বাগান-ঘেরা একতলা বাড়ি আছে। পাকা ঘর বেশি না থাকলেও, কয়েকটি টালির ঘর আছে। সেই তুলনায় জাশিডির বাড়ি বড়, সমস্ত পরিবারের পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব। কিন্তু এখনো পর্যন্ত, দু একজন ছাড়া, এ অঞ্চল ছেড়ে কেউ যায় নি। চন্দ্রনাথ একটু দ্বিধা করে বলেন, 'এখান থেকে যাবার কি কোনো দরকার হবে?'

'সেটা তুমিই ভেবে বলো না।' দীপেন্দ্রনাথ বলেন, 'বড় খোকা বলছিল, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে। তবে আমি জানি হারু মুখুজ্জে, দাশু ঘোষাল এরা খুব তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটোবার তালে আছে।'

চন্দ্রনাথ মনে মনে বিরক্ত বোধ করলেও, মুখে তা প্রকাশ করেন না। জ্যাঠামশাই যাদের নাম বলেন, তাদের সম্পর্কে ওঁর কোনো ভালো ধারণা নেই। দুজনেরই ব্যবসা তেজারতি, আরো বহুবিধ ধরনের ব্যবসা, যা অনেকটা আবছা। দাশু ঘোষাল ইতিমধ্যেই, যুদ্ধের ব্যাপারে, কিছু কিছু ব্যবসায় নেমে পড়েছে এবং কলকাতার উভয় ব্যক্তিরই ঘন ঘন যাতায়াত সরকারি কণ্ট্রাক্টের জন্য। ওরা সত্যি বলেছে, চন্দ্রনাথের এমন বিশ্বাস হয় না, হয়তো দীপেন্দ্রনাথকে বা শহরের আরো কারো কারোকে উদ্বিগ্ন করার জন্যই এরকম একটা সংবাদ রটিয়েছে, এবং নিজেরা হাসাহাসি করছে। কিন্তু সে কথা জ্যাঠামশাইকে

নতুন পামঅলিভ ল্যাভেণ্ডার ব্রিলিয়ান্টাইনের মধ্যে খুঁজে পাবেন আসল ল্যাভেণ্ডারের মনমাতানো সুগন্ধ!

সারাদিন আপনার চুল সুবিন্যস্ত রাখুন

এবার পামঅলিভ আপনার জন্যে অপূর্ব উৎকৃষ্ট ব্রিলিয়ান্টাইনের মধ্যে পুরুষালী রুচির আসল ল্যাভেণ্ডারের সুগন্ধটি ধরে এনে হাজির করেছে। সামান্য একটু লাগালেই—যেভাবেই আপনি চুল আঁচড়ান না কেন, চুল পরিপাটি, সুবিন্যস্ত রাখে। আপনার চুলের স্বাস্থ্যের বাহারে আপনাকে সারাদিন খুব সতেজ ও সুন্দর দেখায়।

পামঅলিভ ল্যাভেণ্ডার ব্রিলিয়ান্টাইন-এটি, আধুনিক, শুকিয়ে-না-যাওয়া ফরমুলাটি আপনার পক্ষে একেবারেই অপরিহার্য। একটি শিশি অনেকদিন চলে। আজই একটি কিনুন।

বয়সে বিশেষ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এরকম তো কখনোই দেখি নি। তার ওপরে এই লীগ মিনিস্ট্রি—আমাদের আশা করার কিছু নেই। মোল্লারহাট, কুমারখালি, সব জায়গায় মানুষ উপোস করছে, কাজ পাচ্ছে না। পাবে কেমন করে, কাজ দেবে কে? কাজ করবার আছে কী? ভেড়ির বাঁধ ডিঙিয়ে তো আর সব জল সেঁচে নদীতে পাচার করা যায় না!'

দীপেন্দ্রনাথ যে কতোখানি উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠা কতো গভীর বোঝা যায়, কারণ, চন্দ্রনাথকে তিনি এসব বলেন। চন্দ্রনাথকে তিনি এসব বিষয় কখনো বলেন না, বরং তাঁর ছোট ভাই ইন্দ্রনাথকেই অনেক সময় অনেক কথা বলেন। নিজের দুই ছেলে, দীনেন্দ্র আর নীরেন্দ্রনাথকেও বলেন, চন্দ্রনাথকে প্রায় কখনোই না। বোঝা যায়, দীপেন্দ্রনাথ যেন অনেকটা ঘরপোড়া গরুর মতো, দুর্যোগের আকাশে তাঁর দৃষ্টি, উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। হয়তো, সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারেন না, কেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি ঘরপোড়া গরু না, আগুনের আঁচ তাঁর কখনো লাগে নি। কিন্তু তাঁর বয়স হয়েছে, দীর্ঘকাল চরাচরে মানুষ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ রাজ্যের পরিক্রমা ইত্যাদি নিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত। প্রকৃতির মধ্যে সর্বনাশের সংকেত যেমন পশুপক্ষী পতঙ্গেরা পায়, তাঁর ইন্দ্রিয় হয়তো সেইরূপে ক্রিয়াশীল। চন্দ্রনাথ তাঁকে কখনো এতোটা উদ্বিগ্ন দেখেন নি। বলেন, 'বেশ তো আপনি যদি মনে করেন এখানে বিপদ আসতে পারে, আমরা না হয় চলেই যাবো। তবে আমার মনে হয়, যেতে হলে, মোল্লারহাট না গিয়ে, জসিডিতে যাওয়া ভালো।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মত।' দীপেন্দ্রনাথ বলেন, গলা তুলে হাঁক দেন, 'কেলো, কেলো কোথায় গেলি?'

চন্দ্রনাথ চকিত হয়ে বলেন, 'ডেকে দেব?'

দীপেন্দ্রনাথ বলেন, 'না, তুই বোস, ওই যে আসছে।'

কেলো ভৃত্য, এবং শতাংশে কেলো কুচকুচে কালো, তার মাথার চুলের থেকেও যেন। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, খাটো, শক্ত পেটা শরীর, কিন্তু চোখ দুটো সাদা, ফুলের পাপড়ির মতো। দীপেন্দ্রনাথ বলেন, 'কলকেটা বদলে দে। বড়বাজারের তামাক আর দিস্ না, বিষ্ণুপুরের মিঠে কড়াটা দিস্।' বলে চন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বলেন, 'বড় খোকা বলছিল, সবাই মিলে মোল্লারহাটে গিয়ে থাকবে। আমি সেটা ভালো বুঝি না। এক তো বেশ কিছু নৌকো আর লঞ্চ যুদ্ধের জন্য সিজ্ করে নিয়ে গেছে। জল জঙ্গলা জায়গা, ছুটে বলতে কোথাও যাওয়া যাবে না। তাছাড়া, আমার মনে হয়, ওদিকের যা অবস্থা, ডাকাতি রাহাজানি বাড়বে। জসিডিই ভালো, তোর কথা ঠিক। কিন্তু এ ব্যাপারে সব দায়িত্ব তোর।'

চন্দ্রনাথ দীপেন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন, অস্পষ্ট জিজ্ঞাসা তাঁর চোখে। দীপেন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি, বড় খোকা, মেজো (নীরেন্দ্রনাথ) কোদন (ইন্দ্রনাথ) আমরা সব এদিকেই থাকবো। জসিডিতে সকলের দেখাশোনার দায়দায়িত্ব তোকে নিতে হবে। নিয়মিত চিঠিপত্র দেওয়া, যোগাযোগ রাখা, খবরাখবর করা, সংসার, খরচ খরচা, সব তোকে দেখতে হবে। পারবি না?'

চন্দ্রনাথের যেন সদ্য ঘুম ভাঙা অবস্থা, জন্মের পরে, প্রথম সংবাদ, জীবনধারণের নানানরকম দায়ভাগ থাকে। কিন্তু ভাববার অবকাশ এখন নিয়ে লাভ নেই, বলেন, 'চেষ্টা করে দেখবো। কখনো করি নি তো।'

'এখন করতে হবে।' দীপেন্দ্রনাথ বলেন, 'তুই একা না। তোর সঙ্গে লোক থাকবে। জগুও হয়তো তোর সঙ্গে যেতে পারে, ওকে নিয়েই সব কাজকর্ম করিয়ে নিতে পারবি।'

কেলো এসে। নতুন কলকের ফুঁ দিতে দিতে, বলে, 'গোঁসাইদের নায়েবমশাই এসেছেন, উত্তরের বৈঠকখানায় বসেছেন।'

'প্রাণগোপাল ঘোষ?' দীপেন্দ্রনাথ বলেন, 'হ্যাঁ, আমিই ডেকেছিলাম, বসতে বল, যাচ্ছি।'

চন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ান। দীপেন্দ্রনাথ বলেন, 'তা হলে—।'

'কথা তো হলোই। আপনি নায়েবের সঙ্গে দেখা করুন, পরে যদি কিছু বলেন, বুঝবেন।' চন্দ্রনাথ বললেন, কিন্তু ওঁকে বেশ অন্যমনস্ক দেখায়। আবার বলেন, 'দিনক্ষণ কিছু ঠিক করেছেন নাকি?'

দীপেন্দ্রনাথ চিন্তাক্রান্ত, বলেন, 'সেই তো মুশকিল। সামনে পুজো, প্রতিমা গড়া শুরু হয়ে গেছে। পুজোর আগে কি আর যাওয়া হবে। তা হবে না। তুই এখন যা, পরে আবার কথা বলবো।'

চন্দ্রনাথ বেরিয়ে যান। জ্যাঠামশাই যে ঘরে বসেন, এই মহলের সে-ঘরকেও একরকম বৈঠকখানা বলা যায়। তবে বাইরের লোকের সঙ্গে এখানে কথা বলেন না। পরিবারের সকলের সঙ্গে, কথাবার্তা বলেন এ ঘরে। এ ঘরের সামনে চওড়া দালান, দালান বাঁ দিকে ঘুরে, অন্দরমহলের দিকে গিয়েছে। অন্দরমহল পার হলে, লম্বা ফালি উঠোন। একতলা সারি সারি অনেকগুলো ঘর। পাঁচিলের গায়ে, ছোট একটি দরজা, সব সময়েই খোলা থাকে। দরজা দিয়ে বেরোলে, চকমেলানো উঠোন, পুব দিকে ঠাকুর দালান।। উঠোনের পশ্চিমে, বকুলতলায় ক্লাব বাড়ি।

চন্দ্রনাথ সেদিকে যাবার জন্য, বাঁ দিকের দালানে হাঁটেন, সকালের আলো এখানে ম্লান, প্রায় অন্ধকার। মাঝামাঝি থেকে সিঁড়ি, বাঁ দিকে। চন্দ্রনাথ থমকে দাঁড়ান, অচলা, পদ্মময়ীর দাসী। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ঘোমটা খানিকটা টেনে নিচু স্বরে বলে, 'একবার ওপরে আসতে বলেছেন।'

বলে, এক মুহূর্ত দাঁড়ায়, তারপর সরে যায়। চন্দ্রনাথ ওপরে, অন্ধকার সিঁড়ির দিকে তাকান।

ক্রমশ

প্রতিদিন আপনার প্যান্টের ঘের কমপক্ষে ৮৯৫৫ বার ঘসা খায়
তৈরীর গুনে টেঁকসই
বিনী-র সুতী কাপড়ে পাবেন
অনেক বেশি মজবুত সুতো,
ফলে ঘসা খাওয়া সত্ত্বেও জামা-কাপড়
টিকবে অনেক বেশিদিন
বিনী
প্যান্টের জন্যে সুতী কাপড় কিনতে হলে, নিন-বিনী — কেননা তৈরার গুনে অনেক বেশি টেঁকসই

১০৫ নম্বর মৌলিক পদার্থ

পর্যায় সারণী বা পিরিওডিক টেবল-এর রূপকার দিমিত্রি মেনডেলিয়েফ ৯২ নম্বর মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়াম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন : 'আমার বিশ্বাস আকরিক ইউরেনিয়ামের উপর যদি যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ চালান হয় তাহলে ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু যুগান্তকর আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে। গবেষণার জন্যে যাঁরা নতুন বিষয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আমি বলব, তাঁরা ইউরেনিয়ামের যৌগগুলি নিয়ে লেগে পড়ুন!' এ যেন তুলনাহীন ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎবাণী। উত্তরকালে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়েই পরমাণু বিজ্ঞানে একে একে সংযোজিত হতে শুরু করে ট্রান্স-ইউরেনিয়াম এলিমেন্টস বা ইউরেনিয়ামের উত্তরসূরী মৌলিক পদার্থ। ১৯৪০ দশকের সময়ে আবিষ্কৃত হয় নেপচুনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম। পরবর্তী তিন দশকের মধ্যে সন্ধান পাওয়া গেল আরও দশটি ইউ-রেনিয়াম-উত্তর মৌলিক পদার্থ। সাম্প্রতিক খবর : সোভিয়েত বিজ্ঞানী আকাদেমিসিয়ান জর্জি ফ্লেরোফ-এর গবেষণাগারে সম্প্রতি আরও একটি ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। যার নাম রাখা হয়েছে ১০৫ নম্বর মৌলিক পদার্থ। উল্লেখ্য, এই গবেষণাগারটি মস্কোর কাছে দুবনায় অবস্থিত।

অনেকেই জানেন, পারমাণবিক ওজনের উপর নির্ভর করে সোভিয়েত বিজ্ঞানী মেনডেলিয়েফ সম্ভাব্য সব রকমের মৌলিক পদার্থ পর পর সাজিয়ে যে পিরিওডিক টেবল তৈরি করেছিলেন তাতে প্রথম স্থানটি নির্বাচিত করা হয় সবচাইতে হাল্কা মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের জন্যে। শেষ স্থানটিতে বসান হয় ইউরেনিয়াম। ১৯৩০ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অনেকেই ভাবতেন ভারীর দিক দিয়ে মৌলিক পদার্থের ঊর্ধ্বতম সীমা ওই ইউরেনিয়াম। তারপর আর কোন মৌলিক পদার্থ কখনই পাওয়া যাবে না।

কিন্তু ১৯৩৬ সালে লিসে মিয়েৎনের সঙ্গে একত্রে কাজ করার সময় হ্যান এবং স্ট্রাসমান বললেন, ইউরেনিয়াম-২৩৮ কে নিউট্রন কণা দিয়ে আঘাত করলে আরও

এক নজরে

জীবাশ্মরূপে মানুষের মাথার এই খুলিটি পাওয়া গেছে দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়াডোরে। সম্প্রতি বার্মিংহাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অ্যাপলায়েড রেডিও অ্যাকটিভিটি বিভাগের অধ্যাপক জে ই ফ্রেমলিন থার্মো-ল্যুমিনেসেনস বা তাপ-প্রতিপ্রভা পদ্ধতির সাহায্যে খুলিটির মধ্যে জমে থাকা ক্যাল-সিয়াম কার্বোনেট কেলাসের উপর পরীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন খুলিটির বয়েস ২৮০০০ বছর। উল্লেখ্য, অধ্যাপক ফ্রেমলিনের এই বিভাগটি বর্তমানে চাঁদের পাথরের বয়েস মাপার কাজ করছে।

খুলিটির সঠিক বয়েস নির্ধারণের জন্যে কার্বন-১৪, অর্থাৎ রেডিও-কার্বন ডেটিং পদ্ধতিরও সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ভি আর সুইটসুর এই শেষোক্ত পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে মন্তব্য করেছেন, অধ্যাপক ফ্রেমলিনের কথাই ঠিক। খুলিটির বয়েস ২৮০০০ বছর। বলা বাহুল্য, মানব সভ্যতার এত বেশি শৈশবকালীন নিদর্শন এই প্রথম আমেরিকা ভূখণ্ডে পাওয়া গেল।

অদ্ভুত ব্যাপার এই, এত দীর্ঘকাল শিলিভূত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও পাশের একটি দাঁত ছাড়া এর সমস্ত দাঁতই এখনও পর্যন্ত অবিকৃত। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে : এক, চোখের ওপরকার হাড় একটু বেশি পরিমাণ উঁচিয়ে রয়েছে। দুই, ছোট কপাল। তিন, মগজের গর্তর বেশির ভাগই খুলির সামনের দিকে অবস্থিত। চার, কানের ভেতরের গর্ত বড়। / পাঁচ, সামনের দাঁত-গুলি বর্তমান মানব-গোষ্ঠীর মতই স্বাভাবিক। তবে শাবলের মত দেখতে অর্থাৎ মোঙ্গলধর্মী। মাড়ির দাঁত যথেষ্ট স্থূল, এনামেল দিয়ে ঢাকা। দাঁতগুলি দেখে মনে হয় যে, মানব গোষ্ঠীর এই খুলি তাদের সঙ্গে নিয়ানদারথাল (Neanderthal)-এর মিল রয়েছে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে নিয়ান-দারথাল মানবের আবির্ভাব ১০০,০০০ বছর আগের কাহিনী। অর্থাৎ চতুর্থ হিমবাহ যুগের কোন এক সময়ে। কিন্তু বিলুপ্ত ঘটে আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে।

এই আবিষ্কারের ফলে তিনটি প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠেছে : এক, আদিম মানবজাতি এশিয়া এবং আফ্রিকায় যেভাবে এবং যখন প্রথম সৃষ্টির পাদপীঠে উপনীত হয়েছিল, ঠিক সেই সময় দক্ষিণ আমেরিকাতেও কি অমন ঘটনা ঘটতে থাকে? দুই, যদি ধরে নেওয়া হয় তারা ভিন-দেশী, অন্য কোন মহাদেশীয় ভূখণ্ড থেকে একদা যাযাবরের মত আমেরিকায় গমন করে, তা হলে কি এটাই ঠিক যে, যেটা বেরিং প্রণালী, এক সময়ে জলের পরিবর্তে সেখানে স্থলপথ ছিল, সেই স্থলপথেই তারা আমেরিকা ভূখণ্ডে গমন করে? অথবা, তিন, থর হেয়ারডাল তাঁর গ্রন্থ 'রা'-তে যে কথা বলতে চেয়েছেন—নৌ-পথে তাদের পূর্ব-পুরুষ উত্তর আফ্রিকা অথবা নিউগিনি থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত ধরে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল। প্রশ্ন যাই হোক না কেন, ২৮০০০ বছরের পুরনো মাথার খুলির আবিষ্কার এই প্রথম।

বিষ্ণু দে-র

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত ৫·০০

(সদ্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত)

বিশ্ববাণীর কবিতার বই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর

পদাতিক (প্রকাশিত হয়েছে) ৩·০০

কাব্য সংগ্রহ ১২·০০ এই ভাই ৪·০০ চিরকুট ২·০০

নাজিম হিকমতের কবিতা ২·৫০

যত দূরেই যাই ৩·৫০ দিন আসবে ৩·০০

পাবলো নেরুদার কবিতাগ্রন্থ ৪·০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর

ওমর খৈয়ামের রুবাই ৫·০০ মেঘদূত ৫·০০

পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি ৩·৫০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর

আমি কি রকম ভাবে বেঁচে আছি ৪·০০

কাজী নজরুল ইসলাম-এর

ঝড় ৩·০০

কালিদাস রায়-এর

পূর্ণাহুতি ৫·০০ (রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত)

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯/বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

(সি ৮৪০৮)

বেশি ভারী পদার্থ পাওয়া যেতে পারে। তাঁদের যুক্তি, এর ফলে ইউরেনিয়াম একটি বিটা-কণিকা পরিত্যাগ করে তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন বা রেডিওঅ্যাকটিভ চেঞ্জ-এর মাধ্যমে একটি নতুন আইসোটোপ তৈরি করবে। যাকে বলা যেতে পারে ৯৩ নম্বর মৌলিক পদার্থ। বস্তুটি তাঁরা তৈরিও করেছিলেন। এবং প্রায় ২৫ মিনিট ধরে তার বিভিন্ন কার্যাবলী নিরীক্ষণও করেন। কিন্তু রাসায়নিক পদ্ধতিতে সনাক্ত করতে পারেন নি।

১৯৪০ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিয়েশন গবেষণাগারে ইউরেনিয়ামের একখন্ড পাতলা পাতের উপর নিউট্রনের সংঘর্ষ ঘটিয়ে ডঃ ম্যাকমিলন এবং ডঃ ফিলিপ অ্যাবেলসন হ্যান এবং স্ট্রাসমান ওই বস্তুটি তৈরি করতে সমর্থ হন। ২৩ মিনিট জীবি ওই বস্তুটির রাসায়নিক গুণাবলীও তাঁরা সনাক্ত করেন। তারপরই পিরিওডিক টেবল এ এটি স্থান পেল ৯৩ নম্বর মৌলিক পদার্থরূপে। ইউরেনাস গ্রহের নাম অনুসারে যেমন ইউরেনিয়ামের নামকরণ করা হয় এবং যেহেতু ইউরেনাসের পরবর্তী গ্রহ নেপচুন, সে কথা স্মরণ করে নতুন আবিষ্কৃত এই মৌলিক পদার্থের নাম রাখা হল নেপচুনিয়াম।

তা না হয় হলো। ম্যাকমিলন এবং অ্যাবেলসন লক্ষ করলেন, নতুন এই পদার্থটি শুধু স্বল্পজীবিই নয়, এর প্রত্যেকটি অণু একটি করে বিটা-কণিকা পরিত্যাগ করে যেন আর একটি নতুন ধরনের মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করছে। দুর্ভাগ্য, নতুন এই পদার্থের যথাযথ পরিচয় তাঁরা যোগাতে পারেন নি। এর পর ১৯৪০ সালেই ডঃ [illegible] টি সিবোর্গের নেতৃত্বে একটি দল ইউরেনিয়াম-উত্তর পদার্থের সন্ধানে হাত দেন। তাঁরা সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে ভারী হাইড্রোজেন অয়ন ডিউটেরন দিয়ে আঘাত হানলেন ইউরেনিয়াম পরমাণুকে। পরিবর্তে পেলেন নেপচুনিয়ামকে। ওই সময় সিবোর্গ এবং তাঁর সহকর্মীরাও দেখলেন সত্যিই এই পদার্থটি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ত্যাগ করে একটি নতুন মৌলিক পদার্থ তৈরি করছে। পদার্থটিকে তাঁরা সনাক্তও করেন। পিরিওডিক টেবল-এ এর স্থান হল ৯৪ নম্বর মৌলিক পদার্থরূপে। প্লুটো গ্রহের নামে এটির নামকরণ হল প্লুটোনিয়াম। বলা বাহুল্য, এই আবিষ্কারই শেষ পর্যন্ত পরমাণু বোমাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ডঃ সিবোর্গের নেতৃত্বে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে অবস্থিত রেডিয়েশন গবেষণাগারে শুরু হলো আর এক নতুন কর্মসূচী। ঠিক হলো, এবার আর হাল্কা নয়, আরও

ভারী কোন বুলেট দিয়ে ইউরেনিয়াম পরমাণুর গায়ে আঘাত হানতে হবে। এর জন্যে ও'রা আরও শক্তিশালী সাইক্লোট্রন যন্ত্র কাজে লাগান। প্রসংগত বলা চলে এই যন্ত্রে পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে পরমাণবিক কণা—যেমন প্রোটন, ইলেকট্রন—প্রভৃতিকে প্রচণ্ডভাবে শক্তিসম্পন্ন করে তোলা হয়। ডঃ সোবার্গের দল এবার আঘাতকারী কণা হিসেবে বেছে নিলেন আলফা কণা বা হিলিয়ামের পরমাণু কেন্দ্র। তৈরি হল ইউরেনিয়াম-২৩৮ থেকে প্লুটোনিয়াম-২৪১। এবং এই শেষোক্ত পদার্থটির পরমাণু একটি বিটা-কণিকা স্বতস্ফূর্ত-ভাবে ত্যাগ করে রূপান্তরিত হয় নতুন এক ধরনের মৌলিক পদার্থে—৯৫ নম্বর পদার্থ। জন্মস্থানের সম্মানে যার নাম রাখা হলো আমেরিকিয়াম। আর এইভাবেই প্লুটোনিয়াম-২৩৯ কে আলফা কণা দিয়ে আঘাত করে তৈরি করা হয় ৯৬ নম্বর পদার্থ কুরিয়াম এবং ১৯৪৯ সালে তৈরি করা হয় ৯৭ নম্বর মৌলিক পদার্থ বার্কেলিয়াম। বার্কলে গবেষণাগারের নাম অনুসারেই এই নামকরণ।

এর পরবর্তী পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। ও'রা ভাবলেন আলফা কণার চেয়ে আরও ভারী কোন বুলেট কাজে লাগালে কেমন হয়? ভারী বুলেট এবং তার সাহায্যে আরও প্রচণ্ড-বেগে আঘাত হানার চেণ্টা করলে ক্ষতি কি? অতঃপর ভারী বুলেটও নির্বাচিত হল। কার্বন-১৪র নিউক্লিয়াস বা পরমাণু কেন্দ্র। সাইক্লোট্রনে প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন করে তুলে এই কার্বন-১৪ পরমাণুকেন্দ্র দিয়ে ইউরেনিয়াম-১৩৮-এর পরমাণুতে আঘাত করার পর সত্যিই আর একটি নতুন মৌলিক পদার্থের অণু পাওয়া গেল। ৯৮ নম্বর পদার্থের অণু! যার নাম রাখা হয় ক্যালিফোর্নিয়াম। সেটা ১৯৫০ সালের মার্চ মাসের ঘটনা।

ক্যালিফোর্নিয়ামের পরবর্তী দুটি মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার কিন্তু নাটকীয় ঘটনা। ১ নভেম্বর, ১৯৫২, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল দ্বীপে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। উদ্দেশ্য, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ঠিক যে জায়গাটিতে বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হয় সেখানে বেশ কয়েক শ' পাউন্ড প্রবাল জমে ছিল। বিস্ফোরণের পর এই প্রবাল দেশ বিদেশের বিভিন্ন গবেষণা-গারে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে পাঠান হয়েছিল। প্রবালের সেই নমুনা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানালেন, তাঁরা আরও দুটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। ৯৯ এবং ১০০ নম্বর মৌলিক পদার্থ। অবশ্য প্রথম মৌলিক পদার্থটির মাত্র দু'শটি পরমাণু তাঁরা সংগ্রহ করতে পেরে-

প্রকাশিত হয়েছে

ফ্যাসিস্ট কারাগারে নিহত বিপ্লবী চেক্ কথাশিল্পী

জুলিয়াস ফুচিকের

বিশ্ববিখ্যাত সেই অনন্য কাহিনী

ফাঁসীর মঞ্চ থেকে

অসিত সরকারের তুলনাবিহীন ভাষান্তর
এ বইকে স্মরণীয় করে রাখবে ॥ ৫·০০

প্রকাশক—পত্রপুট/পরিবেশক—কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলি-৭০০০১২

(সি ৮৩৯৫)

১৫ই সেপ্টেম্বর প্রথম খণ্ড বেরুচ্ছে

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত

শেকস্‌পীয়ার রচনাবলী

মপাসাঁ রচনাবলী (গ্রাহক হোন)

শেক্সপীয়ারের সমগ্র রচনাবলী পাঁচ খণ্ডে ও মপাসাঁ সমগ্র রচনাবলী তিন খণ্ডে। শব্দগত ও ভাবগত যাথার্থ্য বজায় রেখে সরল ও আক্ষরিক অনুবাদের পূর্ণাঙ্গ ও বিপুল প্রয়াস বাংলা ভাষায় এই প্রথম। প্রতি রচনাবলীর জন্য পাঁচ টাকা দিয়ে গ্রাহক হলে প্রতি খণ্ড দশ টাকায় পাওয়া যাবে। ডঃ সুখেন্দুবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ প্রীতি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত সম্পাদিত ও সুসাহিত্যিক সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ অনূদিত।

সুনীল চক্রবর্তীর নতুন উপন্যাস

আমি মন্ত্রী হব ৮৲

কুমারেশ ঘোষের ভ্রমণ-কাহিনী

দমদম থেকে দামাস্কাস ৫৲

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ-এর

যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের-র রহস্য উপন্যাস — কৌটিল্য গুপ্ত-র উপন্যাস

রিপু সংহার ৬৲ ফুল ও স্ফুলিঙ্গ ৭৲

তুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা—৯ ● ফোন : ৩৪-৮১৮০

(সি ৮৩৪৫)

হাসি নয় তো,

যেন মুক্তোর ঝিলিক

হ্যা, আপনার হাসিতে সব সময়েই একটি শুভ্র–সুন্দর আভা মুক্তোর মত ঝলমলিয়ে উঠবে। রোজ পেপ্‌সোডেন্ট দিয়ে দাঁত মেজে দেখুন, কত সহজে আপনি এধরনের হাসি ছড়াতে পারেন। পেপ্‌সোডেন্ট বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী— অপূর্ব এর স্বাদ, এবং দাঁতকে আরও বেশী সাদা ও সুন্দর করে পেপ্‌সোডেন্ট।

পেপ্‌সোডেন্ট ঝকমকে দাঁতের জন্য

হিন্দুস্থান লিভার-এর তৈরী একটি সেরা টুথপেস্ট

ছিলেন। এই পদার্থটির নাম রাখা হয় আলবার্ট আইনস্টাইনের নামে আইনস্টাইনিয়াম। আর ১০০ নম্বর বস্তুটিকে বলা হয় ফের্মিয়াম, বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মির নামে। একেবারে গবেষণাগারের বাইরে এ ধরনের দুটি মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি বা আবিষ্কারের ঘটনা এই প্রথম।

১৯৫৫ সালে বার্কলের বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনিয়াম নিয়ে কাজ শুরু করলেন। আইনস্টাইনিয়ামের যৎসামান্য নমুনা সবেমাত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ওই নমুনার মধ্যে ছিল মাত্র এক বিলিয়ন পরমাণু। গবেষকরা সেই পরমাণুর উপর আঘাত হানলেন আলফা কণিকার সাহায্যে। তৈরি হল ১০১ নম্বর মৌলিক পদার্থ। রুশ বিজ্ঞানী দিমিত্রি মেনডেলিয়েফ-এর নামে নতুন আবিষ্কৃত এই পদার্থটির নামকরণ হলো মেনডেলিয়েভিয়াম। আর এর পরই ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ১০২ নম্বর পদার্থের নাম শোনা গেল। নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক আলফ্রেড নোবেলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যার নাম রাখা হয় নোবেলিয়াম।

পরবর্তী দশকে আবিষ্কৃত হলো ১০৩ এবং ১০৪ নম্বর মৌলিক পদার্থ। সোভিয়েত দেশের সাম্প্রতিক আবিষ্কার ১০৫ নম্বর মৌলিক পদার্থ এক্ষেত্রে এক নতুন সংযোজন।

সোভিয়েত সংবাদ প্রতিষ্ঠান এ পি এন-এর বিজ্ঞান লেখক ভি সারামোনোভিক-এর প্রতিবেদন : ১০৫ নম্বর মৌলিক পদার্থ তৈরির জন্যে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আমেরিকিয়াম আইসোটোপটিকে বেছে নেন। পরে অত্যন্ত শক্তিশালী সাইক্লোট্রন থেকে ওই বস্তুটির উপর প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন নিওন পরমাণু দিয়ে আঘাত হানা হয়। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে এই পরীক্ষায় তাঁরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারেন নি। টারগেট বা লক্ষ্য-বস্তুর উপর জমে থাকা সিসে একটা বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এক গ্রামের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ সিসেও যদি সেখানে থাকে, বিজ্ঞানীরা দেখলেন শেষ পর্যন্ত সেটাই যেন সব কিছু পণ্ড করে দিচ্ছে। এ ছাড়াও দেখা গেল, আমেরিকিয়ামের যে জায়গায় আঘাত হেনে নতুন পদার্থ তৈরির চেষ্টা করা হয়, আঘাতের পর সেখানটায় নানারকম পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রের 'জঞ্জাল' জমে উঠেছে। যাদের বেশির ভাগই হাল্কা মৌলিক পদার্থের পরমাণু কেন্দ্র। বিজ্ঞানীদের হিসেবে, এক ঘণ্টায় যেখানে একটি মৌলিক পদার্থ তৈরি হচ্ছে বলে মনে হয়েছিল, সেখানে প্রতি সেকেণ্ডে বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত পদার্থের পরমাণুই তৈরি হয়েছে দশ লক্ষের মত। ভাবুন ব্যাপারখানা! অত বেশি জঞ্জালের ভিড় থেকে আরাধ্য বস্তুর পরমাণু খুঁজে বের করাই তো শক্ত।

অসুবিধেটি দূর করার জন্যে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা নতুন একটি পথ বেছে নিলেন। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'স্পন্টেনিয়াস ফিশন'। বাংলায় হয়ত বলা চলে স্বতঃস্ফূর্ত অবক্ষয়। এই পদ্ধতিতে ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণু কণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুটি সমান ভর বিশিষ্ট কণায় ভেঙে যায়। এবং এই পদ্ধতিকেই কাজে লাগিয়ে নতুন পদার্থ ১০৫-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে বলে রুশ বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন। প্রথম পর্যায়ে এই পরীক্ষাটি চালিয়েছেন ডঃ ইউরি ওগানেসিয়ান এবং তাঁর সহকারীবৃন্দ।

খবরে প্রকাশ, নতুন এই আইসোটোপটির হাফ-লাইফ প্রায় দুই সেকেন্ডের মত। এবং এটি তৈরি করতে যে আমেরিকিয়াম কাজে লাগান হয় সেই সেই আমেরিকিয়ামের প্রতি গ্রামে সিসের খাদ ছিল মাত্র এক হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীতে এত বেশি বিশুদ্ধ বস্তুর ব্যবহার এই প্রথম। রেডিওকেমিস্ট্রি বা তেজস্ক্রিয় রসায়ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালিয়েও দাবী করা হয়েছে, যে বস্তুটির তাঁরা সন্ধান পেয়েছেন সেটি সত্যিই একটি নতুন পদার্থ। এবং স্বতন্ত্র।

সমরজিৎ কর

বার্ট্রাণ্ড রাসেল
ভিয়েতনামে যুদ্ধাপরাধ ৮·০০
উইলফ্রেড বার্চেট
ভিয়েতনাম : গেরিলা যুদ্ধের কাহিনী ১২·০০
নারায়ণ সান্যাল
নেতাজী রহস্য সন্ধানে ১০·০০
জাপান থেকে ফিরে ১২·০০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
জ্যৈষ্ঠের ঝড় ১২·০০ শতগল্প ২০·০০
সৌরীন সেন
বলিভিয়া ১২·০০ তেতো কফি ১০·০০
ডঃ তারকনাথ ঘোষ
জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ ১০·০০

বাংলাদেশ ॥ অমিতাভ গুপ্ত ॥ ১৪·০০
সিকিম ॥ বীরেন্দ্রনাথ সরকার ॥ ১০·০০
হুগলী জেলার দেব-দেউল ॥ সুধীর মিত্র ॥ ১০·০০
চব্বিশ পরগণার মন্দির ॥ অসীম মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·০০
রামায়ণের চরিতাবলী ॥ সুখময় ভট্টাচার্য ॥ ১৬·০০
বিদ্যাসাগর ॥ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৪·০০
নাটক ও নাট্য আন্দোলন ॥ গঙ্গাপদ বসু ॥ ১০·০০
আসরের গল্প ॥ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ১২·০০
সাহিত্য সন্ধান ॥ ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ১২·০০
মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড ॥ তপমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪·০০

আনন্দধারা প্রকাশন ॥৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

(সি ৪২৪৬)

পেটেণ্ট কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে

খুব মচমচে কড়কড়ে ছোট পাঁপর তৈরি হয়"

বলেন – মিসেস লক্ষ্মী শর্মা 'সোরেণ্টো' মাউণ্ট প্লেসাণ্ট রোড, বোম্বাই—৬

কর্ন প্রোডাক্টস্-এর নির্বাচিত পুরস্কৃত পাকপ্রণালী

ছোট-পাঁপর

ব্রাউন এণ্ড পলসন পেটেণ্ট কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে তৈরী

ব্রাউন এণ্ড পলসন পেটেন্ট কর্নফ্লাওয়ারে দিব্যি মচমচে কড়কড়ে সামোসা ও প্যাটিস তৈরী হয়। (১ বড়চামচ থেকে ২ কাপ সাধারণ ময়দা মিশিয়ে নিন)। আপনার স্যুপ বা গ্রেভী (ঝোল) আরো নরম মোলায়েম ও সুস্বাদু করে তোলবার জন্যও ব্যবহার করবেন। ব্রাউন এণ্ড পলসন কর্নফ্লাওয়ার শিশু ও রোগীদের পক্ষে বেশ পুষ্টিকর।
ব্রাউন এণ্ড পলসন সবচেয়ে সেরা কর্নফ্লাওয়ার কেমনা সেরা উপাদানে তৈরী এবং অতি সযত্নে প্রস্তুত। কাগজের বাক্সে পাওয়া যায়।

উপকরণ :

১ কাপ ব্রাউন এণ্ড পলসন পেটেন্ট কর্নফ্লাওয়ার
৬ কাপ জল
১ থেকে ১½ কাপ ঘোল
৪ অথবা ৫ কাঁচা লঙ্কা
১ টুকরো হিং
১ বড়চামচ ছাপাছাপি লবণ (অথবা স্বাদমতো)

১। জল ফুটিয়ে নিয়ে আঁচ নরম করুন। ব্রাউন এণ্ড পলসন পেটেন্ট কর্নফ্লাওয়ার আর ঘোল মিশিয়ে নিন। জলে মেশান। ভালভাবে নাড়ুন। এইবার এই মিশ্রণে লবণ, হিং ও লঙ্কাবাটা মেশান। কয়েক মিনিট ধরে ফোটান এবং মিশ্রণটি ঠাণ্ডা করুন।
২। পরিষ্কার পলিথিন চাদর রোদে বিছিয়ে তার ওপর মিশ্রণটি রাখুন। এর থেকে ১ বড়চামচ পরিমাণ তুলে নিয়ে পলিথিনের চাদরে রাখুন। পুনরায় আর এক বড়চামচ পরিমাণ তুলে নিয়ে আগেরটির পাশে একটু তফাতে রাখুন এবং এইভাবে মিশ্রণটি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রেখে যান। সন্ধ্যাপর্যান্ত রোদে শুকুতে দিন। পরদিন সকালে ছোট পাঁপরগুলি তুলে নিন এবং বড় থালার ওপর সেগুলি উল্টিয়ে রাখুন। আরো ১-২ দিন রোদে শুকুতে দিন যতক্ষণ না সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়।
৩। বাতাস ঢোকে না এমন পাত্রে ছোট পাঁপর মজুত করুন। প্রয়োজনমতো কড়া করে ভাজুন। তেল গরম করে কড়াইতে কয়েকটি ছোট পাঁপর রাখুন। বাদামী রং ধরবার আগেই তেল থেকে ছেঁকে তুলে নিন।

বিনামূল্যে ! পাকপ্রণালী বই নং ৫ বিনামূল্যে এক কপি পাবার জন্য এখানে লিখুন :

পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট
কর্ন প্রডাক্টস্ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
৫ বিবাদ হাউস, এইচ পোদ্দার মার্গ, বোম্বাই ৪০০০০১

বাংলা হিসেবে ব্যবহৃত হয় যে খাবার তাহা আপনার বাড়িতে তৈরী করার

ইন্দো-জার্মান কালচারাল সেণ্টারের উদ্যোগে ম্যাক্সমূলার ভবনে হেলা বসুর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীটির বিষয়বস্তু ও অংকনরীতি নতুন ধরনের, অন্তত কলকাতায় ঠিক এ জাতীয় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান সম্ভবত ইতিপূর্বে হয়নি। বিভিন্ন জার্মান ও ইংরেজ কবিদের নানা কবিতার পংক্তি ক্যালিগ্রাফিক রীতিতে ইংরেজী অক্ষরমালা সাজিয়ে শিল্পী নতুন ধরনের শিল্প রচনা করেছেন। প্রদর্শনীতে এই জাতীয় ১৯টি নিদর্শন দেখা যায়। হেলা বসুর জন্ম জার্মানীতে, শিক্ষালাভও করেন সেখানে। কোলোন আর্ট কলেজে শিক্ষালাভের পর তিনি ইংলণ্ড যান এবং কয়েকটি বিজ্ঞাপন ও প্রচার সংস্থায় কাজ করেন। তিনি কিছুকাল কভেন্ট্রি আর্ট কলেজে এবং পরে লিস্টার ও হাল-এ অধ্যাপনা করেন। সুন্দরভাবে সাজিয়ে, প্রকাশবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে এক একটি ইংরাজী অক্ষরের মধ্যে যে রসসৃষ্টি করা যায়, হেলা বসুর প্রদর্শনী দেখে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। শুধু তাই নয় বিশেষ কোনও কবিতার রচনাকাল ও ভাবার্থ অনুযায়ী তিনি এক-এক ক্ষেত্রে এক-এক রীতি অবলম্বন করেছেন। শিল্পী প্রায়শঃ হিসাব করে অক্ষর রচনা শিল্পে সুদক্ষ। ইংরাজী বর্ণমালাই যেখানে আত্মপ্রকাশের প্রধান ও একমাত্র মাধ্যম, সেখানে এতগুলি নিদর্শনে বৈচিত্র্যসৃষ্টি করা সহজ কথা নয়। অথচ এই শিল্পী তাই করেছেন। বস্তুত কয়েক ক্ষেত্রে তিনি অক্ষরমালার মধ্য দিয়েই আধুনিক নানা রীতির রচনার অনুসরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ইন পারাম মেমোরিয়াম-এর (তিক্ত) নাম করা যায়। এক একটি অক্ষর ওপরে, পাশে ও সুপার-ইম্পোজ করে তিনি প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছেন এবং মধ্যকার ছোট ছোট স্থান জুড়ে ইণ্ডিয়ান রেড ও খয়েরী রঙে ভরে ফেলে সুন্দর আকারপ্রধান বিমূর্ত নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। কয়েকটিতে হায়েরোগ্লিফিক জাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যেমন পিটার গিলেস্পি-র (জুনিয়র) এল এস ডি ত্রুক-এ। অক্ষরের রচনাবৈচিত্র্যও চমৎকার। কালি-কলমের ড্রয়িং মাধ্যমে শিল্পী দু-এক স্থলে কবিতার ভাবার্থটুকু প্রতীকের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে উইণ্টার ইন দি ভিলেজ-এর (গতি) নাম করা যায়। বাইরনের আইলস অব গ্রীস অবলম্বনে 'গ্রীস' কথাটি আবার সম্পূর্ণ আলংকারিক রীতিতে চাপা রঙের পরিপ্রেক্ষিতে সাজিয়ে ভিন্ন রস পরিবেশন করেছেন। এই শিল্পীর প্রায় প্রতি নিদর্শনেই গবেষণা ও গভীর চিন্তাধারার পরিচয় মেলে। বিশেষ করে হুইল অব ফরচুন-এ (মুইর) তাঁর পরিকল্পনা ও চিন্তাধারা ধরা পড়ে। কবিতাটির ভাবার্থ অনুযায়ী শিল্পী ক্রমবর্ধমান কয়েকটি বিভিন্ন রঙের বৃত্তকে কেন্দ্র করে কবিতাটির মর্মার্থ প্রকাশ করেছেন ও এক একটি পংক্তি ঘড়ির কাঁটার মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়ে হুইলের গতিবেগ ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে নীৎসের রচনা অবলম্বনে লেলিহান অগ্নিশিখার মত লাল রঙের আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলিও দ্রষ্টব্য।

*

কয়েকটি প্রদর্শনী দেখামাত্রই বোঝা যায় যে, আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও শিল্পী নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করার মত নির্দিষ্ট কোনও পথের সন্ধান পান নি। আকাডেমি গ্যালারীতে আয়োজিত শিল্পী রমাপ্রসাদ ঘটকের প্রদর্শনী দেখেও এই কথাই মনে জাগে। এই শিল্পী ১৯৭০ সালে কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করেন এবং এই প্রথম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে জলরঙ, টেম্পারা ও প্যাস্টেলের ১৬টি নিদর্শন দেখা যায়। শিল্পীর রচনারীতি মিশ্র অর্থাৎ তাঁর বিভিন্ন নিদর্শনে একদিকে যেমন পল্লীচিত্র ও ভারতীয় প্রথার সন্ধান মেলে, অন্যদিকে তেমন জ্যামিতিক আকারপ্রধান আধুনিক পদ্ধতির প্রভাবও দেখা যায়। বলা বাহুল্য, কোনও রীতিতেই তিনি মনোভাব সুস্পষ্ট-

ইনোসেণ্ট —রমাপ্রসাদ ঘটক

জীবনানন্দ দাশের

সুদর্শনা ৪·০০

সদ্য প্রকাশিত প্রেমের কবিতার সংকলন। এতে আছে ৪০টি কবিতা। এই বইয়ের কোন কবিতাই যেমন জীবনানন্দের আগের কোন বইয়ে নেই, তেমনি এতে এমন ধরণেরও কবিতা আছে, যা তাঁর আগের কোন বইয়েই নেই। যেমন, প্রেয়সীর চিঠি পেয়ে তার উপর লেখা 'চিঠি এল' নামক অপূর্ব কবিতাটি, প্রভৃতি। কবিতাগুলি দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর পরিশ্রমে সংগ্রহ করে সযত্নে সম্পাদনা করেছেন গোপালচন্দ্র রায়।

গোপালচন্দ্র রায় রচিত **জীবনানন্দ** ১০·০০

জীবনানন্দের বহু দুষ্প্রাপ্য বাংলা ও ইংরাজি কবিতাসহ বিস্তৃত জীবনী।

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ ৮·০০

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাদিসহ যতবার ঢাকায় গিয়েছিলেন, সে সবের বিস্তৃত বিবরণ।

শরৎচন্দ্র

১ম খণ্ড, জীবনী—১৬·০০ ঃ ২য় খণ্ড, স্মৃতিকথা/কীগল্প, আলাপ-আলোচনা, হাস্য-পরিহাস, মৌখিক অভিভাষণ ১৬·০০ ঃ ৩য় খণ্ড, পত্রাবলী, ২০·০০ টাকা।

দীপঙ্কর রায়ের **সপ্তহীরা** ২·৫০

রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মত নতুন স্বাদের রহস্যোপন্যাস।

সাহিত্য সদন ঃঃ এ ১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

(সি ৮২২০)

রূপে ব্যক্ত করতে পারেননি। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে লোকচিত্র জাতীয় ছবিগুলিই প্রশংসার দাবী করে। এগুলির ভাস্কর্য-জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ করে সরলতা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে লুকিং অ্যাট হার ফিউচার ও ইনোসেন্ট-এর নাম করা চলে। দু-একটি নিসর্গজাতীয় ছবিও মন্দ লাগেনি, যেমন মিশ্র রীতিতে আঁকা ড্রিমল্যান্ড। কিন্তু যেক্ষেত্রে শিল্পী জ্যামিতিক আকার অবলম্বনে কম্পোজিশন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন সেক্ষেত্রে তিনি ঠিক সাফল্যলাভ করতে পারেন নি—যেমন মুনলাইট বা অ্যালোন-এ। তবে দু একটি আধুনিকধর্মী ছবির মধ্য দিয়ে আবার তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে অ্যাট নাইট-এর উল্লেখ করা যায়। কালো, লাল ও হলুদ রঙের সুকৌশল ব্যবহার ও সেই সঙ্গে চমৎকার আলোছায়ার অবতারণা করে শিল্পী মায়াবী রাতের এক অপূর্ব মোহজাল বিস্তার করেছেন। বস্তুত এটিই আমার মতে তাঁর প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অপরাপর ছবির মধ্যে অ্যাপিটাইট ও কাপড়ের ওপরে ইমপ্রেশানিস্টিক রীতিতে আঁকা পিলগ্রিমস্-এর নাম করা যায়।

*

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কোন পথে?

প্রথম খণ্ড ঃ ১২·০০

১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ এই তিন বছর ভারতে নেতাজীর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই গ্রন্থ নেতাজীর সেই সময়কার রচনা, বক্তৃতা ও চিঠিপত্রের কালক্রম অনুযায়ী সাজানো এক মহান সংগ্রহ। অপ্রকাশিত অনেক না-জানা তথ্য এতে আছে যা প্রতিটি বাঙালীর অবশ্য জানা উচিত। আছে জওহরলাল নেহরুকে লেখা জীবনের দীর্ঘতম চিঠি। বত্রিশ পাতার এই চিঠি থেকে এবং মহাত্মাজীর ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন, রাজনীতির "সর্বোচ্চ মহলের ক্ষুদ্রতা ও প্রতিহিংসাপ্রবণতা" ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিককে কতখানি ব্যথিত করেছিলো। অমিততেজ সুভাষচন্দ্র অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে গেলেন মহাত্মাজী ও অন্যান্যদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার। কিন্তু তাঁর আবেদন-নিবেদন সবই ব্যর্থ হলো। তারপর এলো ১৯৩৯-এর কলকাতার এ. আই. সি. সি। সর্বোচ্চ মহলের "ক্ষুদ্রতা ও প্রতিহিংসাপ্রবণতার" জবাব দিলেন নেতাজী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থেকে পদত্যাগ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানালেন ঃ "অসম্ভব উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে থেকেও তুমি আত্মমর্যাদা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছ। তোমার নেতৃত্বকে আমি অভিনন্দন জানাই, তাতে আমার আস্থা বাড়লো। ত্রুটিহীন এই শালীনতা বাংলাকে তার নিজস্ব আত্মসম্মানের জন্যেই বজায় রাখতে হবে এবং এই উপায়েই তোমার আপাত পরাজয় থেকে স্থায়ী জয়ের সূচনা দেখা দেবে।"

প্রকাশক—পত্রপুট / পরিবেশক—কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি-৭০০০১২

(সি ৮৩৯৪)

বাউল (শোলা) —সতীনাথ ব্যানার্জী

বিভিন্ন গ্যালারীতে আমরা সচরাচর যে-সব প্রদর্শনী দেখে থাকি তার অধিকাংশই, আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যাঁরা নিয়মিত-ভাবে প্রদর্শনীতে যাতায়াত করেন তাঁরা জানেন যে, গত কয়েক বছর যাবৎ প্রথাগত-ভাবে কোনও শিক্ষালাভ না করেও কয়েকজন শিল্পী তাঁদের প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছেন। তাঁরা শখের শিল্পী, অর্থাৎ তাঁরা শিল্পকলাকে ঠিক পেশা হিসাবে গ্রহণ না করেও নিয়মিতভাবে অবসর সময়ে শিল্পচর্চা করে থাকেন। অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত সতীনাথ ব্যানার্জীর প্রদর্শনীও এই শ্রেণীর। তিনি রঙ ও তুলির পরিবর্তে শোলা ব্যবহার করেছেন। প্রদর্শনীতে শোলা-শিল্পের ২৪টি নিদর্শন দেখা যায়। প্রাচীন-কাল থেকেই আমাদের দেশে শোলাশিল্পের প্রচলন আছে। তার কারণ, দেশের পূর্বাঞ্চলে এটি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, দ্বিতীয়ত, এটি অত্যন্ত নরম ও হাল্কা এবং তৃতীয়ত, এটি দুধের মত সাদা। ফলে প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশের মালাকার শ্রেণী এই শোলার মাধ্যমে নানা সুন্দর বস্তু তৈরী করে আসছেন। তাছাড়া শোলা পবিত্রতার প্রতীক, তাই বহুকাল থেকেই শোলার নানা শিল্পসামগ্রী আমাদের দেশের পূজোপার্বণে এবং বিবাহ উৎসবাদিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পরিকল্পনা, আকার ও সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য দেবী দুর্গার শোলার গহনা ও মুকুট এবং শুভবিবাহ উপলক্ষে বরকনের টোপর তৈরী করে দেশের কারিগর-বৃন্দ হস্তশিল্প ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। শুধু তাই নয়, অপরূপ

কিন্তু এখন

দেশবিদেশে প্রমাণিত ফর্মুলা অ্যাম্বী স্কিন ফেয়ার ক্রিম পাওয়া যাচ্ছে, যা এই মালিন্য কমিয়ে দিয়ে ত্বককে তার স্বাভাবিক ফরসা আর উজ্জ্বল রঙ ফিরিয়ে দেয়, রোদে-পোড়া-কালো রঙ থেকে বাঁচায়।

রঙ ফরসা আর উজ্জ্বল করা ক্রীমের মধ্যে অ্যাম্বীরই বিক্রী পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী। অ্যাম্বী নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার সহজাত স্বাভাবিক ফরসা আর উজ্জ্বল রঙ আবার ফিরে পাবেন,—এ একেবারে সুনিশ্চিত! মাত্র দশদিন মেখে দেখুন,—হাতে-নাতে ফল পাবেন।

নিজের হাত আর উরুর রঙ মিলিয়ে দেখুন,—হাতের রঙ অনেক কালো, তাই না? খুবই স্বাভাবিক। কারণ, হাতে সবসময় রোদ লাগে। শরীরের অনাবৃত জায়গায় রোদ লাগলে ত্বক-কালো-করা পিগমেন্টের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পরিণাম: আপনাকে কালো দেখায়!

পৃথিবীর ৩১টি দেশে যাচাই করা এই আন্তর্জাতিক ফর্মুলা অ্যাম্বী এখন থেকে আপনারই জন্য, আপনার সেবায়!

বিদেশে বহু বছর ধরে লক্ষ লক্ষ নারী তাঁদের রঙের ছটা ফিরে পাওয়ার জন্য অ্যাম্বী ব্যবহার করে আসছেন। এখন এই বিশ্বনন্দিত ফর্মুলা ভারতে এসে গেছে, আপনার জন্য। অ্যাম্বীতে এমন একটি বিশেষ উপাদান আছে যা রোদের তাপ থেকে ত্বককে রক্ষা করে। অ্যাম্বী যে শুধু ত্বক কালো-করা পিগমেন্টই দূর করে তা নয়। উপরন্তু রোদের তাত থেকে ত্বককে আড়াল করে রাখে, কালো হতে দেয় না। আয়নার সামনে দাঁড়ান, মাত্র দশদিনের মধ্যেই এর কার্যকারিতা বুঝতে পারবেন। ত্রিশদিনের মধ্যে আপনার ত্বক ফিরে পাবে তার সহজাত মনোহর কান্তি। অ্যাম্বী ত্বকের সমস্ত ছোপ ও দাগ দূর করে তাকে উজ্জ্বল, কোমল আর সুন্দর করে তোলে।

মনে রাখবেন, প্রথম ত্রিশ দিন অ্যাম্বী ব্যবহার করবেন দিনে দুবার করে। এতে আপনি আপনার সহজাত স্বাভাবিক ফরসা আর উজ্জ্বল রঙ ফিরে পাবেন। তারপর ব্যবহার করবেন প্রতিদিন একবার করে। ত্বককে রোদ থেকে বাঁচানোর এই রক্ষাকবচ আপনার আসল রঙ বদলাতে দেবে না।

[illegible]

অ্যাম্বী

স্কিনফেয়ার ক্রীম

আপনার রূপ ও রঙের ছটা ফিরিয়ে দেয়।

বম্বে, কোলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও ব্যাঙ্গালোরে পাওয়া যায়।

সন্ধ্যা কারুকার্যখচিত 'আলার পশরী দেব-দেবী' ও খেলনাও অনেক হস্তশিল্প প্রদর্শনীতে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। সতীনাথ ব্যানার্জী ঠিক এজাতীয় কাজ করেন নি। মাধ্যম হিসাবে শোলা ব্যবহার করে তিনি নতুনতর শিল্পসৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। সতীনাথ তরুণ, কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, কোনওদিন কারও কাছে শিল্পশিক্ষা করেন নি। অবসর সময়ে আপন মনে শোলা নানাভাবে কেটে তিনি আকার সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। কাল, কালো হলুদ নানা রঙের কাপড়ের ওপরে বিভিন্ন ভাবে শোলার সরু, মোটা পাত প্রয়োজনমত বসিয়ে তিনি বিভিন্ন আকারের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এটি তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা, সুতরাং পরীক্ষামূলক তো বটেই। তা সত্ত্বেও একটি জিনিস সকলের চোখে পড়ে—সংক্ষিপ্ত ও সংযত শোলা পাত ব্যবহার। সতীনাথ কোন ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ আকার সৃষ্টি না করে ইঙ্গিতে বা প্রতীকের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। বলতে বাধা নেই, এ এক স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে তিনি সাফল্যলাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে চকিতা ও নববধূর নাম করা যায়। আলংকারিক পরিকল্পনা হিসাবে পেঁচা ময়ূর ও বাঁকুড়ার ঘোড়া অনেকের ভাল লাগে। তবে বিষয়বস্তুর পরিবর্তে তিনি অহেতুক শোলার ফ্রেমের কারুকার্যের ওপর প্রাধান্য দান করার ফলে দর্শকদৃষ্টি যেন ফ্রেমের দিকেই অধিক আকৃষ্ট হয়। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের কাপড়ের ওপর শোলাপাত ব্যবহার করার ফলে দু একটি নিদর্শন রূপ স্পষ্ট দেখা যায় না, যেমন সরস্বতী। অন্যান্য রচনার মধ্যে করবী, বাউল ও শান্তির নাম করা যায়।

চিত্রপ্রিয়

পূজা সংখ্যা

সিনেমা জগৎ

৮টি উপন্যাস ॥
প্রেমেন্দ্র মিত্র
জরাসন্ধ
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
বারীন্দ্রনাথ দাশ
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়
নিমাই ভট্টাচার্য
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
ধনঞ্জয় বৈরাগী

৩টি বিশেষ রচনা ॥
বিমল মিত্র
শংকর
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

২টি বড় গল্প ॥
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
কণিষ্ক

৯টি গল্প ॥
বনফুল
সমরেশ বসু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
শক্তিপদ রাজগুরু
মায়া বসু
মহাশ্বেতা দেবী
আশাপূর্ণা দেবী
শঙ্কু মহারাজ

২টি হাসির গল্প ॥
কুমারেশ ঘোষ

৩টি রম্য রচনা ॥
শ্রীপান্থ
ইন্দ্রমিত্র
মনোরঞ্জন ঘোষ

সিনেমার ফিচার ও নিয়মিত বিভাগ
সুনীল চৌধুরী
সুভাষ সমাজদার
চিত্রগুপ্ত
উৎপল রায়
পার্থসারথি
বিমান দত্ত
গুরুদাস ভট্টাচার্য
শ্যামল বসু
সন্ধ্যা সেন
কুশল চৌধুরী
দোভাষী
দুর্বাসা
রামকৃষ্ণ রায়
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী
ও
সিনেমা শিল্পী-কলাকুশলী

দাম/৬·৫০ ॥ সডাক ৭·৭৫

১লা আশ্বিন প্রকাশিত হবে

দি ম্যাগাজিনস প্রাইভেট লিমিটেড/১২৪বি, বিবেকানন্দ রোড/কলিকাতা-৬

(সি ৮৪৭১)

এবার চোখে ছেয়ে গেল 'টেরিন' শাড়ীর রূপের আলো

রূপের আলো ছড়িয়ে সকলের মুগ্ধদৃষ্টি টেনে আনতে কে না চায় বলুন? কিন্তু কি করে? জীবন রঙীন করে তোলা শাড়ী পরে... নিজের পছন্দমত শাড়ী পরে... উপভোগ করুন এক অপূর্ব অনুভূতি... আর এই অনুভূতিরই অন্য নাম এস.কুমার!

সারা দেশে আমাদের ধুরন্ধর সহযোগী ব্যবসায়ী, পাইকারী ও খুচরো বিক্রেতা আর মিলগুলির সঙ্গে সুব্যবস্থিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে আমরা জানি আপনাদের পছন্দ কি—কারণ, আপনাদের পছন্দই আমাদের পছন্দ!

নতুন যুগের তালে তাল রেখে উৎকৃষ্ট বুনটের আকর্ষণীয় মনলোভা কাপড় তৈরী হয় কাফি, মাতুরা আর লক্ষ্মী বিষ্ণুর মত স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে! আর এই সব সুন্দর 'টেরিন' স্যুটিং, শার্টিং আর শাড়ী আপনাদের জন্যে এনেছে এস.কুমার!

® রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক

'টেরিন' স্যুটিং, শার্টিং ও শাড়ীর ক্ষেত্রে
এক নির্ভরযোগ্য নাম!

এস.কুমার নিকেতন, ৯৯, মেরীন ড্রাইভ, বম্বে ৪০০ ০০১

SISTA'S-SK-3026-BEN

ব্যবসায়ীগণ যাতে খাদ্যসামগ্রী একটি সঞ্চয়-ভাণ্ডারে মজুত রাখতে পারেন তারও ব্যবস্থা রাখতে হবে। (৬) সমগ্র দেশ জুড়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ন্যায্য মূল্যের দোকান সম্প্রসারিত করতে হবে; এই দোকানগুলির মাধ্যমেই খাদ্যসামগ্রীর খুচরো ব্যবসা চালাতে হবে। এই দোকানগুলিকে যতটা সম্ভব কম দামে মজুত ভাণ্ডার থেকে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। (৭) জনসাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানেই ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি স্থাপিত হওয়া উচিত, এবং প্রত্যেক দোকানের জন্য নিকটবর্তী এলাকার নির্দিষ্টসংখ্যক জনসমষ্টির রেশন-কার্ডের ব্যবস্থা রাখা উচিত। (৮) সাত দিন অথবা ১৪ দিনের জন্য রেশন দিতে হলে রেশন কার্ড মালিকদের সেভাবে রেশন তোলার দিন ভাগ করে দিতে হবে। (৯) ন্যায্য মূল্যের দোকানে খাদ্যসামগ্রী ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যসামগ্রী বিক্রি করতে হবে। কারণ, একটি নির্দিষ্ট জিনিসের ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ অল্প থাকবে বলেই দোকানে তেমন অধিকসংখ্যক জিনিসের বিক্রির ব্যবস্থা থাকা দরকার। (১০) ন্যায্যমূল্যের দোকানে প্রত্যেক দোকানদারকে বিভিন্ন জিনিসের নমুনা ও দাম উল্লেখ প্রদর্শনের জন্য রাখতে হবে। (১১) বাড়িতে বাড়িতে রেশন-কার্ড মালিকদের নাম ধাম সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে যাতে ভুয়া রেশনকার্ড না থাকে। (১২) প্রত্যেক ব্যবসায়ী এবং কৃষককে নিজের কাছে কতটা খাদ্যসামগ্রী মজুত আছে এবং যতটা পরিমাণ মজুত থাকা উচিত তার বেশী আছে কিনা সে সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে হবে; একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই তথ্য প্রকাশ না করলে মজুত খাদ্যসামগ্রী রাষ্ট্রের নিজের হাতে নিয়ে আসতে হবে। (১৩) মাঝে মাঝে দোকানে হানা দিয়ে খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহের পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। রাষ্ট্রপতির মতে সমগ্র দেশে মোটামুটিভাবে একই মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত। তবে সুবিধা এলাকার অপেক্ষাকৃত কম দামে খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করা যেতে পারে। শ্রীগিরির মতে যদিও প্রত্যেক রাজ্যে একজন খাদ্যমন্ত্রী আছেন তবুও খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক দায়িত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর থাকা উচিত; তা হলে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমঝোতা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। রাষ্ট্রপতি যে তের দফা কর্মসূচীর উল্লেখ করেছেন, দেশের বর্তমান খাদ্যসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতিটি সুপারিশই মূল্যবান। রাজ্য সরকারের উচিত উপরোক্ত কর্মসূচীর ভিত্তিতে খাদ্যনীতির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

সুব্রত গুপ্ত

এবার পুজোয় ছোটদের সেরা উপহার

উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড বের হল। মূল্য ২০·০০ টাকা
মনোরম প্ল্যাস্টিক জ্যাকেটে মোড়া শোভন ২২·৫০

তৃতীয় পর্যায়ের গ্রাহক করা হচ্ছে। **২ খণ্ডের গ্রাহক মূল্য** ২৭·৫০ মাত্র। ৭·৫০ দিয়ে গ্রাহক হয়ে আপনিও **সংগ্রহ করুন** স্টক থাকতে থাকতে। সবার জন্য ২·০০ দামে **একটি মনোরম** প্ল্যাস্টিক জ্যাকেট রেডি করেছি আমরা। আপনিও **সংগ্রহ করতে** পারেন।

আজ থেকে গ্রাহক করা হচ্ছে:

গ্রীমেদের সমগ্র রচনাবলী

২ খণ্ডে বেরুবে। প্রচুর ছবি সহ—হাজারেরও বেশী পাতা।
গ্রাহক মূল্য ২৫, গ্রাহক চাঁদা ৫,

হ্যানস্ অ্যান্ডারসন সমগ্র রচনাবলী

২ খণ্ডে সম্পূর্ণ। **গ্রাহক মূল্য ২০, টাকা। ৫, দিয়ে আপনার কপি বুক করুন। অনুবাদ করছেন : লীলা মজুমদার।**

লুইস ক্যারল সমগ্র রচনাবলী

৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। **গ্রাহক মূল্য ২৯, টাকা। গ্রাহক হন ৫, দিয়ে। অনুবাদ করছেন : জয়ন্ত চৌধুরী।**

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

প্রথম খণ্ডের ছাপার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।
প্রথম খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ১০, মাত্র। এখন ৫, দিন।

এডওয়ার্ড লিয়ার রচনাবলী

১লা সেপ্টেম্বর থেকে গ্রাহক মূল্য ৭·০০ টাকা। গ্রাহক হন ২, দিয়ে। অনুবাদ করছেন: অশোককুমার মিত্র ও শৈলশেখর মিত্র।

মণিঅর্ডারে মূল গ্রাহক কেন্দ্র **: এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি,** এ-১৩২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, ফোন ৩৪-২৩৮৬

শাখাকেন্দ্র : নিউ আলিপুর বুক হাউস, ৩৮, টালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা। হীরাপুর বুক স্টল, স্টেশন রোড, বার্ণপুর। স্টাডি এন্ড স্পোর্টস কর্ণার, পুরুলিয়া। স্টুডেন্ট কর্ণার, বহরমপুর—কাদাই। বীণাপাণি পুস্তকালয়, খড়্গপুর। গ্রন্থভারতী, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি। সুবোধ লাইব্রেরী, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১৩। মল্লিক পুস্তকালয়, বড়বাজার, মেদিনীপুর।
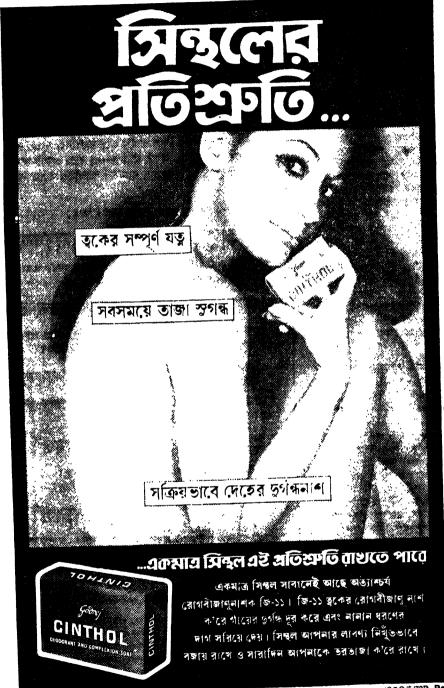
সিন্থলের প্রতিশ্রুতি...
ত্বকের সম্পূর্ণ যত্ন
সবসময়ে তাজা সুগন্ধ
সক্রিয়ভাবে দেহের দুর্গন্ধনাশ
...একমাত্র সিন্থল এই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে
Godrej
CINTHOL
DEODORANT AND COMPLEXION SOAP
CINTHOL
একমাত্র সিন্থল সাবানেই আছে অত্যাশ্চর্য রোগবীজাণুনাশক জি-১১। জি-১১ ত্বকের রোগবীজাণু নাশ ক'রে গায়ের দুর্গন্ধ দূর করে এবং নানান ধরণের দাগ সরিয়ে দেয়। সিন্থল আপনার লাবণ্য নিখুঁতভাবে বজায় রাখে ও সারাদিন আপনাকে তরতাজা ক'রে রাখে।
Interpub/GSC/5/72R Ben

একা এবং কয়েকজন
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৭৯ ॥

এ কথার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই যে বাদল তার বাবা মায়ের ঘোর অমত সত্ত্বেও বিদেশে চলে যেতে পারে কিন্তু রেণু একবার না বললেই সে অসহায় হয়ে পড়বে। এখন তার কাছে রেণুর মতামতের দামই সবচেয়ে বেশী। জন্মের পর মায়ের নাড়ির সঙ্গে সন্তানের নাড়ির যে যোগ থাকে, তা কেটে ফেলা হয়। সন্তান যৌবনে পৌঁছলে অদৃশ্য নাড়ির যোগটাও ছিন্ন হয়ে যায়।

সে তখন মা-বাবাকে ধরে নেয় রোদ বৃষ্টি বা শীত—এই রকম কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনার মতন—বড়দের চোখে যা সে যখন তখন অবজ্ঞা করতে পারে। সে জানে, তার রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি, বৃষ্টিতে ভেজা কিংবা শীতের মাঠেও বোতাম খোলা সার্ট পরা মা-বাবা পছন্দ করেন না—অথচ এইগুলোই তার ভালো লাগে। সুতরাং বাবা মায়ের অনেক সব কথাও অগ্রহণীয়। যেমন, মাঝে মাঝেই, তার ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করতে, হঠাৎ এই পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হবার মোহময় চিন্তা তাকে পেয়ে বসে—সত্যি সত্যি আত্মহত্যা না করলেও এই চিন্তাটার যে সুখ, সে কথা কি বাবা কিংবা মাকে কখনো জানাতে পারবে?

রেণুর কথা আলাদা। রেণু কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। রেণুকে সে একটু একটু করে সৃষ্টি করছে—আবার তার বাইরেও রেণুর যে রহস্যময় অস্তিত্ব, তাকে আয়ত্ত করতেই হবে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মৃত্যু কিংবা বেঁচে থাকার চেয়ে বাদল এখন এটাকে বড় মনে করে।

রেণু জিজ্ঞেস করলো, তুমি বিদেশে যাবার ব্যাপারটা একেবারে ঠিক করে ফেলেছো?

বাদল বললো, হাঁ।

রেণু বললো, আমাকেও নিয়ে চলো।

—তুই সত্যি যাবি? যেতে পারবি?

—কেন পারবো না?

—বাড়ির সবাইকে ছেড়ে থাকতে পারবি? তোদের বাড়িতে যে কেউ তোকে যেতে দেবে না—এ তো জানাই কথা।

—যদি বি এ-টা পাস করে নিই, তারপর পড়তেও যেতে পারি। লণ্ডনে ছোড়দার কাছে থাকবো।

—বি এ পাসের তো এখনো অনেক দেরি।

—তুমি আর দু' বছর অপেক্ষা করতে পারবে না?

—না। তা ছাড়া আমি লণ্ডনে যাবো না, আমি যাবো জার্মানিতে। ওখানে এখন অনেক চাকরি।

—জার্মানির তো এখন কিছুই নেই। সব ভেঙেচুরে গেছে।

—সেই জন্যই তো অনেক কাজের লোক দরকার। রেণু, তোকে বেশ একটা ছেলে সাজিয়ে, প্যান্ট সার্ট পরিয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে আমার সঙ্গে নিয়ে গেলে হতো।

—কেন, মেয়েদের বুঝি যেতে দেবে না?

—জার্মানিতে এখন মেয়েরাই বেশী। ওরা এখন—

হঠাৎ থেমে গিয়েই বাদল প্রসঙ্গ বদলালো। বললো, এখনো জরুরি কথাটাই কিছু বলা হয় নি। আমি যে এতগুলো বছর থাকবো না, তুই কি আমার জন্য অপেক্ষা করবি?

রেণু একটু অবাক হয়ে বললো, অপেক্ষা মানে?

—তোদের বাড়ি যা কনজারভেটিভ, এই চার পাঁচ বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই তোর বিয়ে দিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। তা হলে কি হবে?

রেণু ভ্রূকুটি করে বললো, কি সব আজে বাজে কথা!

এপার বাংলা

শারদীয় সংখ্যা / ১৩৮০

এই বিশেষ সংখ্যায় যাঁরা লিখছেন
প্রবন্ধে—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ সরোজমোহন মিত্র, অধ্যাপক রবি দাস এবং আরও অনেকে।

দুইটি উপন্যাস—নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্তী।
মৌলিক সাইন্স ফিকসন—নারায়ণ চক্রবর্তী

গল্প ও রম্য রচনা—বিমল মিত্র, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু, গৌতম ও অন্যান্য

এ ছাড়াও শিশিজা কবিতা ও অন্যান্য ফিচার সহ বিপুল আকারে শুভ মহালয়ার দিন প্রকাশিত হবে। গ্রাহক বাতীত অন্যান্য যাঁহারা এই বিশেষ সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চান, তাঁহারা সত্বর যোগাযোগ করুন। এই বিশেষ সংখ্যার মূল্য ৪ ॥

প্রাপ্তিস্থান/গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ
১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

(সি ৮০৩৩)

সৌন্দর্য্যের পরশ... নিভিয়া ক্রীম

নিভিয়া ক্রীম মেখে দেখুন... দিনে দিনে...
আপনার ত্বক কোমল, পরিষ্কার আর
সুন্দর হয়ে উঠছে। রোদের প্রভাব
থেকেও আপনার ত্বককে রক্ষা করে
তাই আপনার রঙও যায় খুলে।
ত্বক-সৌন্দর্য্য বাড়াতে নিভিয়া ব্যবহারই
সহজ পন্থা। তেলতেলে কম। আঠার
মত লেগে থাকে না বা চকচক করে না।
মাখবার সাথে সাথেই ত্বকের সাথে মিশে
গিয়ে আপনার অগোচরে পুষ্টি যোগায়...
আর্দ্রতা বাড়ায়... রক্ষাও করে।
সর্বদা মুখে মাখুন আর শুধু - ত্বকের সমস্যায়
পড়লেই শুকনো জায়গায় লাগান।
নিজেকে ভালবাসুন... ত্বকের যত্ন নিন।

স্মিথ অ্যাণ্ড নেফিউ-এর তৈরী

নিভিয়া — সুস্থ, সুন্দর ত্বকের রহস্য!

AIYARS-JLM-176 BN

—আজে বাজে নয়। এইটাই কাজের কথা। তোদের বাড়িতে তো সবারই খুব কম বয়েসে বিয়ে হয়ে যায়।

—জোর করে কারুর বিয়ে হয় না।

—ছেলেদের হয় না, মেয়েদের হয়।

—তুমি আজকে বড্ড ছেলে ছেলে মেয়ে মেয়ে হিসেবে কথা বলছো। জার্মানি যাবার চিন্তাতেই এরকম হয়েছে বুঝি?

—রেণু, আমরা আর ছেলেমানুষ নই। আমরা একটা ব্যাপার জোর করে অস্বীকার করার চেষ্টা করছি। তোকে আর আমাকে এরকম ভাবে আর বেশীদিন মেলামেশা করতে দেওয়া হবে না। আমাদের বাড়ি থেকে না হলেও তোদের বাড়ি থেকে বাধা দেবেই।

রেণু এসব ব্যাপার সত্যিই যেন বোঝে না। তার সারল্য তার চরিত্রে একটা বিশুদ্ধ তেজ দিয়েছে। সে বললো, মেলামেশা কে করতে দেবে না? আমাদের ইচ্ছে আমরা দেখা করবো। আমি এ বাড়িতে এলে মাসীমা কি আপত্তি করবেন?

—কি জানি, করতেও পারেন একদিন। সবকিছুই তো দেখছি অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। একটা ছেলে ও মেয়ের সাধারণভাবে মেলামেশা করার ব্যাপারটা কেউ মেনে নিতে পারে না সহজভাবে। বিয়ে ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই। আজ থেকে কুড়ি কি তিরিশ বছর বাদে হয়তো এই ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি অন্য কোনো দেশে জন্মাতাম—

রেণু বললো, আমার এই দেশই ভালো লাগে।

বাদল রেগে গিয়ে বললো, এটা একটা পচা গলা দেশ। এ দেশের কিস্সু হবে না। ভণ্ডামি, স্বার্থপরতায় সব কিছু বদলে যাচ্ছে। দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে হতাশা—

—জার্মানি যাচ্ছো তো, তাই এ দেশ আর পছন্দ হচ্ছে না।

—শুধু সে জন্য নয়। আমার মতন ছেলের কোনো সুযোগ আছে এখানে? বি এ-তে অনার্স পেয়েছি, তবু এম এ পড়তে পারলাম না। একটা কোনো চাকরি করা দরকার, কোনো চাকরি নেই। আমি যে-কোনো কাজ করতে চাই, কেউ কাজ দেবে না। দিন দিন লক্ষ লক্ষ বেকার বাড়ছে—তাদের কাজে লাগাবার কথা কেউ ভাবছে না। পণ্ডিত নেহরু এখন বিশ্বশান্তির ওপর বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন!

বাদল উত্তেজিত হয়ে গেছে দেখে রেণু চুপ করে বসে রইলো। দর্শক বা শ্রোতার প্রতিক্রিয়া ঠিক মতন বোঝা না গেলে বক্তৃতা জমে না। বাদল একটু বাদেই তাই চুপ করে গেল।

বিক্ষুব্ধভাবে আবার বললো, বিয়ে করলেই যদি লোকে শান্তি পায়, তাহলে আমি তোকে বিয়ে করতেও রাজি। কিন্তু বিয়ে করার যোগ্যতাও নেই আমার। যার চাকরি বাকরি নেই, সে আবার বিয়ে করবে কি? সাধ করে কি আমি দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। দেখছি তো, কত অর্ডিনারি ছেলে দু' এক বছর একটু বিলেত ঘুরে গায়ে পালিশ লাগিয়ে আসছে, অমনি লোকে তাদের সম্পর্কে একেবারে গদগদ। আমিও জার্মানি থেকে এক গাদা টাকা নিয়ে ফিরবো।

—জার্মানিতে বুঝি টাকার ছড়াছড়ি যাচ্ছে?

—যে খাটতে পারে, তার সুযোগ আছে। ওখান থেকে রাশিয়ায় যাবো—যদি থাকতে দেয়, তাহলে রাশিয়াতেই থাকবো। মাঝখানে একবার দেশে ফিরে তোকে নিয়ে যাবো জোর করে। জোর করতেই হবে, কারণ এমনিতে তোর সঙ্গে আমার বিয়েতে রাজি হবে না কেউ। আমার মা যে তোকে এত ভালোবাসেন, আমার মা-ও আপত্তি করবেন দেখিস! তোরা যে কায়স্থ!

রেণু খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, তুমি এমনভাবে কায়স্থ কথাটা উচ্চারণ করলে, যেন এর চেয়ে নীচু জাত আর নেই!

—বামুনেরা তো অন্য কারুকেই গ্রাহ্য করে না। আমি যদি তোকে কেড়ে নিতে

ভারবি-র বই বাংলা সাহিত্যের গর্ব

• উপন্যাস ও গল্প •

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
চলে নীল শাড়ি ১০·০০
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ৪·৫০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
পদ্মপাতার দিন ৪·৫০
প্রতিভা বসুর
আলো, আমার আলো ৯·০০
প্রণয়ীর সংখ্যা পাঁচ ৩·৫০
অমিয়ভূষণ মজুমদারের
নয়নতারা ৮·০০
দীপক চৌধুরীর
নেশা ৫·০০
সমরেশ বসুর
পাপ-পুণ্য ৩·৫০

• প্রবন্ধ ও রম্যরচনা •

গোপীমোহন সিংহরায়ের
রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারী
[প্রথম খণ্ড । উপন্যাস] ১৮·০০
বুদ্ধদেব বসুর
কবি রবীন্দ্রনাথ ৫·০০
প্রবন্ধ-সংকলন ১৪·০০
বিষ্ণু দে-র
সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ৭·০০
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
কবি জীবনানন্দ দাশ ৭·০০
সতীশরঞ্জন খাস্তগীরের
বিজ্ঞানের স্বরূপ ৬·০০
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের
স্মৃতিরঙ্গ ৩·৫০

শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থমালা

এ-পর্যন্ত নিম্নোক্ত কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে :
অমিয় চক্রবর্তী । বুদ্ধদেব বসু প্রতি খণ্ড ৮·০০
জীবনানন্দ দাশ ৭·৫০
মোহিতলাল । প্রেমেন্দ্র মিত্র । অজিত দত্ত প্রতি খণ্ড ৭·০০
দিনেশ দাস । অরুণ মিত্র । সুভাষ মুখোপাধ্যায় । মণীন্দ্র রায় । বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । রাম বসু । শঙ্খ ঘোষ । আলোক সরকার । শক্তি চট্টোপাধ্যায় । অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রতি খণ্ড ৬·০০

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

জীবনানন্দের সাতটি তারার তিমির ৪·০০ ॥ অমিয় চক্রবর্তীর হারানো অর্কিড ৩·৫০ ॥ বিষ্ণু দে-র সেই অন্ধকার চাই ৩·৫০ ॥ বুদ্ধদেব বসুর মরচে-পড়া পেরেকের গান ৩·৫০ ॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাল মধুমাস ৩·৫০ ॥ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য ৩·৫০ । সোনার মাছি খুন করেছি ৩·০০ ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের রক্তাক্ত ঝরোখা ৩·৫০ ॥ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেবল দেখেছে শিয়রলতা ৩·০০ ॥ পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের বিমূর্তির দেবল রক্ত ৩·০০ ॥ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ ১৫·০০

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট । কলকাতা ১২ । ফোন : ৩৪৬১৬৭
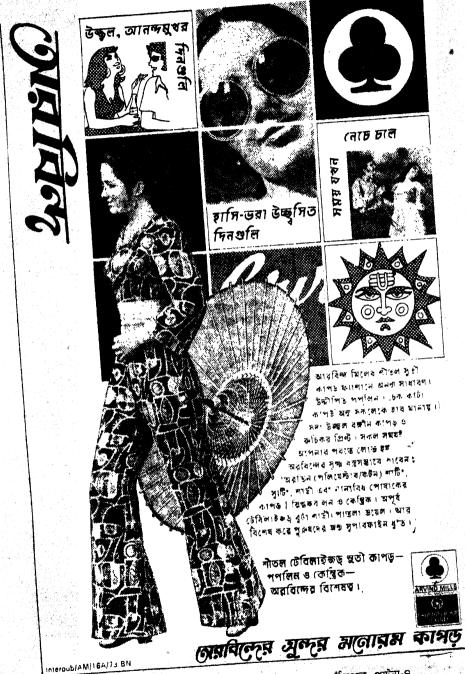
পাইকারী ও খুচরা দোকান : চণ্ডুলাল দুর্গা প্রসাদ, বাঁকিপুর, পাটনা-৪

চাই, তবে অবশ্য আটকাবার সাধ্য কারুর নেই। দরকার হলে এ বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকবো। কিন্তু তার আগে একটা কিছু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে আমাকে।

রেণুর ঠোঁটে হাসির রেখা লেগে রয়েছে তখনো। সে বললো, সেই যোগ্যতা বুঝি শুধু জার্মানিতে গিয়েই অর্জন করা যায়। আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি একদিন খুব বড় লেখক হবে। সবাই তোমার নাম জানবে। তোমার লেখা পড়ে অনেকে কাঁদবে। সেটাও কি একটা যোগ্যতা নয়?

বাদল একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর বললো, রেণু তুই আমাকে লেখার কথা আর বলিস না। ওটা আমার একটা দুর্বল জায়গা।

—তুমি লেখা কেন ছেড়ে দিয়েছো, বলো তো? আজ তোমাকে বলতেই হবে।

—আমি লিখতে জানি না।

—আমার তো ভালো লাগতো।

—তুই বললেই তো হবে না! আমি মানুষের সাম্যে বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাস নিয়ে পার্টির কাজও করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা সবাই আমাকে বললো, আমার লেখাগুলো প্রতিক্রিয়াশীল। তখন আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। আমি নিজে প্রতিক্রিয়াশীল নই, তা হলে আমার লেখা কি করে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায়? আমি তাহলে কি লিখবো? শুধু স্লোগান? আবার ওরা বলে, বিষ্ণু দে খুব প্রগতিশীল লেখক—অথচ তাঁর কবিতা পড়ে আমি সব মানে বুঝতে পারি না। আমার মাথা গুলিয়ে যায় এসব ভাবতে গিয়ে। তার থেকে লেখা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

—তুমি অন্যদের কথা শুনে লিখবে কেন? তোমার নিজের কোনো ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই?

—আমার ইচ্ছে করে শুধু তোকে নিয়ে লিখতে। কিন্তু তুই তো শুধু একটা মেয়ে, তুই একটা জ্যান্ত প্রতিক্রিয়াশীল। পৃথিবীতে তার কোনো মূল্যই নেই এখন। পৃথিবীতে মানুষের এখন অনেক কাজ। শুধু আমিই কোনো কাজ খুঁজে পাচ্ছি না।

—তাহলে একমাত্র জার্মানিতে যাওয়াই তোমার মুক্তির উপায়।

—তাই তো দেখছি।

—তা হলে ঘুরে এসো।

—তুই আমার জন্য অপেক্ষা করবি তো?

—তুমি ঠিক সময়ে ফিরে এসো।

—তুই যদি এর মধ্যেই আমাকে হঠাৎ ডেকে পাঠাস, তা হলে আমি যে-কোনো উপায়েই হোক চলে আসবো। অবশ্য যাওয়ার ব্যাপারে অনেক বাধা আছে এখনো। পাসপোর্ট দেবার আগে পুলিশের ভেরিফিকেশন লাগে। খুব কড়াকড়ি শুনেছি। আমি কিছুদিন পার্টির কাজ করেছি, সেই জন্য আমাকে নাও দিতে পারে। তারপর আছে ভাড়া জোগাড় করার চিন্তা। বাবা মায়ের কাছ থেকে কিছু নেবো না।

—কত টাকা লাগবে?

—জাহাজ ভাড়া টোম্পোলা—সব মিলিয়ে হাজার দুয়েক জোগাড় করতেই হবে। সুবিধে থাকলে ধার চেয়ে নিতাম। সুবিধে তো বড়বাবুরা সব টাকা ফুঁকে দিচ্ছে।

—দু' হাজার টাকা জোগাড় করা খুব শক্ত বুঝি?

বাদল এবার হেসে বললো, তুই একদম ছেলেমানুষ রেণু। দু' হাজার টাকার দাম ঠিক দু' হাজার টাকা। তোকে বললাম না, লোকে আজকাল তিরিশ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরির জন্য হন্যে হয়ে যাচ্ছে। তা হলে দু' হাজার টাকা কত হয়?

রেণু বললো, আমারই তো পোস্ট অফিসে তিন হাজার টাকা আছে। বাবা রেখে গিয়েছিলেন আমার নামে। একটা সই করলেই তো সেই টাকা তোলা যায়।

বাদল গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, তুই আমার এই বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা এখন কারুকে বলিস না। বিন্দুকেও কিছু বলার দরকার নেই।

রেণু বললো, তোমাকে ঐ টাকার জন্য আর কোথাও খোশামুদি করতে হবে না। টাকাটা আমি তুলে দেবো পোস্ট অফিস থেকে। একদিন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও।

—তোর টাকা আমি নেবো না।

—কেন?

—ও কথা থাক। এখন অন্য কথা বল।

রেণু উঠে বাদলের সামনে এসে দাঁড়ালো। ক্রুদ্ধ চোখে বললো, তুমি যদি আমার টাকা না নাও, তাহলে জীবনে আমি তোমার মুখ আর দেখবো না।

(ক্রমশ)

প্রকাশিত হল

জগন্নাথ চক্রবর্তীর

সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ

কলকাতা কলকাতা কলকাতা

ও অন্যান্য কবিতা দাম ৫·০০

সাহিত্য প্রকাশ, ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা—৯

(সি ৮৭০৫)

মহাকবি সেক্সপীয়রের কয়েকখানি নাটকের উপন্যাসরূপ:—

অনুবাদক—অশোক গুহ ॥ প্রতি খণ্ডের মূল্য আড়াই টাকা ॥

ওথেলো, কিং জন, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, সিম্বেলিন, কিং লিয়ার, দি টেম্পেস্ট, কোরিওলেনাস, রিচার্ড দি থার্ড, রোমিও জুলিয়েট, দি উইন্টার্স টেল, টুয়েলফথ নাইট, জুলিয়াস সীজার, কমেডি অফ এরর্স, টেমিং অফ দি শ্রু, হেনরী দি এইটথ, মেজার ফর মেজার, রিচার্ড দি সেকেণ্ড, টিমন অফ এথেন্স, লাভস লেবার্স লস্ট, য়্যাজ ইউ লাইক ইট, মার্চেন্ট অফ ভেনিস, টাইটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস, মাচ য়্যাডো এবাউট নাথিং, এ মিড সামার নাইটস ড্রিম, অ্যান্টনী এন্ড ক্লিওপেট্রা, টু জেন্টেলমেন অফ ভেরোনা, মেরী ওয়াইভস্ অফ উইন্ডসর, পেরিক্লিস দি প্রিন্স অফ টায়ার, অলস্ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্ ওয়েল।

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

ভারতের চিরন্তন কাহিনী ৫, বিদেশের চিরন্তন কাহিনী ৩,

অশোক সীর

রূপকথার ডালি ৩, গল্প মেলা ২·৫০

মোহিত লাহিড়ীর

আরাকান রহস্য ৩,

সুনীল সরকারের

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার ৩·০০

কেমন করে আবিষ্কার হলো ৩, বিজ্ঞানের গল্প শোন ৩,

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস। ৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

(সি ৮২৯৯)

টায়ারের গ্রাহকরা

বেশী মূল্য দেবেন না

সমস্ত অনুমোদিত টায়ার ডীলারদের প্রয়োজন—
নিজের নিজের জায়গায় কোম্পানী দ্বারা সুপারিশ করা সর্বাধিক
খুচরো বিক্রীর মূল্যের তালিকা প্রদর্শন করা। গ্রাহকদের সাগ্রহে নিবেদন
করা হচ্ছে—যে তাঁরা যেন উচিৎ মূল্যের চেয়ে বেশী পয়সা না দেন।

আমরা যত দূর জানি, সমস্ত বিক্রেতা বন্ধুরা উচিৎ মূল্য বজায় রাখবার
জন্যে তাঁদের সরবরাহ স্থানীয় টায়ার বিতরণ প্রণালীর মাধ্যমে
করে থাকেন। টায়ার উদ্যোগের, টায়ার ডীলারদের কাছে
সাগ্রহ অনুরোধ এই যে, তাঁরা যেন খোলা বাজার থেকে টায়ার না
কেনেন, যাতে তাঁদের নাম সেইসব ব্যবহৃত টায়ার বিক্রেতাদের সঙ্গে
জড়িয়ে না পড়ে যাঁরা পুনর্ব্যবহারের জন্যে বাজারে টায়ার বেচে থাকেন।

আর, যদি কোনো অনুমোদিত ডীলার উচিৎ মূল্যের নীতি পালন না
করেন, তো গ্রাহকদের কাছে এই নিবেদন—তাঁরা যেন স্থানীয়
সরকারী অধিকারী বা টায়ার ডীলার এসোসিয়েশন বা সংশ্লিষ্ট
টায়ার কোম্পানীর কাছে পুরো বিবরণসহ একথা জানিয়ে দেন,
যাতে এর উচিৎ তদন্ত ও বিচার করা সম্ভব হয়।

উপস্থিত, চাহিদা অনুযায়ী বিতরণের
জন্যে যথেষ্ট ট্রাক টায়ার
পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই, গ্রাহক বন্ধুদের অনুরোধ
করছি— আপনারা টায়ারের
যত্ন নিন আর যত
বেশী সম্ভব ব্যবহার করে
এই পরিস্থিতিতে সহায়তা করুন।

উচিৎ মূল্য দিন!

নিবেদক: দি অটোমোটিভ টায়ার ইণ্ডাস্ট্রিজ অফ ইণ্ডিয়া

বনস্পতির বৈঠক

৯ই ভাদ্র, ১৩৮০ সংখ্যার "দেশ" পত্রিকায় বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় "বনস্পতির বৈঠক"-এর লেখকের তথ্যগত ভুলভ্রান্তির তালিকায় বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে লিখেছেন, শৈবাল গুপ্ত মহাশয়ের "কখনও খদ্দর ব্যবহার করিবার দুঃসাহস ছিল না।" দাশগুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ে সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন কিনা জানা নেই। তাছাড়া "দুঃসাহস" না থাকার উক্তিও অপর যে কাহারও বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। পরিশেষে, সমালোচক মহাশয় দ্ব্যর্থবাঞ্জক মন্তব্য করে লিখেছেন, ওই সময় খদ্দর পরিলে শ্রীগুপ্তের নিশ্চিত কপালে "বরখাস্ত" ঘটিত। এর অর্থ এও হতে পারে, তিনি খদ্দর পরেননি। "বরখাস্ত" হবার ভয়ে। আবার এও হতে পারে, যেহেতু তিনি "বরখাস্ত" হননি, সেই-হেতু অনুমান করা যায়, তিনি খদ্দর পরেননি।

তৃতীয় ব্যক্তির বিষয়ে এরূপ অযৌক্তিক ও অবান্তর মন্তব্যের অবাধ প্রকাশে আমার এই প্রতিবাদ আশা করি "দেশ" পত্রিকার স্তম্ভে স্থান পাবে।

শিশির দাশগুপ্ত
কলকাতা-৩১

॥ ২ ॥

গত ১৩ই জুন ১৯৭৩ সালের সংখ্যায় শ্রীসুরেশকুমার সান্যাল ঋষি রাজনারায়ণ বসুর বংশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অনেক অসত্য মন্তব্য কোন অধিকারে প্রকাশ করেছেন বুঝতে পারছি না। তিনি লিখেছেন যে, রাজনারায়ণ বসুর গোষ্ঠীতে এবং ঘোষ বংশের ধারায় নাকি হাঁপানি, যক্ষ্মা, শ্বেতী, মস্তিষ্কবিকার, পাগলামি বা অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধি বংশানুক্রমিকভাবে বিদ্যমান। তাঁর জ্ঞাতার্থে জানাই যে রাজনারায়ণ বসুর প্রথমা কন্যা স্বর্ণলতা দেবী বা দ্বিতীয় পুত্র যতীন্দ্রনাথ জন্মাবধি পাগল ছিলেন না। পরে পরিণত বয়সে, বিশেষ কারণে তাঁদের মস্তিষ্কবিকার ঘটে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বা কনিষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রনাথ—আমাদের পিতামহ — সুস্থ শরীরে জীবন অতিবাহিত করেন। শ্রীমণীন্দ্রনাথ ছিলেন নামকরা শিকারী, লেখক, খ্যাতিমান কুস্তিগীর ও বিপুল স্বাস্থ্যের অধিকারী। তাঁর একমাত্র পুত্র—অশোক বসু আমাদের পিতৃদেব—এই ৫৫ বৎসর বয়সেও নীরোগ আছেন। এবং আমরা, অর্থাৎ রাজনারায়ণ বসুর দুই প্রপৌত্র ও এক প্রপৌত্রী, প্রবোধবাবুর সৃষ্ট ও কল্পিত বংশানুক্রমিক ব্যাধি থেকে এখনও দূরে আছি।

রাজনারায়ণ বসুর মেয়ের দিকের দু-একটি উদাহরণ দেওয়াই যথেষ্ট মনে করছি। তাঁর দৌহিত্রগণ—যেমন শান্তি দত্ত প্রভৃতি—৭০ বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিলেন। এ ছাড়া, তাঁর চতুর্থ কন্যার একমাত্র পুত্র, বিপ্লবী সুকুমার মিত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা বাসন্তী দেবী ৮০ বৎসরাধিক সুস্থভাবে দিন কাটিয়ে গেছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমুদিনী

পূজোয় চাই নতুন বই

নতুন স্বাদের দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চার
সলিল মিত্রের
দুর্গম দ্বীপের রহস্য ২·৫০
আন্দামানের বিভীষিকা ২·৫০

দৈত্যহাসি, কণ্ঠহাসি, মুচকিহাসি ও অট্টহাসির গল্প
শিবরাম চক্রবর্তীর
অনেক হাসি ২·০০

পরিচয় গুপ্তের
খেয়ালী রাজার কাণ্ড ২·০০
ভূতের বিয়ে ২·২৫
লম্বুদার গপ্প ২·০০
গোয়েন্দা সম্রাট লম্বুদা ২·৫০

সুবজিৎ মজুমদারের
ভূতের পাল্লায় ২·২৫

রহস্য ও রোমাঞ্চ ভরা এ্যাডভেঞ্চার
হরিপদ ঘোষের
রহস্যময় গুহা ২·৫০
বাঘের দেশে বিভীষণ ২·৫০
পারলৌকিক ও শিকার কাহিনী
ছায়া-কায়া ২·০০
জ্যান্ত বাঘের কবর ২·০০

রূপকথার গল্প
সুজিতকুমার নাগের
রূপকথার ঝাঁপি ২·০০
শ্যামল চক্রবর্তীর
দৈত্যের পাহাড়ে ২·০০

বিঃ দ্রঃ ভি. পিতে বই লইতে হইলে কিছু অগ্রিম পাঠাইবেন

সূচীপত্র ঃ
৩৩-সি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
(সি ৬৬২৮)

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রাত্যহিক প্রায় প্রতিটি ঘটনার লেখক প্রত্যক্ষদর্শী। বর্তমান গ্রন্থে তিনি তাঁর স্বচক্ষে দেখা আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি-সংগ্রামের সেই উন্মাদনাময় এবং পবিত্র কাহিনী দিনলিপির আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে

দাম ৪·০০

সমসাময়িক ইতিহাসের আরও বই ঃ
অমরিকুমার সরকার-সম্পাদিত বাংলা নামে দেশ ১০·০০ বরুণ সেনগুপ্তের পালাবদলের পালা ১২·০০ বিপাক-ই-স্তান ৬·০০
সংকলন-গ্রন্থ কাশ্মীর '৬৫ ১০·০০
সুধীর ঘোষের গান্ধীজীর দূত ১০·০০
এম. আর. আখতারের রূপালী বাতাস ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

স্যুট করাবেন?...

নিজস্ব রুচিতে নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য

DCM

এর 'টেরিন' স্যুটের কাপড়
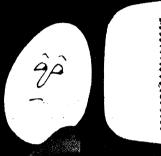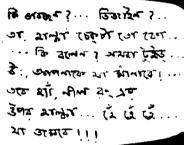
সত্ত্বেও প্রবোধ সান্যাল বর্ণিত রোগের কোনটিতেই আক্রান্ত হননি। রাজনারায়ণ বসুর গোষ্ঠীতে কার কার এবং কত পুরুষের মধ্যেই বা তিনি তাঁর কল্পিত রোগগুলি আবিষ্কার করেছেন যে, তিনি এই মিথ্যা প্রচারে নেমেছেন! 'হেরেডিটারি' কথাটার অর্থ তিনি জানেন কি?

প্রপিতামহ রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রনাথের শিষ্য প্রতাপ সেন ও সরোজিনী পিসীমা সম্বন্ধেও শ্রীসান্যাল যা লিখেছেন তা অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে লতিকাদি এই পত্রিকার ১১ই আগস্ট সংখ্যায় যা জানিয়েছেন তা সর্বাংশে সত্য বলে আমার পিতৃদেব অশোক বসু জানাচ্ছেন, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। সান্যাল মহাশয়ের কষ্টকল্পিত, বিকৃত ও অসত্য তথ্যসমূহের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই তীব্র প্রতিবাদ জানাতে হচ্ছে।

রূপনারায়ণ বসু
কলকাতা-৪

॥ ৩ ॥

গত ১৮ই আগস্ট, ১৯৭৩-এর 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'বনস্পতির বৈঠক'-এর ৩৩তম পরিচ্ছেদে সান্যাল মহাশয় লিখছেন, 'তার বন্ধু জুটেছে অনেকগুলি মেয়ে ও মহিলা, তাদের মধ্যে কল্যাণী দাস, আরতি মুখার্জি, হোসেন আরা বেগম—ফিলিপসের পি কে রায়ের স্ত্রী শোভনা রায়—এবং আরো কয়েকজন।" এই বিশেষ অংশে একটা মারাত্মক ভুল থেকে গেছে। জানি না, এ রকম আর কত আছে।

আমার দিদিমা স্বর্গীয়া সান্ত্বনা রায় ছিলেন তৎকালীন মহিলা বিপ্লবীদের অন্যতম। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি ঝাঁপ দিয়েছিলেন—কারা-নির্যাতন ভোগ করেছেন প্রথম প্রেসিডেন্সী জেলে, তারপর হিজলী ও বহরমপুরে। দেশের কাজে যোগদান করবার জন্য তাঁকে অনেক সময় বহু লোকের অনেক লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি সব হাসিমুখেই সহ্য করেছিলেন। ১৯৩০-৩১ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের পুরোধা এই মহীয়সী মহিলা ছিলেন ফিলিপস অ্যান্ড রায় ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা—গত বছর আকস্মিকভাবে দিল্লীতে লোকান্তরিত শ্রদ্ধেয় পি কে (প্রফুল্লকুমার) রায়ের উপযুক্ত সহধর্মিণী। শোভনা রায় নয়।

প্রবোধবাবু বর্ণিত "শোভনা রায়" হচ্ছেন আমার দিদিমার কনিষ্ঠা সহোদরা—স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁর অবদানও উপেক্ষণীয় নয়। পরাধীন দেশের মুক্তি সাধনে তিনিও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন—কারাবন্দী হয়েছেন বহুবার। এই শোভনা রায়ের স্বামী ডক্টর সরোজেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের কৃতবিদ্য অধ্যাপক—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রীডার।

সমীর চক্রবর্তী
সিটি কলেজ, দক্ষিণ কলকাতা শাখা।

॥ ৪ ॥

'দেশ'-এর গত ২৬শে শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩৪ পৃষ্ঠায়) লেখক লিখেছেন, একদা যে যক্ষ্মা রোগ ছিল তার (দীনেশ মজুমদার) অজ্ঞাতে মাত্র, সেই যক্ষ্মারোগই তাকে ধরেছিল এবং পাছে পুলিশের চোখে পড়ে সেজন্য তার চিকিৎসাও তেমন করা হয়নি।'

প্রবোধবাবু এইরকম একটা কাল্পনিক তথ্য কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করলেন জানি না। বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার কোন দিনই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ছিলেন না, বরং সুস্থই ছিলেন।

শচীন্দ্রকুমার ঘোষ
সুভাষচন্দ্র ॥ সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে
নেতাজীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী
১ম খণ্ড ৯.০০, ২য় খণ্ড ১২.০০
অনিল রায়
নেতাজীর জীবনবাদ
নেতাজীর জীবনদর্শনের অতুলনীয় আলোচনা। চতুর্থ মুদ্রণ ২.৫০/৫.৫০
শংকরীপ্রসাদ বসু
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং
ভারতের পরিকল্পনা রচনায় সুভাষচন্দ্রের অবিস্মরণীয় ভূমিকা। ৬.০০
চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন ২০.০০
রামমোহন ৪.০০
শিকড়ের ডানা
ঐ মহামানব আসে ৬.০০
জয়শ্রী প্রকাশন : ২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা ৯
(সি ৮৩১১/১)

একজিমা রোগ
সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত দাগ সহ আরও অনেক কঠিন কঠিন চর্মরোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ৮০ বৎসরের চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা ৯। পূরবী সিনেমার পাশে।

প্রকাশিত হলো!
অ্যাল্ফা-বিটা পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রফুল্লকুমার সিংহের নতুন উপন্যাস
জনপদ ৬৲
এ যুগের কসমোপলিটন সমাজের স্বার্থ, লোভ, হিংসা, রিরংসার প্রাণবন্ত পটভূমিকায় সযত্নে বিধৃত অসাধারণ গতিময় এই উপন্যাসে সুখতৃপ্তির সহজপথের সন্ধানে দিকভ্রান্ত নানা স্তরের মানুষের অন্তরের চলচ্চিত্র সুপরিস্ফুট হয়েছে।
অ্যাল্ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্ লিঃ
৫৩-১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২
(সি ৮৩৩৮)

মানিক গ্রন্থাবলী
দশম খণ্ড আশ্বিন/১৩৮০
প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে। উক্ত খণ্ডে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুষ্প্রাপ্য উপন্যাস ও গল্পগুলি সংযোজিত হয়েছে ॥ ১৪৲ ॥ মূল্য ১১·২০ ॥ নবম খণ্ড পর্যন্ত প্রতি খণ্ড ১৪৲ ॥ গ্রাহক-মূল্য ১১·২০ ॥
বনফুল রচনাবলী
তৃতীয় খণ্ড আশ্বিন/১৩৮০
প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে। এই খণ্ডে বনফুলের (ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) তৃতীয় দশকের বিশিষ্ট উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি সংযোজিত হয়েছে ॥ ১৫৲ ॥ গ্রাহক-মূল্য ১২৲ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রতি খণ্ড ১৫৲ ॥ গ্রাহক-মূল্য ১২৲ ॥
বিঃ দ্রঃ—কাগজ ও ছাপার মূল্য বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাবলীর পরবর্তী সংস্করণের মূল্য বৃদ্ধি হয়তো রোধ করা যাবে না। এখনও যাঁহারা গ্রাহক তালিকাভুক্ত হতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১০৲ টাকা জমা দিয়ে (মফঃস্বলের গ্রাহকগণ মানি-অর্ডারযোগে) আগামী মহালয়া/১৩৮০ মধ্যে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলি এখনকার মূল্যেই পাইবেন। যোগাযোগ করুন।
গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ
১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-১২
(সি ৮৩৩২)

এন্সর

সোর্ডশার্প

স্টেনলেস স্টীল

সব ব্লেডই দেখতে একরকম ... কিন্তু এন্সর ক্ষুরধার !

maa. E. 2610. BEN.

তিনি অতঃপর লিখেছেন, 'ধরা পড়ার কালে সে চার্লস টেগার্টের পুলিশের সঙ্গে পিস্তল নিয়ে ঘরের থেকে যখন লড়াই করছিল, তখন সে খুবই রোগাক্রান্ত, তার উপরে গায়ে বেশ জ্বর।'

এ তথ্য প্রবোধবাবু কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? তিনি বোধহয় ভালমতোই জানেন, দীনেশ মজুমদার, বিনয় বসু ও বাদল গুপ্ত, এই তিন মুক্তি-সৈনিক রাইটার্স বিল্ডিং-এ কর্নেল সিম্পসন, হোম সেক্রেটারী আলবিয়ান মার, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ ক্রেগ, জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলশন ও সেক্রেটারী মিঃ টায়নাম এই বিশিষ্ট পাঁচজন ব্রিটিশ কর্মচারীকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তিনি 'ঘরের থেকে' বলতে কি বুঝিয়েছেন জানি না, তবে যখন প্রবোধবাবু এই বিশিষ্ট ঘটনাকে উল্লেখ করেছেন তখন কোন অস্পষ্ট তথ্য পরিবেশনা অবাঞ্ছনীয়।

দীনেশ মজুমদার ফাঁসির আগে একদম সুস্থ ছিলেন এবং আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে বউদির কাছে লেখা তাঁর চিঠিতেই তার প্রমাণ আছে।

উদ্দালক মৈত্র
কলিকাতা ৭০০০৪০

কমলা নেহরু

"কমলা নেহেরু" নামের প্রবন্ধটিতে শ্রীবরুণ সেনগুপ্ত লিখেছেন,— "......তিনি (মতিলাল নেহরু) নিজে ব্যারিস্টার। ছেলেও ব্যারিস্টার।......" পণ্ডিত মতিলাল ব্যারিস্টার ছিলেন না। ব্যারিস্টার না হয়েও মতিলাল বিচক্ষণ ব্যবহারজীবী হিসাবে অশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৪৮

মূল্যবৃদ্ধি

গত ৪২ সংখ্যা "দেশ" (শনিবার ২রা ভাদ্র) পত্রিকায় "উৎপাদন, সরবরাহ ও মূল্যবৃদ্ধি" সম্পাদকীয়র জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। এ বিষয়ে আপনার পত্রিকা মারফত কয়েকটি বক্তব্য রাখতে চাই। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের কাছে যে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা অবর্ণনীয়, বিশেষ করে গ্রাম-বাংলার মেহনতী দিনমজুর বা খেটে খাওয়া মানুষের কাছে, ভাদ্র, আশ্বিন এবং কার্তিক মাসে গ্রাম-বাংলার যে খাদ্যাভাব দেখা দেয় কৃষকদের কাছে তা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা ছাড়া আর কিছু নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "খাদ্যের কালোবাজারী মজুতদারদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া উচিত।" কিন্তু উচিত অনুচিত বিবেচনা করে সরকার কেন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না? সরকারের কাছে অনুরোধ —চোরাই পথে যে খাদ্যদ্রব্য পাচার হচ্ছে তা কঠোর হস্তে দমন করুন। সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করুন। এটা খুবই আক্ষেপের বিষয় শক্তিশালী সরকার থাকা সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধি রোধের কোন সফল প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

চঞ্চল সিংহ রায়
সোদিয়া, হুগলী

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আটানব্বইতম আবির্ভাব দিবস
উপলক্ষে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি শরৎ অনুরাগী পাঠকদের টাকায় ২০ পয়সা বাদে—১০—২৫ সেপ্টেম্বর '৭৩ বিক্রয় করা হবে:
অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল : **শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী** ৬.০০ **শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা** ২.৭৫ ডঃ অজিত ঘোষ : **শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার** ১৩.০০
Prof. Humayun Kabir: Sarat Chandra Chatterjee Rs. 3.00 S. L. Ghosh: The Fire (Greehadaha) Rs. 4.50; The betrothed (Datta) Rs. 3.00

উৎপল দত্ত'র নতুন নাটক : **দিল্লী চলো** ৪.৫০
ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী : **ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য** ৯.০০

পপুলার লাইব্রেরী : ১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

(সি ৮৪৮৪)

সুনীল কুমার ঘোষের সর্ববৃহৎ উপন্যাস

রাজা গেল রাজ্য গেল

প্রকাশিত হল। ১৬.০০

ভ্যারাইটি পাবলিশার্স : ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

(সি ৮২৩৭)

প্রকাশিত হল : "ভারতের সাধক" খ্যাত ও রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক শংকরনাথ রায়ের নতুন অবদান

সাধুসন্তের মহাসংগমে ১০.

শক্তিপদ রাজগুরু **বন্যা এলো** ১০.০০
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় **দুঃস্বপ্ন** ৭.০০

কাজী নজরুল ইসলামের ॥ **ভক্তিগীতি মাধুরী** ৮.

মহাশ্বেতা দেবী — ধানের শীষে শিশির ৯. রূপরাখা ৫.০০
সম্রাট সেন — অংগীকার ৬. বিলাপী কিন্নর ১০.০০
চিরঞ্জীব সেন — নৃশংস মাফিয়া ৭. নায়ক নায়িকার রহস্য ৬.০০

নিমাই ভট্টাচার্য **রাজধানী এক্সপ্রেস** ৪.

করুণা প্রকাশনী / ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা—৯

(সি ৮৪৭৮)

তুলা-বৃশ্চিক দুয়ে মিলে করে বিশ্ব জয়
লালভাইয়ের গোলাপী-মেরুন চির সুন্দর রয়!

লালভাই — ভাগ্যচক্র চাক্ষক

মনের মিল থাকলে দুটি মানুষ
যেমন মর্ত্যেই স্বর্গ রচনা করে—
রঙের খেলাতেও তাই। দেখতে চান?
তো আসুন—উদ্‌ঘাটন করুন

হয়তো খুঁজে পাবেন তাঁকে—
যিনি আপনার বিজয়কের সাথী!,
বেছে নেবার ৭ গুণ সুযোগ,
আর কে দেয় বলুন!

CML 9-27-234 BN

উপন্যাস

শেষ প্রহরে শান্তি। শিশির লাহিড়ী। রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১০৬/১, রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা-৯। দাম আট টাকা।

অন্বেষণ। অজয় ভট্টাচার্য। এষণা প্রকাশনী। ১৫৯, বনবিহারী সেন রোড, বহরমপুর, দাম ছ' টাকা।

'শেষ প্রহরে শান্তি' শিশির লাহিড়ীর প্রথম উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস তো বটেই, সম্ভবত তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থও। ইতিমধ্যে ছোটগল্প লেখক হিসেবে তিনি পাঠকদের কাছে পরিচিতি পেয়েছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁর গল্পের একটি পাঠকগোষ্ঠী তৈরী হয়ে গেছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস পড়ে মনে হয়, তাঁর পাঠকের পরিধি বেড়ে যাবে, যাঁরা তাঁর পরবর্তী উপন্যাসের জন্য অপেক্ষা করবেন।

'শেষ প্রহরে শান্তি' পড়তে পড়তে একই সংগে মনে হয়, এই বই লেখকের প্রথম উপন্যাস এবং প্রথম উপন্যাস নয়।

প্রথম কথাটা মনে হয়, কারণ, প্রথম এবং প্রথম দিককার লেখায় যে তাজা স্বাদ, আশা করা যায় 'শেষ প্রহরে শান্তি'তে তা আছে। আবার প্রথম নয় মনে হয়, তার কারণ, শিশির লাহিড়ীর প্রথম উপন্যাস ততটা পরিণত হাতের লেখা, যতটা পরিণতি প্রথম উপন্যাসে আশাতীত।

এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রী প্রত্যেকেই আমাদের চেনা মহলের। গগনেন্দ্র বা দিননাথ, বিরজা বা পরেশ, নমিতা, সুমিত্রা এবং নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের অন্যান্য পরিচিত চরিত্রগুলোর সংগে আমাদের প্রায় প্রতিদিন দেখা হয়। এঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব সমস্যা আছে, আবার একই সংগে এঁরা একই দুঃখের এবং সুখের অংশীদার।

অনেকে জীবনকে নাটকের সংগে তুলনা করতে ভালবাসেন। সে অর্থে এই সব চরিত্ররা কখনও জেনে, কখনও না জেনে, তথাকথিত জীবন-নাটকের কুশীলব হয়ে পড়েন। যেখানে তাদের ইচ্ছাশক্তির মূল্য প্রায় কিছুই নেই। পাঠক হিসেবে আমরাও ক্রমশ এদের সংগে জড়িত হয়ে পড়ি। এদের সুখ আমাদের সুখী করে, এদের দুঃখ আমাদের দুঃখ দেয়।

শেষ প্রহরে শান্তির শেষ প্রহরে যে শান্তি, তা নিঃসঙ্গতায় শান্তি, বিষণ্ণতার শান্তি। যেখানে 'আনন্দ আলোর মতোও কোথাও কোন বিষন্ন নির্জন সুর জাগে।'

উপন্যাসটি আদ্যোপান্ত পাঠককে নিবিষ্ট করে রাখে।

অজয় ভট্টাচার্যের 'অন্বেষণ' তাঁর প্রথম উপন্যাস কি না জানি না।

'অন্বেষণ' মোটামুটি পাঠ্য রচনা। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শংকর বড় অভিমানী এবং দুঃখী। সে সম্ভবত সুখের অন্বেষণ করে। কাহিনী থেকে প্রেম, বেশ্যা, মদ কিছুই বাদ পড়েনি।

সমস্ত লেখার এক ধরনের সরলতা আছে। কিন্তু সরলতা সবসময় লেখার গুণ হয়ে নাও উঠতে পারে। সর্বত্র মনে হয় বোঝা যায়, লেখক বেশ আবেগপ্রবণ।

তবে প্রশ্ন আসে যে শিল্পসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয় তাকি আর নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে?

নবনীতা। তপন ঘোষাল। সেকাল-একাল : ১৮বি, টেমার লেন, কলিকাতা ৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

তপন ঘোষালের 'নবনীতা' সদ্য প্রকাশিত নাতিদীর্ঘ একটি প্রেমের

দুর্লভ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ ● একুশ বছর পরে প্রকাশিত হল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুন্দরবনে সাত বৎসর ৪৲

ছোটদের আরও ভালো ভালো বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের **হার্মাদ** ৩·০০ ॥ নারায়ণ গংগোপাধ্যায়ের **চারমূর্তি** ৪·০০ শিবরাম চক্রবর্তীর **অদৃশ্য হন হর্ষবর্ধন** ২·৫০ ॥ ধীরেন ধরের **দুরন্ত যাত্রী** ৩·৫০ ॥ স্বপন বুড়োর **বিচ্ছুদের বাহাদুরী** ৩·০০ ॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের **নীলতিমি** ৪·০০ ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের **কলকাতার কেঁদো** ৪·০০ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **ঘনাদার জুড়ি নেই** ৪·০০ ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **ঝাউবাংলোর রহস্য** ৪·০০ ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসুর **কাকতাড়ুয়া** ৪·০০ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **ধনে পাহাড়** ৫·০০ ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের **আমাজনের অরণ্যে** ৪·০০ ॥

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

(সি ৭৮৮৭)

অদিতি গ্রন্থালয়ের বই **প্রকাশিত হল**

নিমাই ভট্টাচার্য-র আধুনিকতম উপন্যাস

হরেরাম হরেকৃষ্ণ

বর্তমানকালের যুবক-যুবতীদের ভয়ঙ্কর সুখ-দুঃখ, হতাশা, হাহাকার ও যুগ-যন্ত্রণার স্বাক্ষর হিসাবে এ উপন্যাস পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলবে। দাম : আট টাকা।

নিমাই ভট্টাচার্য-র রোমান্টিক উপন্যাস

অনুভব

বাংলা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে ॥ দাম : ছয় টাকা

পরিবেশক : **নাথ ব্রাদার্স** ॥ ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা-১২

(সে ৮০১১)

উপন্যাস। একদিকে প্রথম যৌবনের সঞ্চরণে আশাবাদী নায়ক, অন্যদিকে নায়িকা ধনীকন্যা নবনীতা। অস্ফুট প্রেমের স্পর্শে নায়ক ও নায়িকা বিচরণ করে। আপন-আপনি গড়ে উঠল স্বপ্নময় পরিমণ্ডল। পরে বাস্তবের নখরাঘাত। স্বপ্নভঙ্গ, হতাশা এবং ব্যর্থতা। এরই ফাঁকে ফাঁকে নায়কের টুকরো টুকরো ঘরোয়া চিত্র সুন্দর ফুটে উঠেছে। নায়ক নায়িকা এবং অন্যান্য চরিত্রের সংলাপ উল্লেখযোগ্য। লেখক জীবনের একটা দিক ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, রচনায় দুর্বলতা এসেছে তা সত্ত্বেও এই চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। এ কথা বোধ হয় বলা যায় লেখকজীবনের অনুশীলন পর্ব তরুণদের বড় অসহিষ্ণু করে। তপনবাবু যদি অনুশীলনে-কাতর না হন, তা হলে ভবিষ্যতে রচনাগুণে খ্যাতিমান হতে পারেন। তাঁর আন্তরিকতা রয়েছে, এটি খুবই বড় গুণ।

কবিতা

নীল আলোর হরিণ। বেনু দত্ত রায়। প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২। দাম তিন টাকা।

কবি বেনু দত্ত রায়ের নিজস্ব মেজাজ আছে। তাঁর প্রকাশভঙ্গী সাবলীল। চিত্রকল্প নির্মাণে সুপটু। প্রেম, মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে রচিত তাঁর কবিতাগুলি পড়তে পড়তে এরকমই মনে হয়। ভাবনায় পরিমিতিবোধ, বাক-সংযম ও শব্দের অনায়াস ব্যবহারনৈপুণ্য নিঃসন্দেহে কয়েকটি কবিতার সৌষ্ঠব প্রকাশে সাহায্য করে। যেমন, 'অরণ্যবিজয়ী বাঘ লাফ দিয়েছিলো' কবিতায় :

> ক্ষতটিকে লালন করি আজো—
> বাঘিনীর প্রতিই আমার গুপ্ত প্রেম,
> হলুদ পশমে চারদিক স্নান করে ওঠে;

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বলতে বাধ্য হই যে, এই কবির কয়েকটি কবিতা ছাড়া আলোচ্য গ্রন্থটি বিশেষ কোনো সাড়া জাগায় না। অথচ এটি তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ।

সুগত বড়ুয়া-র ভিন্ন স্বাদের কাব্যগ্রন্থ

প্রকাশিত হলো

বুক নিউজ ॥ কলকাতা ৬

(সি ৭৬৬৭)

পুজোর মরশুমের নতুন নাটক

'জলদূত' রচিত স্ত্রী বর্জিত নাটক

ফুটপাত ২,
জবাব ২,
বাবার বিয়ে (হাসির নাটক) ২,
ওস্তাদ ২,
সমাজের মুক্তি (১টি স্ত্রী) ৩,
ডিক্কুক (১টি স্ত্রী) ৩,

অরুণেন্দুমার দে রচিত

রক্ত ঝরছে ২,
ওধা সব পাবে ২,
গরীবের ছেলে ২,
মুঠো ভাত ২,

অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

টাইপিস্ট মিতা (২টি স্ত্রী) ৩,

পাবলিশার্স ওনলি ॥ ২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫

(সি ৮২০৪)

প্রকাশিত হলো

চেজ-এর 'শকুনের চোখে পলক পড়ে না' 'শুধু যাওয়া আসা' 'সুখের পাখি উড়িয়ে দিলাম'-এর চেয়েও দুর্ধর্ষ এ বই

জেমস হেডলী চেজ

বলতে ঠিক এমন বই বোঝায়

হাতের মুঠোয় পৃথিবী

ওয়ার্ল্ড ইন মাই পকেট / ভাষান্তর : অনীশ দেব

শুধু যাওয়া আসা-র মতো এ বইয়ের অনুবাদেও অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন অনীশ দেব ॥ ১২.০০

প্রকাশক—পত্রপুট/পরিবেশক—কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলি-৭০০০১২

(সি ৮৩৯৬)

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

চোমংলেমা রচিত **নগশীর্ষ নাগাভূমি** (দীপায়ন, আট টাকা) নাগাভূমি সম্পর্কে একটি সুরম্য বর্ণনা। চোমংলেমা নিশ্চিত ছদ্মনাম, কেননা উত্তমপুরুষে বর্ণিত এই গ্রন্থের মুখ্য চরিত্র এক বাঙালী সাংবাদিক। কলকাতা থেকে কিছুকালের জন্য কোহিমায় গিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য নাগাভূমির সঙ্গে সারেজমিন পরিচয় স্থাপন। উত্তমপুরুষে বর্ণিত এই কাহিনী আর যাই-হোক উপন্যাস নয়। ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সব চরিত্রই কাল্পনিক নয় এবং বিশেষ কোনো কারণবশত ছদ্মনামের আশ্রয় নিয়েছেন লেখক।

তবে নামের জন্য গ্রন্থটির মূল বিষয়ে কিছু হেরফের অবশ্য হয় না। এই গ্রন্থের মুখ্য বিষয় নাগাভূমি সম্পর্কে বিস্তৃত একটি আলোচনা, এবং সে-বিষয় ভালভাবেই বর্ণিত। নাগাভূমির প্রাচীন ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা, সামাজিক [illegible]র-আচরণ ও রীতিনীতি, স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় একটি পরিষ্কার ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। সে-দিক থেকে বইটি সার্থক।

তবে নীরস ভূগোল, তথ্যসর্বস্ব ইতিহাস কিংবা রাজনৈতিক কচকচি যাতে বর্ণনাটিকে একঘেয়ে না করে তোলে সে-দিকে তাকিয়ে লেখক কিঞ্চিৎ প্রেমের গল্পের সুতোয় পুরো বক্তব্যটি গাঁথতে চেয়েছেন। একদিকে গাইড অন্যদিকে প্রেমিকা এক নাগাযুবতীকে এনেছেন তিনি রিলিফ চরিত্র হিসেবে। মেয়েটির দাদা আবার বিদ্রোহী নাগাদের অন্যতম নেতা। হবু পরমাত্মীয় হিসেবে লেখকের সঙ্গে পরিচয় করেছে সে ইলোপ করে নিয়ে। এই অংশ বেশ রোমাঞ্চকর। তবে গ্রন্থের শেষ পর্বে প্রেমিকার হাত থেকে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় না নিলেই পারতেন লেখক। কেননা, বহু ব্যবহারে প্রেমের উপাখ্যানে আংটির দ্রব্যগুণ উবে গিয়েছে।

*

অজিত পুততুণ্ডর 'টেমস থেকে তিস্তা' (প্রকাশিকা : শ্রীমতী সন্ধ্যা দেবী, হাজরা রোড, ছ টাকা) উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র আর্থার ডবসন নামে এক শ্বেতাঙ্গ। সুদূর টেমসের কূল থেকে তিস্তার তীরে ডবসন এসে পড়েছিল পৈতৃক ব্যবসার সূত্রে। আর্থার ডবসন ঠিক খাঁটি ইংরেজচরিত্র নয়, কেননা, বাবার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে সে একটি ভারতীয় মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং সেই ঘনিষ্ঠতা তাকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরোক্ষ সৈনিক করে তোলে। ডবসন-এর প্রেমিকা শিউলি এক নিষ্ঠুর চক্রান্তের শিকার হয়ে নিহত হয়। মৃতা প্রেমিকার স্মৃতিতে তৈরি হল শিউলি-আশ্রম। মেয়েদের স্বনির্ভর করে তুলে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রসারই ছিল এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। এই আশ্রমকে কেন্দ্র করেই মুখ্য চরিত্রগুলি নানান ঘটনার স্রোতে আবর্তিত। দেবজ্যোতি-লীলিতা-সুতপা, ভারতীশ, ইত্যাদি চরিত্রগুলির যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে ঘটিয়েছেন লেখক। অনেকটা দর্শকরুচিক-প্রসন্ন-করা চলচ্চিত্রের মতো এই সমাধান হয়তো অতি-নাটকীয় মনে হতে পারে। তবে নতুন ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগের কয়েকটি টুকরো ঘটনাকে পটভূমি নির্মাণের কাজে ভালভাবেই লাগাতে পেরেছেন তিনি। কাহিনীর গতি, বর্ণনা মাঝে মাঝে এত প্রস্তুতিহীন ও আকস্মিক যে গোলমাল পড়তে হয়। এই ত্রুটি পরিহার করতে পারলে উপন্যাসটির গতি আরও সাবলীল হতে পারত।

*

শ্যামা দে সম্ভবত নতুন লেখিকা। তাঁর **সবুজের বন্দী** (পরিবেশক : জ্ঞানপীঠ, চার টাকা) কাব্যগ্রন্থটিতে যে-কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে তার অধিকাংশই এখনো প্রত্যাশিত মানে পৌঁছতে পারেনি। দু-একটির প্রসাদ সরলতা আন্তরিকতার দিক থেকে বড়জোর মুগ্ধ করে। তবে কাব্যগ্রন্থটির মুদ্রণ-পারিপাট্য বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য।

*

প্রায় কুড়ি বছরের অক্লান্ত চর্চা ও প্রশংসনীয় নিষ্ঠার কিছু স্বাক্ষর নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে প্রফুল্লকুমার দত্তর **স্বনির্বাচিত কবিতা** (পূর্বাশা প্রকাশন, পাঁচ টাকা)। সব কবিতার যে স্থান হয়নি এবং অনেক সদগুণ-সম্পন্ন কবিতাকে যে নির্মমভাবে বাদ দিতে হয়েছে প্রফুল্লকুমারের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় সে-সম্পর্কিত বেদনার আভাস পাওয়া গেল। আমরাও নিশ্চিত সমবেদনা জানাব তাঁকে। তবে একটা কথা ঠিক যে, মহাকাল আরও নির্দয় এবং সময়ের স্রোতে এই কটি কবিতারও কতগুলি শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যাবে তা কেউ জানে না। সুতরাং অতৃপ্তির সান্ত্বনা লজ্জা।

প্রফুল্লকুমার দত্তর কবিতার প্রধান গুণ, সহজতা। এই গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে একটি কথা মানতেই হয় যে, সহজভাবে কাব্যিক পরিবেশ গড়ে তোলার সাধনায় তাঁর সিদ্ধি সহজাত। তাঁর ভাষা সহজ, চিত্রকল্প সরল, বর্ণনায় মারপ্যাঁচ প্রায় নেই বললেই চলে। 'এখন আমার/সকালে শিশুর কণ্ঠে তুমি জাগো, এখন আমার/দুপুরে পাখির গানে তুমি ভাসো, এখন আমার/সন্ধ্যায় চুলের গন্ধে তুমি হাসো আর/ এখন আমার রাতে রমণীর কমনীয় স্পর্শে তুমি মায়ের মতন স্বর্গমর্ত্যরসাতল জুড়ে স্বপ্রকাশ ধরনের পংক্তি তিনি অনায়াস দক্ষতায় রচনা করেছেন। কিন্তু এ-কথাও একই সঙ্গে মনে না হয়ে পারে না যে, এত সহজ বলেই হয়তো তাঁর কবিতায় কোনো দীর্ঘস্থায়ী অভিঘাত শেষ পর্যন্ত তৈরি হয় না। কানের দরজা পেরিয়ে মনের একটা ওপরস্তরে বুদবুদ তোলে মাত্র, ভিতরের চৌকাঠ পেরিয়ে প্রবল ধাক্কায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় না।

পত্রিকা

কৃশানু। সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র সিংহ। ৩০/১/এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য এক টাকা।

নিছক সাহিত্য বিষয়ক এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি যে সাহিত্যরসিক সমাজে আসন করে নিয়েছে তার প্রমাণ একাদিক্রমে পাঁচটি বছর অতিক্রমণ। কোন লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের নয়। আলোচ্য (৫ম বর্ষ ৩য়-৪র্থ) যুগ্ম সংখ্যাখানির রচনাবলীতেও সাহিত্যের মেজাজ অক্ষুণ্ণ পাওয়া যায়। রচয়িতাদের মধ্যে আছেন রাম বসু, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অজিত বাইরী, সিদ্ধেশ্বরকুমার মুখোপাধ্যায়, হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সিংহ, সুনীল বসু ও প্রভাসকান্তি ভদ্র।

যদি কেহ বাড়ীতে অল্প মূলধন দ্বারা কোন ছোট ব্যবসা বাণিজ্য করে লাভবান হইতে চান, তাহা হইলে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত "কুটির উদ্যোগ" নামক পুস্তক অধ্যয়ন করুন। মোট পাতা 224, মূল্য 10 টাকা, 'গৃহ উদ্যোগ' পাতা 464 মূল্য 16 টাকা, লেটেস্ট কটেজ ইণ্ডাস্ট্রীজ (ইংরেজি) পাতা 1048, দাম 22 টাকা। ডাক মাশুল 3 টাকা।
Cottage Industry (DA-39) PB No. 1262, Aguri Bagh Market, Delhi-6.

(সি ৮৮৮১)

(সি ৮৫২৯)

কম দামে শ্রেষ্ঠ বই

১। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে নারী প্রগতি

ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশিষ্ট বই ১২ টাঃ, রিবেট ৪ টাঃ
৩২টি প্রধান দেশের নারীর সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক এবং চারিত্রিক বিষয়ে (প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত) "এত তথ্য সম্বলিত বই বাংলাসাহিত্যে আর নেই।" —বসুমতী
"প্রামাণ্য পুস্তক হিসাবে ইহা খুব সমাদৃত হইবে।" —দেশ

অন্যান্য সকল পত্রপত্রিকারও ঐরূপ মত।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বহু কপি
ঐ বই কিনেছেন।

২। The effects of International-Re-alignments
K. C. Banerjee Rs. 3.50
Hailed all over the world as "a thoughtful and fascinating book", "a book of international interest", "an important and valuable book, etc." by great Statesmen and the Press: H. Humphrey, McGovern, Golda Meir, Dan Rawly, Hiren Mukherjee (M.P.) and others.

K. C. Banerjee & Co.
192|D, Bidhan Sarani, Calcutta-6

(সি ৪১৩৪)

শক্তির জগতে সেরা নাম

খুব সামান্যভাবে শুরু হয়ে আজ এই সংস্থা এক বিরাট, প্রগতিশীল, শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। বিজলী শক্তির উৎপাদন, সম্প্রসারণ এবং ব্যবহারের জন্যে ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে এইচ ই আজ এক সুবিখ্যাত নাম হয়ে উঠেছে!

এইচ ই-র কুশলী ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রবিদরা কাজ করেন বিশেষভাবে তৈরী স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণা ও উৎপাদন ইউনিটে। দুনিয়ার যেকোনো জায়গায় যেকোনো ধরণের, যেকোনো সাইজের ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির বিশেষ চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যেই এই ইউনিটগুলিতে অক্লান্ত পরিশ্রম চলছে।

আমাদের রকমারি উৎপাদন:

- ওয়াটার টারবাইন এবং তার মানানসই জেনারেটর ২০০ এম. ডবলিউ. পর্যন্ত,
- স্টীম টারবাইন, টারবো-জেনারেটর ও কণ্ডেন্সার,
- ৪০০ এম.ভি.এ. পর্যন্ত হারের ইউনিট ও ৪০০ কে.ভি. পর্যন্ত ভোল্টেজের জন্যে ট্রান্সফরমার;
- হাই ভোল্টেজ সুইচগিয়ার-৪২০ কে.ভি. পর্যন্ত;
- এসি এবং ডিসি মোটর সবচেয়ে বড় সাইজ পর্যন্ত;
- কন্ট্রোলগিয়ার এবং কন্ট্রোল প্যানেল;
- ইলেকট্রিক ও ডীজেল ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন ইকুইপমেন্ট;
- রেক্টিফায়ার এবং কেপ্যাসিটর;
- ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার (ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ও কেপ্যাসিটর টাইপ) এবং ৪০০ কে.ভি. পর্যন্ত ভোল্টেজের জন্যে কারেন্ট ট্রান্সফরমার.

হেভি ইলেকট্রিক্যাল্‌স্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ
ভূপাল
(ভারত সরকারের একটি পরিকল্পনা)

নাইম — ফুটবল মহলে একটি নাম

অনেক ব্যথা বুকে নিয়ে ফুটবল খেলোয়াড় নাইম কলকাতা থেকে বিদায় নিয়েছিল। যে ব্যথায় মানুষ ধনরত্ন স্ত্রী পুত্র পরিবার ত্যাগ করে সংসার বিবাগী হয়, তেমন একটা ব্যথা। তার নিজের কথায়, "ফুটবলের নন্দনকানন" কলকাতায় আবার ফিরে এসেছে। যদিও নাইমের ফুটবল জীবনে মধ্যাহ্ন সূর্যের সে দীপ্তি নেই, তবু পশ্চিম গগনে ঢলে পড়া তিরিশ বছর বয়সী ফুটবল-সূর্যের ম্লান আলোরও একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য আছে—পরিকল্পনাপ্রসূত পরিশ্রম ও পরিমার্জিত ক্রীড়াসৌন্দর্য, যা মানুষকে আনন্দ দেয়, দর্শককে উজ্জীবিত করে তোলে।

সুপার লীগে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ঘটনাবহুল খেলার একটি ঘটনায় ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতার উপর নাইম সাময়িক বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। খেলার সময়ে মাঠ থেকে তিন জন খেলোয়াড় বহিষ্কার, খেলার শেষে রেফারির নিগ্রহ, সমর্থকদের মারামারি, তারও পরে কলকাতার রেফারিদের খেলা পরিচালনা বয়কট এবং চারজন খেলোয়াড়ের গ্রেপ্তার প্রভৃতি নানা ঘটনায় সুপার লীগের ওই খেলাটি কলকাতার ফুটবল ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। চুপি চুপি নাইমের কলকাতা ত্যাগ চিহ্নিত হয়ে থাকবে অনেক ব্যথার স্মৃতি জড়ানো ওই অধ্যায়েরই একটি মলিন পরিচ্ছেদ হিসাবে।

গ্রেপ্তার হওয়া চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে নাইমও ছিল একজন। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল খেলার শেষে আর দুজনের সঙ্গে ও রেফারিকে ঘিরে ধরে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। বিষাদ কণ্ঠে নাইম বলেছে: "আমি রেফারির কাছে ছিলাম সত্যি, কিন্তু চ্যালেঞ্জ জানাইনি এবং ফুটবলের সুনামে কলঙ্কের কালি পড়তে পারে জীবনে এমন কাজ কোনদিনই করিনি। আট বছরের খেলোয়াড় জীবনে কলকাতার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। অনেক সম্মান, অনেক ভালবাসা, অনেক মহাজনের দরদী সান্নিধ্য। কিন্তু আজ পেলাম জীবনের চরম পুরস্কার—লালবাজারের লক-আপ আর ব্যাংকশাল কোর্টের কাঠগড়া।"

নাইমকে অবশ্য লক-আপে যেতে হয়নি। ওর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে জেনে নিজেই লালবাজারে গিয়ে ধরা দিয়েছিল। কিন্তু গ্রেপ্তার আর কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর ফলে—ওর মতে ওর যা কিছু সম্মান ও মর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, কলঙ্কের ছাপ পড়েছে ওদের পারিবারিক ঐতিহ্যে। পুরো নাম সৈয়দ নাইমুদ্দিন। অন্ধ্রের খানদানী মুসলমান বংশের সন্তান। সমাজে সৈয়দ পরিবারের পৃথক মর্যাদা, পৃথক ঐতিহ্য। নাইমের ধারণা, ওর গ্রেপ্তারের ফলে সেই বংশের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেছে। কেউ সে মর্যাদা আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তাই আত্মগ্লানিতে চোরের মত চুপি চুপি কলকাতা থেকে চলে গিয়েছিল।

সৈয়দ নাইমুদ্দিন

কেউ জানতনা, কেউ আভাষ পায়নি, মোহনবাগান ক্লাবের কর্মকর্তারাও না। শুধু একজন ক্রীড়া সাংবাদিক এবং একজন ফটোগ্রাফার বিমানবন্দরে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। জলভরা চোখে তাদের কাছে ওর জবানবন্দী: ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল কলকাতার কোন বড় ক্লাবে খেলে ফুটবলে সুনাম কুড়াবো। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং—তিনটি বড় ক্লাবেই খেলেছি। লীগ, শীল্ড, রোভার্স ডুরাণ্ড—সব প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের শরিক হয়েছি। বাংলার হয়ে জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসাবে বিজয়-মঞ্চে দাঁড়িয়েছি। কলকাতায় এসে প্রথম বছরেই পেয়েছি 'বেস্ট ফুটবলার অফ দি ইয়ার'-এর সম্মান। ১৯৭০-এ জাতীয় সরকারের কাছ থেকে পেয়েছি অর্জুন পুরস্কার। কী না পেয়েছি? কিন্তু আজ কী পেলাম?"

"আমি মুসলমান হলেও অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্তির সুবাদে মহাভারতে বর্ণিত তৃতীয় পাণ্ডবের শৌর্য, চারিত্রিক মাধুর্য এবং ধর্মীয় ন্যায়-নীতির সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নিয়েছি। অদৃষ্টের পরিহাস, আজ অর্জুন পুরস্কার-প্রাপ্ত খেলোয়াড়ের জীবনে কী ঘৃণ্য অপবাদ নেমে এসেছে। অথচ আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ নেই। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের অসারতা প্রমাণের আমি কোন সুযোগই পেলাম না। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় উদ্যোগী হয়ে যদি গণ্ডগোল মিটিয়ে না দিতেন তাহলে হয়তো নির্দোষিতা প্রমাণের সুযোগ পেতাম। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েই আমাকে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে হবে।"

অভিযুক্ত খেলোয়াড় নাইমের এই উক্তি থেকেই জলের মত প্রমাণ হয়ে গেল, 'বেস্ট ফুটবলার অফ দি ইয়ার' এবং অর্জুন পুরস্কার অপাত্রে দান করা হয়নি। কলকাতায় আসার আগেই অবশ্য ভারতীয় ফুটবলে নাইমের নাম ছিল। ১৯৬৩-তে পেনাংয়ে আয়োজিত প্রথম এশীয় যুব ফুটবলে নাইমই ছিল ভারত দলের অধিনায়ক। ১৯৬৪-র প্রাক অলিম্পিক ফুটবলেও ওর ডাক পড়েছিল। ১৯৬৬-তে কলকাতায় প্রথম খেলতে এসে যখন ফুটবলার অব দি ইয়ার হল তখন কেউ কেউ একটা চাপা অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'উড়ে এসে জুড়ে বসল'। হ্যাঁ, নাইম উড়ে এসেই কলকাতার ফুটবল আসরে জুড়ে বসেছিল এবং ধারাবাহিক সাফল্যের সোপান বেয়ে সুনামের চূড়ায় চড়েছে। গত ৮ বছর ধরেই নাইম কলকাতা ফুটবলের অপর নাম। বাবা সৈয়দ বদরুদ্দিনও যৌবনে নামী ফুটবলার ছিলেন। ফুটবলার তৈরীর সুদক্ষ কারিগর পরলোকগত কোচ রহিম সাহেবের মন্ত্রশিষ্য সৈয়দ নাইমুদ্দিন। অন্ধ্রের ইসলামিক ওল্ড বয়েজ ও আরসেনাল ক্লাবে খেলত ফরোয়ার্ডে। পরে লেফট-ব্যাক থেকে লিংকম্যান এবং লিংকম্যান থেকে স্টপার। আধুনিক ফুটবলে পারস্পরিক স্থান বদল করে খেলার যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং রক্ষণভাগের খেলোয়াড়ের পক্ষেও যে আক্রমণে এগিয়ে যাওয়া অপরিহার্য নাইমের ফুটবলে তার সার্থক রূপায়ণ। বহু গুরুত্বপূর্ণ খেলায় দেখেছি, সহজ ভঙ্গিতে ও যেভাবে প্রতিপক্ষের আক্রমণের ঢেউ ভেঙে দিয়েছে সেইভাবেই বার বার এগিয়ে গিয়ে বিপক্ষ রক্ষণব্যূহে আক্র-

মণের ঢেউ তুলেছে। ফুটবলের পরিকল্পনায়, আঙ্গিকে এবং সৌকর্যে শিল্পী খেলোয়াড়ের দক্ষতা। মাঠের বাইরে আচারে, ব্যবহারে নম্র, বিনয়ী, শান্ত, সুভদ্র—যা শ্রেষ্ঠ ফুটবলার নির্বাচনের মাপকাঠি। অবশ্যই ক্রীড়ানৈপুণ্যের সঙ্গে।

ওর খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তির একটি উদাহরণ দিয়ে লেখা শেষ করব। ১৯৬৭ সালে ইস্টবেঙ্গল ডুরান্ড ও রোভার্স জিতল। আই এফ এ শীল্ড জিতে প্রথম 'ট্রিপল ক্রাউন' লাভের স্বর্ণ সম্ভাবনা। আই এফ এ সিদ্ধান্ত নিল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে শীল্ড ফাইনাল খেলা হবে খেলোয়াড়দের দল অদল বদলের পালা শেষ হবার পর। যুক্তিহীন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত। দল অদল বদলের ফলে নাইম ইস্টবেঙ্গল থেকে চলে গেল মোহনবাগানে। তখনও ফাইনাল খেলার কথা উঠছে। এবং এমন কথা উঠছে, ১৯৬৭-তে যে খেলোয়াড় যে দলে ছিল তারাই ফাইনালে সেই দলের পক্ষে খেলবে।

নাইমকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি তো পোড়ালাল-পোড়াসবুজ রংয়ের জামা পরেছ, আর কি লাল-হলুদ জার্সি পরে ঠিক ভাবে খেলতে পারবে? নাইম বলেছিল, "কেন পারবনা? ফুটবলারের যেমন জাত বিচার নেই, তেমন জার্সি বিচারও নেই। যখন যে দলে খেলব তখন সেই দলেরই খেলোয়াড় এবং সে দলের সম্মান উঁচুতে তুলে ধরার জন্য প্রাণ-পাত পরিশ্রম করব। দলের জন্য খেলা এবং খেলোয়াড়ী মনোভাব বজায় রাখাই খেলোয়াড়ের প্রকৃত ধর্ম।"

সৈয়দ নাইমও একজন খেলোয়াড়—প্রকৃত খেলোয়াড়।

—মুকুল

খেলার মাঠে

চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত হবার পর হর্ষোৎফুল্ল ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়রা অধিনায়ক স্বপন সেনগুপ্তকে কাঁধে তুলছে —ফটো দেশ

ইস্টবেঙ্গলের আবার লীগ জয়

একক লীগের পর কৃত্রিম ব্যবস্থায় চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসা করার সার্থকতায় সন্দেহ প্রকাশ করে এবং সুপার লীগের সব ব্যবচ্ছেদের দাবি জানিয়েও বলব, ইস্টবেঙ্গলের উপর্যুপরি চার বছর লীগ জয় যোগ্যের যোগ্য পুরস্কার এবং দলগত সংহতির পরিচয়। দলের শক্তি অনুযায়ী সব ম্যাচ অবশ্য ইস্টবেঙ্গল সমান তালে খেলতে পারেনি। পোর্ট কমিশনার্স ও পয়েন্ট হারিয়েছে। খিদিরপুর ক্লাবের কাছে হারিয়েছে দু'টি পয়েন্ট অসমাপ্ত খেলায় স্ক্র্যাচ হয়ে যাবার ফলে। কিন্তু যেখানে জোর লড়াই এবং যে লড়াই জয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের স্বর্ণ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় সেখানে ইস্টবেঙ্গলের সফল ভূমিকা।

স্বভাবতই আমি দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলছি। অনুযায়ী খেলতে পারেনি। কিংবা বলা যায়, মহমেডানকে পর্যুদস্ত করেই ইস্টবেঙ্গল ৩—০ গোলে বিজয়ী হয়েছে। আর একক লীগ এবং সুপার লীগের খেলাতেও প্রবল প্রতিপক্ষ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের জয় রীতিমত প্রাধান্যের পরিচয়। প্রধানত এক্ষেত্রে বাজিমাৎ। আগের তিন বছরের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এ বছরও হয়তো অপরাজিত আখ্যা পেতে পারত যদি খিদিরপুরের সঙ্গে খেলায় গোলমাল না করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ৭০ মিনিট খেলে যেত। কিন্তু দু'টি গোল খাবার পরই খেলোয়াড়রা অধৈর্য হয়ে উঠল। তার মধ্যে একটি গোল শোধও হল। ৩০ মিনিটের সময় হাবিব মার্চিং অর্ডার পেয়ে মাঠ থেকে বের হতে অস্বীকার করায় রেফারি খেলা বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। ১৯৭৩-এর লীগ বিজয়ী দলের এই খেলাটিই দুঃখজনক স্মৃতি হয়ে রইল যা চ্যাম্পিয়ন টিমের ক্রীড়াশৈলী ও ভাবমূর্তির সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

একটি দলের সাফল্যের মূলে সব খেলোয়াড়েরই কিছু না কিছু অবদান থাকে। অবদান থাকে তাঁদেরও, যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে খেলোয়াড়দের পেছনে থেকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। যেমন ক্লাবের কোচ, ক্লাবের কর্মকর্তারা। তবু মুখ্যত ক্রীড়ানৈপুণ্যই সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে তোলে। কারো নৈপুণ্যই কম নয়। সুধীর কর্মকার, শ্যামল ঘোষ, প্রবীর মজুমদার, গৌতম সরকার, সমরেশ চৌধুরী, হাবিব, আকবর, দলনায়ক স্বপন সেনগুপ্ত সবারই অবদান স্বীকার্য। তবু বলব, রক্ষণ ও আক্রমণ ভাগে এবার যাদের মুখ্য ভূমিকা তারা হচ্ছে স্টপার অশোক ব্যানার্জী ও স্ট্রাইকার সুভাষ ভৌমিক। সুভাষ রাইট আউটের খেলোয়াড় হলেও আমি তাকে স্ট্রাইকারের মর্যাদা দেব। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ঠিক ভাবেই সে স্ট্রাইক করেছে। লীগে ২২টি এবং সুপার লীগে ২টি মোট ২৪টি গোল করে পেয়েছে এ বছরের গোলদাতার তালিকায় শীর্ষস্থান।

অভিনন্দন জানাচ্ছি অন্তরালের

নরেশ কোচ পি কে ব্যানার্জীকে, যিনি এগারো তারের সমন্বয়ে একটি মাঠ মাতানো সুর সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, প্রশিক্ষণের গুণে, নিষ্ঠা ও ভালবাসায় খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আগেই বলেছি, ইস্টবেঙ্গলের কাছে দুটি খেলায় পরাজয়ই মোহনবাগানের লীগ হাতছাড়া হবার কারণ। মঙ্গলবারে প্রথম খেলা শুরু, এবং প্রথম খেলা ড্র মোহনবাগানের নাকি সৌভাগ্যের লক্ষণ। ক্যালকাটা জিমখানার সঙ্গে লীগের প্রথম খেলা ড্র করার পর ওই সৌভাগ্যের প্রমাণ মিলেছিল টানা ১৩টি খেলায় জয়ের সুবাদে। কিন্তু অশুভ 'তেরো' সংখ্যাটিই বোধহয় সৌভাগ্যকে কেটে দেয় ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরাজয়ের মাধ্যমে। ইডেনে ওই খেলায় হারের আগে পর্যন্ত মোহনবাগান সত্যিই সুন্দর খেলেছিল। তারুণ্যের তেজে তাজা সদা তৎপর গোলকিপার তরুণ বসু ছিল প্রায় দুর্ভেদ্য। নিমাই গোস্বামী, কাজল ঢালি, নাইম, শঙ্কর ব্যানার্জীর সমন্বয়ে গড়া রক্ষণব্যূহ রীতিমত নির্ভরশীল। লিংকম্যান বরুণ মিত্র সারা মাঠের অনলস কর্মী। সুরজিৎ সেনগুপ্ত ও সুরজিৎ চ্যাটার্জী আক্রমণের ধারালো জোড়া ফলা। কিন্তু ইডেনে ইস্টবেঙ্গলের মানসিক দৃঢ়তার কাছেই মোহনবাগান হার মেনেছে। আত্মবিশ্বাস অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে। টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কাছে আর একটি পয়েন্ট নষ্ট ওই আত্মবিশ্বাস অভাবেরই ফল। একই কারণে শেষ পর্যন্ত সুপার লীগের শীর্ষে পৌঁছেও ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরাজয়।

যাই হোক ১৯৭৩-এর লীগ খেলা সর্বপ্রকারে [illegible] ক্রীড়ামোদীদের মনে দাগ ধরাতে পারেনি। খেলার মান যেন আরও এক ধাপ নেমে গেছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রাবার

ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন, খেলার ক্ষেত্রেও তেমন, এমন একটি সময় আসে যখন ভাগ্যলক্ষ্মী কিছুতেই প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে ফিরে চাইতে চান না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট থেকেও চার বছর মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। না হলে এককালের বে-সরকারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২০টি টেস্টের মধ্যে জয়ের মুখ দেখতে পায় না? চার বছর পরে কোন রাবার জয়ের স্বাদ। সদ্য তিন-টেস্ট সিরিজে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ২-০ জয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' লাভের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটিই মনে বার বার উঠছে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট মান কি সত্যই এতখানি নেমে গিয়েছিল?

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শুধু রাবার জয়ই নয়, ওভাল মাঠের প্রথম টেস্টে ১৫৮ রানে

মস্কোর লেনিন স্টেডিয়ামে বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলোর উদ্বোধন দিনে মার্চ-পাস্টের দৃশ্য। বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলোয় ভারত একটি মাত্র ব্রোঞ্জ-পদক পেয়েছে ৪৮ কিলো বিভাগের কুস্তিতে শম্ভুজি ভারতীর কৃতিত্বে

পরাজয়ের পর ক্রিকেটের পীঠভূমি লর্ডস-এর তৃতীয় টেস্টে ইংলণ্ডের এমন পরাজয়, যে শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি স্বদেশের মাঠে ইংলণ্ডকে কোন দিন ভোগ করতে হয়নি। ইংলণ্ডকে পর্যুদস্ত করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছে ইনিংস ও ২২৬ রানে। তাও দেড় দিনের মত সময় হাতে রেখে। ক্রিকেট ইতিহাসে আর একবার অবশ্য ইংলণ্ডকে এর চেয়ে বড় পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, ইনিংস ও ৩৩২ রানে। তবে সে পরাজয় বিদেশের মাঠে। ১৯৪৬-৪৭ সিরিজে ব্রিসবেন টেস্টে ডন ব্রাডম্যানের অস্ট্রেলিয়া দলের হাতে।

'দেশ'-এর ৪২ সংখ্যায় ওভাল টেস্টের কথা আলোচনা করেছি। এজবাস্টনের দ্বিতীয় টেস্ট সম্পর্কে কিছু বলা হয়ে ওঠেনি। লর্ডস টেস্ট সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার।

দুই টেস্টের দুটি ঘটনায় ক্রিকেট ইতিহাসে নতুন নজির সৃষ্টি হয়েছে। একটি নজির, এজবাস্টনে আম্পায়ার আর্থার ফাগ-এর এক ওভার আম্পায়ারিং না করে মাঠ থেকে বাইরে থাকা। অপর নজির লর্ডসে তৃতীয় দিনের খেলায় বোমা ফাটানোর হুমকীতে ২৮ হাজার দর্শকের মাঠ ত্যাগ এবং এক ঘণ্টা খেলা স্থগিত।

আর্থার ফাগ অতীতের টেস্ট খেলোয়াড়। ১৯৩৮-এ কেন্টের পক্ষে এসেক্সের বিরুদ্ধে ২৪৪ ও ২০২ নট আউট তুলে একটি খেলায় দুটি ডবল সেঞ্চুরী করার কৃতিত্বে এখনো বিশ্বের একমাত্র খেলোয়াড়। দ্বিতীয় দিন বয়কটের একটি কট চ ফাগ নাকচ করার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক কানহাই বিরক্তি প্রকাশ করায় আর্থার ফাগ মুষড়ে পড়েন এবং আর আম্পায়ারিং করবেন না জানান। তিনি আশা করেছিলেন কানহাই নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কিন্তু ক্ষমা না চাওয়াই তৃতীয় দিন ফাগের আম্পায়ার হয়ে মাঠে না নামার কারণ। অপর একজন আম্পায়ার এক ওভার আম্পায়ারিং করার পর যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল বলে, আমরা ফাগের সিদ্ধান্তে পূর্ণ সন্তুষ্ট, তখন ফাগ আবার মাঠে নামেন। ঘটনাটি ক্রিকেটে নতুন নজির।

লর্ডসে বোমার ভীতিও অভূতপূর্ব। যখন মাইকে বোমা ফেলার হুমকীর কথা ঘোষণা করা হয় তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আকাশ ছোঁয়া রানের (৮ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড ৬৫২ রান) বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ধুঁকছে।

লর্ডসে অবশ্য বোমার সন্ধান মেলেনি। এক ঘণ্টা পরে খেলাও আরম্ভ হয়। ২৩৩ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর ফলো অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪২ রান তুলতেই তারা ৩টি উইকেট হারায়। একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিন লাঞ্চের ৪৫ মিনিট পরে ১৯৩ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংস ও ২২৬ রানে বিজয়ী হয়।

তিনটি টেস্টেই প্রচুর রান তুলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা পর্যাপ্ত প্রাধান্য দেখিয়েছে। তিনটি টেস্টে তাদের [illegible] প্রমাণ করে [illegible] এদের প্রতিভা প্রচুর। যে কানহাই ও সোবার্স লর্ডসে ব্যাটে রানের ফুলঝুরি ছুটিয়ে সেঞ্চুরী করেছেন, এই সিরিজের আগে তাঁরা ও ব্যাটে তেমন রান পাননি।

—একলব্য

অরণ্যদেব
লী ফক

যে-দেশে শাসকের ইচ্ছাই হল আইন...
মেয়েটি সুন্দরী নয়?
আঃ, দারুণ!

যা-কিছু শাসকটির পছন্দ হয়, তিনি আত্মসাৎ করেন।
তোমরা ওকে গ্রেফতার করছ কেন?
বাঁচতে চাস তো চুপ কর ব্যাটা।
মা...

বাজপাখির মালিকের গল্প
তোমার স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হল। তারপর?
তারপর আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

আমি জেনারেলের সঙ্গে দেখা করব... সে আমার স্ত্রীকে চুরি করেছে!
ভাগ ব্যাটা পাগল!
!

'তারপর থেকে আমায় লুকিয়ে থাকতে হত।'
ওরা তোমায় ধরতে এসেছে। তুমি এদেশ ছেড়ে পালাও।
1/14

'আমি অজ্ঞাতবাস করতে লাগলাম। ঐ ঘৃণ্য পশুটাকে আরও কয়েকবার দেখেছি আমি। তারপর একদিন আমি দেশ ছেড়ে পালালাম।'
!

তারপর আমি পাখিদের শিক্ষা দিতে লাগলাম। এবার ওই পাখিদের উদ্দেশ্য আমার একটাই : প্রতিশোধ!
কিন্তু এখনও বুঝলাম না, তোমার পাখিরা হলুদ পোশাকের লোকেদের ধরে নিয়ে আসে কেন?

কারণ আমার দেশে একমাত্র সেই শাসক-জেনারেলটি ছাড়া আর কেউ হলুদ পোশাক পরতে পারে না। হলুদ ওর প্রিয় রঙ। সবসময়ই ঐ রঙের পোশাক পরে থাকে সে। এবার বুঝেছ?
!
১০

চালচিত্র গল্পের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে একরকম গেঁথে দিয়েছেন। শিশু অমূল্যকে খেলা দেখাবার সময় ছুতো ভৈরব (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং ঝি কদমের (মেনকা দাস) মুখে গানের দৃশ্যটি ভাল। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও আগাগোড়া বেশ ভাল।

সেটের বাইরে নৌকোর দৃশ্যগুলি রাখাতে ছবির দৃশ্যগত একঘেয়েমি কিছুটা কমেছে। নতুন বাড়ির উপরের ঘর থেকে মাঠের উপর দিয়ে স্কুল-ফেরতা অমূল্যের দিকে বিন্দুর তাকিয়ে থাকার দৃশ্যও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই সব অংশের এবং অন্যত্র ফটোগ্রাফিও (বিজয় দে-কৃত) প্রশংসনীয়। নৌকোয় করে বিন্দুর বাপের বাড়ি যাবার সময় নরেনের (এ-চরিত্রে তপন ভট্টাচার্যের অভিনয় স্বচ্ছন্দ) চিৎকার করে ছোট মামিমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মুহূর্তটি আবেগসম্পন্ন, পরক্ষণেই দেখা গেছে ওইখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে অমূল্য কাঁদছে। শরৎ-কাহিনীর অতি পরিচিত কুটিল চরিত্র এলোকেশী আসার পর যাদবের সংসারে ছোটখাটো অশান্তির ঘটনা দেখা গেছে। চিত্রনাট্যে বা চিত্রপরিচালনায় সেগুলোকে নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই। তবে নাটক গড়ার ব্যাপারে এলোকেশীর কূটবুদ্ধির সুযোগ নেওয়া হয়েছে। কোন জায়গাতেই ফেনিয়ে তোলার প্রবণতা পরিচালক দেখাননি। বিন্দুর কাছ থেকে অমূল্যকে সরিয়ে রাখার ব্যাপারে এলোকেশীর চক্র ধরা পড়ার পরেও অপরাধীর শাস্তি বা অনুতাপের ব্যাপারটিকে পরিচালক বিশেষ আমল দেননি। এখানে তাঁর পরিমিতিবোধের পরিচয়, যা নাটকের ক্লাইম্যাকস-এও লক্ষণীয়। রোগশয্যায় বিন্দু দুহাত বাড়িয়ে অমূল্যকে বুকে টেনে নেয়। দর্শকও তখন চোখের জল মুছে নেন।

জীবন সুখ/ইন্তেজার/জুগনু

নতুন শিল্পী নিয়ে ছবি করা, বিশেষত বোম্বাইয়ে, নিশ্চয়ই খুব সাহসের কাজ। কিন্তু বড় স্টারের অভাব যদি অন্য উপায়ে পুষিয়ে নেবার চেষ্টা থাকে তবে সেটাকে আর সৎসাহস বলা চলে না। এই দুর্বলতা সদ্যোমুক্ত জীবন সুখ-এ নেই বললেই চলে, ইন্তেজার-এ বেশি পরিমাণে রয়েছে। আবার বড় স্টার নিয়েও একটি হিন্দী ফিল্ম অবাস্তবতা ও গোঁজামিলের চরম পর্যায়ে যে পৌঁছতে পারে জুগনু তার একটি সাম্প্রতিক প্রমাণ।

জীবন সুখ-এ তরুণ পরিচালক দেবু সেন গল্প নির্বাচনেও সাহস দেখিয়েছেন। বোম্বাই চিত্রের কমেডিও যেখানে অতি মোটা, সেখানে জ্যোতির্ময় রায়ের গল্প (বাংলা ছবিতে যা কাঁচা-মিঠে নামে একদা জনপ্রিয়) নিয়ে ছবি করাও দুঃসাহসের পরিচয় বইকি। তবে এ-ছবিতে পরিচালক অকারণে মারপিট ঢুকিয়ে হিন্দীচিত্রের নিয়ম পালন না করলেও পারতেন।

রক্ষণশীল পিতার শাসনে থেকে শেখর (ধীরজ) ও ইভা (নার্গিস বানু) যথাক্রমে তাদের প্রেমিকা সুষমা (মলিকা) ও প্রেমিক অমিতাভের (আনন্দ চৌমি) সঙ্গে যে-ভাবে মিলিত হল তাতে আরও অনেক বেশি কমিক সিচুয়েশন গড়বার অবকাশ ছিল। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরবার মতো পরিস্থিতি কম। তবু এই পরিচ্ছন্ন কমেডিতে রস আছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় দেবু সেনের প্রয়োগের কাজ, বিশেষ করে ক্রেডিট টাইটেল-এর দৃশ্যে—যেখানে চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় করানো হচ্ছে এবং শেষের ক্লাইম্যাকস-এ, স্টিল ফটোর ব্যবহার। আধুনিক চলচ্চিত্রকারের বেশ কিছু লক্ষণ, সুন্দরভাবে দৃশ্যের ফ্রেম রচনা, ছবিতে রয়েছে। গানের (স্বপন জগমোহন রচিত) ব্যবহারও খুব নিয়মমাফিক নয়। নতুন শিল্পীদের অভিনয় আরও একটু পাকা হলে ছবিটি আরও উপভোগ্য হত। ধীরজ নবাগত নন, তবুও নবাগতের আড়ষ্টতা এখনও আছে। অভিনয়ের গুণের দিক থেকে নাজির হোসেনকে এঁদের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়া যায়।

ইন্তেজার-এর দুই নায়িকার মধ্যে শীলার চরিত্রের (পদ্মিনী কপিলা) অস্বাভাবিকতা একটু নতুন মনে হতে পারে। শৈশবে শীলা মদ্যপ বাবাকে তার মায়ের উপর অত্যাচার করতে দেখেছে। ওই ভয়ঙ্কর ঘটনার স্বপ্ন শীলা বড় হয়েও দেখে। পরিচালক মোহন সিং কবিয়া সেটি ইস্টম্যান কালার ছবিতে কালো নেগেটিভ দৃশ্যে দেখিয়েছেন। একমাত্র শীলার কাহিনী নিয়ে ইন্তেজার কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছবি হতে পারত। তিনি সম্ভবত ছবিতে কিছু মামুলি ব্যাপার রাখার তাগিদও অনুভব করেছিলেন। যে-কারণে ইন্তেজার শুধু শীলার নারীত্বের জাগরণের অপেক্ষায় পর্যবসিত হয়নি, আর এক নারীকে—দ্বিতীয় নায়িকা চন্দাকে (রিংকু জয়সওয়াল) অতিমাত্র জাগ্রত রাখা হয়েছে। শীলার বাড়ির ঝি থাককালীন চন্দা যথাসম্ভব অশালীন বেশবাসেই ঘুরে বেড়িয়েছে। অবৈধ সন্তানের জননী হবার পরই তাকে ভব্য বেশে দেখা গেল। চন্দার সন্তানের জনক শীলার ভাই আনন্দ (বিশাল)।

সাজানো নাটকের সব উপকরণই সযত্নে পরিবেশিত। সেই সঙ্গে রয়েছে অতি-ব্যবহৃত কিছু উপাদান, যেমন মারপিট। নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও মোটামুটি স্বচ্ছন্দ। ছবিতে ভণ্ড সাধুর বেশে আই এস জোহর অনেক দৃশ্য জমিয়ে রেখেছেন। তাঁর মুখে মান্না দে'র গাওয়া (সুররচনা—চিত্রগুপ্ত) একটি গানও চমৎকার।

শীলা ও চন্দার নাটকের ফয়সালা হয়েছে যথাসময়ে। শীলা যে আসলে নারী, নায়ক সত্যেনের ভাষায় এ ওম্যান ইজ এ ওম্যান ইজ এ ওম্যান, এই তত্ত্বটা পরিচালক নাটকের সোজা পথে তড়িঘড়ি বুঝিয়ে দিয়েছেন। সত্যেন-শীলা মিলিত, চন্দাও গৃহচ্যুত চন্দনের (এই চরিত্রে রাকেশ পান্ডের অভিনয় মনোগ্রাহী) মহত্ব ভুলতে পারেনি। ছবির শেষে ওদের ইন্তেজার-এর অবসান।

জুগনু-বিষয়ে, আগেই বলা হয়েছে, কোন রকম যুক্তি ও সঙ্গতি খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। ধর্মেন্দ্রর দুই রূপ—আদর্শবাদী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ডাকাত (নাম জুগনু)—এবং হেমা মালিনীর প্রেম ও অ্যাডভেঞ্চার (হেলিকপ্টারে বসে ভিলেনদের হাত থেকে অস্ত্র তুলে নেওয়া) আর যাই হোক মানবজগতের ব্যাপার নয়। প্রযোজক-পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী তাঁর জুগনুকে কখনও রবিন হুড কখনও বন্ডের (ভিলেনদের উপর টেক্কা মারাও জুগনুর কাজ) আদলেই হয়ত গড়তে চেয়েছিলেন। সে কোনটাই হয়নি। জুগনু-তে আবার নাটকও আছে, যা হাস্যকর। সব মিলিয়ে জুগনু (এস ডি বর্মণের সুরে গান ছাড়া) এক ভীষণ বিরক্তির অভিজ্ঞতা।

প্রভাতী অনুষ্ঠানে মুনাব্বর ও আমজাদ

গত এক বছরে দুটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সুরেশ সংগীত সংসদ দুঃস্থ শিল্পীদের সেবাকল্পে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে দুটি শয্যা দান করে সংগীত জগতে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা এক কথায় অতুলনীয়। গত ১৫ আগস্ট সুরেশ সংগীত সংসদের স্বাধীনতা রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানটিও একই লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত। সংসদ রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সেবাকার্যের সাহায্যকল্পে দশ হাজার টাকা দান করেছেন। মিশনের অধ্যক্ষা মোক্ষপ্রাণা প্রব্রাজিকার হাতে এই দান তুলে দেন সংসদ সভাপতি শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

ঐদিন মুনোব্বর আলি খাঁর কণ্ঠসংগীত ও আমজাদ আলি খাঁর যন্ত্রসংগীত ছাড়াও জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রেকর্ড সহযোগে তিমিরবরণ পরিচালিত 'বন্দেমাতরম'-এর পরিবেশন এবং কামারপুকুর ও জয়রামবাটির তথ্যচিত্র প্রদর্শনের অনুষ্ঠানগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"যদি জানতেম" (পরিচালনা : যাত্রিক) ছবিতে রুমা গুহঠাকুরতা ও উত্তমকুমার

গানবাজনার আসরের সূচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন মুনাব্বর আলি খাঁ। গেয়েছিলেন প্রথমে কোমল ঋষভ আশাবরী তারপর মিয়া-কি টোড়ী ও সবশেষে ভৈরবী ঠুংরী। আশাবরীর পর মিয়া-কি টোড়ীর রাগনির্বাচনে শিল্পীর রসবোধের পরিচয়টুকু বিদগ্ধ শ্রোতারা চিনে নিতে ভুল করেন নি। মুনাব্বরের পরিবেশনাও ছিল একই বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। আশাবরীতে টোড়ী অঙ্গের ভাবমাধুর্যের যে আভাসটুকু ছিল তা-ই এক বিস্তৃত পরিধি নিয়ে ব্যাপ্ত হয়েছিল তাঁর টোড়ীর পরিবেশনা। ছন্দোবন্ধ বিস্তার মুনাব্বরের সেদিনের গানের এক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। এবং সেই বিশেষত্বটুকু শিল্পী তান ও লয়ের কারুকাজেও অক্ষুণ্ণ রাখেন। তবলায় শংকর ঘোষ ও হারমোনিয়মে আমীর আলীর সহযোগিতা সুন্দর।

আসরের অপর অনুষ্ঠানের শিল্পী আমজাদ আলী খাঁ। সরোদে তিনি বাজালেন সোহাগভৈরো। স্বসৃষ্ট রাগ। বছর দুয়েক আগে প্রথম শুনিয়েছিলেন রাতভোর সরোদ অনুষ্ঠানে। রামকেলী ভৈরো ও ভাটিয়ারের শিল্পসম্মত সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আমজাদ সেদিন সুসংবদ্ধ ও সুচিন্তিত আলাপে শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরলেন রাগ পরিচয়। একই সঙ্গে আমজাদের কল্পনাপ্রসারী শিল্পী মনের পরিচয়টুকুও ব্যক্ত হল। রাগটির মিষ্টত্ব ও মজাটুকু উপভোগের সুযোগ এবার আমজাদ এনে দিলেন তাঁর নিপুণ হাতের তৈরী বাক্তের সুপ্রয়োগ ও স্বরপ্রক্ষেপণের অসামান্য দক্ষতার নজির রেখে। গত অংশে লয়কারীর বৈচিত্র্যের সঙ্গে ছন্দ ও সুর বৈচিত্র্যের ঝালার পরিবেশনে আমজাদ তাঁর বৈশিষ্ট্যকে আর একবার নতুন করে মনে করিয়ে দিলেন। সঙ্গতে ছিলেন কেরামত খাঁ। অপূর্ব তাঁর সঙ্গত।

—সুররসিক

রবীন্দ্র সংগীত যুগে যুগে

আজকাল প্রায়ই এমন কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে উদ্দেশ্য থাকে না কেবল রসসৃষ্টির। একটা গবেষণামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করবার নির্দিষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে সেগুলি দর্শকের সামনে উপস্থিত করা হয়। যেমন সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে সাংস্কৃতিক সংস্থা 'শ্রুতি'র প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে দেখা গেল যে সেখানে কেবল কয়েকজন শিল্পীর গান শোনানোই তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। প্রারম্ভিক ভাষণে সন্তোষকুমার ঘোষ সংক্ষেপে সে সম্পর্কে আলোচনাও করলেন যা থেকে বোঝা গিয়েছিল 'রবীন্দ্র সংগীত—যুগে যুগে'—এই নাম দিয়ে 'গত চল্লিশ বছর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্রোতধারা কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, তার পরিচয় দেওয়াই ওঁদের উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই, তার সিদ্ধি এবং সার্থকতা যদিও বিচার্য অথবা আলোচনায় নয়, কেবল গানের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত সেখানে সমগ্র আয়োজনের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্য থাকা দরকার, যা একটি সংগীতানুষ্ঠানের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন গতির সঞ্চার করে শ্রোতৃমণ্ডলীর রসাস্বাদনকে অব্যাহত রাখতে পারে। সেদিনকার অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাবর্গ চিত্রশোভিত বেষ্টনী রচনা করে মঞ্চকে সজ্জিত করেছেন (যাতে শিল্পীরা কিছুটা ঢাকা পড়েছেন), গানের অনুষ্ঠানে আলোক নিয়ন্ত্রণেরও সহায়তা নিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমগ্র উপস্থাপনাটিকে আগাগোড়া নিখুঁত করে তোলবার দিকে তেমন তৎপরতার পরিচয় পাওয়া গেল না। শুরু থেকেই কেমন একটা অসংলগ্ন ভাব। নতুবা অন্তত উদ্বোধন সংগীত এবং তার আনুষঙ্গিক আয়োজনটুকুও কি যবনিকা উত্তোলনের আগে সেরে রাখা যেতো না? দ্বিতীয়ার্ধে 'শ্রুতি'র শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে কিছুটা শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা ছিল কিন্তু অনুষ্ঠানের দৈর্ঘ্য তখন যে অনিবার্য অবসাদ এনে দিয়েছিল, শেষের দিকের শূন্যপ্রায় প্রেক্ষাগৃহেই তার প্রমাণ ছিল।

অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল অমিয়া ঠাকুর এবং শান্তিদেব ঘোষকে সম্বর্ধনা জানিয়ে। 'রবীন্দ্র সংগীত যুগে যুগে' অনুষ্ঠানটির শুরুও ওঁদের গান দিয়েই। অমিয়া ঠাকুরের বার্ধক্যজীর্ণ অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠে গাওয়া 'বড়ো বিস্ময় লাগে' একালের শ্রোতৃবর্গের কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। শান্তিদেবের কণ্ঠ অবশ্য সুপরিচিত, কিন্তু তাঁর গাইবার ভঙ্গিতে সেই পুরাতন রাবীন্দ্রিক ঢঙটি এখনও বজায় রয়েছে যার স্বর প্রক্ষেপন এবং উচ্চারণের ওজঃগুণটুকু আজকের গানে দুর্লভ। 'বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা' গানটিকে সুরে তালে ছন্দে প্রাণবন্ত করে শান্তিদেব ঘোষ সেই গীতিরীতির সুন্দর পরিচয় দিলেন। পরিবেশনের ভঙ্গির এই পরিবর্তনটুকু দেখামোই বুঝি এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল এবং ওই দুই শিল্পীর উপস্থিতির ফলে তার সূচনাটিও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছিল। পরবর্তী শিল্পীদের মধ্যে কিছু প্রবীণ এবং কিছু নবীন শিল্পী ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সুবিনয় রায় অনবদ্য গেয়েছেন 'তুমি অবগুণ্ঠনে'। নীলিমা সেনের 'ফিরে এসো বঁধু হে' মনে রাখবার মতন। একটি অপ্রচলিত গান শোনালেন অতি সুন্দর ভঙ্গিতে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এ ছাড়া গান শোনালেন গীতা সেন এবং অপেক্ষাকৃত নবীনদের মধ্যে, শৈলেন দাস, গীতা ঘটক, অর্ঘ্য সেন, রমা গুহ ঠাকুরতা এবং অতঃপর ঠাকুরবাড়ির বধূ অমিয়া ঠাকুরের গানে যে অনুষ্ঠানের শুরু হয়েছিল, তার সমাপ্তিও করলেন ঠাকুরবাড়ির কন্যা

সুপর্ণা চৌধুরী। এ'দের সকলেরই কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য আছে, গাইবার একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে। অর্ঘ্য সেনের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা, সুপর্ণার অনুভূতির স্পর্শে রসমণ্ডিত প্রকাশভঙ্গি, আবার দেখা গেল কোনো কোনো শিল্পীর উচ্চারণে অস্পষ্টতা এবং স্বরবিস্তারে আতিশয্যপ্রবণতা। এমনভাবে শুধু প্রবীণ-নবীন ভেদে কেন, যে-কোনো একজন শিল্পীর সংগে আর একজনের প্রভেদ তো থাকবেই। কিন্তু তাতে করে রবীন্দ্র সংগীতের গায়ন পদ্ধতির এমন কোনো ধারাবাহিক পরিবর্তন বা বিবর্তনের আভাস ফুটে উঠল কি, যার ফলে 'যুগে যুগে'—এই অভিধার তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে?

বিরতির পরে 'শ্রুতি'র বৃহৎ শিল্পী-গোষ্ঠীর কয়েকটি সম্মেলক গান উল্লেখ-যোগ্য। শিশুদের কণ্ঠে 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'—একটি চমকপ্রদ পরিবেষণা। তবে 'প্রতিদিন তব গাথা'র এক একটি চরণের অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তি বিরক্তিকর। তাহলেও সব মিলিয়ে 'শ্রুতি'র শিল্পীবৃন্দের গান নিঃসন্দেহে উপভোগ্য হয়ে উঠত যদি সমগ্র অনুষ্ঠানটি একটু পরিমিত হোতো।

আনন্দবর্ধন

"ভয়েস অ্যান্ড ভিশন"-এর রজত জয়ন্তী

অর্থের প্রাচুর্য না থাকলেও কেবলমাত্র সততা এবং কর্মনিষ্ঠার জোরে যে একটি প্রতিষ্ঠানকে বড় করে তোলা যায়, ৩বি ম্যাডান স্ট্রীটে অবস্থিত "ভয়েস অ্যান্ড ভিশান" তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গত ২৪ আগস্ট এই প্রতিষ্ঠান রজত-জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রীপরেশ দাশগুপ্ত অরোরা স্টুডিওর একজন শব্দযন্ত্রী। ১৯৪৮ সনে নিজের চেষ্টায় তিনি এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। প্রথম প্রথম এ'রা সিনেমায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও সরবরাহ করতেন। এখন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচয়—এ'রা ১৬ মিলিমিটার ছবির বিশিষ্ট পরিবেশক। বহু বাংলা এবং হিন্দী ছবি এ'দের পরিবেশন-তালিকায় আছে। ১৯৬৪ সন থেকে বোম্বাই-শহরে এই প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা কাজ করছে। কিছুদিন পরে মাদ্রাজেও একটি এজেন্সিএজেন্সি খোলা হয়। এই রজত জয়ন্তী বছরে দিল্লিতেও একটি শাখা স্থাপিত হচ্ছে।

এই উপলক্ষে গত ২৪ আগস্ট সেনট পলস ক্যাথিড্রালের পরিবেশ হলে একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন সাংবাদিক শ্রীসুধাংশু-কুমার বসু। পৌরোহিত্য করেন বিচারপতি শ্রীশচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীঅজিত বসু। প্রতিষ্ঠানের কর্মধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন শ্রীকালিন পাল।

"সব্যসাচী" (পরিচালনাঃ পীযূষ বসু) ছবিতে উত্তমকুমার ও জয়শ্রী রায় ফটো—দেশ

সাংবাদিক বৈঠকে ইমরাৎ খাঁ

হিন্দুস্থানী রাগ সংগীত এবং দক্ষিণ ভারতীয় রাগ সংগীতের মধ্যে মূলে পার্থক্য কী? খেয়ালের আলাপ আর ধ্রুপদের আলাপ কি আলাদা ব্যাপার? কণ্ঠ এবং যন্ত্র সংগীতের আলাপে কতটা মিল? গৎ বাজানোর সময় তবলা পরিহার করা চলে কি? তাৎক্ষণিক সৃষ্টি বা ইমপ্রোভাইজেসন নিয়ে এত মাথা ঘামান কেন আপনারা? আধমাত্রা বা সিকিমাত্রার হিসাব কীভাবে করেন?—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই সব এবং এই জাতীয় আরও অজস্র প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল কলকাতার কুশলী শিল্পী সেতার ও সুরবাহারের নিপুণ কারিগর, ওস্তাদ ইমরাৎ খাঁকে। বার্লিন বেতার কর্তৃপক্ষের আহ্বানে জুন মাসে তিনি গিয়েছিলেন পাঁচদিনব্যাপী এক সেমিনারে যোগ দিতে। বিষয়ঃ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত। বক্তা ও শিল্পী একমাত্র ইমরাৎ খাঁ। সহযোগী শিল্পী প্রতিষ্ঠিত তবলিয়া শংখ চ্যাটার্জি। দুদিন তাঁকে বাজাতে হয়েছিল। তিন দিন ধরে আলোচনা-সভা। পশ্চিম জারম্যানির নানা কেন্দ্র থেকে এসেছিলেন গুণী শিল্পী এবং সংগীত-বিদ্‌রা। বার্লিন বেতারের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান শুনবার সুযোগ পেয়েছেন সমগ্র ইয়োরোপের বেতারশ্রোতারা।

'আমার এবারের ইয়োরোপ ট্যুরে, আমার শিল্পীজীবনেও বটে, রেডিওর এই অনুষ্ঠানটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।' আনন্দ আর বিনয় মেশানো গলায় বলছিলেন ইমরাৎ খাঁ। 'কত বড় শিল্পী এদেশে জন্মেছেন। কত বিরাট শিল্পী—রবিশংকরজী, দাদা বিলায়েৎ খাঁ সাহেব, আলি আকবর খাঁ—বিদেশে ভারতীয় সংগীতের জয়পতাকা উড়িয়ে রেখেছেন। আমার মত সামান্য শিল্পীও যে বিদেশী পণ্ডিতদের দরবারে আমাদের রাগ সংগীতের কিছু নমুনা রাখতে পারলে, এ আমার কত বড় ভাগ্য!'

গিয়েছিলেন ২ মারচ। ফিরলেন আগস্টের গোড়ায়। সংগে শংখ চ্যাটার্জি। এই ক-মাস সেতার সুরবাহারের অবিচ্ছিন্ন জয়যাত্রা। ফ্রানস, জারম্যানি, হল্যান্ড, বেল-জিয়াম, ব্রিটেন—ছোট বড় অসংখ্য শহরে একটার পর একটা আসর মাৎ করে। ম্যান-চেসটারের কাছে ওপন-এয়ার থিয়েটারে, ব্রাসেলসের ক্যাথিড্রালে, মিউনিখের গীর্জায়, দু-দুবার লনডনের রয়াল ফেসটিভ্যাল হলে। সর্বত্র টিকিট অগ্রিম বিক্রি হয়ে গেছে, শ্রোতাদের গভীর মনোযোগ বরাবর অক্ষুণ্ণ। ক্রয়ডন, ব্রাইটন, আডিইনন ফেসটিভ্যালে সম্মানিত শিল্পীর আসন ইমরাৎ আর শংখ। বি বি সি টেলিভিশন-২ তাঁদের 'লাইভ' প্রোগ্রাম বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। আগামী জানুয়ারী থেকে আট মাসের নানা অনুষ্ঠানের বুকিং পকেটে নিয়ে দেশে ফিরেছেন ইমরাৎ খাঁ।

'কিন্তু', হঠাৎই তাঁর গলায় বিষণ্ণতা এল, 'দেখুন, কলকাতায় আজও আমি যেন অচেনা রয়ে গেলাম। সবাই আমার কুড়ি বছর আগেকার স্ট্যানডার্ড মনে রেখেছে। আমার এতদিনের কঠিন পরিশ্রম, আমার যতটুকু-যা সাফল্য, তার কি কোনো দাম নেই? এই যে বিদেশে গিয়ে নিজের দেশের সংগীতকেই সেবা করে চলেছি, এর পরিবর্তে শুধু কি অবহেলাই পেয়ে যাব?'

[illegible]

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় মজুতদার মুনাফাখোর ও ভেজালদারদের কারাদণ্ড সম্পর্কে বিল এই সপ্তাহের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। মজুতদার, মুনাফাখোর ও ভেজাল-দারদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেবার জন্য বিধানসভায় বিল আসছে। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করে এসে ২৬ আগস্ট রবিবার এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :—খাদ্য, ওষুধ ও নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মজুত-দার, মুনাফাখোর ও ভেজালদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির কয়েকটি ধারা সংশোধন করে অভিযুক্তদের উপরই নিজেদের নির্দোষ সাব্যস্ত করতে সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপিত করার ভার ন্যস্ত করা হবে। বর্তমান আইনে অভিযোগকারীকেই আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে হয়। প্রসাধন সামগ্রীকেও প্রস্তাবিত বিলের আওতায় আনা হবে বলে খাদ্যমন্ত্রী জানান। মজুতদার, মুনাফাখোর ও ভেজালদারদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য প্রস্তাবিত বিল এবার সরকার পক্ষের বড় হাতিয়ার হবে।

দেশী সংবাদ

২০ আগস্ট—পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও সি পি আই-এর সম্পর্ক এখন "নরমে গরমে" চলেছে। মালদহে সি পি আই-কে লক্ষ্য করে সিদ্ধার্থবাবু একটা বড় রকমের হুংকার দিয়ে-ছিলেন। সি পি আই তার জবাবে আরও কড়া একটা বিবৃতি দিলেন। কিন্তু এখন যেন দু-পক্ষের সুরই একটু নরম।

নাগাল্যাণ্ডের তথাকথিত বিপ্লবী সরকার (আর জি এন) ভেঙে দেওয়া হলো। ১৯৬৩ সালে এই সরকার গঠিত হয়েছিল। গত ১৬ আগস্ট নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপাল শ্রী বি কে নেহরুর উপস্থিতিতে জুন্হেবোতোতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিপ্লবী সরকারের অস্তিত্বের অবসানের কথা ঘোষণা করা হয়।

২১ আগস্ট—কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে "নরম্যাল স্যালাইনে"-এর বোতলে নোংরা ও পোকা দেখতে পাওয়ায় ডাক্তার ও ছাত্ররা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁরা কয়েকটি বোতল "সীল" করেছেন। "সীল" করা একটি বোতল প্রিন্সিপ্যাল-সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ বিজয় চক্রবর্তীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম যোজনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য রাজ্য সরকার দেড় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের দাবি জানাবেন। রাজ্যের যোজনা পর্ষদের বৈঠকে আজ খসড়া অনুমোদন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল দিল্লিতে যোজনা মন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন।

২২ আগস্ট—ভুয়ো কেলেঙ্কারী সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগ খাদ্য দফতরের বহু ফাইল আটক করেছেন। ওই সব ফাইলের মারফত বিভিন্ন সময়ে ভুয়ো পারমিট সংক্রান্ত নানান আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগে প্রকাশ ভুয়ো কেলেঙ্কারীর ব্যাপারে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জড়িত থাকার অভিযোগ পুলিসের হাতে এসেছে। পুলিস এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের মতামতের অপেক্ষায়।

বিদেশ থেকে কেনা খাদ্যশস্য নিয়ে ভারতে [illegible]

খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজ লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে কৃষিমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ এই তথ্য জানান। শ্রীআমেদ বলেন, এটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিছু বরাদ্দ রাখতেই হয় অপচয়ের খাতে।

২৩ আগস্ট—পাগলা কুকুরের কামড়ে যে জলাতঙ্ক রোগ হয়, তার প্রতিষেধক হিসাবে এক নতুন ধরনের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা এই উদ্ভাবনের কথা জানিয়েছে। এখন পাগলা কুকুর কামড়ালে দু তিন সপ্তাহ ধরে প্রত্যহ ইনজেকশন চালাতে থাকে। নতুন ব্যবস্থায় এক থেকে তিনটি ইনজেকশন দিলেই কাজ হবে।

বারবার ঘোষণা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে উঠতে পারছেন না, তখন অন্য দিকে ইতিপূর্বে নিযুক্ত চল্লিশজন সরকারী কর্মীর চাকরি যাচ্ছে। সেই মর্মে নির্দেশ জারি হয়েছে। আগামী ৩১ আগস্টের পর কৃষি দফতরের সামাজিক-অর্থনৈতিক মূল্যায়ন শাখার এই কর্মীদের চাকুরি আর থাকছে না।

২৪ আগস্ট—এককালের প্রাণচঞ্চল বিমান-বন্দর দমদম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিমান পরি-বহণ ব্যবসায় মহলে ধারণা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার মানের নিরিখে দমদমের সুযোগ-সুবিধা এখন নানাক্ষেত্রে কম বলে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন।

আজ লোকসভায় শ্রীসমর গুহ। (সোশ্যা-লিস্ট পার্টি)। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি দাবি করে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতির একটি হুমকির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওই বিবৃতিতে কংগ্রেস সভা-পতি বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্র থেকে প্রয়ো-জনীয় পরিমাণে চাল পাবে না বলে পাট চাষ থেকে জমি মুক্ত করে তাতে ধান চাষ করবে।

২৫ আগস্ট—যোজনা মন্ত্রী শ্রী ডি পি ধর বলেন: সাধারণ প্রশাসক ও কারিগরি বিশেষজ্ঞ-দের মধ্যে বিতর্ককে কৃত্রিম বলে অভিহিত করে-ছেন। অর্থনীতি বিষয়ে এক আলোচনাচক্রে ওই মন্তব্য করে তিনি বলেন, কাজের জন্য আপনাকে [illegible]

কৃত্রিমতা-অতীত থেকে আমরা বহন করে আসছি। এই রোগ সারাতে হবে।

নাগপুরে করপোরেশন মেডিকেল কলেজের ৪০ জন আবাসিক ডাক্তারকে করপোরেশন কর্তৃ-পক্ষ বরখাস্ত করেছেন। মহারাষ্ট্র সরকারের অত্যাবশ্যক সংস্থা আইনের ৭ ধারা বলে বর-খাস্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মেয়ো হাসপাতালের ১০ জন আবাসিক ডাক্তারের চাকুরি গতকাল খতম করা হয়েছিল।

২৬ আগস্ট—সংগঠন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅশোক মেটা আজ সাংবাদিকদের বলেন, দুই কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙনের মূল কারণ এবং তার পর যে সব ঘটনা ঘটেছে তা পর্যালোচনা না হওয়া পর্যন্ত সংযুক্তির কথা বলে কোন লাভ নেই। তিনি বলেন, সংযুক্তির প্রথম শর্ত হওয়া উচিত, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশের কর্ণধার থাকতে পারবেন না।

বিদেশী সংবাদ

২০ আগস্ট—লাওসের বিমানবাহিনীর সৈনারা আজ সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে। বিভিন্ন সূত্র থেকে এই অভ্যুত্থান সম্পর্কে নানা-রকম খবর আসছে। একটি খবরে বলা হয় প্রধান-মন্ত্রী প্রিন্স সুভন্না ফুমার বাসভবন ওদের দখলে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এলাকাও তারা দখল নিয়েছেন।

২১ আগস্ট—বিদেশের সোভিয়েট বিরোধী আন্দ্রেই শাখারভ আজ পশ্চিমী দেশগুলিকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন, সোভিয়েট ইউ-নিয়নের সঙ্গে কোন রকম নিঃশর্ত বোঝাপড়া করবেন না, করলে তা খুব বিপজ্জনক হবে।

২২ আগস্ট—প্রেসিডেন্ট নিক্সন আজ মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্সের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। হেনরী কেসিঞ্জার এই পদে বসবেন। নিক্সন রজার্সের জায়গায় কিসিংগারের নাম করেছেন। শ্রীনিক্সন জানান ডঃ কিসিংগার জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষ সহকারীর পদেও বহাল থাকবেন।

২৩ আগস্ট—প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেছেন, আমি পদত্যাগ করব না। দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী প্রকাশে এই তাঁর প্রথম সরাসরি প্রশ্নের সরাসরি জবাব। বলেছেন, ওয়া-টারগেট কেকের আলাদা বসে খাওয়া জ্যামের মত।

২৪ আগস্ট—ডঃ হেনরি কিসিংগার মার-কিন সাফল্যের জন্যে পররাষ্ট্র সচিব। প্রেসি-ডেন্ট নিক্সন তাঁকে মনোনীত করেছেন। কিসিংগার জার্মানজাত মার্কিন। সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলেন আপনাকে কি বলে ডাকব? উত্তরে কিসিংগার উত্তর দিলেন, "আমি এখনও নিয়মকানুনের মাথা ঘামাচ্ছি না। এক্সিলেন্সিস বললে, চলবে মনে হয়।"

২৫ আগস্ট—ভাইস প্রেসিডেন্ট স্পিরো অ্যাগনিউ এর বিরুদ্ধে তদন্তের খবর ফাঁস হয়ে যাওয়াতে যে ক্ষতির আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে, সে সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ব্যক্তিগতভাবে শ্রীঅ্যাগনিউ-এর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। হোয়াইট হাউস থেকে সরকারীভাবে একথা জানানো হয়েছে।

২৬ আগস্ট—পাকিস্তানের ন্যাপ দলের নেতা খান আবদুল ওয়ালি খান বলেছেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান আর বেশী দিন ভুট্টোবাদ সহ্য করবে না। ভুট্টো আর **পাকিস্তানের [illegible] হতে পারে না।**

"ত্বক নিষ্প্রভ" হয়ে যাওয়ার সমস্যা দূর করে—কারণ, এ তার মূল কারণই দূর করে দেয়

অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক ত্বকের গভীর পর্য্যন্ত পৌঁছে, ত্বকের নিষ্প্রভতার কারণ যে ময়লা আর বাসি মেক-আপ, তা সবচেয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে, কারণ এ সবচেয়ে তরল করে তৈরী!

আপনার ত্বককে নরম আর উজ্জ্বল ক'রে তোলে !

অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক

এমন চমৎকার পরিষ্কার আর কোনো ক্লেনজার করতে পারে না। অ্যান ফ্রেঞ্চ খুব বেশী তরল ! একে বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে ত্বকের গভীরে পৌঁছে—ত্বকের বিশ্রী দাগ আর নিষ্প্রভতার জন্যে দায়ী ময়লা আর মেক-আপ বার করে আনতে পারে। কোনো সাবান বা সাধারণ ক্লেনজার এত গভীর পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

যাচাই করে দেখুন

মুখ ধুয়ে আসুন ! তারপর, একটু তুলো অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্কে ভিজিয়ে নিয়ে, নিচে থেকে ওপর দিকে হাত করে, আস্তে আস্তে মুখে আর গলায় ঘষুন। দেখুন কত ময়লা বেরিয়ে এলো—এত ময়লা ছিল, আপনি তো জানতেনই না ! এমন জিনিষ আপনার প্রতি রাত্রেই ব্যবহার করা উচিৎ নয় কি ?

অ্যান ফ্রেঞ্চও সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়, ত্বকপরিচর্য্যায় অদ্বিতীয়

Licensed User of TM: Geoffrey Manners & Co. Ltd.

110 DCM-243 Ben

মর্ত্তে গড়ে
তুলুন
স্বপ্ন-পুরী
আপনার স্বপ্নকে সত্যি করে
তুলুন—ডি সি এম-এর অপূর্ব
সুন্দর ফার্ণিশিং কাপড় দিয়ে
ডি সি এম-এর যাদুস্পর্শে,
সাধারণ সোফা, কৌচ,
আসবাব পত্র—হয়ে উঠবে
অসাধারণ, অনন্য ! এর
হালফ্যাসানের পর্দ্দা—
আপনার ঘরটিকে করে
তুলবে স্বপ্নজড়িত আরামের
নীড় ! এর রাজসিক রূপ মুগ্ধ
করবে-আপনাকে, সবাইকে
ফার্ণিশিং
DCM
TEXTILES
mcm/dcm/727 ben

দেশ

NRIPEN SEN
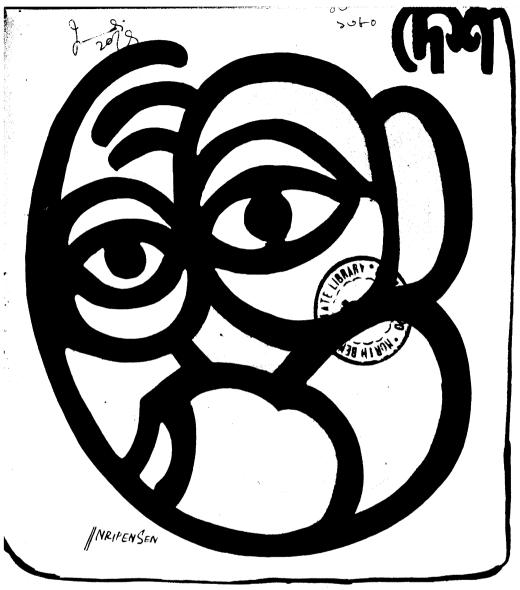
বর্ষ] শনিবার, ২৯ ভাদ্র, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 15th September, 1973 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা ৪৬

ফ্যাশান মডেল মিন্না জোহরের সঙ্গে মুখোমুখি

"ফেস পাউডার?
আমার তো না হলেই নয়!
তবে পণ্ডস হওয়া চাই"

P.5594

মিন্না জোহরকে ভালো ক'রে দেখুন। পণ্ডস ফেস পাউডার
ওঁর সুন্দর মুখে ঝলমলে আভা এনে দেয় আর ওঁকে
মনোহারিণী ক'রে রাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে।
আপনিও পণ্ডস ফেস পাউডার মেখে দেখুন কি সুন্দর লাগে।
পণ্ডস ফেস পাউডার এদেশের রূপসীদের মুখের রঙের
সঙ্গে মানানসই ছ'রকম জনপ্রিয় রঙে পাওয়া যায়।

পণ্ডস ফেস পাউডার
সব ফেস পাউডারের চেয়ে
পণ্ডসই রূপসীদের প্রিয়।

চীজব্রো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড
(সীমিত দায়িত্বসহ ইউ.এস.এ-তে সংস্থাপিত)

পৃথিবীর
বুকে ফুলের
স্বর্গ হল্যাণ্ডের

সিগমা পেন্ট্স
অসংখ্য
রঙের বাহারে
ডাচ্ বৈশিষ্ট্য
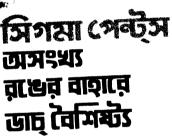
উৎকৃষ্ট, বিশ্ববিখ্যাত পেন্ট তৈরীর ক্ষেত্রে হল্যাণ্ডের ২৫০ বছরের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি সিগমা পেন্ট্স রকমারি মনোহারী রঙে আপনি পাবেন।
ঘরদোর রঙ করার জন্যে অতুলনীয় সিগমা পেন্ট ব্যবহার করলে খরচ হয় কম, রঙ টেকে বহু দিন, জলুস অম্লান থাকে. অনেকখানি জায়গা জুড়ে রঙ করা যায় আর তাছাড়া সব মরসুমেই রঙ থাকবে যে-কে-সেই।

সব জায়গায় সব কাজে
সেরা রঙ—সিগমা পেন্ট্স

সিগমা পেন্ট্স লিঃ
২২১, ডি. এন. রোড, বোম্বাই ৪০০ ০০১

সিগমা কোটিংস বি ভি (হল্যাণ্ড)-এর অধীন পিয়েটার সোয়েন অ্যাণ্ড জুন পিটার স্কুন অ্যাণ্ড জুনের সহযোগিতায়।

CHAITRA-SP-25 Ben

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার

সুপার ৭৭৭

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

সুপার ৭৭৭ বার—দুনিয়াতে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন ফর্মূলা। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাধারণত একেবারেই ফেনা হয় না, তেমন জলে-ও। সাধারণ বার সাবানের তুলনায় দাম-ও কম।

এখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করুন নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার!

shilpi hpma 6A/73 BEN

॥ শ্রেষ্ঠ লেখকদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ॥

যাযাবরের

নূতন বই

হ্রস্ব ও দীর্ঘ

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

॥ পাঁচ টাকা ॥

বিমল করের

নবতম উপন্যাস

সেতু ৪৲

দক্ষিণারঞ্জন বসুর উপন্যাস

প্লাবন ৬৲

আশাপূর্ণা দেবীর

যার যা দাম

(দ্বিতীয় মুদ্রণ)

॥ পাঁচ টাকা ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সারি তুমি কার

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

॥ পাঁচ টাকা ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

নবতম সুদীর্ঘ উপন্যাস

অশান্ত ঘূর্ণি

॥ আট টাকা ॥

এই দশকের সর্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম উপন্যাসের অসামান্য জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত

সাহিত্য তপস্বী

বিমল মিত্রের

অবিস্মরণীয় উপন্যাস

আসামী হাজির

সাড়ে চার মাসে দুই মুদ্রণ নিঃশেষিত

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে !

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ

॥ ত্রিশ টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন: ৩৪-৩৪৯২

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯ ৩৪-৮৭৯১
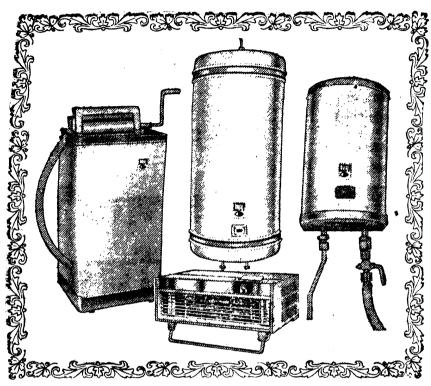
জীবন খুশীতে ভরবে তখন বাজাজ সরঞ্জাম থাকবে যখন

শীতের সময় গ্রীষ্মের আমেজ

ঘরে গরম আর সুখদায়ক বাতাবরণ সৃষ্টি করার ইচ্ছা যদি আপনার থাকে তাহ'লে দেখবেন, বাজাজ-এর সরঞ্জামই আপনার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। বস্তুতঃ বাজাজ-এর সমস্ত সরঞ্জামই আপনার জীবনে সুখ আর আরাম এনে দেবার জন্যেই; যেমন— রুম-হিটার, ইমার্সন-হিটার, পোর্টেবল গীজর, ওয়াসিং মেসিন ইত্যাদি।

আর কেবল বাজাজ-ই এমন এক কোম্পানী—যাদের সারাভারতে আছে ৩,৫০০ ডিলার আর ১৬টি শাখা। এর জন্যই আমরা আপ-নাকে বিক্রীর আগে ও পরে সন্তোষজনক সেবা যোগাতে সক্ষম।

বাজাজ ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড

বীর নরিম্যান রোড, বোম্বাই

সারা ভারতে শাখা আছে

heros' BE-178 BEN

সূচীপত্র

অমর সাহিত্যের সানন্দ ঘোষণা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিরীটী অমনিবাস

তৃতীয় খণ্ড কয়েক দিন হলো প্রকাশিত হয়েছে

!! দাম দশ টাকা !!

গ্রাহকদের বই সংগ্রহ করতে বলা হচ্ছে।

সুপ্রভাত ঘোষের

ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর

ওরা বড় হয়ে গেল ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বক্ষে বাজে বাঁশী ৪৲

বিমল মিত্রের

আমি ১০৲

উপন্যাস-জগতে এই উপন্যাস একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম।

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলি-৯

(সি ১০৪১)

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

শ্রীপ্রবোধকুমার চক্রবর্তী

রম্যাণি বীক্ষ্যর

আর একখানি নূতন পর্ব লিখলেন

অবন্তীপর্ব

এই গ্রন্থে শুধু কালিদাসের অবন্তী ও বিদিশার কথা নয়, বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, ভোজরাজের ধারানগরী, চান্দেল্লাদের মন্দিরময় খাজুরাহো, পাঠানদের দুর্গ মাণ্ডু অহল্যাবাঈ-এর ইন্দোর ও মহেশ্বর, এবং লক্ষ্মীবাঈ-এর ঝাঁসির কথা ও পাবেন। আরও পাবেন অমরকণ্টকে নর্মদার উৎস থেকে জব্বলপুরে তার সুন্দর জলপ্রপাত ও ওঙ্কারজীতে তার দুই-ধারায় বেষ্টিত দ্বীপে জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বর, পশ্চিমঘাট পাহাড়ে প্রাচীন গুহামন্দির বাঘ ও বিন্ধ্যপর্বতে পাচমারি শৈলাবাসের পরিচয়, মানসিংহের গোয়ালিয়র, শিবপুরী ও মান্দলার কথাও আছে, আছে মধ্যপ্রদেশের ইতিহাস, শিল্প সংস্কৃতি আদিবাসী ও দস্যুদের কথাও। বহু চিত্র শোভিত মূল্যবান গ্রন্থ।

যে পর্বগুলি আবার ছাপা হলো:

হিমাচল পর্ব:
ষষ্ঠ সংস্করণ—মূল্য ১০·০০

উৎকল পর্ব:
সপ্তম সংস্করণ—মূল্য ১০·০০

কালিন্দী পর্ব:
নবম সংস্করণ—মূল্য ১০·০০

মগধ পর্ব:
চতুর্থ সংস্করণ—মূল্য ১০·০০

ভারতের অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে পর্বগুলি যথা—অন্ধ্র, তামিল, কেরল, কর্ণাট, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, কোঙ্কণ, কোশল, কাশ্মীর, কামরূপ ও গৌড় পর্ব পাওয়া যাইতেছে।

প্রকাশক:

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

(সি ৪৯৮১)

ঠাকরসীর
শার্টিং ও স্যুটিং
সব সময় প্রশংসা পায় !
এভারফ্রেশ
ক্রোনেস্টর
ক্রোনলীন
ঠাকরসী গ্রুপ অব মিল্‌স

সূচীপত্র

বর্তমান বাংলা নাটকের সার্থক রূপকার রত্নকুমার ঘোষের
এক সেটে অভিনয়োপযোগী নতুন পূর্ণাঙ্গ নাটক

ভোরের মিছিল (১ নারী) ৩·৫০

সূর্য-পরিক্রমার মত ঘুরতে ঘুরতে একদিন আমরা বিষুবরেখায় মিলব, তখন দেখা যাবে লাঞ্ছিত মানুষের বিরাট বিশাল মিছিল বিস্ফোরণ ঘটাতে এগিয়ে আসছে। সেই বিস্ফোরণে ভস্মীভূত হবে ক্ষমতালোভী মানুষের নিষ্ঠুর জোত। রাতের অন্ধকার দূর হবে সর্বহারা মানুষের ভোরের মিছিলে।

এই নাট্যকারের এক সেটের অন্যান্য নাটক

অন্ধতমসাপুরোঃ (২য় সং ॥ ৩ নারী) ৩·০০ * সকালের জন্য (৩য় সং ॥ ১ নারী) ৪, * ভূমিকম্পের আগে (১ নারী) ৩·০০ * ভূমিকম্পের পরে (১ নারী) ৩·০০ * ফেরা (২য় সং ॥ ১ নারী) ৩·৫০ * সিঁড়ি (১ নারী) ৩·০০ * প্রচ্ছন্ন মহিমা (বনফুলের উপন্যাসের নাট্যরূপ ॥ ৩ নারী) ৩·০০

ক্যাপ্টেন হুররা (১ নারী) ৩·৫০

মানুষের বৃহত্তম শত্রু আজও সম্ভবত মানুষ — এই কলঙ্কিত অপবাদে সভ্যতা আর কতকাল অভিযুক্ত থাকবে? এই নাটকে মানুষের এই কলঙ্ক-মুক্তির উদ্যোগ ও দায়িত্ব স্বীকার করা হয়েছে এর উপসংহার—বাংলা দেশের দুঃস্থ থেকে জাগ্রত জননীর রিক্ত মুখশ্রী উজ্জ্বল করে তোলার সাহস ও স্বপ্ন।

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর
আমি ক্রীতদাস (৩ নারী) ৪·০০

সুশীল সেনের
জলপোন (২ নারী) ৩·৫০

পূর্ণাঙ্গ নাটক

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন নাটক

ইস্তাহার	(১ নারী)	৪.০০
চিতাভস্ম	(৩ নারী)	৩.৫০
নিহত নিয়তি	(২ নারী)	৩.০০

অগ্নিমিত্রের নতুন নাটক

নিজস্ব সংবাদদাতা	(৩ নারী)	৪.০০
জটায়ু	(৪ নারী)	৩.৫০
নিকটে ফাঁদ	(২ নারী)	৩.০০

অগ্নিদূতের

অন্ধকারের নীচে সূর্য	(২ নারী)	৩.০০

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের

এই মন সেই মন	(২ নারী)	৩.৫০
পাঞ্চজন্য	(২ নারী)	৩.০০

পার্থপ্রতিম চৌধুরীর

ললাটের রং মুহূর্ত	(২ নারী)	৩.০০
খাঁচা	(২ নারী)	৩.০০
সম্রাট কণিষ্ক	(১ নারী)	২.৫০

মনোজ মিত্রের হাসির নাটক

মাথা বদল	(৪ নারী)	৩.০০
কোথায় যাবো	(১ নারী)	৩·৫০
নেকড়ে	(২ নারী)	৪·০০

উমানাথ ভট্টাচার্যের

দাদা জানেন	(১ নারী)	৩.০০
অগ্নিকোণ	(২ নারী)	৩.০০

গঙ্গাপদ বসুর

একটি স্বপ্নের জন্যে	(২ নারী)	৩.৫০
নহ মাতা	(১ নারী)	৩.৫০

দিলীপ মজুমদারের

গোলাপ কাঁটার মৃত্যু	(১ নারী)	৩.০০

শক্তিপদ রাজগুরুর

কুমারী মন	(৩ নারী)	৩.০০

তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের

ক্রৌঞ্চ নিষাদ কথা	(২ নারী)	২.৫০

তমাল দাসের

স্বপ্ন সম্ভবা	(২ নারী)	৩.০০

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর

জনক জননী	(৩ নারী)	৩.৫০

বিজয় ভট্টাচার্যের

দেবী গর্জন	(৫ নারী)	৩.০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী: ১৩/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোন: ৩৪-৮৩৫৬

সঞ্চয়ী পরিবারই সুখী পরিবার

আপনার নিজের বার্দ্ধক্যের ও পরিবারের যাবতীয় আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য এখন থেকেই সঞ্চয় সুরু করুন। 'পিয়ারলেস'-এর সহজ ও বিশেষ লাভ-জনক সঞ্চয় পরিকল্পনায় যোগ দিয়ে ছেলেমেয়ের শিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান ক'রে রাখুন। বিশদ বিবরণের জন্য আজই কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে অথবা নিকটবর্তী এজেন্টের নিকট খোঁজ নিন।

'পিয়ারলেস'-এর সঞ্চয় পরিকল্পনায় ইতি-মধ্যেই দুই লক্ষাধিক ব্যক্তি যোগদান করেছেন।

— বিনা খরচায় —

দুর্ঘটনা এবং কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যু-বীমার সুযোগ নিন—

"পিয়ারলেস"-এর মাধ্যমে সঞ্চয় করুন।

দি পিয়ারলেস জেনারেল ইন্সিওরেন্স

এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ • (স্থাপিত ১৯৩২)

রেজিঃ অফিস: পিয়ারলেস হাউস

৫/২, ফকির দে লেন • কলিকাতা-১২

গভঃ সিকিউরিটিতে লগ্নী—এক কোটি টাকার ঊর্দ্ধে (Face Value)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীদীপেন সেন

বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ

গর্ব ও গৌরবের সঙ্গে সংগ্রহে রাখার মত রাজ-সংস্করণ

বঙ্কিম রচনাবলী

এক খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস। গ্রাহক মূল্য ১২, । ৫, দিয়ে গ্রাহক হোন। নামমাত্র মূল্যে অন্ততঃ ৫০ বছর স্থায়ী এই দুর্লভ অভিজাত সংস্করণটি আমরা বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। পৃষ্ঠা এক হাজারের উপর। লাইনো টাইপ, দামী কাগজ, রেক্সিন বাঁধাই, মনোরম আবরণী, বিশাল ভূমিকা, বিশুদ্ধ পাঠ, জীবনী প্রভৃতিতে সুসম্পাদিত এবং উন্নত মানের প্রকাশনা।

মধুসূদন রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

রামমোহন, মধুসূদন, দীনবন্ধু এবং দ্বিজেন্দ্র রচনাবলীরও গ্রাহক করা হচ্ছে। প্রতিটির জন্য ৫, দিয়ে গ্রাহক হোন।

হরফ প্রকাশনী। এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২

(সি ৮৯৭৪)

শিশু সাহিত্যের মণিমঞ্জুষা

উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে

দাম ২২·০০ টাকা। শোভন ২২·৫০ টাকা।
আবার কিছু নতুন গ্রাহক করা হচ্ছেঃ
দু খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ২৭·৫০ টাকা মাত্র স্টক থাকতে থাকতে ৭·৫০ দিয়ে গ্রাহক হয়ে আপনিও আজই সংগ্রহ করুন।

গ্রীমদের সমগ্র রচনাবলী

বাংলা ভাষায় এই প্রথম সমগ্র রচনা ২ খণ্ডে বের হচ্ছে। গ্রাহক মূল্য ২৫, । ৫, দিয়ে গ্রাহক হয়ে আজই আপনার কপি বুক করুন।

লুইস্ ক্যারল সমগ্র রচনাবলী

অনুবাদ করছেন ঃ জয়ন্ত চৌধুরী

৩ খণ্ডে বের হচ্ছে। গ্রাহক মূল্য ২৯, মাত্র, গ্রাহক চাঁদা ৫, ।

হ্যান্স অ্যাণ্ডারসন সমগ্র রচনাবলী

অনুবাদ ঃ লীলা মজুমদার

২ খণ্ডে সমগ্র লেখা। গ্রাহক মূল্য ২০, , গ্রাহক চাঁদা ৫, ।

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

প্রথম খণ্ড দ্রুত ছাপা হচ্ছে। প্রথম খণ্ডের গ্রাহক চাঁদা ১০, মাত্র। গ্রাহক হন ৫, দিয়ে।

এডওয়ার্ড লীয়ার রচনাবলী

অনুবাদ ঃ অশোককুমার মিত্র ও শৈলশেখর মিত্র

গ্রাহক মূল্য ৭, গ্রাহক চাঁদা ২,

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

এ/১৩২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২,

ফোন ঃ ৩৪-২৩৮৬

(সি ৯০৩৩)

বিমল মিত্রের

বিশিষ্ট উপন্যাস

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

দাম ৮·০০

এই কাহিনীর নায়ক লোকনাথের জন্ম আর আণবিক বোমা পতনের মধ্যে কোনও যোগ-সূত্র ছিল কিনা কে জানে, তবে লোকনাথ যখন বড় হলো তখন পৃথিবীর এই চরমতম পাপের বিবরণ পড়ে তার নিজের মনেও এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। তার মনে হলো আটাশ বছর আগে মানুষ যে পাপ করেছে তার জন্যে পৃথিবীর কারোর না কারোর অশৌচ পালন করা অপরিহার্য। তাই একদিন সে সমস্ত মানুষজাতির হয়ে এক মহা-অশৌচ ব্রত আরম্ভ করলে। আড়াই হাজার বছর আগে এক রাজপুত্র একদিন মানবের কল্যাণকামনায় তথাগত বুদ্ধদেব হতে পেরেছিলেন। কিন্তু লোকনাথ? লোকনাথ কি যথার্থই লোকনাথ হতে পেরেছিল এই বিজ্ঞানসর্বস্ব আণবিক যুগে? বিমল মিত্রের নতুন উপন্যাস 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' বিষয়বস্তুতে যেমন অভিনব, নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবেও তেমনি চমকপ্রদ॥

প্রকাশিত হল

সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস

সময়, আমার সময় ৪·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

ঝড় ৮·০০

শংকর-এর উপন্যাস

বোধোদয় ৫·০০

সুশীল রায়ের উপন্যাস

অদ্বিতীয়া ৪·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর রম্যরচনা সংকলন

দু'হারা ৭·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর অনুবাদ-উপন্যাস

প্রেম ৪·০০

সমরেশ বসুর উপন্যাস

ফেরাই ৩·০০

বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস

বাতিঘর ৪·০০

সুশীল রায়ের যুগল-উপন্যাস

সামান্য অসামান্য ৫·০০

গৌরকিশোর ঘোষের গল্পগ্রন্থ

সাগিনা মাহাতো ৫·০০

সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস

জল দাও ৩·৫০

গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস

লোকটা ৩·০০

সমরেশ বসুর উপন্যাস

বিবর ৫·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস

অমাবস্যার গান ৩·০০

শংকর-এর উপন্যাস

নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪০৬২ ॥ বিক্রয়-কেন্দ্র: ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিঃ ৯

রুশ বুদ্ধিজীবীদের ভবিষ্যৎ

ফরাসী মনীষী ও সাহিত্যিক মরিয়াক্ একদা তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে কী ধরনের সমাজ গড়ে তোলা হচ্ছে তা বাইরের মানুষের কাছে অজ্ঞাত। যতদিন না একজন মহৎ ঔপন্যাসিক ওই সমাজের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হচ্ছেন ততদিন আমরা কিছুই জানতে পারব না। সেই সমাজের অন্তর-জীবনকে যিনি দেখছেন সেই অজ্ঞাত প্রস্তুতকে আমি অভিবাদন জানাই। আমি জানি, এই অজ্ঞাত প্রস্তুত সোভিয়েট সমাজের সেই সব জিনিসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন যা এখানকার সরকারের অনুমোদিত নয়, রাষ্ট্র-স্বীকৃত নয়, এবং তাতেই তাঁর উৎসাহ ও আকর্ষণ সমধিক। মরিয়াকের এই মন্তব্যটি আপাতদৃষ্টিতে যতই সরল মনে হোক বস্তুত তার অর্থ অতটা সরল নয়। মরিয়াকের এই মন্তব্যের অনেক পরে আমরা বরিস পাস্তেরনেক এবং সোলঝেনিৎসিনের মতন মহৎ লোকদের দেখতে পেলাম। মরিয়াক কী মিথ্যা বলেছিলেন?

সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে-সমাজ গড়ে উঠেছে সেই সমাজের কথা বলতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, সমষ্টিগত এক নিদ্রাসুলভ অবস্থার মধ্যে মানুষ সেখানে বেঁচে আছে: রাষ্ট্র এই নিদ্রা সঞ্চার করে দিয়েছে সমাজের মধ্যে, ব্যক্তিগত মানুষের কোনো জীবনস্পন্দন সেখানে নেই। অকল্পনীয় এক শাসনযন্ত্র সমাজের চারপাশে পাহারাদারের কাজ করছে। মার্কস লেনিনের নামে সোভিয়েট আদর্শবাদ যে-মানুষের কথা মুখে বলতে চেয়েছে সেই মানুষ আর স্টালিনের শাসনের মধ্যে যাদের জীবন কেটেছে সেই মানুষ কি এক? অবশ্যই নয়। আমরা জানি স্টালিন কোন মূল্যে রুশ জনগণের আনুগত্য কিনেছিলেন। মানব-জীবনের কতটুকু মূল্য তিনি দিয়েছিলেন তাও আজ অজানা নয়। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে, ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় আসার পর সোভিয়েট সমাজের এই নিদ্রা কোথাও যেন ফিকে হয়ে আসে। বলা বাহুল্য, সোভিয়েট সমাজের সমষ্টিগত নিদ্রার যুগে সকলেই নিদ্রিত ছিলেন না। তারই পরিণতি হিসেবে ক্রুশ্চেভের আমল থেকেই সোভিয়েট বুদ্ধিজীবী মহলে এক মৃদু আলোড়ন দেখা দেয়, সেই আলোড়নে সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এমন কি ধর্মবিশ্বাসীদেরও অংশ ছিল। এই আলোড়ন সম্পর্কে সোভিয়েট সরকার অজ্ঞ ছিলেন না, বা উপেক্ষাও দেখান নি। যথাসময়ে এদের দমন এবং কণ্ঠরোধের চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু samizdat বা টাইপ করা গোপন পাণ্ডুলিপি মারফত বুদ্ধিজীবী মহলে নব-চিন্তার আদানপ্রদান চলতে থাকে। দিনে দিনে তা গোকুলে বেড়েছে। এক নতুন চিন্তাশীল সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে সোভিয়েটে, যারা রাষ্ট্রের স্বৈরাচারকে ঘৃণা করে, এরা চায় নাগরিক অধিকার, মানবিক ও নৈতিক অধিকার, স্বাধীন সাহিত্যকর্মের অধিকার। সোভিয়েট সরকার এই বুদ্ধিজীবীদের দমন করার জন্যে আজ প্রায় উন্মাদ। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক সোলঝেনিৎসিন আজ স্বদেশে ধিক্কৃত, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এখন বিপজ্জনক এক অবস্থার মধ্যে রয়েছে, মস্কো প্রবেশের অনুমতি নেই! জোরেজ মেদভিদেয়েভ— যিনি বায়োকেমিস্ট্রি এবং অ্যাগ্রোবায়োলজির গবেষক হিসেবে স্বদেশে কিছু আলোড়ন তুলে ইংল্যাণ্ডে এক বছরের জন্যে গবেষণার কাজ করার অনুমতি পেয়েছিলেন—বিদেশে থাকার সময় তাঁর সোভিয়েট নাগরিকত্ব খারিজ করে দেওয়া হল। এর একমাত্র কারণ এই নয় যে তিনি সোলঝেনিৎসিনের

৪০ বর্ষ ।। সংখ্যা ৪৬
শনিবার ৩০ ভাদ্র ১৩৮০
Saturday 15 September 1973

অনুরাগী। একদা এই মেদভিদেয়েভ-এর রচনা বিদেশে পাচার এবং প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা উদারপন্থী তাঁদের চিন্তারও উনি অনুসারী। স্বদেশেই তিনি মোটা ভাষায় সরকারী বিজ্ঞান-চিন্তার কূপমণ্ডূক মনোভাবের সমালোচনা করেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত রুশ পদার্থ-বিজ্ঞানী ডঃ সাখারভ সরকারী সতর্কতা অবজ্ঞা করে, সম্প্রতি বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যা বলেছেন তাও আমাদের মনে থাকার কথা। সরকারী অত্যাচার, শ্রমশিবিরে পাঠানো, মানসিক হাস-পাতালে আটকে রাখা, তথাকথিত বিচার, চরিত্র হনন—এ সমস্তই আজ বিক্ষুব্ধ বুদ্ধিজীবীদেরও সহ্য করতে হচ্ছে। তবু ডঃ সাখারভ নিজের জীবনের বিনিময়ে বিশ্বকে সতর্ক করে দিতে চাইছেন—যেন এমন ঘটনা না ঘটে যাতে সোভিয়েট দেশের এই নবচেতনার মৃত্যু ঘটে।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম : ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৬.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৮.৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯.৫০

আসামে ও ত্রিপুরায়
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৪৪.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ২২.৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১.৫০

ভারতের বাইরে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৮৭.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৪৪.০০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ২২.০০
বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৬০.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৩১.০০

লণ্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক — টাঃ ১৭৪.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৮৭.০০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৪৪.০০

<u>কাগুজে ক্ষেপণাস্ত্র</u> : শ্রীদীক্ষিত আশ্বাস দিয়েছেন যে মজুতদারি ও মুনাফাবাজি রোধ করার জন্য মান্যগণ্য বড়লোকদের বিরুদ্ধে ডি-আই-আর প্রয়োগ করা হবে।

পাকিস্তান কি সততার সঙ্গে দিল্লিচুক্তি মানবে?

শেষ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা লড়াই নিয়ে উদ্ভূত সমস্যাবলী সম্পর্কে একটা চুক্তি হল। এই চুক্তি কার্যকর হতে অনেকটা সময় লাগবে। এদিক থেকে পাকিস্তানে ফেরৎ যাবে প্রায় নব্বুই হাজার যুদ্ধবন্দী। আর পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আসবেন কয়েক লক্ষ বাঙালী—যাঁরা আটক পড়ে আছেন ওখানে। আবার, বাংলাদেশ থেকে ফেরৎ যাবেন এক লক্ষ পাকিস্তানী—যাদের অবশ্য পাকিস্তান ফিরিয়ে নিয়ে যেতে খুব উৎসাহী নয়।

সিমলা চুক্তির এক বছরেরও পরে দিল্লি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তি কার্যকর করার ব্যাপারে পাকিস্তান কতটা সততা দেখাবে তার উপর নির্ভর করবে এই উপমহাদেশের শান্তির ভবিষ্যৎ।

যে চাপেই হোক বা যার চাপেই হোক পাকিস্তান ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের বিচার করার আবদার ছেড়েছে। পাকিস্তান যেদিন শুনেছিল বাংলাদেশ সরকার অন্তত ১৯৫ জন পাক যুদ্ধাপরাধীর বিচার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেদিন থেকেই বলতে শুরু করেছিল যে তারাও ২০০-র ওপর আটক বাঙালীর বিরুদ্ধে মামলা চালাবে পাকিস্তানে। সে আবদার পাকিস্তান এখন ছেড়েছে। রাজি হয়েছে আটক সব বাঙালীকে ফেরৎ দিতে।

বাংলাদেশ কিন্তু আটক সব পাক যুদ্ধাপরাধীকে ছাড়তে রাজি হয়নি। এখনও পর্যন্ত ওই ১৯৫ জন পাক যুদ্ধাপরাধীর বিচারের সিদ্ধান্তে অবিচল। অত্যাচারীদের সবাইকে বাংলাদেশ বিনা বিচারে ছাড়তে চায় না। পাকিস্তান এই ব্যাপারে দুটো জিনিস অবশ্য আদায় করে নিয়েছে। (এক) দুই দেশ থেকে যুদ্ধবন্দী, আটক বাঙালী এবং পাকিস্তানী নেওয়া আনা যতদিন শেষ না হবে ততদিন ওই ১৯৫ জন পাক যুদ্ধবন্দী ভারতেই থাকবে। এবং (দুই) ততদিন বাংলাদেশ তাদের বিচার শুরু করবে না।

দিল্লি চুক্তি কার্যকরী করার ব্যাপারে যেটা সবচেয়ে আগে দেখার তা হল পাকিস্তান সব বাঙালীকে ফেরৎ দেয় কি-না। আটক বাঙালীদের তালিকা কারু কাছে নেই। সঠিক সংখ্যাও কেউ জানেন না। বাংলাদেশ সরকার বলছেন, এদের সংখ্যা চার লক্ষের বেশি। পাক সরকার বলছে, ঐ সংখ্যাটা ওর অর্ধেকও নয়। পাকিস্তানীরা শুরু থেকেই প্রচার করছে আটক বাঙালীদের অনেকেই পালিয়ে আসতে গিয়ে মারা গিয়েছে। বাঙালীরা

যারা পাক সেনাবাহিনীতে ছিলেন তাঁদের পাক সরকার ক্যাম্পে ক্যাম্পে আটকে রেখেছিল। কিন্তু অসামরিক সরকারী কাজে নিযুক্ত বা এমনি কাজে যেসব বাঙালী ছিলেন তাঁরা নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগও ছিল না। সেনাবাহিনীর আটক বাঙালীদের হিসাবও পাকিস্তান কোনও দিন কাউকে দেয় নি।

তাই বাঙালীদের ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের গন্ডগোল করার যথেষ্ট সুযোগও আছে।

পাকিস্তান দ্বিতীয় যেটা নিয়ে শুরু থেকে গন্ডগোল করছে তা হল বাংলাদেশের পাকিস্তানীদের ফেরৎ নেওয়ার প্রসঙ্গ। বাংলাদেশ বলছে না, বাংলাদেশের অবাঙালী মাত্রই পাকিস্তানী। বাংলাদেশ সরকার বলছেন, বাংলাদেশের যেসব অবাঙালী নিজেদের পাকিস্তানী বলে ঘোষণা করেছে তারা পাকিস্তানী। বাংলাদেশ তাদের রাখতে রাজি নয়। পাকিস্তানও তাদের ফেরৎ নিতে ঘোরতর অনিচ্ছুক।

এরা হল আসলে অবাঙালী উদ্বাস্তু। ১৯৪৭ সনের দেশভাগের সময় এরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কেউ গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, কেউ পূর্ব পাকিস্তানে। এরা এতদিন পূর্ব বাংলায় সর্ব ব্যাপারে পাকিস্তানীদের সঙ্গে একসঙ্গে চলেছে। মায় বাঙালীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করার ব্যাপারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়েও এরা হাত মিলিয়েছিল পাক সেনাবাহিনীর সঙ্গেই। বাংলাদেশ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার পর এরা নিজেদের ঘোষণা করেছে পাকিস্তানী বলে। লিখিত ঘোষণা। বলেছে, আমরা পাকিস্তানী—পাকিস্তানে যেতে চাই।

পাকিস্তান তবু তাদের নেবে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাজি হয়েছে প্রায় এক লক্ষকে নিতে। তবে এই এক লক্ষ নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও লিখিতভাবে দিতে রাজি হয়নি। সংখ্যাটা চুক্তিতে লেখা নেই। তাই পাকিস্তান এ ব্যাপারেও গন্ডগোল করতে পারে।

অবাঙালীদের গ্রহণ করার ব্যাপারে পাকিস্তানের অসুবিধাও আছে। ১৯৪৭ সনের পরই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেসব উদ্বাস্তু পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিল তাদেরই অবস্থা এখন কাহিল। এরা পাকিস্তানের চারটে প্রদেশেই অবাঞ্ছিত। পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু,

প্রকাশিত হল

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক তার অগ্রগমনের পথের উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি—যার ফলে আবিষ্কৃত শরীর ও তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত নানা তথ্য, শরীরের অসুস্থতা ও বিভিন্ন রোগের কারণ সেগুলির প্রতিকার ও ওষুধসমূহ, চিকিৎসার সহায়ক নানারকম যন্ত্রপাতি ও বস্তুসকল প্রভৃতি। এই বইয়ের লেখক গল্পের মত হৃদয়গ্রাহী করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সেইসব রোমাঞ্চকর আবিষ্কার ও অগ্রগতির কথা ছোটদের জন্য লিখেছেন। অজস্র ছবিতে ভরা এই বই যে-কোনও গল্প-উপন্যাসের চেয়েও অনেক বেশী আকর্ষক। এমন বই শুধু ছোটদের কেন, বড়দের জন্যেও বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি॥

॥ দাম ৪·০০ ॥

পার্থসারথি চক্রবর্তীর
অভিনব বই
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

সীমান্ত প্রদেশ বা বালুচিস্তান কেউই এদের স্থান দিতে রাজি নয়। এখনও সবাই দূর দূর করে। একমাত্র করাচি শহরে এরা নিজেদের কিছুটা নিরাপদ মনে করে। কারণ করাচিতে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরা মাঝে মধ্যে করাচিকে কেন্দ্র করে একটা আলাদা প্রদেশের দাবি করে। কিন্তু সিন্ধু প্রদেশে আগুন জ্বলার ভয়ে কোন পাকিস্তানী শাসক এদের এই দাবি নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতেও সাহস পান না।

বেনারসী
সিল্ক · তাঁত · পোষাক
ঈশ্বর চন্দ্র পাল
গঙ্গা প্রসাদ পাল
বড়বাজার, কলিকাতা-৭

১৯৪৭ সনের মোহাজেরদের (উদ্বাস্তু) নিয়েই পাকিস্তান বড় বিপদে আছে। গত বছর এদের নিয়ে গোটা সিন্ধু প্রদেশে বড় ভাষা-দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। তার উপর নতুন এক লক্ষ বা আড়াই লক্ষ মোহাজের গিয়ে পড়লে পাক শাসকদের নাভিশ্বাস উঠতে বাধ্য। এত মোহাজেরকে তারা কোন্ প্রদেশে বসাবে? যেখানে বসাবে সেখানের লোকই চটবে। শেষ পর্যন্ত পাক সরকার যত মোহাজের নিয়ে যাবে তাদের বসাবার হয়তো চেষ্টা করবে সেই করাচিতেই। কিন্তু এতে সিন্ধু প্রদেশে প্রতিক্রিয়া আরও খারাপ হবে।

পাকিস্তান তাই বাংলাদেশ থেকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানীদের নেওয়ার ব্যাপারে নানা রকমের গণ্ডগোল করবেই। যদি এরা পাঞ্জাবী হত তা হলে কোনই অসুবিধা হত না। পাকিস্তান এদের সাদরে ফিরিয়ে নিত। পাঞ্জাবীরা এজন্য পাকিস্তান সরকারের উপর প্রচণ্ড চাপ দিত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলত। কিন্তু যেহেতু এরা প্রধানত বিহারী তাই পাকিস্তানে এরা অবাঞ্ছিত।

এই একটা জিনিসই আবার প্রমাণ করছে, পাকিস্তান স্রষ্টাদের দ্বিজাতিতত্ত্ব কত ভুল ছিল। দ্বিজাতিতত্ত্বের মূল কথা ছিল : ভারতে হিন্দু মুসলমান দুটো আলাদা জাতি। বিহারী মুসলমান, বাঙালী মুসলমান, পাঞ্জাবী মুসলমান, মাদ্রাজী মুসলমান—সব মুসলমান এক জাতি। আর বিহারী হিন্দু, বাঙালী হিন্দু, পাঞ্জাবী হিন্দু, মাদ্রাজী হিন্দু—সব হিন্দু এক জাতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম একবার প্রমাণ করেছে এই তত্ত্ব ভিত্তিহীন। এখন আবার পশ্চিম পাকিস্তানীরাই প্রমাণ করছে, এই তত্ত্ব ভুল। কারণ, পাঞ্জাবী মুসলমানকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিতে তারা অগ্রহী; আর বিহারী মুসলমানকে কিছুতেই গ্রহণ করবে না! অর্থাৎ এখন পাকিস্তানীরাই বলছে, সব মুসলমান এক নয়, এক জাতি নয়। যারা উগ্র পাকিস্তানী সেই পাঞ্জাবীরাই আজ একথা বলছে!

*

দিল্লি চুক্তি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি হলেও কার্যত এটা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি। বাংলাদেশও এই চুক্তির মধ্যে। চুক্তির বিষয়গুলি প্রধানত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ব্যাপার। যেহেতু পাকিস্তান এখনও বাংলাদেশকে মেনে নেয় নি তাই চুক্তিটা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে না হয়ে হল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। চুক্তিটা দেখে সকলেরই মনে হয়েছিল, এর পর পাকিস্তান খুব তাড়াতাড়ি বাংলাদেশকে মেনে নেবে।

কিন্তু দিল্লি চুক্তির পরই পাক নেতারা যা বলেছেন তাতে অনেকেই হতাশ হয়েছেন। এখন আর মনে হয় না পাকিস্তান চট করে বাংলাদেশকে মেনে নেবে। পাকিস্তানী নেতারা আরো পাঁচ রকমের ফাকড়া তুলেছেন।

তাই পাকিস্তান দিল্লি চুক্তি কতটা মানবে সে সম্পর্কে গোড়াতেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। পাকিস্তান যদি বাংলাদেশকে মেনে নাই নেয় তা হলে এই উপমহাদেশে শান্তির আশা সুদূরপরাহত।

পাকিস্তানের ভেতরের অবস্থাও বাংলাদেশকে মেনে নেওয়া বা উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল নয়। পাকিস্তান যারা চালায় সেই পাঞ্জাবীরা এখনও ঘোরতর ভারত ও বাংলাদেশ বিরোধী। সরকারী ও বেসরকারী প্রচারে বিহ্বল হয়ে তাদের অনেকেরই এখনও ধারণা : ভারতের সঙ্গে আর একটা যুদ্ধ করে "হিন্দু রাজ" খতম করে দেওয়া যাবে এবং "হিন্দু রাজ ভারতকে" বড় রকমের আঘাত করা গেলে বাংলাদেশও আবার অনায়াসে পাকিস্তানে ফিরে আসবে। কারণ, তারা এখনও বিশ্বাস করে বাংলাদেশে পাক-প্রেমীদের সংখ্যা বেশী এবং তারা ক্রমেই সংগঠিত হচ্ছে। পাকিস্তানী সরকারও এই বিশ্বাস উৎপাদনে নানাভাবে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তান তাই একদিকে যখন দিল্লি চুক্তি করছে আর একদিকে তখন পাগলের মত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই যুদ্ধ-প্রস্তুতিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে বর্তমান পাকিস্তানী নায়করা উপমহাদেশে শান্তির জন্য মোটেই আগ্রহী নয়।

এবং সেইজন্যই আশঙ্কা, বাইরের বহু এবং ভেতরের কিছু চাপ পড়ে পাক নায়করা যে চুক্তি করেছেন তা পালনে তাঁরা তেমন আগ্রহ প্রকাশ করবেন না।

২-৯-৭৩।

নবারুণ গুপ্ত

(সি ৮৯৭২)

পলিটিক্যাল ফাইলেরিয়া

পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে একের পর এক দুঃসংবাদ আসছে। একেই তো আবার ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে, এ খবর শুনে যথেষ্ট দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তার উপর এল এনকেফেলাইটিসের খবর। জাতির মনোবল যাতে ভেঙে না পড়ে সেই কারণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী খবরটিকে যত দিন পারেন সরকারী স্বীকৃতি না দিয়ে চেপে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই উদ্যম সবিশেষ প্রশংসনীয়, যদিও শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে তাঁকে কবুল করতেই হয়েছে যে, কলকাতা শহরেও এনকেফেলাইটিসে লোক মরেছে।

যাক গে যাক, ওসব রোগে পাবলিক ভুগছে, কাজেই আমাদের তেমন বিচলিত না হলেও চলে। কিন্তু সম্প্রতি এমন একটি রোগের কথা জানা গিয়েছে, যাতে শুধু কংগ্রেস নেতারাই আক্রান্ত হচ্ছেন। এই দুঃসংবাদে আমরা আর স্থির থাকতে পারছি না। এই মারাত্মক রোগের নাম 'পলিটিক্যাল ফাইলেরিয়া'। বাগবাজার থেকে প্রকাশিত জোড়মন্ত্রীর কাগজেই প্রথম এই রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা প্রচারিত হয়।

দক্ষিণ কলকাতা জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে আহূত এক সাংবাদিক বৈঠকে কিছু কাঁচ নেতা জানান, "পলিটিক্যাল ফাইলেরিয়া রোগগ্রস্ত কিছু নেতা কংগ্রেসের মধ্যে আছে, তাদের কার্যকলাপে কংগ্রেসের গতি মাঝে মাঝে শ্লথ হয়ে পড়ছে। কংগ্রেস ও জনগণের মঙ্গলের জন্য ঐ পলিটিক্যাল ফাইলেরিয়া রোগগ্রস্ত নেতাদের কংগ্রেসে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই।" ডাক্তার দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে ঐ বৈঠকে কলা দিয়ে দিল্লি থেকে আনা হয়েছিল। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে এই ব্যামো সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল।

এই মারাত্মক ব্যাধির কথা খবরের কাগজ মারফত ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়ায় এই রোগের কোনও উল্লেখ না থাকায় চিকিৎসক সমাজেও বিশেষ আলোড়ন উপস্থিত হয়। পলিটিক্যাল টুরিস্টরা বিদেশ থেকে ভারতে আসা বাতিল করে দেন।

অবশেষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য এক দল বিশেষজ্ঞকে ভারতে পাঠান। তাঁদের তদন্তের বিষয় ছিল মোটামুটি এই; যথা :

(এক) পলিটিক্যাল ফাইলেরিয়া কোনও পুরাতন রোগের নতুন নাম, না ওটা নতুন কোনও রোগ?

(দুই) এই রোগের লক্ষণ কি?

(তিন) এই রোগ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে, না বিশেষ কোনও অঞ্চলেই ওর আক্রমণ সীমাবদ্ধ?

(চার) এই রোগ কতটা সংক্রামক?

(পাঁচ) এই রোগের ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা কতটুকু?

(ছয়) সম্ভাব্য চিকিৎসা কি?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ দল প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে যে রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, পলিটিক্যাল ফাইলেরিয়া সম্পূর্ণ একটি নতুন রোগ। এই রোগের বীজাণু যে কিভাবে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে তা এখনও জানা যায় নি। গবেষণা চলছে। তবে এই ব্যাধি আক্রমণ করার কিছু দিনের মধ্যেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দ্রুত ফুলতে শুরু করে। শুধু যে রোগী নিজেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয় তাই নয়, তার বাড়ি গাড়ি জমিজমা ব্যাংক ব্যালান্স সবই ফুলে ওঠে। এই ব্যাধি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ এমন কথা নিশ্চিত করে বলার মত যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে আশ্চর্যের কথা, এই ব্যাধি বর্তমানে শুধু ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরই মারাত্মকভাবে আক্রমণ করছে।

ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বিশেষজ্ঞ দল কিছু কংগ্রেস এম এল এ, এম পি, মন্ত্রী, এমন কি কংগ্রেস সংগঠনের কিছু মাতব্বর সদস্যকে পরীক্ষা করেন। একমাত্র কেরল ও তামিলনাড়ু ছাড়া আর সর্বত্রই দেখা গিয়েছে যে, ক্ষমতাসীন কংগ্রেসীরাই পলিটিক্যাল ফাইলেরিয়ার দ্বারা সর্বাধিক আক্রান্ত। কেরলে সি-পি-আই দলের বেশ কিছু সদস্য এবং তামিলনাড়ুতে ডি এম কে দলের সদস্যরাও এই রোগের আক্রমণের ফলে দিব্যি ফুলে গোলগাল হয়ে উঠেছেন। গবেষকগণ এটাও লক্ষ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র অঞ্চল যেখানে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও পলিটিক্যাল ফাইলেরিয়ার সংক্রমণ দারুণভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রেরিত তদন্তকারী এই বিশেষজ্ঞ দলটি আরও একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছেন। সি পি এম, আর সি পি আই, আর এস পি, এস ইউ সি প্রভৃতি বিপ্লবী দলের প্রাক্তন মন্ত্রীদের দেহেও এই রোগের আক্রমণচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের বাঘা বিপ্লবী উপ-মুখ্যমন্ত্রীর উপরেই পলিটিক্যাল ফাইলেরিয়া বা জনগণের ভাষায় ফোলা রোগের আক্রমণ সব থেকে মারাত্মক হয় বলে তাঁরা মন্তব্য করেন। তাঁর অমন ছিমছাম সুঠাম মেম-ভজানো কমরেডী চেহারা এই রোগের আক্রমণে মাত্র ক'মাসের মধ্যেই ফুলে ফেঁপে ঘাড়ে-গর্দানে একেবারে এক হয়ে যায়। তিনি এখনও ভুগছেন।

বিশেষজ্ঞ দলের মতে এই রোগ সাংঘাতিকভাবে সংক্রামক। এবং এর ক্ষতিসাধনের ক্ষমতাও প্রবল। এই রোগের চিকিৎসা বিশেষ কিছু নেই। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে আলাদা করে রেখে দেবার একটা প্রস্তাব তরুণ কংগ্রেসী নেতারা ভেবে দেখছেন।

তবে ওয়াকিবহাল অথবা ঘনিষ্ঠ মহলের ধারণা, পলিটিক্যাল ফাইলেরিয়া, একবার যে দলকে আক্রমণ করেছে, সেই দলের কারোর পক্ষে ওর সংক্রমণ এড়িয়ে থাকা শক্ত। কেননা, এই রোগের আক্রমণের সঙ্গে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

কলকাতা পরিত্যাগ করার প্রাক্কালে দমদম বিমানঘাঁটিতে অনুসন্ধানী দলটির সরকারী মুখপাত্র এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে আমাকে জানান, "যে যত ক্ষমতার কাছে, পলিটিক্যাল ফাইলেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হবার আশঙ্কা তার তত বেশী।"

সেইজন্যই কিছু কাঁচা নেতা প্রস্তাব করেছেন, "পলিটিক্যাল ফাইলেরিয়া রোগগ্রস্ত নেতাদের কংগ্রেসে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই।"

এই সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য কি, সে কথা জানতে চাইলে, পলিটিক্যাল ফাইলেরিয়া রোগগ্রস্ত কংগ্রেসী নেতাদের মুখপাত্র বললেন, "তা হলে কাদের নিয়ে কংগ্রেস চলবে?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?"

তিনি বললেন, "তা হলে যে রোগী বস্তুতে পার্টি উজাড় হয়ে যাবে। ঐ রোগে কে না ভুগছে!"

মরিয়া না মরে রাম

চার বছর পরে চীনা কম্যুনিস্ট দলের বৈঠক যে বসছে ২৪ থেকে ২৮ আগস্ট, ঢাক ঢোল বাজিয়ে সে খবর তামাম চীনের বাসিন্দাদের তো দূরের কথা খোদ রাজধানী পিকিংয়ের লোকদেরও জানানো হয়নি। প্রতিনিধিরা সব এসেছেন চীনের সব এলাকা থেকে। পাঁচ দিন ধরে তাঁরা বৈঠক বসিয়েছেন কোনও আড়ম্বর না করে। খবরটা কিন্তু একরকম চেপে রাখাই হয়েছিল। সরকারীভাবে জানানো হয়েছে পিকিং বেতার মারফত ২৯ আগস্ট রাত নটায়। তারপর বাজী পুড়েছে, আলো জ্বলেছে, ঢাক বেজেছে, লোকে শোভাযাত্রা করে জমায়েত হয়েছে পিকিংয়ের তেনানমেনবাগে। তবে যা ঘটেছে দলের দশ নম্বর কংগ্রেসে ততে তাক লাগানোর মতো কিছু নেই। মোটামুটি দলের সাবেকী চালই বজায় আছে, ধরনধারনও তেমন কিছু পালটায়নি। দলে ভাঙন ধরেছে এমন লক্ষণও কিছু মেলেনি, দলের সর্বময় কর্তা রইলেন চেয়ারম্যান মাও-ই। তাঁর ধারে কাছে আসতে পারেন এমন কোনও নেতার দেখা মেলেনি বৈঠকে, নতুন কোনও তারা দেখা দেয়নি চীনা কম্যুনিস্ট দলের আকাশে। শুধু একটা পুরোনো তারার জৌলুস কিছু বেড়েছে আর খসেছে একটি ঝকমকে তারা।

জৌলুস বেড়েছে চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইয়ের আর খসে পড়েছেন মার্শাল লিন পিয়াও। ১৯৬৯ সনে চীনা কম্যুনিস্ট দলের যে ন নম্বর কংগ্রেস বসেছিল তার নায়ক ছিলেন মার্শাল লিন পিয়াও। তাঁর তখন তুঙ্গে বৃহস্পতি, সুখের পেয়ালা তাঁর কানায় কানায় ভরা। সে কংগ্রেসে মূল বক্তব্য ছিল তাঁরই। প্রতিনিধিদের বেশির ভাগই তাঁর চেলা। সেনাবাহিনী তাঁর হাতের মুঠোয়। রাজনীতিকেরা তাঁর একান্ত বশংবদ। যাকে বলে সোনায় সোহাগা। তিনি যা চেয়েছেন তাই মঞ্জুর করেছে দলের বৈঠক। যে রিপোর্ট তিনি কংগ্রেসে পেশ করেছিলেন তাতে প্রাণ খুলে গালাগাল দিয়েছিলেন লিউ শাও চিকে—তখনও লিউ আইনত চীনের রাষ্ট্রপতি যদিও তাঁর মাথায় কলঙ্কের ডালি তুলে দিয়ে সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দলের সংবিধানেরও রদবদল হয়েছিল সে কংগ্রেসে। তাতে নতুন একটা ধারা যোগ করে বলা হয়েছিল মাও সে তুংয়ের পর তাঁর শূন্য আসনে বসবেন মার্শাল লিন পিয়াও। এখন শোনা যাচ্ছে সে রদবদলে মাওয়ের মত ছিল না—নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ও ব্যবস্থায় তিনি সায় দিয়েছিলেন।

আগের কংগ্রেসে যে দশা হয়েছিল

দেবরাজ

লিউ শাও চির, এ কংগ্রেসে সে দশা হয়েছে মার্শাল লিন পিয়াওয়ের। তফাতের মধ্যে লিউ শাও চি তখনও বেঁচে ছিলেন, আজও বেঁচে। যদিও ক্ষমতা আর মর্যাদা তাঁর সবই গেছে। মার্শাল লিন পিয়াও মারা গেছেন ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাটোর হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে পালাতে গিয়ে বিমান দুর্ঘটনায়। এতদিন পরে চীন সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ রাত্রে চেয়ারম্যান মাও যে ট্রেনে সাংহাই থেকে পিকিং ফিরছিলেন সে ট্রেনটা উড়িয়ে দিয়ে তাঁকে খুন করার মতলব করেছিলেন বিশ্বাসঘাতক মার্শাল লিন পিয়াও, তাঁর বউ ইয়ে চুন আর ছেলে লিন লি-কুয়ো। মাও সে যাত্রা বেঁচে যান আর লিন পিয়াওয়ের চক্রান্ত ফাঁস করে দেন প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইয়ের কাছে লিন পিয়াওয়েরই এক মেয়ে লিন দো-দো। তাঁর মা লিন পিয়াওয়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী। মরে গিয়েও লিন পিয়াওয়ের রেহাই নেই। তাঁকে কড়া ভাষায় নিন্দে করা তো হয়েছেই, তাঁর সব অধিকার কেড়ে নিয়ে দল থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়েছে দলের সংবিধান পালটে।

ইতিহাসের পাতা থেকে লিন পিয়াওয়ের নাম মুছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে চীনা কম্যুনিস্ট দলের সদ্য শেষ হওয়া বৈঠকে। তাঁকে ভাইস চেয়ারম্যান, যুদ্ধমন্ত্রী আর মাওয়ের উত্তরাধিকারী করাটা বোকামি হয়েছিল এ কথা কবুল করা হয়েছে সে কংগ্রেসে। মরার ওপর এমন মরিয়া হয়ে খাঁড়ার ঘা দেওয়ার আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে লিন পিয়াও খতম হলেও তাঁর ভূত এখনও ভর করে আছে চীনা কম্যুনিস্ট দল, চীনা সরকার আর পিপলস্ আর্মির ওপর। এ প্রায় মরিয়া না মরে রাম গোছের ব্যাপার। ভূত তাড়াবার জন্যে আসরে নামতে হয়েছে স্বয়ং মাওকে। লিন পিয়াও যে কত ধূর্ত ছিলেন, তিনি দেশসুদ্ধ লোককে কিরকম ধাপ্পা দিয়েছেন তা তিনি নিজেই বিস্তারিতভাবে লিখে দলের নেতাদের মারফত দেশের লোককে জানিয়েছেন। লিন পিয়াও ছিলেন বেজায় উচ্চাভিলাষী, কূট-বুদ্ধিতে তাঁর জুড়ি ছিল না, ক্ষমতা কব্জা করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। লেডি ম্যাকবেথের মতো তাঁকে তাতিয়েছিলেন তাঁর বউ ইয়ে চুন।

এত করেও কিন্তু দলের কর্তাদের ভয় যায়নি। যতদিন না কংগ্রেসের বৈঠক শেষ হয়েছে ততদিন তাঁরা স্বস্তি পাননি। এখনও পেয়েছেন কি না তা স্পষ্ট নয়। লিন পিয়াওয়ের ভক্তরা পাছে বেঁকে বসে একটা কেলেঙ্কারি বাধায় সেই জন্যেই কংগ্রেসের বৈঠক নিয়ে তাঁরা বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন নি। চীনা ফৌজের ওপর বিশেষ প্রভাব ছিল লিন পিয়াওয়ের। দেশের তরুণদের ওপরও। তাই নতুন প্রেসিডিয়াম আর কেন্দ্রীয় কমিটী গড়া হয়েছে তাদের মন রেখে। যে ১২৪৯ জন প্রতিনিধি হাজির ছিলেন কংগ্রেসে তাঁদের মধ্যে কতজন লিন পিয়াওয়ের ভক্ত তার কোনও হিসেব পাওয়া যায়নি। তবে প্রেসিডিয়াম কিংবা কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ার সময় খুব বেশী ঝুঁকি নিতে সাহস পান নি দলের যাঁরা চাঁই। খুব বেশী নতুন মুখ তাই দেখা যাচ্ছে না দলের ওপরের দিকে। বরং সেখানে যেন বুড়োদেরই দল বেশী। তরুণদের মধ্যে এসেছেন ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে সাংহাই বৈপ্লবিক পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ওয়াং-হুং ওয়েন। তিনি চীনের উঠতি নেতাদের একজন।

কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই। তাঁর রিপোর্টে নিন্দে করা হয়েছে লিন পিয়াও আর "উগ্র বামপন্থী" চেন পো তাকে। তিনি এখন পয়লা নম্বর ভাইস চেয়ারম্যান, চীনের চাঁইদের দু নম্বর। ওয়াং হুং ওয়েনও কিন্তু কম যান না। তিনিও এক রিপোর্ট পেশ করেছেন বৈঠকে। তাতে গাল দেওয়া হয়েছে লিন পিয়াও আর লিউ শাও চিকে প্রাণ খুলে। মাওয়ের স্ত্রী চিয়াং চিং তাঁর দিকে। বৈঠকে যদিও ঠিক হয়েছে মাওয়ের পর চীনে যৌথ নেতৃত্ব চালু হবে কিন্তু এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছে পয়লা নম্বর হবার চেষ্টা করছেন চু এন লাই তো বটেই, ওয়াং হুং ওয়েনও। আপাতত অবশ্য চীনের কম্যুনিস্ট দল এককাট্টা—নেতাদের মধ্যে অমিল যেটুকু তাছে তা তাঁরা বাইরে প্রকাশ করতে চান না। তাঁদের ভয় এখন আর আমেরিকাকে নয়। রুশিয়াকে নিয়ে। মামুলী গালাগালি বৈঠকে দেওয়া হয়েছে আমেরিকাকে কিন্তু তার সঙ্গে চীনের লড়াই বাধবে এ বিশ্বাস তাঁদের নেই। তাঁদের ধারণা চীনের দুশমন এখন শোধনবাদী সমাজতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ কম্যুনিস্ট রুশিয়া।

তোমাদের মনের মতো রঙীন পূজাবার্ষিকী

আনন্দ মেলা

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
এক ডজন ছড়া
ছবিতে যার মজা দিচ্ছে এক ডজন শিশু ও কিশোর শিল্পী।

সত্যজিৎ রায়ের
লেখা ও আঁকা
বারীন ভৌমিকের ব্যারাম
রাজধানী এক্সপ্রেসের কামরায় বারীন ভৌমিকের সহযাত্রী মাত্র একজন। কেন তাকে এত চেনা-চেনা মনে হচ্ছে বারীন ভৌমিকের?

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
বড় গল্প
পৃথিবী বাড়ল না কেন?
এক অকল্পনীয় ভবিষ্যৎ থেকে মানুষকে বাঁচাতে ঘনাদা এবার পাড়ি দিয়েছেন আমেরিকার হেলস ক্যানিয়ন থেকে আফ্রিকার ইঁদুরের নগর এনবুজিমবে।

মতি নন্দীর
ফুটবলের উপন্যাস
স্টপার
গতবছরের 'স্ট্রাইকার' মনে আছে তো? "স্টপার" শুধু আকারেই আরো বড় নয়, আরো চিত্তাকর্ষকও।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস
সত্যিকার রাজপুত্র
কিশোরমণির বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে বলে ইস্কুল থেকে কারা তুলে নিয়ে এল মলয়কে? পথে অজ্ঞান করে কোথায় এনে বন্দী করে রাখল? কোনোদিন কি মুক্তি পাবে মলয়?

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর
গোয়েন্দা উপন্যাস
গোগো দি গ্রেট
কলেজে-পড়া জোটকাকা কথায় কথায় ছেলেমানুষ ব'লে তুচ্ছ করে গোগোকে। "জোটকা"-কে শিক্ষা দিতে তাই এক "বিগ্রহ-চুরি'র রহস্যের কিনারা করে ফেলতে হল গোগোকে।

হাসির গল্প/ভূতের গল্প
গোয়েন্দা গল্প
আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, মনোজ বসু, বিমল মিত্র, সতীকান্ত গুহ, সুকুমার দে সরকার, শিবশঙ্কর মিত্র

শৈলেন ঘোষের
রূপকথা
আমার নাম টায়রা
জাল ফেলে মাছ ধরে টায়রার বাবা। তবু টায়রার খুব ইচ্ছে করে রাজকন্যা হতে। হরিণের সঙ্গে তার ভাব, বাঘের পিঠেও সে চড়েছে, পড়েছে ডাকাতের হাতেও। তারপর?

চিরঞ্জীবের
যে খেলা শেষ হবে না
চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে হার-জিত-জয়ের যে-খেলা কোনোদিন শেষ হবে না—অন্তত যতদিন কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলা হবে, তারই বিস্তৃত কাহিনী, তথ্য ও বিবরণ।

অমিতাভ চৌধুরীর
নাটিকা
সেতুবন্ধ লক্ষ্মণেশ্বর
সেতুবন্ধ রামেশ্বরের পাশে দ্বিতীয় সেতু লক্ষ্মণেশ্বর এবং সমুদ্রের তলা দিয়ে পাতালপথ তৈরি কেন হল না, তারই গোপন কথা।

এ-ছাড়াও প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত
ছড়া, ছবি, গল্প
ধাঁধা : কার্টুন

দাম ৪ টাকা/সডাক ৫·২০

বাংলাদেশের দুই কবি

শামসুর রাহমানের নতুন কবিতার বইয়ের নাম "দুঃসময়ে মুখোমুখি"। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এগুলি নিছক যুদ্ধকালীন প্রতিবাদের কবিতা নয়। যদিও সাম্প্রতিক কালের কবিতার পাঠক মাত্রই জানেন, শামসুর রাহমানের হাতে যাদু আছে, তিনি যে-কোনো বিষয় নিয়েই লিখতে গেলে, সেই রচনাকে সার্থক কবিতা করে তুলতে পারেন। কবিতাকে কখনো কবিত্বধর্ম' থেকে বিচ্যুত হতে দেন না। এই কাব্যগ্রন্থে যে দুঃসময়ের কথা সূচিত হয়েছে, তার মধ্যে যেমন রয়েছে কবির নিজের দেশের দুঃসময়ের ছায়া, তা ছাড়াও ব্যক্তিগত দুঃসময়ও হয় অনেক প্রকার।

কবি ইয়েটস যদিও বলেছিলেন, যে সময় কবিদের কথা কেউ শোনে না, সেই সময় কবিদের উচিত কিছু না লেখা। এই বাণী সঙ্গত হলেও সব সময় মেনে নেওয়া যায় না—সারা দেশ জুড়ে একটা তাণ্ডব শুরু হলে কবিরও মনে হয়, প্রতিবাদ জানানোর নৈতিক দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেন না। কামান-বন্দুকের বিরুদ্ধে একটি কবিতায় সেইটুকুই মূল্য আছে। একজন কবি যেমন বলেছিল, মা নিষাদ। আত্মার পরিশুদ্ধি হয় এতে।

ঠিক এইরকমভাবেই শামসুর রাহমান লিখেছেন :

এখন তোমরা কেউ আমার কথায় করবে
না কর্ণপাত
সেরেস্তারি পরোয়ানা নিয়ে
ছুটেছো করুণা প্রেম প্রমুখের পেছনে
পেছনে
সোৎসাহে পরাচ্ছো হাতকড়া কল্যাণকে
ফাঁসিমঞ্চে লটকাচ্ছো বিবেককে,
শান্তিকে করছো একঘরে।

এই সব সময় কবির মনে হয়, পাথর, পতঙ্গ, গাছ, পশুপাখিদের বরং বলা যায় অন্তরঙ্গ ভাবনার কথা।

এই কাব্যগ্রন্থে টুকরো-টুকরোভাবে উঁকি মেরেছে সত্তর সালে বাংলাদেশের বিধ্বংসী বন্যার রূপ ও তাণ্ডব এবং একাত্তর সালের সেই ভয়ংকর দিনগুলির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। এই সব বিষয়ে লিখতে গিয়ে তিনি বেদনার্ত বা ক্রুদ্ধ হয়েছেন কিন্তু তাঁর হাতিয়ার যে বন্দুক বা বোমা নয়, ভাষা, এ কথা কখনো বিস্মৃত হন নি। তিনি সেই ভাষাকে আরও নতুন শক্তি দিয়েছেন। লক্ষ করার বিষয় এই শামসুর রাহমান ছন্দকেই অধিকাংশ সময় অবলম্বন করলেও, তাঁর বর্ণনাভঙ্গি মুখের ভাষার মতন। অবিকল কথা ভঙ্গিতে লেখা—অথচ লাইনের শেষে মিল দেওয়া—এরকম কবিতা পূর্বে কিছু লেখা হয়েছে বটে কিন্তু এই কবি তাতে নিজস্ব একটা রূপ দিয়েছেন। সামান্য উদাহরণ দিই :

সভাসদ, চাটুকার সবাই উৎকর্ণ থেকে
যাবে চিরদিন?
মুক্ত এক গাধার চোয়ালে, মনে নেই
ফিকির্দিকির
দিয়েছি গুঁড়িয়ে কত বর্বরের খুলি?
কত শক্তি
সঞ্চিত আমার দুটি বাহুতে সেও
তো আছে জানা। বজ্রশক্তি
যতই করো না আজ........

এই গ্রন্থের নাম-কবিতা একটি দীর্ঘ কবিতা। এই দুঃসময় ব্যক্তিগত। এখানে কবি শামসুর রাহমান কথা বলছেন সাচ্চু নামের একটি এগারো বছরের ছেলের সঙ্গে। বড় করুণ ও মায়াময় উপলব্ধির এই কবিতা। কোথাও বলে না দিলেও আমরা বুঝতে পারি, ঐ যে কিশোর বাচ্চু, সে তো এই কবিরই স্মৃতি থেকে উঠে আসা—পোশাকী মানুষকে কেউ জানিয়ে দিচ্ছে তার ডাক নাম।

সারা বইতে, দুটি মাত্র কবিতাই অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সংবাদপত্রের গন্ধ এড়াতে পারে নি, 'কত যাই আই, এবং স্কুটার ড্রাইভার'।

বেলাল চৌধুরী বাংলাদেশের নাগরিক হলেও বহুদিন ছিলেন কলকাতার বাসিন্দা এই তো সেদিন পর্যন্ত। তাঁর এটাই প্রথম কাব্যগ্রন্থ, নাম, 'বেলাল চৌধুরীর কবিতা'—সব কটি রচনাই কলকাতায় রচিত।

গত দশ বছরে, পশ্চিম বাংলার তরুণ কবিদের মধ্যে বেলাল চৌধুরী ছিলেন অতি পরিচিত ও প্রিয় এক যুবা। কিছুদিন তিনি 'কৃত্তিবাস' পত্রিকারও সম্পাদনা করেছিলেন।

বেলাল চৌধুরীর কবিতা অত্যন্ত নাগরিক গুণসম্পন্ন এবং সহৃদয়ী। ইস্কাবনকে তিনি ইস্কাবনই বলতে চান। অথচ হাওয়া বা আকাশ বা অচেনা কোনো রাস্তা—নিসর্গের ছোট ছোট টুকরো, এসব তাঁর কাছে অন্তহীন রহস্য নিয়ে আসে। কখনো কখনো তাঁর চিন্তাকে মনে হয় সুরারিয়লিস্টিক। একটি কবিতা থেকে খানিকটা উদ্ধার করছি,

চেতলার বাস থেমে গেল মাঝপথে
বেলালকে থেৎলে দিয়ে পিণ্ড করে
আমি বেলালের সঙ্গে যাচ্ছিলুম তুপশিয়ায়
তুপশিয়া কি চেতলার পথেই...
আসলে আমি আর বেলাল আমরা দুজন
ছিলুম
আসন্ন সামর্থ্যে একীভূত পরিহরাত্মা
এবার দ্রুত পা চালালুম, কেননা আমি জানি
এখুনি আসবে অ্যাম্বুলেন্স হসপাতাল
আ ই ডে ন টি টি......

এইরকমই আর একটি কবিতা 'কবির ঘোড়া' যার শুরু হয়েছে এমন জোরালো বর্ণনা দিয়ে :

গোধূলির পড়ন্ত লাল সূর্য থেকে বেরিয়ে
এলো
বিষম রণে উগবগে তেজী এক তরুণ ঘোড়া
এবং সেই ঘোড়া ফাল্গুনের জ্যোৎস্না
চেটে আহ্লাদে আটখানা ডগমগ হয়ে
ছুটতে লাগলো ঘোটকীর যোনির গন্ধে
উন্মনা হয়ে—শেষ পর্যন্ত তাকে দেখা যায়
বাস নিরবধি পৃথিবী ও সূর্যের ভারশূন্য
অয়ন একা।

বেলাল চৌধুরীর প্রতিটি কবিতাই বাহুল্যবর্জনহীন এবং আলাদা ধরনের স্বাদ দেয়।

কেমন আছো, বেলাল?

সনাতন পাঠক

A SKY OF DISTURBANCE
নামসাহিত্যঅপসাহিত্যঅতিবিরক্তসাহিত্য

নিমসাহিত্য-র

১৩নং যুবক-যুবতী সংখ্যা বেরোল
লিখেছেন : বিমান চট্টোপাধ্যায়, সুধেন্দু আচার্য, রবীন্দ্র গুহ, মৃণাল বণিক, প্রদীপ চৌধুরী, বারীন ঘোষাল ও সুবোধেন্দু সেন
আগামী সংখ্যা সেলস্ম্যানশিপের নষ্টালজিয়া ও এশিয়া মাইনরের উজ্জ্বল কীট-পতঙ্গ সম্বলিত হয়ে 'গল্প-সংখ্যা' হিসেবে বেরোবে।

সম্পাদক :
সুবোধেন্দু সেন / বিমান চট্টোপাধ্যায়
ঠিকানা : ৩এ/৪৯, রামকৃষ্ণ এক্সটেনশন,
দুর্গাপুর, বর্ধমান

(সি ৮৫৪৮)

পঞ্চাশ গুলির [illegible] পিস্তল
(লা ই সে ন্স
প্রয়োজন হয় না)
রাশিয়ান মডেল পিস্তল। চোর ও বন্যপ্রাণী হইতে নিজেকে

রক্ষা করুন। নাটক [illegible] বিশেষ উপযোগী। ১০০ গুলি বিনামূল্যে। দাম ১২ টাঃ ৫০ পঃ তদুপরি ডাকব্যয় ২ টাঃ ৫০ পঃ। ডিলাক্স (সুপার) ২০ টাকা। তদুপরি ডাকব্যয় ৩ টাকা। বেল্টসহ ক্রোম লেদার কেস (সুপার) ৮ টাকা। অতিরিক্ত গুলি ২ টাকা প্রতি [illegible]।

STAR TRADING CO.
(WDC) Chhapati, Aligarh (UP)

শিঙ্গার
এইসব উৎসবের দিনগুলি আমাদের মধুর ঐতিহ্যেরই অংশ বিশেষ...
শিঙ্গার কুমকুমও তাই...
ভারতীয় সৌন্দর্যের প্রতীক
শিঙ্গার সুন্দর সুন্দর কুমকুম তৈরী করে… সোনালী ও রূপোলী থেকে আরম্ভ করে মোট ১৫ রকমের মনোহর রং পাওয়া যায়…যা আপনার সাজ পোষাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে… আর আপনার মন জয় করে। সিঁদুর পাউডার ও পেস্ট—ম্যাট ও মসৃণ ফিনিশের মধ্যে যা পছন্দ বেছে নিন।
প্যারামাউন্ট প্রডাক্টস্, বোম্বাই-৪০০ ০০৪.
everest/597/SP-bn

মানুষ

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

মানুষ কখনো বাঁচে মানুষের জন্যে
কখনো বা
বাঁচার আনন্দে, নিজে,
রোদ্রে পুড়ে অথবা বর্ষায় ভিজে
খেয়ে কিংবা একদম না-খেয়ে যে-রকম।

বকম্-বকম্ গায় গোলা পায়রা
কিচির-মিচির করে পাখি
'কোথায় কোথায়' ডাকে কাক—
ওরাও যেমন আছে থাক, আর আমরাও থাকি
যত দিন
ব্যক্তিগত মৃত্যুর প্রত্যাশা
আছে
আর আছে আমাদের
অপভ্রংশ, বুদ্ধিহীন ভাষা।

ডাইরীর পাতায় ১৯শে ও ৩ তারিখ

শংকর চট্টোপাধ্যায়

১৯শে

জোমরালতার নাল ছাড়িয়ে আছে আজ মধ্যদিনের আকাশে
বাজছে হুইসেল
চৌরাস্তায় কিশোরের লাশে বসছে মাছি
খুব শোরগোল চারদিকে।
'ঢেলে সাজাও' 'ঢেলে সাজাও' রাজমিস্ত্রীর গলা পেলাম
উঠোনে
আর তখনই
হাতের কাছে কুজো চেয়ারটা প্রাণপণে ছুঁড়ে মেরেছি আয়নায়
চেঁচিয়ে বলেছি
'বেল্লিক, তোর কি আর মরণ হবে না কোনদিন।'

৩ তারিখ

নত হতে হতেই আমার পূর্ণতা
মাড়িয়ে গেছি মাটি তখনই পড়েছি হুমড়ি খেয়ে
বলেছি 'মাফ করুন'।
গাছগাছড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে গেছি সরু হয়ে
এমনকি কুটোগাছটাও মাড়িয়ে ফেলে
কেঁদে বলেছি 'দয়া হবে না'?
মানুষ তো কোন ছার আঁস্তাকুড়ের খেড়ে গোসাপের আগুপিছু
মাথা ঠুকে বলেছি 'চরণে রাখবেন'।
তারপর নিজের দু হাতে দুই পা জড়িয়ে
নিজেকেই 'রাখবি তো আমায়'?
বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছি হুহু করে।

কী অদ্ভুত পেরেক

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কলেজস্ট্রিটে বিদায় জানিয়ে এক সিগারেটসুদ্ধ হাত, আমাকে,
লাফিয়ে ধরল বাসের হাতল ;
জোলুসময় কার্নিভালে, এখন মাংসের বর্ণের মতো আমি একা।
পানের দোকানের আয়নায় আমার রোগা-ছায়া হুমড়ি খায়,
এর পর একাই হেঁটে গেলুম নরেন সেন স্কোয়ারে—
ধোঁয়া ঘিঞ্জি গলিতে
ভিখিরির মতো অনেক মানুষ, প্রচুর মানুষ, দলে-দলে লম্বা প
তাদের রোগা ও ভৌতিক।
সঙ্গে কেউ ছিল না, ছিল অসম্ভব মনখারাপ, দু আঙুলের
ফাঁকে সিগারেট
ও পকেটে খুচরো পয়সার শব্দ।
আমি একজন ব্যক্তিগত আততায়ী নিয়োগ করেছি, চাই না
বেঁচে থাকতে,
চাই না : এই জীবন আমার কাছে বমির থেকেও বেশী
ঘৃণাউদ্রেককারী।
ভীষণ মনখারাপেও দেখলুম ডাকবিভাগের বিস্তৃত বাড়ি
কি আশ্চর্য সুন্দর এই প্রাথমিক সন্ধেবেলা।
আমি সাধারণ মানুষের মতো নই—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
আর ধরে রাখে না,
ছিটকে বেরিয়ে এ-গলি ও-গলি শয়তানের মতো
ঘরচোখ ঘোরে প্রতিটি বাড়ির দরজায়।
চৌকাঠে হেলান দিয়ে হেসে উঠলেন একজন মহিলা
গলির ভিতরে—
ভরসন্ধেবেলায় ধারালো ঐ হাসি তৎক্ষণাৎ চেয়ারের মতো
ভাঁজ দুমড়ে
মাটিতে ফেলে দিল আমাকে।
অন্য সন্ধেবেলা— সিপিয়া রঙের ধোঁয়াভর্তি দোকানে
আমার আত্মা
চেয়ার সরিয়ে সশব্দে পড়ে যায় মেঝেয়—দুই বাহু বিস্তারিত
বহুদূর কার্পেটে : যেন সহসা তরবারি ছিন্ন করেছে তাদের
প্রধান শরীরের থেকে।
আঃ, আমার ছিন্ন হাতের ওপর বুটের দাপাদাপি,
বোতল ও গরম পানীয়ের স্পর্শ।
বিনিময়ে, আঃ, আজ একটি অদ্ভুত পেরেক
আমাকে গেঁথে ফেল্ল নরেন সেন স্কোয়ারে।

ভোঁ

রণজিৎ দাস

হাতে রেখেছিলে হাত ; চট-কলে ভোঁ বেজেছিল।
শ্রমিকের মর্মছোঁয়া ওই শব্দ, ওই ভোঁ—ধর্মবাপ মেশিনের ডাক
আমাদের জন্যে নয়, আমরা শ্রমিক নই, আমাদের পিতামহী
সোনার গহনা রাখতো লোহার সিন্দুকে ;

তবু, আজ, মনে রেখো, ঘনিষ্ঠ হবার আগে
হাতে যেই রেখেছিলে হাত, চট-কলে ভোঁ বেজেছিল।

পথ চলতে একদিন

সত্যেন বোস

যেমন জাগলাম একান্ত নিঃসহায় বোধে মন ভরে গেল; মনে হল, অন্ধকারে অলস জলরাশিতে সাঁতার দিচ্ছি, লক্ষ্যহীন তার স্রোত! সব যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে শেষ অবধি নির্দয় ভাবে আমাকে তীরে ফেলে দিয়েছে, আমি টলছি ঘুরছি অন্ধকারে—থামবার বিরাম নেই। দেহের কোন অঙ্গের সাড়া পাই না, সমস্ত দেহের সঙ্গে যেন কোন যোগ নেই, নিজের অনুভূতি নিয়ে গেছে। কিছু দেখা যায় না শোনা যায় না কিম্বা দিতে কোন ঘ্রাণ পাই না, একমাত্র নরম বালিশের স্পর্শ বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। মুখে আছে বুঝেছি আর চিন্তা ভাবনা বরফের মত ঠান্ডা পরিষ্কার। শুধু মাথাধরার কষ্ট ঘোলাটে করে দিচ্ছে মাঝে মাঝে—এটি বাজে সরাব পানের ফল! পাশ থেকে একবার নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনলাম না, সহজ শিশুর মত ঘুমাচ্ছে, তবু ভাবতেই হল সে আমার পাশে শুয়ে। হাত বাড়িয়ে তার কোমল চুলের রাশ বা তার মুখ ছোঁয়ার মনে হয় না। হাত তো আমার নেই! স্মৃতিতে ভাসছে ভাবনার রাশ, রক্তহীন নিস্তেজ, কোন রেশ তো দেহে রেখে যায়নি সে সব।

এইভাবে বহুবার বাস্তবতার পাশে ঘুরেছিলাম মাতাল যেমন পাতাল-ধারের সরুপথে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে বোঝা যায় না

> **অধ্যাপক সত্যেন বোস বিজ্ঞানী হিসাবেই সমধিক পরিচিত। তাঁর খ্যাতির কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এই প্রবীণ বিজ্ঞানী যে কী পরিমাণ সাহিত্যরসিক তার প্রমাণ এই অনুবাদ গল্পটি। জার্মান লেখক হাইনরিখ বোলের যে গল্পটি তিনি অনুবাদ করেছেন তা বোলের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে স্বীকৃত। গল্পটির ছায়ানুবাদ আশা করি পাঠককে পরিতৃপ্ত করবে।**

ভারসাম্য বজায় রেখে কোন লক্ষ্যের দিকে সে টলমান—মুখে তার শুধু মাধুর্যের ছায়া দেখা যায়। একাকী চলেছি পথ ধরে অল্প আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে—নিষ্প্রভ আলোয় বাস্তবতার ইঙ্গিত পরে সব কিন্তু মিথ্যা বলে প্রতীত হয়! অন্ধ আমি আঁধারে তলিয়ে গিয়েছি—পথে মানুষ ভর্তি—তবু আমি বুঝছি যে আমি একলা একাকী আমি!

শুধু মাথা নিয়ে আমি; তাও তার সবটা নয়—মুখ নাক, চোখ কান নির্জীব। শুধু মস্তিষ্ক নিয়ে—আর সে চেষ্টা করছে স্মৃতিপথে ফেরাতে অতীতকে শিশু যেমন নিরর্থক কাঁকরের রাশ দিয়ে নিরর্থক মূর্তি গড়ে যায়! সে নিশ্চয়ই আমার পাশে রয়েছে, তবু তার কোন সাড়া পাচ্ছি না।

আগের দিন গাড়ি থেকে নেমেছি, সেটি বল্কান দেশ দিয়ে এথেন্স যাবে! মাঝ রাস্তায় একটি স্টেশনে অন্য গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হবে—আমাকে সেটি কার্পেথীয় গিরিসঙ্কটের কাছে নিয়ে যাবে।

স্টেশনের নাম ভাল জানি না। নেমে প্লাটফর্মে খোঁড়াচ্ছি, দেখি নেশায় চুর একব্যক্তি আমার দিকে টলতে টলতে আসছে—বাহারী রংয়ের হাঙ্গারীয় সাধারণের পোশাকের তলায় তার ধূসর যোদ্ধার বেশ দেখা যাচ্ছে জওয়ান বিকট চিৎকার করছে, শাসাচ্ছে সকলকে। তার ধ্বনি

কানে বাজল, যেন তার তীব্র আঘাতে আমার গাল জ্বলছে থাকবে সারা জীবন।

হুয়ের দল—শুয়েরের পাল—আমার শখ মিটেছে ভরপুরে—ইত্যাদি সব কথা পরিষ্কার চেঁচাচ্ছে একজন হাঙ্গারীয়ের দিকে ফিরে—তার.ও পাগলের মত হেসে লুটিয়ে পড়ছে। এদিকে ভারি কাঁধে ঝোলা নিয়ে গাড়ির দিকে এগোল—যখন আমি নেমে পড়েছি।

গাড়ির একধারে জানলা থেকে স্টীল-হেলমেটধারী একজন চেঁচিয়ে ডাকলে—দেখ ঐ! ঐ দেখ! মাতাল তার পিস্তল বের করে তাক করলে শিরস্ত্রাণের দিকে। লোকে হই হই করে উঠলো—আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিলাম—লুকিয়ে ফেললাম সেটি—শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম—সেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ধস্তাধস্তি করতে লাগল! সব লোকে হই হই করছে—জওয়ান চেঁচাচ্ছে—লোহার টুপীধারীও চেঁচায়। এমন সময় গাড়ি ছেড়ে দিল—আর চলন্তগাড়ি শিরস্ত্রাণ-ধারীও সব সময় রুখতে পারে না।

সাঙ্গাৎ কে—শেষ অবধি ছেড়ে দিলাম—পিস্তল ফেরৎ দিয়ে ঠেলে নিয়ে চললাম—হতবুদ্ধিকে—বাহির হবার দিকে।

ছন্ন-ছাড়া ছোট যায়গা। সংগের লোকেদের সব তাড়াতাড়ি উঠতে হল। স্টেশনের বাহিরে চাতাল খালি—ক্লান্ত-ময়লা বেশে এক কর্মচারী ছোট গাছের ঝোপের মধ্যে একটি চটির দিকে দেখালে আঙগুল দিয়ে!

আমাদের বোঝা নীচে মাটিতে রাখলাম, মদের অর্ডার দিলাম। সেই খারাপ সরাব জেগে উঠে এখন যার ফলে ভুগছি!

সংগী বিরাগ ভরে চুপ করে বসলো। সিগারেট দিলাম। দুজন ধোঁয়া ছাড়ছি আর আমি তাকে দেখছি! চলনসই যোদ্ধার সম্মান চিহ্ন রয়েছে তার। বয়স অল্প, প্রায় সমবয়সী দুজনে! সোনালী চুল এলো-মেলো সাদা কপালে ঝুঁকে পড়েছে। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে কালো চোখ দুটো।

'সত্য বলছি সাঙ্গাৎ'—হঠাৎ বলে উঠলো সে, 'আমার সব সাধ মিটেছে, বুঝেছো!' ঘাড় নাড়লাম 'মন এত্ত ভারী যে কিছু বলতে পারছি না।'

"আমি এখন একে হালকা করতে যাবো।"

আমি তার দিকে তা[illegible]।

'হ্যাঁ—সহজভাবেই বললো সে—নিজেকে বিলিয়ে দিতে যাচ্ছি—পোস্তায়—ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়াব, দরকার হলে নিজের জন্য রেঁধে নেব। কোন ব্যাটার তোয়াক্কা করি না আমি।'

'আসবে আমার সংগে?' ঘাড় নাড়লাম 'না'। 'ভয় পাচ্ছিস কি রকম না?'

না—বেশ আমি যাবই কিন্তু—যাই ঘটুক।

চলছি হালকা হতে—আবার দেখা হবে!

ব্যাগ রেখে দাঁড়িয়ে উঠে একখানা নোট রাখল টেবিলে, আমার দিকে একবার মাথা নাড়ল তারপর চলে গেল। অপেক্ষায় রইলাম অনেকক্ষণ! ভাবি নি, সত্যিই পোস্তায় ভেসে চললো! তার ব্যাগ পাহারা দিচ্ছি আর অপেক্ষা করছি, খারাপ সরাব গিলছি—

দোকানের মালিকের সঙ্গে গল্প জুড়বার বৃথা চেষ্টা করলাম। চেয়ে রইলাম—সামনের চত্বরে সেখানটা [illegible] [illegible] টক [illegible] ঘোড়া ছুটিয়ে যায় সামনে—কত সওয়ার।

আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হচ্ছে

বাংলার জ্যোতিষক্ষেত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বক্তা এবং গণনাকার

ভৃগুজাতকের
১৯৭৪ কেমন যাবে
ও ভৃগুজাতক পঞ্জিকা

আগের আগের বর্ষের মত এবারেও ১৯৭৪ সালের রাষ্ট্রফল, ব্যক্তিগত রাশিফল, লগ্নফল, ইংরাজী মতে ভাগ্যনির্ণয় ও অন্যান্য যাবতীয় জ্যোতিষ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইল।

এই সঙ্গে আছে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিনের পঞ্জিকা অর্থাৎ অ্যালমানাক, শুভদিনের নির্ঘণ্ট প্রভৃতি। দাম : ২, টাকা, ডাকে ৩·৫০ টাকা

॥ জাল হইতে সাবধান ॥

ভৃগুজাতকের নামের অনুকরণে কোন কোন অসাধু ব্যক্তি খেলো ধরনের জ্যোতিষ-সংক্রান্ত গ্রন্থ, বর্ষফল চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। গ্রাহকগণকে নিবেদন, তাঁহারা যেন তাহাদের অভীষ্ট বইয়ের টাইটেলে 'ভৃগুজাতক' লেখকের নাম ও প্রতিকৃতি দেখিয়া লন।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
: ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অর্শরোগে যাঁরা ভুগছেন! অসহ্য চুলকানি আর যন্ত্রণা থেকে কয়েক মিনিটেই আরাম!

নতুন আবিষ্কার—বিনা অস্ত্রোপচারে অর্শের সঙ্কোচন করে!

নিউ ইয়র্ক – বিজ্ঞান এখন এক নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেছে—যাতে, খুব বাড়াবাড়ি রকমের অর্শ ছাড়া, সব অর্শ সত্যিই সঙ্কুচিত হয়ে সেরে যায়—অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। এই দিয়ে, একের পর এক বহু অর্শ-রোগীর "বিশেষ আশ্চর্য্য রকমের উন্নতি" হয়েছে বলে জানা যায় এবং একথা যে সত্যি তা' ডাক্তাররা পরখ ক'রে দেখে স্বীকার করেছেন। এতে অবিলম্বে জ্বালা-যন্ত্রণা ও চুলকানির উপশম হয়েছে, আর সত্যি-সত্যিই অর্শ সঙ্কুচিত হ'য়ে সেরে যেতে দেখা গেছে। বাস্তবিক, এটি এতই ফলপ্রদ ওষুধ যে ১০ থেকে ২০ বছরের পুরোনো রোগীরাও এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে বলেছেন, "অর্শ আজ আর কোনো সমস্যাই নয়।" এত ফলদায়ক, অথচ এই ওষুধ দেবার সময় এমন কোনো জিনিষ ব্যবহার করতে হয় না যা শরীর আচ্ছন্ন করে, কেননা মাদক কে বা পেশী সঙ্কুচিত ক'রে অসাড় ক'রে দেয়।

অর্শের এই নতুন ওষুধের নাম প্রেপারেশন এইচ* মলম। অর্শের সঙ্কোচন করা ছাড়া, প্রেপারেশন এইচ পিচ্ছিল করে, জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম করে এবং মলত্যাগের সময়ের যন্ত্রণা কমিয়ে দেয়। প্রেপারেশন এইচ, সমস্ত ওষুধের দোকানে অ্যাপ্লিকেটরসহ ৬০ গ্রাম ও আরো লাভজনক ৫০ গ্রাম টিউবে পাওয়া যায়।

অর্শ সম্বন্ধে বিনামূল্যে তথ্যপূর্ণ পুস্তিকার জন্যে আজই এই ঠিকানায় লিখুন—ডিপার্টমেন্ট TP-34 জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ, পোঃ অ. বক্স ১০১৩৩, বম্বে ৪০০০০১ পি আর।

*Regd. User of TM, Geoffrey Manners & Co. Ltd. | 116 PH-82 Ben

[illegible] এলো। [illegible] দিচ্ছে—সে গর্জন করছে। তাড়াতাড়ি বেশী অন্ধকার হলো। কি ভেবেছিলাম আর মনে পড়বে না। বসে আছি অপেক্ষায়। মদ, খাচ্ছি মাসে। হোৎকা কর্তাকে দেখছি। চত্বরের দিকে চেয়ে সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছি। এ সব কিছু বলছে মস্তিষ্ক, আবার উগরে দিচ্ছে বিস্নাগস্তরে।

এদিকে আমি, এই অন্ধকার স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছি। ঘুর্ণি লাগছে। ঘোরার ছেদ নাই রক্তে—এক বাড়িতে যা আমার অচেনা—এক রাস্তায় যার নাম সেই—পাশে এক কিশোরী ঘুমায় যার মুখও ভাল করে দেখিনি!

[illegible] শহরের রাস্তায় [illegible] চারদিক থেকে আমার উপর ভেসে এলো ধূসর অন্ধকার—আর মাঝে মাঝে আলোর মানুষদের দেখছি—সেই আলোর জীবন্ত মুখ যেমন দেখায়।

আর কোথায় ঢুকে ভাল অন্নপান করলাম। দোকানের কাউন্টারের পেছনে বাস্ত গম্ভীর স্ত্রী মূর্তির দিকে অসহায় ভাবে চাইলাম। পয়সা গুণলাম, আবার অন্ধকারে মিশে গেলাম।

ভাবলাম এই জীবন আমার সত্যকারের জীবন নয় এ খেলা মাত্র—তাও ভাল করে হচ্ছে না। একেবারে গম্ভীর অন্ধকার হয়ে এলো, গরমের দেশের শহরের উপর স্বচ্ছ [illegible]

[illegible] একটা মূর্তি [illegible] অস্পষ্ট দেখতে পা[illegible] ছলছল করছে চোখ। [illegible] কালো হবে, কি অন্ধকারে ঠেকছে কটা রং।

ক্ষীণকায়ের শুভ্রতা, গোল মুখের ঠোঁট

॥ গ্রন্থপ্রকাশের সশ্রদ্ধ নিবেদন = বাংলা সাহিত্যের দুই দিক্‌পালের রচনাবলী ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

রচনাবলী

॥ দেবতাত্মা হিমালয়, হাসুবানু, বিবাগী ভ্রমর, বেনোয়ারী, মহাপ্রস্থানের পথে, জনম জনম হম, উত্তর হিমালয় চরিত, বনস্পতির বৈঠকে ইত্যাদি বিভিন্ন রচনা সহ আনুমানিক দশ খণ্ডে প্রকাশিত হবে॥

মনোজ বসুর

রচনাবলী

॥ নিশিকুটুম্ব, ভুলি নাই, বন কেটে বসত, রূপবতী, মানুষ গড়ার কারিগর, বনমর্মর, চীন দেখে এলাম, জলজঙ্গল, পথ কে রুখবে? ইত্যাদি বিভিন্ন রচনা সহ আনুমানিক দশ খণ্ডে প্রকাশিত হবে॥

নিয়মাবলী:—প্রতিটি রচনাবলীর জন্য ৫, টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। দুটির জন্য ১০, টাকা। যাঁরা দুটির গ্রাহক একসঙ্গে হবেন বিনামূল্যে তাঁদের বই উপহার দেওয়া হবে। শুধুমাত্র গ্রাহকরা শতকরা ২০, টাকা হারে কমিশন পাবেন। জমা টাকা শেষ খণ্ডের সঙ্গে কাটা যাবে। গ্রাহক হবার জন্য টাকা পয়সা শুধুমাত্র আমাদের ঠিকানায় পাঠাবেন। কলকাতার বাইরে যাঁরা, তাঁরা M.O. করে অথবা Postal Order অথবা Bank Draft পাঠাতে পারেন।

বশেষ উপহার: যাঁরা ১০, টাকা দিয়ে দুটি রচনাবলীর গ্রাহক হবেন, তাঁদের আমাদের পছন্দমতো লিস্ট থেকে ৩, থেকে ৪, টাকার বই বিনামূল্যে উপহার ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৩ পর্যন্ত সীমিত-সংখ্যক গ্রাহককে দেওয়া হবে।

কেন গ্রাহক হবেন: এই দুজন লেখকের বিভিন্ন উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি আলাদা কিনতে গেলে ৩০০, টাকার উপর লাগবে প্রত্যেকের জন্য। রচনাবলীতে দশ খণ্ডে আনুমানিক ১৫০, টাকায় এবং তার উপর ২০% কমিশন বাদে কত পড়ছে হিসাব করুন। বর্তমানে যে হারে টাকার মূল্য কমছে, সে তুলনায় আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহ মূল্যবান ও রুচিশীল করে তুলুন।

॥ **বিভিন্ন পুস্তক প্রতিষ্ঠান যাঁরা আমাদের হয়ে গ্রাহক সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, নিয়মাবলীর জন্য যোগাযোগ করুন।**॥

গ্রন্থপ্রকাশ, C/o. বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ (ফোন: ৩৪-৩৮২৫)

রি সিস্টেম দেখুন
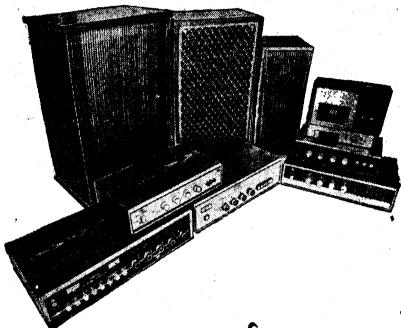
তারপর কসমিক শুনে

একটাই কিনুন

আপনি হয়ত একটি স্টিরিও সিস্টেম কেনার কথা ভাবছেন। বাজারে আপনি বেশ ভাল ভাল স্টিরিও পাবেন. তার মধ্যে কসমিক একটি যে নাকি দাম নিয়ে সব সেরাটি দেবে। সব কয়টি দেখুন, শুনুন, কসমিকও, কিন্তু আমরা বলতে পারি আপনি বেছে নেবেন—**কসমিক**।

আমরাও অনেক টেকনিক্যাল ডেটা দিতে পারি

যা যাচাই করলে বিফল হবেন না।

কিন্তু আমরা মনে করি উৎকর্ষের বিচার হবে এর ধ্বনি শোনার পর। আপনার কানই বিচার করবে। আমরা নিশ্চিত আপনার রায় **কসমিক**।

আমাদের স্টিরিও সম্বন্ধে অত্যুক্তি করতে আমরা রাজি নই। আমরা জানি কসমিক শুনে অত্যুক্তি যা করবার তা আপনিই করবেন।

আর কত রকমেরই আছে! প্রতি সঙ্গীতপ্রেমিকের রুচি অনুযায়ী কসমিক স্টিরিও সিস্টেম পাওয়া যায়।

COSMIC RADIO 9B, Mahal Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (East). Bombay-400 093 TEL: 573361/62 GRAMS: SOLID STATE

পার্ক স্ট্রীট : হারমান হাউস, লুগেন্স ইস্টার্ন ইলেকট্রিক অ্যান্ড ট্রেডিং কোং। **এসপ্লানেড :** সি সি সাহা, রেডিও অ্যান্ড অ্যালায়েড স্টোর্স। **নিউ মার্কেট :** রেডিও ডিস্ট্রিবিউটরস, ব্যামাবনো। **বিবেকানন্দ রোড :** বসন্ত ট্রেডিং কোং। **গড়িয়াহাট :** ব্যামাবনো।
বাংলা সংক্রান্ত খোঁজখবরের জন্যে যোগাযোগ করুন : শ্রীঅরিন্দম দত্ত, ১২৮/১৮ হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬।

নিশ্চয়ই সকাল হবে—সেও অন্ধকারে দেখছে বিবর্ণ ধূসর!

'সুখ'কে বললাম 'এসো'। তার বাহু ধরেছি, পুরুষভাবের ঠেকছে। আমাদের হাতের তেলো জড়িয়ে গেছে। পরস্পরের অঙ্গুলিগুলি আমাদের আবদ্ধ হয়েছে—অজানা শহরের অজানা রাস্তায় চলেছি দুজনে।

এই ঘরে ঢুকলাম—বললাম—আলো, জেবলো না।

সারা শরীর বাঁধনহারা হয়ে ঘুরে পড়লো অন্ধকারে। অন্ধকারে ঠেকছে এক কান্নাভরা মুখ—আর তলিয়ে গেলাম আমি কোন পাতালপুরীতে—সিঁড়ি বেয়ে যেন গড়িয়ে নামছি—ঘুর লাগছে—ভেঙেচুরে এক ধাপ বেয়ে পড়ে যাচ্ছি অসীম অতলে—আরও আরও নীচে নতুন করে!

স্মৃতি বলছে ঘটেছিল এসব। এখন, এই বালিশে মাথা রেখে এই ঘরে আমি শোওয়া—সে আমার পাশে, তবু তার নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনছি না এখতে সতেজ সুন্দর শিশুর মতো ঘুম দিচ্ছে—ভাবনা তবে কি শুধু মস্তিষ্ক রয়ে গেছে আমার।

মাঝে মাঝে নিথর হচ্ছে অন্ধকারের স্রোত। মনে আশা হচ্ছে—জেগে উঠবে—পায়ের সাড়া মিলবে—শুনবো কানে—প্রাণে পাব গন্ধ—শুধু কেবল চিন্তা নিয়েই বাঁচছি না! আস্তে নীরবে, আশা বাড়াচ্ছে আমার কাছে যাচ্ছে। আনছে আঁধারের ঘূর্ণি, আমার অসহায় শরীরকে অনন্ত সীমাহীন অতলে ঠেলে দিচ্ছে। মন বলছে, আরও রাত্রির শেষ আছে, আবার দিন হবে। ভাবছি আবার কাঁদব হাসব চুম্বন করবো—মনে চুমুক দেবো—আবার প্রার্থনা করবো। শুধু কি মস্তিষ্ক নিয়ে এ প্রার্থনা হবে। যখন ঠিক বুঝলাম জেগেছি, সেই আঁধার রাতে নরম বালিশের পাশে হাসনুহানার কিশোরীও জাগলো। সব বুঝছি তবু ভাবছি—মরে যাই নি তো?

মনে হচ্ছে এইবার ভোর হয়ে এলো, উষার নিঃশব্দে আসে। ধীরে ধীরে বাড়ছে—এত ধীরে যে তা বোঝাই যায় না। বরং প্রথমে মনে হবে বুঝি ভুল করছি। পৃথিবী গহ্বর থেকে মানুষ তো বুঝতে পারে না সত্যি ভোর হল। সুদূর দিক-চক্রবালে নরম মৃদু আলোর রেখা দেখে মানুষ ভাবে ভুল হচ্ছে, ক্লান্ত চোখের উত্তেজনায়, কেউ হয় জানালো আলোর এ বুঝি প্রতিচ্ছায়া।

তবু, সত্যি ভোর হলো। এবার বেশ আলো ফুটেছে। চক্রবালে আলোর বিবর্ণ রূপ উজ্জ্বল হয়েছে। বুঝি এবার সকাল হবে।

হঠাৎ মনে হলো জমে যাচ্ছি যে! রোদের উপর ঢাকা লেপ সরে গিয়েছে—

মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস	॥	ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখো	১৮,
বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য	॥	ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ	১৫,
সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ	॥	ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যো	৯,
চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব	॥	ডঃ মনীগোপাল গোস্বামী	১২,
প্রাচীন নাট্য প্রসঙ্গ	॥	অবন্তীকুমার সান্যাল	৭,
স্বামীজী-স্মৃতি সঞ্চয়ন	॥	স্বামী নির্লেপানন্দ	৫,
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনালোকে	॥	ঐ	৭,

করুণা প্রকাশনী ॥ ১৮/এ টেমার লেন, কলকাতা-৯

(সি ১০০৯/২)

সুখময় মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় ৮·০০

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য আনুমানিক ৭০০ থেকে সুরু করে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ সময়ের মধ্যে যে সব কবি বাংলা-সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন অথবা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের পরিচয় প্রদান ও আবির্ভাবকাল নিরূপণ। এর সাতটি অধ্যায়ে যথাক্রমে চর্যাগীতিকার গোষ্ঠী জয়দেব, লক্ষ্মণসেন সংবৎ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস এবং মালাধর বসু, সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়েই এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করে এবং পূর্ব-সূরীগণের মতের বিচার করে সত্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে কৃত্তিবাসের ছাত্রজীবন, রামায়ণ রচনার ইতিহাস ও সম্ভাব্য জন্মতারিখ সম্বন্ধে নতুন তথ্যের সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবরাগ ৭·০০

ভারতী বুক স্টল ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

(সি ৪৯৭৯)

শঙ্করনাথ রায় ভারতের সাধক

১ম হইতে দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

এই লেখকের ভারতের সাধিকা ১ম ও ২য় ১০,

বন্যা এলো শক্তিপদ রাজগুরু ॥ ১২,

দুঃস্বপ্ন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৭,

ভক্তিগীতিমাধুরী কাজী নজরুল ইসলাম ॥ ৮,

ধানের শীষে শিশির	॥	মহাশ্বেতা দেবী	॥	১০,
বিলাপী কিন্নর	॥	সম্রাট সেন	॥	৯,
রাজধানী এক্সপ্রেস	॥	নিমাই ভট্টাচার্য	॥	৪,

প্রকাশিত হল শঙ্করনাথ রায়

সাধুসন্তের মহাসঙ্গমে ১০,

করুণা প্রকাশনী ॥ ১৮/এ টেমার লেন, কলকাতা-৯

(সি ১০০৯)

দুটি 'পা'-ই বেশ ঠাণ্ডা—সত্যি ঠাণ্ডা লাগছে এবার। দীর্ঘ নিঃশ্বাস, তারো ছোঁয়াচ লাগলো নিজের চিবুকে। ঝুকে হাতড়ে পা ঢাকলাম। আবার হাত দুটি পেয়েছি—নিজের পা ও নিঃশ্বাসের স্পর্শও পাচ্ছি যে।

মাটির থেকে হাতের মুঠোতে প্যান্ট কুড়িয়ে তুলেছি। খস খস করে উঠলো পকেটের দিয়াশলাই। পাশ থেকে এলো তার স্বর, 'আলো জেলো না, মিনতি করি—' আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনি।

'সিগারেট ধরাবে?' মৃদু প্রশ্ন করি। উত্তর হলো, 'হ্যাঁ'।

শলা-র আলোতে একেবারে হলুদ দেখাচ্ছে তাকে। ঠোঁটও হলুদ—গোল ও ভয়ার্ত কালো চোখ—পাতলা হলদে বালির রাশ—দেহ যেন, আর চুল যেন কালো মধু। এবার কথা বলা শক্ত! কিভাবে শুরু হবে! দুজনে কান পেতে কালের গতি শুনছি, পল-বিপলের অদ্ভুত সুন্দর মৃদু রেশ—উঠে অল্প সময় পরে আবার থেমে যাচ্ছে।

'কি ভাবছ?' হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো। নরম সুর কিন্তু ঠিক লাগ-সই, স্রষ্ট হল না লক্ষ্য। ভেতরে আমার বাঁধ ভাঙল—তড়া-তাড়ি নিবে-যাওয়া কাঠির আলোয় আর একবার তার মুখ দেখার আগেই কথা বলে যাই।

"ভাবছি, সত্তর বৎসর বাদে কে এখানে শুয়ে থাকবে—এই অর্ধ-বর্গ মিটর জমিতে—বসবে বা ঘুরবে কে—সে কি তোমার আমার কথা জানবে? কিছুই না, শুধু জানবে যুদ্ধ হয়েছিল।"

সিগারেট পোড়া শেষ-আগা দুজনে মাটিতে পাশে ফেলেছি—নিঃশব্দে আমার প্যান্টের উপর পড়লো, ঝেড়ে ফেললাম তাড়াতাড়ি। ছোট দুটি টুকরো লাল-প্রভায় পাশাপাশি রইল।

আরও ভাবি সত্তর বৎসর আগে—এখানে কি ছিল—কেউ ছিল কি? হয়ত চাষের মাটিতে জন্মাত ভুট্টা কি পিঁয়াজ, আমাদের মাথার দু মিটার নীচে। বাতাস বয়ে যেত তার উপর, আর প্রতিদিন সকালে পোস্তার উপর এইভাবে ভোরের আলো ফুটতো। কিংবা হয়ত তখন কেউ বাড়ি করেছিল—এইখানে।

'হ্যাঁ' আস্তে বললে সে। 'সত্তর বছর আগে তখন বাড়িই ছিল মনে হয়। ঠাকুর-দাদা এ-বাড়ি করেছিলেন। রেলে কাজ করতেন—আর পয়সা জমিয়ে তুলেছিলেন এই ছোট-বাসা। তারপরে যুদ্ধ বাঁধলো—জান তো—১৯১৪—রুশ দেশে মারা পড়লেন তিনি। তারপর বাবা—তাঁর কিছু জমি ছিল। তিনিও রেলে কাজ করতেন—এই যুদ্ধের মধ্যেই মারা গেছেন তিনি। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে? না, মরে গেলেন—মা আগেই চলে গেছলেন—এখন ভাই-বউ আর তার ছেলে-মেয়ে নিয়ে আছে—৭০ বছর বাদে আমার ভাইয়ের নাতিরা থাকবে এখানে।'

'সম্ভব। তবে তারা তোমার আমার বিষয় কিছু জানবে না।'

'না, কোন মানুষ জানবে না তুমি আমার কাছে ছিলে!' তার ছোট নরম হাত-খানি ধরে আনলাম আমার মুখের সামনে। যেখানে জানলা সেখানে একটুকরো আঁধার তবে রাতের থেকে অনেক পাতলা—এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ অনুভব করলুম আমার কাছ থেকে সরে গেছে সে আমাকে না ছুঁয়েই।

● স্যানজাইম নিলে সব খাবার হজম হয়ে যায় আর শরীরের সঙ্গে মিশে যায় আর খিদে বাড়ে।
● স্যানজাইমে রয়েছে ফেনা তৈরী হতে দেয়না এমন একটি বিশেষ উপাদান। তাই বায়ু ও ব্যথা দূর হয় নিমিষে।
● স্যানজাইম এক মুহূর্তে অম্লের উপশম করে।

আজই স্যানজাইম পরখ করুন। মাত্র ৪৯ পয়সায় ৪টি ট্যাবলেটের নতুন প্যাক পাবেন

ভালো হজম মানে ভালো স্বাস্থ্য
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যাসহ পুস্তিকা অনুরোধক্রমে পাওয়া যায়, সব সম্ভ্রান্ত দোকানে পাবেন।

ইউনি-স্যানক্যো লিঃ
বোম্বাই-৪০০০২৬

PRATIBHA 1215-11-BEN

ডিস্ট্রিবিউটর : দেশ' প্রিমিয়ার র‍্যাডিক্যাল ম্যাগাজিন অ্যান্ড স্টোর্স', ৪৪, এজরা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল : অমর কথাশিল্পী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ উপন্যাস

শতাব্দীর মৃত্যু

প্রথম খণ্ড

পনের টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল : শুদ্ধসত্ত্ব বসু-র

রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায় ১৪·০০

এই গ্রন্থে কবিগুরুর 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সমস্ত কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতার তাৎপর্যপূর্ণ বিশদ আলোচনা। প্রথম খণ্ড : ১৬·০০

সাধন চৌধুরী
লণ্ডনে ললিতা লাহিড়ী
দাম : সাত টাকা

রঞ্জন সেন
এক দিন অনেক রাত
দাম : পাঁচ টাকা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বাধীনতার স্বাদ ৮·০০
শহরতলি ৯·০০

ইন্দ্রজিৎ সেন
তোমার দেশ আমার দেশ ১৫·০০
আরব-কাঁটা ইজরায়েল ১২·০০

নারায়ণ সান্যাল
ওপার বাংলার আগে ১৪·০০

চিরঞ্জীব সেন
ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা ৬·০০

সম্রাট সেন
মহানগর বাদশানগর ১০·০০

সঞ্জয় সেন
নেপাল থেকে ৬·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ফরিয়াদ ৫·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিশিপদ্ম ৬·০০

শক্তিপদ রাজগুরু
বিক্ষোভ ১২·০০

বিশ্বনাথ বসু
অশান্ত অরণ্যে ৬·০০

ত্রিলোচন কলমচী
নাচের পুতুল ৮·০০

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
পূর্বাভাস ১২·০০

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯।

প্রজনন সম্পর্কিত

রতনলাল ব্রহ্মচারী

বাঁ দিকে : ডিম্বাকার আধারের মধ্যে শামুকের প্রোকোফোর। ডান দিকে : প্রায় পূর্ণাঙ্গ শামুক ভ্রূণ

[প্রজনন রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীরা এখন নানা রকমের প্রাণী নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভ্রূণ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ওই একই উদ্দেশ্যে যে প্রাণীটি বেছে নিয়েছেন, সেটি পশ্চিমবঙ্গেরই একটি প্রাণী—শামুক। বর্তমান প্রবন্ধ তারই প্রতিবেদন]

একটি বীজ থেকে একটি বিশাল বৃক্ষ, একটি ডিম থেকে একটি প্রাণীর উদ্ভব! সর্বকালের দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর মনে এই অতি স্বাভাবিক ঘটনাগুলি নিয়ে এসেছে অসীম রহস্যের ইঙ্গিত। কি করে আকারহীন খানিকটা হলদে-সাদা বস্তুপিণ্ড ডিমের খোলার মধ্যে আস্তে আস্তে একটি পাখীতে রূপান্তরিত হয়, গড়ে ওঠে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিস্তৃত স্নায়ুজাল, শিরা-ধমনীর নালিকা, গতিশীল রক্ত-কণিকা, স্পন্দনশীল হৃদযন্ত্র?

জীবদেহ যে বহু কোষের সমষ্টি এই আবিষ্কারের পর প্রশ্নটা দাঁড়ালো এইরকম - একটি ফার্টিলাইজড় ডিম্বকোষ কি আশ্চর্য শৃঙ্খলার সঙ্গে বিভাজিত হয়ে দুটি, চারটি—শেষে শত লক্ষ কোষের এক অপরূপ বিন্যাস সৃষ্টি করে! একটিমাত্র ডিম্বকোষ থেকে সহস্র ধারায় বিভিন্নরকম কোষের উৎপত্তি হতে লাগলো। এতটা 'সংবাদ' কিভাবে নিহিত ছিল সেই আদি-কোষে, আর কি করেই বা সেই সংবাদের বাহ্যপ্রকাশ ঘটছে?

আজকের দিনে জানা আছে এই সংবাদ রয়ে গেছে কোষের ডি এন এ অণুর মধ্যে; তাই এমব্রয়োলজির (বা ভ্রূণতত্ত্বের) মূল প্রশ্ন হলো কি করে এই সংবাদ ভ্রূণ বিকাশের পর্যায়ে সুশৃঙ্খলভাবে আত্ম-প্রকাশ করে।

১৯৬৩ থেকে দু চার বছরের মধ্যে হস্, মনরয় সিপরিন, ব্রাউন ইত্যাদি বিজ্ঞানীরা জীবরসায়নবিদদের জেনেটিক কোড আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে ভ্রূণতত্ত্বে এক নবযুগের সূচনা করলেন। সেই চির-পুরাতন সমস্যাগুলি—ডি এন এ, আর এন এ এবং প্রোটিন বায়োসীনথেসিসের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করা হল।

বর্তমান প্রবন্ধকারের গবেষণা প্রধানত জলজ শামুকের ওপর। প্রথম কোষ-বিভাজনের আগে থেকে প্রায় পূর্ণাঙ্গ শামুকের ভ্রূণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে আর-এন-এ সীনথেসিস দেখা হয়েছে। খুব বেশী পরিমাণ আর-এন-এ তৈরী হয় প্রোকোফোর নামক ভ্রূণের একটি বিশেষ অবস্থায়। এ পর্যায়টি শামুকের একটি বৈশিষ্ট্য। এ অবস্থায় ভ্রূণটি তার ডিম্বাকৃতি কনটেনার বা ক্যাপসুলের মধ্যে চরকীবাজীর মত ঘুরতে থাকে, নিউট্রাল-রেড নামক রঞ্জক পদার্থের সাহায্যে লাল রং করে নিলে চমৎকার দেখায় অনুবীক্ষণের তলায়। এই পর্যায়ে তৈরি আর-এন-এর একটা বড় অংশ মাঝারি আকারের আর-এন-এ। নানা কারণে মনে হয় এগুলি বার্তাবহ আর-এন-এ যার অনেকটা কাজ (অর্থাৎ প্রোটিন তৈরী) পরের পর্যায়ে (ভেলিগার) করা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, আর এন এ প্রধানত তিন রকমের। তাদের মধ্যে একরকম মাঝারি আকারের অণু ডি এন এ থেকে কী ধরনের প্রোটিন সংশ্লেষিত হওয়া দরকার তার উপর সংবাদ নিয়ে আসে। এদেরকেই বলা হয় ট্রান্সফার বা বার্তাবহ আর এন এ। ভেলিগার পর্যায়ে বিপুল পরিমাণ প্রোটিন সীনথেসিস হচ্ছে। এটি খুবই স্বাভাবিক, কারণ এসময় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্রুত গঠিত হতে থাকে। কিন্তু দেখা গেল এ সময়ে আর এন এ সীনথেসিস বেশ কমে যায়। আবার অ্যাকটিনোমাইসিন নামে একপ্রকার অ্যান্টি-বাওটিকের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে প্রোকোফোরের আর-এন-এ সীন-থেসিস বন্ধ করে দিলে সে প্রোকোফোর আর কখনই ভেলিগার হতে পারে না। দেখা গেল অ্যাকটিনোমাইসিন প্রয়োগের ফলে মাঝারি আকারের আর-এন-এ সীনথেসিস সব চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। অতএব এই আর-এন-এর সঙ্গে ভেলিগার পর্যায়ের প্রোটিন সীনথেসিসের একটি কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয়।

বিভিন্ন পর্যায়ে বার্তাবহ ছাড়াও অন্যান্য আর-এন-এ যেমন, রাইবোসোমাল এবং ট্রান্সফার আর-এন-এর সংশ্লেষণ দেখা

'বিজ্ঞানীরা নিজেদের গবেষণা সম্পর্কে নিজেরাই বাংলা ভাষায় কিছু লিখুন।' সম্প্রতি কয়েকজন বিজ্ঞানীর কাছে এমন একটি প্রস্তাব রাখায় আমরা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য দুটি। এক, বাংলা রচনার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করা। দুই, কোথায় এবং কে কী ধরনের গবেষণা করছেন অথবা অনুরূপ গবেষণা কোথায় হচ্ছে সে সব সম্পর্কে 'দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের অবহিত করা। এ ব্যাপারে সমস্ত বিজ্ঞানীর কাছে আমাদের আমন্ত্রণ রইল। রচনা ৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সম্ভব হলে সচিত্র। উপযুক্ত রচনা বিশ্ব-বিজ্ঞান বিভাগে প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক, দেশ

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

বুদ্ধদেব বসু, যদিও মুখ্যত কবি, তথাপি সাহিত্যের সকল শাখারই তাঁর সৃষ্টির স্বাক্ষর বর্তমান। গোলাপ কেন কালো তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির অন্যতম। এক স্বপ্নবিলাসী যুবকের নিঃশেষ নিঃসঙ্গ এক প্রৌঢ়ে বিবর্তিত হওয়ার এক বিষাদঘন ট্র্যাজেডি এই কাহিনী ॥

বুদ্ধদেব বসুর

গোলাপ কেন কালো

দাম ৫·০০

এই লেখকের অন্যান্য বই :

সংক্রান্তি প্রায়শ্চিত্ত ইক্কাকু সেন্সেই ৪·০০ অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ ৫·০০ পুনর্মিলন ৪·০০ বিপন্ন বিস্ময় ৮·০০ কালসন্ধ্যা ৩·০০ কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ ৫·০০ তুমি কেমন আছো ৬·০০ তপস্বী ও তরঙ্গিণী ৩·০০ ॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

হয়েছে। এ-ছাড়াও এক রকম বড় আকারের আর-এন-এর সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু এর প্রকৃতি অর্থাৎ দেহকোষে এর কাজ এখনও অজানা।

কিন্তু ভ্রূণের দেহগঠন বা প্রাণীর উদ্ভব হতেই পারে না যদি প্রথম কোষটি (ফার্টিলাইজড্ ডিম্বকোষ) ক্রমাগত বিভাজন না করত। কোষ বিভাজনের প্রাথমিক ব্যাপারটাই কিন্তু অনেক পরিমাণে অজ্ঞাত। কি কারণে কোষটি একটি বিশেষ সময় বিভাজিত হয়, তার আগে বা পরে নয়? বিভাজনের সময় বা তার আগে বা পরে, কোষের রাসায়নিক পদার্থগুলির কি পরিবর্তন বা সীনথেসিস ঘটে? সাধারণত বিভাজনের সঙ্গে সীনথেসিস-ক্রিয়াগুলি থেমে যায়।

শামুকের ডিমের প্রথম কয়েকটি কোষ-বিভাজনের সময় দেখতে পেয়েছি আর-এন-এ সীনথেসিস বিশেষ নিয়মে বাড়ছে কমছে। এই হ্রাসবৃদ্ধি একেবারে প্রথম থেকেই, অর্থাৎ প্রথম কোষবিভাজনের পূর্ব-মুহূর্ত থেকেই আছে। (আরও পেছনে চলে গেলে প্রশ্ন হচ্ছে ফার্টিলাইজড্ হওয়ার আগে এবং অব্যবহিত পরেই আর-এন-এ সীনথেসিস কি রকম? আমার সহযোগী শ্রী পি কে তপস্বী এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছেন।)

আবার সালফার-যুক্ত একটি বা একাধিক পদার্থ অতি উল্লেখযোগ্যভাবে কোষ-বিভাজনের সময় হ্রাস-বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখতে পেয়েছি। এ পদার্থের খানিকটা প্রোটিন, বেশীর ভাগই প্রোটিন নয়। (আমার ছাত্র শ্রী ডি ঘোষাল দেখিয়েছেন এ জিনিসটা অ্যাসিড ম্যাকোপলি স্যাকারাইড)। এই সব পদার্থের হ্রাসবৃদ্ধি কি কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করে না কি এগুলি সেই বিভাজনেরই ফল মাত্র, —এ প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা।

বিজ্ঞান সংবাদ

থুম্বা থেকে

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং 'নাসা' পারস্পরিক সহযোগিতায় কিছুদিন আগে থুম্বার উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে পৃথিবীর অয়নমণ্ডলে চারটি রকেট উৎক্ষেপ করেছিল। উদ্দেশ্য, ওই অঞ্চলে যে সব বস্তুকণা অণু, পরমাণু এবং বিশেষ করে অয়নিত অবস্থায় ভাসমান থাকে তাদের রাসায়নিক কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া। তাদের কোনটির অয়নের পরিমাণ বেশি, কে কার সঙ্গে বিক্রিয়া করে বেশি-মাত্রায়, ওই বিক্রিয়ায় অয়নমণ্ডলের কোন ভৌত পরিবর্তন হয় কী না, এ সব সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ। ভারতীয় বিজ্ঞানী-দের সহযোগী হিসেবে অংশ গ্রহণ করে-

বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী
দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। দাম : ১৮·০০; ১ম খণ্ড ২০·০০
যারা পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁরা ২০% কমিশন পাবেন।

শংকর-এর
এপার বাংলা ওপার বাংলা ১৯শ মুদ্রণ ১০.০০ চৌরঙ্গী ২৪শ মুদ্রণ ১২.৫০
সার্থক জনম ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ৬.০০ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ২২শ মুদ্রণ ৬.০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের পৌষ ফাগুনের পালা ৫ম মুদ্রণ ১৮.০০
নিমাই ভট্টাচার্যের উইং কমাণ্ডার ২য় মুদ্রণ ৬.০০

বিমল মিত্রের এর নাম সংসার ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ১০.০০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর গল্পসম্ভার দাম : ১৬.০০ অসবর্ণ নতুন উপন্যাস ৫.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
বিদূষক দাম : ৪.৫০ আলোকপর্ণা ২য় মুদ্রণ ১০.০০ উপনিবেশ ৩ খণ্ড একত্রে ৮.৫০

বনফুলের অধিক লাল ২য় মুদ্রণ ৪.৫০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশিপদ্ম ৯ম মুদ্রণ ৪.৫০ ব্যর্থ নায়িকা ২য় মুদ্রণ ৪.৫০

অতুলপ্রসাদ সেন ১০·০০ ॥ সুরেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত
দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১৬·০০ ॥ ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়
ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ ১২·০০ ॥ দিলীপকুমার রায়
ভবঘুরে ও অন্যান্য ৬·৫০ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী
বিশ্ববিবেক ১২·০০ ॥ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর ও শংকরীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত

ওংকার গুপ্তের ব্যাপার বহুতর সচিত্র বই রচনা ৫.০০
চাণক্য সেনের তিন তরঙ্গ ৩য় মুদ্রণ ৭.০০ শুধু কথা ২য় মুদ্রণ ৩.৫০

নমিতা চক্রবর্তীর অহল্যা রাত্রি দাম : ৯.০০
ননীমাধব চৌধুরীর আবির্ভাব দাম : ১০.০০
মনগোপাল দাসের দুই নারী দাম : ৬.০০

কয়েকখানি নাটক
বিমল মিত্রের একক দশক শতক ৩·০০ নাট্যরূপ : দেবনারায়ণ গুপ্ত
গঙ্গাপদ বসুর নতুন নাটক অপমানিত ৩·৫০
সাহেব বিবি গোলাম ৩·০০ নাট্যরূপ : বৈদ্যনাথ ঘোষ
দেবনারায়ণ গুপ্তর দাবী ৩, শর্মিলা ৩, সীমা ৩·৫০
রতনকুমার ঘোষের সম্রাট ২·২৫ ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র-র লেবেডেফ ২·৭৫ ধনঞ্জয় বৈরাগীর সৈনিক ২·৫০

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

ছিলেন 'নাসার গডডারর্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের দুজন বিজ্ঞানী এ সি আইকিন এবং আর এ গোল্ডবার্গ। থুম্বের রকেট উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে মোট চারটি রকেটের দুটি দিনের দিকে এবং দুটি রাতের দিকে ঊর্ধ্বাকাশে ই-স্তরের দিকে পাঠান হয়েছিল। রকেটের উপর কিছু ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরি এবং কিছু মার্কিন বিজ্ঞানীদের তৈরি যন্ত্রপাতি বসান ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে, সাধারণত পৃথিবীর প্রায় ১০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বাকাশে ই-স্তরের অবস্থান। অবশ্য অঞ্চল বিশেষে এই দূরত্বের কিছুটা পরিবর্তনও ঘটে। এই স্তরটিকে কখনও কখনও কেনেলি-হিভসাইড স্তরও বলা হয়। আয়নমণ্ডলে অবস্থিত এই স্তর সব সময় তড়িৎ-আহিত বা 'ইলেকট্রিকেলি চার্জড' অবস্থায় থাকে এবং বেতার তরঙ্গ এই স্তরেই প্রতিফলিত হয়। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে, এই স্তরে সব চাইতে বেশি পরিমাণ যে সব বস্তু পাওয়া যায় তাদের পর্যায়ক্রমে প্রধান অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরমাণু এবং অণুর আয়ন। এ ছাড়াও ওই স্তরে আরও কোন মৌল পদার্থের

অণু পরমাণু অথবা মূলকের আয়ন পাওয়া যায় কী না গত কয়েক বছর ধরে তাদের অনুসন্ধানের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রকেটের সাহায্যে অনুসন্ধান চালান হয়েছে।

থুম্বা থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী পর্যালোচনা করে সম্প্রতি অ্যাইকিন এবং গোল্ডবার্গ জানিয়েছেন, থুম্বার আকাশের ই-স্তরে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি ছাড়াও বেশ কিছু পরিমাণ ধাতুর অয়নেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। তথ্যগুলি সরবরাহ করেছিল থুম্বা থেকে উৎক্ষেপ করা চারটি রকেট। বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য, পৃথিবীর চৌম্বক-নিরক্ষ রেখা বরাবর ই-স্তরে ধাতুর-অণুপরমাণুর অস্তিত্বের আবিষ্কার এই প্রথম ঘটল। মধ্য অক্ষাংশ বরাবর অঞ্চলে এর আগে অবশ্য কিছু কিছু ধাতুর পরমাণু অ-অয়নিত অথবা অয়নিত উভয় অবস্থাতেই পাওয়া গেছে। কিন্তু তুলনায় থুম্বার আকাশে যতটা পাওয়া গেছে তার পরিমাণ অনেক বেশি।

সাম্প্রতিক এই গবেষণায় জানা গেছে, দিনের দিকে ওই অঞ্চলে যে সমস্ত অয়ন সবচাইতে বেশি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে আছে ধনাত্মক তাড়িৎ আহিত বা পজিটিভলি চার্জড নাইট্রিক-অক্সাইড-মূলক অয়ন এবং অক্সিজেন অণুর অয়ন। ৯০ থেকে ১২৫ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে এই সব অণু এক এক জায়গায় এক এক মাত্রায় ছড়িয়ে রয়েছে। কোথাও অদ্ভুত রকমের বেশি। কোথাও কম। ধাতুর অয়ন সব চাইতে বেশি পাওয়া গেছে ৯২ কিলোমিটার ঊর্ধ্বাকাশে। প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ৪০০টি অয়নের মত। গবেষকদের ধারণা ধাতব অয়ন এবং নাইট্রিক অকসাইড ও অকসিজেন অণুর অয়ন পরস্পরের মধ্যে অয়নের বিনিময় ঘটায় এবং ক্ষরিত হয়ে যায়।

ওঁদের প্রশ্ন করা হয়েছিল : ঠিক কোন ধাতুর সন্ধান আপনারা অয়নমণ্ডলে পেলেন?

উত্তর : সবচাইতে বেশি ম্যাগনেসিয়াম এবং লোহা। এছাড়া কম বেশি সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম। কিছুটা সিলিকনও পাওয়া গেছে।

গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন, ধাতুর অয়নগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর যে অণু সৃষ্টি করে সেই সব অণুর চেয়ে তাদের নিজস্ব আণবিক অবস্থার স্থায়িত্ব অয়নমণ্ডলে সব চাইতে বেশি। কখনও এক লক্ষ গুণেরও বেশি হয়ে থাকে। ঊর্ধ্বাকাশের বিদ্যুৎ প্রবাহ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর এদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে তৎপর।

প্রশ্ন : এই তৎপরতা বলতে আপনারা কী

উত্তর : যেমন ধরুন এর ফলে অয়নমণ্ডল থেকে ধাতুর অয়নিত একটি স্তর স্রোতের মত নিচের দিকে নামতে থাকে। রাতের দিকে দিনের তুলনায় ওই স্রোতের পরিসর প্রায় অর্ধেকের মত কমে গিয়ে তিন কিলোমিটারের মত হয়। এটা অবশ্য থুম্বা অঞ্চলের ঘটনা। নামার সময় এই স্রোতের গতিবেগ থাকে সেকেণ্ডে এক মিটারের মত। চলে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে। বলতে কি, রাতের দিকে অয়নমণ্ডলের ই-স্তরে ধাতব-অয়নের পরিমাণই থাকে সব চাইতে বেশি। পৃথিবীর অন্যান্য অক্ষাংশেও নিশ্চয় এ ধরনের ব্যাপার ঘটে থাকে।

প্র : ঊর্ধ্বাকাশে ধাতব অয়ন সৃষ্টির মূলে কাজ করে কে?

উত্তর : এক, সৌর বিকিরণ। ওই বিকিরণই সালোক-অয়নিতকরণ বা ফোটো-আইওনাইজেশন পদ্ধতিতেই ধাতব-অয়ন তৈরি করে। দুই, উল্কার সাহায্যেও অয়নিতকরণ সম্ভব। তিন, যে সব আহিত কণা ঊর্ধ্বাকাশে থাকে তাদের সঙ্গে পারস্পরিক আয়ন বিনিময় করেও এটা ঘটা সম্ভব। এ পর্যন্ত ওই রকমের প্রায় ৮২টি রাসায়নিক বিক্রিয়া সেখানে ধরা পড়েছে।

বলা বাহুল্য, থুম্বার এই গবেষণা চৌম্বক-নিরক্ষ রেখা বা ম্যাগনেটিক ইকুয়েটর বরাবর ঊর্ধ্বাকাশের আকাশে স্তরীভূত আয়নমণ্ডলের একটি বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে, সন্দেহ নেই।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে পৃথিবীর আয়নমণ্ডল এখনও পর্যন্ত বড় রকমের একটি রহস্য। রকেট নিয়ে গবেষণা চালানর আগে বেলুনের সাহায্যে যন্ত্রপাতি পাঠিয়েই প্রধানত ঊর্ধ্বাকাশে ওই স্তরের উপর গবেষণা চালান হত। পরবর্তীকালে রকেট আয়নমণ্ডলের একাধিক রহস্য ক্রমে উন্মীলিত করেছে। বিশেষ করে এর পরই জানা সম্ভব হয়েছে, কী কী বস্তু সেখানে ঘনীভূত অবস্থায় থাকে, সেখানকার বৈদ্যুতিক অবস্থা, চৌম্বক ক্ষেত্রের রহস্য, ইত্যাদি। বলা হয়েছে, মহাকাশ থেকে ভেসে আসা নানা রকমের রশ্মি, যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন, শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি, এক্স রশ্মির কিছু অংশ সেখানে এসে যে সমস্ত অয়ন সৃষ্টি করে তারাই শেষ পর্যন্ত স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে তৈরি করে আয়নমণ্ডল। এবং আয়নমণ্ডল সম্পর্কে বিশদ তথ্যাবলী সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য দুটি : এক, এই অঞ্চলের পৃথিবীর আবহাওয়ার উপর কোন প্রভাব আছে কী না, থাকলে কতটা সেই প্রভাব এবং কীভাবে সেই প্রভাব কার্যকর হয়, সে সব সম্পর্কে জানা। এতে করে আবহাওয়ার সুপরিকল্পিত পূর্বাভাস জানানর কাজটা আরও সহজতর হবে। দুই, দূরে পাল্লার বেতার সংকেত পাঠানর ব্যাপারে আয়নমণ্ডল যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা থেকে মুক্তি পাবার পথটিকে হয়ত সুগম করা যাবে। বলা বাহুল্য, মানবিক প্রয়োজনে দুটিই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া আয়নমণ্ডলের উপর গবেষণা মহাজাগতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানকেও প্রবুদ্ধ করবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৬২ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিজ্ঞান বিষয়ক কমিটির আহ্বানে মানবকল্যাণে মহাকাশ বিজ্ঞানকে কাজে লাগানর জন্যে পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলের ঊর্ধ্বাকাশে মৌলিক গবেষণা করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয় ভারতের পরমাণু শক্তি কমিশন তাতে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন।

সেই প্রথম থুম্বার জন্ম। চিরদিনের মৎস্যশিকারীদের স্বর্গরাজ্য থুম্বা প্রতিষ্ঠা লাভ করল ভারতের প্রথম এবং প্রধান রকেট-উৎক্ষেপণ কেন্দ্ররূপে। যার অবস্থান ত্রিবান্দ্রম থেকে উত্তরে ১৬ কিলোমিটার দূরে বিস্তৃত আরব সাগরের উপকূল বরাবর। ভৌগোলিক অবস্থান ৮ ডিগ্রি ৩৩ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ, ৭৬ ডিগ্রি ৫৬ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমায়। এবং তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ, থুম্বা পৃথিবীর চৌম্বক-নিরক্ষীয় রেখার একেবারে কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। এখানকার চৌম্বক অক্ষাংশ শূন্য ডিগ্রি ২৪ মিনিট দক্ষিণ। এমন বিশেষ এক চৌম্বক পরিবেশে ঊর্ধ্বাকাশের চিত্রটি, স্বতন্ত্র এক পরিবেশ নিয়ে রচিত। এখানকার বায়ুস্তরের বিন্যাস, বাতাসের গতিবেগের পরিবর্তন, তাপমাত্রা এবং তার চাপ, মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডলের প্রতিক্রিয়া; অথবা ঊর্ধ্বাকাশে ইলেকট্রোজেট বা নৈসর্গিক তড়িৎপ্রবাহের কার্য-কারণ এমন অনেক বিষয় নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে গত দশ বছরের সীমিত সময়ে থুম্বা ইতিমধ্যেই অনেক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

সমরজিৎ কর

পত্রাণু — বিশ্বের প্রথম অণু-পত্রিকা

শ্রেষ্ঠ অণু-সাহিত্যের সম্ভারে অদ্বিতীয়া শারদীয়া / এক টাকা

সম্পাদক ● অমিয় চট্টোপাধ্যায়

—অর্ডার পাঠান—
১২২এ, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলকাতা—১৯

(সি ৮২৬১)

মুখের দুর্গন্ধ মস্ত অন্তরায়
COLGATE
DENTAL CREAM
কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে
মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন...
সারাদিন দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ করেছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের
মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে এবং খাবার ঠিক পরেই কলগেট পন্থায়
দাঁত ব্রাশ করলে বেশিরভাগ লোকেরই দাঁতের আরও বেশি ক্ষয় বন্ধ হয়—
যা দাঁতের মাজনের আবহমান কালের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শোনা যায়নি।
কারণ, কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে একবার মাত্র ব্রাশ করলেই শতকরা
৮৫ ভাগ পর্যন্ত দুর্গন্ধ ও ক্ষয় সৃষ্টিকারী জীবাণুদের দূর করা যায়।
সেইসঙ্গে এতে কি অপূর্ব পিপারমিন্টের গন্ধ—তাইতো ছেলেমেয়েরা কলগেট
ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করতে
ভীষণ ভালবাসে!
মধুর, স্নিগ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ও
উজ্জ্বল দাঁতের জন্য...
দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক অন্য
যেকোন টুথপেস্টের চেয়ে
দাঁতের সম্পূর্ণ যত্নের জন্য
ব্যবহার করুন
কলগেট টুথ ব্রাশ
১৪ রকমের—প্রত্যেকের
উপযুক্ত!
DCG 48 BN

॥ ৩৭ ॥

ফরাসী চন্দননগরে মতিলাল রায় মহাশয় 'প্রবর্তক সঙ্ঘ' নামক এক সর্বার্থ-সাধক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান বাঙালীর গৌরবের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল। খাদ্য বস্ত্র কুটীর শিল্প ইত্যাদি সকল বিষয়ে এঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বনির্ভর ছিলেন। চন্দননগরে ওঁদের এক আশ্রম ছিল, হয়ত এখনও আছে, সেখানে বহু অধ্যাত্মসাধক এবং বোধ করি সাধিকারাও থাকতেন। কর্মীরা কেউ বেতনাদি নিতেন না, তাঁদের সর্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করেন 'প্রবর্তক সঙ্ঘ'।

এই সঙ্ঘেরই জনৈক সাধক কর্মীর হাতে ছিল 'প্রবর্তক' মাসিকপত্র। এঁর নাম রাধারমণ চৌধুরী। চৌধুরীমশায় আমাকে প্রবর্তকের নিয়মিত লেখক করে তোলেন এবং সেই সূত্রে ওঁদের বহুবাজারের আপিসে আমার যাতায়াত ছিল। ওই যাতায়াতের কালেই এক তরুণ সুদর্শন যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তার নাম প্রতুল। সে তখন সবেমাত্র এসেছে ময়মনসিংহ থেকে। সে আমাকে প্রথম দিনেই নিজের আঙ্গুলে লম্বা এক টুকরো দড়ি বেঁধে দেশলাই জেলে দড়ির মাঝখানটা পুড়িয়ে দিতে বলল। আগুনে পুড়ে দড়িখানা দু খণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু ভোজবাজির কৌশলে সেই দড়ি আবার জোড়া লেগে একখানাই হয়ে উঠল! আমি চমৎকৃত হলুম। যুবকটি পকেট থেকে একটি নোটবই বার করে বলল, আপনার ভালো লেগেছে, এটুকু লিখে দিন? চৌধুরীমশায়ের সামনেই আমি সোৎসাহে প্রতুলের খাতায় আমার স্তুতিবাদ লিখলুম।

এই যুবক পরবর্তীকালে আপন যোগ্যতা ও প্রতিভায় হয়ে ওঠে যাদুসম্রাট পি সি সরকার। যাদুবিদ্যার প্রচারকার্যে প্রতুল সিদ্ধহস্ত ছিল। সে কালক্রমে পৃথিবীর সকল দেশে তার যাদুবিদ্যার প্রতিভা প্রকাশ করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল।

যাই হোক, আমি প্রবর্তকের নিয়মিত লেখক হয়ে উঠেছিলুম। ওই একটা সময়ে মতিলাল রায়মহাশয়ের সঙ্গে আমি পরিচিত হই। তিনি তখন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এক প্রকার কঠোর ব্রতচারণে ব্যাপৃত থাকতেন এবং, আমার বিদ্যা সামান্যই—আমি শুনেছুম উত্তরে বিভিন্নরূপ তন্ত্রসাধনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। শুনেছি একদা রায়-মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একত্র বসবাস করেছেন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর থেকেই পণ্ডিচেরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মতিলাল রায় মহাশয় আমার প্রতি স্নেহশীল হয়ে উঠেছিলেন এবং আমার সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে সেটি প্রবর্তকে প্রকাশ করেন।

শুধু প্রবর্তক নয়, আমি তখন নিয়মিত লিখি ভারতবর্ষে এবং প্রায়ই প্রবাসীতে। ভারতবর্ষে তখন আমার উপন্যাস 'নবীন যুবক' বেরচ্ছে এবং তার মধ্যে স্বদেশীয়ানার গন্ধ থাকার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটর লাল-নীল পেন্সিলের দাগ দিয়ে বিশেষ-বিশেষ সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' গুরুদাসে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন।

প্রায় ৪০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে

ছোটগল্পের মাসিক পত্রিকা ॥ শারদীয়া ১৩৮০ ॥

উপন্যাস ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ বড় গল্প ॥ বিমল কর
গল্প ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ। সমরেশ বসু। রমাপদ চৌধুরী। মহাশ্বেতা দেবী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। দিব্যেন্দু পালিত। সমীর রক্ষিত। শিশির লাহিড়ী। সুধাংশু ঘোষ। অভ্র রায়। নির্মল চট্টোপাধ্যায়। সমরেশ মজুমদার। প্রবোধবন্ধু অধিকারী। শংকর চট্টোপাধ্যায়। তুলসী সেনগুপ্ত। ফণিভূষণ আচার্য। প্রলয় সেন। নিখিলচন্দ্র সরকার। সুব্রত সেনগুপ্ত। শেখর বসু। রমানাথ রায়। আশিস ঘোষ। অসিত গুপ্ত। সুনীল দাশ। শিকারের গল্প ॥ বুদ্ধদেব গুহ। হাসির গল্প ॥ রূপদর্শী। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

রহস্য গল্প ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। সত্যেন্দ্র আচার্য।
অলৌকিক গল্প ॥ কবিতা সিংহ। অজয় দাশগুপ্ত। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প ॥ সমরজিৎ কর। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীর মৈত্র
চারশো আশি পৃষ্ঠা, সাদা কাগজে ছাপা। দাম পাঁচ টাকা। কার্যালয় : ৬৬ কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল), কলকাতা ১২। অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান : বিশ্ববাণী, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড; কলকাতা ৯ ; রূপা পুস্তকালয়, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২।

(সি ৮৭১২)

everest/572f/PTM bn

হোল সেলারস : সংঘভি মেহতা অ্যান্ড কোং, ১৫৪, যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট; জে এস মহম্মদ আলি টাওয়ার হাউস, চৌরঙ্গী স্কোয়ার
পরমেশ্বলাল রোশনলাল ভাটিয়া, ১৬০, যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট। এজেন্টস : শিবকুমার যোশী, ১১, আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

এমনি একটা সময়ে আমার সঙ্গে হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা ঘটে দুটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং অন্য জন হলেন কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। এঁরা উভয়েই তখন থাকতেন নিউ আলিপুরের 'পশ' অঞ্চলে—যাঁদের বাড়ির চাকর বা বাবুর্চিদের বাজার-হাট করার জন্য দ্বিতীয় মোটরকার মোতায়েন থাকত এবং তারা আলিপুরের ব্রিজ পেরিয়ে ময়দানের ভিতর দিয়ে গিয়ে হগ-মার্কেট থেকে রসদ কেনাকাটা করে আনত।

রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তখন প্রবীণ বয়স্ক এবং পক্বকেশ। তিনি অতিশয় ভদ্র, অমায়িক ও মিষ্টভাষী। তাঁর আচার-আচরণ ও আপ্যায়নে অভিজাত বাঙালীর সহজাত সংস্কৃতির স্বাদ পেতুম। যে সুবৃহৎ বাগান-ঘের বাড়িতে তিনি বাস করতেন, সেটিকে অট্টালিকা না বলে একটি প্রাসাদপুরী বললেই মানায়। স্যার আশুতোষ চৌধুরীর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী আর্যকুমার চৌধুরী রণেন্দ্রমোহনের কন্যা কবি শ্রীমতী লীলাকে বিবাহ করেন। তৎকালে শ্রীমতী লীলা দেবী কলকাতার অভিজাত মহলে সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী ও সুদর্শনা হিসবে বর্ণিতা ছিলেন। আর্যকুমার চৌধুরী তৎকালে নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্র 'মানসী ও মর্মবাণী'তে শ্রীমতী লীলা দেবীর বহু 'মুড' সম্বলিত একটির পর একটি ছবি প্রকাশ করে বাঙলার পাঠক সমাজকে আনন্দে অভিভূত করতেন। তাঁর মুখশ্রী ও সৌন্দর্যের সঙ্গে একটি অনৈসর্গিক লাবণ্য দেখতে পেতুম।

এই পরিণত যৌবনা মহিলা তখন আমার চেয়ে প্রায় বছর দশেকের বড় ছিলেন। তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'কিশলয়' থেকে আমি একেকটি কবিতা আবৃত্তি করে যখন তাঁকে শোনাতুম, তিনি অনুপ্রাণিত কণ্ঠে বলতেন, এ কবিতা আমার নয়, আপনার!

তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লেখেন ডাঃ স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়। তিনি 'মানসী ও মর্মবাণী'র যুগে বঙ্গ-সাহিত্যের একজন কেউ-কেটা ছিলেন, এবং এই ভূমিকায় তিনি ঠারে-ঠারে রবীন্দ্রনাথকে ঈষৎ খোঁটা দিয়েছিলেন। এটি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের কথা। এই সময় সর্বাধিকারী মহাশয় একটি ভ্রমণকাহিনী লিখছিলেন 'ভারতবর্ষ'-এ —"ইউরোপে তিন মাস" কিন্তু তাঁর এই ভ্রমণকাহিনী যখন পরবর্তী তিন বছরেও শেষ হচ্ছিল না, তখন একটি ঠোঁট-কাটা কুমারী মেয়ে সম্পাদক জলধর সেনের নিকট একটি চিঠি পাঠিয়ে প্রশ্ন করে, "সর্বাধিকারী মহাশয় কি গোরুর গাড়িতে চড়ে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন?"

অতঃপর মাস দুয়েকের মধ্যে এই ভ্রমণবৃত্তান্তটি বন্ধ হয়ে যায়।

কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় আমাকে প্রায়ই আমন্ত্রণ জানাতেন তাঁর নিউ আলিপুরের বাড়িতে। তাঁর ধারণা আমি কাব্য-চর্চার অধিকারী এবং আমার ধারণা এর বিপরীত। তিনি একদা বাঙলার শিক্ষা-বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর সংসারটি ছোট। স্বামী, স্ত্রী ও একটিমাত্র কন্যা—এই নিয়ে পরিবার। তরুণী ও সুশ্রী মেয়েটির নাম নোটন। সুরেনবাবু আপাতত কোনো এক স্টেটের ট্রাস্টির চেয়ারম্যান।

'বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ'-এর কর্তা দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় হলেন সুরেনবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর। তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। ভদ্রলোক শৌখীন, প্রবীণ ও সুপুরুষ। কিন্তু তাঁর একটি চোখ ছিল কাচের তৈরি।

আমার মুখ থেকে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর মতো সুরেনবাবুও তাঁর কবিতার আবৃত্তি শুনে আনন্দ পেতেন। তিনিই বোধ করি ব্রাউনিং দম্পতির কবিতা প্রথম বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন,—কিন্তু এটি আমার সঠিক মনে নেই। আমি নিজে রবার্ট ব্রাউনিং বা ইলিজাবেথ ব্রাউনিং-এর কবিতা যথেষ্ট অনুরাগ নিয়ে পড়তুম না! ওঁদের কাব্যভাবনা ও গুরুভার ভাষার জটিলতা আমাকে পীড়া দিত। যেমন মাঝে মাঝে পীড়া দিত আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তর কবিতা। সুরেনবাবু ব্রাউনিং দম্পতির প্রতি শ্রদ্ধানুরাগে মুখর হয়ে যখন তাঁদের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর তুলনা করতেন, তখন আমার সঙ্গে

বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের ভারতীয় বিপ্লবীদের ইয়োরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যের দেশে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ এবং তাঁদের ওপরে রুশ বিপ্লবের প্রভাবের কথা ও দুষ্প্রাপ্য দলিলের ফটোস্ট্যাট্ কপি সহ চারশ পঁচিশ পাতার বই

রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী

চিন্মোহন সেহানবীশ

..."বিপ্লব জিজ্ঞাসার তো শেষ নেই।...অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ভরে উঠেছে বিচিত্র সম্পদে।"...
আন্দামানের দুঃসহ বন্দীশালায় সন্ত্রাসবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের কাহিনী খ্যাতনামা বিপ্লবীর জবানীতে

আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসাঃ

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার দাম দশ টাকা

'সংস্কৃতির রূপান্তর'এর লেখক-বাংলার চিন্তাজগতে প্রখ্যাত চিন্তাবিদের আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণ

রূপনারাণের কূলেঃ

গোপাল হালদার দাম ছয় টাকা

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

(সি ৮৭৬৯)

পেটের গোলমালে?

বায়ু? অম্বল? বুকজ্বালা? বদহজম?

২টি রেনী চিবিয়ে খেলেই তাড়াতাড়ি পেটের যাবতীয় গোলমালের উপশম হবে।

আপনার পেটের গোলমাল কোন ধরনের ?	হাঁ	না
১. আপনি কি খাওয়ার পর কখন কখন পেটভার কিংবা পেটের অস্বস্তি বোধ করেন ?		
২. খাওয়ার পর কি পেট জ্বালা করে ?		
৩. আপনার কি মনে হয় যে কোন বিশেষ খাদ্য পেট ব্যথা ও অস্বস্তির কারণ ?		
৪. উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা কিংবা বিপর্যস্ত অবস্থায় কি আপনার পেট ব্যথা করে ?		
৫. বুকজ্বালার জন্য কি আপনার রাত্রে ঘুম হয় না ?		
৬. বেশী ধূমপানে ও বেশি খেলে কি আপনার বদহজম হয় ?		
৭. খিদে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি পেট ব্যথা শুরু হয় ?		
৮. অসময় খেলে কি পেট ব্যথা করে ?		
৯. সুরা কিংবা মদ্যপানের পর কি আপনার পেট জ্বালা করে ?		

তিন বারের বেশী যদি আপনার উত্তর "হাঁ" হয়, তাহলে অবশ্যই আপনি বেশ কষ্টকর অম্বলের ব্যথায় ভুগছেন।

অম্বল কেন হয় ?

হজমের জন্য জরুরী এসিড বা অম্লরস পাকস্থলীতেই তৈরী হয়। কিন্তু অনেকেরই প্রয়োজনের তুলনায় বেশীমাত্রায় এসিড তৈরী হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত এসিডের জন্যই অম্বল, বদহজমের ব্যথা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণে হজমের ব্যাঘাত, বুকজ্বালা ইত্যাদি রকমারি পেটের গোলমাল সৃষ্টি হয়। এই অতিরিক্ত এসিড সঙ্গে সঙ্গে কমিয়ে ফেলা অবশ্য প্রয়োজন। তার জন্য চাই রেনী, যা দ্রুত ও নিরাপদে কাজ করে।

অম্বলের চিকিৎসার কি উপায় ?

অম্বলের সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা হল এমন একটি বড়ি যা দ্রুত ও সহজ ভাবে অতিরিক্ত এসিড নাশ করে— এর নাম, রেনী। ব্যথা উপশমের জন্য যতটুকু এসিড কমান প্রয়োজন, রেনী ঠিক সেই পরিমাণে এসিড কমায়। ফলে, হজমের কাজ স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে। পেটের অস্বস্তিকর অবস্থার থেকে দ্রুত আরাম পাবার জন্য ২টি রেনী চিবিয়ে খান। সারা দুনিয়ায় বহু লোক রেনী ব্যবহার করেন।

পেটের গোলমালে রেনী খুবই উপকারী। কারণ যে কোন এসিড নাশক পদার্থের যে ছয়টি গুণ থাকা প্রয়োজন, তার সবগুলিই রেনীতে আছে!

১. রেনী অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত ও নিশ্চিত আরাম দেয়।
২. রেনী পেটে বায়ু হতে দেয় না।
৩. রেনী এসিডের সঠিক সমতা রক্ষা করে।
৪. রেনী হজমের স্বাভাবিক কাজে কোন বাধা দেয় না।
৫. রেনী পেটের ভিতরের অংশে প্রলেপ দিয়ে তা রক্ষা করে।
৬. বার বার রেনী খেলেও পেটের অসুখ বা কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয় না।

পিপারমিন্টের স্বাদে গন্ধে ভরা রেনী হাতের কাছে রাখুন।

২টি রেনী ট্যাবলেটেই আপনি যথার্থ আরাম পাবেন।

নিকোলাস—Ⓝ—এর তৈরী

@cm/ni/4d ben,

তাঁর বচনা থেমে যেত! আমার জ্ঞান ও বিদ্যা কম। কিন্তু একথা জানতুম, ইংরেজ আমলে ইংরেজ শিক্ষাবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কলকাতার এক শ্রেণীর ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ইংরেজ কবি চসার, কারলাইল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, শেলী, বায়রণ প্রভৃতির সমাদর করতে গিয়ে এমনই লালা-সিক্ত হতেন যে, আমাদের পাশের বাড়ির রবি ঠাকুর তাঁদের কাছে আমলই পেতেন না! এক রবি ঠাকুর সব ইংরেজ কবিদেরকে যে গিলে খেয়ে বসে আছেন, এটি সেই অধ্যাপকরা কতকটা স্বীকার করলেন যখন, তাঁরা 'দয়া করে' বাঙ্গলা সাহিত্য পড়তে আরম্ভ করলেন। 'কল্লোল'-এ একদা রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট চিঠি ছাপা হয়েছিল, তাতে তিনি এই মর্মে বলেছিলেন, আমার কবিতা বুঝবার জন্য ইংরেজি সাহিত্যের কোনও অধ্যাপকের দরজায় যেয়ো না। নিজে নিজেই পড়ো!

যাই হোক, কবি সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন কাব্য ও রসসাহিত্যের একজন পরম রসিক। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর ওখানে নজরুলকে নিয়ে যেতেন। হাস্যে পরিহাসে গানে গল্পে আমোদে নজরুল ও'দেরকে মাতিয়ে তুলতো।

এমনি একটা সময়ে হঠাৎ একদিন এক-খানা চিঠির সঙ্গে এক ছাপা আবেদনপত্র পেলুম। আবেদনপত্র বললে একটু ভুল হবে, ওটা অনেকটা যেন সাহিত্যনীতির একটি 'ম্যানিফেস্টো'। দুটোতেই নাম সই রয়েছে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য। আগে এঁর নাম আমি শুনিনি। পরম্পরায় জানলুম ইনি প্রসিদ্ধ এক ব্যবসায়ী এবং কর্মবীর। গৌহাটি-শিলং বাস সার্ভিসের ইনিই মালিক,—ওটি তাঁর একচেটিয়া ব্যবসায়। যেমন শিলিগুড়ি-দার্জিলিঙ মোটর সার্ভিসের একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিক মন্মথ চৌধুরী। এছাড়া শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মেট্রপলিটান ব্যাঙ্ক ও ইনস্যুওরেন্সের সর্বাধিনায়ক। সুতরাং এ হেন বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যের ক্রমোন্নতির সহায়ক হন, তাহলে আনন্দেরই কথা। রামায়ণ-মহাভারত ও সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ সামনে রেখে সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ নৈতিক শুচিতা নাকি সকলের কাম্য। আধুনিক বা তরুণ সাহিত্যের যথেচ্ছাচার থেকে সৎসাহিত্যকে বাঁচানো প্রয়োজন। যে দেশে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন সেই দেশে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভট্টাচার্য মহাশয় 'বঙ্গশ্রী' নামক মাসিক-পত্র বার করলেন। সম্পাদক হলেন বোধ হয় সজনীকান্ত দাস। সজনীর জায়গায় 'শনিবারের চিঠির' সম্পাদক হলেন চির-নিরীহ রসিক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী। বঙ্গশ্রীতে গিয়ে উপস্থিত হল সরোজ, কিরণ রায় এবং ওদের সঙ্গে দুই বিভূতি-ভূষণ ও তৎকালে স্বল্পখ্যাত তারাশঙ্কর। আশে পাশে যারা এসে দাঁড়াল তাদের মধ্যে শক্তিমান নব্যলেখক মানিক ও সাহিত্য-বিদূষক প্রমথ বিশী। ভাগলপুরবাসী বনফুল বা বলাইচাঁদের নামও ওদের সঙ্গে যুক্ত হল। বঙ্গশ্রী আপিসটি বসল এম্পায়ার রেস্তরাঁর পাশেই।

'বঙ্গশ্রীর' আসর জমে উঠল শক্তিমান লেখকদের সমাগমে।

বাঙ্গলাদেশে তখন শিশুমৃত্যুর হার হল দেড় মিনিটে একটি। ওরই সঙ্গে সমান তাল রেখে মরেছে এক একখানি সাময়িক পত্র। চোখের সামনেই দেখলুম রূপ ও রঙ্গ, বসুন্ধরা, অভ্যুদয়, নবযুগ, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, ধূপছায়া, বাঁশরী, উদয়ন, দুন্দুভি, উপাসনা, বিজলী, স্বদেশ প্রভৃতি একে একে মারা পড়ল। একালের কোনও কাগজই বাঁচবে না, কেননা সামনে আসছে নতুন কাল, অভিনব একটি যুগ। সে যুগের চেহারা কেমন, কেউ জানে না, আমিও না। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সামনে এগিয়ে আসছে দেশজোড়া অসন্তোষ ও নৈরাজ্যবাদ, দেখতে পাচ্ছি, অদূরবর্তী সমাজ বিপ্লবের চেহারা— আসছে যেন আমাদের দিকে সে এক অশ্বমেধের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে আর ধুলো উড়িয়েই। চোখের সামনে ভেঙে পড়ছে যৌথ পরিবার আর সমবায় পরিবার। দেখতে পাচ্ছি মেয়ে সমাজে বারুদ জমছে, ওরা শৃঙ্খল ছিঁড়ছে, পুরনো নীতিকে ওরা মানতে চাইছে না, পুরুষ শাসিত সমাজকে ভাঙতে চাইছে ওরা। ছেলেরা ঘর

প্রকাশিত হল

ভালবাসা-ঘৃণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, দুঃসাহস আর দুর্বলতার সংঘাতে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অথচ রমণীয় এক ঐতিহাসিক উপন্যাস।

দিল্লী যখন জাহাঁপনা
নিগূঢ়ানন্দ ৭৲

অমলেন্দু শূরের	স্বপনটপন আদতে	৫৲
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর	রাঙ্গা শিমুল	৫৲
বেদুইনের	ইন্দোচীনে পাঁচটি রাত	৮৲
শ্রীপারাবতের	শ্যামল দেশে সূর্য ওঠে	৫৲

পুস্তক প্রকাশনী — ৮২/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

(সি ৪৮১১)

নির্মল আচার্য—সম্পাদিত

শারদীয়া

॥ রক্ত স্বাক্ষর ॥

আগামী পৃথিবীর যারা বিরাট আশার আলো, সেই সব তরুণ শিল্পীর রক্ত দিয়ে ইতিহাস লেখা থাকবে রক্তস্বাক্ষরে।

এবার শারদ সংখ্যায় যে সব বলিষ্ঠ দরদী শিল্পীর সৃষ্টি পৌঁছে দিয়েছে কৃষক মজদুর, মধ্যবিত্ত, খেটে-খাওয়া মানুষের অন্তরালে, তাদের ইতিহাস নিয়ে রক্তস্বাক্ষর মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।

এ-সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন :

বিমলচন্দ্র ঘোষ, নারায়ণ চৌধুরী, পরমানন্দ সরস্বতী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ইন্দ্রনীল, বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিনয় চৌধুরী, সাধনা মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, প্রতাপরঞ্জন হাজরা, কালীপদ কোঙার, শ্যামাদাস দে, অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়, জগৎ লাহা সুনির্মল কুণ্ডু, হারেন ঘোষ, দিলীপ মজুমদার, শতদ্রু চাকী, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, শ্যামল সেন, সমর দত্ত, সমর মুখোঃ, জহরলাল সিনহা, অরুণ ভট্টাচার্য, গৌর থাড়া, কমল চক্রবর্তী সুনীল জানা, রতন চক্রবর্তী, নিমাই মান্না, সুকুমাররঞ্জন ঘোষ, বিপ্লব চন্দ, স্বাতী চক্রবর্তী শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, স্বপন চক্রবর্তী, বাঁশরী চৌধুরী, অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, কার্তিক মোদক, সমর দাস, তমাল চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণেশ্বর গুপ্ত, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, আনন্দময় হল মুখোপাধ্যায়, রাখালরঞ্জন ঘোষ, সরসী সরকার, সৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রণজিৎকুমার সেন, অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, কান্তিময় ভট্টাচার্য, অশোক আচার্য, শিবপদ আচার্য, মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, নির্মল আচার্য, প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত ও ও-পার বাংলার প্রখ্যাত মহিলা-কবি বেগম সুফিয়া কামাল।

কার্যালয়—রক্তস্বাক্ষর : সোনার বাংলা প্রকাশনী, ফোন নং ২৪-৯৬৭৭
৭বি, ধীরেন ধর সরণী, কলিকাতা-৭০০০১২

(সি ৪৫৪)

সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যে
ক'রে তুলুন

ব্যবহার করুন অতি পুষ্টিকর
প্রোটীন-সমৃদ্ধ
হ্যালো
এগ্ শ্যাম্পু

মখমলের মত নরম সোনালী শোভায় উজ্জ্বল ও মসৃণ--হ্যালো এগ্ শ্যাম্পু। এই বাড়তি পুষ্টির এগ্ ফর্মুলা আপনার চুলে প্রাণ ও রূপের সঞ্চার করে।

এর প্রচুর নরম ফেনা আস্তে আস্তে মাথায় পুষ্টি যোগায় আর চুলের মধ্যে ঢুকে সব চুল স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতায় পরিষ্কার ঝকঝকে ক'রে তোলে। হ্যালো এগ্ শ্যাম্পু ব্যবহার করলে আপনার চুল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

হ্যালো—রূপের ছটায়, সারা জগৎ মাতায়

এখন ৩টি নতুন সুবিধাজনক সাইজে পাওয়া যায়

পাকাচ্ছে, ক্ষোভ জমা করছে, শাসন-শোষণ পরোয়া করছে না, প্রতিবাদ জানাচ্ছে চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ওদের সামনে পথ নেই, প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা নেই, উপযুক্ত অন্ন নেই ওদের মুখে, নিজেদেরকে বড় করে তুলবার সম্ভাবনা ওরা দেখতে পাচ্ছে না। ওদেরকে শুধু রক্তচক্ষু আর উপদেশের দ্বারা ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে ইস্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কনভোকেশনে ওরা শুনে আসছে অর্থহীন অপদার্থ আদর্শের বুলি এবং গাউন পরে সঙ সেজে গিয়ে চান্সেলারের কাছে হিতোপদেশ শুনে পথে গিয়ে নামছে! যাও, এবার চাকরি খোঁজোগে—যেখানে খুশি, যেদিকে খুশি। সংস্কৃত শিখেছ, লজিক ফিলজফি পড়েছ, ইংরেজি ভাষায় রপ্ত হয়েছ,—এবার যাও মেসো-পিসেকে ধরো, মামা বা ভগ্নিপতির পায়ে পড়ো, সদাগরি আপিসের দরজায়-দরজায় কেঁদে বেড়াও—যদি কুড়ি-পঁচিশ টাকার গোলামি জোটে! এই নৈরাশ্যবাদ আর অসন্তোষের তলায় বিপ্লবের বীজ লুকিয়ে রয়েছে—যথাসময়ে সেটি অঙ্কুরিত হবে এই ধারণা অনেককে পেয়ে বসেছে!

'প্রিয়-বান্ধবী' উপন্যাসটি এই মনোভাব থেকে লেখা হয়েছিল এবং বইটির বিক্রি বহর দেখে প্রকাশক গুরুদাস খুশি হয়ে উঠল। ওরা যখন এ-বই বিক্রি আরম্ভ করলেন আমি তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি! কেননা ওঁদের কাছে ও-বইয়ের কপিরাইট বিক্রি করেছি তিনশ পঁচিশ টাকায়—সেই টাকা বিধবা দিদির বিয়ের খরচে গেছে! হিমসাগর আমের সমস্ত শাঁস খেয়ে খোসা পর্যন্ত চুষছে গুরুদাস আর আমি শুধু ওর খাতির শুকনো আঁটিটার দিকে চেয়ে রয়েছি।

সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হলুম একটি কারণে। 'প্রিয়-বান্ধবী' উৎসর্গ করেছিলুম শ্রীমতী শোভারানী দত্তকে—তাঁর প্রতি আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধানুরাগের চিহ্নস্বরূপ। তিনি উপন্যাসটি মন দিয়ে পড়ে বললেন, অসম্ভব, এরকম মেয়ে হয় না! এ মেয়ে সমাজেও নেই, দেশেও নেই। এমন মেয়ে দেখেছেন কোথাও?

আমি হাসলুম। বললুম, অদূর ভবিষ্যতে এ মেয়ে আসছে! তারই সম্ভাবনা নিয়ে লেখক লেখে? হাতের কাছেই নমুনা, —আপনি নিজে কী?

উনি আর কথা বাড়াননি।

আমি যখন অক্ষয় সরকারের সাপ্তাহিক 'খেয়ালী'র জন্য প্রতি সপ্তাহে দশ টাকার বিনিময়ে একেকটি লেখা লিখছি, তখন একদা সাহিত্যক্ষেত্রের সংবাদদাতা শ্রীমান্ ভবানী মুখুজ্যে জানাল, 'বঙ্গশ্রী'তে নানা মতবাদ ও আদর্শের লেখকরা এসে জড়ো হয়েছে যাদের মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। সুতরাং এই কাগজের অদূর ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করে আমরা দুজনেই হাসছিলুম। কিন্তু তেল আর জলে মিশ খায়, যখন তরকারিটা রান্না হয় ভালো। বঙ্গশ্রীতে যে-তরকারি রান্না হচ্ছিল নেহাৎ কুস্বাদ নয়। আমি নিজে বিভূতিভূষণ আর তারাশঙ্কর সম্বন্ধে উৎসাহিত ছিলুম। তারাশঙ্কর সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী, পরিশ্রমী এবং নিজের রচনা-দিতে সে সামাজিক ও নৈতিক শুচিতাবোধ মেনে চলে। সজনীকান্ত আমার সর্বাপেক্ষা পুরনো বন্ধু। সে বন্ধুবৎসল। দেখতে পাচ্ছিলুম, সে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণকে যত্নে লালন করছে। খবর পাচ্ছিলুম, সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মশায় ওকে বিশ্বাস করেন।

এমনি একটা সময়ে অনেকদিন পরে একখানা চিঠি এল শ্রীমতী নীলিমা চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। সেই আমাদের 'বিজলী' ও 'স্বদেশ'-এর আমলে ইনি মধ্যে মাঝে লেখা পাঠাতেন এবং চিঠি দিতেন। এবার অনেককাল পরে ওঁর খবর পাওয়া গেল। চিঠিখানা বড়, কিন্তু পড়ে আমি একটু দুঃখিতই হলুম। উনি ঠাউরিয়ে নিয়েছেন, আমি হয়ত ওঁর দুর্দশার কালে ওঁর ওঁর কোনও কাজে আসতে পারি। ওঁর স্বামী বিহার সরকারের অধীনে কাজ করতেন ফরেস্ট অফিসে—চক্রধরপুর ডিভিশনে। কিন্তু বিগত দেড় বছর থেকে তিনি পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হয়ে একপ্রকার পঙ্গু। ওঁর শিশু-পুত্র সন্তানটি মারা যায় প্রায় এক বছর আগে। ওঁর বাবা পাটনায় উকীল। ওঁর স্বামীর সরকারি মাসোহারা কিছু থাকলেও ওঁর বাবা কন্যা-জামাতার সাংসারিক খরচ-পত্র অধিকাংশই চালান। এটি ওঁর পক্ষে সঙ্কোচের কারণ। এখন উনি স্বনির্ভর হতে চান। উনি যদিও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাইভেট পরীক্ষা-দেওয়া গ্রাজুয়েট

উল্লেখযোগ্য কিশোর সাহিত্য
টেনিদার গল্প ও উপন্যাস, ঘনাদার গল্প ও উপন্যাস, হর্ষবর্ধনের গল্প, রহস্য, রোমাঞ্চ ও অভিযানের কাহিনী

মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র ।। ৪.00
চারমূর্তি ।। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ।। ৪.00
অদৃশ্য হন হর্ষবর্ধন ।। শিবরাম চক্রবর্তী ।। ২.৫0
সুন্দরবনে সাত বৎসর ।। বিভূতি বন্দ্যোঃ ।। ৪.00
কাকতাড়ুয়া ।। দক্ষিণারঞ্জন বসু ।। ৪.00
বিচ্ছুদের বাহাদুরী ।। স্বপনবুড়ো ।। ৩.00
খুনে পাহাড় ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র ।। ৫.00
ঝাউবাংলোর রহস্য ।। নারায়ণ গঙ্গোঃ ।। ৪.00
কলকাতার কেঁদো ।। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ।। ৪.00
নীলার্তিমি ।। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ৪.00
হার্মাদ ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র ।। ৩.00
দুরন্তযাত্রী ।। ধীরেন্দ্রলাল ধর ।। ৩.৫0
ঘনাদার জুড়ি নেই ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র ।। ৪.00
আনাজনের অরণ্যে ।। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।। ৪.00

শিশু পুস্তকালয় : ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
(সি ৮৭২৩)

সোয়ান মিলস্ এঁদের জন্য রকমারি কাপড় তৈরী করে
ধবধবে সাদা, হাল্কা, ফুলের মত কোমল ও শীতল সুতী।
পাঞ্জাবী ও রুমালের জন্য কেম্ব্রিকস–যা নবীন
ও প্রবীণ সবারই সমান প্রিয়। চমৎকার পপলিন।
আধুনিকতার অতুলনীয় সমন্বয়।

সবার প্রিয়, সবার আপন সোয়ান মিলস –এর কাপড়

কিন্তু রাঁচী শহর বাঙ্গালীপ্রধান হলেও এখানে বাঙ্গালী সমাজের কোনও মহিলা বাড়ির বাইরে গিয়ে বিশেষ কাজকর্ম করেন না। উনি প্রায়ই দরখাস্ত পাঠান, কিন্তু জবাব আসে না। শেষকালে উনি লিখেছেন, এখন আমার সংসারে আমরা মোট চার জন। স্বামী, বিধবা ননদ, একটি চাকর ও আমি। আমি কলকাতায় গিয়ে যদি কোনও অর্থকরী কাজ পাই, তাহলে খুবই উপকৃত হই।

চিঠিখানা নিয়ে আমি শোভার কাছে গেলুম। তিনি প'ড়ে বললেন, পুণ্যাশ্রমের বাসিন্দা রয়েছে অনেক মেয়ে গ্রাজুয়েট, কিন্তু কাজ কই ? সরকারি আপিসে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, ব্যাঙ্ক-পোস্টাপিসে —কোথাও মেয়েদের জায়গা নেই। তবে শুনেছি নাকি রেলওয়েতে মেয়ে-ইন্‌সপেক্টর নিচ্ছে আজকাল,—দেখুন না চেষ্টা করে। অনেক জায়গায় মেয়েরা ডাক্তারও কাটছে। তা ছাড়া উনিও ত' গ্রাজুয়েট।

শোভার কথাবার্তার ধরনে যথেষ্ট উৎসাহ পাওয়া গেল না, এবং শ্রীমতী নীলিমাকে চিঠির জবাব কি দেবো তাও বুঝতে পারলুম না। সুতরাং আমি এক-প্রকার চুপ করেই যাচ্ছিলুম।

শিমলা-কাঁসারিপাড়ার ওদিকে তখন থাকতেন ডঃ বি সি ঘোষ। তিনি সৌম্য-দর্শন সুপুরুষ এবং অমায়িক ও ভদ্রব্যক্তি। তিনি বিলাতে প্রবাসকালে এক ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের একমাত্র পুত্র সন্তানের নাম ছিল 'হ্যারি ঘোষ।' বস্তুত আমাদের বাল্যকালে স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ডাঃ বি সি ঘোষ—এঁরা থাকতেন খুবই কাছাকাছি। ডাঃ ঘোষের নিকট আত্মীয় ও স্নেহভাজন সরোজ মিত্র তখন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও খুবই পরিচিত। ঠিক মনে পড়ছে না, সরোজবাবু বোধ হয় ছিলেন একজন 'জে-পি', অর্থাৎ 'জাস্টিস অফ দি পীস।' তাঁকে বোধ হয় জুরীতেও গিয়ে বসতে হত। তিনি দু' একটি প্রতিষ্ঠানেরও পরিচালক ছিলেন। তাদের মধ্যে একটি মহিলা-সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'সরযূ-সদন।' সরোজ মিত্র তখন একজন পরিণত বয়সের মানুষ। আমার সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, আমি একজন সমাজসেবক। সুতরাং আমি একদিন শ্রীমতী নীলিমা চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখালুম।

সেই প্রথম জানলুম, ডঃ বি সি ঘোষ মহাশয় বিদ্যাসাগর কলেজ ও তার হস্টেল-গুলির একজন পরিচালক। অতটা আনুপূর্বিক জানা না থাকলেও এটি জানতুম, মেয়েদের জন্য ছিল তখন বেথুন হস্টেল এবং স্কটিশ মিশনের অধীনে ডাফ্‌ডাস হস্টেল। এখন শুনলুম বিদ্যাসাগর কলেজের অধীনে রয়েছে দুটি ছাত্রী হস্টেল। তার একটি রয়েছে বোধ হয় সুকিয়া স্ট্রীটের কোথায় যেন, অন্যটি আমার পুস্তক প্রকাশক বরেন্দ্র লাইব্রেরীর উপর তলায়।

সরোজবাবু নীলিমা দেবীর সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন। আমি বললুম, কয়েকখানা মাত্র চিঠির বাইরে তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানিনে, এবং অদ্যাবধি গত তিন বছরের মধ্যে তাঁকে আমি চোখেও দেখিনি। তবে চিঠিপত্রাদি পড়ে মনে হয়েছে তিনি সুশিক্ষিতা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা।

সরোজবাবু জানালেন, সুকিয়া স্ট্রীটের ওদিকে তাঁদের ছাত্রী-হস্টেলের জন্য জনৈক মেট্রনের দরকার। আহারাদি ও বাসস্থান ছাড়া টাকা পঁচিশেক হয়ত হাতখরচ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই মেট্রনের পক্ষে দরকার কঠোর ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য ও আত্মপ্রত্যয়। তাঁকে হতে হবে নিরপেক্ষ, মিষ্টভাষী ও স্নেহশীল। হস্টেল প্রশাসনের সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা তাঁর হাতেই থাকবে। আজকালকার ছাত্রীরা কড়াকড়ি বিশেষ মানতে চায় না, সেদিকেও তাঁকে সতর্ক-সচেতন থাকতে হবে। তিনি রান্না-ভাঁড়ার ইত্যাদি দেখাশোনা করবেন এবং তিনিই হবেন সর্ববিষয়ের পরিচালিকা। আপনি তাঁকে এ বিষয়ে লিখতে পারেন।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে আমি সবিস্তারে একখানা চিঠি লিখলুম নীলিমা দেবীকে এবং ওই সঙ্গে সরোজ মিত্র মহাশয়ের ঠিকানাও দিয়ে দিলুম। আমার কর্তব্য ওখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

বোধহয় দশ বারো দিন পরে নীলিমা দেবী আরেকখানা চিঠি দিলেন। আমাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সরোজ মিত্র মহাশয় তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেছেন এবং পঁচিশ টাকার পরিবর্তে তাঁকে তিরিশ টাকাই দিতে চেয়েছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি কলকাতায় আসছেন। তবে যেহেতু তাঁদের পরিবারে মেয়েছেলের পক্ষে একা যাতায়াতের রেওয়াজ নেই, সেই কারণে তিনি একজন উপযুক্ত সংগীর জন্য চেষ্টাচরিত্র করছেন।

এমনি একটা সময়ে একদিন সকালে 'চিত্রমন্দির' থেকে রতিবাবু তাঁর সহকারীর মারফৎ একখানা চিঠি পাঠিয়ে আমাকে

চারণিক বর্ণিত 'মহাকাল' এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। মহাকাল বলেছেন—"আমার কথা বার বার পড়বে এবং যত পড়বে দেখবে তার অন্তর্নিহিত নতুন নতুন ভাবভাবনা revealed হচ্ছে।"

চারণিক-এর

ঐ মহামানব আসে ৬.০০

একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করছে

জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬,
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন ॥ ১৮-এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

(সি ৮৯৩১)

প্রত্যেকেরই দরকার নিজেকে সুরক্ষিত রাখার

বীজাণুর বিরুদ্ধে, ঘামের দুর্গন্ধের বিরুদ্ধে, বিরক্তিভাবের বিরুদ্ধে, নিজের এবং অন্যের **সিন্থল টয়লেট পাউডার** জি-১১ যুক্ত এই সবের বিরুদ্ধে আপনাকে নিরাপদ রাখবে এবং দেবে··· আরও সুগন্ধ···তাজা ফুলের সুগন্ধ

সিন্থল

সেই টয়লেট পাউডার যেটি আপনাকে সম্পুর্ণ দুর্গন্ধনাশের নিরাপত্তা দেয়

Interpub/GSP-6/72 Ben

ডাকলেন। রতিবাবুর দাদা থাকেন পণ্ডিচেরীতে এবং আমার ধারণা, রতিবাবু তাঁর ফটোগ্রাফির কাজের ফাঁকে তাঁর ডার্করুমের পাশের ঘরটিতে বসে জপতপ বা ধ্যান-ধারণা করেন। তিনি ঈষৎ খর্বকায়, গুম্ফশোভিত ও শুষ্কদর্শন। তাঁকে নিয়ে আমি নেপালে গিয়েছিলুম এবং তাঁর সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আনন্দদায়ক হয়নি। তা ছাড়া শ্রীমতী সাধনা আমার কল্যাণ থেকে যে সোনার বিছাহারটি নেপাল যাবার প্রাক্কালে ও'র কাছে গচ্ছিত করেছিল সেটি ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে উনি যেরূপ ছ'কড়া-ন'কড়া করেছিলেন, তাতে আমি একটু বিরক্তই হয়েছিলুম। এ ধরনের আচরণ আমার পক্ষে কতকটা দুর্বোধ্য মনে হয়।

আমি গিয়ে ওর দোতলায় উঠে সামনে হাজির হলুম।—ডেকেছেন কেন? কি হুকুম, বলুন।

রতিবাবু খুব হাসলেন। বললেন, একদম ডুব মেরেছেন, দেখা সাক্ষাৎ নেই, দাঁড়ান, আগে একটু চা খান, তারপর বলছি সব।

আমি হাসিমুখে বললুম, বলুন, আপনার যোগযাগ কেমন চলছে!

মিনিট কয়েকের মধ্যে ও'র সহকারী দু'পেয়ালা চা এনে রাখল এবং আমি কাঁচি-সিগারেটের প্যাকেট বার করলুম।

সিগারেট ধরিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে রতিবাবু হাসিমুখে বললেন, আর মশাই, আপনারা যে আমার এখানে এক কেউটে সাপ ছেড়ে দিয়ে গেছেন, একি আগে আমি জানতুম?

—কেন, হয়েছে কি?

সেই ত' সেবার কল্যাণী দেবী আর আপনি মিলে ব্যবস্থা করে গেলেন যে, শ্রীমতী সাধনা টিফিন-ক্যারিয়ারে করে রোজ বিকেলের দিকে কোন এক বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেবে আর যদি দরকার হয়, আমার এখানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে যাবে, এইত? যাই হোক, নেপাল থেকে ফিরে দেখছিলুম, মেয়েটা ওই কাজ নিয়েই রয়েছে। আমার কাছ থেকে যেমন করেই হোক, আপনার ওই শ্রীমতী সাধনা হারগাছটা আদায় করে নিল!

আমি হাসছিলুম,—শ্রীমতী সাধনা আমার নয়, রতিবাবু।

—নয়ত কি মশাই?—রতিবাবু হাস্যমুখর হয়ে বললেন, আপনি হলেন তার মহারাজ, আমরা সব অপোগণ্ড প্রজা! সে যাই হোক, একদিন আমি বললুম, সাধনাদেবী, তুমি ত' ঘটা করে সেদিন হারগাছটা ফেরৎ নিয়ে গেলে! আজ আমাকে একটা ভজন গান শুনিয়ে যাও দেখি?

মেয়েটি প্রথমে বলল, রতিবাবু, আজ আমি ভয়ে-ভয়ে এসেছি। বোধহয় পুলিস-

নিজের ভাগ্যকে নিজে জানবার চেষ্টা করুন।

পৃথিবীখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহ মিহির রচিত

হাবভাব ও চালচলন দেখে লোক চিনুন ৩৲

আপনার হাতে লটারী ও সৌভাগ্য ৩৲

আপনার হাতে বিবাহ ও প্রণয় সংকেত ৩৲

হাত দেখে রোগ নির্ণয় করুন ৩৲

বইগুলি সারা জগতে আলোড়ন এনে দিয়েছে।

পাবলিশার্স ওনলি ॥ ২৭/এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা—৫

(সি ৮৭৬৬)

রেফিউজি হ্যাণ্ডিক্রাফট্স

পূজা উপলক্ষে যে আয়োজন হইয়াছে তাহা দেখিয়া আনন্দ পাইবেন

৩এ ও ২এ গড়িয়াহাট রোড-৪৭৩৩৪৬/৭

(সি ৭৯৭৯)

ইন্‌কেলাবের ... জীবন ... থেকে ... করেছে। ... আমার ... খুঁজবে না। আপনার এই চিঠিটা ... কে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।

রতিবাবু আমার হাতে ছোট একখানা চিঠি দিলেন। চিঠিখানার তারিখ পুরনো। অনেকটা যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই তিনি চিঠিটা দিলেন।

হাসিমুখে বললুম, কিন্তু কেউটে সাপের কাহিনীটি কি প্রকার ?

হো হো ক'রে হাসলেন রতিবাবু। বললেন, আরে সেই কথাই বলছি, মশাই। উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে! উনিও গাইবেন না, আমিও তেমনি নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত ভজন একটা গাইয়ে ছাড়লুম! মেয়েটার গলা কিন্তু চমৎকার!

—আমারও তাই ধারণা।

—কিন্তু আমার বোধহয় একটু ভুলই হয়েছিল। ঠিক অতটা ভাবিনি।—রতিবাবু বললেন, আমার একটু 'ফিলিংস' হয়েছিল, মশাই। মেয়েটার কাঁধে দুখানা হাত রেখে আমি একটু আদর জানাতে গিয়েছিলুম—

আমার মুখে ঈষৎ গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ছিল।

—তবে হাঁ, মেয়েটি খুব নরম নয়—রতিবাবু বললেন, ওদিকেও বেশ হিংসেবী। বললে, রতিবাবু, আমি একটা মিশন নিয়ে এ পাড়ায় আনাগোনা করি। আমাকে অন্য কিছু মনে করবেন না। আমার গায়ে কেউ হাত দেয় এ আমি পছন্দ করিনে। আপনি সরে দাঁড়ান—

আমি রতিবাবুর মুখের দিকে চেয়েছিলুম।

রতিবাবু তেমনিই হেসে বললেন, ভাবলুম মেয়েরা অমন বলেই থাকে! কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে ত' আর নেহাৎ অজ্ঞান নয়। কিন্তু এখনেই আমার ভুল হ'য়ে গেল। মেয়েটা হঠাৎ আমাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ছিটকিয়ে দিল একেবারে মেঝের ওপর।

বললুম, তারপর ?

খুব হাসলেন রতিবাবু। পরে বললেন, মেয়েটা কিন্তু যাবার আগে আবার শাসিয়েও গেল! বললে, মনে রাখবেন রতিবাবু, আমি এমনিভাবেই আবার আসব। রোজই আসব—যতদিন আমার আসার দরকার। আমি ভয় পাবার মেয়ে নয়, মনে রাখবেন।

আমি আসবার সময় সহাস্যে বলে এলুম, রতিবাবু, আমাদের সকলের পক্ষেই একথা মনে রাখা দরকার, বিপ্লবী মেয়েরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া। যারা জীবনের পরোয়া করে না, বিপদে ভয় পায় না, সামাজিক জীবনের প্রতি যারা মোহ রাখে না,—তাদের সঙ্গে বিশেষ সতর্ক হয়ে আদান-প্রদান করতে হয়। স্বয়ং ইংরেজও এই কেউটে সাপকে সমীহ করে চলে।

বাড়ি এসে চিঠিখানা খুলে দেখি, সামান্য তিনটে কথা। কিন্তু চিঠির তারিখটা পেরিয়ে গেছে পাঁচ দিন আগে। সাধনা লিখেছে, আমার এক দিদিকে বলে রেখেছি আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আপনি এলে দু'একখানা গানও শোনাতুম। ইতি—

তারিখ পেরিয়ে গেছে, তবু গেলুম। ঠিকানাটা ভবানীপুরের প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের। বিকেলের দিকে গেলুম। গলি ঘুঁজির মধ্যে ঢুকে বাড়ি খুঁজে বার করতে সময় নিল অনেক।

শেষ পর্যন্ত একটা ডাঙ্গাল ছোট মাঠ পেরিয়ে গলির ভিতরে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের পল্লী ঘেঁষে যেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম, সেটা দোতালা পাকাবাড়ি। ডাঙ্গাল মাঠের কাছাকাছি রয়েছে ট্যাক্সি ও ট্রাকচালক কয়েকজন পাঞ্জাবী শিখের আড্ডা। তখনকার ট্যাক্সির আকার ছিল অনেক বড়। বেবি-ট্যাক্সি তখন জন্মায়নি।

যাই হোক, এখন প্রায় সন্ধ্যা। এর মধ্যে এক পশলা হালকা বৃষ্টিও হয়ে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে নম্বর মিলিয়ে দেখলুম—হ্যাঁ এই বাড়িই ত বটে। একটি মেয়েকে খুঁজতে এসেছি, এজন্য আমার আড়ষ্টতা ছিল প্রচুর। তবু কড়া নাড়ানাড়ি করলুম। একটু পরে ভিতর থেকে যে দরজা খুলল, সেও একটি মেয়ে, এবং প্রায় সাধনার সমবয়সী। সংকোচ কাটিয়ে আমি সাধনার কথা জানতে চাইলুম। মেয়েটি বলল, দাঁড়ান, আমি ডেকে দিই।

মিনিট তিন চার পরে যিনি এলেন তিনি এক বয়স্কা মহিলা। তিনি আমাকে দেখেই কি জানি কেন হাসিখুশী মুখে বললেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। কদিন আগেই আপনার আসার কথা, সাধনা বলে রেখেছিল। আমিই তার সেই দিদি। আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করবেন আসুন—

মহিলা আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন

মা,
ওদের বাথরুমে
এত দুর্গন্ধ,
আর আমাদের
বাথরুমে
এত সুন্দর গন্ধ
কেন?

বেবী, আমরা যে
অডোনিল
ব্যবহার করি!

অডোনিল নিমেষে সব দুর্গন্ধ দূর ক'রে আপনার
বাথরুম তকতকে পরিষ্কার ক'রে তোলে আর
মিষ্টি গন্ধে ভরে দেয়।
অনেক রকম সুন্দর সুন্দর গন্ধে অডোনিল পাওয়া যায়।
বিভিন্ন ধরণের সাইজ, মডেল ও প্যাকে পাবেন।

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রায়
আধুনিক সহায়ক
BALSARA

CHAITRA-BLS-6 BEN

দোতলায় একেবারে ওদের শয়নকক্ষে। এক প্রবীণ ভদ্রলোক আমাকে অভ্যর্থনা করলেন হাসিমুখে। বললেন, শুনুন মশাই, আমার নাম মৃত্যুঞ্জয়, কিন্তু আমাকে সবাই ডাকে কেষ্টবাবু। কারণ আমার গায়ের রং কালো! আর আমিও কি ছেড়ে কথা কই ? ওই দেখুন নী আমার স্ত্রীর রং ফর্সা, কিন্তু নাম মলিনা। আমি ওঁকে ডাকি, ময়লাবাবু!

ভদ্রলোকের হালকা চালের পরিহাসে সাহস পেয়ে এবার বসলুম।

মলিনাদেবী বললেন, সাধনা থাকে পুণ্যাশ্রমে। গতকালও সে এসেছিল আমাদের এখানে। আসছে কাল আবার আসবে। ওর গান নাকি আপনার ভালো লেগেছে—বলছিল। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হল, এই আমাদের লাভ। কাল আসবেন আপনি ?

বললুম, কাল আর বোধ হয় পারব না, আমি সামনের সপ্তাহে বুধবারে আসব।

—বেশ, আমিও তুকে বলে রাখব। সাধনা আসে বেলা ঠিক তিনটের পর। আমিও সেই সময় হাসপাতাল থেকে ফিরি। আপনি চারটের সময় এলে আমাদের ঠিকই পাবেন।

যে মেয়েটিকে প্রথম দেখেছিলুম দরজার সামনে, সে এবার একটি কাচের গেলাসে করে চা এনে হাজির করল। কেষ্টবাবু এই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, একে দেখে রাখুন, এর নাম অমিতবাবু।

মেয়েটা হেসে উঠে [illegible] নিজের জ্বলন্ত স্বাস্থ্যটাকে একটু লুকোবার জন্য মলিনাদেবীর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। বুঝলুম, এ মেয়ে অন্যপ্রকার।

মলিনাদেবী বললেন, এর নাম অমিতা। এদের বাড়ি ফরিদপুরে। এও এসেছিল কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে। ছ' মাস জেল খেটে ফিরেছে। পুণ্যাশ্রমে ওর জায়গা হয়নি। সাধনা ওকে রেখে গেছে আমার এখানে। বছর দুই আগে ওর স্বামীটি মারা গেছে।

সেদিন বিদায় নেবার আগে দেখলুম বছর দুয়েকের একটি শিশুপুত্র এখানে ওখানে গুটগুট করে ঘুরছে এবং তাকে সামাল দিচ্ছে বছর দশ বারো বয়সের একটি ঘাগরাপরা রোগাটে বালিকা ঝি। কিন্তু সকলের সৌজন্য ও মিষ্ট ব্যবহারে সেদিন খুবই আনন্দ পেয়ে ফিরেছিলুম।

পুজো সংখ্যার লেখার জন্য তাগাদা আসছিল একটির পর একটি। বলা বাহুল্য, ছোট গল্প লিখতে হবে অনেকগুলি এবং দু-তিনটি ভ্রমণ কথা। এদের সঙ্গে আছে বেতার কেন্দ্রের দুই একটি ফরমাস। আমি এখন নিঃস্ব বটে, কিন্তু আগামী মাস দুই যদি নিয়মিত পরিশ্রম করি তবে পুজোর ঠিক আগে ও পরে আমি ধনাঢ্য ব্যক্তি!

আমি যখন কোমর বেঁধে কাজ করতে বসে গিয়েছি, সেই সময় একদিন শ্রীমতী শোভা তাঁর জেঠতুতো ছোট ভাইকে হঠাৎ আমার কাছে পাঠালেন। তখন প্রায় মধ্যাহ্ন-কাল। ছেলেটি বলল, ছোড়দি বলে দিয়েছে এক্ষুনি আপনাকে নিয়ে যেতে। দুদিন ধরে ছোড়দি অপেক্ষা করছে। আমার সঙ্গেই চলুন।

বললুম, কী এমন জরুরী দরকার? আমাকে তৈরি হতে হবে ত? তাঁকে গিয়ে বলো, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে আজ। সেটা সেরে তবে যাব।

ছেলেটি একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই চলে গেল। ওরা এখন আমার কুটুম্ব সুতরাং আমার ধমক দেবার অধিকার আছে।

একটা ছোট গল্প শেষ করছিলুম। তাইতে গেল প্রায় ঘণ্টা দুই। স্নানাহার সেরে যখন বেরোলুম তখন প্রায় তিনটে বাজে। সোজা গিয়ে শ্যামবাজারের মোড়ে বাস ধরলুম। আমি যাচ্ছিলুম জনৈক ছোট-খাটো প্রকাশকের কাছে। তিনি আমাকে অত্যন্ত কড়া একখানা চিঠি [illegible] যোগে। তাঁর কাছে আমি থেপে-থেপে কমবেশি তিনশ' টাকা নিয়েছি। হয় এবার পুজোর মধ্যে তাঁর টাকা ফেরৎ দেবো, নয়ত উপন্যাস লিখে দেবো—এই হল চুক্তি। তাঁর চিঠিতে প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল। তাঁর সঙ্গে তারিখের উল্লেখ করে চুক্তি হয়েছিল।

যাই হোক, ঘণ্টাখানেক ধরে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করা সত্ত্বেও তিনি আরও মাস ছয়েক সময় দিতে চাইলেন না। তখন শুধু বেগতিক নয়, অন্ধকার দেখলুম! আমার সাহিত্য-জীবনে বড় একটা কথার খেলাপ হয় না। প্রতিশ্রুতি দিলে পালন করি, নির্দিষ্ট তারিখ মেনে চলি এবং সম্পাদক বা প্রকাশককে কখনও হয়রান করিনে। সামান্য একটা কলম আর একখানা খাতা,—এই ত' আমার মূলধন! এর ওপরে শুধু আমি নয়, প্রত্যেক লেখকই দাঁড়িয়ে থাকে। সুতরাং অসময়ে যে প্রকাশক বা কাগজের মালিক অগ্রিম টাকা দিয়ে তোমাকে বিপদের থেকে উত্তীর্ণ করে দেয়, তার বিশ্বাসকে তুমি নষ্ট করবে? তুমি লেখক, নিত্য-অভাবগ্রস্ত, তোমার অসময়ে কি আর আসবে না বলতে চাও?

সুতরাং আমি বললুম, গিরীনবাবু, রাগ করবেন না। আগামী একমাসের মধ্যে হয় আপনার নগদ তিনশ' টাকা, আর নয়ত একখানা নতুন-লেখা উপন্যাস আপনার হাতে দিয়ে যাব। আমার ভাগ্নির বিয়েতে যে অসময়ে আপনি টাকা দিয়েছিলেন, সে আমি ভুলিনি।

গিরীনবাবুর লম্বা মুখখানা লম্বাই হয়ে রইল। আমি চলে গেলুম।

সুকিয়া স্ট্রীটের মোড় থেকে আবার বাসে উঠলুম। এখান থেকেও কালীঘাট দু আনা। যেতে যেতে পটলডাঙ্গার মোড়ে একটা সিগারেট ধরালুম। তখন চলন্ত বাসের মধ্যে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ নয়। পথের দিকে চেয়ে নিজের মনে ধূমপান করা মানে দুশ্চিন্তার মধ্যে ডুবে যাওয়া! তিনশ' টাকা! বস্তুত, তিনশ' টাকা একসঙ্গে জীবনে কবারই বা দেখেছি? সুতরাং চৌরঙ্গী দিয়ে যাবার সময় আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছিলুম!

হাজরা রোডের মোড়ে নেমে যখন শ্রীমতী শোভার ওখানে গিয়ে পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যা ছটা বাজে। আমার মেজাজটা ভাল ছিল না।

আমি যখন ওঁদের বাড়ির দোতলায় উঠে এলুম, শ্রীমতী শোভা আমাকে একবার নিরীক্ষণ করলেন। পরে বললেন, এত দেরি করলেন যে? সেই পাগলা মেয়েটার ওখানে থেকে হয়ে এলেন বুঝি?

ওঁর দিকে ফিরে দাঁড়ালুম। ওঁর কথায় শ্লেষের আওয়াজ ছিল। সুতরাং আমার মুখে এসে পড়ল,—সেখানে গেলে কি আর এত সকাল-সকাল ছেড়ে দিত? বসে বসে তার গান শুনতুম!

শ্রীমতী শোভা উঠে আমার সঙ্গে তাঁর ঘরে এসে ঢুকলেন। [ক্রমশ]

মানিক গ্রন্থাবলী

দশম খণ্ড আশ্বিন / ১৩৮০

প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে। উক্ত খণ্ডে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুষ্প্রাপ্য উপন্যাস ও গল্পগুলি সংযোজিত হয়েছে ॥ ১৪, ॥ মূল্য ১১·২০ ॥ নবম খণ্ড পর্যন্ত প্রতি খণ্ড ১৪, ॥ গ্রাহক-মূল্য ১১·২০ ॥

বনফুল রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড আশ্বিন / ১৩৮০

প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে। এই খণ্ডে বনফুলের (ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) তৃতীয় দশকের বিশিষ্ট উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি সংযোজিত হয়েছে ॥ ১৫, ॥ গ্রাহক-মূল্য ১২, ॥ দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রতি খণ্ড ১৫, ॥ গ্রাহক-মূল্য ১২, ॥

বিঃ দ্রঃ—কাগজ ও ছাপার মূল্য বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাবলীর পরবর্তী সংস্করণের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়তো রোধ করা যাবে না। এখনও যাঁহারা গ্রাহক তালিকাভুক্ত হতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১০, টাকা জমা দিয়ে (মফঃস্বলের গ্রাহকগণ মানি-অর্ডারযোগে) আগামী মহালয়া/১৩৮০ মধ্যে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলি এখনকার মূল্যেই পাইবেন। যোগাযোগ করুন।

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ
১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-১২

(সে ৮৩৩২)

ফুলের মত
সতেজ সৌন্দর্য্যে
উদ্ভাসিতা...
এ শাড়ী
প্রস্তুতকারী-
এস আর এম
মনলোভা, অনুপম
বহুবিচিত্র ডিজাইন থেকে
পছন্দমত বেছে নিন।
ফুল-ভয়েল / সেমি-ভয়েল।
'টেরিন'/ কটন।
এবং বুটা।
এছাড়াও পাবেন:
• শুটিংস্
• শার্টিংস্
• ধুতি
• পোশাকের নানান বস্ত্র
SRM
CHOICE FABRICS
শ্রী রাম মিলস্ লিমিটেড
গণপৎরাও কদম মার্গ, লোয়ার প্যারেল,
বোম্বাই ৪০০ ০১৩
OBM-0565-BEN

॥ দশ ॥

'কে ? কে ? কে—এ এ এ!' ...চন্দ্রনাথ কাকাতুয়াটার দিকে তাকান। এই একটি মাত্র বুলি কাকাতুয়াটা জানে। শেখানো হয়েছে, এবং শেখাবার উদ্দেশ্য যাই থাক, ও যাকেই দেখে, ডাকে, প্রত্যেককে লক্ষ্য করে, নিরীক্ষণ করে দেখে ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে, আর কেউ কাছে গেলেই পালক ফোলায়, নিচু হয়ে দাঁড়ের ওপর দিয়ে, পিছু হটে—দৃষ্টিতে সন্দেহ, যেন আক্রান্ত হতে চলেছে, প্রতিহতের জন্য প্রস্তুত। রেলিঙের ওপরে, অর্ধবৃত্ত খিলানের সবুজ রঙ কাঠের ঝালরির নিচে কাকাতুয়ার দাঁড় ঝোলানো, বৃষ্টি-ধোয়া স্বর্ণচাঁপার বড় বড় সবুজ পাতার ছায়া ওর গায়ে। গাছটা কয়েক হাত দূরেই, দোতলার ছাদ অবধি উচ্চতায় পৌঁছয়নি। অচলা অদৃশ্য, চন্দ্রনাথ দীর্ঘ বারান্দার ডাইনে বাঁয়ে তাকান।

পুবে খোলা, উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ বারান্দা, থামের পরে থাম, থাম থেকে থামের মাঝখানে অর্ধবৃত্ত খিলানে কাঠের ঝালরি স্থায়ীভাবে বন্ধ বারান্দা ছায়া ছায়া অন্ধকার লাগে, পায়রারা ডাকে নিরন্তর আর থামের খাঁজে ভীড়ে। গন্ধ পায়রার বিষ্ঠার আর খাঁচার পাখিদের এবং আরো নানাবিধ গন্ধ, বন্ধ পাখিদের, যাদের খাঁচাগুলো সিঁড়ির সামনেই সারি সারি রাখা। নানা আকৃতির নানা বর্ণের পাখি, প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন, যাদের অধিকাংশের নাম চন্দ্রনাথ মনে রাখতে পারেন না। দূরে পাহাড় জঙ্গল থেকে ফাঁদ পেতে ধরে আনা পাখি, কোনোটা প্রায় ময়ূরের মতো বড়, কিন্তু রঙ আগুনের মতো, বড় চোখ গোল, ডাকে অনেকটা চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণীর মতো, এবং জোড়া পৌঁছেও মেলে না, ডিম পাড়ে না। কেন ? নিলর্জের মরশুম বছরের কখন আসে, কখন চলে যায়, হয়তো এই প্রাসাদের বারান্দায়, বাতাসে তা ধরা পড়ে না, কিন্তু অন্য অনেক পাখি, বন্ধ খাঁচাতেও মেলে, ডিম প্রসব করে, কখনো কখনো বেঁচে যায়। চন্দ্রনাথের চোখে গভীর মমতা, স্নেহের অভিব্যক্তি মুখে, ভালবাসেন এই সব পাখিদের, আর মনে মনে কষ্টও পান। এই যে এক অতিকায় টিয়া, বড় খাঁচার দাঁড়ে বসে নানা খেলা করে, আর খালি ঠকঠকে ধারালো চঞ্চু দিয়ে, মাঝে মাঝে লোহার জাল কাটবার চেষ্টা করে, ও নাকি টিয়ানী—অর্থাৎ মেয়ে। ও টিয়া-ই কী না, কে জানে, কেননা এতো বড় টিয়া কখনো দেখা যায় না, সংগ্রাহক দীনেন্দু জানিয়েছে, ও টিয়ানী। একা ধারালো লাল চঞ্চু দিয়ে প্রায়ই লোহার জাল কাটবার চেষ্টা করে, পারে না, তা-ই সকলের অলক্ষে একদিন চন্দ্রনাথ খুলে দিয়েছিলেন ওর খাঁচার দরজাটা, চোখে মুখে শিশুর উত্তেজনা আর ভয়, কিন্তু অতিকায় টিয়ানীটা সেই মুহূর্তে, পিছু হটে চন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়েছিল ঘাড় বাঁকিয়ে, নজর মোটেই খোলা দরজার দিকে ছিল না। চন্দ্রনাথের উত্তেজনা তখন চরমে, পক্ষীটার বোকামিতে, বিরক্ত ক্ষুব্ধ। ভেবেছিলেন, তিনি কাছে আছেন বলে বেরিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না, তাই সরে গিয়েছিলেন দূরে, এবং তাঁর বুকের বক্ষ তোলপাড় করে টিয়ানীটা ধীরে, অতি ধীরে এসেছিল দরজার কাছে, এসে মুখ বাড়িয়েছিল দরজার বাইরে, লক্ষ কিন্তু—আশ্চর্য, চন্দ্রনাথের দিকে, এবং ঝটিতি দরজার কড়া চঞ্চুতে কামড়ে টেনে বন্ধ করে দিয়েছিল, আর তারপরেই দীর্ঘ বারান্দা ঘর ফাটিয়ে কর্কশ স্বরে চিৎকার করে উঠেছিল। চন্দ্রনাথ অবাক। খোলা দরজা পেয়ে পক্ষী ওড়ে না, উপরন্তু অতি সাবধানে, আত্মরক্ষার জন্য, তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে, যেন খাঁচার না, ঘরের, এবং তারপরে চিৎকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, সংবাদ প্রচার।

প্রায় আড়াই ফুট দীর্ঘ টিয়ানীটার দিকে তাকিয়ে, চন্দ্রনাথ একটু হাসেন, ওর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি চন্দ্রনাথের দিকে। চন্দ্রনাথ একবার দক্ষিণ দিকে তাকান, বারান্দার ওদিকে মোড় নিয়ে। দক্ষিণ খোলা। অচলা অদৃশ্য, তিনি উত্তরে যান। দু' ঘর ছাড়িয়ে, বাঁ দিকে সরু বারান্দায় ঢোকেন, ডান দিকে খোলা দরজা ঘর। শূন্য ঘর, কেউ নেই, দেওয়াল ঘেঁষে দুটো কাঠের আলমারি, এক পাশে একটি পুরনো খাট, বিছানা পাতা, মশারি খাটানো, এত বেলাতেও তোলা হয়নি। বাঁ দিকের ভেজানো দরজা ঘরের ভিতর থেকে অস্পষ্ট শব্দ আসে, মেয়ের স্বরে, 'হা বুটু হা বুটু চু চু চু' এবং তার সঙ্গে আরো অস্পষ্ট শিশুর খুশির গোঙানি, বোঝা যায়, শিশুকে সামলায়, খেলায় ভোলায় বাঁচি নামে মেয়েটা, যা ওর কাজ। চন্দ্রনাথ সামনের খোলা দরজা দিয়ে, পাশের ঘরে যান। বড় ঘর, ছোটকার শোবার ঘর, মৃগেন্দ্রনাথ যাঁর নাম। দুই দরজা, পুবে বারান্দার দিকে, এখন বন্ধ। ফুলের গন্ধ ছড়ানো ঘরে, আসলে ফুলের না, তেল আর নানাবিধ প্রসাধনের। উত্তরের খোলা জানালার ধারে, পিছন ফেরা মালতী, অহঙ্কারিকা—যক্ষ আহ্বান বহে নিয়ে নিচে গিয়েছিল অচলা। মালতী—ছোটকার বউ—নীল চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ির ঘোমটা, খোঁপা পর্যন্ত তোলা। বাঁ হাত খাটের বাজুতে, ডান হাত কোমর ছাড়িয়ে শিথিল ভাব, শাঁখা আর সোনার চুড়িতে ঝিলিক। ঘোমটায়, পিঠে, কটিতে কোমরে কিছু নীল নীল ফুল

ফণিভূষণ আচার্যের
নতুন কবিতার বই
ধর্মদা আর কতদূর ৪,
পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ ॥ ফোন : ৩৪-৬৫৯২
(সি ৮৮৭৪)

জড়ানো। পাড়ের কুঞ্জের সঙ্গে মিলিয়ে, চওড়া নকশা আঁচলের একদিকে চাবির গোছা। শুড়ির সাদা পাড়ের জমিনের নিচে, জামা আর শায়া দেখা যায়। চন্দ্রনাথের উপস্থিতি যেন এক স্পষ্ট ছবির মতো প্রত্যক্ষ, মালতীর পিছন ফেরা মস্ক্রারির লম্বা শরীরে মেদহীন, এখনো যেন কাঁচ শ্যামলী লতার মতো, তার মধ্যে একটি সোনালি চিকনতা।

বড় খাট, উঁচু, সেকেলে ধরনের, ওঠবার জন্য জলচৌকি পাতা, মোটা গদী বিছানায়, মাথার আর পাশ বালিশ একদিকে জড়ো করা, একটি অয়েল ক্লথ একদিকে ভাঁজ করা। চন্দ্রনাথ খাটের এ-পাশে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ান, ও-পাশে মালতী। চন্দ্রনাথ পুব দিকে, খাটের ধার দিয়ে, মালতীর দিকে এগোন, এবং তখনই, মালতী ডান দিকে ফিরে চন্দ্রনাথের মুখোমুখি হয়, চন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে পড়েন। মালতীর চোখের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি তুলে তাকান, উত্তরের জানলার ওপরের দেওয়ালে, যেখানে কালো ভেলভেট জমিনের ওপরে মুগা সুতায় সুচের কাজে লেখা আছে, 'যাও পাখি বলো তারে/সে যেন ভোলে না মোরে।' নিচে এক পাশে লেখা, 'মালতী।' কিন্তু সেলাইয়ের কাজে কোথাও কোনো পাখি নেই, শুধু কথাগুলোর জন্যই সেলাই করা।

'এদিকে আসার ইচ্ছা ছিল না বোধ হয়?' মালতীর স্বরে অভিমানের গাঢ়তা, অথচ কালো চোখের দৃষ্টিতে যেন একটি উদাস বিষণ্ণতা।

চন্দ্রনাথ আবার তাকান মালতীর দিকে। কপালে সিঁদুর ফোঁটা, সিঁথায় আঁকা, একটু ম্লান, কারণ বাসি। মুখের গঠন একটু গোল, ঠোঁট খুব পাতলা না, নাক তেমন টিকলো না, কিন্তু হীরার নাকছাবি যেন এই নাকেরই তুল্য, অথচ হীরার দ্যুতি কোথাও নেই মুখে। সরু কালো ভুরুর নিচে চোখ দুটি যেন গভীর কালো জলের মতো, পড়ন্ত রোদের ম্লানতা, তথাপি গভীর। মাঝখানের সিঁথি থেকে, দু' পাশে নামিয়ে দেওয়া, পিছনে টান চুল খোঁপায় জড়ানো। এই মুখ, এই মূর্তি, এই ঘর, এই গন্ধ, আর একটি জিজ্ঞাসা, কেবল যে বকুলতলা ক্লাব বাড়ি থেকে বহু দূরে মনে হয়, তা না। মনে হয়, যে-পৃথিবী এখন যুদ্ধ উন্মাদনায় আকাশ বাতাস কাঁপছে, হত্যা দিকে দিকে, বিবিধ ভয়ংকর অস্ত্র বিমান জলযান নিয়ে ছুটোছুটি করে, মেরে হেরে জেতে, তার থেকে অনেক—অনেক দূরে। চন্দ্রনাথের মনে হয়, তিনিও অনেক দূরে, পৃথিবীর বাইরে, নিভৃতে, মালতী নামে এক গ্রহে। তাঁর মুখে একটু হাসি ফোটে, দৃষ্টিতে বিব্রত ভাব, বলেন, 'ইচ্ছা থাকা আর আসা, দুয়েতে অনেক তফাত নেই?'

মালতী চুপ করে থাকে, হঠাৎ কথা বলে না, যেন চন্দ্রনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে, কথার সত্যতা যাচাই করে। তারপরে একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'বুঝি না।'

'কেন?' চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি বোঝ না কেন?' বলতে বলতে তাঁর দৃষ্টি যেন অসহায় হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে একটা ব্যাকুলতা, বলেন, 'নিজেকে মনে হয়, আমার শরীর বলে কিছু নেই, আমি একটা ছায়া। ভূতের মতন শব্দ না করে তোমার অন্দরের চারপাশে ঘুরে বেড়াই।'

মালতী কিছু বলে না, তার মন নয় বুকে নিশ্বাসে ফুলে ওঠে, চোখে একটি চকিত কষ্টের ছায়া নামে, এগিয়ে আসবার উদ্যোগ করে এক পা এগিয়ে থেমে যায়। চন্দ্রনাথ আবার বলেন, 'একটু সুখ, কিন্তু অনেক বড় দুঃখ, ভেবে দেখ।'

মালতীর দৃষ্টির কষ্ট যেন যন্ত্রণায় তীব্র হয়, নাকের হীরা কেঁপে যায়, এবং একটি জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তি ফোটে। আর এক পা এগোয়। প্রশ্ন আটকে যাওয়া স্বরকে মুক্ত করে বলে, 'কেন, দুঃখ তোমার কাছে বড় কেন?'

চন্দ্রনাথ যেন হাসবার চেষ্টা করেন,

সিগনেট প্রেসের বই

খাতাঞ্চির খাতা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটদের মনের এক আশ্চর্য খোরাক অবনীন্দ্রনাথের 'খাতাঞ্চির খাতা।' বড়রাও পড়তে পড়তে ছোট হয়ে-যাওয়ার মিষ্টি এক অনুভূতির আস্বাদ পাবেন। অর্ধশতাব্দী পরে প্রকাশিত 'খাতাঞ্চির খাতা' শুধু গল্প নয়, অবনীন্দ্রনাথের কলম-তুলিতে আঁকা এক বিচিত্র রঙিন চিত্র। দাম ৩·৫০

নতুন সংস্করণ : **সুকুমার রায়**

আবোলতাবোল ২.২৫, ৩, ঝালাপালা ৪,
পাগলা দাশু ২.৫০, ৩.২৫ হযবরল ১.৫০
খাইখাই ২.২৫, ৩, বহুরূপী ২.২৫, ৩,
বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ ২.৫০

সিগনেট বুকশপ : ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

(সি ৮৬৩৩)

কম দাম,
দেখতে দামী!

কমলার
নাইলন মিটেক্স জামার কাপড়
তৈরি হয়েছে বাছাই করা উৎকৃষ্ট
নাইলন আর পলিয়েস্টার সুতো থেকে।
ঝলমলে উজ্জ্বল স্ট্রেচ বা ক্রিম্প।
'নিট' করাও পাওয়া যায়'
বিশেষ ধরণের সিলিকন ফিনিশ,
ফলে, স্পর্শে কোমল আর হাল্কা।
এ একেবারে গ্যারান্টি। রকমারি
রঙীন প্রিন্টের বিরাট সম্ভার।
আর মিটারের দাম মাত্র ১০ টাকা
থেকে ১৫ টাকার মধ্যে।

বলেন, 'আমার কাছে দুঃখ বড় না, দুঃখ আপনা থেকেই অনেক বড়। তার যেন কোনো সীমা পরিসীমা নেই।'

মালতী কথা শোনে, কথার পরেই যেন তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারে না, এক পলকের জন্য সে চোখ বোজে, আবার তাকায়। না, জল তার চোখে নেই, কিন্তু শুকনো চোখ যেন একটু লাল, বলে, 'সুখকে আমার বেশি ভালো লাগে। এক এক সময় মনে হয়, আমার বড় সুখ।'

চন্দ্রনাথ সেই মুহূর্তেই জবাব দিতে পারেন না, মালতীর চোখের দিকে তাকান, এবং চোখ থেকে মালতীর শরীরের দিকে। মালতী এগিয়ে খাটের এক কোণে আসে, তাকে এবার সম্পূর্ণ দেখা যায়, নীল পাড়ের নিচে, আলতা পরা পা, রুপোর আঙটি দু' পায়ে জোড়া জোড়া। আবার বলে, 'তুমি সুখকে বড় করো না কেন, সবই তো তোমার হাতে। আমার দুঃখ তো তোমার জন্য, তুমি থাকলে, আমার কোনো দুঃখ থাকে না।'

চন্দ্রনাথ আবার যেন হাসবার চেষ্টা করেন, যা হাসি না, বুক থেকে উঠে আসা একটা কষ্টের মতো, বলেন, 'কেমন করে থাকি ছোট? এমনিতেই তোমার হাতে বিষ তুলে দিয়েছি।'

চন্দ্রনাথের কথা শেষ হবার আগেই, মালতীর গলা থেকে অস্ফুট আর্তনাদের শব্দ হয়, তার পরে জোরে মাথা নাড়ে। চোখ বোজা, মুখে যেন কান্নার অভিব্যক্তি, এবং কষ্টকে দমন করবার জন্যই যেন দু' হাত দিয়ে, উরুতের শাড়ি চেপে ধরে মুঠিতে। চন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন স্বরে ডাকেন, 'ছোট। ছোট।'

মালতী মাথা নাড়তে নাড়তেই, ফিসফিস করে বলে, 'বলো না, আর ও কথাটা বলো না। বিষ তুমি দাওনি।'

চন্দ্রনাথ এবার প্রকৃতই হাসেন, কিন্তু দৃষ্টিতে যাতনা, বলেন, 'আমার এক এক সময় মনে হয়, তাই বলি।'

মালতী কথা বলে না, নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করে, এবং সে স্থির হয়, চোখ মেলে চন্দ্রনাথের দিকে তাকায়, বলে, 'বিষ?'

মালতীও এবার একটু হাসবার চেষ্টা করে, এবং কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে চন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপরে বলে, 'তবে তুমি আরো বিষ দাও। যতো তোমার বিষ আছে, সব দাও।'

চন্দ্রনাথ হাসেন, দৃষ্টিতে যাতনা, কথা বলেন না। দুজনেই চুপচাপ—মুখোমুখি, এই ঘর পৃথিবীর বাইরে। চন্দ্রনাথ জানেন, মৃগেন্দ্রনাথের কয়েকটি ঘরের এই সীমানায় প্রবেশের পথ এখন বন্ধ, অদৃশ্য প্রহরী সেখানে সজাগ। মালতীর ডাক পাওয়া মানে ব্যবস্থা আগের থেকে স্থির। তাঁর চোখের সামনে ভাসে, দশ বছর আগের ঘটনা। বিবাহবাসর ছোট্টকার, স্থান নদীয়ার কৃষ্ণনগর। দীপেন্দ্রনাথ বরকর্তা, তাঁর কনিষ্ঠতম ভাইয়ের বিবাহ, পিতৃহীন, তিনি পিতৃতুল্য অগ্রজ। মৃগেন্দ্রনাথের বয়স তখন সাইত্রিশ আটত্রিশ, বর যাকে বলে, এবং কনের বয়স ষোল সতেরোর বেশি না।

জেনে শুনে, কেন এই বিয়ে? মাথায় যাঁর গোলমাল, বয়স যাঁর বিয়ের সীমা অতিক্রান্ত? না, বড়লোক জমিদার বলে না, চন্দ্রনাথের মনে আছে সব কথা। কৃষ্ণনগরের গরীব গৃহস্থ, রাখালমোহন মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথকে হাত জোড় করে, হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর কন্যাকে দীপেন্দ্রনাথের পরিবারে একটু আশ্রয় দেবার জন্য। এই হাত ধরার মধ্যে, এই ভিক্ষার মধ্যে, আর একটি যে রহস্য ছিল, তা দীপেন্দ্রনাথ আর রাখালমোহন ছাড়া কেউ তখন জানতেন না। তারপর কানাঘুষায় অনেক আলোচনা, অনুমানহীন গুজব, যাদের মানুষেরা ছড়িয়েছে এ অঞ্চলে, এই বাড়িতে, যদিচ সরব কেউ-ই না, কারণ নির্দিষ্ট প্রমাণ কারোর কাছে নেই।

চন্দ্রনাথ কথাটা দীপেন্দ্রনাথের কাছে প্রথম শুনেছিলেন। রাখালমোহনের সংগে, যোগাযোগের সূত্র ছিল, নদীয়ায় এই পরিবারের যা কিছু জমিজমা আছে, দেখাশোনার দায়দায়িত্ব তাঁর। রাখালমোহন যা হিসাব দিতেন, ফসলের বিক্রির যা অর্থ দিতেন, তা-ই গ্রহণ করা হতো, কারণ রাখালমোহন বা তাঁর পরিবারের সততা প্রশ্নের অতীত ছিল। সেই হিসাবে, রাখালমোহনকে দয়া করার থেকেও, সমীহই বেশি করা হতো, এবং চন্দ্রনাথ তাঁকে মুখুজ্জে জ্যাঠা বলে ডাকেন, দীপেন্দ্রনাথরা মুখুজ্জে

সতীনাথ গ্রন্থাবলী

সদ্য প্রকাশিত ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ১৮·০০

সম্পাদনা : শঙ্খ ঘোষ/নির্মাল্য আচার্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় স্মরণীয় রচনা

অগ্নিপুত্র ৪·০০

সবিতাব্রত দত্ত প্রযোজিত/বসন্ত পোদ্দার কর্তৃক একক অভিনীত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

পরিণয় মঙ্গল ৭, আমি সে ও সখা ৭,

দিব্যেন্দু পালিতের নতুন উপন্যাস

সম্পর্ক ৫, মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ ৫,

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মূল্যবান প্রবন্ধ গ্রন্থ

কবিতার ক্লাস ৫,

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ

শামসুর রাহমানের নতুন কাব্যগ্রন্থ

দুঃসময়ে মুখোমুখি ৪, বন্দী শিবির থেকে ২,

জুল ভের্ন/মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

স্টীম হাউস ৫·৫০ গডফ্রে মরগান ৫,

অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন : কলকাতা—১২

পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলকাতা—১২

(সি ৮৯৩৬)

বড়ো, কারণ তিনি দীপেন্দ্রনাথের থেকে বয়সে ছোট।

দীপেন্দ্রনাথের কাছে রাখালমোহনের প্রস্তাব শোনার থেকেও, চন্দ্রনাথের মন যে কারণে বিরূপ বিস্ময়ে তোলপাড় করে তুলেছিল, তা হলো, মৃগেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে। চন্দ্রনাথ প্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, যখন শুনেছিলেন, জ্যাঠামশাই সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ঠিক গ্রহণ করেছেন বলা যায় না, রাখালমোহনের প্রাথমিক প্রস্তাবের পরে, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে তাঁর গোপনে যে-আলোচনাই হয়ে থাক, তাঁদের আলোচনার মধ্যেই স্থির হয়েছিল, প্রস্তাবকে কার্যকর করতে হলে, মৃগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কন্যার বিয়ে হবে। যার অর্থ, জেনে শুনে নিতান্ত আশ্রয় দেবার জন্যই একটি অনূঢ়া কন্যাকে বিয়ে ঘটিয়ে নিয়ে আসতে হবে। দীপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, জ্যাঠামশাই নিজেই নাকি বলেছেন, একটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে তো আর এমনি বাড়িতে এনে রাখা যায় না, তার একটি পারিবারিক পরিচয় চাই, আর সেই পারিবারিক পরিচয়ের জন্য, যার বিয়ের কথা কেউ কখনো চিন্তা করেননি, সেই মৃগেন্দ্রনাথকে

লিনটাস-V.29-140 BG
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

স্থির করা হয়েছিল। জ্যাঠামশাইয়ের আরো বক্তব্য ছিল, মৃগেন্দ্রনাথের মাথা খারাপ থাকতে পারে। সেটা উন্মাদের পাগলামি না, তাকে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়েও রাখা হয় না। সে শান্ত, কথা বলে না। কিন্তু আর দশজনের মতো তার স্বাস্থ্য ভালো, শরীরে কোনো রোগ নেই। তার নিজস্ব সম্পত্তি কিছু কম নেই। যদিও সম্পত্তি ভাগাভাগি অদ্যাবধি হয় নি, তথাপি, পরিবারের সমগ্র সম্পত্তির মালিকানা চার ভাইয়ের। দুজন গত, দুজন জীবিত। দুজনের সন্তানাদি আছে, একজন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়েছেন। কে বলতে পারে, মৃগেন্দ্রনাথের বিয়ে হলে তার কোনো সন্তান হবে না? সে হয়তো মুখে বলতে পারে না, বা সে অনুভূতি বা আকাঙ্ক্ষা তার নেই। কিন্তু তার হয়তো বংশরক্ষা হতে পারে।

দীনেন্দ্রনাথের মুখে এ সব কথা শুনে চন্দ্রনাথের একেবারে অযৌক্তিক মনে হয় নি, তথাপি তাঁর মনটা খচখচ করেছিল। ছোটকার কথা তাঁর বার বার মনে হয়েছিল এবং তিনি দীনেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলেন, রাখালমোহনের কন্যার বয়স ষোল সতেরো। চন্দ্রনাথ আর একবার আহত বিস্ময়ে চমকে উঠেছিলেন এবং দীনেন্দ্রনাথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, তারপরে বলেছিলেন, 'জ্যাঠামশাই কিছু ঠিক করে থাকলে আমার কিছু বলার থাকতে পারে না, কিন্তু বড়দা, আমার কেমন মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

দীনেন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'কেন, ভাবী ছোট কাকীমার দুঃখে?'

চন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'না, যাঁকে কখনো চোখে দেখি নি, তাঁর দুঃখের কথা কী করে ভাববো। আমি ভাবছি, ছোটকা এখন এক রকম আছেন, খান দান, মাথামুণ্ডু কী সব ভাবেন, মাঝে মাঝে পুকুরে ছিপ ফেলে চুপচাপ বসে থাকেন, বাড়িতে একটা লোক আছেন কি না আছেন, টেরও পাওয়া যায় না কিন্তু ধরো, বিয়ের পরেই এই ছোটকা বদলে গেলেন, তখন?'

'কী রকম? কী করবেন ছোটকা?' দীনেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন।

মৃগেন্দ্রনাথ আর দীনেন্দ্রনাথের বয়স প্রায় সমান। চন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'অনেক কিছুই হতে পারে।

ছোটকাকে কি আমরা ঠিক বুঝি? ধরো, হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন?'

দীনেন্দ্রনাথ কথাটা শুনে ভুরু কুঁচকে একটু চুপ করেছিলেন। চন্দ্রনাথ দীনেন্দ্রনাথকে কথাগুলো বলেছিলেন, কারণ, দীনেন্দ্রনাথের কথা জ্যাঠামশাই কিছুটা মানেন এবং দীনেন্দ্রনাথ যদি বাধা দেন, তা হলে জ্যাঠামশাই নতুন করে ভাবতে পারেন। কিন্তু দীনেন্দ্রনাথ হেসে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'তুই বেশি কবিতা নভেল পড়িস তো, অনেক বেশি ভাবছিস। ছোটকা ক্ষেপে যেতে পারেন বলে আমার মনে হয় না, হয়তো ভালোও হয়ে যেতে পারেন। বাবা যা ঠিক করেছেন, ভেবে চিন্তেই করেছেন। মা কাকীমা সকলের সঙ্গেই বাবা কথার্বার্তা বলেছেন। সকলেই রাজী। তা ছাড়া মুখুজ্জে খুড়োর কথাটা ভাবতে হবে, আর ভাগ্যের কথাটাও ভাবতে হবে। কার ভাগ্যে কী আছে, আমরা কি তা বলতে পারি?'

চন্দ্রনাথ তথাপি ভেবেছিলেন এবং একটু সংকোচের সঙ্গে বলেছিলেন, 'সেজদার জন্য তো পাত্রী দেখা চলছে, ওর সঙ্গে এ বিয়ে দেওয়া যায় না?'

সেজদা বলতে নৃপেন্দ্রনাথকে বোঝায়, দীনেন্দ্রর তৃতীয় ভাই। দীনেন্দ্রনাথ একটু হেসে বলেছিলেন, 'বাদির, তোর বুদ্ধি একটু অল্প। সেজোর সঙ্গে বাবা কখনো মুখুজ্জে খুড়োর মেয়ের বিয়ে দেবেন না, তা সে মুখুজ্জে খুড়ো যতো ভালো লোকই হোন।'

দীনেন্দ্রনাথ কথাটা মিথ্যা বলেন নি, যতোই নিষ্ঠুর শোনাক। এবং তারপরে দীনেন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'এমন কি, তোর যদি মুখুজ্জে খুড়োর মেয়েকে বিয়ে করতেও ইচ্ছা হয়, বাবা তাও কখনো দেবেন না। দীপেন বাঁড়ুজ্জেকে আমি ভালোই জানি।'

দীনেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাঁর বাবার সম্পর্কে এরকম কথা বলে থাকেন, তার মধ্যে অশ্রদ্ধা কিছু নেই। দীনেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'হোক না। খারাপটাই কেবল ভাবছিস কেন, ভালোও তো হতে পারে?'

ভালো? হ্যাঁ, সেই ভালো দেখেছিলেন, একেবারে ছোটকার বিয়ের ছাঁদনাতলায়, যখন মালতীকে কনে সাজিয়ে বাইরে নিয়ে এসেছিল। চন্দ্রনাথের তখন তেমন কিছু মনে ছিল না, সকলের সঙ্গে আনন্দ করে, সিগারেট টেনে গলায় মালা দিয়ে চুনোট করা কাঁচির ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরে গায়ে আতরের গন্ধে বেশ মেজাজেই ছিলেন। অদ্ভুত লেগেছিল ছোটকাকে। তিনি কিছুই বলেন নি। বিয়ে কী, বা তিনি যে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, এ বিষয়ে যেন তিনি কিছুই জানতেন না। তাঁকে সাজানো হয়েছিল, তিনি সেজেছেন। তাঁকে দিয়ে যে সব নিয়মরক্ষা করানো হয়েছিল, তিনি তা করেছেন। মা জ্যাঠাইমা আর দুই বউদি এবং দিদিরা এবং আত্মীয় মহিলারাই সব কিছু করিয়েছিলেন। ছোটকা কোনো রকম বাধা দেন নি, আপত্তিও করেন নি, কেবল তাঁকে যে বিয়ের দিন খেতে নেই, সে সব বোঝালেও বোঝেন নি, খাবার ঘরে ঠিক সময় মতো সকলের সঙ্গে পাতা পিঁড়িতে গিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁকে পিঁড়ি থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয় নি, জ্যাঠাইমা নিজের হাতে তাঁকে একটু মিষ্টি আর সরবত পান করিয়ে হাত ধরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, ছোটকা বাধা দেন নি।

বিবাহবাসরের সেই আনন্দের মধ্যে কন্যাকে যখন আনা হয়েছিল, চন্দ্রনাথ থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। মালতীকে তিনি জীবনে সেই প্রথম দেখেছিলেন উজ্জ্বল হ্যাজাকের আলোয় এবং মুহূর্তের মধ্যে একটা কষ্ট বিদ্ধ ব্যথায় অপমানে তাঁর চোখে উৎসব যেন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, কেবল একবিন্দু আলোর মতো জেগেছিল মালতীর মুখ।

উৎসবের সেই অন্ধকার, এখনো যেন গভীর হয়ে আছে চারপাশে, আর আলোর বিন্দুটি এখনো পৃথিবীর বাইরে এই ঘরে তাঁর সামনে মুখোমুখি। দীনেন্দ্রনাথের কথা এখন মনে পড়ে যায়, 'কার ভাগ্যে কী আছে, কে বলতে পারে।'

(ক্রমশ)

আমাদের মাথার উপরে যে আকাশ, আমরা তাকে মহাশূন্য বলেই জানি। কিন্তু কত স্তরে মহাকাশের নানা রশ্মিকে প্রতিহত করে সে খবর কি রাখি?

নভোচারীরা মহাকাশে কেমন করে ভেসে থাকতে পারে? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কত দূর পর্যন্ত টানে? মহাকাশের সুদূরে যে সব মিটমিটে তারা দেখি—সেগুলো কত বড়? ধূমকেতু সত্যই কি অঘটন ঘটায়? এমন কত কি জানার আছে। অজস্র ছবি ভরা একেবারে নূতন ধরনের বই—আকাশ ও মহাকাশ প্রকাশ হয়েছে। ছোট বড় সকলের পড়ার মত বই। মহাকাশ যুগে এ বই না পড়লেই নয়। প্রকাশ করেছেন অমৃত প্রকাশন।

দাম—৮

পাবেন : প্যাপিরাস—৯ চিন্তামণি দাস লেন ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে।

(সি ৮২০২)

দিদির বাড়ী থেকে
ঘুরে আসার পর
এই মহিলা
অনিন্দ্যসুন্দর
হয়ে উঠেছেন।

Lakmé
SATIN GLOW
LIQUID
MAKE-UP

ল্যাকমে স্যাটিন গ্লো

লিকুইড মেকআপ

সংবাদ

শশিকলা কাকোদকরের মুখ্যমন্ত্রী হবার খবর মহিলাজগতের মস্ত সংবাদ। মহারাষ্ট্র-বাদী গোমন্তক পার্টির সরকার গোয়া, দমন ও দিউতে। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন স্বর্গীয় বান্দোদকর। বান্দোদকরের কন্যা শশিকলা। সত্তর সালে কিছু দিনের জন্য যখন গোয়াতে গিয়েছিলাম তখনও রাজনৈতিক পরিবেশে প্রভাবে পিতা বান্দোদকরের বদলে কন্যা কাকোদকরের মুখ্যমন্ত্রী হবার সম্ভাবনা খুব প্রবল হয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাকোদকর সাহেব সামলে নিয়েছিলেন ব্যাপারটি। এখন তাঁর তিরোধানে শশিকলার মনোনয়নে বাধা রইল না।

শশিকলার বয়স মাত্র আটত্রিশ। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী যাঁরা হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠা। বান্দোদকর পরিবার কেন্দ্রশাসিত দমন দিউ গোয়ার ধনীশ্রেষ্ঠদের মধ্যে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান পরিবার। শশিকলা শৈশব থেকেই শিক্ষা ও সম্যক কৃষ্টিলাভের সুযোগ পেয়েছেন। বিদেশে স্বদেশে সর্বত্র তাঁর উপ-যুক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার অবকাশ হয়েছে। তিনি নানা ভাষায় ব্যুৎপন্না। ফরাসী জানেন। আর জানেন পর্তুগীজ। গোয়ার সংস্কৃতিতে পর্তুগীজ প্রভাব আজও প্রকট। সাধারণ মানুষ সমানে পর্তুগীজ শিখেছে। আমরা যেভাবে ইংরাজী শিখেছিলাম তার চেয়েও নিষ্ঠভাবে তারা শিখেছিল পর্তুগীজ ভাষা। কাজেই শ্রীমতী কাকোদকরের পর্তুগীজ জানা আশ্চর্যের কিছু নয়।

শশিকলা কাকোদকর মহিলা সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে সচেতন। মহিলারা ঘরের বাইরেও আগ্রহশীল হবেন, রাজনীতিতে নামতে পারবেন—এই শশিকলার ইচ্ছা। গোয়া ছোট, কিন্তু তার মহিলাসমাজ মুক্ত পরিবেশ ও স্বাধীন চলাফেরায় অভ্যস্ত। মৎস্যজীবিনী থেকে নিয়ে উচ্চ মহল পর্যন্ত মহিলারা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। শশিকলার মুখ্যমন্ত্রিত্ব তাদের অগ্রগতির সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করি।

*

১৯৭২ সালে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের দুইশত বছর পূর্ণ হয়েছে। ১৭৭২ সালের ২২শে মে রাধানগরে জন্ম হয়েছিল এই মহাপুরুষের। শ্রীমতী যমুনা নাগ এই ... জীবনী প্রকাশ করেন। বইখানা ইংরাজীতে প্রথম লেখা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ হয়েছে। বাংলা অনুবাদটি যন্ত্রস্থ। সম্প্রতি যমুনা নাগ দিল্লি গিয়ে বইখানা শ্রীমতী গান্ধীকে উপহার দিয়ে এসেছেন।

ভারতের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের দানের তুলনা হয় না। লেখিকা বলেন, সে কথা সবাইকে মনে করিয়ে দেবার জন্যই বইটির প্রয়োজন ছিল। বইখানা ১১টি পরিচ্ছেদে ভাগ করা। তার মধ্যে anecdotes বা টুকরো সত্য কাহিনী সংগ্রহ সম্বন্ধে লেখিকাকে অভিনন্দন জানাই। মানুষ ও মনুষ্যত্ব সংক্রান্ত প্রয়োগবাদের নিদর্শন হিসাবে টুকরো কথা সব অতি চমৎকার।

রামমোহনকে জোর করে তিনটি বিবাহ দেওয়া হয়। কিশোর রামমোহন কিছু করতে পারেননি। তাঁর এক স্ত্রী অল্প দিন পরে মারা যান। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন রামমোহন।

সেকালে একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার ঘটনা মাঝে মাঝে হতো। রামমোহনের বিশেষ ভক্ত নন্দকিশোর বসুর বিবাহেও তাই হয়েছিল। নন্দকিশোরকে পরমাসুন্দরী মেয়ে দেখানো হয়। বিয়ে হলো অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে। সে সুন্দরী ছিল না। নন্দকিশোর ক্ষেপে গেলেন। শ্বশুর মহাশয়কে জব্দ করার জন্য দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে উদ্যত হলেন। রামমোহন খবরটি শুনে অতিমাত্র উদ্বিগ্ন হলেন। নন্দকিশোরের কাছে নিজে গেলেন ও তাকে এ কাজ করতে মানা করলেন। বললেন, "তোমার পত্নী সুরূপা না হলে কি আসে যায়? যদি তার গর্ভে সুযোগ্য পুত্রের জন্ম হয় তবে তাকে সুন্দরী মনে করা তোমার

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে বই উপহার দিচ্ছেন যমুনা নাগ

আপনি কি রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ড যেতে চান!! তাহলে আজই কিনুন।
দীপককুমার সরকারের
রূপতীর্থ রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ড ৬·৫০
হোমকুণ্ড অভিযানের এক বিস্ময়কর ভ্রমণকাহিনী।
পরিবেশক : ক্লাসিক প্রেস, ৩/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
প্রাপ্তিস্থান : অভ্যুদয়, ২২/২এ বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—৩
জনতা...., ৩৬৬ ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা—৩৪
(সি ৪৪৩১)

উচিত।" নন্দকিশোরের পুত্র ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ উত্তর জীবনে এক বিশিষ্ট নেতা, সমাজসেবী ও মহাপণ্ডিত বলে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

এ ধরনের ছোটখাটো কাহিনীতে এ অধ্যায়টি পাঠকপাঠিকার প্রিয় হয়েছে। বাকী সবটুকুই অবশ্য সুন্দর ও প্রাঞ্জল। আমরা আশা করছি বাংলা অনুবাদটিও তেমনই হবে। যমুনা নাগের শিল্পীসুলভ সৌন্দর্যবোধ সেখানেও সমান কার্যকর হবে বলেই মনে হয়।

যমুনা নাগের বইখানার সেকালের সমাজচিত্র আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ চিন্তাকর্ষক। চরস, গাঁজা ইত্যাদি নেশা নিয়ে আজ সারা দুনিয়ায় হৈচৈ চলেছে। সেদিন বাঙালী বড়লোক এ সব নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন ও অসৎ আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হতেন। আজ যেমন নেশার নিত্যনূতন নামকরণ হচ্ছে 'স্পীড, 'প্যাড' ইত্যাদি—তখনও তেমনই ছিল। নেশাখোর যুবক গোষ্ঠী নিজেদের পাখীর নামে ডাকতেন পাখীর মর্যাদার মাপ ছিল কে কত চরস টানতে পারে তার উপর! তাদের বাসগৃহ বা "ডেন" ছিল যেমন

সঞ্চয়ের আর এক পন্থা

দুবছরের ডাকঘর নির্দিষ্টকালীন জমা প্রকল্প

নতুন দুবছরের ডাকঘর নির্দিষ্টকালীন জমা প্রকল্প (টু ইয়ার টাইম ডিপজিট স্কীম) অনুসারে ভারতীয় ডাকঘরগুলি ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে বা অনুমোদিত এজেন্ট মারফৎ জমার টাকা গ্রহণ করবে।

সুদের হার শতকরা সাত টাকা আর তা বছর বছর পাওয়া যাবে। তবে তা আয় কর-এর আওতায় পড়বে।

উপার্জনের সূত্র থেকে কর কেটে নেওয়া হবে না। অন্যান্য অনুমোদিত বিনিয়োগের মত এক্ষেত্রেও আয় কর-এ রেহাই পাওয়া যাবে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত।

দুবছরের এই জমার খাতাগুলি দুবছরের সময়সীমার মধ্যে তিন বছরের করে নেওয়া চলে।

নতুন প্রকল্প চালু হয়ে গেছে 1973এর পয়লা আগস্ট থেকে

ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করুন

বিশদ বিবরণের জন্য এঁকে লিখুন:

ন্যাশনাল সেভিংস কমিশনার
গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া,
পো. ব.-96, নাগপুর
অথবা
আপনার রাজ্যের রাজধানীতে
রিজানাল ডিরেক্টার,
গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া,
ন্যাশনাল সেভিংস

davp 73/213

আজকাল নেশায় আসক্ত পুরুষদের খোঁজে। একদিন এক "পাখীর" শিকার তার সন্ধান করতে গিয়ে ঢুকলেন গহ্বরে। তাঁর পক্ষে তখন কাঠঠোকরা। বাপকে চিনতে পেরে ঠুকরে দিল হাতে। বাপ তো হতভম্ব! কিন্তু লেখিকা বলছেন, বাপেরা অর্থাগম, সহজ অলস জীবন, নানা বেপরোয়া আমোদে লিপ্ত থাকতেন বলে তাঁদের পুত্ররা এমন পথে যেতে পারতো। মায়েদের হাত ছিল না কোন কিছুতেই। তাঁরা বিপথগমন দেখতেন বসে বসে। অসংযমের প্রশ্রয় পিতারা দিতেন। ভাবছি আজও কি সেই একই কারণে "প্যাড"-এর পত্তন হয়েছে? মায়েরা তো আর অসহায় দর্শক নেই! তাঁরা শিক্ষিত ও স্বাধীন হচ্ছেন। তবে কেন যাব সমাজের সমস্যার সমাধান হয় না? মনে হয় কারণ অনুসন্ধান কোথাও গলদ রয়ে যায়।

টুকিটাকি

বর্ষাকালে চুল ও মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখা এক সমস্যা। চট্ করে চটচটে হয়ে উঠতে চায়, ময়লাও জমে ওঠে বাতাসের ভিজে ভিজে আর্দ্রতার মাঝে। যাঁরা হেয়ার ড্রেসারের দরজায় নিত্য হানা দিতে পারেন, তাঁদেরও সব সমস্যা সমাধান সেখানে মেলে না। যেমন ধরুন খাওয়া। গরম বা বর্ষায় সবার শরীর সমান সতেজ থাকে না। শরীরের সব অংশের মত চুলও পুষ্টি চায়। মাছ দুধ ডিম মাংস যাকে পুষ্টিতত্ত্বে "এ" গোষ্ঠীর আমিষ বলা হয় তা চুলের পক্ষে উপকারী। কিন্তু আজ কজন খেয়ে এ গোষ্ঠীর আমিষ যথেষ্ট পান? "বি" গোষ্ঠীর মধ্যে আছে আটা, ডাল, বিন ইত্যাদির প্রোটিন। তাও পুষ্টির জন্য চলতে পারে। যাঁরা নিরামিষ খান তাঁদের জন্য "বি" গোষ্ঠী বিশেষ দরকার।

ভারতীয় রন্ধন পদ্ধতিও পুষ্টির মাত্রা কমিয়ে দেয়। ভাজাভুজি তেলাক্ত খাদ্য ত্বকের ক্ষতি করে। সঙ্গে সঙ্গে চুলেরও জলুস বা ঔজ্জ্বল্য কমিয়ে দেয়। ফল ও তাজা শাক-সবজী যে ভিটামিন দেয় তার প্রয়োজন চুলের স্বাস্থ্যের জন্যও খুব বেশী।

মাথার ত্বকের মালিশ নিয়মিত করবেন। মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে ঘাড় থেকে নিয়ে মালিশ আরম্ভ করে সমস্ত মাথায় আঙুলে চালাবেন। তারপর ব্রাশ করবেন। লম্বা দাঁত বিশিষ্ট চিরুনি হলেও চলবে। ভাল করে ব্রাশ করলে চুলের স্বাভাবিক তেল সমান-ভাবে সর্বত্র পৌঁছোবে, অতিরিক্ত আবর্জনাও বেরিয়ে যাবে।

বর্ষায় বার বার শ্যাম্পু করা ভাল। প্রথম শ্যামপু দিয়ে ভিজিয়ে নেবার সময় ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করবেন। কারণ, তাতে ময়লা কাটবে সহজে। শ্যামপু করবার জলে ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে দিলে চকচকে ও প্রাণবন্ত দেখাবে চুল।

অনেক খুস্কির জন্য ওষুধ মেশানো শ্যামপু ব্যবহার করেন। তাতে খুস্কি হয়তো যায়, কিন্তু চুল রুক্ষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তখন শ্যামপু করার পরে মাথায় চুলের পক্ষে উপকারী ক্রীম মালিশ করা দরকার। বাজারে কনডিশানিং ক্রীম বলে যা বিক্রী হয় তা থেকে ভাল জিনিস বেছে কিনতে পারলে কাজ ভালই হবে। ক্রীম মালিশ করে গরম তোয়ালেতে মাথা জড়িয়ে কিছু সময় রাখলে চট্ করে ক্রীম চুলের গোড়ায় পৌঁছোবে। কনডিশানিং ক্রীমের আর একটি উপকার হচ্ছে চুলকে প্রখর রৌদ্রতাপ থেকে রক্ষা করা। যাঁরা বেশী বাইরে ঘোরাফেরা করেন তাঁদের পক্ষে কনডিশানিং ক্রীমের এ দিকটা উপেক্ষা করার নয়।

শ্রীমতী

তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

শেষ কোথায় ৪.৫০

রূপেরতন বলে চলেছে—মুকুট পিসেমশাই মানুষকে বড় ভালবাসতেন। সাতসকালে উঠেই বারবাড়িতে গায়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন গৌড়া, নুলো, অন্ধদের। সুখের ব্যবস্থা করছেন ঘোষাল এন্টারপ্রাইজের কর্মচারীদের। ফাঁকেফাঁকে ছুটছেন সোনারপুরে, বারুইপুরে। তখন মাথায় একটাই চিন্তা। আর সেই চিন্তাই একদিন বাস্তবে রূপ নিল। সদানন্দ কবিরাজ খরচ চিন্দার লেখা ভরজা—ওই যে নেতা, নয় বিধাতা, ভাগ্যদাতা নয়। তারপরই পুলিশের আওয়াজ। দূর থেকে ভেসে এল বুড়োমার গান—সুখদুঃখ কপালে লেখা, মরণ লেখা পা-য়।

আর ওদিকে তখন আর্ট-ও-হেয়ার-এ বসে লীনা ঘোষাল, পারিজাতকে বলছে, এখানকার মেয়েগুলো কি ধড়িবাজ। কত ছলাকলাই না জানে। পারিজাত বললে, জানবে না কেন। বাসরে কি মেয়েদের কিছু শিখিয়ে দিতে হয়। তাই তো এ-বিভাগের নাম দিয়েছি 'ক্ষণিক বাসর'। এই বংশরের নেশা ধরিয়ে দিতে হবে মানুষের মনে।

কয়েকটা চরিত্র নিয়ে উপন্যাসের কাঠামো হলেও অসংখ্য চরিত্রের ভিড় ঠেলে ঠেলে কাহিনীকে এগোতে হয়েছে 'শেষ কোথায়'-এর সন্ধানে। আর এইসব চরিত্রের মুখ দিয়েই মূল বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন লেখক।

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড : ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা—৯

নতুন ঘড়ির প্রচুর স্টক!
আর সবরকমের ঘড়ি
মেরামতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
টাইম কর্নার
১০৩/১, এস. এন. ব্যানার্জি রোড,
কলিকাতা-১৪ : ফোন ২৪-৩৯৮৫
চক্ষু পরীক্ষাসহ চশমা বিভাগ আছে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সেরা 'টেরিন' স্যুটিং-এর নিশানা এস. কুমারের নাম!

নতুন যুগের তালে তাল রেখে উৎকৃষ্ট বুনটের আকর্ষণীয় মনলোভা কাপড় তৈরী হয় ক্যাফি, মাদুরা আর লক্ষ্মী বিষ্ণুর মত স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে! আর এই সব সুন্দর 'টেরিন' স্যুটিং, শার্টিং আর শাড়ী আপনাদের জন্যে এনেছেন এস.কুমার! সারা দেশে আমাদের ধুরন্ধর সহযোগী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক আর সুব্যবস্থিত গবেষণার ব্যবস্থা থাকার ফলে আমরা জানি আপনাদের পছন্দ ঠিক কি—কারণ, আপনাদের পছন্দই আমাদের পছন্দ! জীবন রঙীন করে তুলুন···পরুন আপনার পছন্দমত কাপড়···উপভোগ করুন এক অপূর্ব অনুভূতি···আর এই অনুভূতিরই অন্য নাম—এস.কুমার!

'টেরিন' স্যুটিং, শার্টিং ও শাড়ীর ক্ষেত্রে এক নির্ভরযোগ্য নাম!

এস.কুমার, নিরঞ্জন, ৯৯, মেরীন ড্রাইভ, বম্বে ৪০০ ০০২,

SISTA'S-SK-3027-BEN

॥ আটাশ ॥

উদয়শঙ্কর ঠিক জানে না এখন সময় কত। সম্ভবত সকাল এগারোটা বেজেছে। চঞ্চল লণ্ডন নগরীতে হু-হু করে বয়ে চলেছে কর্মস্রোত। মানুষ হাঁটছে দ্রুত পায়ে। বাস যাচ্ছে, ট্যাক্সি যাচ্ছে। এক মুহূর্ত নষ্ট করার মত সময় কারুরই নেই।

শুধু উদয়শঙ্করই একমাত্র ব্যতিক্রম। কোনো কাজ নেই তার। সে বেকার এবং কপর্দকহীন। উদয়শঙ্করের ধারণা হয়েছে এই পৃথিবীতে একটি মানুষও নেই যার তাকে প্রয়োজন আছে। ছন্নছাড়া ভবঘুরের এক যুবকের মতন সে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়। তার জীবনধারণের আর কোন মানে নেই।

আজ প্রাতরাশ না খেয়েই নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে উদয়শঙ্কর। সে জানে তার ল্যাণ্ডলেডী তাকে ডাকডাকি করবেন, খুঁজবেন। তাঁর স্নেহের ভার বহন করার শক্তিও যেন আর নেই উদয়শঙ্করের। তিনি এসে দাঁড়ালেই তার নিজেকে কেমন দীন-দীন মনে হয়। বিষণ্ণ হয়ে ওঠে তার দু নয়ন।

ঈষৎ ভাবপ্রবণ হয়ে উদয়শঙ্কর তার ল্যাণ্ডলেডীকে এক সময় বলেছিল, "এত করছেন আপনি আমার জন্যে, আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি!"

"থাম বাছা! বেশী বকবক কর না!"

"বকবক না করে পারছি না। আমি কোথাকার কে, কবে টাকাপয়সা দিতে পারব ঠিক নেই, তবুও আপনি আমার জন্য এত করছেন! কত লোকসান দিতে হচ্ছে আপনাকে!"

ল্যাণ্ডলেডী হেসে হালকা গলায় বলেছিলেন, "তা তুমি কি করতে বল আমাকে? তোমার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দিয়ে বের করে দেব তোমাকে?"

"তাই দেওয়া উচিত।"

"বটে!" ল্যাণ্ডলেডী হাসছিলেন, "বেশ, আমি ভেবে দেখব।"

উদয়শঙ্কর বলেছিল, "একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে আপনাকে—ছোট্ট একটা নামে ডাকতে ইচ্ছে করছে—"

"বল না!"

উদয়শঙ্কর ডাকল, "মা!"

তার সেই নরম ডাক শুনে ল্যাণ্ডলেডীও বলে উঠেছিলেন, "মাই সান!"

উদয়শঙ্করের চলার গতি আরও শ্লথ হয়ে এল। এক-একবার সে তাকাচ্ছিল এপাশে-ওপাশে। দিন বড় পরিষ্কার আজ। রোদ না উঠলেও ঠাণ্ডা সাঁতসেঁতে ভাব ছিল না। একটা করুণ ছায়া ফুটে উঠেছিল উদয়শঙ্করের চোখে। চঞ্চল নগরীর এই আলো হাওয়া প্রাণভরে গ্রহণ করার তার আর কোন অধিকার নেই। একটা ধাক্কা খেয়ে সে যেন ছিটকে পড়েছে জনস্রোতের বাইরে।

এক রুশ নর্তকী ও উদয়শংকর

উদাসীন নিরাসক্ত এবং ইহলোকের মানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যর্থ বঞ্চিত উদয়শঙ্কর ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেণ্ট ধরে হাঁটতে-হাঁটতে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবের কাছে। কি রকম একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে সে সামনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বেশ কিছু সময়। চারপাশে বিরাজ করছে অলৌকিক এক নীরবতা। এই কবরখানায় কত মনীষী, কত যশস্বী মানুষ মরজগতের সংগে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছেন চির নিদ্রার কোলে।

তেমন বিশ্রাম তো উদয়শঙ্করও করতে পারে। তারও তো ফুরিয়ে গেছে সব কাজ। সে বড়ই ক্লান্ত এখন। কাছেই ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রীজ। কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে মন্থর পায়ে এগিয়ে গেল উদয়শঙ্কর। এসে দাঁড়াল ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রীজের ওপর। জলে আলোর ছায়া। বড় শান্ত নদী টেমস।

কিন্তু কোন কিছুর প্রতি আর একটুও আকর্ষণ নেই উদয়শঙ্করের। এ জীবন তার কাছে তিক্ত, দুর্বিষহ। কঠিন একটা যন্ত্রণা থমথম করছে তার বুকের মধ্যে। বুক জ্বলছে। গলা শুকিয়ে আসছে। কটকট করে উঠছে দু চোখ। তার দৃষ্টি শ্রবণ ঘ্রাণ—তার শরীরের সকল ইন্দ্রিয় বিকল হয়ে গেছে।

ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে সকাল এগারোটা-সাড়ে এগারোটায় প্রবাসী উদয়শঙ্কর শেষ বারের মতন দেখে নিল আকাশ। বড় উজ্জ্বল। স্বচ্ছ টেমস নদীর জলও। ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেণ্ট মুখর জীবনের স্পন্দনে। কোথাও দুঃখ নেই, কোথাও কর্মের বিরতি নেই। উদয়শঙ্কর না থাকলে এক মুহূর্তের জন্যও থেমে যাবে না জীবনের প্রবাহ।

কে আমি? উদয়শঙ্করের মনে প্রশ্ন জাগল। উত্তরও মিলল সংগে সংগে। কেউ না। কিছু না। আমার জীবনে যদি দেবতার মতন সেই মানুষ অম্বিকাচরণের আবির্ভাব না হত তা হলে আজ কি হত আমার পরিচয়? কে মাথা ঘামাত আমার জীবন ও মৃত্যু নিয়ে? চোখ ফেটে জল আসছিল উদয়শঙ্করের। সে গাজীপুরের সেই খোকা।

খোকা! অনেক হয়েছে! আর নয়! তোমার থাকা না-থাকায় এখনো কারুর কিছু যায় আসে না। কাউকে উৎকণ্ঠা করে নয়, নিচে স্থবির শরীর টেমস-এর ঘোলা জল দেখতে দেখতে উদয়শঙ্কর অস্ফুট উচ্চারণে বলে উঠল, "বিদায়!" এবং দেখল তপ্ত এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে তার হাতের ওপর।

কিন্তু তারই উচ্চারিত খুব ছোট একটি কথা 'বিদায়' দুর্বার গতিতে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ ঘুমভাঙা স্মৃতির গভীর অরণ্যে। সেখানে তখন বয়ে যাচ্ছে ঝড় অবিশ্রাম। গাজীপুরের সেই খোকা! নসরৎপুরের সেই রোগা ছেলেটি! মা! বাবা! দাদু! তোমরা কোথায়! কোথায় সেই মাস্টার মশাই-এর ময়না পাখিটা! সে থেকে-থেকে বলে উঠত তারই শেখানো বুলি, রাধাকৃষ্ণ!

একে-একে উদয়শঙ্করের মনে ভেসে উঠছে কত দৃশ্য! সুখের, দুঃখের! টিবু আর নেই। নেই ছোট্ট পচলী! কত দূরে ঝালাওয়ার! সত্যি কি কোন দিন সে ছিল সেখানে! কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে উদয়শঙ্কর! ঝাপসা হয়ে গেছে তার শিল্পালোক! পাহাড়ী মৌনতায় ডুবেছে ঐকতান। হারিয়ে গেছে তার নৃত্য-লোকও। ইংল্যান্ড আমেরিকা—সব খানের করতালির ধারাপাত—সব থেমে গেছে। সুতরাং আর দ্বিধা কেন? এবার যাক এ জীবন!

আপন মনে সব বন্ধন ছিন্ন করে উদয়শঙ্কর তাকিয়ে দেখল নিচে। কিন্তু এখান থেকে ঝাঁপ দিলে সে তো মরবে না। টেমস-এর জল গভীর নয়। তা ছাড়া পাকা সাঁতারু উদয়শঙ্কর। জল গভীর হলেও সে ডুবে যেত না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল উদয়শঙ্কর। পোলের শেষ কিনারে ধাপের মত কিছু প্রস্তরখণ্ড আছে। অন্যমনস্কের মতন স্থান পরিবর্তন করে সে এসে দাঁড়াল ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রীজের এক প্রান্তে।

ঝুপ করে জলের ওপর ছায়া নামল। শব্দের জগৎ নিস্পন্দ হয়ে গেছে। ওই কঠিন প্রস্তরখণ্ডের ওপর এখান থেকে আছড়ে পড়লে থেঁতলে যাবে উদয়শঙ্করের দেহ। তার মৃত্যু হবেই। নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে পোলের লোহার রেলিঙের ওপর সে একটা পা রাখল। আর একবার দেখল নিচে। উদয়শঙ্কর ঝাঁপ দেবে এমন করে যেন আগে তার মাথাটা শক্ত ধারালো পাথরের ওপর পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

উদয়শঙ্কর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এইবার সে লাফিয়ে পড়বে। তার জীবনের শেষ কয়েকটি মুহূর্ত থরথর করছে। তার চোখ বন্ধ। ঠিক এমন সময় কার স্নেহের 'করস্পর্শে' ভীষণভাবে চমকে উঠল উদয়শঙ্কর। ফিরে দেখল, এক অতি সুদর্শন তরুণ লণ্ডন

উদয়শঙ্কর

পুলিস স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে।

সে বড় মিষ্টি করে বলল, "জায়গাটা সত্যি খুবই সুন্দর। কী দেখছেন স্যার আপনি? ভারতবর্ষ থেকে আসছেন তো?"

উদয়শঙ্কর এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, কিছুক্ষণ একটিও কথা ফুটল না তার মুখে। সে অনুভব করল দারুণ ক্ষুধায় তার পেট জ্বলছে। কিন্তু তার পকেট শূন্য। বাড়ি ফিরে যাবার পয়সাও নেই। সে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকল পুলিসের দিকে।

উদয়শঙ্করের মৌন ও বিমূঢ় ভাব গ্রাহ্য করল না পুলিস। সে কথা বলে যেতে লাগল, "শুনেছি স্যার, আপনাদের দেশ মহান। জানেন, আমার বাবা অনেক দিন ছিলেন ভারতবর্ষে। চলুন স্যার, কাছাকাছি কোথাও গিয়ে একটু কফি-টফি কিছু খাই—"

উদয়শঙ্কর খুশী হয়েই চলল সেই সুদর্শন তরুণ পুলিসের সঙ্গে। ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রীজ পার হয়ে ওরা এগিয়ে যেতে লাগল কবরখানার দিকে। যেতে যেতে নম্র স্বরে পুলিস বলল উদয়শঙ্করকে, "জিজ্ঞেস করতে পারি স্যার আপনি কি করতে এ-দেশে এসেছেন?"

উদয়শঙ্কর বলল, "আমি স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইনের ছাত্র। রয়্যাল কলেজ অব আর্টস-এ ছিলাম।"

"তাই নাকি?" সপ্রশংস দৃষ্টিতে উদয়শঙ্করের দিকে তাকিয়ে পুলিস বলল, "স্যার রদেনস্টাইন খুব বড় শিল্পী।"

"আমি এ-আর-সি-এ ডিপ্লোমাও পেয়েছিলাম—" উদয়শঙ্কর বেশ গর্বের সঙ্গে নিজের কথা বলল এবার।

"বলেন কি! আপনি তো বেশ গুণী লোক স্যার! আমার ভাগ্য ভাল যে, আপনার মতন একজন প্রতিভাবান মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।"

উদয়শঙ্কর আরও প্রশংসা পাওয়ার জন্যে বলে ফেলল, "আমি পাভলোভার ব্যালের দলেও ছিলাম।"

"কি বললেন স্যার? পা-ভ-লো-ভা! আপনি নৃত্যশিল্পী? আশ্চর্য!"

অন্তরঙ্গ স্বরে এই রকম ঘরোয়া কথা বলতে বলতে উদয়শঙ্কর আর সেই তরুণ সুদর্শন পুলিস ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবের

মাথাধরা যাবে চলে

মাত্র একটি সারিডন খেলে

ট্রেডমার্ক 'রোশ'

একমাত্র সারিডনেই এমন গুণ আছে যা আপনার মাথার সব যন্ত্রণা দূর ক'রে আপনাকে স্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্ল ক'রে তুলতে পারে।
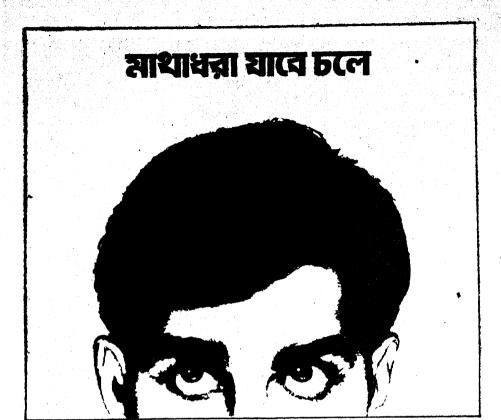
সারিডনের অসাধারণ ক্রিয়াগুণ দেখতে দেখতে মাথা-ব্যথার গোড়ায় গিয়ে পৌঁছে যায় আর আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে সঙ্গে সঙ্গে। একটা খেলেই যথেষ্ট। এই হ'ল রোশ-এর আন্তর্জাতিক গবেষণার ফলশ্রুতি।

তাছাড়া, দাঁতের বেদনা, গায়ের ব্যথা প্রভৃতি অবস্থাতে মাত্র একটি সারিডনই সব কষ্ট আর যন্ত্রণা দূর করতে অব্যর্থ।

একমাত্র সারিডনই যন্ত্রণা দূর করে, আরাম দেয়, খুশি রাখে।

রোশ-এর একটি উৎকৃষ্ট

RP 5969

কাছাকাছি ছোট একটা কাফেতে এসে ঢুকল। ঢুকে একটা ফাঁকা জায়গায় উদয়শঙ্করের মুখোমুখি বসে পুলিস তাকে বলল, "যদিও ডিউটিতে আছি, এক কাপ চা খেলে আর কি ক্ষতি? কি বলেন স্যার? কি খাবেন বলুন, চা না কফি?"

উদয়শঙ্কর ইতস্তত করে বলল, "যা হয়।"

"সঙ্গে কি খাবেন?"

খিদেয় পেট জ্বলে গেলেও একটি পেনিও ছিল না উদয়শঙ্করের পকেটে। তাই সে বিব্রত হয়ে বলল, "না-না, আর কিছু না। ধন্যবাদ।"

"তা হবে না স্যার। দয়া করে সামান্য কিছু আপনাকে খেতেই হবে। বলুন আর কি খাবেন? রুটি মাখন? টোস্ট আর ডিম? ছোট একটা কেক?"

অগত্যা উদয়শঙ্করকে বলতেই হল, "ডিম আর টোস্টই খাওয়া যাক।"

ওয়েট্রেসকে খাবার আনতে বলে উদয়শঙ্করের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল পুলিস, "ইংল্যাণ্ডে আসবার পর প্রথম প্রথম আপনার খুব অসুবিধা হত, না স্যার? রোদ-টোদ ওঠে না, খাওয়া-দাওয়াও অন্য-রকম—"

"না-না, আমার কোনই অসুবিধা হত না।"

"আপনি সত্যি খুব গুণী লোক। এক-দিন আপনার বাড়িতে যেতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

পকেট থেকে ছোট একটা নোটবুক বের করে পুলিস বলল, "দয়া করে আপনার ঠিকানাটা বলবেন স্যার?"

উদয়শঙ্কর বলল তার ঠিকানা। পুলিস তা লিখে নিতে-নিতে বলল, "যাব স্যার এক দিন। মনে থাকবে তো আমাকে আপনার?"

এত পরে হাসি ফুটল উদয়শঙ্করের মুখে, "খুব মনে থাকবে।"

"আমার নাম রবার্ট।"

খাবার পর বিল চুকিয়ে দেওয়ার সময় হল মুশকিল। উদয়শঙ্করের চুপচাপ বসে থাকা ভাল দেখায় না। তার কাছে কানাকড়ি না থাকলেও সে মহাব্যস্ত হয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, "আমি দেব দাম।"

"তা কি হয় স্যার—" পুলিস মধুর হেসে বলল, "আমিই তো আপনাকে নিয়ে এলাম এখানে।"

কাফে থেকে বেরিয়ে উদয়শঙ্কর অনুভব করল তার মন বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। হেঁটে হেঁটে সে বাড়ি ফিরে এল। এসে ল্যাণ্ডলেডীকে বলল তরুণ সুদর্শন পুলিসের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের কথা। সে আরও বলল, "জান মা, রবার্ট বলেছে এক দিন আসবে এখানে।"

ট্রিও : শাকি, উদয়শঙ্কর ও অ্যাডেলেড

"বেশ, বেশ! আমিও খুশী হয়ে তার সঙ্গে আলাপ করব।"

কয়েক দিন পরেই রবার্ট এল উদয়শঙ্করের বাড়িতে। পুলিসের পোশাকে নয়, সে এসেছে সাধারণ বেশে। তাকে আরও অনেক বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। তাকে দেখে উল্লাসে চীৎকার করে উঠল উদয়শঙ্কর, "মা, দেখে যাও রবার্ট এসেছে।"

ল্যাণ্ডলেডী লাউঞ্জে এসে রবার্টকে দেখে মুগ্ধ হলেন। তাকে চা কেক খাইয়ে বললেন আবার আসতে। রবার্ট বলল, সে আসবে আবার। কথায় কথায় উদয়শঙ্কর শুনল বেশ ভাল ছাত্র ছিল রবার্ট। পড়া-শুনোয় তার খুব আগ্রহ।

উদয়শঙ্কর তাকে বলল এক সময়, "জান রবার্ট, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। সেদিন ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রীজের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম।"

রবার্ট হেসে বলল, "জানি বন্ধু, জানি। আমি অনেকক্ষণ থেকে তোমার গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিলুম।"

পরে আরও কয়েকবার রবার্টের সঙ্গে দেখা হয়েছিল উদয়শঙ্করের।

পাভলোভার দলের ইটালীর সেই দুই মেয়ে—দু বোন। শাকি আর অ্যাডেলেড। ওদের কালো চুল, কালো চোখ। উদয়শঙ্করের মনে হয়েছিল নৃত্যে ওদের নিষ্ঠাও গভীর। আসলে ইটালীই তো ধ্রুপদী ইউরোপীয় ব্যালের জন্মস্থান। ফ্রান্সে হল তার সমৃদ্ধি, তার নানা নামকরণ। এবং পরে ইউরোপীয় ব্যালেকে রূপে রঙে রাঙিয়ে দিল রুশ।

শাকি আর অ্যাডেলেডের সঙ্গে উদয়-শঙ্করের শেষ দেখা হয়েছিল আমেরিকা যাবার আগে আগে—ওরা যখন পাভলোভার দল ছেড়ে গেল, তখন। যাবার সময় ওদের লণ্ডনের ঠিকানা দিয়ে উদয়শঙ্করকে অ্যাডেলেড বলেছিল, "আমাদের ভুলে যেও না শঙ্কর! ফিরে এসে দেখা করবে তো?"

"নিশ্চয়ই দেখা করব।"

আমেরিকা থেকে ফিরে আসবার পর অনেকবার এই দু বোনের কথা মনে পড়েছিল উদয়শঙ্করের—তাদের সঙ্গে দেখা

বিরল শোভায়
সুষমা শোভনা
শর্মিলা
ঠাকুর
বোম্বে
ডাইং
শাড়ীতে

বোম্বে ডাইং শাড়ী।
টেরিলিন, রেলিকা ১০০%
পিওর কটন, সুইস
ভয়েল এবং ভয়েল।

করার ইচ্ছেও হয়েছিল। ঠিকানা তো আছেই তার কাছে। কিন্তু টাকার ভাবনায় সে এত বিব্রত ছিল যে, শেষ অবধি শাকি আর অ্যাডেলেডের বাড়িতে তার আর যাওয়া হয়নি।

এখন ওদের কথা উদয়শঙ্করের আবার মনে পড়ে গেল। এখনো যদিও তার পকেট শূন্য এবং ভবিষ্যৎ আগের মতই অন্ধকার তবু মৃত্যুর অতি নিকট থেকে ফিরে এসে তার দেহমন দীপ্ত হয়ে উঠেছে উচ্ছল প্রাণশক্তিতে। তার মুখে আর দৈন্যের কোন ছায়া নেই।

উদয়শঙ্কর ভেবেছিল হেঁটে হেঁটেই সে চলে যাবে অ্যাডেলেডের কাছে, কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে তার মনে হল কি যেন বেজে উঠছে থেকে থেকে। উদয়শঙ্কর পকেটে হাত দিয়ে দেখল কয়েকটি শিলিং রয়েছে। এমন প্রাপ্তিযোগ অভাবনীয়। কে ভরে দিল তার পকেটে এই মুদ্রা? ল্যান্ডলেডীর কথা ভেবে আপন মনে হাসল উদয়শঙ্কর।

পকেটে যখন পয়সা আছে তখন আর কষ্ট করে হাঁটবার দরকার কি! উদয়শঙ্কর ভাবল, সামান্য পয়সার অভাবে কত দিন সে বাসে কিংবা টিউবে চড়েনি! অ্যাডেলেডদের বাড়ি বেশী দূরে নয়। কাছেই। সুইস কটেজ অঞ্চলে। তবুও উদয়শঙ্কর একটা ডবল ডেকারের দোতলায় গিয়ে বসল।

বাসের হুড-টুড কিছু নেই। খোলা। ওপরে তাকালে আকাশ দেখা যায়। একটু পরে উদয়শঙ্করের ঠিক সামনের সীটে একটি মোটাসোটা ইংরেজ এসে ধপ করে বসে পড়ল। লোকটার কান্ডজ্ঞান নেই একেবারে। পিক করে বাইরে থুতু ফেলল বাসে বসে। হাওয়ার জোর ছিল। থুতুর ছিটেফোঁটা লাগল উদয়শঙ্করের গায়েও।

উদয়শঙ্কর পিছন থেকে আস্তে সেই মোটা ইংরেজের কাঁধে একটা হাত রেখে খুব নম্র স্বরে বলল, "দয়া করে থুতু ফেলবেন না এমনভাবে!"

লোকটি পিছন ফিরে উদয়শঙ্করকে দেখল। এবং সম্ভবত একজন ভারতীয়র এই রকম স্পর্ধা দেখে জ্বলে গেল মনে মনে। বাসে বসেই মুখ বিকৃত করে সে গজগজ করতে লাগল উদয়শঙ্করকে লক্ষ করে, "যত্ত সব বিদেশী! আমাদের দেশে এসে আমাদেরই শেখাবে আদব-কায়দা! ব্লাডি, নিগার! দাঁড়াও, তোমার মজা বের করছি আমি!"

শাকিদের বাড়ির কাছাকাছি এসে বাস থেকে নেমে পড়ল উদয়শঙ্কর। সেই মোটা লোকটাও নামল তার সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তায় নেমে সে আরও গালাগাল করল উদয়শঙ্করকে। পরে বলল, "চল ওপারে। ব্লাডি বিদেশী! তোমাকে আচ্ছা মতন শিক্ষা দেব আমি—"

উদয়শঙ্কর বলল, "অমনভাবে থুতু ফেলা তোমার উচিত না।"

"ফের!" লোকটা ধমকে উঠল, "চল শিগগির!"

ইচ্ছে না থাকলেও লোকটার সঙ্গে যেতে যেতে ভাগ্যক্রমে উদয়শঙ্কর একজন পুলিসকে দেখল। পরে তার কাছে গিয়ে বলল মোটা ইংরেজের দুর্ব্যবহারের কথা। সব শুনে পুলিস উদয়শঙ্করকে বলল, "লোকটা ভাল নয়। আমরা ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আরও অনেককে ও ভুগিয়েছে। তুমি যাও না ওর সঙ্গে। দেখ কি করে। গায়ে হাত দিলে চীৎকার করে উঠ। আমি আড়াল থেকে নজর রাখছি।"

লোকটা তখনো উদয়শঙ্করকে গালাগাল করে চলেছে। একটা বাঁক ঘুরল ওরা। জায়গাটা বেশ নির্জন। কেউ কোথাও নেই। এতক্ষণ গালাগাল সহ্য করে উদয়শঙ্করও রাগে কাঁপছে।

লোকটা এখনো গায়ে হাত দিল না দেখে উদয়শঙ্কর তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "দাও এবার কী শিক্ষা দেবে আমাকে?" বলেই তার মুখে কাঁধে চালাল দমাদম ঘুসি।

আশ্চর্য, লোকটা কিছুই করল না। আই-আই করে শুধু বলতে লাগল, "আরে, যাও যাও—"

পাগল নাকি লোকটা! উদয়শঙ্কর পরে আবার পুলিসকে জানিয়ে দিল, কিছু করেনি সে।

শাকি আর অ্যাডেলেডের বাবার নাম মিস্টার ল্যানক্যাস্টিক। বেশ অমায়িক লোক। মুখে চাপদাড়ি। তার দেহ ঈষৎ স্থূল। উদয়শঙ্করকে দেখে ল্যাঙ্কাস্টিক বললেন, "মেয়েদের মুখে তোমার কথা শুনেছি। তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলাম।"

"ধন্যবাদ। আমারও খুব ভাল লাগল আপনাকে দেখে।"

শাকি বলল, "কি করছ তুমি এখন শঙ্কর? নিজের দল-টল খুলেছ নাকি?"

উদয়শঙ্কর ম্লান হাসল, "কই আর পারলাম! আপাতত কিছুই করছি না। খুব খারাপ অবস্থায় আছি এখন।"

"বল কি!"

উদয়শঙ্কর অ্যাডেলেডের দিকে ফিরে বলল, "তোমরা কী করছ?"

"শাকি আর আমি একটা ব্যালের ইস্কুল করেছি।"

"বাঃ! কোথায় তোমাদের ইস্কুল?"

অ্যাডেলেড বলল, "কাছেই একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি--" সে হাসল, "আমাদের

ক্রমশঃ

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

শারদীয় কথাসাহিত্য

= এই সংখ্যার লেখকবৃন্দ =

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, অবধূত, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, উমা দেবী, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, কালিদাস রায়, কৃষ্ণধন দে, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, গোপাল ভৌমিক, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, জরাসন্ধ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, দৃষ্টিহীন, দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য, নলিনীকান্ত সরকার, নিশিকান্ত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রমথনাথ বিশী, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত চৌধুরী, বনফুল, বাণী রায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, বিমল কর, মহাশ্বেতা দেবী, মনোজ বসু, মনোজিৎ বসু, মায়া বসু, যাযাবর, লীলা মজুমদার, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শঙ্কু মহারাজ, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুনীলকুমার লাহিড়ী, সুবোধকুমার চক্রবর্তী, সুমথনাথ ঘোষ, সৈয়দ মুজতবা আলী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার দে ও আরো অনেকে।

মূল্য ঃ চার টাকা। গ্রাহকদের অতিরিক্ত লাগিবে না।

বার্ষিক চাঁদা ৮·৫০

কার্যালয় ঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

(সি ৮১৮০)

Prestige
PREETT
লক্ষাধিক গৃহিণীরা প্রেস্টিজ ব্যবহার করেন —এই প্রেসার কুকারেরই সবচেয়ে বেশী চাহিদা এবং ইহাই সর্বাধিক বিক্রীত
তার কারণ হ'ল
জায়গা বেশী
বাইরে থেকে প্রেস্টিজের ঢাকনি বন্ধ করার ব্যবস্থা। সেজন্য এর ভিতরে জায়গা বেশী এবং বেশী পরিমাণের খাবার রাঁধা যায়।
প্রেস্টিজের 'সেপারেটার'ও বেশী বড় কারণ প্রেস্টিজের ধারণশক্তি অনেক বেশী। বাজারের অন্য ডিজাইনের কুকারের চেয়ে এই কুকার প্রায় ১/৩ ভাগ বেশী বড়।
তাড়াতাড়ি রান্না
বিশেষ এলুমিনিয়াম মিশ্রণে তৈরী প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার তাড়াতাড়ি রান্না হওয়ার এবং সমভাবে উত্তাপ সঞ্চারণের নিশ্চয়তা দেয়। ফলে, আপনার সময় ও জ্বালানী দুয়েরই সাশ্রয় হয়।
আরও নিরাপদ
ডবল লকিং-যুক্ত ঢাকনি পিস্টন সহ তিন-ধাপে কার্যকর রবারের সেফটি বা নিরাপত্তা প্লাগ প্রেস্টিজ-কে সর্বাধিক নিরাপদ কুকারে পরিণত করে।
ছ রকম সাইজে প্রেস্টিজ কুকার পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকটিতে সারাজীবন চলার গ্যারাণ্টী থাকে।
আপনার জন্যই প্রেস্টিজ কুকার নিখুঁতভাবে তৈরী এবং একমাত্র দক্ষ কারিগর বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে এই কুকার মেরামত করতে পারেন। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী ২০০র চেয়েও বেশী প্রেস্টিজ সার্ভিস স্টেশন আছে-যেখানে তাড়াতাড়ি, উপযুক্ত বিক্রয়পরবর্তী সার্ভিস বা সেবা পাওয়া যায়। একমাত্র প্রেস্টিজ প্রীত সার্ভিস স্টেশন ও নামকরা ডীলারের কাছ থেকেই এদের আসল আলগা অংশ (স্পেয়ার পার্টস) কিনবেন।
Prestige
PRESSURE
saves time
Prestige
PREETT
দুইই এক
টি টি. (প্রাইভেট) লিমিটেড, ব্যাঙ্গালোর ৫৬০০১৬
SAA/TTP/1008 BN

ভারতীয় নাচ ভাল করে শেখাও না তুমি। শেখাবে?"

উদয়শঙ্কর বলল, "খুশী হয়ে শেখব। কখন কোথায় শিখবে বল?"

অ্যাডেলেড একটু ভেবে বলল, "আমাদের ইস্কুলের ঘরেই শিখব। কি বলিস শকি?"

"হ্যাঁ, তাই ভাল হবে—" শকি হেসে বলল, "আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে শঙ্কর আমাদের শেখাবে। ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ।"

"আজ থেকে আসবে?"

উদয়শঙ্কর উৎসাহ প্রকাশ করে বলল, "আনন্দের সঙ্গে।"

সব শুনে ল্যানক্রাঙ্ক প্রসন্ন মুখে উদয়শঙ্করকে বললেন, "তোমাকে দেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে, তুমি খুব কাজের লোক। নতুন নতুন নাচ শেখাও শকি আর অ্যাডেলেডকে। শুনেছি ভারতীয় নাচ খুব ভাল।"

উদয়শঙ্কর সবিনয়ে বলল, "আমি খুব মন দিয়ে শেখাবার চেষ্টা করব।"

"আমি জানি, তুমি করবে—" ল্যানক্রাঙ্ক করুণ একটা নিশ্বাস ফেললেন, "ওদের মা নেই কিনা। আমি চাই মায়ের অভাব ওরা যেন কোনদিনও না বুঝতে পারে।"

হতাশার যে ঘন মেঘ জমে উঠেছিল উদয়শঙ্করের জীবনে, শকি আর অ্যাডেলেডের সান্নিধ্যে তা ভেসে চলে গেল। এবং তার যে নৃত্যের জগৎ হারিয়ে গিয়েছিল গভীর অন্ধকারে তা-ও আবার ফুটে উঠল আলোকোজ্জ্বল হয়ে। উদয়শঙ্কর নিয়মিত আসে শকি আর অ্যাডেলেডের ব্যালে ইস্কুলে। প্রথমে তারা শেখায় তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ইউরোপীয় ব্যালে। পরে উদয়শঙ্কর দু'বোনকে শেখায় ভারতীয় নাচ।

'রাধাকৃষ্ণ' কিংবা 'হিন্দু বিবাহে'র মতন বিশেষ কোন নাচ প্রথমে উদয়শঙ্কর শেখাল না শকি আর অ্যাডেলেডকে। সে তাদের নাচের তাল বুঝিয়ে দিল, মুদ্রা শেখাল। বলল, "নাচের এক-এক ভঙ্গির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে হবে চোখ ও মুখের এক-এক রকম অভিব্যক্তি। মনে রাখবে ভারতীয় নাচ শুধু দেহগত নয়।"

পাভলোভার কথা মনে রেখেছে উদয়শঙ্কর। সে দেখেছে সব রকম বিদেশী ব্যালে, বুঝতে পেরেছে তার ভাবার্থ। কিন্তু সে সব সময় সতর্ক যেন তার কোন নাচে ইউরোপীয় ব্যালের সামান্য প্রভাব না পড়ে।

দ্রুত তাদের নাচ শেখাচ্ছে উদয়শঙ্কর শকি আর অ্যাডেলেডকে। কোন বিশেষ প্রদেশের লোকনৃত্য না হলেও তাদের নাচে ফুটে উঠেছে একটা গ্রামীণ ভাব। সহজ সরল গতিভঙ্গি। তাদের পায়ে ঘুঙুর।

পরনে চোলি ঘাগরা ওড়না—রাজস্থানের মেয়েদের মত। শকি আর অ্যাডেলেডের সঙ্গে নিজেও যোগ দিয়ে ত্রয়ীর সমাবেশে এই ধরনের একটা আলাদা নাচের পরিকল্পনা করেছে উদয়শঙ্কর। এক দিকে শকি, আর এক দিকে অ্যাডেলেড, মাঝখানে উদয়শঙ্কর।

এই নাচের পরে অ্যাডেলেড বলল, "শঙ্কর, আমার মনে হয় ভারতীয় নাচ এদেশের লোকের খুবই ভাল লাগবে। আমরা তিনজনে মিলে নাচলেই তো পারি?"

"বেশ তো। কিন্তু নাচবে কোথায়? অনেক টাকার দরকার হয়।"

"তা তো বটেই—" অ্যাডেলেড একটু ভাবল। ভেবে বলল, "হোটেলে নাচতে তোমার আপত্তি আছে?"

"একটুও না—" উদয়শঙ্কর নিরুত্তাপ স্বরে বলল, "যেমন করে হোক, টাকা রোজগার করতেই হবে। আমি আর চালাতে পারছি না। এর মধ্যে তার সোনার আংটি, তার যত স্যুট ছিল প্রায় সবই সে বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়েছে।

অ্যাডেলেড তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "আর একটু ধৈর্য ধর। রোজগারের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আমাদেরও চালাতে হবে তো—" কথা শেষ করে সে হাসল, "যত দিন কিছু ঠিক না হয় ততদিন দরকারমতন টাকাপয়সা আমাদের কাছ থেকে নিও—"

"না-না, তা হয় না। তোমাদের নাচ শেখাচ্ছি বলে টাকা তো দিচ্ছ তোমরা।"

"তাতে কি, দরকার হলে আরও নেবে।"

"আচ্ছা, সে দেখা যাবে পরে।"

শকি অ্যাডেলেড আর উদয়শঙ্কর—মাত্র এই তিন বন্ধুকে নিয়ে লন্ডনে গড়ে উঠল ভারতীয় নৃত্যের নতুন একটা দল। নাম—ট্রিও।

একদিন অ্যাডেলেড উদয়শঙ্করকে দিল সুসংবাদ। ট্রিওর কাজ হয়েছে পিকাডিলির এডওয়ার্ড হোটেলে। এক-এক দিন এক-একজন পাবে এক-এক পাউন্ড। অর্থাৎ তিনজনে পাবে তিন পাউন্ড। এডওয়ার্ড হোটেলের ক্যাবারেতে নাচতে হবে। ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছে শকি আর অ্যাডেলেড।

(ক্রমশ)

আমাদের ১৩৮০ সালের নতুন স্বাদের নতুন উপন্যাস

অমরেন্দ্র দাসের এ পৃথিবী স্বর্গ নয় ৬·০০
চিরঞ্জীব সেনের ॥ সাগর বেলায় খুন ৭·০০
বেদুইনের ॥ এ জীবন নাটক নয় ৭·০০
শক্তিপদ রাজগুরুর চোখের আলো ৮·০০
অনিল রায়ের ॥ লোভের সোনা কামের হীরা ৭·০০
বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত ॥ তারাশঙ্কর বিচিত্রা ৬·০০
সুধীন্দ্রকুমার নাগের ॥ সাত সাগরের ঢেউ (ছোটদের) ২·৫০

সাহিত্যালোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলি-৬

(সি ৮৯২৬)

সুনীল কুমার ঘোষের সর্ববৃহৎ উপন্যাস

রাজা গেল রাজ্য গেল

প্রকাশিত হল। ১৬·০০

ভ্যারাইটি পাবলিশার্স : ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

(সি ৪২০৭)

লিওরের সঙ্গে পরিচয়-২

লিওর কোল্ড ওয়্যাক্স অবাঞ্ছিত চুল তুলে ফেলে—একেবারে
গোড়া থেকে। এর কাজের ধারা ক্রীম বা খুরের ঠিক উল্টো!
ক্রমাগত ব্যবহার করলে চুলের বৃদ্ধি কমিয়ে দেয়, মোটা কর্কশ
চুল গজাতে দেয় না আর আপনার ত্বককে করে তোলে
রেশমের মত মোলায়েম!

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৮০ ॥
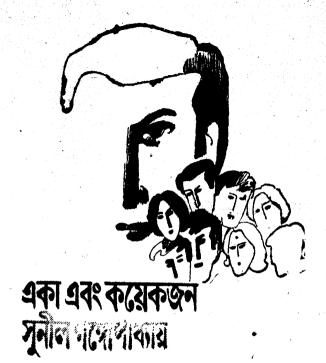
বাদল বললো, রেণু, এরকম ছেলেমানুষী করিস না। টাকা জোগাড় করার চেষ্টা আমি করবো, খুব সম্ভবত পেয়েও যাবো। তোর কাছ থেকে টাকা নিতে আমি পারি না।

রেণু বললো, কেন পারো না। সেটাই আমি জানতে চাই।

বাদল একটু অসহায়ভাবে হাত নাড়তে লাগলো। ঠিক যুক্তিটা তার মনে আসছে না। তারপর বললো, এটা হয় না। এটা ঠিক মানায় না! আমি তোর কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিদেশে যাবো, এটা কি সম্ভব?

রেণু বললো, আমার যদি টাকার খুব দরকার হতো কখনো, আমি তো তোমার কাছেই চাইতাম। অন্য কার কাছে চাইব?

—সেটা আলাদা ব্যাপার।

—আমি এই আলাদা ব্যাপারটাই বুঝতে পারি না। আমার কাছে টাকা থাকলেও তুমি নেবে না, অথচ অন্য লোকজনের কাছ থেকে অনুগ্রহ চাইবে—এর মানে কি?

বাদল বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। অন্য কোথাও না পেলে তোর কাছ থেকেই নেবো!

রেণু এতেও খুশি নয়। সে কঠিন মুখ করে বললো, না, ওসব চলবে না। তুমি অন্য কারুর কাছে চাইতেই পারবে না।

—তুই এত জোর করছিস কেন?

—কারুর কাছে টাকা চাইবার পর সে যদি না দেয়, তা হলে অপমান লাগে না? আমি চাই না, কেউ তোমাকে সেরকম অপমান করুক।

—তুই যেন আমাকে জার্মানিতে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস?

—বাঃ, নিজেই তো এতক্ষণ ধরে বলছিলে এই সব কথা। বিদেশে না গেলে নাকি তোমার জয় হবে না!

—যেতে আমাকে হবে ঠিকই। আমি যে চার পাঁচ বছর বাইরে থাকবো, তাতে তোর মন খারাপ লাগবে না তো?

রেণু ভুরু কুঁচকে বললো, না, মন খারাপ লাগবে কেন?

রেণু খুব চাপা মেয়ে, তার মনের ভাব বাদলও সব সময় বুঝতে পারে না।

বাদলের মনে হলো, যেন তার বিদেশে যাওয়া সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এক্ষুনি সেই বিচ্ছেদের মুহূর্ত। আসলে তার যাওয়ার ব্যাপার এখনো কিছুই ঠিক নেই। তবু সে বিচ্ছেদের নাটকীয় মুহূর্তটিকে মনে মনে কল্পনা করে ফেলে।

মাদ্রাজ গিয়ে তাকে জাহাজ ধরতে হবে। সুতরাং ট্রেনে চেপে যাবে মাদ্রাজে। হাওড়া স্টেশনে কি রেণু যাবে তাকে বিদায় দিতে? বোধ হয় পারবে না। তা হলে, রেণুর সঙ্গে বাদলের শেষ দেখা কোথায় হবে? রেণুর বাড়িতে তো বাদল আর যাবে না কখনো। এই বাড়িতেই, নাকি কোনো পার্কে বা রেস্তোরাঁয়?

এইরকম ভাবতে ভাবতে বাদল রেণুর কাঁধে দু'হাত রাখলো। আবেগ কম্পিত গলায় বললো, রেণু, তোর কথা সব সময় আমার মনে থাকবে। যদি প্রতি সপ্তাহে তোর চিঠি না পাই—

রেণু হেসে ফেললো। তারপর বললো, তুমি একটা পাগল!

মেয়েদের এই সব সর্বনাশা হাসি ছেলেদের হতবুদ্ধি করে দেয়। বাদল ঘাবড়ে গেল। সে বুঝতে পারলো, রেণুর সামনে সে পুরুষোচিত সপ্রতিভ হতে পারছে না।

তখন সে সবচেয়ে সহজ পুরুষোচিত কাজটি করে ফেললো। সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো রেণুকে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, রেণু এবার বাধা দিল না। বাদলের বুকে মুখ রেখে চুপি চুপি বললো, আমার কথা একদম চিন্তা করতে হবে না তোমাকে। শুধু শুধু চিন্তা করে নিজের কাজ নষ্ট করো না!

এবারেও বাদল একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেললো। সে বললো, রেণু, আমি তোকে ভালোবাসি। খুব ভালোবাসি।

রেণু খুব সংক্ষিপ্তভাবে বললো, জানি।

তারপর সে আঙুল দিয়ে বাদলের বুকে দাগ কাটতে লাগলো। হিজিবিজি রেখা অথবা কোনো অক্ষর।

বাদল রেণুর ঐ 'জানি' কথাটাই শুধু শুনলো, আঙুলের রেখার ভাষা বুঝলো না।

গৌরকিশোর ঘোষের

ছোটদের উপন্যাস

দুষ্টুর দুপুর

আনন্দ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক

**শীঘ্রই
প্রকাশিত হচ্ছে**

প্রকাশিত হইল বেদুইনের নূতন বই

অশান্ত চিলি ৮.০০

চিলির সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনার উপর রচিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।
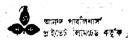
প্যালেস্টাইন কম্যাণ্ডো ও আরাফত ১০.০০

পাপনগরী সায়গন ১০.০০

পূর্বাচল : ৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

(সি ৮৯৭৬)

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

সঞ্জীব রচনাবলী ১৬.০০

● এক খণ্ডে সম্পূর্ণ ●

প্যারীচাঁদ রচনাবলী ১৮.০০

● এক খণ্ডে সম্পূর্ণ ●

●

ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

বৈষ্ণব কাব্যে প্রেম ৫.০০

কাজী নজরুল ইসলাম

কাব্যসংগ্রহ ১০.০০

ভূমিকা : শুদ্ধসত্ত্ব বসু

●

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমের কবিতা ৫.০০

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর ১২.০০

মণ্ডল বুক হাউস ।। ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা-৯

(সি ১০০৪)

রেণুর এত শান্ত ব্যবহার ঠিক পছন্দ করতে পারলো না সে। একটু নাটকীয়তার দিকে তার ঝোঁক।

সে আবার হঠাৎ কাঁপানো গলায় বললো, রেণু, তোর কাছে একটা জিনিস চাইবো, দিবি?

—কি বলো?

—না বলতে পারবি না কিন্তু?

—আচ্ছা দেবো। কি?

—আমাকে একটু আদর করতে দিবি! আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে। আমি এটাকে স্মৃতি হিসেবে নিয়ে যাবো।

রেণু এবার রীতিমতন কাবু হয়ে পড়লো। এতক্ষণ সে কথায় বার্তায় বাদলকে মাথা তুলতে দেয়নি। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে সে অসহায়। আগে থেকেই হ্যাঁ বলে ফেলেছে।

খুব অস্ফুট গলায় বললো, এসব কি ভালো?

—এতে কিছু দোষ নেই। তুই তো আমারই।

—তবু আমার মনে হয়, সবাইকে লুকিয়ে চুরিয়ে এটা যেন একটা পাপ।

বাদলের গলায় এবার দৃঢ়তা এসেছে। সে জোর দিয়ে বললো, না, পাপ নয়।

রেণু মুখ না তুলেই বললো, আচ্ছা, একবার!

বাদল আঙুল দিয়ে রেণুর থুতনিটা উঁচু করে তুলে ধরলো। চোখে রাখলো চোখ। দেখলো ঝরনার জলের মতন স্বচ্ছ মুখখানি, খুব যত্নের সঙ্গে সে চুমু খেল রেণুকে। জোরজারি বা ছটফটানি নেই, খুব শান্ত ভাব। শারীরিক বাসনা নয় সে যেন শিল্প সম্ভোগ করছে। তার নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। লজ্জার বাদলের দিকে তাকাতে পারছে না, ফিরিয়ে নিল মুখ।

বাদল উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করলো, তোর ভালো লাগে নি?

রেণু মুখ অন্যদিকে রেখেই বললো, জানি না।

বাদল দু'হাতে রেণুর মুখখানা নিজের দিকে নিয়ে এলো আবার। রেণুর ঠোঁটের ওপর রাখলো নিজের একটা আঙুল।

রেণু বললো, আর নয়।

বাদল হুকুমের সুরে বললো, আর একবার।

—তুমি কথা রাখছো না। দেখো, বৃষ্টি এসে গেছে। জানলা দিয়ে জল আসছে।

—আসুক!

বাদল আবার তার ঠোঁট রাখলো রেণুর ঠোঁটে। রেণু চুম্বনের মর্ম বোঝে না। সে শুধু দেখছে বাদলের চোখ, যা এখন অসম্ভব জ্বলজ্বলে। বাদল রেণুর নিচের ঠোঁট, যাকে অধর বলে, নিয়ে নিল নিজের মুখের মধ্যে এবং সে অনুভব করলো, রেণু সত্যিই আমার।

এবার মুখ সরিয়ে নিয়ে রেণু বললো,

আমার গায়ের মধ্যে যেন কিরকম করছে। আমার সত্যিই খুব দুর্বল লাগছে শরীরটা।

বাদল অভিজ্ঞের মতন বললো, ও কিছু না। ওরকম হয়।

রেণু বললো, ভীষণ জোরে বৃষ্টি আসছে। কি করে বাড়ি যাবো?

—একটু পরেই থেমে যাবে।

বাইরে শোনা যাচ্ছে ঝড়ের শনশন আওয়াজ। জানলার পাল্লাটা ঠকাস ঠকাস শব্দে দেওয়ালে আছড়ে পড়ছে। রেণুর গলা জড়িয়ে ধরে তাকে সঙ্গে নিয়েই বাদল চলে এলো জানলার কাছে। দুজনেই চোখ রাখলো বাইরের রুদ্ধ বন্য ঝড়-বৃষ্টির দিকে।

রেণু বললো, আমি তোমার কথা যখন ভাবি, এই সব কথা কিন্তু কখনো ভাবি না। এই সব ছাড়াও কি আমরা খুব কাছাকাছি থাকতে পারি না?

বাদল বললো, আমি ওসব জানি না। তুই সুন্দর, তাই আমি তোকে ছুঁয়ে থাকতে চাই। কলেজে পড়ার সময় আমার বন্ধুরা মেয়েদের সম্পর্কে কত রকম কথা বলতো। আমার শুধু মনে পড়তো তোর কথা।

রেণু বাদলের বুকে আঙুল দিয়ে আবার কিছু আঁকিবুকি বা লিখতে লাগলো।

বাদল বললো, রেণু, তোর গালে আমি একটা দাগ করে দেবো?

রেণু লজ্জিতভাবে বললো, অন্যরা দেখে যখন জিজ্ঞেস করবে, কি বলবো?

—বলবি কোনো পোকায় কামড়ে দিয়েছে?

—তুমি বুঝি পোকা?

—আচ্ছা, এমন জায়গায় দাগ করে দিচ্ছি, কেউ দেখতে পাবে না।

রেণু কিছু বলছে না। বাধা দিচ্ছে না, দেখছে বাদলকে। বাদল রেণুর ডান হাতে, কাঁধের কাছটায় ব্লাউজটা সরিয়ে দাঁত দিয়ে আলতো ভাবে কামড়ে ধরলো। বাদলের চুলসুদ্ধ মাথাটা রেণুর গালের কাছে। রেণু অন্য হাতটা রাখলো বাদলের চুলে। মনে মনে সে-ও ভাবলো, এই মানুষটা আমার।

এই উপলব্ধি তার শরীরে একটা শিহরণ এনে দেয়। মনে হয়, এই পৃথিবীটা এই মুহূর্তে শুধু ওদের দুজনেরই জন্য। আর কেউ নেই কোথাও। পৃথিবীর বুকে যেন একটা কাঁটা ফুটে ছিল, এইমাত্র সেই কাঁটাটা কেউ তুলে নিল।

রেণু নিজেই বাদলের মাথাটা টেনে এনে চেপে ধরলো নিজের বুকে। খুব জোরে। তারপরেই সরিয়ে দিল।

বাদল কোনোদিন রেণুর হাতের আদর পায়নি। কাঙালের মতন চোখ করে তাকালো। তারপর বললো, আমি অনেকক্ষণ তোর বুকে মাথা রাখতে চাই।

রেণু সরে গিয়ে ব্লাউজের হাতাটা টেনে ঠিক করলো। তারপর বললো, না। আর কোনোদিন এরকম করো না।

—কেন?

—আমাদের পবিত্র থাকতে হবে।

—আজকেই নিজেকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র মনে হচ্ছে আমার।

—যেদিন আমারও সেই রকম মনে হবে, সেইদিন আবার, কেমন!

বাদল আর কিছু বলতে সাহস পেল না। বৃষ্টির ছাট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে রেণুকে। বাদল জিজ্ঞেস করলো, জানলা বন্ধ করে দেবো?

—না থাক। বৃষ্টি দেখতে ভালো লাগছে।

বাদল সিগারেট ধরিয়ে রেণুর পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। জলের ঝাপটায় দুজনেরই জামা কাপড় ভিজে যাচ্ছে, তবু খেয়াল নেই।

(ক্রমশ)

—এবারে বলমলে হয়ে বেরোবে—

শারদীয়া "কালিন্দ্রী"

৮টি উপন্যাস, ছোট বড় গল্পগুচ্ছ, প্রবন্ধ, কবিতা নামী ও দামী লেখকের লেখায় ভরা। আর থাকছে চলচ্চিত্র বিচিত্রা।

দাম : মাত্র ৩·৫০

সম্পাদিকা—গৌরী গুপ্ত

২০/বি, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-২১৩৪

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক

"গণবাংলা"

পড়ুন

এতে থাকে দুই বাংলার প্রখ্যাত লেখক-লেখিকাদের লেখা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশ-ব্যাংকক-হংকং-জাপানের পটভূমিতে লেখা জাহিদুর রহমানের ধারাবাহিক রম্য উপন্যাস "ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুষ্টা"

গণবাংলা ভবন, লায়ব্রেরি এ্যাভিনিউ, ঢাকা

(সি ৬৬২১)

প্রকাশিত হলো

একটি মারাত্মক হাসির উপন্যাস

আলাপ থেকে প্রলাপ

বাসুদেব বসু

পাঁচ টাকা

সাহিত্য প্রকাশ

৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
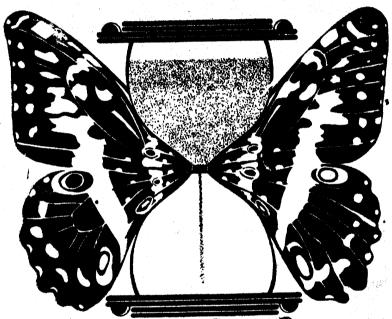
(সি ৬৬৬৫)

টাকার দাম
বাড়ল
কো-অপটেক্সে

10%

কো-অপটেক্স
হ্যাণ্ডলুম ফেব্রিকস্
বাটারফ্লাই মানে তাঁতের তৈরির

স্পেশাল রিবেট
১ সেপ্টেম্বর থেকে
৫ অক্টোবর, '৭৩

যে কোন কো-অপটেক্স শো-রুমে ১০০ টাকার জিনিস কিনে মাত্র ৯০ টাকা দিন। দেশের সর্বত্র প্রত্যেক কো-অপটেক্স শো-রুমে সর্বাধুনিক ডিজাইন, চকমকে রং, ও অপূর্ব বুনটের নূতন স্টক আমদানী হয়েছে।

আসল সিল্ক : কাঞ্চীভরম, আরণী, ধর্মভরম্ ও কুম্ভকোনম সিল্ক।
প্রিন্সপ কটন : বহু রকমারী শাড়ী, ধুতি, লুংগী, ক্লাসিক শার্ট, ফার্নিশিং ও তোয়ালের কাপড়।

বাটারফ্লাই দিচ্ছে উৎসব উপলক্ষে প্রকৃতই ১০% রিবেট
(তামিলনাড়ু সরকারের দোকানে)

Criterion Co 2963

কাব্যগ্রন্থ

এক মৃত্যু ঃ অনন্ত জীবন। নচিকেতা ভরদ্বাজ। সাহিত্য সদন, কলকাতা-৯। দশ টাকা।

খৃীষ্টজীবনকে কেন্দ্র করে এটি একটি কবিতার রচিত আলেখ্য। যীশু খৃীষ্টকে জানবার ও বুঝবার পক্ষে এটি বিশেষ সহায়ক বলে মনে হয়। খৃীষ্টজীবন নানা-

ভাবে বিভক্ত করে এই কাব্যচিত্র। জন্ম শৈশব, যৌবন, জীবন, বন্দী ও বিচার, ক্রুশবিদ্ধ, ক্রুশ, মৃত্যু, পুনরভ্যুত্থান, স্বর্গারোহণ ইত্যাদি বিভিন্ন পর্বে এই গ্রন্থটি ভাগ করা। যীশু খৃীষ্টের জীবনের বিভিন্ন পর্ব অবলম্বন করে বিশ্বের অনেক কবি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের ৮০ জন কবির ১১৭টি কবিতা সংগ্রহ করে তা বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন নচিকেতা ভরদ্বাজ।

গত দু হাজার বছর ধরে যীশু খৃীষ্ট সম্বন্ধে অজস্র রচনা জমে উঠেছে। তার থেকে বাছাই করে পর্বে-পর্বে সেই রচনা বাছাই করে নিয়ে মূল রচনার ভাবলালিত্য বজায় রেখে ভাষান্তর করা একটি কঠিন কাজ। এই কাজটি কতটা সার্থকভাবে করা হয়েছে আমরা তা বলতে পারব না, কেননা সমস্ত মূল রচনা আমাদের হাতের কাছে নেই, আমাদের পড়াও নেই। কিন্তু ভাষান্তরিত অবস্থায় যা পেয়েছি তাতে কাব্যসুষমা আছে, পড়তে ভালো লেগেছে। সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হয়েছে যে, এই গ্রন্থের অন্তর্গত সব লেখাই কি যীশুর উদ্দেশে লিখিত? কি জানি, আমাদের মনে এ বিষয়ে সংশয় কিন্তু আছে।

শিশু সাহিত্য

ময়না ঃ নির্মাল্য গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশক নীরদ মজুমদার, যোগমায়া, ১৬২।৭।১ লেক গার্ডেন্স, কলিকাতা-৪৫, মূল্য ৫ টাকা।

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে পুস্তক-পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। ফলে আজ দেশের বিভিন্ন প্রদেশে নানা ভাষায় বহু পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের পড়ার উপযোগী নানা পুস্তিকা-পত্রিকাও আজকাল দেখা যায়। শুধু তাই নয়, অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণ-পারিপাট্য, অলংকরণ ও বিষয়বস্তুর দিক থেকেও কয়েকটি বই আজ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নির্মাল্য গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ময়নাও ছোট ছোট ছেলেমেয়ের পড়ার উপযোগী একটি পুস্তিকাবিশেষ। পুস্তিকাটি সুচিত্রিতও বটে। বিষয়বস্তু ও বিশেষ করে

পরিতোষ ঠাকুর সম্পাদিত
বেদগ্রন্থমালা
সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত
মূল অন্বয় অনুবাদ, তাৎপর্য, শব্দার্থ ব্যাখ্যা, সায়ণভাষ্য ও অন্যান্য ভাষ্য সহ।
প্রতি খণ্ড ঃ তিন টাকা
অষ্টম খণ্ড বাহির হইয়াছে।
মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
(সি-৭৪০৫)

বাহির হইল! বাহির হইল!
নাটক-জগতে বিস্ময় সৃষ্টিকারী!!
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য রচিত
পরশুরাম (নাটক)
মূল্য ঃ টাঃ ৪.৫০ পঃ
পপুলার বুক হাউস
৪নং বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যাইবে।
(সি ৮৩৫১)

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮০
জাগৃহি দাম ঃ ২ টাকা
উন্নতমানের প্রবন্ধ গল্প কবিতায় সমৃদ্ধ
এই সংখ্যায় লিখছেন
॥ প্রবন্ধ ॥
বিনয় ঘোষ/অশোক মিত্র/নরেন্দ্র দাশগুপ্ত
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়/ছাঁরেন চক্রবর্তী
অসীম সোম প্রভৃতি
॥ বড় গল্প ॥
সমীর রক্ষিত
॥ গল্প ॥
দিব্যেন্দু পালিত/শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
সুধাংশু ঘোষ/মিহির সেন/সত্যেন্দ্র আচার্য
সমরেশ মজুমদার / অভ্র রায়/নির্মল
চট্টোপাধ্যায় / মৃণাল চৌধুরী বরেন
গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি
॥কবিতা ॥
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত/বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অরুণ ভট্টাচার্য/শান্তি লাহিড়ী/স্বদেশরঞ্জন দত্ত প্রভৃতি
'মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে
জাগৃহি কাটজুনগর ॥ কলকাতা ৩২
(সি ৮১৪১)

ধীরেন বলের—
টইটম্বুর ২.৫০
উদ্ভট আর অদ্ভুত হাসির কবিতা
হাস্যকম্বু ৩.৫০
হাসি আর রঙ্গে ভরা গল্প
সঞ্চিতা প্রকাশনী
৮ বি, টেমার লেন, কলিকাতা-৯
(সি ৮৫৬১)

রূপার বই
ইসাডোরা ডানকান
নৃত্যের তালে তালে
দেহ ও আত্মার লীলা-রস
নায়িকা ইসাডোরার বহু বিতর্কিত আত্মজীবনী।
অনুবাদ করেছেন ঃ
সারিৎশেখর মজুমদার
[দাম ৮.০০]
রূপা অ্যান্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

প্রকাশিত হয়েছে
৪১শ-'বিশেষ'-সংখ্যা
বহুরূপী
● এ সংখ্যায় ছ'টি পূর্ণাঙ্গ নাটক ●
অপরাজিতা ঃ নীতীশ সেন ॥ এক যে ছিল ঘোড়া ঃ জুলিয়াস হে/অশ্রুকুমার সিকদার ॥ অভিমন্যু ঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষ ॥ গণ্ডার ঃ ইউজিন ইয়োনেস্কো/শাঁওলী মিত্র ॥ পাপের বেতন মৃত্যু ঃ রঘুনাথ গোস্বামী ॥ তরুণ হিরের নতুন যন্ত্রণা ঃ উলরিশ প্লেনৎসডর্ফ/স্বপন মজুমদার ও দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য
● প্রবন্ধ ●
শিশিরকুমার ভাদুড়ী ॥ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
সুকুমার সেন ॥ সুশীল মুখোপাধ্যায়
চিন্মোহন সেহানবীশ ॥ শম্ভু মিত্র
॥ দাম পাঁচ টাকা মাত্র ॥
• পরিবেশক •
পারিজাত ব্রাদার্স ॥ মনীষা গ্রন্থালয়
॥ বহুরূপী ॥
১১-এ, নাসিরুদ্দিন রোড, কলিকাতা-১৭
(সি ৮৭১৪)

বর্ণনাকৌশলের দিক থেকে এটির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এটি কথাচিত্র জাতীয়, অর্থাৎ চিত্র, ছড়া ও কথা-কাহিনীর সুবিস্তারের মধ্য দিয়ে এটির মূল কাহিনীটুকু ব্যক্ত হয়েছে। ময়না গ্রামের একটি ছোট্ট মেয়ে, গ্রামে পিতাকে আর দেখতে না পেয়ে সে পিতার সন্ধানে শহর চলে যায় ও শেষ পর্যন্ত সেখানেই হারিয়ে যায়। কাহিনীটি প্রতীকমূলক। নিজের ছোট্ট গ্রামের গাছ-পালা, পরিচিত পরিবেশ পশু-পাখি ছেড়ে শহরের বিরাট ও কৃত্রিম বেড়াজালের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে ময়না বুঝি নিজস্ব অতীত পরিবেশ ও অস্তিত্বও ভুলে যায়। এই ছোট্ট কাহিনীটি শিশুদের অভিনয়ের উপযোগী। শুধু তাই নয়, শিশু-চিত্র হিসাবে এটি চলচ্চিত্রেও রূপান্তরিত হতে পারে। বস্তুত পুস্তিকাখানি দৃশ্যনাট্য রূপেই রচিত। পুস্তিকাটির অন্যতম আকর্ষণ খ্যাতনামা শিল্পী নীরদ মজুমদারের আঁকা দুটি চমৎকার রেখাচিত্র ও সেই সঙ্গে তাঁর ১০ থেকে ১৫ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়ে চন্দ্রভানু, অদিতি ও গুল্লুসের আঁকা কয়েকটি রঙীন ও রেখাভিত্তিক ছবি—বিশেষ করে প্রচ্ছদপট।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নরেশ দেব অনূদিত **তুষার হংসী** (এম সি সরকার অ্যান্ড সনস প্রাইভেট লিমিটেড, তিন টাকা) বাংলা অনুবাদ শাখায় একটি বিশিষ্ট সংযোজন। পল গ্যালিকোর 'দি স্নো গুজ' নামক বিখ্যাত গল্পটির একটি সহজ স্বচ্ছন্দ তরজমা করেছেন শ্রীদেব। বাবা ইতালীয়, মা অস্ট্রিয়াবাসিনী, পল গ্যালিকোর জন্ম আমেরিকায় কিন্তু বসবাস ইংল্যান্ডে। বিবাহ এক হাঙ্গেরীয় মহিলার সঙ্গে, এদিক থেকে তাঁকে যথার্থই বিশ্ব-নাগরিক বলা যায়। তুষারহংসী গল্পটি আপাতভাবে একটি বিকৃতদর্শন পঙ্গু যুবকের মর্মান্তিক কাহিনী। অন্যদিকে মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর জীবের একটি স্নিগ্ধ নম্র সম্পর্কের ছবির প্রতিরূপে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় কাহিনীটি স্থাপন করে, মনে হয়, একটি নতুন মাত্রাও গল্পটির মধ্যে সংযোজন করেছেন পল গ্যালিকো। যুদ্ধের নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী চালচিত্রটি মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে আরও মহৎ, ব্যাপক ও তীক্ষ্ণ করে তুলেছে।

গল্পের প্রধান চরিত্র ফিলিপ রায়েডার, প্রায় স্বেচ্ছানির্বাসিত এক শিল্পীর জীবন বেছে নিয়েছিলো একটি নির্জন জলাভূমিতে। বাইরে বিকটদর্শন এই যুবকের মনটি ছিল যীশুর মতই করুণামায়। একদিন তার সঙ্গে পরিচয় ঘটলো একটি ছোট্ট মেয়ের, আহত এক তুষারহংসীকে বাঁচানোর জন্য যে শরণাপন্ন হল ফিলিপের। ফিলিপের শুশ্রূষায় শুধু যে তুষারহংসী বেঁচে উঠলো তাই নয় তার নিঃসঙ্গ জীবনে মেয়েটি ও এই রাজহাঁস এক উষ্ণ নিবিড়

Eminent Historian Dr. R. C. Majumdar's

HISTORY OF ANCIENT BENGAL

Full Rexine Bound : 72 Rare Plates : Rs. 45.00

অসামান্য গ্রন্থাবলী

আশাপূর্ণা দেবীর রচনা সম্ভার

আশাপূর্ণা দেবীর অর্ধশতাব্দীব্যাপী লিখিত বাংলা সাহিত্যজগতের অবিস্মরণীয় কীর্তি — যাবতীয় উপন্যাস, গল্প, নাটক—গ্রন্থাবলীর আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। **প্রথম খণ্ড বাহির হইল।**

প্রতি খণ্ড ঃ ১৫·০০ টাকা

জি ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং ঃ ২২এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

প্রকাশিত হল ॥

দীর্ঘদিনের গবেষণালব্ধ সুখপাঠ্য একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ
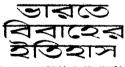
SEX AND MARRIAGE IN INDIA

ডঃ অতুল সুর

বিশাল ভূখণ্ড এই ভারতবর্ষ, বহু বিচিত্র এদেশের বিবাহ পদ্ধতি। আচার, নিয়মও অজস্র অসংখ্য। ভ্রাতা-ভগ্নীতে বিবাহ এক অঞ্চলে একল্পনীয় কিন্তু আদরণীয় অন্যত্র।

বিভিন্ন ধরনের বিবাহের উৎপত্তি ও বিবর্তন এবং তার সঙ্গে জৈবিক ও সামাজিক সম্পর্ক, যৌন আচার ও স্বেচ্ছাচারিতা বোধ, হিন্দু, মুসলিম ও আদিবাসী সমাজের বিবাহ, প্রাক-বিবাহ ও বিবাহ বহির্ভূত নরনারীর বৈধ বা অবৈধ সম্পর্ক, গণিকাবৃত্তি এবং বহুবিধ প্রথা ও আচার ব্যবহার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা। সমাজবিদ্যার একখানি অপরিহার্য বই ॥ ৮·০০

এই গ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণের দাম ঃ ২০·০০

শঙ্খ প্রকাশন ॥ কলিকাতা-৯

একজিমা রোগ

সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলো, শ্বেত দাগ সহ আরও অনেক কঠিন কঠিন চর্মরোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ৮০ বৎসরের চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন। **হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর**, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন ঃ ৬৭-২৩৫৯। শাখা ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড কলিকাতা-৯)। পূরবী সিনেমার পাশে।

আবেগ সঞ্চারিত করল। কিন্তু কোনো স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার আগেই ফিলিপের মৃত্যু ঘটল মর্মান্তিকভাবে। শারীরিক পঙ্গুতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সে ডানকার্ক সৈকতে আটকে-পড়া শত শত বৃটিশ সৈন্যকে রক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারে নি। অমৃত্যুসঙ্গী তুষরহংসী যেন ফিলিপের বিদেহী আত্মার রূপে ধরে মেয়েটির কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে বিলীন হল আকাশে।

পল গ্যালিকোর গল্পের বিষণ্ন নরম ভঙ্গিটি অনুবাদে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন শ্রীদেব।

*

শান্তি পি দত্তর **রক্তস্নাত বাংলাদেশ** (রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, পাঁচ টাকা) গ্রন্থটির প্রচ্ছদপটটি অতি সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। ভেতরের ছাপা অতটা মনোগ্রাহী না হলেও, খারাপ বলা যায় না। ভূমিকাটি অপ্রয়োজনীয়—কেননা এই ধরনের বই কোন্ হুজুগে বেরোয় সবাই জানে—তবে বেশী বড়ো নয় বলে মেনে নেওয়া যায়। উৎসর্গ-পত্রটির ঠিক পরের পাতায় 'আমার সোনার বাংলা' গানটির চার লাইন বিকৃত করে ছাপা হয়েছে। এর কারণ বোঝা গেল না। তেমনই বোঝা গেল না এত বড় বইটি কী কারণে রচিত। এর মধ্যে এমন কোনো কথা নেই যা থেকে মনে হতে পারে বইটি বেরুনোর প্রয়োজন ছিল। এমন-ভাবে লেখাও নয় যাতে পড়তে ভাল লাগে। উচ্ছ্বাসময় সস্তা কবিত্ব করে শুধু বার বার প্রণাম জানাবার জন্যে এতগুলি পৃষ্ঠা ব্যয় না করলেও চলত।

*

"কে এই রহস্যময়ী? দু' দুটো খুনের পর রাঁতেশ ও আরেকজনের জীবনে কি বিপর্যয় এনেছিল সে? স্বাভাবিক চরিত্রের এই লাস্যময়ী নারীর অস্বাভাবিক কার্য-কলাপ ও নেপথ্যে আরো তিনটে বীভৎস খুনের শিহরণময় কাহিনী জানতে হলে পড়ুন—ডামি" কল্লোল সেনগুপ্ত রচিত **ডামি** (কমসো-স্ক্রিপট, সাত টাকা) নামক অপরাধমূলক উপন্যাসের আখ্যাপত্রে সংযোজিত এই বিজ্ঞাপনটি যে-ভাষায় রচিত তা হুবহু তুলে দেওয়া হল। এর কারণ 'ডামি' পড়ার পর স্বীকার করতেই হয় যে, 'শিহরনময় কাহিনী' রচনা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য লেখকের নিশ্চিত ছিল না। ক্ষমতাও ছিল কিনা সে-সম্পর্কেও নিশ্চিত হবার মতো কোনও সূত্র লেখক রাখেন নি। একটি অবিকল চেহারার মেয়েকে কেন্দ্র করে যে-ভাবে রহস্য-উপন্যাস গড়ে উঠতে পারে কল্লোলবাবু তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। রহস্য কাহিনীর শেষে অতিরিক্ত কথকের উপাদানও তিনি সরবরাহ করতে ভোলেন নি। খুনীর ওপর টেক্কা দিয়ে অদৃশ্য আততায়ী তার যাবতীয় কাজ প্রায় হাসিল করে এনেছিল, কিন্তু মিলনান্ত সমাপ্তির কথা মনে রেখে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করতেও ভুল হয় নি, তবু 'ডামি' কেন যেন কোথাও সাহিত্যের স্বাদ-যুক্ত হয়ে উঠল না।

*

রবি রায়ের **অন্ধকারের পদাতিক মুহূর্তগুলি** (কবিপত্র প্রকাশ ভবন, তিন টাকা) তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। রবি রায় ছন্দে লিখতে পারেন, শব্দ-মিল বেশ কাব্যিক, চিত্রকল্পও দু-এক ক্ষেত্রে সার্থক ছবি ফুটিয়েছে—কিন্তু সব মিলিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর এখনো নিজস্ব ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল নয়। এরই মধ্যে যে-কবিতাগুলি ভাল লাগে তার মধ্যে 'অর্কিড' 'অসুখে' 'জীবন বেঁচে থাকা' 'টোপ' ও নামক কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'অন্ধকারে পদাতিক মুহূর্তগুলির 'খুঁটে খুঁটে তুলে নাও। নিকোনো দাওয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া। ধানের মতো টুকরো টুকরো অতীত' কিংবা 'পদাতিক মুহূর্তেরা অন্ধকারে হেঁটে যায় শব্দের মিছিলে'—পংক্তির চিত্রকল্পগুলি বেশ সজীব।

(সি ৮৪২৯)

দাদ, চুলকানি, নালী ঘা, একজিমা, ফুস্কুড়ি, গায়ে গোটা, ঠাণ্ডায় হাত পা ফাটা, জীবজন্তুর দেহের ক্ষতে অব্যর্থ মহৌষধ।
বি-টেক্স, নবসারী, গুজরাট

দৃঢ় পদে হাসিখুশি জীবনের দিকে
বাটা জানে এযুগের ছেলেমেয়েদের মন
তাইতো ওদের জন্য এমন নিপুণতার অনুশীলন
করেছেন বাটার কারিগররা। আধুনিক, অতি-আধুনিক,
বনেদি—যে জুতোই ওরা চায়—বাটার দোকানে বিপুল সম্ভার,
অনেক পছন্দের স্বাধীনতা। পায়ের দিকে চোখ পড়ার মতো
অথচ নির্ভয় আরাম। একেই তো বলে দৃঢ় পদক্ষেপে
হাসিখুশি জীবনের দিকে এগিয়ে চলা।
১৮.৯৫-২৩.৯৫
ওয়েফাইন্ডারস ০৭
২০.৯৫-২৬.৯৫
জয় ডে ৬৮
১১.৯৫-২৪.৯৫
জুনিয়র ০৩
১৬.৯৫-২৪.৯৫
ওয়েফাইন্ডারস ৬৭
১১.৯৫-২৪.৯৫
Bata
Bata
Bata
Bata

সুরজিৎ সিং-এর হকি-শৌর্য

সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ, রবিবার। ৫৫ কোটি ভারতবাসীর অন্তত কয়েক কোটির সারাদিন চিত্তচাঞ্চল্যের মধ্যে কেটে গেছে। সন্ধ্যার পর কয়েক লক্ষ মানুষ কান খাড়া করে বসে আছে রেডিওর সামনে। ঘড়িতে ৮টা বেজে ৩৬ মিনিট। হল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডাম থেকে ইথার তরঙ্গে ভেসে আসা একটি নামের উচ্চারণ বেতার-যন্ত্র মারফৎ সবার কানে যেন মধু ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনের পর্দায় ভেসে উঠল একটি শ্মশ্রুল শৌর্যমণ্ডিত মুখের ছবি।

৪ মিনিট পরে আবার সেই শ্রুতি-সুখকর নামটির সোচ্চার উচ্চারণ—'সুরজিৎ সিং'। বিশ্ব কাপ হকি ফাইনালের বেতার ভাষ্যকার আবেগমথিত কণ্ঠে বলে চলেছেন—"সুরজিৎ, সুরজিৎ। পর পর পেনাল্টি কর্নার থেকে করা সুরজিতের দুটি গোলে ১০ মিনিটের মধ্যে হল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত ২—০ গোলে অগ্রগামী। চমৎকার দুটি গোল করেছে সুরজিৎ। তার বুলেটের মত হিটে দুবারই হল্যান্ডের রক্ষণব্যূহ বিধ্বস্ত। খেলায় এখন ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য।"

এদিকে বিশ্ব হকির বিজয়ী বীর হিসাবে ভারতে তখন সুরজিৎ-এর বন্দনা। কিন্তু বিধাতার কি নির্মম পরিহাস। সুরজিৎ পেল না বিজয়ী বীরের সম্মান। আদরের দুলালকে কাঁধে তুলে নৃত্য করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল ভারতের ক্রীড়ামোদি জনসাধারণ, হল্যান্ডের কাছে ভারত শেষ পর্যন্ত হেরে যাওয়ায়। যদি সুরজিৎ-এর দেওয়া দুটি গোল বজায় রেখে ভারত বিশ্ব কাপ বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরতে পারত তবে সম্ভবত সুরজিৎই হয়ে উঠত দ্বিতীয় বিশ্ব হকির প্রধান নায়ক।

চাকাটা অবশ্যই ঘুরে গেছে। কিন্তু বিশ্ব আসরে প্রথম খেলার সুযোগে বাইশ বছর বয়সী ছেলেটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্রীড়াশৌর্যে ভারতীয় হকির ভাবমূর্তিকে বড় করে তুলেছে। গ্রুপ লীগে প্রথম খেলায় জাপানের বিরুদ্ধে সুরজিৎই প্রথম গোল করে জয়ের পথ তৈরী করেছে। পাঁচটি গোলের মধ্যে একা করেছে দুটি গোল। সুরজিতের দুটি গোলেই প্রথম বিশ্ব কাপ রানার্স স্পেনের বিরুদ্ধে ভারতের জয়লাভ। এবং প্রধানত সুরজিতের বিক্রমে ভারতের নিশ্ছিদ্র রক্ষণ-ব্যূহ। ৭টি খেলার মধ্যে আক্রমণ থেকে একটিও গোল হয়নি, পাঁচটি গোলই হয়েছে পেনাল্টি কর্নার ও পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে।

অবশ্যই হকি একজনের খেলা নয়। সুরজিতের সঙ্গে রক্ষণভাগের অপর খেলোয়াড়দের দৃঢ়তার কথাও স্বীকার্য। পেনাল্টি কর্নার থেকে ৬টি গোল করলেও সুযোগের সদ্ব্যবহারে ওর ব্যর্থতাও না আছে, এমন নয়। তবু ব্যর্থতা ও সাফল্যের পরিমাপে সাফল্যই মুখ্য, ব্যর্থতা গৌণ। আর আধুনিক কালের আন্তর্জাতিক হকির বলিষ্ঠ ক্রীড়াপদ্ধতিতে সুরজিৎ শৌর্যের ছবি। খেলার মধ্যে বাড়তি বিক্রম। হাতে যেমন জোরালো হিট আছে, তেমন পজিশন জ্ঞান। খেলার টেকনিক ট্যাকটিকসও প্রায়

সুরজিৎ সিং

নির্ভুল। নিঃসন্দেহে সুরজিৎ এখন ভারতের এক নম্বর ব্যাক।

সুরজিৎকে আমরা কলকাতায় প্রথম দেখি বাহাত্তরে বেটন কাপের খেলায়। বর্ডার সিকিউরিটির পক্ষে খেলতে এসেছিল। তারুণ্যের তেজে ছেলেটি তখন টগবগ করছে। তার আগেই অবশ্য নির্বাচকদের নজরে পড়েছিল ১৯৭১-এ দিল্লিতে নেহরু হকি প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলার সুবাদে। ফলে ভারত সফরকারী কেনিয়া দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য ওর ডাক পড়ে এবং ওই বছরই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর ও ব্যাংকক সফর করে ফিরে আসে। সফল সফর। ১৪টি খেলাতেই জয়ের রেকর্ড।

বাহাত্তরের বেটন কাপে অসাধারণ ভাল খেলার ফলেই মুানিখ অলিম্পিকের কোচিং ক্যাম্পে ওর ডাক পড়ে। জীবনের বড় স্বপ্ন সফলের সম্ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সুরজিৎও মনপ্রাণ দিয়ে অনুশীলন শুরু করে। কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ে কোচিং ক্যাম্প থাকা কালে পরীক্ষার জন্য ওর বাড়ি যাবার প্রয়োজন দেখা দিলে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅশ্বিনীকুমার বলেন, "পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে। অলিম্পিক কিন্তু কারো জন্য অপেক্ষা করবে না। এখন পরীক্ষার চেয়েও তোমার প্র্যাকটিস ভারতের পক্ষে বেশী জরুরী।"

কোচিং ক্যাম্পে ছেলেটি এমন খেলা দেখিয়েছিল যে, হকি ফেডারেশনের সভাপতি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন তোমার উপর আমরা অনেকখানি নির্ভর করে আছি। যদি এই ভাবে খেলতে পার তবে রক্ষণব্যূহ নিঃসন্দেহে সুদৃঢ় হবে।"

যার খেলার উপর হকি ফেডারেশনের সর্বময় কর্মকর্তার এতখানি আস্থা ছিল এবং যে প্রতিটি ক্যাম্পে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল, কোন্ গূঢ় কারণে সে মুানিখ অলিম্পিক দল থেকে বাদ পড়ল কেউ জানে না। সুরজিৎ নিজেও তার কোন আঁচ পায়নি। শুধু এইটুকু বুঝেছিল ও কোন কর্তাব্যক্তির বিরাগভাজন হয়েছে।

আশাভঙ্গে খুবই ভেঙ্গে পড়েছিল সুরজিৎ। অনেকদিন হকি স্টিক হাতে করতে ইচ্ছে হয়নি। মনমরা হয়ে কলেজ হোস্টেলেই পড়ে ছিল। এমন সময় বাবার চিঠি পেল—"তোমার কতই বা বয়স। দিন পড়ে রয়েছে। মন শক্ত করে আবার অনুশীলন শুরু কর।"

দ্বিগুণ উৎসাহে আবার খেলা শুরু করল সুরজিৎ। বাবার কথা ফলতে দেরি হল না। সুযোগ পেয়ে গেল প্রায় হাতে-নাতে মুানিখ ব্যর্থতার পর যখন কথা উঠল, সুরজিৎকে উপেক্ষা করা উচিত হয়নি।

কর্মকর্তাদের উপেক্ষাই সম্ভবত সুরজিৎকে আরও সুদক্ষ হবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে কোচের পরামর্শ মত ভুল ত্রুটি শুধরে নিতে কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেনি। আমস্টার্ডামে বিশ্ব কাপের খেলার মধ্যে তারই প্রতিফলন।

পঞ্চ নদীর তীরের গুরুদাসপুর জেলার ছেলে। ১৫ বছর বয়সে অমৃতশহরে পশ্চিম জার্মান দলের বিরুদ্ধে জাতিভাই হরচরণ সিংকে খেলতে দেখে মনে হকি খেলার রং ধরে। তারপর নামী ব্যাক মুখবেন সিংয়ের সান্নিধ্যে আসে। জলন্ধর স্পোর্টস কলেজে ভর্তি হবার পর হকিতে নেশা ধরে যায়। কিন্তু নেশা ধরলেই তো খেলায় নাম করা যায় না। শুধু অনুশীলনের মাধ্যমেও বড় খেলোয়াড় হওয়া যায় না। বড় খেলোয়াড় হতে হলে সহজাত শক্তি ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন। সুরজিৎ সে শক্তি, নৈপুণ্য ও স্বাস্থ্যের অধিকারী। আন্তরিকতায়ও ঘাটতি নেই। সুতরাং বাইশ বছরের তরুণ হকি প্রতিভার জন্য বহু সম্মান অপেক্ষা করে আছে।

—মুকুল

স্বর্ণ-মৃগের পিছনে ছুটে চলেছি

সাত বছর ব্যর্থতার পর আবার হকি দুনিয়ার শীর্ষে আরোহণের স্বর্ণ সম্ভাবনা জাগিয়েও আমস্টার্ডামে বিশ্ব কাপ হকি ফাইনালে হল্যাণ্ডের কাছে ভারত হেরে গেল। আপাতত ব্যর্থ হয়ে গেল গীতিকার অতুলপ্রসাদের বাণী "ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"। আমাদের হকি খেলোয়াড়রা স্বর্ণ-মৃগের পিছনেই ছুটে চলেছে

সাফল্য, সাফল্য; সাফল্য। ব্যর্থতা, ব্যর্থতা; ব্যর্থতা। ভারতীয় হকির স্বর্ণ যুগে আমরা সাফল্যের সোনার তরীতে সারা বিশ্ব সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছি। বার বার ব্যর্থতার গ্লানির মধ্যে এখন বিচরণ করছি রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ যুগের মধ্যে। কবে আবার স্বর্ণযুগ ফিরে আসবে? কবে আবার ভারত বিশ্ব হকির শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করবে? ভারতীয় হকির ভগবানেরাই তা বলতে পারেন। স্বর্ণযুগের পেছনেই কি আমাদের চিরদিন ছুটতে হবে?

সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটি পারস্পরিক প্রতিশব্দ। দুটি অর্থের মধ্যে বিরাট ব্যবধান, যেমন ব্যবধান আমাদের অতীত দিনের হকি খেলার সঙ্গে বর্তমান কালের হকি খেলার।

কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, হকির বর্তমান বিশ্বমান অনুযায়ী সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে বিরাজ করছে একটি অতি সূক্ষ্ম ভেদরেখা। বার বার সেই সূক্ষ্ম রেখাটি ছিন্ন করার অসামর্থ্যই আমাদের বড় ব্যথার কারণ।

দু'বছর আগে বার্সিলোনায় প্রথম বিশ্ব কাপের সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম গোল করে এবং বিরতি সময় পর্যন্ত ১—০ গোলে এগিয়ে থেকেও আমরা ২—১ গোলে হেরে গেলাম। এক বছর আগে মুানিখ অলিম্পিকের সেমিফাইনালে ৯টি সর্ট কর্নার, ৭টি লং কর্নার এবং মোট ২৭ বার গোল করার সুযোগ পেয়েও আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি গোল করতে পারলাম না। পাকিস্তান ৮টি সুযোগ থেকে দুটি গোল করে খেলায় জিতে গেল। আমস্টার্ডামে কী হল? ফাইনালে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১০ মিনিটের মধ্যেই আমরা ২—০ গোলে অগ্রগামী। গোল দুটি [illegible] পরও জয়ের সুবর্ণ সুযোগ এসেছে বার বার। অতিরিক্ত সময়ের শেষ মুখেও মিলেছে পেনাল্টি স্ট্রোকের চরম সুযোগ। কিন্তু সে সুযোগও হাতছাড় হল। শেষ পর্যন্ত আমরা টাই ব্রেকারে হারলাম ৪—৬ গোলের ব্যবধানে।

খেলাধুলার [illegible] এমন হারের অবশ্যই নজীর [illegible]-এর বিশ্ব কাপ ফুটবলের [illegible] লীগে যুগোস্লাভিয়া ৫১ মিনিট পর্যন্ত ২—০ গোলে এগিয়ে [illegible]

গোলে। তার চার বছর আগে ইংলণ্ডে বিশ্ব কাপ ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে ৩—০ গোলে অগ্রগামী উত্তর কোরিয়ার ৫—৩ গোলে পর্তুগালের কাছে হারের কথাও আমাদের মনে আছে। মনে আছে ১৯৭১-এ মারডেকা ফুটবলের সেমি-ফাইনালে ২—০ গোলে অগ্রগামী ভারতের ৩—২ গোলে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে পরাজয়ের কথা। কিন্তু কোনো বিশ্ব

প্রতিযোগিতার ফাইনালে এমন হারের বোধ-হয় নজীর নেই, এবার আমস্টার্ডামে যেভাবে ভারতের হকি দল হেরেছে হল্যাণ্ডের কাছে।

একটি ঘটনার সঙ্গেই বোধ হয় এ হারের কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়—দীর্ঘ ৯১ বছর আগে যে হারের ফলে ক্রিকেটে 'অ্যাসেজ' কথাটির উৎপত্তি। জয়ের জন্য মাত্র ৩৫ রান বাকী। হাতে ছিল ৮টি উইকেট। তবু, ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় ওই টেস্ট যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ৭ রানে হেরে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে।

ইংরেজরাই ক্রিকেটের স্রষ্টা। ওই পরাজয়ের গ্লানিতেই ইংরেজ সাংবাদিক খবরের কাগজের পাতায় কালো বেষ্টনীর মধ্যে ইংলিশ ক্রিকেটের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন। হকি খেলা যদি আমরা সৃষ্টি করতাম তাহলে বার বার ব্যর্থতার পরি-প্রেক্ষিতে, বিশেষ করে বিশ্বকাপ ফাইনালের বিস্ময়কর বিপর্যয়ে আমরাও হয়তো হকির মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করতে পারতাম। তা আর করি কিভাবে। কিন্তু অন্তরে আমাদের বড় দুঃখ। হকি সৃষ্টি না করলেও যে ভারত রূপ-গুণ-বর্ণ-ছন্দে হকিকে পরম রমণীয় খেলায় পরিণত করেছে, কব্জির পেলবতায়, সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে হকি খেলার মধ্যে এনেছে মোহময় মায়াজাল—সেই ভারতের হকির আজ কী হাল। [illegible] অলিম্পিকের [illegible]

সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচু মেক্সিকো শহর থেকে আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠের মাটিতে নেমেছি, মুানিখেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারিনি। বার্সিলোনার বিপর্যয়ের পর আবার আমস্টারডামে ব্যর্থতা। মাঝখানে ব্যাংকক এশিয়ান গেমসের ব্যর্থতাও আছে। সুতরাং লজ্জা, লজ্জা! লজ্জা! এ লজ্জা আমরা রাখব কোথায়?

সাধারণ ক্রীড়ামোদী এবং প্রতিটি ভারত-বাসী দেশের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতায় লজ্জাবোধ করলেও হকি খেলার কর্মকর্তারা কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে বহাল তবিয়তে বসে আছেন প্রশাসনের বেতের সিংহাসনে।

"বিশ্বকাপ এনে দিতে না পারলে হকি থেকে সরে যাব"—কেচ রণধীর সিং জেণ্টল-এর সেই প্রতিজ্ঞার কথা আজ তুলব না। "বিশ্বকাপ জিতব"—কর্মকর্তাদের সেই আশ্বাসবাণীর কথাও না। শুধু কর্মকর্তাদের গোষ্ঠীগত কোন্দল এবং সেই কোন্দলকে কেন্দ্র করে বিশ্বকাপ দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের বিদ্রোহের কথাটাই আবার স্মরণ করিয়ে দেব। বোধ হয় পাঠক-দের মনে আছে, আমস্টারডামে খেলা শুরুর মাত্র একমাস আগে দলের ম্যানেজার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কর্মকর্তাদের মধ্যে যে বিবৃতি পাল্টা-বিবৃতি এবং কাদা ছোঁড়াছুড়ি আরম্ভ হয়েছিল তা দেখে মন্তব্য করেছিলাম—"আমস্টারডামে বিপর্যয় ঘটলে কর্মকর্তাদেরও কৈফিয়ৎ দেবার দায়িত্ব থাকবে।"

কর্মকর্তারা কি আজ সে দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন? আত্মকলহের অপর নাম আত্মবিলুপ্তি। কলহে রাষ্ট্র বিপর্যয় ঘটে। দম্পতি কচকচিতে সোনার সংসার ছারখার হয়ে যায়। কারণ খুঁজতে গেলে কোন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় না। ভারতের হকি সংসারেও দম্পতি কচকচি শুরু হয়েছে বহুকাল থেকে। মাঠের বাইরে [illegible] লাঠি ঘুরিয়ে [illegible]-এর চেষ্টা চলছে। [illegible] বোধ হয় [illegible] লাঠি [illegible]।

না হলে কেন বার বার এই বিপর্যয়? অতি সক্ষ্ম ভেদরেখা ছিন্ন করার কেন এই ব্যর্থতা?

কোচ জেণ্টল বলেছেন, তাঁর ছেলেরা চমৎকার খেলেছে। মানিখ ওলিম্পিকের চেয়েও ভাল খেলেছে। স্বীকার করছি, অতিরিক্ত সময়ের শেষ মুহূর্তে সেণ্টার ফরোয়ার্ড গোবিন্দ যদি পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করতে পারত, কিংবা লেফ্‌ট-ব্যাক সুরজিৎ সিং পেনাল্টি কর্নার থেকে আর একটি গোল করত তাহলে ভারত বিশ্বকাপ নিয়ে ফিরে আসত। চিত্রও বদলে যেত। দেশ আনন্দের বন্যায় ভেসে যেত, অফিস আদালত ছুটি হত, পার্লামেণ্টে প্রশংসাবাণীর বাণ ডাকত, অভিনন্দন বার্তায় খবরের কাগজের পাতা ভরে উঠত এবং আমাদের কলমেও জোয়ার আসত।

কিন্তু স্বীকার করতে পারছি না এবারও আমাদের ছেলেরা চমৎকার খেলেছে। গ্রুপ লীগে নিউজিল্যাণ্ডকে আমরা হারাতে পারিনি, পশ্চিম জার্মানীকেও না। দ্বিতীয় সারির পাকিস্তান দলের বিরুদ্ধে আমাদের কষ্টার্জিত জয় এবং ফাইনালে হল্যাণ্ডের কাছে টাই ব্রেকারে পরাজয়। এই কি ভাল খেলার নমুনা? তার চেয়েও বড় কথা, যে দল একটি প্রতিযোগিতায় চারটি পেনাল্টি স্ট্রোক মিস করে সে দল কি প্রশংসার শিরোপা পেতে পারে? শর্ট কর্নারের সুযোগও তো কম নষ্ট হয়নি। তবু স্বীকার করি শর্ট কর্নার হিটে সুরজিৎ সিং আংশিক সফল। কিন্তু পেনাল্টি স্ট্রোকের সদ্ব্যবহারে এত ব্যর্থতা কেন? গ্রুপের খেলায় জাপানের বিরুদ্ধে, জার্মানীর বিরুদ্ধে, সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং ফাইনালে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আমরা পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করতে পারিনি। আর শেষ পর্যন্ত ওই পেনাল্টি স্ট্রোকের ব্যর্থতায় হারিয়েছি বিশ্বকাপ। টাই ব্রেকারে পাঁচটি পেনাল্টি স্ট্রোকের চারটি থেকে হল্যাণ্ড গোল করল, আমরা করলাম দুটি গোল। এতদিন বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনে এসেছি, আমাদের পেনাল্টি কর্নার হিটে পারদর্শী হতে হবে। এবার বোধ হয় শুনব, পেনাল্টি স্ট্রোকে পারদর্শী না হলে আমরা বিশ্ব আসরে দাঁড়াতে পারব না।

খেলা প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলার ছিল। বলার ছিল অনকোরা নতুন দল নিয়ে পাকিস্তানের প্রশংসনীয় ও দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার কথা। হকিতে হল্যাণ্ডের প্রথম বড় সম্মান লাভেরও পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ সপ্তাহে স্থানাভাব। পরে এ সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছে রইল।

শুধু এইটুকু বলা দরকার, আন্তর্জাতিক হকি ক্ষেত্রে বহুকাল থেকে যারা গৌরব লাভের জন্য সংগ্রাম করছে সেই হল্যাণ্ডের বিশ্বকাপ যোগ্যের যোগ্য পুরস্কার। অবশ্যই দেশের মাঠে, দেশের সমর্থকদের সামনে খেলার একটা বাড়তি সুযোগ থাকে। স্পেনও সম্ভবত এই সুযোগে বার্সিলোনার প্রথম বিশ্বকাপে রানার্স'র সম্মান পেয়েছিল। তবু বলব, সেমি-ফাইনালে ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে এবং ফাইনালে ভারতের সঙ্গে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করে হল্যাণ্ড যেভাবে বিজয়ী হয়েছে তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। দুটি খেলারই মীমাংসা হয়েছে টাই ব্রেকারে ১০৭½ মিনিট করে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর।

হকি দুরন্ত গতি ও ছুটন্ত বলের খেলা। ৭০ মিনিট খেলার পর ১৫ মিনিট অতিরিক্ত সময় খেলতেই খেলোয়াড়রা হিমসিম খেয়ে ওঠে। তারপরে সাড়ে ৭ মিনিট করে তিন দফায় "সাডেন ডেথ পিরিয়ডের" খেলা। তারপরে পেনাল্টি স্ট্রোক, ট্রাই ব্রেকারের। ওই অবস্থার মধ্যেও হল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে এবং নিখুঁতভাবে স্ট্রোকের সদ্ব্যবহার করেছে, এটা তাদের কৃতিত্বের পরিচয়।

নীচে খেলার ফলাফল ও লীগ টেবল দেওয়া হল।

এ গ্রুপ

ভারত—৫ জাপান—০
(সুরজিৎ—২, হরচরণ, চাঁদ, গোবিন্দ)
ভারত—০ পঃ জার্মানী—০
ভারত—৪ কেনিয়া—০
(চাঁদ, বলদেব, অজিত, গোবিন্দ)
ভারত—১ নিউজিল্যাণ্ড—১
(বলদেব)
ভারত—২ স্পেন—০
(সুরজিৎ—২)
পঃ জার্মানী—২ নিউজিল্যাণ্ড—১
পঃ জার্মানী—১ স্পেন—০
পঃ জার্মানী—২ কেনিয়া—১
পঃ জার্মানী—১ জাপান—০
স্পেন—৪ কেনিয়া—১
স্পেন—২ নিউজিল্যাণ্ড—১
স্পেন—৩ জাপান—০
নিউজিল্যাণ্ড—৮ জাপান—১
নিউজিল্যাণ্ড—২ কেনিয়া—২
জাপান—২ কেনিয়া—২

এ গ্রুপ লীগ টেবল

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পঃ জার্মানী	৫	৪	১	০	৬	২	৯
ভারত	৫	৩	২	০	১২	১	৮
স্পেন	৫	৩	০	২	৯	৫	৬
নিউজিল্যাণ্ড	৫	১	২	২	১৩	৮	৪
কেনিয়া	৫	০	২	৩	৬	১৪	২
জাপান	৫	[illegible]	১	[illegible]	[illegible]	১১	১

বি গ্রুপ

পাকিস্তান—৪ মালয়েশিয়া—২
পাকিস্তান—২ হল্যাণ্ড—১
পাকিস্তান—২ ইংল্যাণ্ড—২
পাকিস্তান—২ বেলজিয়াম—০
পাকিস্তান—৬ আর্জেণ্টিনা—০
হল্যাণ্ড—০ আর্জেণ্টিনা—০
হল্যাণ্ড—৪ বেলজিয়াম—১
হল্যাণ্ড—৪ মালয়েশিয়া—০
হল্যাণ্ড—২ ইংল্যাণ্ড—১
ইংল্যাণ্ড—৫ বেলজিয়াম—২
মালয়েশিয়া—২ ইংল্যাণ্ড—১
ইংল্যাণ্ড—০ আর্জেণ্টিনা—০
বেলজিয়াম—২ আর্জেণ্টিনা—০
আর্জেণ্টিনা—১ মালয়েশিয়া—১
বেলজিয়াম—৩ মালয়েশিয়া—০

বি গ্রুপ লীগ টেবল

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পাকিস্তান	৫	৪	১	০	১৬	৫	৯
হল্যানড	৫	৩	১	১	১১	৪	৭
ইংল্যানড	৫	১	২	২	৯	৮	৪
বেলজিয়াম	৫	২	০	৩	৮	১২	৪
মালয়েশিয়া	৫	১	১	৩	৫	১৩	৩
আরজেনটিনা	৫	০	৩	২	২	১	৩

সেমি ফাইনাল

ভারত—১ পাকিস্তান—০
(গোবিন্দ)
হল্যাণ্ড—৪ পঃ জার্মানী—২

ফাইনাল

হল্যাণ্ড—৬ ভারত—৪
(সুরজিৎ সিং—২, হরমিক, অজিতপাল)

তৃতীয় স্থান নির্ণয় খেলা

পঃ জার্মানী—১ পাকিস্তান—০

১২টি দেশের পর্যায়ক্রমে স্থান—

১। হল্যাণ্ড ২। ভারত ৩। পশ্চিম জার্মানী ৪। পাকিস্তান ৫। স্পেন ৬। ইংল্যাণ্ড ৭। নিউজিল্যাণ্ড ৮। বেলজিয়াম ৯। আর্জেণ্টিনা ১০। জাপান ১১। মালয়েশিয়া ১২। কেনিয়া।

একলব্য

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

বাজ-পাখির মালিকের গল্প, যার সুন্দরী স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তার দেশের শাসক।

এখন হতভাগ্য স্বামীর একমাত্র লক্ষ্য : প্রতিশোধ।

জেনারেল কি সবসময়ই হলুদ পোশাক পরে থাকেন?
হ্যাঁ। ওটা তার প্রিয় রঙ। তার পতাকাগুলোও হলুদ রঙে ছোপানো। প্রকাশ্যে অন্য কোন লোকের ঐ রঙের পোশাক পরবার অধিকার নেই আমাদের দেশে।

হুম। কিন্তু হলুদ পোশাক-পরা মানুষদের তুলে আনার বিদ্যে ঐ বাজগুলোকে শেখালে কেমন করে?
ব্যাপারটা ঠিক ধরেছ দেখছি। কী করে শেখালাম, বলছি।

'প্রথমে পাখিগুলোকে হলুদ পোশাক তুলে-আনা অভ্যেস করাতাম।'

'তারপর ঐ রঙের নকল মানুষ কুড়িয়ে আনা অভ্যেস করাই।'

'তারপর এখন আমি নির্দেশ দিলেই বাজগুলো হলুদ পোশাক-পরা জ্যান্ত মানুষদের তুলে আনে, যেমন এনেছে তোমাকে।'

ওদের ধারালো নখগুলো ফিতেয় বেঁধে রেখেছি যাতে কারুর কেটে-ছড়ে না যায়। অ্যাদ্দিনে মহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। শিগগিরই আমি প্রতিশোধ নেব।
মনে হচ্ছে-- অবিশ্বাস্য, অসম্ভব!

পদাতিক পরিচালনা : মৃণাল সেন) ছবিতে বোম্বাইয়ের স্টার সিমি—ছবির মূর্তি [illegible]

সিনেমা টিকিটের উপর অতিরিক্ত পাঁচ পয়সা কর ধার্য করে দশ কোটি টাকার এক তহবিল গড়ে তোলার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন। সম্প্রতি রাজ্যসভায় তথ্য ও বেতার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী আই কে গুজরাল এই কথা ঘোষণা করেন। তহবিলের উদ্দেশ্য ফিল্ম ইনডাস্ট্রির সর্বাত্মক উন্নতিসাধন। সরকার সর্বভারতীয় ফিল্ম ইনডাস্ট্রির উন্নতির কথা যখন ভাবছেন তখন হিন্দী ফিল্ম ইনডাস্ট্রিও হয়ত বাদ পড়ছে না। বোম্বাইয়ের হিন্দী ফিল্ম ইনডাস্ট্রিকে মদৎ দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি? বোম্বাইয়ের বড় স্টার সমেত বড় বাজেটের একটি হিন্দীচিত্র তৈরির খরচ নাকি এক কোটি টাকার কাছাকাছি, কখনও নাকি তা এক কোটি টাকারও উপর। এহেন ফিল্ম ইনডাস্ট্রির যদি আরও উপকারসাধনের দরকার থাকে তবে দশ কোটি টাকার তহবিলে কুলোবে না।

* * *

শ্রীগুজরাল রাজ্যসভায় বিতর্কের উত্তরদানকালে এই তহবিলের কথা বলেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি প্রকাশ করেননি। যদিও বা করে থাকেন সংবাদপত্রে তার প্রতিবেদন নেই। যদি আঞ্চলিক চিত্রশিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য এই তহবিল গড়ে তোলা

মতামতের মন্তাজ

হয় তবে সংশ্লিষ্ট সকলেই সরকারকে সাধুবাদ জানাবেন। সর্বভারতীয় ফিল্ম ইনডাস্ট্রি তথা হিন্দী ফিল্ম ইনডাস্ট্রি মোটেই সংকটপীড়িত নয়, সংকট যদি থাকে সেটা আঞ্চলিক চিত্রের। হিন্দী চিত্র-সাম্রাজ্যের নিষ্পেষণে আঞ্চলিক চিত্রশিল্প এখন মৃতপ্রায়। এক শ্রেণীর জাঁকজমকপূর্ণ কমার্শিয়াল হিন্দীচিত্র, ক্রাইম ও যৌন-উপকরণই যার প্রধান উপজীব্য, জনরুচিকে বিষাক্ত করে তুলেছে। কলির ধর্ম ফিল্মের ব্যবসায় প্রতিফলিত—সৎপ্রচেষ্টার মূল্য কম, অসৎ বুদ্ধির জয়জয়কার। সুস্থ ও রুচি-সম্পন্ন আঞ্চলিক চিত্র জাতীয় পুরস্কার পেতে পারে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ নেশাগ্রস্ত দর্শকের অনুরাগ থেকে বঞ্চিত। সেকারণে আঞ্চলিক চিত্রকে প্রতিযোগিতায় হার মানতেই হয়। পরাজয় কোন কোন চিত্র-পরিচালকের মনে আপসের মনোভাবও জাগায়। সেটা আরও ভয়ঙ্কর। সব মিলিয়ে আঞ্চলিক চিত্রশিল্পের অবস্থা অতি শোচনীয়।

* * *

ফিল্ম কাউনসিল গঠন কিংবা দশ কোটি টাকার তহবিল গড়ার প্রস্তাবে আঞ্চলিক চিত্রশিল্পমহলে স্বভাবতই আশার সঞ্চার হতে পারে। সেই সঙ্গে আশঙ্কার রেশ থাকাও অসম্ভব নয়। আঞ্চলিক চিত্রই এ-যাবৎ ভারতীয় সিনেমার কৌলিন্যকে বাঁচিয়ে এসেছে। শুধু জাতীয় পুরস্কারই নয়, বিদেশেও পুরস্কার বা সম্মান যা কিছু ভারতের ভাগ্যে জোটে তা আঞ্চলিক চিত্রেরই দৌলতে—বিশেষত বাংলা ছবির জন্য। বাংলা ছবিকে কেন্দ্রীয় সরকার আর সব ছবির সঙ্গে এক পংক্তিতে ফেলতে পারেন না। এটা ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা বা সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা নয়। বাংলা ছবি বাঁচলে ভারতীয় সিনেমারই মর্যাদা রক্ষা পাবে। নতুন সাহায্য পরিকল্পনায় বাংলা ছবির খাতে কত টাকা ব্যয় করা হবে সে-সম্পর্কে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দরকার।

* * *

আঞ্চলিক ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশন গঠনের দাবি কয়েকবারই কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে। এই প্রস্তাব সর-

কারের বিবেচনাধীন বলেও শোনা গিয়েছিল। নতুন যে তহবিল গড়া হচ্ছে তা থেকে আঞ্চলিক ফিল্ম ফিনান্স-এর কথা সরকার ভেবে দেখতে পারেন। আঞ্চলিক চিত্রেরই এখন সব চাইতে বেশি আর্থিক সাহায্যের দরকার।

• • •

প্রস্তাবিত তহবিলের টাকা জোগাবার দায় যে দর্শকদের উপর ন্যস্ত হয়েছে সেটা আর এক আশঙ্কার কথা। সিনেমার টিকিটের দাম ক্রমবর্ধমান। আমোদ-কর বাবদ সমানে বেড়েই চলেছে। তথাকথিত হিন্দীচিত্র থেকে বিকৃত আমোদ আহরণের জন্য যাঁরা বেপরোয়া তাঁরা টিকিট প্রতি অতিরিক্ত পাঁচ পয়সা কর দিতে গররাজি হবেন না নিশ্চয়ই। দাম বাড়লেও নেশার বস্তুর কদর কমে না। টিকিটের দাম আরও বাড়লে আঞ্চলিক চলচ্চিত্রেরই ক্ষতি। অতএব তহবিল গড়ার উপায়টিও সমর্থন-যোগ্য নয়। টিকিটের উপর বর্ধিত কর হিন্দী চিত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে না, ক্ষতি হবে আঞ্চলিক চিত্রের। আমোদ-কর বাবদ সরকার যে টাকা আদায় করে থাকেন তারই একটা অংশ সরকার ফিল্ম ইনডাস্ট্রির কল্যাণে ফিরিয়ে দিতে পারেন। সর্বভারতীয় ফিল্ম ইনডাস্ট্রির মঙ্গলের জন্য নয়, আঞ্চলিক চিত্রের মঙ্গলের জন্য।

"......তাদের বিচারে [illegible] সবচেয়ে বড় ত্রুটি এর একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি।..."
'দেশ'—১১।৮।৭৩

মুক্তাঙ্গন। ১৯ সেপ্টেম্বর। ৭টা
হলে টিকিট। চেতনা প্রযোজনা

(সি ৮৪৩০)

অ্যাকাডেমী মঞ্চে
২১শে সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যা ৬॥টায়
তরুণ অপেরা ৫৫-৭১২১

নামভূমিকায়—শান্তিগোপাল
হলে টিকিট।

(সি ৪৪৬৪)

শ্রীচরণকমলেষু বাবুমশাইগণ সমীপেষু
সবিনয় নিবেদন
চতুরঙ্গের
নরক থেকে আলোয় ফেরার নতুন নাটক
নির্দেশনা/বরুণ দাশগুপ্ত
নাটক/অজিত গঙ্গোপাধ্যায়
মুক্তঅঙ্গন ১৭ই সেপটেমবর/৭টা

(সি ৯০১৮)

একাডেমীতে থিয়েটার ওয়ার্কশপ
চাকভাঙা মধু
১৫ সেপ্টেম্বর ৭৩
শনিবার সন্ধে সাতটা
নাটক—মনোজ মিত্র / আলো—তাপস সেন
নির্দেশনা—বিভাস চক্রবর্তী

(সি ৯০৩৭)

লম্বকর্ণ পালা
ছোটদেরও সঙ্গে আনুন
রবীন্দ্র সদনে/নক্ষত্র
পালাকার/অবনীন্দ্রনাথ
প্রয়োগ প্রধান/শ্যামল ঘোষ
২২ সেপ্টেম্বরসন্ধে ৭টা
রবিবার হইতে হলে টিকিট
সেপ্টেম্বরের প্রতি রবিবার সন্ধে ৭টা
শতাব্দী অঙ্গন মঞ্চে একিনা বীথিতে
নয়ন কবিরের পালা

(সি ৮৯১৪)

রেকর্ডে পূজার গান
মন কেড়ে নেওয়া সুরে নতুন গান গেয়েছেন
চিত্র তারকা মালা সিনহা
বাংলা পপ গানের জনপ্রিয় শিল্পী
বাপী লাহিড়ী
বোম্বাইয়ের শিল্পী : মানস মুখোপাধ্যায়
প্রথিতযশা জপমালা ঘোষ ও সনৎ সিংহ
জনপ্রিয় শিল্পী : প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য
উদীয়মানা শিল্পী :
শ্যামলী বসু ও কুমকুম চট্টোপাধ্যায়
সেই সঙ্গে
বটুক নন্দী : গীটার • জহর রায় : কমিক
সুকুমার মিত্র : নজরুল গীতি
ফিল্মের গান :
রৌদ্রছায়া • চলো ক'লকাতা • অপরাজিতা
এই তিনটি ছায়া ছবির গান গেয়েছেন
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় • সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
মান্না দে • নির্মলা মিশ্র
ই. পি. রেকর্ডে : কার্তিক কুমারের সেতার
এল. পি. রেকর্ডে : শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা
আপনার কাছের পলিডর বিক্রেতার দোকানে আজই শুনুন
গানের বই স্টক থাকা পর্যন্ত পাবেন

পূর্ব ভারতের একমাত্র পরিবেশক :
দেবসনস প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা • পাটনা • কটক • গৌহাটী • জামশেদপুর
DEEVAS/737

"অমর-ঝমেঝ" ছবিতে কল্যাণী মণ্ডল ও আনন্দ মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

ক্ষুধিত পাষাণ—নৃত্যে

গোয়ালিয়রের সুখ্যাত রঙ্গশ্রী লিটল ব্যালে দলের 'ক্ষুধিত পাষাণ' (রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে) আক্ষরিক অর্থেই নৃত্য-নাট্য। এবং সফল ও সুপ্রযোজিত। গল্পের রহস্যময়তা, বাস্তব ও কল্পনার খণ্ড খণ্ড দৃশ্যপর্যায়গুলি এখানে গল্পের মেজাজ অনুযায়ী বিন্যস্ত। নাচ এখানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাকে গান কিংবা কোন ধারা-ভাষ্যের হাত ধরে চলতে হয় নি। মেহের আলীর প্রলাপ 'সব ঝুট হ্যায়' তাও মাত্র একবার ব্যবহৃত। গান ছিল না বললেই হয়। মাত্র একটি গান 'কোয়েলিয়া মত্ কুকো' ব্যবহার করা হয়েছে। এই ব্যবহার নাচের প্রয়োজনে নয়—পরিবেশ রচনার জন্যেই। আর যা আছে তা হচ্ছে সুরের কারুকাজ। যা দিয়ে গল্পের অপ্রাকৃত পরি-বেশ, আর মায়া রচনা করা হয়েছে। যন্ত্র-সংগীতের সার্থক ব্যবহার আর কিছু ধ্বনি প্রয়োগ দু' একটি স্মরণীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে।

নাচের ব্যাপারে 'রঙ্গশ্রী' কোন ত্রুটি রাখেন নি। প্রায় প্রত্যেক শিল্পীই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নেচেছেন। নৃত্যের সূক্ষ্ম ভঙ্গিমা এঁদের সকলেরই করায়ত্ত। ফলে নৃত্যের ভঙ্গিতেই শিল্পীরা গল্প বলে গেছেন। কাহিনীর অতি খুঁটিনাটি ব্যাপার-গুলোও নৃত্যের দ্বারা চমৎকারভাবে প্রতি-ভাত। গান ও নেপথ্য ভাষণের সাহায্য ব্যতিরেকেও শুধুমাত্র নাচ দিয়ে একটি কাহিনীর গঠন ও বিন্যাস সুন্দর করা যায় একথা কলকাতার দর্শকরা রবীন্দ্রসদনে বসে আনন্দের সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন। তবে, উপভোগ্যতা বাড়াবার জন্যে গোটা অনুষ্ঠান কি আরেকটু সংক্ষিপ্ত হতে পারে না? তাছাড়া এই গল্পের মেজাজ সুরে সুরে যেমন বাঁধা পড়ল, তাতে আলোর ভূমিকা এত অকিঞ্চিৎকর হল কেন? উজ্জ্বল আলোর আক্রমণ দাক্ষিণ্য সর্বত্র না রেখে কখনো কখনো কি আলোর মায়া দিয়েও পরিবেশের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুললে ভালো লাগত না?

দর্শক হিসেবে আর একটি ক্ষোভ নিতান্তই ব্যক্তিগত। তা হচ্ছে সুন্দর নাচের সঙ্গে দু' একটি সুন্দর মুখের অভাব! ইরাণী মেয়েদের সৌন্দর্য আর রূপলাবণ্য এখানে উপেক্ষিত। সংগীত পরিচালনা ও নৃত্য পরিকল্পনার জন্য প্রশংসা পাবেন যথাক্রমে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়। সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে রঙ্গশ্রী লিটল ব্যালে ট্রুপ "ক্ষুধিত পাষাণ" মঞ্চস্থ করেন।

নৃত্য-সমালোচক

রঞ্জনা নান্দীকার
৫৫-৬৮৪৬ প্রযোজিত
১৫ই শনিবার ৬৷টায়
নটী বিনোদিনী
১৬ই রবিবার ৩টে ও ৬৷টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
(সি ৯২৯০)

সান্ধ্য আসরে সেতার

সুব্রত রায়চৌধুরী এবং ওস্তাদ কেরামতুল্লাহ্ খাঁয়ের সেতার-তবলা জুটি বেশ কিছুকাল কলকাতায় প্রসিদ্ধ অর্জন করেছে। এঁদের বাজনার রসের মিলন বস্তুত মেজাজের সাযুজ্যের জন্যই ঘটে। সে-পরিচয় আবার পাওয়া গেল ৯ আগস্টের এক অনুষ্ঠানে, ম্যাক্সমুলার ভবনে।

সান্ধ্য আসরের শুরুতে সুব্রত ধরে-ছিলেন বাগেশ্রীর আলাপ। কাফী ঠাটের বাগেশ্রীতে ওঁর সুরের গাম্ভীর্য লক্ষণীয় ছিল। বিশেষ করে বাদী স্বর মধ্যমের নিপুণ প্রয়োগ, ধৈবতের সম্যক ব্যবহার, বিস্তারের স্বরপ্রকৃতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ সুব্রতর বাগেশ্রী আলাপকে একটা সংবদ্ধতা দিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, জোড়ের অংশে সেতারের তার ক্রমশ্বরে আলগা হয়ে পড়ায় শিল্পী সুন্দর সুন্দর সুরের মুখ ধরেও সেগুলির যথাযথ বিস্তার থেকে বিরত হতে বাধ্য হন। কয়েকটি তানও বন্ধ পড়ে এই কারণে। অবশেষে গতে এসে শিল্পী এক অনবদ্য মুর্ছনায় জোর দেন তাঁর শ্রোতাকে।

বিরতির পর সুব্রত ছোট্ট করে আলাপ শোনালেন দরবারী কানাড়ার। গুরুগম্ভীর বাগেশ্রী এবং মালকোষের পর দরবারীর কোমল-করুণ মাধুর্য ভারী মনে ধরেছিল শ্রোতাদের। কোনরকম চুটকি ঢঙের কাজের মধ্যে না গিয়ে এবং দরবারীর নিবিষ্ট মুড়কিতেই মগ্নতায় নিমগ্ন থেকে শিল্পী তাঁর চিন্তার পরিচয় দিলেন। তার মানে হয় দরবারীর যথাযথ পরিবেশ-টাকে স্মরণীয় করার জন্য আরও কিছু সময় নিলেই ভাল হত।

অবশ্য কোন সমালোচনাই ছাপাতে পারে না সুব্রতর কিরওয়ানী নিবেদনকে। অজস্র কারুকার্যতে ধরা কিরওয়ানী গত একটা মননশীল রূপ পেয়েছিল। শিল্পী সুরের ঘোমটা ক্রমশই খুলে চলেছিলেন কেরামতের কেতাদুরস্ত ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে। সন্ধিপ্রকাশ, এই দাক্ষিণী রাগ সন্ধ্যার লগ্নে পরিবেশিত হলেও হিন্দুস্থানী নট ভৈরোঁ গোছের সুরব্যঞ্জনা একে প্রাতঃকালের একটা সরল মহিমা দেয়। সুব্রতর বাজনায় সুরের তোড়ে কিরওয়ানী যেন রবীন্দ্রসংগীতের মতই সদানন্দ হয়ে উঠেছিল। অবশ্য স্বরপ্রকরণ, তত্ত্ববাদী বিচারেও সে-কিরওয়ানী কিন্তু তার কর্ণাটকী চরিত্র থেকে নির্বাসিত নয়। সময় সময় বাঁশের কাজের মধ্য দিয়ে শিল্পী সে-কথা স্মরণ করালেন। শেষে সওয়াল-জবাব এবং ঝালায় সেতার-তবলার শেষ বক্তব্যটুকুও সোচ্চার হল।

সংগীত সমালোচক

উদয়শংকর ব্যালে সেনটারের 'সামান্য ক্ষতি'

গত ১৯শে অগাস্ট সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে উদয়শংকর ব্যালে সেনটার নিবেদিত 'সামান্য ক্ষতি এবং 'প্রকৃতি-আনন্দ' নৃত্যনাট্যের একটি সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠানরূপে উল্লেখযোগ্য। দুটি নৃত্যনাট্যই রবীন্দ্রকাব্য অনুকরণে রচিত। সামান্য ক্ষতি-র অভিনয় এর আগেও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারকার অভিনয়ে অবশ্য তার একটি অংশমাত্র উপহার দেওয়া হল।

'প্রকৃতি-আনন্দে'ও রবীন্দ্র-রচিত চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের একটি নির্বাচিত অংশ অভিনীত হল। মায়ের মায়ানৃত্য, নাগপাশমন্ত্রপাঠ এবং তার আকর্ষণে আনন্দের আগমন—এই অংশটুকু উদয়শংকরের অসাধারণ নৃত্য-পরিকল্পনায়, ব্যঞ্জনাময় আবহসংগীতে এবং সুদক্ষ উপস্থাপনায় চমৎকার এক রসরূপ অর্জন করেছিল। এই অংশে চণ্ডালিকার ভূমিকা গৌণ। মায়ের ভূমিকায় অনুপমা দাসের অভিনয়ে এবং নৃত্যে সমগ্র দৃশ্যটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। নেপথ্য-সংগীতে ('জাগে নি এখনো জাগে নি'—এই গানটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে) একটা প্রতিধ্বনির এফেক্ট পরিবেশটিকে যেন আরও বেশি ব্যঞ্জনাবহ করে তুলেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সমগ্র আবহ-সংগীত টেপ-রেকর্ড-বিধৃত হওয়ার এই ধরনের কিছু যান্ত্রিক সুবিধার সহায়তার সদ্ব্যবহার এঁরা করতে পেরেছেন যা এই ধরনের প্রযোজনার মধ্যে একটা বিশেষ মাত্রা যোজনা করতে পারে।

'সামান্য ক্ষতি'-ই সেদিনকার অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল। কিভাবে সখী-সহ মহিষীর বিলাসিতার শিকার হয়ে দরিদ্র গ্রামবাসীরা গৃহচ্যুত হয়েছিল, রাজদরবারে বর্ণিত সেই বৃত্তান্তের সূত্র অনুসরণে ফ্লাশ-ব্যাকের ভঙ্গিতে উপস্থাপিত এই কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রসংগীতাশ্রিত ব্যালের আঙ্গিকে রূপায়িত। কোনোরকম ভাষা বা গান-বর্জিত এই ধরনের অভিনয়ে কাহিনীর ব্যঞ্জনা অভিব্যক্তির নিপুণতা এবং আবহ-সংগীতের ইঙ্গিতময়তার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। রবিশংকর-কৃত আবহ-সংগীত 'সামান্য ক্ষতি'র মর্মবাণীকে অসামান্য ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছে। নৃত্য-পরিকল্পনায় উদয়শংকরের সৃষ্টির স্বাক্ষর স্পষ্ট।

নৃত্যনাট্য-দুটির পূর্ববর্তী একটি নিউ্যেটে মমতা চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত কত্থক-নৃত্যের পরিবেশনা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মমতা চট্টোপাধ্যায় এবার বার্লিন যুব উৎসবে বিশেষ পুরস্কার-সহ একাধিক মেডেল ও একটি বিশেষ সার্টিফিকেট পেয়েছেন। কমলেশ মৈত্রের তবলা-তরঙ্গের অনুষ্ঠানটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

—আনন্দবর্ধন

"পালাবার পথ নেই" (পরিচালনা : অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে অপর্ণা সেন ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

হারাধনের দশটি ছেলে

সমকালের ঘটনা নিয়ে ইদানীং বহু নাটক অভিনীত হচ্ছে। সেই সব নাট্য-কাহিনীর মধ্যে সাম্প্রতিক কালের রাজনীতির জটিল আবর্তন, বিগত দুই-তিন বছরের অশান্ত এবং উদ্বিগ্ন পরিবেশের কথাও বলবার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। 'সায়ন্তনী'র নতুন প্রযোজনা 'হারাধনের দশটি ছেলে' সেদিক থেকে অভিনব কিছু নয়, তবুও সব মিলিয়ে এই নাট্যপ্রযোজনা অভিভূত হবার মতো। প্রয়োগকলার যথাযথ ব্যবহার এবং শিল্পীদের অভিনয়—দুইয়ের চমৎকার যোগফল এই নাটক। যদিও নাট্য অঙ্গনে ত্রুটির চিহ্ন আছে, পরিমিতিবোধের কিছু অভাবও অপ্রত্যক্ষ নয়, তবুও এই নাটক মন টানে, দর্শকদের ভাবায়।

প্রয়োজনার ঢঙটিতে ব্রেখট রীতি অনুসৃত। মঞ্চের ওপর পাত্রপাত্রীরা মিলিত হচ্ছেন এবং সূত্রধারের নির্দেশমতো যে যার ভূমিকা নির্বাচন করে অভিনয় আরম্ভ করে দিচ্ছেন। নাটক গড়ে উঠছে আবার তারই মাঝে ছেদ টেনে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন সূত্রধার। একই শিল্পী মঞ্চে একাধিক চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর, শারীরিক ভঙ্গি ইত্যাদি বদল করে। ছোট ছোট ঘটনাবলীকে ঘটিয়ে নিয়ে গড়ে এই নাটক আসলে বলতে চায়, জনতা বিভ্রান্ত, অসহায়। দলের নেতারা থেকে আরম্ভ করে উঁচুতলার সবাই জনতাকে শোষণ করে চলেছে। একের পর এক হারাধনের ছেলেরা জীবন দেয় অথচ একসঙ্গে রুখে দাঁড়ায় না।

এ কথাগুলো বলবার জন্যে এখানে একাধিক ঘটনার সন্নিবেশ। সব ঘটনাগুলিই সমান যুক্তিগ্রাহ্য নয়, কোথাও কোথাও শস্তা নাটকীয়তা সৃষ্টির লোভ সামলাতে পারলে এই প্রযোজনা আরো মর্যাদা পেতো। মেয়ে দেখতে আসার দৃশ্যে পাত্রের বাবার হাবভাব প্রায় ভাঁড়ের মতো। নাটকে শুভদীপ নামক যুবকের প্রেমের পর্বটি খুবই দুর্বল অংশ। ওখানে গানের আয়োজনও যেন মাত্রাতিরিক্ত। প্রশংসার বিষয়ও নাটকে একাধিক। মঞ্চে, একই সঙ্গে ডাবল অ্যাকটিং, কিংবা একটি ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক স্টেজে তারই অভিনয় ভালো লেগেছে। 'পিয়ালী' পর্বে পিয়ালী ডাকের সঙ্গে সঙ্গে একটি একক কণ্ঠের গানের সুর উচ্চকিত হয়ে ওঠার মুহূর্তটি মনে রাখবার মতো। নাটকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, এঁদের স্পষ্টবাদিতা। বক্তব্য উপস্থাপনে এই দল যা নিন্দনীয় বলে মনে করেছেন তাকে সরাসরি সনাক্ত করে দিতে এঁদের দ্বিধা নেই।

অভিনয় আকর্ষক। থিয়েটার সেণ্টারের ছোট্ট মঞ্চে এই নাটকের অনেকগুলি চরিত্র এক সঙ্গে বেশ সচ্ছন্দে অভিনয় করছেন। অভিনয়ে ছিলেন মিহির চট্টোপাধ্যায়, অসিত চৌধুরী, সোমনাথ চক্রবর্তী, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, কল্যাণ বসু, সুশান্ত কর ও আরতি চট্টোপাধ্যায়। নাট্যরচনা রাধারমণ ঘোষের। নির্দেশনায় মিহির চট্টোপাধ্যায়। আলো এবং আবহসংগীত নাটকে তাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে।

নাট্য সমালোচক

ভারত-পাক চুক্তি এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২৮ আগস্ট নয়াদিল্লিতে উভয়-পক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ভারত-পাক চুক্তির ভিত্তি হলো গত বছর জুলাইয়ের সিমলা চুক্তি। এই নতুন চুক্তির পিছনে বাংলাদেশের পূর্ণ সম্মতি আছে। এই চুক্তির ফলে পাক যুদ্ধবন্দীদের, পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালী-দের এবং বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তানীদের যে-সব সমস্যা ছিল, সেগুলি মীমাংসার ব্যাপারে মতৈক্য হল। ২৯ আগস্ট ভারত-পাক চুক্তিটি সংসদে পেশ করা হয়েছে। চুক্তিটি ত্রিমুখী প্রত্যর্পণের। একই সঙ্গে ভারত বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান আটক ব্যক্তিদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। বাদ থাকবে শুধু ১৯৫ জন পাক যুদ্ধাপরাধী। ওরা ভারতেই থাকবে। ভারত থেকে পাকিস্তানে যাবে প্রায় ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দী, বাংলাদেশ থেকে বিহারীরা (যারা যেতে ইচ্ছুক) পাকিস্তানে, পাকিস্তান থেকে "সব বাঙ্গালী" বাংলাদেশে। নিজ নিজ এলাকায় পরিবহণ ব্যবস্থা করবে সংশ্লিষ্ট দেশ। তদারকী করবে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সুইস সরকার। চুক্তির মূল বিষয়ঃ- (১) বেশ কিছুসংখ্যক (২ লাখ ৬০ হাজার) বিহারী পাকিস্তানে যেতে চেয়েছেন। (২) বাংলাদেশ যে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিচার করতে চান, তাঁরা ভারতের হাতেই থাকবে। (৩) এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভারত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আলোচনায় বসবে। (৪) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রত্যর্পণের কাজ শুরু করতে হবে। ১৯ মাস হলো তিন দেশে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ আটক পড়ে আছেন।

দেশী সংবাদ

২৭ আগস্ট—আজ রাজ্য বিধান সভায় জরুরি বিষয়ের উত্থাপনকালে দু'জন কংগ্রেস সদস্য আসানসোল কয়লা খনি এলাকার অব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য রাজ্যে কয়লা পাচার ও অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি, শ্রমিকদের দুরবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কলকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন খিদিরপুর মাতৃসদন নামক হাসপাতাল, আসলে এটি একটি নার্সিং হোম। এখানে ডাক্তারদের প্রাইভেট কেসগুলি ভর্তির অগ্রাধিকার পায়। রোগীকে বেড পেতে হলে ডাক্তারকে মোটামুটি টাকা দিতে হবে। ছোট-খাট অস্ত্রোপচারের জন্য অতিরিক্ত দক্ষিণা।

২৮ আগস্ট—[illegible] চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতি, রাজ্যপাল অথবা কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] নির্দেশ দিয়েছেন। [illegible] ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই নিয়ম চালু হয়।

সেই প্রায় সাতাশ লক্ষ মণ ডাল ও সর্ষের কি হল? [illegible] কলকাতার আশপাশে [illegible] আটক করেছিল। সেই ডাল ও সর্ষে নিয়ে এখন খাদ্য দপ্তরে ও [illegible] ফাইলের পর ফাইল জমছে। কিন্তু সেই ডাল ও সর্ষেটা গেল কোথায়?

২৯ আগস্ট—ভারত-পাক বৈঠকে আগত পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের কয়েকজন সদস্য গতকাল নয়াদিল্লির বাজারে গিয়ে কয়েকশো টাকার পান সুপারি কেনেন। একজন সদস্য বলেন পাকিস্তানে এখন একটি পান আট আনা থেকে এক টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেস দলের তরুণ সদস্যরা রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ ও তাঁর মন্ত্রকের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান এবং চরম বাদানুবাদ অভিযোগ তোলেন। এই সদস্যরা এব্যাপারে আলোচনার জন্য বর্তমান অধিবেশনে আলাদা দিন ধার্যের দাবিও তোলেন। শেষ পর্যন্ত তা স্বীকৃত হয়।

৩০ আগস্ট—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় একের পর এক কংগ্রেস সদস্য এই রাজ্যে [illegible] অভিযোগ করেন যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে এবং শিল্প পুনরুজ্জীবনের নীতি ব্যাহত হচ্ছে। প্রথম ক্ষেত্রে প্রধানত পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পপতি ও কিছু সরকারী অফিসার দায়ী বলে তাঁরা অভিযোগ করেন।

চিনি ব্যবসায়ীদের কারসাজির ফলে [illegible] প্রায় ৩০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে [illegible]। [illegible] এর কাছে [illegible] হয়ে যায়।

৩১ আগস্ট—এ বছর সবচেয়ে বেশী কলেরা রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। [illegible] অনুসন্ধানের ফলে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। তালিকায় এর পরেই স্থান হলো [illegible] ও [illegible]।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরের পর জরুরী বিষয়ের আলোচনাকালে কংগ্রেস পক্ষে একাধিক সদস্য খাদ্যাভাবজনিত গ্রাম বাংলার অনাহারে মৃত্যু ও [illegible] এক মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেন। এ সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রীর জবাবে [illegible]। সভাকক্ষে এ নিয়ে উত্তেজনার ঝড় বয়ে যায়।

১ সেপটেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ কংগ্রেস কর্মীদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, যাঁরা প্রকাশ্যে দলবিরোধী কার্য-কলাপে লিপ্ত হবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সমাজকে আধুনিক করা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার এজন্য একটা নির্দিষ্ট পথ নিয়েছেন।

২ সেপটেম্বর—বেলেঘাটা এলাকার ৩৫নং ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীদেবেন সেনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আজ সকালে নীলরতন সরকার হাসপাতালে সমবেত এক বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত জনতা হাসপাতালের এমারজেন্সি ব্লকের তিনটি ঘর সম্পূর্ণ তছনছ করে ফেলে। দরজা-জানালার কাচ ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়। এমারজেন্সি সংলগ্ন দুটি ঘরের টেলি-ফোনের তার ছিঁড়ে তা ভেঙে দেওয়া হয়।

বিদেশী সংবাদ

২৭ আগস্ট—মৌলানা ভাসানীর প্রস্তাবিত সাধারণ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে নতুন করে উত্তেজনা লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রধান তিনটি দল—আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মু) এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি এক সঙ্গে আগামীকাল ধর্মঘটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২৮ আগস্ট—আজ প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে মধ্য মেক্সিকোয় দু'শ জনেরও বেশী লোক মারা গিয়েছেন। সাম্প্রতিককালের মধ্যে এই ধরনের প্রচণ্ড ভূমিকম্প ওদেশে আর হয়নি। দু' হাজারের মত লোক আহত হয়েছেন। পাঁচটি শহর প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২৯ আগস্ট—আজ বাংলাদেশ জাতীয় আওয়ামী পার্টির নেতা মৌলানা ভাসানির দেশব্যাপী হরতালের ডাক জনসাধারণের সাড়া জাগাতে পারেনি। রাজধানী শহর ঢাকা, বন্দর-শহর চট্টগ্রাম এবং বাংলা দেশের অন্যান্য জায়গায় এই হরতালে জনসাধারণের সাড়া মেলেনি।

৩০ আগস্ট—নোবেল ইনস্টিটিউট-এর ডিরেক্টর অগাস্ট শাউ আজ বলেছেন, এই বছরের শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার-এর জন্য ৪৭ জনের নাম বিবেচনার জন্য পাওয়া গেছে। বিবেচনার জন্য গৃহীত নাম প্রকাশ করা হয় না। তবে সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট নিকসন এবং টিটোর নামও তালিকায় রয়েছে।

৩১ আগস্ট—মুন্না ওরফে ইসমাইলকে আজ একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ড দেন। পাক দখলদার বাহিনীর সহযোগী হিসাবে সে বহু মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় এবং তাদের সর্বনাশ করে। লোকটি রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার ছিল। পাক বাহিনীর জন্য মেয়ে সরবরাহের দায়িত্ব ছিল তার উপর।

১ সেপটেম্বর—বেসরকারী শিক্ষকদের একাংশের ধর্মঘট সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার আজ বিদ্যালয়গুলির চত্বরে কারফু জারি করে সারা দেশে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা গ্রহণ করেন। হালকা মেশিন গান ও অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে পুলিশ ও আধা সামরিক জাতীয় রক্ষীরা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি পাহারা দেন।

২ সেপটেম্বর—মসকোয় লেনিনের স্মৃতি সৌধের ওপর বোমার আক্রমণে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। খবরটি দিয়েছেন পশ্চিম জারমানির একটি সংবাদপত্রের মসকোর সংবাদ-দাতা। স্মৃতি সৌধটির কোন ক্ষতি হয়নি।

এটাই হোল আপনার ব্লেড

এন্সর

সোর্ডশার্প
স্টেনলেস স্টীল

চমৎকার মসৃণভাবে কামানোর বিলাসিতার জন্যে। রেজরে ব্লেড লাগিয়ে গালের ওপর হালকাভাবে বুলিয়ে যান···তাহলেই বুঝবেন কত তফাৎ!

এন্সর সোর্ডশার্প আপনি আগে কখনও দেখেননি। তা তো হবেই···এ যে একেবারে নতুন ব্লেড।

সব ব্লেডই দেখতে একরকম ... **কিন্তু এন্সর ক্ষুরধার!**

পরিবেশক : ভিস্‌কন সেলস্ প্রাঃ লিঃ
বোম্বাই : ৫০৯. প্রসাদ চেম্বার্স, ৫ম মহলা, অপেরা হাউস বোম্বাই ৪০০ ০০৪
কলিকাতা : ২৪, ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৬
দিল্লী : ২৪, হাউসিং সোসাইটি, এন. ডি. এস-ই. পার্ট-১ নতুন দিল্লী-১১০০৪৯
মাদ্রাজ : ৭, বিশপ্ ওয়ালার্স এভিনিউ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ – ৬০০০০৪

E. 2810-R.BEN.

হাসি নয় তো,

যেন মুক্তোর ঝিলিক

হ্যাঁ, আপনার হাসিতে সব সময়েই একটি শুভ্র—সুন্দর আভা মুক্তোর মত ঝলমলিয়ে উঠবে। রোজ পেপ্‌সোডেন্ট দিয়ে দাঁত মেজে দেখুন, কত সহজে আপনি এধরনের হাসি ছড়াতে পারেন। পেপ্‌সোডেন্ট বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী—অপূর্ব এর স্বাদ, এবং দাঁতকে আরও বেশী সাদা ও সুন্দর করে পেপ্‌সোডেন্ট।

Pepsodent

পেপ্‌সোডেন্ট

ঝকমকে দাঁতের জন্য

হিন্দুস্থান লিভার-এর তৈরী একটি সেরা টুথপেস্ট

5070

মাত্র ১ পয়সায় ১টি শাড়ী বা ৩টি শার্ট ধবধবে সাদা করার জন্যে

ম্যাক্সিম*

সব রকম কাপড়ের পক্ষেই নিরাপদ হোয়াইটনার

কত লাভদায়ক!

যে কোনও কাপড় আবার নতুনের মত সাদা করতে গড়পড়তায় ১ ফোঁটা ম্যাক্সিমই যথেষ্ট। আর জেনে রাখুন যে, প্রতি বোতলে প্রায় ১২০০ ফোঁটা ম্যাক্সিম থাকে। এ থেকেই বোঝা যায় যে ম্যাক্সিমই সবচেয়ে লাভদায়ক ঘনীভূত নীল তরল হোয়াইটনার। তা ছাড়া এই প্লাস্টিক বোতলের মুখে 'ড্রপার' লাগানো থাকে বলে, আপনার ঠিক যত ফোঁটার প্রয়োজন ততটাই ম্যাক্সিম ঢালতে পারবেন। কোনও অপচয় নেই, আর কাপড়ও বেশী নীল হয় না।
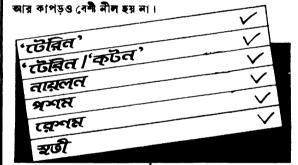
সবরকম কাপড়ের পক্ষেই উপযোগী

সবরকম কাপড়েই আপনি নিশ্চিন্তে ম্যাক্সিম ব্যবহার করতে পারেন। 'টেরিন', 'টেরিন'/'কটন' নায়লন, পশম এবং রেশম বা সুতী সব কাপড়কেই ম্যাক্সিম এত সাদা বানিয়ে দেয় যে নতুনের মত দেখায়। তাছাড়া, সবচেয়ে সুবিধা হ'ল যে ম্যাক্সিম ব্যবহারে কাপড়ে কোনও ছোপ ধরে না।

অতি সহজ ব্যবহার বিধি

ম্যাক্সিম ব্যবহার করা খুবই সহজ প্রথমে সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড়গুলি খুব ভাল করে ধুয়ে নিন। তারপর এক বালতি (৫ লিটার) পরিষ্কার জলে ১০।১৫ ফোঁটা ম্যাক্সিম মেশান। (সাদা কাপড় বেশী ময়লা হলে বা ধবধবে না থাকলে ম্যাক্সিম কয়েক ফোঁটা বেশী মেশাবেন)। সেইজলে কাপড়গুলি ১০/১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। তারপর, না নিংড়িয়ে ঐ জল থেকে উঠিয়ে কাপড়গুলি টাঙ্গিয়ে শুখোতে দিন।
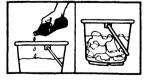
ম্যাক্সিম ব্যবহারে প্রতিটি পয়সার খরচ সার্থক হয়।

GMM-23.BEG

*Regd. T.M. Geoffrey Manners & Co., Ltd.

Cover Printed by Anand Offset ... ate Ltd.—Calcutta - 54.

বর্ষ] শনিবার, ১০ কার্তিক, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 27th October, 1973 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা ৫১

এটাই হোল আপনার ব্লেড

এন্সর

সোর্ডশার্প
স্টেনলেস স্টীল

চমৎকার মসৃণভাবে কামানোর বিলাসিতার জন্যে। রেজরে ব্লেড লাগিয়ে গালের ওপর হালকাভাবে বুলিয়ে যান···তাহলেই বুঝবেন কত তফাৎ!

এন্সর সোর্ডশার্প আপনি আগে কখনও দেখেননি। তা তো হবেই···এ যে একেবারে নতুন ব্লেড।

সব ব্লেডই দেখতে একরকম ...

কিন্তু এন্সর ক্ষুরধার!

পরিবেশক : ডিসকন সেলস্ প্রাঃ লিঃ
বোম্বাই : ৫০৯, প্রসাদ চেম্বার্স, ৫ম মহলা, অপেরা হাউস বোম্বাই ৪০০ ০০৪
কলিকাতা : ২৪, ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৬
দিল্লী : ২৪, হাউসিং সোসাইটি, এন. ডি. এস-ই. পার্ট-১ নতুন দিল্লী-১১০০৪৯
মাদ্রাজ : ৭, বিশপ্ ওয়ার্লাস এভিনিউ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ - ৬০০০০৪

E. 2610-R.BEN.
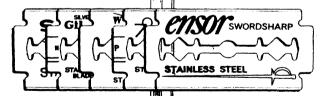
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ রচনা

ভৃগুজাতকের

এ বছরের ভবিষ্যৎ গণনা

১৯৭৪ কেমন যাবে

ও

ভৃগুজাতক পঞ্জিকা

অন্য অন্য বছরের মতো এবারও **ব্যক্তিগত রাশিফল, লগ্নফল, ইংরেজী জন্মতারিখ অনুসারে ভাগ্য নির্ণয়, রাষ্ট্রগত বর্ষফল** ও অন্যান্য যাবতীয় জ্যোতিষ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তো আছেই, এ ছাড়া অতিরিক্ত হিসেবে এবারে এই বইটিতে **বিবাহ যোটক মিল** সম্বন্ধে জ্যোতিষিক তথ্য সম্বলিত হয়েছে। নিজের **পারিবারিক জীবন ও কর্মজীবন কেমন যাবে?** কোন্ কাজে হাত দেওয়া ভাল হবে? কোথায় কখন ঝুঁকি নেবেন? **কখন কোথায় সাবধান হবেন?** —এসব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ভৃগুজাতকের এই বইটিতে। বইটির অতিরিক্ত আকর্ষণ ১৯৭৪ সালের সারা বছরের পঞ্জিকা—শুভদিনের নির্ঘণ্ট সমেত পুরো একটি বছরের ছুটির তালিকা।

॥ দাম মাত্র দুই টাকা ॥

বিমল মিত্র

এ যাবৎ সাহিত্যক্ষেত্রে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা-ই অসামান্য হয়ে উঠেছে—উদাহরণস্বরূপ তাঁর বহুবিখ্যাত বইয়ের মধ্যে আমাদের প্রকাশিত "কড়ি দিয়ে কিনলাম" এবং "একক দশক শতক" উল্লেখযোগ্য। তাঁর বর্তমান অতিপ্রশংসিত উপন্যাস

আসামী হাজির

মাত্র সাড়ে চার মাসে দুটি মুদ্রণ নিঃশেষিত হয়ে আর একবার প্রমাণ করল যে সাহিত্য সম্রাটের অভিধা একমাত্র বিমল মিত্রকে দেওয়া যায়।

দাম মাত্র ত্রিশ টাকা দুটি খণ্ডে সমাপ্ত

যাযাবরের অসামান্য উপন্যাস **হ্রস্ব ও দীর্ঘ ৫**

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাড়া জাগানো উপন্যাস **শত রূপে দেখা ১৪**

প্রেমেন্দ্র মিত্রের **হার মানলেন পরাশর বর্মা ৪॥**

জরাসন্ধের **শ্রেষ্ঠ গল্প ৬॥**

প্রফুল্ল রায়ের **পূর্ব পার্বতী ১১**

জ্যোতির্ময়ী দেবীর **সোনা রূপা নয় ১৫**

প্রমথনাথ বিশীর **বঙ্কিম সরণী ১০**

রাধাকৃষ্ণণের **শ্রীমদভাগবদ্‌গীতা ১০**

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ৬**

নকুল চট্টোপাধ্যায়ের **তিন শতকের কলকাতা ৭**

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের **নূপুরের মতো ৮**

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের **গগনেন্দ্রনাথ ৬.৫০**

আশাপূর্ণা দেবীর **উড়োপাখি ৬**

দক্ষিণারঞ্জন বসুর **প্লাবন ৬॥**

বিমল করের **সেতু ৪**

নীহাররঞ্জন গুপ্তের **অশান্তঘূর্ণি ৮ কোমলগান্ধার ৮**

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ ৩৪-৮৭৯১; ৩৪-৩৪৯২

চিনাবাদাম দিয়ে তৈরী
অসাধারণ মিষ্টি।

বাদাম্ মিঠাই

'স্যাপী' চিনাবাদাম দিয়ে তৈরী মুখরোচক,
মুচমুচে, পুষ্টিদায়ক প্রাকৃতিক প্রোটিনে ভরা মিষ্টি।
"স্যাপীর" মধ্যে আসে স্নেহপদার্থ,
খনিজপদার্থ, ভিটামিন এ, বি, বি ২।
২০, ৫০, ১০০ এবং ২০০ গ্রামের প্যাকেটে পাওয়া যায়।

ডালমিয়া উদ্যোগের একটি চমৎকার অবদান

সূচীপত্র

আ মা র শৈ শ ব

জন্ম থেকে শৈশব পর্যন্ত
শিশুটির প্রতিটি উল্লেখ্য
ঘটনার নাম ও ছবি রাখার
বাঙলায় একমাত্র বই।

● জন্মদিনে ও অন্নপ্রাশনে উপহারে অনন্য ● যে-বই উপহার দিয়ে খুশি হবেন ● যে-বই শিশুটির সঙ্গী থাকবে সারা জীবন।

আমার শৈশব
শিশুদের মনে জাগাবে
সুন্দর জীবন
গড়ার কল্পনা!

বহুবর্ণের বহু ছবি: ছাপা বাঁধাই ও পরিসাজে অদ্বিতীয়

মূল্য ঃ পনের টাকা
শোভন ঃ পঁচিশ টাকা
[উপহারের যোগ্য সুদৃশ্য বাক্স সমেত]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা ৯

(সি ১১৩০৭)

সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ ও সমালোচনা গ্রন্থ

বাংলা সমালোচনা পরিচয় ১২·৫০
ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে ১২·৫০
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ ৬·০০
ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ১৬·৫০
ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ধ্বন্যালোক ৪·০০
[ধ্বন্যালোক বাংলা অনুবাদ]
ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও
অধ্যাপক কালীপদ ভট্টাচার্য

কাব্য-শ্রী ৫·০০
ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

কাব্যালোক ১৫·০০
ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র
দ্বিতীয় সংস্করণ ১২·৫০
ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

দীনবন্ধু মিত্র ৩·০০
ডঃ সুশীলকুমার দে

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২

এস্ট্রেলা-শক্তি

আপনার ট্রানজিস্টার আর টর্চে এস্ট্রেলা-শক্তির বাহাদুরী দেখুন!

এস্ট্রেলা ব্যাটারির শক্তি: যেন 'বিন্দুতে সিন্ধু' এস্ট্রেলা ব্যাটারিজ লিঃ, বম্বে ৪০০ ০১৯

CMEB-2-234 BEN

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

নারায়ণ সান্যালের নতুন উপন্যাস

গজমুক্তা ১০.০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

বিশ্বাসের বাইরে ৫.০০

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রাই শোন আজ ৬.০০

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

মুক্তিস্নান ৬.০০

শ্রীহংস-এর উপন্যাস

গাইনিক ওয়ার্ড ৮.০০

শঙ্কু মহারাজ-এর ভ্রমণকথা

মথুরা-বৃন্দাবনে ১ম পর্ব ১০.০০ ২য় পর্ব ১০.০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

আধুনিক ৬.০০

দীপক চৌধুরীর উপন্যাস

কুমারী কন্যা ৮.০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস

রাণী কাহিনী ৭.০০

শ্রীপান্থ-এর

আজব নগরী ৫.০০

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস

অন্বেষণ ৫.০০

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

দুই নায়িকা ৫.০০

সুবোধ ঘোষের উপন্যাস

বন্ধু গোলাপ ৬.০০

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

নিঃসঙ্গ পদাতিক ৮.০০

প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রের নতুন গ্রন্থ

রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি ২০৲

[illegible]

নিখিলচন্দ্র সরকারের নতুন উপন্যাস

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০·০০

নিগূঢ়ানন্দের অনন্যসাধারণ উপন্যাস

হৃদয়ে নাবিক ৮·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণীয় সৃষ্টি

আর এক সাজে ৬·০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী : ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোন ৩৪-৮৩৫৬

সিঙ্গার

সকল সময়েই ভাল জিনিষ দেয়

সিঙ্গার* অয়েল
মাল্টি-প্রটেকটিভ

আপনি **সিঙ্গার**-এর ওপর নির্ভর করতে পারেন — কারণ সেলাই কলের ব্যাপারে এই কোম্পানীর রয়েছে ১০০ বছরেরও বেশী অভিজ্ঞতা। **সিঙ্গার** কোম্পানী আন্তর্জাতিক মানের জিনিষপত্র যুগিয়ে আসছে। মেরিট* সেলাইয়ের কল, **সিঙ্গার** অল পারপাস অয়েল, **সিঙ্গার** ছুঁচ। তাই ভারতে এবং বিদেশে গৃহিনীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেলাইয়ের আনন্দের জন্য যে **সিঙ্গার** ই পছন্দ করেন— এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

সিঙ্গার সকল সময়েই ভাল জিনিষ দেয়

*সিঙ্গার কোম্পানীর এক ট্রেডমার্ক

maa.SSM.2630.BEN.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

অত্যন্ত উৎসাহের প্রকাশনা। প্রতিটি বই ডি-লাক্স এডিশন

বঙ্কিম

রচনাবলী। এক খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস। মূল্য ১৪, । ৫, দিয়ে গ্রাহক হোন।

কোরান শরীফ

বিশ্বাসযোগ্যতনে কোরানের বঙ্গানুবাদ। মূল্য ১০, । ৫, দিয়ে গ্রাহক হোন।

বিষাদ-সিন্ধু

এক খণ্ডে বিষাদ সিন্ধু ও জমিদারদর্পণ। মূল্য ৭, । ৩, দিয়ে গ্রাহক হোন।

মধুসূদন রামমোহন

রচনাবলী। কাগজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য ৮ই অক্টোবর থেকে মধুসূদন রচনাবলী ১৫, রামমোহন রচনাবলী ১৫, দীনবন্ধু রচনাবলী ১০ ও দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ২৫ ধার্য করা হয়েছে। প্রতি রচনাবলীর জন্য ৫, দিয়ে গ্রাহক হোন।

যাঁরা অর্ডার করতে কোন রচনাবলীর জন্য টাকা পাঠাচ্ছেন তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করবেন।

হরফ প্রকাশনী। এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২

(সি ১১৭৮৩)

ভা'য়ের কপালে দিলাম ফোঁটা। যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।

এবারের ভাই-ফোঁটাকে মধুর করে তুলতে ছয় থেকে ষাট যে কোনও বয়সে উপহার দিন

বাড়ি থেকে পালিয়ে

শিবরাম চক্রবর্তী ৩·৫০

নাকুগামা

লীলা মজুমদার ৩·৫০

শিশু সাহিত্যের বরণীয় লেখকদের রচনাবলী একে একে বের হচ্ছে :

উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী

২ খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ২৭·৫০ গ্রাহক চাঁদা ৭·৫০ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রথম খণ্ড সংগ্রহ করুন।

লুইস ক্যারল সমগ্র রচনাবলী

৩ খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ২৯ গ্রাহক চাঁদা ৫

অনুবাদ : জয়ন্ত চৌধুরী

হ্যান্স অ্যান্ডারসন সমগ্র রচনাবলী

২ খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ২০ গ্রাহক চাঁদা ৫

অনুবাদ : লীলা মজুমদার

গ্রিমদের সমগ্র রচনাবলী

২ খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ২৫ গ্রাহক চাঁদা ৫

হেমেন্দ্রকুমার রায় সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ১০ গ্রাহক চাঁদা ৫

এডওয়ার্ড লিয়ার রচনাবলী

গ্রাহক চাঁদা ৭ এককালীন ২ দিয়ে

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

এ/১৩২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলকাতা-১২

(সি-১১২৩১/২)

আনন্দ বাগচীর

ছোটদের রহস্য-উপন্যাস

বনের খাঁচায়

দাম ৫·০০

দিনের আলোয় আলিপুরের চিড়িয়াখানায় তোমরা অনেকেই গিয়েছ, সাজানো খাঁচার ভেতর পোরা জন্তু জানোয়ার দেখে মজা পেয়েছ। লেক হ্রদের ধারে যাযাবর পাখিদের মেলা তোমাদের চোখ-মন ভরে দিয়েছে; কিন্তু রাত্রির গভীরে—যখন ঝাউ-ঝোপ ঝোপঝাড়ের আড়াল আর আকাশছোঁয়া বিশাল বিশাল গাছগুলোর মাথা থেকে ঝুপ ঝুপ করে তাল তাল অন্ধকার লাফিয়ে পড়ে

প্রকাশিত হল

নিশব্দ কালোয় ভরে দেয় এই কৃত্রিম অরণ্য; এবং থেকে থেকে উদ্‌বেড়াল-শাবকের আঁতুড়ে কান্না, হায়েনার অট্টহাস, পশুরাজের গম্ভীর গর্জন আর নানারকমের রাতপাখির তীক্ষ্ণ চিৎকারে এই প্রাণ-উদ্যান পরিণত হয় দক্ষিণ আমেরিকা অথবা আফ্রিকার কোনও নিবিড় হিংস্র জঙ্গলের এক মিনি সংস্করণে, তখন—সেই গা-ছমছমে ভয়-ধরানো মুহূর্তে কখনও কি তোমরা কেউ দেখেছ চিড়িয়াখানার রূপ? সুলেখক আনন্দ বাগচী 'বনের খাঁচায়' চিড়িয়াখানার সেই অজানা অচেনা ভয়ংকর রূপটিই শুধু তোমাদের সামনে তুলে ধরেননি তার সঙ্গে সেই ভয়াবহ পরিবেশের পটভূমিতে একটি রোমহর্ষক রহস্যকাহিনীও বুনেছেন—যার নায়ক এক কিশোর গোয়েন্দা মিঃ পাপে এবং তার সহকারী এক কিশোরী দুঃসাহসিকা মিস মিঠু।

শান্তিদেব ঘোষের
রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা
রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনা ॥ দাম ১২·০০

অভীককুমার সরকার সম্পাদিত
বাংলা নামে দেশ
বাংলাদেশের জন্মকাহিনী ॥ দাম ১০·০০

অমল দত্তের
ফুটবল খেলতে হলে
ফুটবল কোচিং-এর বই ॥ দাম ১০·০০

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দেখা হয় নাই
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতীর্থ ॥ দাম ২০·০০

আনন্দবাজার পত্রিকা স্মারকগ্রন্থ
আনন্দসঙ্গী
অর্ধশতাব্দী সংকলন ॥ দাম ২৫·০০

বরুণ সেনগুপ্তের
বিপাক-ই-স্তান
রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ॥ দাম ৬·০০

বরুণ সেনগুপ্তের
পালাবদলের পালা
যুক্তফ্রন্টের ইতিহাস ॥ দাম ১২·০০

বিশ্বকর্মা-র
লক্ষ্মীর কৃপালাভে বাঙালীর সাধনা
বাবসায়ীদের নির্দেশগ্রন্থ ॥ ২৫·০০

ইন্দ্রমিত্র-র
করুণাসাগর বিদ্যাসাগর
জীবনচরিত ॥ দাম ৫০·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের
প্রবন্ধ সংগ্রহ
প্রবন্ধ-সংকলন ॥ দাম ৫·০০

আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন
কাশ্মীর '৬৫
কাশ্মীর সংঘর্ষের ইতিকথা ॥ দাম ১০·০০

সুধীর ঘোষের
গান্ধীজীর দূত
স্মৃতিকথা ॥ দাম ১৯·০০

শংকরীপ্রসাদ বসুর
নিবেদিতা লোকমাতা
নিবেদিতা ॥ ১ম খণ্ড ॥ দাম ৩০·০০

অমরেন্দ্রনাথ রায়ের
Students Fight For Freedom
ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ॥ দাম ৬·০০
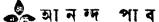
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের
বিবেকানন্দ চরিত
জীবনচরিত ॥ দাম ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪ ৪৩৬২ ॥ বিক্রয়কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিঃ ৯

৪০ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫১
শনিবার ১০ কার্তিক ১৩৮০
Saturday 27 October 1973

নিকট পর্যটন :

পুজোর ছুটিতে বাইরে যাওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। বেরোনোটাও এক দুর্দৈব। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তিন-চার মাস আগে রেলওয়ে টিকিট যোগাড় করা এবং তারপর নির্দিষ্ট দিনে তিন-চার ঘণ্টা হাতে সময় নিয়ে হাওড়া বা শিয়ালদা স্টেশনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া—দেশভ্রমণের এই গোড়ার পর্বটি মোটেই সুখকর নয়। তবু কোনরকমে বেরিয়ে পড়ার মধ্যেই একটা সুখ বা উত্তেজনা আছে। এবার বোধ হয় কলকাতা থেকে পালিয়ে বাঁচাটাই ছিল অনেকের প্রধান লক্ষ্য।

বাঙালী ঘরকুনো এ কথা বলার উপায় নেই। ঘর হতে শুধু দু পা ফেলে একটি ঘাসের শীষের উপর একটি শিশিরবিন্দুতে সব সময় তার মন ওঠে না। এবার পুজোয় অবশ্য ঘর হতে বেরিয়ে শরতের শিশিরবিন্দুর বদলে শুধু জঞ্জাল ও খানা-খন্দ দেখাই সম্ভব ছিল। শহরে ঘুরে বেড়াবার দুরাশাও অনেককেই ছাড়তে হয়েছে। বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে যদিও বা একটি বাসের দেখা মিলল তার পাদানিতে পা রাখে সাধ্য কার। ট্যাক্সি পাওয়া বহু ভাগ্যের ব্যাপার। উদ্ধত ট্যাক্সিওয়ালা কারো কাতর আহ্বানে কর্ণপাতও করে না। এই দুর্ভোগ শুধু পুজোর সময়ই নয়, আগে এবং পরেও। সকালে-বিকালে অফিস-টাইমে বেশির ভাগ ট্যাক্সি মিটারে চলে, দুপুরে ট্যাক্সি-ড্রাইভারের আহারের সময়, রাত দশটার আগেই গাড়ি গ্যারাজ করার তাড়া। অতএব ট্যাক্সি থাকা না-থাকা সমান।

এই কৃচ্ছ্রসাধনের হাত থেকে অন্তত কিছু দিনের জন্য মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছায় বুঝি এবার পুজোয় বাইরে যাওয়ার আগ্রহ আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল। শ্রীনগর থেকে প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়, এবার পুজোয় কাশ্মীরে যে বহুসংখ্যক পর্যটকের সমাবেশ ঘটেছে তার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী বাঙালী। এই হিসাবে অবশ্য বিদেশীদের ধরা হয়নি। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের আকর্ষণ এড়ানো কঠিন। দেশভ্রমণের ইচ্ছা বা সৌন্দর্যপিপাসা বাঙালীকে সুদূর কাশ্মীরে বা দেশের অন্য রাজ্যেও টেনে নিয়ে যেতে পারে। এটা সুস্থ অভিরুচিরই লক্ষণ। তবে বাঙালীর হাতের মুদ্রা যে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে এটাও লক্ষ করার মতো। কাশ্মীর বা অন্য কোন রমণীয় স্থানের জন্য পর্যটকের আকর্ষণ বরাবরই থাকবে। পশ্চিম বাংলার ভিতরেও পর্যটকের জন্য নানাবিধ সৌন্দর্যের আকর্ষণ বাড়াবার ব্যাপক ব্যবস্থা করা যায়। নির্দিষ্ট একটি সৌন্দর্যস্থলে যাঁরা যাবেনই তাঁদের কথা আলাদা কিন্তু কোন নিকট জায়গায় রম্য ও তৃপ্তিকর জায়গায় দেখতে পান না বলেই অনেকে দূর রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হন। একথাও ঠিক, পর্যটনের জন্য যত খুশি টাকা খরচ করার ক্ষমতা অনেকের নেই। দূরে বেড়াতে যাওয়ার ব্যয় বহন করাও অনেকের পক্ষে কষ্টসাধ্য। তাঁদের জন্য অন্তত পশ্চিমবাংলার সীমার মধ্যে বহু সুন্দর জায়গাকে পর্যটনের জন্য আকর্ষক করে তোলার সুযোগ আরও আছে।

পশ্চিমবঙ্গে সৌন্দর্য ছড়িয়ে রাখতে প্রকৃতিদেবী কোনই কার্পণ্য করেননি। এখনও কোন সমুদ্রতট বা অরণ্য-পরিবেশকে চিত্তাকর্ষক টুরিসট স্পট হিসাবে গড়ে তোলা যায়। পর্যটককে আকৃষ্ট করার মতো নৈসর্গিক সৌন্দর্য নানা স্থানেই দেখতে পাওয়া যায়। পর্যটকের অবসর বিনোদনের জন্য ওই সব স্থানে সুন্দর নিবাস তৈরি করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে টুরিজম বিভাগের একটি মস্ত দায়িত্ব রয়েছে। পশ্চিম বাংলার ভিতরেই স্বল্প বাজেটের পর্যটনের জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে এজন্য সুষ্ঠু কর্মসূচীর প্রয়োজন।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম : ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮৩
৫৩-৮৫৪৯

চাঁদার হার
ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৬·০০
ষান্মাসিক — টাঃ ১৮·৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯·৫০

আসামে ও ত্রিপুরায়
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৪৪·০০
ষান্মাসিক — টাঃ ২২·৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১·৫০

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৮৭·০০
ষান্মাসিক — টাঃ ৪৪·০০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ২২·০০
বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৬০·০০
ষান্মাসিক — টাঃ ৩১·০০

লণ্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক — টাঃ ১৭৪·০০
ষান্মাসিক — টাঃ ৮৭·৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৪৪·০০

মিঃ ভুট্টোকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে পাকিস্তানের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।
তাবিজ আবার ফলপ্রসূ হল!
টিক্কা

বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় আগামী মরসুমে ধান-চাল সংগ্রহের জন্য যে অভিযান চালাবেন বলে স্থির করেছেন সেই ব্যাপারে সদুপদেশ নেবার জন্য শ্রীরায় বিরোধী নেতাদের এক বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমন্ত্রণলিপিতে উল্লেখ না থাকলেও খাদ্যমন্ত্রী মহোদয়ের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গিয়েছে যে, অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থাটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারেই হয়েছে।

কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তদা এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করায় মুখ্যমন্ত্রী মর্মাহত হয়েছেন। কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তদা যে কে, এই জেনারেশনের অনেকেই হয়তো এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তার উত্তরে জানাচ্ছি, কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তদা হচ্ছেন সি পি এম-এর রাজ্য কমিটির স্থায়ী সাধারণ সম্পাদক।

এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা সি পি এম বললে চট করে বুঝতে পারবে না যে, জিনিসটা কি? তাই সি পি এম বলতে কি বোঝাতে চাইছি তাও বলে নেওয়া ভাল। সি পি এম একটা পলিটিক্যাল পারটির নাম। সি পি আই বলতে যেমন কমিউনিসট পারটি অব ইন্দিরা, সরি, ইনডিয়া বোঝায়, এস ইউ সি বলতে যেমন সোস্যালিসট ইউনিটি সেনটার বোঝায়, আর এস পি বলতে যেমন রেভলিউশনারি সোস্যালিসট পারটি বোঝায়, আর সি পি আই বলতে যেমন রেভলিউশনারি কমিউনিসট পারটি অব ইনডিয়া বোঝায় তেমনি সি পি এম বলতে কমিউনিসট পারটি (মারকসিসট) বা বাংলা কথায় মারকসবাদী (মতান্তরে মাকুবাদী) কমিউনিসট পারটি বোঝায়।

মারকসবাদী কমিউনিসট পারটি মানে কি? কমিউনিসট পারটি আমারকসবাদী বলে কিছু আছে না কি?

এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা! এই ধরনের প্রশ্ন যদি জিজ্ঞেস কর, তা হলে বেজায় মুশকিলে পড়ে যাব। মারকসবাদী কমিউনিসট পারটি মানে, আমার সাধারণ বুদ্ধিতে যা বলে তা হচ্ছে এই, যে কমিউনিসট পারটি মারকসবাদে বিশ্বাস করে তাহাকে মারকসবাদী কমিউনিসট পারটি বলে।

তা হলে পৃথিবীর কোনও কমিউনিসট পারটি মারকসবাদে বিশ্বাস করে না?

আরে মশাই এসব প্রশ্ন আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমি কি মারকসবাদী তাত্ত্বিক? এসব কথা সি পি এম-এর কোনও নেতা-কমরেডকে জিজ্ঞেস করুন, সঠিক লাইন তিনিই আপনাদের দিতে পারবেন। এক সময় পশ্চিমবঙ্গে অনেক প্রখ্যাত সব সি পি এম নেতা-কমরেডদাদের নাম শোনা যেত। এই আমাদের কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তদার কথাই ধরুন না। পুরাকালে সি পি এম তাঁর মিত্রশক্তিদের সাহায্যে এই পশ্চিমবঙ্গেই এক বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, দাক্ষিণাত্যের কেরল প্রদেশেও পুরাকীর্তির যে-সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা দেখে বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকেরা নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, সেখানেও কোনও এক সময় সি পি এম সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল। তবে ঐতিহাসিকদের অনুমান সেই সাম্রাজ্য স্বল্পকালস্থায়ী হয়েছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গে যে দুই দুইবার সি পি এম সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটেছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ এখন পাওয়া যাচ্ছে।

আরও আশ্চর্যের কথা, পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম-এর সেই স্বর্ণময় যুগে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত নামে একজন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদকের নাম পাওয়া গিয়েছে। বর্তমান রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং উল্লিখিত কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত এক ব্যক্তি কিনা, এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এক দলের অভিমত, উভয় কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তই এক ব্যক্তি। অপর দলের অভিমত একেবারে বিপরীত। তাঁরা বলেন, কোনও একসময় হয়তো কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত নামক ব্যক্তি পারটির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে পারটি গৌরব ও গরিমার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। তাই তার কীর্তি চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য পারটির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদকের পদটিই কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত নামাঙ্কিত করে রাখা হয়েছে। যিনিই ঐ পদে অভিষিক্ত হন বা হবেন তাঁকেই কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত নামে অভিহিত করা হয় বা হবে।

সম্প্রতি কোনও কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন যে, সি পি এম-এর রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদকের পদটি বংশগত করে রাখা হয়েছে। তাই বর্তমান কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রকৃতপক্ষে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়। কিন্তু আমার মতে, এটা নিছক অনুমান। এর পিছনে তথ্য-প্রমাণের তেমন কিছু জোর নেই।

সি পি এম নেতৃমন্ডলীর আরও দুই জ্যোতিষ্কের নাম এক সময় খুবই ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁদের একজনের নাম কমরেড প্রথম জ্যোতি বসু এবং অপরজনের নাম কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার। এই উভয় নেতাই সি পি এম সাম্রাজ্যের মুকুট ও কবচ স্বরূপ ছিলেন। এঁদের দাপটে বুরজোয়া শিবির থরহরি কম্পমান ছিল। তাই ইতিহাসে এঁরা বুরজোয়া-ত্রাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

এই দুই নেতার জীবনযাত্রা প্রণালী মুঘল সম্রাট ঔরংগজেবের তুল্য সরল ছিল। ঔরংগজেব যেমন হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হয়েও স্বহস্তে কোরান নকল করে তা বিক্রি করতেন এবং তার আয়েই ভরণপোষণ নির্বাহ করতেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম সাম্রাজ্যের ছত্রপতি হয়েও কমরেড প্রথম জ্যোতি বসু (লোকসভায় কমরেড জ্যোতির্ময় বসু নামে সি পি এম-এর আরেকজন সদস্য থাকায় পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসুকে ঐতিহাসিক মহলে প্রথম জ্যোতি বসু নামে অভিহিত করা হয়) সামান্য সরকারী বেতন ও গাড়িভাড়ার আয়ে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্বাহ করে গিয়েছেন।

সি পি এম দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গে সাম্রাজ্য স্থাপন করার পর কিছুকাল অতিবাহিত হলে মিত্রশক্তি শিবিরে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সি পি এম সাম্রাজ্যের পতনের এইটেই মূল কারণ বলে অনেকে মনে করেন। দ্বিধাবিভক্ত সি পি এম শিবির ভোটযুদ্ধে তরুণ নব কংগ্রেসী আক্রমণের মুখে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তদবধি তাদের নাম আর বিশেষ শোনা যায় না।

সেই কারণেই বর্তমান জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের কাছে সি পি এম-এর ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করা হল।

আসুন !
এক দোকানেই
সব কেনা-কাটা সারুন...

এই এক দোকানেই সব বাছাই
করা জিনিস পাবেন ! বিশেষ যত্নে,
বিভিন্ন বিভাগে—উপহার পর্দা-
আসবাবের কাপড়, কার্পেট, টেবিল
ক্লথ, চটি, শাল, গহনা, শাড়ী, জামা
হাল-ফ্যাসানের নানান সামগ্রী।

«কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ»

জনপথ, নিউ দিল্লী
চৌরঙ্গী, কলিকাতা
গেটওয়ে ইণ্ডিয়া, বোম্বে
বিস্ময়কর কারুশিল্পের স্বপ্নপুরী

DBM/1819/BEN

দেবরাজ

হিসেবের ভুল

সাতষট্টির জুনে আরবদের সঙ্গে ইহুদীদের যে লড়াই হয়েছিল তাকে ছ' দিনের যুদ্ধ বলাই রেওয়াজ। সেবার ছ'দিনের মধ্যেই ইস্রায়েলিদের সেনারা তছনছ করে দিয়েছিল আরবদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জলে, স্থলে, আকাশে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নাসের কবুল করেছিলেন তাঁর ফৌজের সামরিক সরঞ্জাম শতকরা ৮০ ভাগ খোয়া গিয়েছে ওই যুদ্ধে, পাত্তা নেই দশ হাজার ফৌজ আর অফিসারের, বন্দী হয়েছেন ৫০০০ ফৌজ আর ৫০০ অফিসার। শুধু লোকলস্কর আর যুদ্ধের সরঞ্জাম যায়নি আরবদের বিরাট এলাকা কব্জা করে নিয়েছিল ইস্রায়েলিরা। লড়াই হয়েছিল সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ মিশর, সিরিয়া আর জর্ডনের সঙ্গে ইস্রায়েলের। তিন দেশেরই অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছিল ইস্রায়েল। সুয়েজ খালের পূব পাড়ে সিনাই আর গাজা এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল সে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের কাছ থেকে, জর্ডন নদীর পশ্চিম পারে জুডিয়া আর সামারিয়া জর্ডনের কাছ থেকে, ইয়ারমুক নদীর পার পারে পাহাড়ে জায়গা সিরিয়ার কাছ থেকে।

৫ অক্টোবর পর্যন্ত ও সব এলাকার এক ছটাক জমিও ইস্রায়েলের হাতছাড়া হয়নি — স্বেচ্ছায় আরবদের জমি আরবদের ফিরিয়ে দেবার এমন পাত্র ইহুদীরা নয়। যুদ্ধে যে সব জমি তারা জিতে নিয়েছে সে সব এলাকায় ওরা মৌরসী পাট্টা করে বসে থাকবে এই ছিল তাদের মতলব। ইস্রায়েল এক ছিমছাম দেশ। তার আশেপাশের সব আরব দেশই তার ঘোর শত্রু। পশ্চিম এশিয়ায় তার অবস্থা অনেকটা সপ্তরথী ঘেরা অভিমন্যুর মতো। আরব দেশগুলো ইস্রায়েলকে কোনও দিনই মেনে নেয়নি। ইংরেজ এবং আমেরিকানদের গায়ের জোরে তার পত্তন হয়েছে আরবদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। তাকে ধ্বংস করার পণ করেছিল আরবরা তার জন্মের সময়ই। ইংরেজ আর আমেরিকানরা ইস্রায়েলকে মদত না দিলে আঁতুড় ঘরেই সে মরতো। ইংরেজদের আজ আগের প্রতাপ নেই, দরদও নেই। কিন্তু আমেরিকা একাই একশো। ইস্রায়েলকে সে শুধু অভয় দেয়নি তাকে টাকাকড়ি আর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দুর্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত করেছে।

আমেরিকানদের সঙ্গে আরবদের কোনও শত্রুতা নেই—তাদের পাকা ধানে কোনও দিন আরবরা মই দেয়নি। তবুও যে তাদেরই এলাকা ছিনিয়ে নিয়ে বানানো তাদের চিরবৈরী রাষ্ট্র আমেরিকানরা জিইয়ে রাখছে তার কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের প্রতিপত্তি। সে দেশে বাস করে ৫৮ লক্ষ ইহুদী—ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য ওদের হাতে, সরকারেও ওদের প্রভাব খুব বেশী। তাদের ভোটের জোর, বুদ্ধির জোর আর টাকার জোর কোনওটাই কম নয়, কোনওটাই কোনও রাজনৈতিক দল উপেক্ষা করতে পারে না। ইস্রায়েলের বনিয়াদ গড়েছে আমেরিকানরা, তার ওপর বিশাল ইমারতও তারাই বানিয়েছে। সে ইমারত যাতে ধ্বসে না পড়ে তার জন্যে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে। টাকা আর লড়ায়ের জিনিস তারা সমানে যুগিয়ে যাচ্ছে ইস্রায়েলকে। প্রতিপত্তি খাটিয়ে জাতিপুঞ্জে তাকে ঠাঁই দিয়েছে। বাইরের মধ্যে মুরুব্বীদের বেড়া দিয়েছে। একবার নয় নিরাপত্তা পরিষদে তারা ভেটো খাটিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করছে ইস্রায়েলকে। আমেরিকা না থাকলে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত ইহুদী রাষ্ট্রকে আরব দেশগুলো।

ছ' দিনের যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসেছিল — "শান্তি চাই" "শান্তি চাই" বলে যা তারপরই লড়াই থামবার জন্যে পরিষদ অনুরোধও জানিয়েছিল। লড়াই বন্ধ করে সে অনুরোধ মেনে নিয়েছিল ইস্রায়েল। কিন্তু যুদ্ধে জেতা জমি ফিরিয়ে দেয়নি কোনও আরব দেশকে। নিরাপত্তা পরিষদ লড়াই থামিয়েছিল সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র আর জর্ডন। সব শেষে সাই থাকুক লড়াই থামার আশা ছিল না সিরিয়ার। থেমে যাওয়া লড়াই যাতে আবার না বাধে তার জন্যে নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতির চুক্তির শর্তগুলো পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয় আরবদেরও, ইহুদীদেরও ২২ নভেম্বর ১৯৬৭ সালে এক প্রস্তাবে। সে প্রস্তাব পাস হয় বিনা আপত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে। তার বয়ান ইংরেজদের তৈরি হলেও মোটামুটি এই ধাঁচেই আরও দুটো প্রস্তাব পেশ করেছিল সে বৈঠকে রুশীরা আর ভারত, মালি আর নাইজেরিয়া মিলে। কাজেই ও প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটির দরকার হয়নি। ভেটো খাটাবার হুমকিও কেউ দেয়নি। জর্ডন আর সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র সে প্রস্তাব মেনে নিল, তবে সায় দিল না সিরিয়া। ইস্রায়েল মুখে আপত্তি না জানালেও কোন শর্তই পূরণ করলে না।

নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে বলা হয়েছিল পশ্চিম এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো হানাহানি কাটাকাটি করবে না। একে অপরের সমস্ত অধিকার স্বীকার করে নেবে। কেউ কারুর সীমান্ত লঙ্ঘন করবে না, কেউ অপরের এলাকা কেড়ে নেবে না। সবাই মিলেমিশে শান্তিতে থাকবে। দখল-করা জমি আরবদের ইস্রায়েল ফিরিয়ে দেবে। ৫ জুন ১৯৬৭-এর সীমান্তে সবাই ফিরে যাবে। যাতে হঠাৎ সংঘর্ষ না বাধে তার জন্যে সীমান্ত বরাবর খানিকটা করে এলাকায় কোনও সামরিক ঘাঁটি থাকবে না। প্যালেস্টাইনে উদ্বাস্তু সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান বের করা হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের একজন প্রতিনিধির ওপর ভার দেওয়া হবে চুক্তি সবাই মানছে কিনা তা দেখার জন্যে। মস্কোতে যিনি সুইডেনের রাষ্ট্রদূত ছিলেন সেই গুনার ইয়ারিংকে জাতিপুঞ্জের তখনকার মহাসচিব উ থান্ট তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে বাছাই করলেন। ইয়ারিং সে দায়িত্ব নিলেনও। সিরিয়া ছাড়া অন্য আরব দেশগুলো তাঁকে মেনেও নিলে। কিন্তু সব ফেঁসে গেল ইস্রায়েলের জেদে। যুদ্ধের আগের সীমান্তে সেনা ফিরিয়ে আনতে কিছুতেই সে রাজী হলো না। বরং কেড়ে নেওয়া আরব এলাকায় জেঁকে বসার ব্যবস্থা করলো, গোটা জেরুজালেমকে নিজের দখলে এনে রাজধানী সেখানেই সরিয়ে নিয়ে এলো।

এর পর যুদ্ধবিরতির চুক্তির মূল্য কিছু আর রইলো না। আরবদের দাঁত ভেঙে দিয়েছে ইহুদীরা, তাদের কামড়াবার জো নেই। তাই ইস্রায়েলের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো না, কিন্তু মনে মনে গজরাতে লাগলো—আর তৈরি হতে লাগলো নতুন করে ইহুদীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে। যুদ্ধ বাইরে থামলেও ভেতরে ভেতরে চলতে লাগলো আর এক দফা লড়াইয়ের উদ্যোগ। ইস্রায়েলের তো নতুন করে রণসাজের দরকার ছিল না, পুরোনো অস্ত্রে সে শান দিতে লাগলো, সাবেকী অস্ত্র ফেলে দিয়ে যোগাড় করতে লাগলো অতি আধুনিক মারাত্মক অস্ত্র। খুচরো লড়াই চলতেই লাগলো যদিও বড় রকমের যুদ্ধ কিছু আর বাধলো না। তবে যে আরবরা একেবারে ছেড়ে দেয়নি, মোকাবিলার জন্যে তারা যে তৈরি হচ্ছিল দুনিয়ার হাট থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনে, রাশিয়া তাদের পেছনে যে রয়েছে তা ইহুদীরা জানতো না এমন নয়, কিন্তু তাতে তারা ভড়কে যায়নি, তার ওপর কোনও গরজ দেখায়নি। ভেবেছিল যত গর্জায় তত বর্ষায় না, আর যদি বর্ষায়ও তার পাল্টা ব্যবস্থা তারা অনায়াসে নিতে পারবে। তাদের এ হিসেবে যে ভুল তা যখন তারা বুঝলে তখন দেরী হয়ে গিয়েছে। ৬ অক্টোবর যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো সিনাইয়ে আর গোলান হাইটে। ছয় দিনে কেল্লা ফতে করা এবারে আর গেলো না।

আপনি নিজেই এ কাজে করতে যাবেন না

আমরা আপনার সেবা করার জন্যেই রয়েছি

Prestige PREETT

আপনাদের সুবিধার জন্য সারা দেশে আমাদের ২৫০টি'রও বেশী মেরামতি'র কেন্দ্র রয়েছে। আপনার প্রেস্টিজ-এর কোন মেরামতি'র প্রয়োজন হ'লে, আপনার সবচেয়ে কাছে আমাদের মেরামতি'র কেন্দ্রে নিয়ে যান, সেখানে আমাদের কারখানায় শিক্ষিত কারিগর যথার্থ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে তাকে একেবারে নতুনের মত করে দেবেন। আমাদের মেরামতি কেন্দ্রের তালিকার প্রয়োজন হ'লে জানান। আমরা খুব আনন্দের সঙ্গেই আপনাকে একখানি তালিকা পাঠিয়ে দেব। আপনার জন্যেই প্রেস্টিজ-প্রীত-এর এই তদারকি'র বন্দোবস্ত।

একটা ব্যাপারে সাবধান

সব সময়েই অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি কিনতে হ'লে প্রেস্টিজ/প্রীত ট্রেড মার্ক আর আমাদের কোম্পানী'র প্রতীক চিহ্ন আঁকা সীল করা পলিথিনের ব্যাগে ভরা যন্ত্রপাতি কিনবেন।
মেকি যন্ত্রপাতি কিনবেন না।
ওগুলো আপনাকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করতে পারবে না।

টিটি (প্রাইভেট) লিমিটেড দূরবানিনগর ব্যাঙ্গালোর ৫৬০০১৬

TTP/1100/81

বাংলাদেশের গদ্য—১

সম্প্রতি আমি বাংলাদেশের কয়েকজন আধুনিক লেখকের কয়েকখানি গল্প-উপন্যাস পড়লাম। এর মধ্যে দুটি বই সম্পর্কে এবারে কিছু লিখছি, আর কয়েকটি সম্পর্কে বারান্তরে কিছু লেখার চেষ্টা করবো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরাট ঘটনাটি নিয়ে নিশ্চয়ই অনেক কিছু লেখা হবে। তবে, এ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে, তার কোনোটিই কালোত্তীর্ণ হবার যোগ্য হয়েছে কিনা সন্দেহ। অনেক সময় দেখা যায়, লেখার বিষয়বস্তুটি বিরাট হলে তা নিয়ে লেখা বেশ অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা রাষ্ট্রবিপ্লব—যাতে এক সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ জড়িত হয়ে পড়ে, তা নিয়ে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করা চাট্টিখানি কথা নয়, পৃথিবীতে এরকম দৃষ্টান্ত খুব বেশী নেই। লেখকের স্বাভাবিক ঝোঁক একটি ব্যক্তি বা পরিবারের সুখদুঃখের কথা ফুটিয়ে তোলার দিকে। তা ছাড়া, এইরকম ঘটনার অব্যবহিত পরেই কিছু লিখতে গেলে ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাসের বড় বাড়াবাড়ি দেখা যায়। কয়েক বছর কেটে গেলে যে নির্লিপ্ততা আসে, সেটাই সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী। যেমন ধরা যাক, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরেই যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ নিয়ে কিছু লিখতে বসতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তার মধ্যে ভারতের জয়গান বা সৈন্যবাহিনীর সম্পর্কে কিছু উচ্ছ্বাস থাকতো। আবার, এখন যদি কেউ লিখতে বসেন, তা হলে, যা শুনেছি, তিনি হয়তো ভারতের উল্লেখই করবেন না। আবার, আরও পাঁচ বছর বাদে কেউ লিখতে বসলে, হয়তো তিনি মুক্ত মনে ভারতের উল্লেখ করতে পারবেন, যোগ্য স্থলে প্রশংসা বা সমালোচনা করতে পারবেন।

আমার ওপরের কথাগুলো হয়তো একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। কারণ, আলোচ্য বই দুটির কোনোটিই যুদ্ধ বিষয়ে নয়। তবে, বাংলাদেশের প্রসঙ্গ এলেই এপারের আমাদের এখনও সেই একাত্তর সালের কয়েকটি মাসের কথা মনে পড়ে। এটা প্রায় বাতিকের মতন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এবার ছাড়তে হবে।

রশীদ করীমের উপন্যাসটির নাম 'আমার যত গ্লানি'। (আদিল ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং, ৬০ পটুয়াটুলী, ঢাকা-১। দাম-পনেরো টাকা।) এঁর বিষয়বস্তু, স্বাধীনতা-যুদ্ধের ঠিক আগের দিনগুলি। এটা একটা যোগ্য বিষয় নিঃসন্দেহে। রশীদ করীম বিদগ্ধ লেখক, একদা তাঁর 'উত্তম পুরুষ' নামের উপন্যাস আদমজী পুরস্কার পেয়েছিল, এই উপন্যাসটিও প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৭২ সালে ওখানকার বাংলা আকাডেমি প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পুরস্কার লাভ করেছে।

উপন্যাসটিতে অভিনবত্ব আছে। এর মূল চরিত্র, এমন একজন মানুষ, যে পাকিস্তানী আমলে উচ্চ চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত, ভোগবিলাসের জীবন যার কাছে অনায়াসলভ্য, বিচরণ করে সমাজের উঁচু তলায়। সাধারণ লেখকরা এদের নিয়ে ব্যঙ্গরচনা লেখে কিংবা হঠাৎ একে দিয়ে নানারকম ত্যাগ-ট্যাগ করিয়ে আদর্শবাদী মহৎ চরিত্র বানায়। রশীদ করীম এইরকম একটি মানুষ যা হতে পারে, সেইরকম হতে দিয়েছেন। সব মানুষই মাঠে গিয়ে বক্তৃতা দেয় না, গরীব দেখলেই ভাই বলে জড়িয়ে ধরে না, হঠাৎ যুদ্ধেও ঝাঁপিয়ে পড়ে না। সে অন্যায়কে অন্যায় বলে চেনে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে নিজের ভূমিকাটি ঠিক করে নিতে পারে না। তার মনের মধ্যে গ্লানি জমে, অন্যের কষ্ট দূর করতে না পেরে সে নিজেকে কষ্ট দেয়।

এই কাহিনীর নায়ক এরফান। সে একটা বিলিতী কোম্পানীর হোমরাচোমরা অফিসার। পাকিস্তানী আমলের শেষ দিককার অদ্ভুত দিনগুলোতে সে তার ভূমিকা অনেকটা লক্ষ করে। সে দেখছে সুবিধাবাদী রাজনীতিক, কন্ট্রাক্টর দালাল আর গুণ্ডাদের উপদ্রব, নৈতিকতার মৃত্যু, ব্যভিচার, বিলাস। অন্য দিকে সে দেখছে দারিদ্র্য, ধূমায়িত বিদ্রোহের ইঙ্গিত, যুবসমাজের গোপন প্রস্তুতি, নায়নিষ্ঠ নেতার সংগ্রাম। এই দু'দিকের কোনো দিকেই সে যোগ দিতে পারছে না—সে দর্শক, বিবেকপীড়িত, সে মদ্যপানের মতন ঘুমের ওষুধে নিজেকে ডুবিয়ে রাখছে। তার অনুজোপম স্নেহাস্পদ কেউ যখন লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য যায়, সে তাকে এগিয়ে দেয়, কিন্তু বন্ধু বেশী দুঃশাসনকে দূরে ঠেলে ফেলে দিতে পারে না। এর মধ্যে আবার কেন্দ্রিত হয়েছে কয়েকটি নারী-পুরুষের প্রেম ও যৌনজীবন। একেবারে শেষে চরম সময়ে এরফান নিষেধ সত্ত্বেও পতাকা উড়িয়ে দেয়, সেখানেই তার মুক্তি। এই ব্যাপারটি ও খুব চাপা সুরে বলার জন্য শিল্পসম্মত হতে পেরেছ।

লেখকের বৈদগ্ধ্য তাঁর লেখার মধ্যে সপ্রকাশ। রুচিস্নিগ্ধ সুন্দর বাংলা, পড়তে খুব ভালো লাগে। তবে, দু' এক জায়গায় তিনি দু' একটি চরিত্রে অতি নাটকীয়তা এনে ফেলেছেন। আর একটি ব্যাপারে তাঁর ভুল হয়েছে। এই উপন্যাসে অন্তত দুটি নারী বিবাহিত জীবনে খুবই অতৃপ্ত, নায়কের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা হয়, নায়ক তাদের লোভনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। উপদেশ বিনিময় হয় মাত্র। এতে একটু হাসি পায়। যে-সব নারী কাহিনীর শেষের দিকে নায়কের দিদি কিংবা শ্রদ্ধেয় বউদি হয়ে যাবে, গোড়ার দিকে তাদের স্তন বা উরুর বর্ণনা দেওয়া ঠিক নয়। এটা বিসদৃশ।

দ্বিতীয় বইটি আবদুল মান্নান সৈয়দের 'চলো যাই পরোক্ষে'। (আলমগীর রহমান, ১৯ সতীশ সরকার রোড, গ্যাণ্ডারিয়া, ঢাকা-৪। দাম পাঁচ টাকা।) ইনি কবি হিসেবে বিশেষ পরিচিত, এঁর একটি প্রবন্ধের বই 'শুদ্ধতম কবি' সম্পর্কে আমরা এই বিভাগে কয়েক দিন আগে লিখেছি—এবং এঁর একটি গল্পগ্রন্থ 'সত্যের মত বদমাশ' পাকিস্তান আমলে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

এটি নিছক গল্প-উপন্যাসের বই নয়, একটি পরীক্ষামূলক রচনা, ভেবেচিন্তে লেখা। যে-সব রচনা সাহিত্যকে বিস্তৃত করে, পাঠককে শিক্ষিত করে—এই গ্রন্থটি সেই জাতের এবং এই লেখকের সেরকম যোগ্যতা আছে নিঃসন্দেহ।

বইটি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কাহিনীর সমষ্টি অথচ একটি যোগসূত্রে গাঁথা। সবগুলিই হারিয়ে যাওয়ার গল্প। লেখক এখানে একটা চমৎকার রহস্যের অবতারণা করেছেন, বাস্তব অনুসারী কাহিনীর শেষ দিকে কোনো-না-কোনো মানুষ হারিয়ে যায়। এই অন্তর্ধান ঠিক যেন বাস্তবতার সীমানাটা ডিঙিয়ে যাওয়া অথচ কথাও অবিশ্বাস্য নয়, বুকের মধ্যে ধাক্কা মেরে পাঠকের চৈতন্যের কাছে একটা প্রশ্ন আনে।

এই ধরনের গ্রন্থ নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা হয়। অত্যুৎসাহী কেউ এর মধ্যে খুঁজবেন প্রতীক, কে খুঁজবেন পরা-বাস্তবতা, কেউ বলবেন, লেখার ধরনটা কাফকার মতন। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না, কথায় কথায় সাহেব লেখকদের সঙ্গে মিল খোঁজাও আমার স্বভাব নয়—কোনো লেখকের সঙ্গে অপর কোনো লেখকের তুলনা চলে না, কারণ, এটা দৌড় প্রতিযোগিতা নয়। আমার মনে হলো, এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ, ভাষার কিছুটা আড়ষ্টতা সত্ত্বেও এর একটা আলাদা মূল্য আছে। তবে, দু' তিনটি কাহিনী পড়ার পরই যখন বুঝতে পারি যে, প্রতিটি কাহিনীর শেষেই কেউ না কেউ অদৃশ্য হয়ে যাবে বা মরবে, তখন শেষ জেনে ফেলা গল্পের মতন আগ্রহ একটু কমে যায়—একেবারে কমে না, লেখার মুন্সিয়ানায় বইটি পড়ে শেষ করতেই হয়।

সনাতন পাঠক

কান্নার নামে

জগন্নাথ চক্রবর্তী

কান্নার নামে আমরা
পরস্পরকে ডাকবো, এমন
কথা ছিল না, কথা ছিল না বুনবো
দুই করতলের মধ্যে
বিদেশী বদ্বীপ, দুস্তর,
এবং আগুনে দেবো
আদরের অনুবীক্ষণ-অক্ষরগুলি।

কষ্ট দেবো, এবং পাবো, মুঠি থেকে
ঢিল ছুঁড়ে দিয়ে,
এমন কথা ছিল না, কথা ছিল না
ভালকে আর কোনোদিনও ভাল না বলার।

কবিতার, গল্পের, ছবির
সেই সব কাটাকুটি যারা
স্বপ্ন শুনিয়েছিল কষ্টের শেষ রাতে
কথা ছিল আমরা বারে বারে
ফিরে যাবো তাদেরি দিকে।

কথা ছিল সংসারকে
বদলে নেবো ভালবেসে,
তার বদলে নিজেরাই এমন করে
বদলে যাবো, বদলে দেবো নিজেদের,
কথা ছিল না।

নির্বাণ

আনন্দ বাগচী

ছাইদানের মধ্য থেকে নানারঙের ধোঁয়া ওঠে, ফুরিয়ে যায়
শোয়া চেয়ার, হাতলে হাত, পুরু লেন্সে দুষ্প্রাপ্য আলোয়
মূল্যবান পৃষ্ঠাগুলি বিকেলের বারান্দায় জ্বলে,
কিছু মনে পড়লে বই উল্টে রাখা, দিগন্তের দিকে—
যেখানে সূর্যাস্ত ছিল কিছু আগে চুরুটের ছাই
চেয়ে থাকা, মোটাফ্রেমের ছবির মত চশমাখানা
ঘরে চূর্ণ শাঁখ, যেন স্বপ্নে নষ্ট নারী
হাতে নিতে সব অন্ধকার হয়ে যায়।
বৃক্ষের বল্কলে শাখে পত্রপুঞ্জে গভীর শিকড়ে
প্রাচীন গল্পের মত মৃত্তিকার মধ্যবর্তী জল
কপালে ছড়ায় সূক্ষ্ম জটিল তাঁতের ছেঁড়া সুতো।
মাকড়সাকে দেখা যায় না, জালবোনা শেষ লুকিয়েছে।

ছাইদানের মধ্য থেকে নানা রঙ ধোঁয়া, চক্রচিত্র, বলিরেখা
শোয়া চেয়ারের পাশে হাতল রেলিং নির্বাপিত পুরু লেন্স॥

সেখানে বৃষ্টি পড়ে

দিব্যেন্দু পালিত

ঘরে ও বাহিরে আছে মানুষের অবিভাজ্য রেখা—
সেখানে বৃষ্টি পড়ে, বৈশাখের সর্বনাশা ঝড়ে
ওড়ে ধুলো; অনন্তকালের চিহ্ন বুকে নিয়ে
মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে পাখি এক, যে-ছিল বস্তুত
ঘরের ভিতর, কাল এসেছিল দূর দেশ থেকে—
সকালে সমস্ত চিহ্ন মুছে যায়, মুছে যায় রেখা।

মুছে যায় এইভাবে, একইভাবে, দেয়াল উঠোন
দলিলপত্রে লেখা গৃহস্থের আব্রু, আড়াল—
এক বৈশাখের ঝড়ে, এক বর্ষার বৃষ্টিতে।
পুরুষ তাকিয়ে থাকে, নারীও তাকায় তার দিকে—
মাঠের ওপর দিয়ে শুধু দৌড়ে যায় ন্যাংটো ছেলে
দাঁড়াতে পুকুরে, যদি ওঠে কেউ এমন আশায়।

এই রোদ বৃষ্টিপাত

ফণিভূষণ আচার্য

কিছুই জানেনা কেউ তবু সব জানা হয়ে যায়
এই রোদ বৃষ্টিপাত আলগোছে হাওয়া আর মাটির কুহক
মার্জনা করে না বিষ-পিপড়েরা যেমন
জামরুলে গাছটাকে কুরে কুরে অন্তরীক্ষ বাদামী যন্ত্রণা
প্রতিটি জীবনকোষে রেখে যায় অন্তর্ঘাতে ডেটোনেইটর
কেবলি বিষের বড়ি হাত ঘুরে চলে যায়
হাত ঘুরে চলে যায় ব্যাকটিরিয়া ও অষ্ট আধি যাকে
পাপ বলে দূরে রাখো অথচ কিছুই দূরে থাকে না
শহর ও সভ্যতার সবুজ বাসিন্দাগুলি একে এ[illegible]
গুণেবোটে চলে যায় ভূগোলের দেশে

এভাবেই ভেসে যায় মানুষের শিল্পের মিনার
এভাবেই ভেঙে যায় কুঁড়িসহ বৃক্ষের গরিমা
ফুলের ভেতর দিয়ে তবুও ভুবন দেখা যায়
সপ্তাহান্তে করবীর ডালগুলি হেলে পড়ে পাহাড়ী জ্যোৎস্নায়
নোনামাটি খামচে ধরে মখমল সভ্যতার সুন্দরী বৃক্ষেরা

এভাবে কিছু না জেনে দিকভ্রষ্ট বিষজ্বালা ধুয়ে নিতে
যেতে হয় খিলভাঙা রমণীর কাছে
কে দেবে নিষিদ্ধ ভিক্ষা মূলে ও পরাগে স্পর্শজল
ছায়ার আড়ালে পথ যেমন জলের নিচে নদী
মুমুক্ষু দুঃখের স্রোত পরিব্রাজকের কোন ঘরবাড়ি পিছুটান নেই
এভাবেই জেলেনৌকো ভাঙাডাল শিমুলের তুলো ভেসে যায়
এবং শব্দের কিস্তি নতুন ডাঙার খোঁজে
সংরক্ষিত দ্বীপে ও শহরে
এই রোদ বৃষ্টিপাত আলগোছে হাওয়া আর মাটির কুহক
শুধু ডাল মেলে চলে ডাল থেকে বিচ্ছুরিত বিষ

ফুজিয়ারার হাতে আত্মসমর্পণ করে। ইংরেজ অধিনায়ক ফ্রিংসপ্যাট্রিক আহত হয়েছিলেন। তারপরে ভারতীয় অফিসার ছিলেন মোহন সিং। ফুজিয়ারা ও প্রীতম সিং মোহন সিংকে অনেক বোঝালেন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের এই সুযোগ তাদের গ্রহণ করা উচিত। শেষ পর্যন্ত মোহন সিং রাজী হলেন ও তার সেনাদলের মধ্য থেকে জন্ম নিল প্রথম ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আই এন এ।

এরপর ফুজিয়ারা তার সিংগাপুরের আরো চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার গল্প করলেন। বললেন, জানো '৪২এর ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মি যেদিন সিঙ্গাপুরে আত্মসমর্পণ করল সেদিন সেই সারেনডার আনুষ্ঠানিকভাবে আমি গ্রহণ করি। ১৭ই ফেব্রুয়ারী সিংগাপুরের ফ্যারার রেস-কোর্সের মাঠ। পঞ্চাশ হাজার ব্রিটিশ ভারতীয় সেনা আত্মসমর্পণের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ইংরেজ সেনাপতি লেঃ কর্নেল হাণ্ট তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে ফুজিয়ারার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর ফুজিয়ারা যে বক্তৃতা করেন তা বিখ্যাত হয়ে গেছে। উনি তাদের নিজের দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান জানান। উনি বলেন তারা যদি রাজী থাকেন তবে আজ থেকে তারা যুদ্ধবন্দী নয়—স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক বলে গণ্য হবেন।

পরাজিত সেনাদল প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তারপর বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হল। হ্যাঁ, ভারতীয় অফিসাররা ফুজিয়ারাকে জাপানের অভিসন্ধি সম্বন্ধে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তিনি যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলেন, এশিয়ার দেশগুলি বিদেশী শাসনমুক্ত হবে ও একটি Asian Co-prosperity sphere গড়ে তুলতে পারা যাবে জাপানের তাই অভিলাষ।

সেই সময় থেকে ফুজিয়ারা হয়ে গেলেন "Lawrence of the Indian National Army—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন হয়ে গেল এই জাপানীর জীবনের মিশন।

ফুজিয়ারা বললেন নেতাজীর সংগে আরো একটি সাক্ষাৎকার ওঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারীতে জেনারেল মুতাগুচি ও নেতাজী মেমিওতে এক বৈঠকে মিলিত হন। ফুজিয়ারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মুতাগুচি ও নেতাজীর মধ্যে বেশ সৌহার্দ্য গড়ে উঠল। ইমফলের যুদ্ধে জয় সম্বন্ধে দুজনেই তখন নিঃসন্দেহ। মুতাগুচি বলছেন শীগ্‌গিরই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করবেন। নেতাজী বললেন, একবার আসামে ঢুকতে পারলে আর কোন চিন্তা নেই। সমস্ত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মি বিদ্রোহ করবে আর বাংলাদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হবে।

মুতাগুচি মস্ত ডিনার দিয়েছিলেন সে রাত্রে নেতাজীকে। ডিনারের পর নেতাজী ফুজিয়ারাকে সংগে করে নিয়ে এলেন তাঁর বাড়ীতে। নানা সামরিক প্রসংগ আলোচনা হতে লাগল। মুক্ত এলাকার শাসনভার নেবে আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট সেখানে জাপানী কারেন্সি চলবে না, আজাদ হিন্দ-এর নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহার হবে। এমনি সব কথা বলতে বলতে রাত ভোর হয়ে গেল। ফুজিয়ারার মনে হত নেতাজীর সঙ্গে যেন তার জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয়।

এবার প্রশ্ন, আপনি তো ইমফলের যুদ্ধে আই এন এ-র সঙ্গে ফ্রণ্টে ছিলেন সে সব দিনের কথা কিছু বলুন।

ফুজিয়ারা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কলম বার করে খসখস করে কাগজের ওপর ইমফল অপারেশনের প্ল্যান এঁকে ফেললেন। সাকাইর অনুবাদের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই ম্যাপ দেখিয়ে বোঝাতে লাগলেন—এই হল পাহাড়ের ওপর টেগনুপাল পাস। এইখানে জাপানী ইয়ামামোটো ফোর্স আর আই এন এ-র ফার্স্ট ডিভিশনের কমানডার মেজর জেনারেল মহম্মদ জমান কিয়ানি ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলেন। পাহাড়ের নীচে প্যালেল। কর্নেল অনায়েৎ কিয়ানি প্যালেলের ব্রিটিশ বিমান ঘাঁটি দখল করে নিয়েছিলেন। মরণপণ যুদ্ধ হয়েছিল এইসব অঞ্চলে। হ্যাঁ, ফুজিয়ারা এখানে ছিলেন বৈকি! একদিন নয় দুদিন নয়—১৯৪৪-এর এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত একটানা ওদের সাথী ছিলেন। রাত্রের অন্ধকারে গভীর অরণ্যে তখন শোনা যেত "দিল্লী চলো, দিল্লী চলো" ধ্বনি।

খাবারদাবার ও অস্ত্রশস্ত্র সাপলাই-এর অভাবে ওরা নিদারুণ কষ্টে পড়েছিলেন। না খেয়ে, প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সেই জঙ্গলে কিভাবে তিনমাস যে শত্রুপক্ষকে আটকে দেওয়া গিয়েছিল সেটাই আশ্চর্য।

কষ্ট তো ছিলই, তবে কি জানো—ফুজিয়ারা মুচকে হেসে বললেন 'ওরই মধ্যে জমান কিয়ানি যখন তার ক্যাম্পে আমাকে নেমন্তন্ন করতেন খুব ভাল খাবার দেবার এমন কি Ox hide পর্যন্ত সার্ভ করেছেন।'

রিট্রিটের কথা উঠল। '৪৪-এর ১০ই জুলাই রিট্রিট শুরু হল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন এইভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে দেখে ফুজিয়ারা সেদিন অসহায়ভাবে চোখের জল ফেলেছিলেন। আর সে কি রিট্রিট! ওদের সঙ্গে ছিলেন জাপানী যুদ্ধ সাংবাদিক মারুয়ামা। তিনি এই রিট্রিট বর্ণনা করেছেন death flight বলে। সে পরাজয়ে এক লক্ষ হাজার হাজার জাপানী ও ভারতীয় শহীদ হয়েছে ইমফলের রণাঙ্গনে। এদের জন্য ভারত-জাপান প্রাঙ্গণে একটা মেমোরিয়াল সার্ভিস বা স্মরণ অনুষ্ঠান হয় এ জেনারেল সাহেবের একান্ত ইচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনি কি আর ইমফল গেছেন তারপর?

না। এবার যাব ঠিক করে এসে-ছিলাম। ইচ্ছা ছিল দুদিন সেখানে থেকে প্রার্থনা করব। যেতে না পেরে বড় দুঃখিত।

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ কাশ্মীরের দুর্গ ৪ (২য় সং)
॥ মুসাফির ৫ (২য় সং)
॥ ইস্তাহার ৪ (২য় সং)
॥ শহর ৩ (৩য় সং)
॥ রবীন্দ্রোত্তর যুগের বিশিষ্ট কবিতা ॥
বিবজান ৯।১ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

(সি ১১৪৮৬)

দুর্ধর্ষ, আপোষহীন রহস্যময় ও খাঁটি বাঙ্গালী গদ্যশিল্পী
কমলকুমার মজুমদার
এ বছরে একটি মাত্র রচনা সৃষ্টি করেছেন
আবহ
সম্পাদক : অসিত গুপ্ত
C/o. প্রিণ্টার্স কর্নার, ১ গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা—৭০০০১২

(সি ১১৪৬৮)

হয়েছি। ইমফল যাবার সরকারী অনুমতি মেলেনি।'

আমি তো অবাক! সে কি! ইমফলের যুদ্ধের অন্যতম নায়ক, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহ-যোদ্ধা ফৌজিয়ারার ইমফল যেতে অনুমতি মেলেনি। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। সন্দেহ হয় কোথাও একটা আমলাতান্ত্রিক জট পাকিয়ে থাকবে।

লজ্জায় আর এ নিয়ে বেশী প্রশ্ন করলাম না।—এখন আপনি কোথায় যাবেন?

'বাংলাদেশে যাচ্ছি। শেখ মুজিবর রহমান সেখানে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করেছেন। সেখানে শেখ সাহেবের সঙ্গে ও বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার কথা হবে। আগে যখন আর একবার বাংলাদেশে গিয়েছি তখন দেখেছি ওরা নেতাজী ও আই এন এ সম্পর্কে খুব শ্রদ্ধাশীল।'

ফৌজিয়ারা যে ভারতবর্ষের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন সে ভারতবর্ষে আজকের ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সবই ছিল। তাই উনি ফিরে ফিরে আসেন এই তিন দেশে।

গত ভারত-পাক যুদ্ধের পর পরাজিত পাকিস্তানে উনি গিয়েছিলেন জানুয়ারী মাসে। সেখানে অনেক আছেন আই এন এর পুরোনো বন্ধুরা। ইসলামাবাদে উনি মহম্মদ জমান কিয়ানির বাড়িতেই আতিথ্য নিয়েছেন। এনায়েৎ কিয়ানি, হবিবুর রহমান সকলে খবর পেয়ে এসেছিলেন।

ওরা আমাদের সম্বন্ধে এখন কি ভাবেন? ওরা কি আমাদের প্রতি বিরূপ?—জিজ্ঞাসা করে বসলাম।

কথাটা একটু ঘুরিয়ে ফৌজিয়ারা জবাব দিলেন, নেতাজী সম্বন্ধে ওদের মনোভাব সেদিন যেমন ছিল আজো তাই আছে।

সময় আর বেশী ছিল না। লাঞ্চের পর উনি নেতাজী ভবনে যাবেন। সম্প্রতি উনি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর অনারারি সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাই নিয়ে যাবেন বলে আমার সঙ্গে লিফটে উঠলেন।

লিফটে নামতে নামতে শোনালেন ফৌজিয়ার বললেন, এই যে আজ এশিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট হয়েছে তার মধ্য দিয়েও নেতাজীর আদর্শই প্রচার করছি। এশিয়ার মুক্তি ও এশিয়ার ঐক্য নেতাজীর কাম্য ছিল। শুধু নেতাজী কেন তোমাদের রবীন্দ্রনাথ অম দব গুরুরা অনেকে এই স্বপ্ন দেখেছেন। সেই কাজ অগ্রসর করতে—উনি যার নাম দিয়েছেন Inter Asianism তারই প্রচারে ফৌজিয়ার জীবনের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দেবেন ভেবেছেন।

—কৃষ্ণা বসু

লাইব্রেরীতে রাখার মত বই

শংকর-এর
সর্বাধুনিক উপন্যাস
আশা আকাঙ্ক্ষা ৬·০০

কালকূট-এর
সর্বাধুনিক ভ্রমণ উপন্যাস
মন চল বনে ৬·০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর
প্রথম উপন্যাস
হাংরাস ১০·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর
হীরক দীপ্তি ৫·০০ অচেনা মানুষ ৫·০০
রক্ত ৬·০০ বৃত্তের বাইরে ৬·০০ রূপালি মানবী ৬·০০
আমি কি রকম ভাবে বেঁচে আছি ৪·০০

রমাপদ চৌধুরী-র
সর্বাধুনিক উপন্যাস
সীমন্তীর স্বপ্ন ৫·০০

নিমাই ভট্টাচার্য-র
সর্বাধুনিক উপন্যাস
প্রবেশ নিষেধ ৪·০০ ডিফেন্স কলোনী ৬·০০
মেমসাহেব ৮·০০ ডিপ্লোম্যাট ৮·০০
এ ডি সি ৮·০০ রিপোর্টার ৬·০০

সমরেশ বসু-র
অন্ধকার গভীর গভীরতর ৪·০০ অলিন্দ ৫·০০
অপরিচিত ৫·০০ আচিনপুর ৭·০০ অলকা সংবাদ ৫·০০
রূপায়ন ৫·০০ বিষের স্বাদ ৫·০০
অগ্নিবিন্দু ৪·০০ হ্রেষাধ্বনি ৬·০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা-৯
(দে ১১৬০৯/১)

এবার চোখে ছেয়ে গেল 'টেরিন' শাড়ীর রূপের আলো

রূপের আলো ছড়িয়ে সকলের মুগ্ধদৃষ্টি টেনে আনতে কে না চায় বলুন? কিন্তু কি করে? জীবন রঙীন করে তোলা শাড়ী পরে···নিজের পছন্দমত শাড়ী পরে···উপভোগ করুন এক অপূর্ব অনুভূতি···আর এই অনুভূতিরই অন্য নাম এস.কুমার!

সারা দেশে আমাদের ধুরন্ধর সহযোগী ব্যবসায়ী, পাইকারী ও খুচরো বিক্রেতা আর মিলগুলির সঙ্গে সুব্যবস্থিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে আমরা জানি আপনাদের পছন্দ কি— কারণ, আপনাদের পছন্দই আমাদের পছন্দ!

নতুন যুগের তালে তাল রেখে উৎকৃষ্ট বুনটের আকর্ষণীয়, মনলোভা, কাপড় তৈরী হয় ক্যাফি, মাতুরা আর লক্ষ্মী বিষ্ণুর মত স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে! আর এই সব সুন্দর 'টেরিন' স্যুটিং, শার্টিং আর শাড়ী আপনাদের জন্যে এনেছে এস.কুমার।

'টেরিন' স্যুটিং, শার্টিং ও শাড়ীর ক্ষেত্রে
এক নির্ভরযোগ্য নাম!

এস.কুমারস্ নিরঞ্জন, ৯৯, মেরীন ড্রাইভ, বম্বে ৪০০ ০০১

SISTA'S-SK-3026-BEN

শ্রীবাস্তবজী। বিশাল চেহারা, শুভ্র খদ্দরের পোশাক পরা, মাথায় গান্ধী টুপী। মুখখানা গম্ভীর। প্রথমেই তিনি বললেন, আজ আমার মনে পড়ছে—সেই সব সহকর্মীর কথা যাঁদের আত্মত্যাগের মূলে এসেছে এই স্বাধীনতা। সেই সব শহীদদের স্মরণে আমরা দু' মিনিট নীরবতা পালন করবো।

এই বলেই শ্রীবাস্তবজী চোখ বুজলেন। অনেকে দেখা দেখি চোখ বুজে চুপ করলো। অনেকে তাঁর কথা শুনতে পায়নি বলে তখনও গোলমাল করছে আর ভলান্টিয়াররা বলছে, চুপ, চুপ!

সূর্য চুপ করে রইলো কিন্তু যোগানন্দ ছাড়া আর কারুর কথা তার মনে পড়লো না। যোগানন্দকে কি শহীদ বলা যায়? পথের কুকুরের মতন সে রাস্তায় মরে পড়ে ছিল, তার কোনো বন্ধু বা আত্মীয় তার কাছে যায়নি। পুলিসের মুর্দফরাস এসে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়েছিল দেহটা। বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ যোগানন্দ দেশের জন্য প্রাণ দিতেই চেয়েছিল, তবু মৃত্যু এসেছিল অতর্কিতে। সূর্য তার লাশ ফেলে পালিয়েছিল। কোনো ইতিহাসের পাতায় তার নামটাও থাকবে না। কেন সে প্রাণটা দিতে গেল?

যোগানন্দর স্ত্রী শ্যামলীর কথাও মনে পড়লো একবার। সূর্যর সঙ্গে আর কোনোদিন তার দেখা হয় নি। কিভাবে সে যোগানন্দর মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিল কে জানে। শ্যামলী ছিল একটু গম্ভীর ধরনের, যেন একটু অহংকারী, কিন্তু হঠাৎ যখন হাসতো, অন্যরকম হয়ে যেত তার মুখ।

শ্যামলী কি সহ্য করতে পেরেছে? সূর্য নিজেকে অপরাধী বোধ করে।

নীরবতা ভঙ্গের পর মন্ত্রী মহোদয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজ এই পুণ্য দিনে আমি এখানে যে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি, সে জন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই এলাকার যে বিপ্লবী ঐতিহ্য আছে...

সূর্য অবাক হয়ে ভাবলো, বেয়াল্লিশের সময় গোয়ালিয়রে কি কিছু হয়েছিল? সে যে শোনেনি। সে সাতনার কথা শুনেছিল বটে। একটু পরেই বুঝতে পারলো, শ্রীবাস্তবজী বলছেন ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের কথা। তিনি অতদূর থেকে শুরু করেছেন।

শ্রীবাস্তবজীকে ঠিক মোটে বক্তা বলা চলে না। গরম গরম বুলি ছাড়ার দিকে তাঁর ঝোঁক নেই। ধীর স্থির ভাবে তিনি ইতিহাস আলোচনা করতে শুরু করলেন, অবশ্য একদেশদর্শী ইতিহাস।

মানুষটিকে বেশ সৎ বলেই মনে হয়। এই লোকটিকে যেন আবগারি বিভাগের মন্ত্রী পদে ঠিক মানায় না। বোধ হয় আর কোনো দপ্তর খালি ছিল না।

ময়দানের মিটিং-এ এরকম মাস্টারমশাই সুলভ বক্তৃতা কেউ বেশীক্ষণ শুনতে চায় না—একটু পরেই এদিক-ওদিক থেকে গুঞ্জন শুরু হলো। রূপলাল কিন্তু খুব মুগ্ধভাবে শুনছে, এই আবগারি মন্ত্রীর কাছে কলাতার পারমিট আনতে যাওয়ার কথা আছে।

শ্রীবাস্তবজী বেয়াল্লিশের আন্দোলনের বিষয় মাত্র দু'-তিন লাইনে সেরে দিলেন। শুধু জানালেন যে, ঐ সময় তিনি নেহরুজীর সঙ্গে এক জেলে ছিলেন। জেলের ভেতরে থেকে তাঁরা তখন বুঝতেই পারেননি যে, বাইরে এক শ্রেণীর লোক হিংস্র হয়ে উঠে গান্ধীজীর প্রোগ্রাম বানচাল করে দিতে চলেছে। যাই হোক, গান্ধীজী যে স্বাধীনতা আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন, তাকে রক্ষা করতে হবে...

কে যেন কি একটা প্রশ্ন করলো চেঁচিয়ে, ঠিক বোঝা গেল না। অমনি খানিকটা গোলমাল শুরু হলো। তারপর দেখা গেল, খাকী পোশাকপরা প্রৌঢ় মতন একজন লোক মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, স্বেচ্ছাসেবকরা ঝাঁপিয়ে ধরে ফেললো তাকে। খাকী পোশাকপরা লোকটির একটা হাত কনুইয়ের কাছ থেকে কাটা। সে হাউ হাউ করে কাঁদছে আর কি যেন বলতে চাইছে।

শ্রীবাস্তবজী উর্দু মেশানো হিন্দীতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সূর্য মোটামুটি বুঝতে পারছিল। খাকী পোশাক পরা লোকটার কথা সে কিছুই বুঝতে পারলো না। লোকটা কি পাগল?

সে রূপলালকে জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপারটা কি?

রূপলাল বললো, ও লোকটা বলছে, ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সেপাই ছিল। এখন খেতে পায় না। কিছু একটা কাজ চাইছে।

সূর্য হেসে বললো, শ্রীবাস্তবজী তো আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম উল্লেখ করেননি। সেই জন্য, ওঁর কোনো দায়িত্ব নেই।

রূপলাল বললো, নেতাজী যখন ফিরে আসবেন, তখন দেখে নেবেন এক হাত!

—ফিরে আসবার কথা আছে নাকি?

—আলবাৎ। তিনি ফিরে এসে যদি তাঁর সব পুরোনো সেপাইদের নিয়ে আবার দল তৈরি করেন, সেই জন্যই তো আজাদ হিন্দ ফৌজের কারুকে আর্মিতে নেওয়া হয়নি।

সূর্য এই অভিনব তত্ত্বটি শুনে চুপ করে গেল। ওদিকে শ্রীবাস্তবজী এবার গলা চড়ালেন। তাঁকে খানিকটা বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তিনি বললেন, স্বাধীনতা শুধু মুখের কথা নয়, এর জন্য অনেক আত্মদান করতে হবে। প্রথমেই আমাদের রক্ষা করতে হবে গণতন্ত্র। সামনেই যে সাধারণ নির্বাচন আসছে...

পরের বক্তা, কৃষিমন্ত্রী সাকসেনাজীর কথা থেকে আরও স্পষ্ট বোঝা গেল, এটা আসলে একটি নির্বাচনী সভা। কয়েক মাস পরেই ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, তার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। বেয়াল্লিশের আন্দোলনের স্মৃতি উদ্‌যাপন নিয়ে কারুর মাথা ব্যথা নেই।

সাকসেনাজী আগের বক্তার মতন নিছক ইতিহাসের কচকচি নিয়ে সময় কাটাবার মতন ভুল করলেন না। তিনি সরাসরি নেমে পড়লেন আত্মপ্রচারে। সিপাহী যুদ্ধের পঞ্চম সারের নিচে তাঁর নাম না থাকলেও কথা না। তিনি বললেন, তিনি চৌদ্দ বছর বয়েসে স্কুল ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। জেল খেটেছেন, পুলিসের হাতে মার খেয়েছেন, তবু মহান কংগ্রেসের আদর্শ থেকে কখনো বিচ্যুত হন নি। তিনি সব মিলিয়ে পাঁচবার জেল খেটেছেন, তার মধ্যে লাহোর জেলে যে ভয়াবহ অত্যাচার করা হয়েছিল তার বর্ণনা শুনলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তিনি নাটকীয়ভাবে বোতাম খুলে জামাটা ফাঁক করে গলার কাছে হাত দিয়ে বললেন, এই-খানে, ঠিক এইখানে জোয়ান ডাণ্ডা দিয়ে আমাকে মেরেছিল, আমি তবুও বলেছি, বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম! যতবার মেরেছে ততবার আমি বলেছি—

সূর্যর মনে হলো, আগ্রা হোটেলের সেই মেয়ে তিনটি যেমন তাদের শরীরের রূপ-যৌবন দেখিয়ে খদ্দেরদের আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল এই ব্যক্তিটিও ঠিক সেই রকমই যেন নিজের ওপর অত্যাচার-

নিপীড়নের বিবরণ দিয়ে ভোট আদায় করতে চাইছে। কেন তিনি ভোটে জিততে চাইছেন? অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে বলে এখন একটু আরাম চান? নাকি, দেশের সেবা করা একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে?

সূর্য হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তার মনে হলো, হরকুমার, ব্রজগোপাল, যোগানন্দ—এ'দের স্মৃতিকে অপমান করা হচ্ছে। সেই লোকগুলো কি মূর্খ ও নির্বোধ ছিল, তাই শুধু শুধু প্রাণ দিয়েছে? সে নিজেই বা কেন নষ্ট করলো তার প্রথম যৌবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটা বছর? স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে এক সময় তারা উন্মাদ হয়েছিল, এর নাম স্বাধীনতা? মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে দুজন হোমরা-চোমরা, অদূরে পুলিসের গাড়ি পাহারায়—আর কতকগুলো ভিখিরী হাঁ করে শুনে যাচ্ছে নানারকম উদ্ভট কথা। কোটি কোটি লোক দিশেহারা হয়ে বসে আছে, দেশের কোন কাজে তারা লাগবে তাও জানে না—তাদের সামনে আজ দেওয়া হচ্ছে মস্ত বড় একটা কাজ, ভোট দাও!

সূর্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাতো না—কিন্তু আগস্ট আন্দোলনের স্মৃতির নাম করে এই সভা ডাকা হয়েছে বলেই তার মাথা জেগে উঠেছে পুরোনো দিনের উত্তেজনা।

সাকসেনাজী যখন গলার আওয়াজ আরও উঁচুতে তুলেছেন, সূর্য তখন আরও জোরে চিৎকার করে বললো, শাট্ আপ!

কিন্তু এতে বড় কিছু আলোড়ন দেখা গেল না। কয়েকজন ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো এদিকে। রূপলাল সূর্যর হাত চেপে ধরে বললো, এ কি করছেন?

সূর্য তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে যাচ্ছিল। তার মুখ এখন রক্তাভ কপালে ঘাম জমেছে, সে আত্মবিস্মৃত। কিন্তু সূর্যকে বেশী দূরে এগোতে হলো না, এই সময়েই ময়দানের অন্য অংশ থেকে গোলমাল শোনা গেল। একদল লোক তাদের মধ্যে অধিকাংশই যুবক—উঠে দাঁড়িয়ে হৈহৈ শুরু করেছে। তারা বলছে, তারা মন্ত্রীর বক্তৃতা শুনতে চায় না, চাকরি চায়। ওরা অনেকেই সদ্য চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবকরা আর কিছু জানে না, তাদের ওপর শুধু নির্দেশ আছে, কোনো গণ্ডগোল বাধলেই থামাতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকরা ছুটে গিয়ে ওদের ঘাড় ধরে জোর করে বসিয়ে দিতে গেল। ফলে শুরু হয়ে গেল ধাক্কাধাক্কি হুড়োহুড়ি। এই সব ঘটনার গতি কখন কোন দিকে যাবে, তা আগে থেকে বলা শিবের বাপেরও অসাধ্য।

অনেক সভায় এইরকম সামান্য গোলমাল একটুতেই থেমে যায়, অনেক সময় আবার রক্তারক্তি পর্যন্ত পেঁছোয়। সাকসেনজী অদম্যভাবে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, কমুনিস্টরা দেশটাকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে। তারা পাকিস্তানের সাপোর্টার। তাদের ষড়যন্ত্র আমরা ব্যর্থ করে দেবোই। স্বাধীনতার পর কমুনিস্ট পার্টি ব্যান করার কথা যখন উঠেছিল, তখন আমরা কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ তার বিরোধিতা করেছি। আমরা জনতার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করবো। আমরা—

পুলিসের লাঠি চার্জে সেই সভা শেষ হয়। আহত হয় এগারোজন, তার মধ্যে একজন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ এবং একটি এগারো বছরের ছেলে।

সূর্য আর বেশী মাথা গরম করে নি, হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়েছে। বরং নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছিল তার। এই সাত পাগলের মেলায় তার আসবার দরকার কি ছিল? এই নিরন্ন, বুভুক্ষু, মূর্খের দেশটা উচ্ছন্নে যাক না, তার কি আসে যায় তাতে? হরদা'র কাছে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা শেষ হয়ে গেছে, আর কারুর কাছে তো তার মাথার দিব্যি দেওয়া নেই।

ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে সূর্য ময়দানের অন্য প্রান্তে এসে পড়েছিল, রূপলালকে হারিয়ে ফেলেছে, তাতে সে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। যাক্, এখন একটু একা ঘোরাফেরা করে যাবে। মিটিং-এ লাঠি চালনার ফলে রাস্তায় বেশ উত্তেজনার আবহাওয়া রয়েছে, অনেক দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে এর মধ্যেই, লাঠিসোটা হাতে কিছু মানুষও দেখা যায়। সূর্য অবশ্য সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। সে এরকম অনেক দেখেছে, সে জানে কিভাবে এড়িয়ে থাকতে হয়।

কিন্তু রূপলালকে এড়ানো গেল না। সে হঠাৎ আবার ফস করে কোথা থেকে হাজির হলো। মুখ ভর্তি হাসি নিয়ে বললো, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? ডাকবাংলো তো উল্টো দিকে।

সূর্য বললো, আমি একটু দানোলি বাজারের দিকে যাবো।

—সেখানে চেনা জানা কেউ আছে বুঝি?

—সেখানে একটা বাড়ি খুঁজতে হবে।

—চলুন, আমিও যাই।

অগত্যা তাকে নিতেই হলো সঙ্গে। খানিকক্ষণ চুপচাপ যাবার পর সে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ আপনার দেমাগ খারাপ হয়ে গেল কেন?

সূর্য কাঁধ ঝাঁকালো, কোনো উত্তর দিল না।

—আপনি পলিটিকস করেন নাকি?

এ কথার উত্তর না দিয়ে সূর্য ফস করে জিজ্ঞেস করলো, আপনি তো কাল মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন?

রূপলাল থমকে দাঁড়িয়ে সূর্যর মুখের দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসলো। তারপর বললো মাথা খারাপ? আপনাকে নিয়ে গিয়ে আমি মরবো? আমি যাচ্ছি পারমিটের জন্য দরবার করতে—সেখানে আপনি গরম গরম বাত বলতে শুরু করবেন—

সূর্য আবার নিজের ওপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠলো। একটু আগেই সে ঠিক করেছিল, ওদের কারুর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না, তবু সে এ কথাটা বলতে গেল কেন? রাজনীতির ভূত কি কিছুতেই ঘাড় থেকে নামবে না? না, আর ঐ চিন্তা একদম স্থান দেবে না মাথায়।

সূর্য উষ্ণ গলায় বললো, তা হলে আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন কেন?

রূপলাল বললো, আরে দাদা, আপনি রাগ করছেন কেন? আপনার লাইন আলাদা, আমার লাইন আলাদা। তা বলে কি সন্ধেটা এক সঙ্গে কাটাতে পারি না? আপনি তো আমাকে মিটিং শোনালেন, এবার চলুন, আপনাকে আমি ভালো ভালো জায়গায় নিয়ে যাবো। দেখবেন, পছন্দ হয় কিনা।

(ক্রমশ)

প্রকাশিত হয়েছে — একটি ভিন্ন স্বাদের কবিতার বই
অসীমকুমার বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ
সরাইখানায় অন্ধকার ২·০০
পাওয়া যাচ্ছে : সিগনেট, কথাশিল্প ও সমস্ত পরিচিত বইয়ের দোকানে
পরিবেশক : গ্রন্থনিলয়, ৪৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭
অনন্তর প্রকাশনী, ৪, রড স্ট্রীট, কলিকাতা—১৯
(দে ১১০৮৩)

নির্বাসন

বাণী লাহিড়ী

ফাল্গুনের চড়া রোদ থেকে অনেকটা হেঁটে এসে গলির মধ্যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো বাতাসীর মা। অন্ধকার ঘুপসি গলি। দু'পাশের কাঁচা নর্দমার ভ্যাপসা গন্ধ ভিজে বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। তবু প্রচণ্ড রোদে তেতে পুড়ে এসে এই স্যাঁতসেঁতে বাতাসই টেনে ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো জিভ বার করে হাঁফিয়ে শরীর জুড়োয় এই বস্তির মানুষেরা।

এক হাতে বেবীফুডের টিন, অন্য হাতে আরও মোটঘাট নিয়ে বাতাসীর মা ঘরে ঢুকলো। রোদের তেজটুকু তখনও তার চোখে লেগে আছে, তাই ঘরের মধ্যে কিছুই সে দেখতে পেলো না।

—'বাতাসী! অ বাতাসী! এখনও পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিস?'

—'চোখের মাথা খেয়েছো নাকি? দেখতে পাচ্ছো না কি কচ্ছি'—

ষোল বছরের বাতাসী ঝংকার দিয়ে উঠলো মাকে।

—'বাইরে ঠা-ঠা অন্দুর, ঘরে রেতের আঁধার! দেখবেটা কি করে শুনি? বলি যাবার সময় হয়ে এল, সে খেয়াল আছে?'—

—'করবোটা কি? আক্কোসের জাতের খিদে কি মেটে সহজে? এট্টু আগে বার্লি খাইয়ে দিলাম, ফের কানতে নেগেছে!'

—'আবার তুই দুধ দিচ্ছিস? একে তোর শরীলের এই অবোস্তা! নিজেও মরবি, ছেলেটাকেও মারবি? উঠিয়ে নে, জামাকাপড় পরা। শিগ্গির!'

বাতাসী ছেলেটাকে কোল থেকে তুলে জামাকাপড় পরাতে গেল ছেলেটা ততক্ষণে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। তার লিকলিকে হাত-পাগুলো টানটান করে চ্যাঁচাচ্ছে। পেটের নীল নীল শির-গুলো দেখা যাচ্ছে। সেদিকে এক পলক তাকিয়েই বাতাসীর মা'র বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

—'আহা-হা! কাঁদে না মানিক আমার...! তোমার জন্যি দুধ এনিচি। কৌটোর দুধ! বাতাসী যা তো মা, খপ্ করে ও ঘরের বউদির কাছ থেকে জলটুক গরম করে নে আয় তো!'—

—'কৌটোর দুধ এনিচিস্ মা!—'

বাতাসীর চোখটা আনন্দে চক্ চক্ করে উঠলো।

—'হ্যাঁরে হ্যাঁ! তবে আর বলচি কি? দুধ এনিচি, বোতল এনিচি, কাপড় মিষ্টি সব-আব এনিচি। তোর শাউড়ির মুখ বন্ধ করে ছাড়বো'—

মায়ের কথা শুনে বাতাসী লাফাতে লাফাতে জল গরম করতে চলে গেল। আর ছেলেটার কপালে গোল টিপের মত পোড়া দাগটায় হাত বুলোতে বুলোতে বাতাসীর মা গজ্ গজ্ করতে লাগলো—

—'গেরামের ভূতগুলো সব! জন্ম থেকে ছেলের কপালে খোঁচার দাগ করে দিলে গা। বলে কিনা—(ভেংচে নকল করে) আমাদের পয়মন্ত ছেলে, তাই টিকের ছ্যাঁকা দে খুঁত করে দিচ্ছি, এক বছর ভাত এঁটো কিছু দেবুনি। হিংসে, আসলে হিংসে! ডাইনী নিজে তো অমন একটা চাঁদপানা ছেলে বিয়োয় নি, তাই...।'

কাপড়ের আঁচল দিয়ে বাটিটা ধরে এনে দুম্ করে মেঝেতে নামিয়ে রেখেই হাতে ফুঁ দিয়ে লাফাতে লাগলো বাতাসী। ওর মা তখনও গজ্ গজ্ করে চলেছে—

—'বাতাসী! তোর শাউড়িকে বলবি, এক বছর এই বাড়ন্ত ছেলেকে ভাত ফ্যান কিছুই দেবোনি তা হবে না। তা সে য্যাতো বড় গনক্কারই বলুক না কেন! এই তো হাসপাতালে বাবুদের ছেলেমেয়েদের দেখি, এতটুকুন থেকে কত যত্ন, কত খাওয়া! তুই না পারিস্ তো আমিই'—

—'না, না, মা! অমন করিসনি। রাগের মাথায় শাউড়িকে ভুলেও আকথা কুকথা বলে ফেলিসনি যেন'...!

বাতাসী সভয়ে বলে উঠলো।

—'আচ্ছা, আচ্ছা, সে আর তোকে শেখাতে হবেনি! এখন তৈরী হয়ে নে তো! বেলা পড়ে এল যে!—

ওরা তিনটের গাড়িতে রওনা হয়ে যখন শ্রীমন্তপুরে পৌঁছলো, তখন বেশ সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। পাড়াগাঁয়ের সন্ধ্যে! আকাশে তখনও চাঁদ ওঠেনি! তাই এর মধ্যেই রাত্রির অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। শুধু স্টেশনের কোণে থেমে থাকা ইঞ্জিনের একঘেয়ে সোঁ সোঁ শব্দ, গাছের পাতার শিরশিরে কাঁপন আর মাঝে মাঝে গরুরগাড়ির চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ, ও সেই সঙ্গে থেকে থেকে গাড়োয়ানের 'হুই' চিৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

বাতাসীর মনে তখন ভয়ের কাঁপন শুরু হয়েছে। রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে শ্বশুর-বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে যে সে ভাল করে নি, সেটা এখন টের পেলো। তাই তার চোখের সামনে দুলতে লাগলো শাশুড়ীর রুক্ষ মূর্তিটা।

—'মুড়কি আর মিষ্টির হাঁড়িটা সঙ্গে নে এইচিস তো?'—

বাতাসীর মা বস্তাটার গায়ে কাঁথাটা টেনেটুনে দিতে দিতে প্রশ্ন করে!

—'হু'—ঘাড় কাত করে জবাব দেয় বাতাসী।

—'তুই এত সব কেনার টাকা পেলি কোত্থেকে মা? এ যে অনেক!'—

—'সে বহু কষ্টে ছুটে যোগাড় করেচি, বুকের রক্ত তুলে যোগাড় করিচি—'

অনচ্ছ অন্ধকারেও মায়ের ঠোঁটের বিষণ্ণ ক্লান্ত হাসিটা ঢাকা পড়লো না।

—'মা এবার এসে গেলাম! তুই কিন্তু শাউড়িকে এট্টু সামলে নিস'—

শ্বশুরবাড়ির বেড়ার কোণটা চোখে পড়তেই বাতাসী মায়ের থেকে একটু পিছিয়ে পড়লো।

—'কই গো বেন কই? তোমাদের কলকেতার কুটুম এইচি গো'—

উঠোনের বেড়ার দরজাটা ঠেলে ঢুকলো বাতাসীর মা।

—'কে? কে এয়েচো? কলকেতার কুটুম? তা অ্যাদ্দিনে গরীব বেনকে মনে পড়লো? গুণধরী মেয়েকে সঙ্গে যে এয়েচো বুঝি? বলি, ও বড়মানুষের বেটি! খুব তো তেজ করে চলে গিয়েছিলি, তোর ছেলেকে নাকি চিকিচ্ছে করাই না, খেতে দিই না...!'

—'থাক্ ভাই থাক্'! আমি হাত জোড় করে বলচি, আমি ওকে এ জন্যি অনেক বকিচি। মেরেচিও পর্যন্ত। অনেকটা হেঁটে এইচি, এট্টু জিরোই বুন। তারপর তুমি আমাদের মা মেয়েকে যা শাস্তি হয় দিও'— কাতর গলায় বলে উঠলো বাতাসীর মা।

—'দেখ বেন, কলকেতার লোক নই বলে অমন ছোটলোক ভেবোনি আমাদের। কুটুম সাক্ষেতের মত্ন আমরাও জানি'—

ব্যাজার মুখে বাতাসীর শাশুড়ী এবার একটা কুপি ঘর থেকে নিয়ে এসে দাওয়া বেয়ে উঠোনে নামলো। কুপিটা হাতে করে তুলে বাতাসীর মায়ের মুখের কাছে আনতেই কেমন যেন থমকে গেল সে। বাতাসীর মা তখন হাসিমুখে ওর দিকে চেয়ে আছে। কুপির থিরথিরে আলোয় বাতাসীর মা'র টানা চোখের ক্লান্ত নরম চাউনি আরও স্নিগ্ধ লাগছে। টান্ টান্ করে চুল বাঁধা ছোট্ট মসৃণ কপালে টিকোলো নাকের রেখায় নিটোল গালে পলকা আলোটা যেন পিছলে পড়ছে। তার সাদা সিঁথি, আভরণশূন্য মেহনতি দেহ তবু যেন চট্ করে তা থেকে চোখ ফেরানো যায় না।

—'কি হল গো দিদি, ঘরে চল?'—

বাতাসীর মায়ের মুখে আবার একটা অপরূপ ভঙ্গি ফুটে উঠলো।

—'ওঃ হ্যাঁ! চল বুন চল?'—

এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকার লজ্জায় শাশুড়ী এবার অপ্রস্তুত দ্রুত পায়ে চলতে শুরু করলো। কুপি হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি দাওয়ায় উঠেই চিৎকার শুরু করে দিল।

—'এসো বুন আমার, এস! ওরে ও মানদাদি দেখে যা আমার বেন এয়েচে! কলকেতার বেন!'—

শাশুড়ীর হাঁক ডাকে মুহূর্তের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দশাসই চেহারার মানদাদি। বাতাসীর দূর সম্পর্কের পিস্ শাশুড়ী। বাতাসীর মা'র দিকে তাকিয়েই বুড়ি ফোকলা দাঁতে হেসে বললো,

—'আমা, এযে দুগ্গো পিতিমে। যেমন মুখের ছিঁরি, তেমন অং, গড়ন।'

—হ্যাঁ বল দিদি, বল? আমি কি যে সে কুটুম করিচি, এসে দাঁড়ালে গাঁ সুদ্ধু অবাক হয়ে যাবে! কি গো বুন, বস? পিঁড়িটা তো পাতাই আছে। আয়, মা বাতাসী, ইদিকে আয়, গালমন্দ করি আর যা করি, ঘরের বউকে তো!'—

আতিশয্যে শাশুড়ী গদগদ হয়ে পড়লো।—'হ্যাঁ দিদি, আমাদের জয়দেব কোথায়'?

বাতাসীর মা জামাইয়ের খোঁজ করে।

—'সে আর বলোনি বোন, নেকাপড়া নেকাপড়া করে তোমার জামাই একেবারে পা-গো-ল! নিজের ছেলে বলে বলচিনি। আজ ওর শরীলটা খারাপ ছেলো। বুনু মাস্টারের কাছে পড়তে যেতে হবে নি, তবু কথা শুনলো নি'—

—'তা ভাল! অ-বাতাসী, ঐ পুঁটলির জিনিসগুলো খোল্ মা! বেন বেশী কিছু আনতে পারিনি, যা ক্ষ্যামতায় কুলোল...'

মিহি সুরে বলে ওঠে বাতাসীর মা। বাতাসী এগিয়ে এসে পুঁটলিটা খোলা মাত্রই শাশুড়ীর মুখটা জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে—

—'এযে অনেক এনেচো গো! কৌটোর আধার ওটা কি?'—

—'তোমার নাতির দুধ গো'—

—'দুধ! কৌটোর দুধ! সে যে অনেক টাকার ব্যাপার! বড় মানুষের ছেলের খাবার!'—

আনন্দে ডগমগ সুরে বলে উঠলো শাশুড়ী।

—'এ আর বেশি কি দিদি! মেয়েকে আরও কত দেবার সাধ! তাও যেটুকু তোমাদের ছিচরণে দিতে পারচি সে তোমাদেরই আশীর্বাদ'—

সুকৌশলী বাতাসীর মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো। শাশুড়ী তাতেই গলে জল! তাই এক গাল হাসি নিয়ে কলকলিয়ে উঠলো—

—'বুন আমার কলকেতার মানুষ তো! কত ভাল শিক্ষাদীক্ষা! এত রূপ এত পয়সা! তবু একটু দেমাগ নেই গা! ওঠ দিদি আমার! রাত হয়ে এল, মুখে কিছু দাও! আজ বড় সুসময়ে এয়েচো, মল্লিকদের চাতালে যাত্রা হবে, যাবে দিদি দেখতে?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ যাবুনি আবার! কলকেতায় কত থেটার সিনেমা হয় তবু গেরামের যাত্রার কাছে আর কি...!'

—'ঠিক বলেচো দিদি। যাত্রার কাছে আবার থেটার সিনেমা! ছ্যাঃ ছ্যাঃ! এই তো সাহাবাড়ির মেজো ছেলে আগের বছর গাঙের ধারে একটা বাইস্কোপ খুললো। ছেলে ছোকরাদের সেকি ভীড়! আমি তখন বলু মুখে আগুন তোদের। গেরামের যাত্রা পুতুল নাচ থাকতে পয়সা খরচ করে......'

—'সেকি মা! তুমিও তো দেখতে চেয়েছিলে? শেষে মেজোকাকা জোর করে উঠিয়ে দিল বলে...

বাতাসী ওপাশ থেকে ফোড়ন কাটলো।

—'তুই থাম দেখি হতভাগী! সব যেন মনে ক'রে রেখেছে! তার পর জান, আমিই তোমার বেয়াইকে বল্লু—'ওগো, তোমরা গাঁয়ের মাতা থাকতে ছেলে বউ ঝির পেটের ভাত না জুগিয়ে সিনেমার পয়সা যোগাবে! ও বন্ধ করে দাও'—

—'সে কি মা! তুমি কোথায় বললে? সে তো দাশু কাকার বউ বলেছিল?'

বাতাসীর মার মনে মনে হাসি পেলেও ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললে—

—'বাতাসী! ছিঃ মা! গুরুজনদের মুখে মুখে তর্ক করতে নেই—'

'বলতো দিদি বলতো! আহা, মায়ের এমন শিক্ষাদীক্ষা তবু যে মেয়ে কেন এমন হল!'

শাশুড়ী আক্ষেপ ক'রে ওঠে। বাতাসী মুখ ভার ক'রে থমথমে পায়ে উঠে চলে যেতে চায়।

—'তা হলে যাবে বুনে! বেশ রাত ভোর দুজনে...'!

—'আমিও যাব মা! আমি যাত্রা দেখবো।'

মেয়ে পেস্কম ফিরে নাকি সুরে বলে উঠতেই বাতাসীর মা ধমক দেয়—

—'তুই কি করে যাবি? তোর ছেলেকে ফেলে?'—

—'তা যাক বুনে যাক! ও ছেলেমানুষ, ও তো বায়না করবেই! আমি বলেই লোভ সামলাতে পারি না'—

নিমেষের মধ্যে শাশুড়ী নরম হয়ে ওঠে যেন! বউকে আদরের সুরে আবার বলে—

—'যা মা! সেজে গুজে নিগে যা!'

একটু মুখ ফিরিয়ে বাতাসীর মা'র দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—'মানদা দিদি আছে, ছেলেকে রাখবেখন'—

—'মা! বার বার বলিচি, আমার খোঁয়াড়ের দরজা খুলে রাখবি না তবু...ওঃ আপনি? কখন এলেন?'

জয়দেব দুড় দাড় করে ঘরে ঢুকে মাকে নালিশ জানাতে গিয়েই শাশুড়ীর দিকে চোখ পড়তে বেশ সমীহ হয়ে পড়লো। তার সদ্য ওঠা গোঁফের ফাঁকে একটু লজ্জার ঝিলিক দেখা দিল। তারপর খপ করে শাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়েই চৌকাঠ ডিঙোতে চাইলো।

—'ওরে শোন শোন পাগল কোথাকার! ছেলের আমার কি লজ্জা দেখেছো যেন! শাউড়িকে দেকেচ কি...যা হাত মুখ ধুয়ে আয় দিকিন'...!

—'আজ যাবোনি গো মা! গেটা শরীরটায় বড্ড ব্যাথা। বোধ হয় জ্বর এয়েছে'—

—'জ্বর! সেই বিকেলেই বারণ করে ছিনু...অয় ইদিকে আয় দেখি! হুঁ, বেশ জ্বর! তা ভাত না খাস মুড়ি মুড়ি'—

—'যা হোক ঘরে পাঠিয়ে দাও! আমি শুতে গেনু! বড় শীত নেগেচ'!

জয়দেব চলে গেল। বাতাসীর মা জামাইয়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। এই এক বছরেই জয়দেব বেশ লম্বা হ'য়ে গেছে। চেহারায় সেই লিকলিকে ভাবটা আর নেই। বাড়ন্ত কলাগাছের মত পুরুষ্টু ভাব এসেছে ওর শরীরে! চুলটাও পরিপাটি করে আঁচড়ানো! পরিষ্কার জামাকাপড়! যতই হোক ইস্কুলে পড়ছে তো! মায়ের বুকটা কেমন একটা তৃপ্তিতে ভরে উঠলো।

—'যাও দিদি যাও! ছেলেকে খেতে দে এস! আমি এটু ইদিক সিদিক ঘুরে দেখি'—

বাতাসীর মা উঠোন পেরিয়ে খিড়কি পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল। অষ্টমীর ফালি চাঁদ। একটু দেরীতে উঠলেও এখন আর চারপাশটা অতটা অন্ধকার ঠেকছে না। পুকুরের এপাশে নারকোল, ওপাশে সুপুরি গাছের সারি! মরা চাঁদের আবছা আলোয় তারই কালো কালো লম্বা ছায়া পড়েছে পুকুরের জলে, আর সরু পথের জমিতে এঁকে দিয়েছে কালো ছায়ার জাজিম!

—'নাঃ! মেয়েটা বেশ বড় বাড়ন্ত ঘরেই পড়েছে! শুধু শ্বশুরে বুড়োটা এট্টু চামার গোছেই...'

নিজের মনেই ভাবতে ভাবতে দাওয়ায় উঠে এল বাতাসীর মা, দাওয়ার বাঁশের খুঁটিটা ধরে হেলান দিল ও। খানিকটা ওপাশেই বাতাসীর ঘর! 'ঘর' কথাটা আজও বাতাসীর মায়ের মধ্যে অদ্ভুত একটা সুখের শিহরণ তোলে। দু' অক্ষরের এই শব্দটা ওর মনে যে কত আকাঙ্ক্ষিত পুরোনো দিন-গুলোর স্বাদ এনে দেয়! সেজনাই ঘরের একটা টিমটিমে প্রদীপের আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সে, তার বাতাসীর ঘরখানা। ঘরে জিনিসপত্র বড় একটা নেই। যেটুকু আছে, তাও পরিপাটি করে গোছানো। ওদিকের দেওয়ালের ধারের বিছানায় জয়দেব চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছে। হালকা আলোয় ওর মুখখানা কাঁচা বাঁশপাতার মতো লাগছে। ইতিমধ্যে একটা ছায়া ঘরের মধ্যে এসে পড়লো। আস্তে আস্তে ছায়াটা সরে গিয়ে বাতাসীকে দেখা গেল।

বাতাসী আজ নতুন লাল শাড়িটা পরেছে। চুল আঁচড়ে খোঁপা বেঁধেছে, ঠোঁট দুটো তার পানের রসে টুকটুকে। কপালে বড় একটা সিঁদুরের টিপ।

ও পা টিপে এসে জয়দেবের কপালে দুটো আঙুল ছুঁইয়েই একটু মুচকি হেসে নিল। জয়দেব হাতটা সরিয়ে দিল ঠেলে। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসীর কাঁচভাঙ্গা হাসি আছড়ে পড়লো ঘরের মধ্যে—

—'ইস, বাবুর তেজ হয়েছে! যাত্রা দেখা হলুনি তো? বেশ হয়েছে। এতদিন আমাকে ফেলে দিবা একা একা...নাও এবার চোখ বুজে হাঁ করো তো দেখি'—

ওর হাতের মধ্যে একটা পান গোঁজা। বাতাসীর মা বুক ভরে নিশ্বাস নিল। আবার একটা সুখের স্বাদ ওর সারা দেহে মনে কাঁপন ধরালো, সমুদ্রের পাড়ে লাফিয়ে উঠে আসা সূর্যের মতো ওর মনেও লাফিয়ে ওঠে ওর নিজের ষোল বছর

॥ গ্রন্থপ্রকাশের সশ্রদ্ধ নিবেদন—বাংলা সাহিত্যের দুই দিক্‌পালের রচনাবলী ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের রচনাবলী

মনোজ বসুর রচনাবলী

নিয়মাবলী ঃ—প্রতিটি রচনাবলীর জন্য ৫ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। দুটির জন্য ১০ টাকা। যাঁরা দুটির গ্রাহক একসঙ্গে হবেন বিনামূল্যে তাঁদের ৪ টাকার বই উপহার দেওয়া হবে। শুধুমাত্র গ্রাহকরা শতকরা ২০, টাকা হারে কমিশন পাবেন। জমা টাকা শেষ খণ্ডের সঙ্গে কাটা যাবে। গ্রাহক হবার জন্য টাকা পয়সা শুধুমাত্র আমাদের ঠিকানায় পাঠাবেন।

বিভিন্ন পুস্তক প্রতিষ্ঠান যাঁরা আমাদের হয়ে গ্রাহক সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, যোগাযোগ করুন ॥

গ্রন্থপ্রকাশ, C/o. বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৪, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৮২৫

শেভার স্যুইশ-'খোঁচাচুলের ভয়ঙ্কর খপ্পরে' *
* রেসের ট্র্যাকে ভয়াবহ আলোড়ন
এই মরশুমের ৩০০০ নং ট্রফির রেস, শুরু হোলো বলে···স্টার্টার পিস্তল তুললো·· দুম্··· শুরু হল দৌড় !
VOOOOM
শেভার স্যুইশ যে পিছিয়ে পড়লো ! এগিয়ে এসো, বাহাদুর !
ভয়ানক খোঁচাচুল গজিয়ে উঠছে ! উপায় ? চট্ করে কামিয়ে নিয়ে আত্মভরসাটা ফিরিয়ে আনি !
প্রচণ্ড আওয়াজ করে থামলো শেভার স্যুইশ···তারপর সাঁই করে বার করলো তার অসময়ের সাথী স্যুইশ শেভিং সরঞ্জাম···
বেঁচে থাক স্যুইশ ! খুব লম্বা হাতল ওয়ালা স্যুইশ রেজর অনেক শক্ত করে ধরা যায় । আর, এই স্যুইশ ব্লেডের কামানো যেমন পরিষ্কার, তেমনি আরামদায়ক !
৩টে স্যুইশ ব্লেড কাজ করে ৫টা সাধারণ ব্লেডের সমান, কারণ, স্যুইশের ধারে আছে এক অসাধারণ পলিমার আবরণ !
Swish STAINLESS
তোমার তুলনা নেই, গো ! কি হারান হারালে সবাইকে !
স্যুইশ দিয়ে যে দাড়ি কামায়— তাকে কেউ হারাতে পারে না !
প্রতিবারই তাই হয়ঃ
স্যুইশ দিয়ে যে দাড়ি কামায়—তাকে কেউ হারাতে পারে না !
mcm/cl/18-a-rev-Ben

বয়েসটা! বন্ধ চোখ, কিন্তু কানের কাছে তখন রিনরিন করে বাজছে তেয়ের গল্প—

—'এই! ছাড়ো বলছি! মা এসে পড়বে যে!'

—'আসুক! তুই খাবিনি বল! সকালে চলে যাবে, আজ শুধু তুই আর আমি!'

ওদের গলার চাপা আওয়াজ, বাতাসীর হাতের চুড়ির ঠিন ঠিন শব্দ মায়ের মনে যেন সুখের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সারা বুক জুড়ে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে আগুনটা। তার প্রচণ্ড উত্তাপ গরম নিশ্বাস মায়ের দেহে মনে তোলপাড় তুলেছে। সেই ষোল বছর! যখন বাতাসীর ঘর-পালানো কাঠুরে বাপটা সেদিনও কাঠ কাটতে, মৌচাক ভেঙে আনতে যেতো, তখনও কোন কোন শেষ রাতে ও নিজেই দু'হাতের বাঁধন দিয়ে এমনিভাবেই আটকে রাখতে চাইতো...! সেই দিনগুলো...

—'অমা বুন, তুমি ইদিকে চুপটি ক'রে দাঁড়াও আর আমি সারা বাড়ি খুঁজে মরি! অ বাতাসী! বলি ভাবনা হল তোর? যাবি কখন! বাজনা বাজাতে শুরু করেচে যে ইদিকে'—

শাশুড়ী আচমকা এসে হাঁক ডাক শুরু করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে বাতাসীও ঘর থেকে ককিয়ে উঠলো—

—'উঃ বড্ড শীত লেগেছে মা! বোধ হয় আমারও জ্বর আসছে লেগেছে! আমি যাবনি—'

—'কোন মেয়ের কথা! কি পাগলি মেয়ে তোমার দেকেচো বেন! এই একেরে কচি ছেলে যাত্রা যাবে, যাত্রা যাব করে...!'

—'থাক দিদি থাক! ঠাণ্ডায় অনেকটা হেঁটেছে তো!'—

মেয়ের কাণ্ড বুঝে মা ফিক করে হেসে ফেলে বললো।

'তাহলে চল আমরা যাই!—'

শাশুড়ী যেন একটু মনমরা হয়ে পড়লো। আজ তার মনটা বেশ ভাল ছিল বলেই বউকে দশগুছির বিনুনি বিনিয়ে খোঁপা ক'রে দিয়েছিল, লাল শাড়িটা পরতে বলেছিল, যাতে আশপাশের দশটা গাঁকে দেখানো যায় মা মেয়ের জোড়াকে! কিন্তু মা, মেয়ের কি যে অনাছিষ্টি কাণ্ড!

পরদিন সকালে একটি দুটি করে এক গাদা বউ মেয়ে ভীড় করেছে বাতাসীর শ্বশুরবাড়ির দাওয়ায়। সকলের চোখে মুখেই কৌতূহল আর বিস্ময় ঝরে পড়ছে। বাতাসীর মা খানিকটা আগেই মেয়েকে বলতে শুরু করে ছিল কাল রাতে দেখে আসা যাত্রার গল্পটা। তারা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে এই আঁটসাট গড়নের সুন্দর ছোট্ট মানুষটির কথার ভাঁজে ভাঁজে যে মাধুর্য যে দীপ্তি ফুটে ওঠে। বাতাসীর বুকটা গর্বে দশহাত ফুলে উঠেছে, আর শাশুড়ীর মুখে চাপা হাসি টসটস করছে। তারপর এক সময় যখন গল্প শেষ হ'ল তখন বাতাসীর খুড়শাশুড়ী গালে হাত দিয়ে বলে উঠল—'হাই মা! কত বিদ্যে শিকেচো গো তুমি! গোটা গল্পটা এই একটা রাত যাত্রা দেখেই শিখে ফেললে! এই আমরা সারা জেবনের এত বউ ঝি যাত্রা দেখনু, কই বলুক তো দেখি গোটা গল্পটা, বুকে হাত দিয়ে বলুক, দেখনু এই পর্যন্তই!'

আরেকজন পড়শিনী বলে উঠলো—'তুমিও ভাগ্যিমানী জয়দেবের মা! অনেক পুণ্যি করলে এই রকম কুটুম-সাক্ষেত হয়। আহা, মায়ের যেমন রূপ তেমন লেকাপড়া বুদ্ধি! কিই বা বয়েস! যা আঁট সাঁট ছয়-ছোট্ট গড়ন, মনেই তো হয় না তিরিশ পেরিয়েছে! এই বয়েসেই শত্তুর ভগবান সব ঘুচিয়ে দিলে গা—'

সকলের আফসোস আর প্রশংসার মাঝে বাতাসীর মা যেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল। আনন্দে ওর চোখটা জলে ভরে উঠছে আর কানের কাছে বাজছে বাতাসীর বাপের ঠাট্টার সুরটা—'তুই শহরের ছেলো হয়ে জন্মালে নিরঘাত জজ বেলেস্টার হতিস বটে!'—

এতগুলো মানুষের ভিড়েও ও আবার আবছা নিজ পুরনো দিনের ছায়ায়। ওদের প্রশংসার মাঝে ও মাথা নামিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটতে খুঁটতে ভাবছে—লোকটা ছিলনাই, মদ গাঁজা খেতে শুরু করলে কি হবে, বড় ভালবাসতো তাকে। তাই নেশার ঝোঁকে সময়ে সময়ে মেরে কালশিটে করে দিলে কি হবে, খানিক বাদে ঠাণ্ডা হলেই আদরে ভরিয়ে দিত তাকে। মানুষটা যে কোথায় চলে গেল! না জুটলো এক ফোঁটা ওষুধ, না পথ্যি...!

—'কই গো জয়দেবের মা! তোর কুটুম কেন কই? গাঁয়ের লোকের মুখে আর সুখ্যাতি ধরে না! তাই দেখতে এনু—'

লাঠি হাতে বামুনপাড়ার ঠানদি এগিয়ে এলো উঠানের দিকে। মেয়ে বউরা তখন ঠানদিকে দেখে আরও বেশী উৎসাহিত হয়ে পড়লো। সকলেই যেন ঠানদির অভিমতের প্রতীক্ষায় উন্মুখ।

ঠানদি নুয়ে পড়া দেহটা তুলে ঘাড়টা হেলিয়ে বাতাসীর মা-র দিকে তাকালো। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাবার পর ভুরুটো কুঁচকে বলে উঠলো—'দেখে মনে হচ্ছে যেন চিনি, ঠিক ঠাওর কর্তে পারছিনে! তোমার কোথায় দেকেচি বল তো?'—

বুড়ির দিকে তাকিয়েই বাতাসীর মা শিউরে উঠলো। তার চোখের সামনে দুলে উঠলো একটা রাতের ঘটনা। সেই গভীর রাত.........হাসপাতালের এঁদো পড়া করিডোরের কানাচে ওর সেই সর্বনেশে ঘুমের নেশা ......একঘেয়ে বৃষ্টির ঘুমেল হাওয়ায় ঘরের রুগীদের নিঃশব্দ আচ্ছন্নতার মাঝে মুখার্জীবাবুর উত্তপ্ত কঠিন হাতের বেষ্টন, অসংলগ্ন, অপর্যাপ্ত আবেগ......মুখের ঝাঁঝালো দিশি মদের গন্ধ বাতাসীর মায়ের দেহের প্রতি রক্তকণিকায় আগুন ছিটিয়ে দিয়েছিল। তারই ফলে নরম পালকে ঢাকা ভেজা পাখির মতো তার ছোট্ট দেহটা মুহূর্তের জন্য উষ্ণ আশ্রয় খুঁজেছিল। হঠাৎ কানের কাছে গরম তেলের মতো ছিটকে পড়লো কটা কথা—

—'বাঃ বেশ, বৃন্দাবন লীলে চলছে যে! কখন থেকে চেঁচিয়েও ভেন্টায় এক ঘটি জল পাইনে! বলি এঁকি......?'

সন্ত্রস্ত হয়ে স্প্রিংয়ের মতো বাতাসীর মা ছিটকে পড়েছিল, মুহূর্তের জন্য নিজেকে বড় অসহায় বোধ করেছিল, তাই ভীতু গলায় বলে উঠেছিল—'যাচ্ছি মা, এই যে যাচ্ছি...!'

মুখার্জীবাবু তখন বাতাসীর মায়ের দিকে ভুরুটা নাচিয়ে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসেছিল। তার পরই দ্রুত পায়ে সরে পড়েছিল সেখান থেকে। সে হাসির দিকে তাকিয়ে বাতাসীর মা'র সারা শরীর ঘুলিয়ে ওঠে। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই নিজের মুহূর্তের দুর্বলতা ও পরাজয়ের গ্লানি মনকে বিষিয়ে তোলে, তবু এ থেকে পরিত্রাণের পথ নেই তার। তার জীবনের অনেক দুর্গ্রহের মধ্যে নিজেকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলেছে মুখার্জীবাবুর সঙ্গে। আজ সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠলেও তা থেকে রেহাই মিলবে না।

কিন্তু মাথা নীচু করে বাতাসীর মা কয়েক মুহূর্তে এসব ভাবতেও সময় পায় না। ঠানদি আবার হাঁক পাড়ে—'কই গো, এসো মা ইদিকে, দেখি তোমার মুখখান!'—

বাতাসীর শাশুড়ী এবার উৎসাহিত হয়ে বলে, ওঠে—'যাও বুন, সামনে যাও। আমাদের বাউনপাড়ার ঠানদি! তোমার মাতই কত্তো বুদ্ধি ধরে মাতায়! দেবতার তুল্য মান্যি করি ওনাকে!'

বাতাসীর মা নিরুপায় হয়ে ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে মাথা নীচু করে প্রণাম করে উঠতেই ঠানদি ঘোমটাটা টেনে ফেলে দিয়েই চমকে উঠলো। ভুরুটা কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েই বুড়ির দু-চোখে নামলো বিরাগের চিহ্ন, তার পরই বিড় বিড় করে বলে উঠলো—'ওঃ তুমিই তালে সেই!...'

তারপরেই পিছন ফিরে তাকিয়ে বলে উঠলো—'চলি রে জয়দেবের মা! আমারও যেমন ভীমরতি, যত্তো আদেখলার মা শুনেই সাত সকালে এত্তোটা পথ চলে এনু—'

ঠানদি দ্রুত পায়ে চলে যাবার পরই প্রতিবেশীদের মধ্যে মুখ-চাওয়াচাওয়ি শুরু হলো। শিকারী কুকুরের মতো সকলেই অজানা রহস্যের গন্ধ শুঁকতে লাগলো।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দাওয়া খালি।

শুধু বাতাসীর শাশুড়ী খানিকটা হক-চকিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা মনে মনে পড়ে নেবার চেষ্টা করলো। তার পরেই জোর গলায় বলতে শুরু করলো—হিংসে! আসলে হিংসে, জান বুন? পাড়াপড়শি, দা-দেইজিরা কখনও কি আর কারো ভাল দেখতে পারে? ঠানদির মুখখান দেখলে না, হিংসেতে চুপসে এতটুকু! হলো তো বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা—'

বাতাসীর মা শূন্য দৃষ্টিতে সামনের বাদার দিকে তাকিয়ে রইলো। ও জানে এখানেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবার নয়। তাই বোধ হয় নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিল। কোন একটা ঝড় ওঠার সম্ভাবনায় বাতাসীর মুখটাও শুকিয়ে গেছে ভয়ে। শাশুড়ীও বাতাসীর মায়ের মুখের চেহারা লক্ষ্য করে কোন কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়েছে মনে মনে। সারা সকালটা এই রকম থমথমে ভাবেই কাটলো। কিন্তু ঝড় উঠলো সেই দুপুরে।

ভোরবেলাতেই বাতাসীর খুড়শ্বশুর একটা বড় মাছ ধরে এনে ফেলে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ির দাওয়াতে। সংগে সংগে এও বলে গিয়েছিল—'বেশ ভালো করে ঝোল রাঁধিও তো বউঠান, চাট্টি ভাত খাবো—'

দুপুরবেলা খেতে বসার সময় সেই বিদ্রূপের ভংগীতে বলে উঠলো—'সকালে পুকুর থেকে যে শোলটা ধরে এনিচি, সেটা আর আমাদের দিওনি বউঠান তরকারির খাউড়ির পাতেই দিও! কলকেতার বিবি উনি, হাসপাতালে কাজ করেন, শোর গরু সবই চলে—'

বাতাসীর মা দাওয়ায় বাঁশের খুঁটি ধরে সে সময় দাঁড়িয়ে। তার সারা মুখের রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে। বাতাসীর শ্বশুর, শাশুড়ী আর ভাসুরের মুখটা টকটকে আগুনের মতো।

কয়েক মুহূর্ত অসহ্য নিস্তব্ধতা! তার পরেই ধুপধাপ পায়ের শব্দের সংগে সংগে বাতাসীর কচি গলার ঝংকার শোনা গেল— 'পুকুরের ধরা শোলটা আমার মা একলা খাবে কেন? আপনি ধরেচেন যখন আপনেই আগে খান!'

ঘোমটার ফাঁক থেকে কথাটা ছুঁড়েই বাতাসী ঝপ্ ঝপ্ করে কাঁসি থেকে গোটা পাঁচ-ছয় মাছের টুকরো খুড়শ্বশুরের পাতে ফেলে দিল। তার পরই কাউকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই ঘর থেকে পুঁটলিটা বের করে এনে তার মায়ের পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে বলে উঠলো—'তোর কি লজ্জা ঘেন্না পিত্তি কিছু নেই মা! তুই এখনও দাঁইড়ে শুনচিস এদের কতা!'

বাতাসী! তার ষোল বছরের বাতাসী! এই সেদিন পর্যন্ত যে কথায় কথায় নাকি সুরে মায়ের আঁচল ধরে কাঁদতো! মা বিস্ময়ের মতো তাকিয়ে রইলো। একটা চাপা কষ্ট, চাপা কান্না তার বুক ঠেলে বের হয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু অপমান লজ্জায় তার চোখটা জ্বালা করে উঠলেও এক ফোঁটা জল নেই তাতে। পুঁটলিটা এবার সে আস্তে আস্তে উঠিয়ে নিয়ে উঠোনে নামলো। উঠোনের বেড়াটা পার হয়ে শুধু শেষবারের মতো সতৃষ্ণ করুণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকাতেই শাশুড়ীর ঝাঁঝালো গলা শুনতে পেলো—'কলকেতার বিবি হয়েচো বলে কি এখন গেরস্তের কল্যাণ অকল্যাণ মানতে নেই...?'

বাতাসীর মা হেঁটে চলেছে মোহনপুরের হাটের পাশ দিয়ে, মল্লিকদের বাদা, গাজন-তলা, মিত্তিরদের আটচালা ছাড়িয়ে...!

মাথার ওপর ঘোমটা করে আঁচলটা ফেলা। তারই এক কোণ টেনে নিয়ে বার বার চোখ মুছছে সে। এতক্ষণে তার মুখ, কপাল, মাথার অর্ধেকটা ঢাকা পড়েনি। সে যে এক সময় গাঁয়ের বউ ছিলো, এই গাঁয়েরই পাশের গাঁয়ে যে তার শ্বশুরের ভিটে ছিলো তা যেন সে ভুলেই গেছে।

তার ঘোমটা ছিলো সেদিন, যেদিন পাঁচ বছরের বাতাসীকে সংগে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসছিলো কলকাতায়। পেটের দায়ে কোন কাজের সন্ধানে। সে আজ প্রায় ১০।১১ বছরের কথা। সেদিন তাকে স্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলো কতো জন! কত-জনে কত উপদেশ কত সান্ত্বনা দিয়েছিল। তারপর সেদিন পাঁচ বছরের বাতাসী যখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো—'আবার আসবো তো মড়মা?'—

—'নিশ্চয়ই আসবি বাবা, নিশ্চয়ই, বাপের ভিটে ইখেনে রইলো, আসবিনে?'

...সমস্বরে বলে উঠেছিলো। সে-দিনও বাতাসীর মার চোখে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু আজকের সংগে তার কতো তফাত! সেদিন ওদের আদরের আতিশয্যে বুকটা ভরা কলসীর মতো কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আজ একেবারে শূন্য। এই ভরদুপুরের প্রচণ্ড উত্তাপ আর তৃষ্ণার মতোই তার বুকটা মনটা জ্বলে যাচ্ছে। সে জানে কোথাও এতটুকু সান্ত্বনার আশ্রয় সে খুঁজে পাবে না। তাকে এইভাবে জ্বলতেই হবে বাকি কটা দিন।

ট্রেনের জানলার ধারে বসলো বাতাসীর মা। জানলা দিয়ে বাদার দিকে তাকিয়ে দেখলো বাদার প্রান্তে মেঘের ঢল নেমেছে। এখুনি হয়তো বৃষ্টি নামবে। ও একবার শেষবারের মতো প্রাণভরে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে তার গাঁ-কে।

হঠাৎ মেঘ ফুঁড়ে এক কুচি আলোর টুকরোর মতোই বাদার ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে কে যেন আসছে। তার গায়ে সাদার ওপর নীল ডোরাকাটা ছিটের জামা পরনে ধুতি আর বগলে বই-খাতা। ও কি জয়দেব? না অন্য কেউ? কি বলতে চায় ও? কি বলবে? কেন আসছে? কেন?

ট্রেনটা একটু কেঁপে উঠে চলতে শুরু করে দিয়েছে তখন। জোরে! আরও জোরে! বাতাসীর মা জানলা দিয়ে মুখ বার করে আরও ভালভাবে বাদার ওপর দিয়ে ছুটে আসা মূর্তিটাকে চেনবার চেষ্টা করে। লাইনের ধারের বড় বড় গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে তার মুখটা কখনও রোদ্দুরে চিক্-চিকে, কখনও ছায়ায় ঢেকে যায়।

মিনাডেক্স সুস্থ রক্ত, মজবুত হাড়, ও ভালো দৃষ্টির জন্যে!

বনস্পতির বৈঠক

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ ৪২ ॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রে 'রাধারাণী'র উল্লেখ করে তাকে অমরত্ব দান করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু রাধারাণীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওঠার পর থেকেই আমার মনে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কেননা তখনকার দিনে কতকগুলি শব্দ কানে উঠলে আমার মন অতিশয় বিরূপ ও ব্যথিত হয়ে উঠত। যেমন বেশ্যা, বারনারী, বারবনিতা, গণিকা, বারাঙ্গনা, রূপোপজীবিনী, কুলটা, ভ্রষ্টা, অসতী—ইত্যাদি। এ শব্দগুলি সবই কিন্তু পুরুষের সৃষ্টি। পুরুষ-সমাজপতিরা তাদের কথায়, বক্তৃতায়, সাহিত্যে, কাব্যে—যখন এই শব্দগুলি দরকার মতো ব্যবহার করে তখন পুরুষ-শাসিত সমাজের মেয়েরা সেগুলি চুপ করে শোনে। কেন চুপ করে থাকে, প্রশ্ন সেইখানে। উপরিউক্ত শব্দগুলির একটিও মেয়েদের সৃষ্টি নয়, বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেন তারা চুপ করে থাকে, কেন ওই ধরনের আলোচনায় যোগ দেয় না, কেন পতিতা নারীদের জীবন তারা বিশ্লেষণ করতে চায় না,—এটি মেয়েরা নিজেরাই জানে। পুরুষের আধিপত্যের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তৎকালে কোনও মেয়ের এমন সাহস **ছিল না যে, তারা মুখ খোলে!**

মেয়েদের কপালে সুখ্যাতির তিলক অথবা কলঙ্কের দাগ চিহ্নিত করে দেওয়া একমাত্র পুরুষেরই অধিকার ছিল। তখনকার কাব্য বা সাহিত্যেও এই মূলনীতি পাকা হয়ে থাকত। সেই কারণে একদা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা, বউ ঠাকুরাণীর হাট, চোখের বালি, ঘরে বাইরে' প্রভৃতি কাব্য ও গ্রন্থ ঝড় তুলেছিল রক্ষণশীল পুরুষ সমাজে, কিন্তু মেয়েরা রবীন্দ্রনাথের এই বইগুলি পড়ে আনন্দ পেয়েছিল। অঙ্গনা মানে মেয়ে এবং তাকে হতে হবে সতী মেয়ে! সে গৃহের গণ্ডির মধ্যে থাকে, তাই সে গৃহাঙ্গনা। কিন্তু গণ্ডীর বাইরে গেলেই তার নাম বরাঙ্গনা থেকে হল বারাঙ্গনা। এর

প্রবীণ কথাসাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী রচিত আত্মস্মৃতি
"ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর"
আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

পিছনের আইডিয়াটা হল, পুরুষের 'সেন্স অফ পজেশন' এবং সম্পত্তিবাদ। পুরুষ কখনও মেয়েকে বিশ্বাস করেনি এবং একা বাইরে যেতে দেয়নি, পাছে তার ওই 'সেন্স অফ পজেশনে' আঘাত পড়ে, পাছে তার আপন ঔরসজাত 'পুত্র সন্তান' পিতার সম্পত্তি না পায়, পাছে 'ক্ষেত্রজ' অন্য কেউ পায়! এই কারণে মেয়েদেরকে ঘরের মধ্যে পুরে রেখে তাদের ওপর 'দেবীত্ব' আরোপ করা হত। কিন্তু দেবী হওয়া সত্ত্বেও মেয়েরা সম্পত্তি লাভ করত না—সে মেয়ে জননী, জায়া, কন্যা, ভগিনী যাই হোক না কেন। তাদের জন্য থাকত শুধু 'খোরপোশের' ব্যবস্থা।

কিন্তু বারবনিতাদের কথা ছিল স্বতন্ত্র। **এরাও ত দেশেরই মেয়ে,—এদের কেউ আকাশ থেকে পড়েনি! এরা পুরুষেরই সৃষ্টি, আবার পুরুষের চোখেই ঘৃণ্য!** কলকাতার প্রথম পত্তনকালে এদেরকেই সৃষ্টি করেছিল যারা, তারা রাজা, মহারাজা, জমিদার, জড়োয়া জহরৎ ব্যবসায়ী, জাহাজের মালিক, পাটোয়ারী, বৃটিশের প্রথম আমলের যোগানদার এবং তখনকার বিভিন্ন অভিজাত শ্রেণী। এই বারবনিতাদের গর্ভে এসেছিল হাজার হাজার সন্তান। তারা ভিন্ন পরিচয় নিয়ে কালক্রমে বিবাহসূত্রে নানা সমাজে মিলিয়ে গেছে।

পরবর্তীকালে পতিতাদের মধ্যে বহু মেয়ে এসেছিল ভদ্র ও স্বল্পবিত্ত সমাজ থেকে। তারা তাদের পারিবারিক পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করত, এবং নিজেদের প্রকৃত নাম-ধাম বদলিয়ে রাখত শোভন সুরুচির দায়ে। ওদের মধ্যে বহু মেয়ের ইতিহাস হল উৎপীড়নের, অপযশ রটনার, অভাব-অনটনের, কঠোর শাসনের, অরক্ষণীয় অবস্থার, দুরারোগ্য ব্যাধির, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার, পদস্খলনের বা গৃহবিতাড়নের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ অভিভাবকরা ওদেরকে তাড়িয়েছে। মা কেঁদেছে, ভাই-বোন, আত্মীয় পরিজন কেঁদেছে,—কিন্তু পুরুষের কঠিন নির্দেশের ফলে নিরুদ্দিষ্ট জীবনের মধ্যে তাদেরকে চলে যেতে হয়েছে। ওদের মধ্যে বহু মেয়ে সুশ্রী ও শিক্ষাসম্পন্না, বহু মেয়ে সম্ভ্রান্ত সমাজের। পিতার কন্যাদায়, স্বামীর সন্দেহ, শাশুড়ির অনাচার, সতীনের দুর্ব্যবহার, অন্যায়ের আস্ফালন—প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে আহত প্রত্যাহত হয়ে মেয়ে বা বাড়ির বউ সংগোপনে বৃহৎ মুক্তির দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যাও কাজ করেছে অনেক। স্বল্পশিক্ষিত বেকার স্বামী বা সহোদর, সন্তান

লতিকা দত্তের
কফি হাউস—৩৲
'যৌবন-জল-তরঙ্গে'র উচ্ছ্বাস এসে নাকে মুখে চোখে লাগে। সংগে গভীর চিন্তা ধারার নিগূঢ় ইঙ্গিত অনুভূতি ছুঁয়ে যায়।
বকুল সেন—৫৲
(বসন্ত গৌরী দত্ত—ছদ্মনামে লেখা)
বকুলের প্রেম কথা ভাবে ও ভাষায় একটি অতি মধুর কবিতা।
বুক ফ্রেণ্ড
৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
(সি ১৭৮২)

প্রোটিন—আপনার চুলের একান্ত প্রয়োজনীয় খোরাক।

সমস্ত বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে একমত, যে আপনার চুল সুস্থ রাখার জন্যে অবিরামভাবে প্রোটিনের প্রয়োজন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে, আপনার মূল্যবান চুলের প্রায় সবটাই তো প্রোটিন! দুঃখের বিষয়, আবহাওয়া, বাতাস, আর এমনকি সূর্যের তাপও আপনার চুলের এই প্রোটিন ক্রমশঃ হরণ করে নিচ্ছে। একাজে যোগ দিচ্ছে বহু কৃত্রিম জিনিষ, যেমন, ড্রায়ার, ব্লীচ, ক্ষারযুক্ত সাবান ইত্যাদি ধোয়ার জিনিষ, ধাম আর নানান পচা তেল—ফলে, আপনার চুল থেকে প্রোটিন নিঃশেষ হ... দিয়ে চুল হচ্ছে মৃত, শুষ্ক আর নিষ্প্রভ! একমাত্র প্রোটিনের পুষ্টিই আপনার চুলের সজীবতা, ঘনত্ব আর ঝলমলে সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে পারে।

টিয়ারা এগ শ্যাম্পু আপনার চুলে যোগায় সবচেয়ে স্বাভাবিক ধরণের প্রোটিন।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাজা ডিম দিয়ে তৈরী এই শ্যাম্পুতে আছে—অ্যালবুমেন আর একান্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন এ আর ডি। টিয়ারা এগ শ্যাম্পুর ডিমের প্রোটিন স্বাভাবিক পুষ্টি যুগিয়ে আপনার চুলের ক্ষতিপূরণ করে। নিয়মিত ব্যবহার করলে, টিয়ারা এগ শ্যাম্পুর প্রোটিন চুলওঠা আর চুল চিরে যাওয়া বন্ধ করে, চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করে তোলে ফলে চুল হয়ে ওঠে ঘন, উজ্জ্বল আর ঝলমলে সুন্দর!

টিয়ারা এগ শ্যাম্পু আপনার চুলকে দেয় স্বাস্থ্যে ভরপুর বৃদ্ধি আর উজ্জ্বলতা।

আপনার চুলের জন্যে, টিয়ারা এগ শ্যাম্পুর প্রোটিন-সমৃদ্ধ কোমল ফেনা—অন্য যেকোনো সাধারণ শ্যাম্পুর চেয়ে অনেক বেশী উপকারী! এ আপনার চুলকে দেয় স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে ভরপুর বৃদ্ধি আর উজ্জ্বলতা! আপনি পান কোমল, সহজে আয়ত্তে আসে এমন ঝলমলে সুন্দর ঘন চুল।

প্রোটিনের ঘাটতি হলে চুলের ডগা চিরে যায়। চুল প্রাণহীন নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

প্রোটিনের পুষ্টিতে ভরপুর চুল—চিরে যায় না, স্বাভাবিক স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি আর উজ্জ্বলতায় ভরে ওঠে।

৪টি সাইজে পাওয়া যায়:
১০০ মিলি
১৫০ মিলি—পলিপ্যাক
২০০ মিলি
এছাড়া, নতুন যুগান্তকারী ৭০ মিলি স্বচ্ছ প্লাস্টিকের শিশিতে—দাম মাত্র—৩ টা: ৭৫ প:*
*নির্ভর করবে স্থানীয় করের ওপর

চুলের স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি আর উজ্জ্বলতার জন্যে প্রোটিন সমৃদ্ধ

টিয়াঁরা এগ শ্যাম্পু!

ভারতে তৈরী করেন—
জে. কে. কেমীস কাটিস লিমিটেড, বোম্বে-১

ARMS-HC-022-144-BG.

সংখ্যা বৃদ্ধি, পিতা বা শ্বশুরের পুঁজির অভাব, উপার্জনের সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা—এসবগুলি একত্র করলে দেখা যেত ঘরের মধ্যে মেয়েদের ভাগেই উচ্ছিষ্ট অন্নের পরিমাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে। বলা বাহুল্য, দেশের চারিদিকে জীবনের এই ভয়াবহ পঙ্গুতার মধ্যেও এই দুঃসহ অর্থনৈতিক দুর্গতি সকল পারিবারিক সম্পর্ককেই যুগের পর যুগ ধরে নিয়ন্ত্রিত করে চলত। কিন্তু এর প্রধান আঘাত পড়ত পুরুষশাসিত মেয়েদের জীবনে। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে মেয়েদের কপালে জুটত নিগ্রহ, কৃচ্ছ্রতা, অসম্মান এবং অনাচার। এগুলির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাদের অনেকে বেরিয়ে পড়ত যেদিকে দু'চোখ যায়। মহাষ্টমীতে, গ্রহণস্নানে, পাল-পার্বণে ভিড়ের ভিতর দিয়ে বহু মেয়ের নিখোঁজ হয়ে যাবার ইতিবৃত্ত তৎকালে অনেকেই শুনত।

আরেকটু বলি। কলকাতা বা মফঃস্বলের শ্রেষ্ঠ নাগরিক, সমাজের নামজাদ অভিভাবক জমিদার বংশের শাখা-প্রশাখা,—এঁদের ভিতর থেকে কত রূপলাবণ্যময়ী নিরুপায় নারী 'বেরিয়ে' এসেছে। বন্দিনী অবস্থা থেকে মেয়েরা কেউ মুক্তি নিলে বলা হত 'বেরিয়ে' গেছে। খাঁচার দরজা খুলে সে পালিয়েছে, শিকল ছিঁড়ে বেরিয়েছে, শাসন-বাঁধন অস্বীকার করেছে! শাস্ত্রে নাকি বলেছে বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী প্রৌঢ়ত্বে পুত্র, বার্ধক্যে পৌত্র. এদের দ্বারা রক্ষণ-বেক্ষণের বাইরে মেয়েদের স্বাধীন সত্তা নেই। মেয়েরা হবে পরাশ্রিতা পরান্ন-ভোজিনী, পরপদানুগতা ও পরার্থ-সেবিকা,—এই তাদের একমাত্র পরিচয়। ওদের নাম হবে তখন সতীসাধ্বী গৃহ-লক্ষ্মী! ওরা কদন্ন খাক, রোগে ভুগুক, সূতিকায় বা যক্ষ্মায় মরুক, অমানুষ স্বামীর অনাচারে নিগৃহীত হোক,—কিন্তু ওরা গৃহলক্ষ্মী! সংসারে ওদের একমাত্র দাবি হল 'খোরপোশ।' অর্থাৎ ভাত আর কাপড়। অর্থ বা সম্পদ থেকে ওরা বঞ্চিত। অনাহারে বা অনাচারে ওদের যখন অকাল মৃত্যু ঘটে, তখন ওদের মাথায় সিঁদুর মাখিয়ে ফুলের তোড়ায় সাজিয়ে চিতায় তোলা হয়। তখন সবাই বলে, আহা, পুণ্যবতী! অর্থাৎ বহু পুণ্যের ফলে এই অপমৃত্যু!

মেয়েদের এই প্রকার দুর্দশার একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে একদা একটি ছোট উপন্যাস লিখে নাম দিয়েছিলুম, 'দেবীর দেশের মেয়ে।' এটিকে সিনেমা চিত্রে রূপান্তরিত করার জন্য ১৯৩৪-এর এক সময়ে সুধীর বসু নামক এক উৎসাহী ভদ্রলোক এটি কিনে নেন।

এই সময়ে একটি তরুণ বালক প্রায়ই আমার খোঁজে আসত। কিন্তু আমি তৎকালে সর্বদাই ব্যস্তবাগীশ। একদিন দুপুরে ছেলেটিকে বাইরের ঘরে বসালুম। ছেলেটি লাজুক, অমায়িক এবং মিষ্টভাষী। বয়স চোদ্দ পনেরো হবে। সে আসে ভবানীপুর থেকে। এসে এসে ফিরে যায়। তার এই অধ্যবসায় দেখে আমি অবাক হয়েছিলুম। কিন্তু আরও অবাক করল একটি বিষয়ে। সে আমার কোন কোনও বই থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্থ বলে যেতে লাগল। এ ধরনের স্মরণশক্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। বয়সে সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু সেই থেকে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এই তরুণ সুকুমার বালক একজন সুলেখক হয়ে ওঠে। তার নাম সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

আরেকদিন আসে একটি নবীন যুবক। তাকে দেখে আমি থমকিয়ে গিয়েছিলুম। এমন রূপবান, স্বাস্থ্যবান, প্রিয়দর্শন ও লাজুক যুবক বোধ হয় এর আগে দেখিনি। ঠোঁট দুটি সুন্দরী নারীর মতো রাঙাটে, দাঁতগুলি ঠিক মুক্তো এবং বড় বড় কাচ নধর চোখ। পুরুষের এই সুন্দর শ্রী ও স্বাস্থ্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পরিচয় দিল, সে আমাদের বন্ধু পবিত্র গাঙ্গুলীর সম্পর্কে ভাগ্নে এবং তার নাম অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়। সে থাকে এই কাছেই এক বস্তিতে একটি চালাঘরে। কিন্তু তার কথাবার্তার মধ্যেই জানাল, ভাগ্যের ভয়াবহ বিদ্রূপ তার সঙ্গেই রয়েছে! পড়াশুনো তাকে বন্ধ রাখতে হয়েছে, কারণ তার বাঁচবার কোনও প্রকার আশা নেই।

আমি আঁতকিয়ে উঠলুম,—কেন?

এই লাজুক ও বিনীতস্বভাব যুবকটি যখন জানাল, সে অতিশয় কঠিন যক্ষ্মা রোগে ভুগছে এবং প্রতি সন্ধ্যায় জ্বর এবং যখন-তখন রক্ত বমি হচ্ছে, আমি শুনে পাথর হয়ে গেলুম! সে শুনেছে কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় কোন স্টেটের ট্রাস্টির চেয়ার-ম্যান এবং এই স্টেটের খরচে দার্জিলিংয়ের লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়ামে দুটি বেড নেওয়া আছে। আমি যদি সুরেনবাবুকে এ বিষয় একটু বলি। ওখানে চিকিৎসা, ঔষধ-পথ্য ইত্যাদির সুবিধা আছে।

আমি সেইদিনই বিকালে আলিপুরে সুরেনবাবুর বাড়িতে হাজির হয়েছিলুম। অমিয়জীবনের এই সুন্দর রূপ, স্বাস্থ্য, যৌবনশ্রী—এর জন্য সেদিন আমি অনেক দূর যেতে পারতুম! সুরেনবাবু ছিলেন আমার খুবই শ্রদ্ধেয় বন্ধু। তিনি সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন। দার্জিলিংয়ে থাকাকালীন বহুদিন অবধি অমিয়র বাঁচবার আশা ছিল না। এর অনুপর্ব আমি লিখেছি 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থে। তখন

কবিতা সিংহের নতুন স্বাদের উপন্যাস

চারজন রাগী যুবতী ৫.00

বাংলা সাহিত্যের রাগী যুবকদের চরিত্র অনেকেই এঁকেছেন। কিন্তু রাগী যুবতী? এই প্রথম, এই জ্বলন্ত সময়ের শিকার, এই অস্থির সময়ের সঙ্গে সংগ্রামে রত, সন উনিশশো তিয়াত্তরে যারা সতেরো পেরিয়ে আঠারোয় পড়ছে, তেমনি চারজন রাগী যুবতীর কথা লিখেছেন কবিতা সিংহ। তাদের প্রেম, ঘৃণা, প্রয়োজন, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, প্রতিহিংসা ও সময়চেতনার বর্ণচ্ছটাময় একটি বিস্ফোরিত মুহূর্ত; লেখিকা জ্বালিয়ে দিয়েছেন, তাঁর তীক্ষ্ণ, তীব্র তপ্ত গদ্যে।

বাসুদেব বসুর নবতম রচনা
রাজগৃহে রাজা নেই ৪.
কাঁদিছে মৃত্তিকা ৫.00

শক্তিপদ রাজগুরুর নতুন উপন্যাস
স্বর্ণ মৃগয়া ৪.00
বনে বনান্তরে ৭.00

পরিচয় গুপ্তের রহস্যোপন্যাস
রহস্যের ধোঁয়া ৫.00

মণিভূষণ আচার্যের নতুন কবিতার বই
ধর্মদা আর কতদূর ৪.

সুশীলকুমার নাগের নতুন উপন্যাস
দ্রৌপদী প্রেম ৬.00

নটরাজনের সাড়াজাগানো গ্রন্থ
ওরা সেই পুলিশ ১২.00

অমরনাথ রায়ের নতুন গল্পগ্রন্থ
রাশিয়ার ভালো ভালো গল্প ৩.00

পূর্ণ প্রকাশন : ৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা—৯ ॥ ফোন ৩৪-৯৫৯২

(সি ১১৫৫৪)

বিনাকা ফ্লোরাইড* টুথপেস্ট দাঁতের যন্ত্রনাদায়ক ছিদ্র ও ক্ষয় প্রতিরোধ করে

আপনার কি বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে দাঁত মাজা উচিৎ নয় ?

দন্তচিকিৎসক ও গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিকগণের সুনিশ্চিত অভিমত

* "এখন আমরা জানি দাঁতের ক্ষয় রোধের প্রধান উপাদান হ'ল – ফ্লোরাইড – দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে গবেষকদের এটি একটি বিরাট অবদান —"

চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকার সংবাদ (দি মেডিসিন এণ্ড সার্জন VIII ২৫২ – ৫৭ ফেব্রু: ১৯৬৭)

শক্ত ও মজবুত দাঁতের জন্য বিনাকা টুথপেস্ট দিয়ে নিয়মিত দাঁত মাজুন।

বিনাকা টুথব্রাশের কুচির ডগাগুলি গোল করে ছাঁটা থাকে—সেজন্য দাঁতের মাড়ি ছড়ে যাওয়ার ভয় থাকেনা।

CIBA

ULKA-CF-33 BN

কথায় কথায় না ছিল এক্স-রে, না স্ট্রেপটোমাইসিন, পেনিসিলিন, না বা ডাঃ সেলম্যান ওয়াকসম্যানের অ্যান্টিবায়োটিক কোনও ওষুধ। যক্ষ্মারোগ মানে তখন অবধারিত মৃত্যু। কিন্তু এই নিশ্চিত মৃত্যুর থেকে একদা বেঁচে উঠেছিল অমিয়জীবন। পরবর্তী বহু বছর পরে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালে অমিয়কে নানা লেখাপড়ার কাজ দিয়ে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

এমনি একটা সময় আমার নামে একটি খুব হাল্কা পার্সেল এল। হাতে নিয়ে দেখি, বিহারের পাসা ইনস্টিটিউট থেকে পাঠিয়েছেন রমলা দেবী। খুলে দেখি একটি ছোট সাবানের বাক্সর মধ্যে কয়েকটি রক্ত-নীল বর্ণের গোলাপ ফুল। এখনও বাক্সের মধ্যে কিছু মুখচোর গন্ধ রয়েছে। ফুল-গুলির তলায়, পাতিকরা একখানা চিঠি। চিঠির ভিতরকার সেই একই সম্ভাষণ এবং প্রায় একই ভাষা আমার মনে ক্লান্তি এনে-ছিল। তবু প্রাপ্তি স্বীকার করে একটি পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দিলুম। এ মহিলা কত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন, এই ভেবে আমি আড়ষ্ট হচ্ছিলুম।

এরই মধ্যে একদিন এক সৌম্যকান্তি ও পরিণত বয়স্ক ভদ্রলোক এসে হাসিমুখে যখন বললেন তাঁর নাম হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি তাঁকে সাদরে ঘরে বসিয়ে ক্ষমা চেয়ে জানালুম, আপনার চিঠির জবাব দিতে পারিনি, সেজন্য আমি খুবই লজ্জিত। ভদ্রলোক আমার সাহিত্য ও ভ্রাম্যমান জীবনের নানা খবর রাখেন। এক সময় তিনি কাজের কথায় এলেন। হেমবাবু বর্তমানে নদীয়ার মহারাজার বাড়িতেই থাকেন অনেকটা অভিভাবকের মতো এবং তাঁদেরই নির্দেশে উনি আমার সঙ্গে যোগা-যোগ করেছেন। তাঁদের আমন্ত্রণ যদি গ্রহণ করি এবং এখনই যদি একবারটি সেখানে যাই তবে সকলে খুশী হন। হেমবাবু গাড়ি এনেছেন।

তখন বেলা তিনটে। আমি রাজি হলুম এবং ভিতরে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে এলুম। গাড়ির ড্রাইভারের সাজসজ্জা রাজবাড়িরই উপযুক্ত।

আধ ঘণ্টার মধ্যে যে-অঞ্চলে এলাম, সেটি আমার খুবই পরিচিত পল্লী। ঝাউ-তলার ঠিক মোড়ে কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর বাড়ির একেবারে মুখোমুখি। গেটের ভিতর দিয়ে বাগান পেরিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল পর্চ-এর নিচে। বাড়িটি একতলা বটে তবে বিশাল অট্টালিকা। প্রথমে দেখলুম একটি সুশ্রী কিশোর বালক, মুখখানি যেন হাসির মাধুর্যে ভরা। ছেলেটির নাম সৌরীশ অথবা সৌরেশ। ওরই পিতা মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় মহাশয় কিছুকাল আগে অকালে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্ত্রী মহারানী জ্যোতির্ময়ী দেবী এই ছেলেটিকে নিয়ে এই বাড়িতেই থাকেন। আমাকে ওই ছেলেটির কাছে গল্পগুজবে বসিয়ে হেমবাবু অন্দর মহলে গেলেন এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মহারানী এসে দাঁড়ালেন চিকের আড়ালে। এবার মধ্যস্থ হয়ে হেমবাবু বললেন, মহারানী একখানি উপন্যাস লিখেছেন সম্প্রতি, আপনি যদি সেখানি একটু দেখে-শুনে দেন।

সবিনয়ে আমি বললুম, এ ধরনের কাজ আমি ত কখনও করিনি, তবে পাণ্ডুলিপিটি হাতে পেলে অবশ্যই পড়ে দেখতে পারি।

মহারানীর হাতেই ছিল দুখানা মোটা ও কালো রংয়ের এক্সারসাইজ খাতা। হেমবাবু সেই দুখানা খাতা এনে আমার সামনে রাখলেন। আমি তার পাতা উল্টিয়ে পড়তে বসে গেলুম। আমি কয়েকবার বই সম্পাদকতা করেছি, সুতরাং লেখার ধরন পরীক্ষা করার অভিজ্ঞতা আমার কিছু আছে। ঘণ্টাখানেক খুঁটিয়ে পড়ে আমি হেমবাবুকে বললুম, মহারানী উপন্যাস রচনায় অভ্যস্ত নন, সেই কারণেই লেখাটা ঠিক জমে ওঠেনি! মাতৃস্নেহ হল এ গল্পের মূলে ভিত্তি। তা হোক। যে কোনও বিষয়-বস্তু নিয়েই লেখা চলে। কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গি বা রচনার দক্ষতাই প্রধান কথা। এই বইটিতে তার একটু অভাব রয়েছে।

হেমবাবু আবার অন্দরমহলে গেলেন এবং মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে বললেন, মহারানী খুশী হন যদি আপনি বইটি সংশোধন করেন, কিংবা আরেকটু গুছিয়ে এটিকে তৈরি করে দেন। ওঁর খুব ইচ্ছে যদি আপনি এখানে নিয়মিত এসে কাজ করেন; আমাদের গাড়ি যাতায়াত করবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে খাতা দুখানা নাড়াচাড়া করে ভাবতে বসলুম। কাজটি বিনা পারিশ্রমিকের নয়, এবং রাজা-রাজড়ার বাড়িতে তার পরিমাণও কম নয়! আমি রাজী হয়ে গেলুম এবং সপ্তাহে দুই তিনবার আসা-যাওয়া করতে লাগলুম। কাজটি শেষ করে দিতে আমার বহুদিন লেগেছিল। আমার গল্প নিজের মনে বসতে সময় লাগে বইকি। কিন্তু ছুটো-ছুটিতে সাহিত্য হয় না। অবশেষে মহারানী বিশ্বাস করে খাতা দুখানা আমার হাতে একদিন ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমার বিবেচনা ছিল এই, বইটি ছাপা হবে সম্ভ্রান্ত সমাজের এক মহিলার নামে। সুতরাং এই বইয়ের প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্য আমাকে অত্যন্ত সতর্কভাবে বসাতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ওই গ্রন্থের বিষয়বস্তু, প্রতিপাদ্য বা পরিণতির সঙ্গে আমার মনের কোনও যোগ ছিল না। কিন্তু মহারানী আমার কাজে খুশী হয়েছিলেন। ওইখানেই আমার সঙ্গে ওঁদের প্রায় দেড় বছরের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। মহারানীকে আমি কোনদিন সুস্পষ্ট-

এ বাদল তু ইৎনা না বরস যো ও আ না সকে,
ও আ যায়ে তো ইৎনা বরস ও যা না সকে॥

মানে—হে বর্ষা, এত বেশী ঝরো না যে আমার প্রেয়সী আমার কাছে আসতে না পারে। ও এসে যাওয়ার পর এত মুষলধারায় ঝরো যে ও যেন যেতেই না পারে!

বহু বিখ্যাত উর্দু কবিদের এমন একশটি 'শের'-এর সংকলন ও অনুবাদ করেছেন

শচীন ভৌমিক

শের শায়েরী

অনবদ্য অলঙ্করণে এই অভূতপূর্ব কাব্যগ্রন্থ লাইনো টাইপে, সুন্দর কাগজে, সৌখীন মোড়কে

প্রকাশিত হ'ল ॥ দাম : ৫·০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯।১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলি-৯

(সি ১১২০৩/২)

রেশমের জামাকাপড় ধোয়ার জন্যে দরকার বিশেষ যত্ন

জেণ্টীল

রেশমের জামাকাপড় আর 'টেরীন', নাইলন, রেয়ন, প্রভৃতি সিন্থেটিক কাপড় খুব সূক্ষ্ম জিনিস। এগুলো খুব সাবধানে ধুতে হয় আর তার জন্যে দরকার শুধু জেণ্টীল। জেণ্টীল আপনার শাড়ী, অন্তর্বাস, শার্ট, স্কার্ফ প্রভৃতি নরম কাপড়ের বিন্যাস ও চাকচিক্য বজায় রাখে। জেণ্টীল দিয়ে বাড়িতে নিরাপদে আপনার নরম জামাকাপড় ধুয়ে নিন।

জেণ্টীল বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী করা হয়েছে আপনার নরম জামাকাপড় ধোয়ার জন্যে—রেশমের কাপড়, সিন্থেটিক কাপড়, পশমের কাপড়—সব। জেণ্টীল আপনার জামাকাপড় ভালো ক'রে···সব ময়লা দূর ক'রে নতুনের মত মোলায়েম, ঝরঝরে ঝলমলে ক'রে রাখে।

জেণ্টীল—নরম জামাকাপড় সবচেয়ে নিরাপদে বাড়িতে ধোয়ার জন্যে

Shilpi HPMA 84A Ben

ভাবে চোখেও দেখিনি। শুনেছি অন্যদিকে তিনি রাজা কমলারঞ্জনের ভগ্নি।

এর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে চন্দননগরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এক অধিবেশন বসে। রবীন্দ্রনাথ তখন ওখানকার গঙ্গার ঘাটে এক সুন্দর নৌকায় বসবাস করছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যকার, পণ্ডিত ও অ্যাটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। ওই অধিবেশনে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী প্রমুখে কয়েকজন লেখিকা ও বহু লেখক যোগদান করেছিলেন। আমার পাশেই বসেছিল ভবানী মুখোপাধ্যায়। যাই হোক, এই সম্মেলনে সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তি গঙ্গাতীর থেকে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন। কবি এসে একটি মনোজ্ঞ ও স্মরণীয় ভাষণ দান করেন। সম্মেলনের সেইটিই ছিল সকলের বড় সাফল্য। ওই একই দিনে মণ্ডপের পিছন দিকে একটি পৃথক মহিলাসভা বসে, এবং শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী তার সভানেত্রী হিসাবে আমাকে সামান্য কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ করেন। কী বলেছিলুম আমি, এখন আর মনে নেই। কিন্তু তার জন্য আজও আমি অনুতপ্ত এই কারণে যে, সাহিত্যের রক্ষণশীলতার আলোচনায় শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবীর সঙ্গে আমার একটি বিতর্ক বেধে ওঠে।

অতঃপর ওই সম্মেলনের সভাপতি দত্ত মহাশয় তাঁর ভাষণে তৎকালীন তরুণ সাহিত্যকে অতি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করছিলেন, এবং সেই সূত্রে এই অবজ্ঞাত সাহিত্যকে 'যৌনপ্রবৃত্তির চণ্ড চংক্রমণ'—এই আখ্যা দেন। তিনি বলেন, সাহিত্যের এই চরম দুর্গতির কালে আশার কথা এই, কোথাও কোথাও মহৎ সাহিত্যও সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি তাঁর পরম কল্যাণীয়া নদীয়ার মহারানী জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখিত 'মাতৃস্নেহ' (?) উপন্যাসটির উল্লেখ করে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন!

ভবানী আমার গায়ে চিমটি কেটে কুলকুলিয়ে হাসছিল। সে সবই জানতো। তবে মহারানী তাঁর বইয়ের নামটি ঠিক কী দিয়েছিলেন, এটি আমি ভুলে গেছি।

কিন্তু ওই সম্মেলনের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবার সুযোগ আমি ছাড়িনি। অবেলার দিকে সভা যখন বেশ সরগরম, তারই এক ফাঁকে পিছলিয়ে বেরিয়ে আমি সোজা চলে গিয়েছিলুম গঙ্গার ধারে কবির বজরার কাছে। খবর দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবি তাঁর অনুমতি পাঠিয়ে দিলেন। আমি নৌকায় উঠে এলাম। ভিতরে কবি একা, একখানা চেয়ারে বসে রয়েছেন। পাশের টিপাইতে কিছু কাগজপত্র রাখা। তখন নব বসন্ত সমাগমে গঙ্গার উপর দিয়ে মৃদুমন্দ সমীরণ বয়ে চলেছে। আমি মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকে নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। বললুম, আপনার আজকের ভাষণটি শুধু সম্মেলনকেই নয়, সমস্ত বাঙালী সমাজকে অনুপ্রাণিত করবে। আমরা যেন গঙ্গায় অবগাহন স্নান করলুম!

কবি প্রসন্ন মুখে একবার তাকালেন। তারপর তাঁরই ভাষণটির সূত্র ধরে বললেন, জীবনের গতি আছে বলেই সাহিত্যের গতিকে দেখতে পাই। মানুষের মন বসে থাকে না। সে এগিয়ে চলে বলেই নিজের খাদ্য খুঁজে পায়!

আমি স্থির হয়ে বসে ছিলুম শতরঞ্চির উপর। আমার সামনে রয়েছে গৌরীশৃঙ্গের চূড়া! সমস্ত আত্মাভিমান ভুলে যেতে হয় এই বিরাট পুরুষের পায়ের কাছে এসে বসলে—নিজেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হতে থাকে।

সেই অল্পকালটুকুর মধ্যে কবি রাজনীতি, সমাজজীবন এবং সাহিত্যের অন্যান্য আলোচনার কথা তুললেন। মিনিট পনেরো বড় জোর। কিন্তু ওই কথাবার্তার মধ্যেও তিনি সর্বাধুনিক সাহিত্যের কথা তোলেননি। সেই সময়ে তারাশঙ্করের নব প্রকাশিত একখানি ছোট গল্পের বইয়ের খুব নাম হয়েছিল। বইখানি তাঁর হাতে এসেছিল, এবং তিনি গল্পগুলির খুবই প্রশংসা করে এক সময়ে বললেন, তুমি দেখে নিয়ো এই নতুন লেখক একদিন অনেকের মাথা ছাড়িয়ে উঠবে!

কবির ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি!

সেই রাত্রেই আমি তারাশঙ্করকে কবির কথাগুলি জানিয়ে দিয়েছিলুম।

এমনি একটা কোন্ সময়ে রজনী মুখার্জির সঙ্গে আমার আলাপ হয় এবং সেই আলাপ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। রাজনীতি বিষয়ে রজনীর পড়াশুনো এবং পাণ্ডিত্য যথেষ্ট। সে তখন রাজনৈতিক কর্মী, অতিশয় মিষ্টভাষী এবং অমায়িক। সে

ডাঃ এস এন পাণ্ডে'র
মডার্ণ
এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ৭০০
এ্যানাটমি শিক্ষা ১০'০০
আদিতা প্রকাশালয় ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২.
(সি ১১৪২২)

আপনার মুখ-শ্রীর অনুরাগী অনেক
আপনার ত্বকের শত্রু-ও বহু
পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার মস্ত সহায়
প্রত্যহ ব্যবহার করুন নতুন রূপের পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম। হাওয়া, ধুলো-বালি আর আবহাওয়ার প্রবল প্রকোপ থেকে আপনার গায়ের ত্বক সুরক্ষিত থাকবে আর সেই সঙ্গে হয়ে উঠবে লাবণ্যমণ্ডিত। এর বিশেষ হিউমেকট্যান্ট উপাদানটি ত্বকের স্নিগ্ধতা বজায় রাখে, কিন্তু ত্বক তেলতেলে হতে দেয় না। বরং ত্বককে ক'রে তোলে ঝরঝরে মসৃণ। তাছাড়া পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম যেমন একটি অনবদ্য পাউডার বেস তেমনি আবার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সৌন্দর্য প্রসাধন। আপনার ত্বকের প্রয়োজন স্নেহভরা নিবিড় যত্ন— তার চাই নতুন রূপে পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম।
নতুন রূপে পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম
আদর্শ পাউডার বেস
POND'S
VANISHING CREAM
চীজব্রো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড
(সীমিত দায়িত্বসহ ইউ.এস.এ.-তে সংস্থাপিত)

বিবাহ করেছে শ্রীমতী আরতিকে—যে মেয়েটি জেলে যাবার আগে বিচারককে কঠিন বাক্য শুনিয়েছিল! আমার ভগিনীপতির বন্ধু হিসাবে আমিও শ্রীমতী আরতির 'ছোট মামা'। রজনী ও আরতি—দুইজনে মিলে ওদের নতুন ঘরকন্না পেতেছে।

ওদের বাসাবাড়িতে সেদিন আমার ডাক পড়েছিল।

ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই রজনী হাসিমুখে এগিয়ে এল এবং সামনের ঘরে যে মহিলারা কথাবার্তা বলছিলেন তাঁদের ভিতর থেকে শ্রীমতী আরতি উঠে এসে বলল, আসুন ছোট মামা, এঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।

ঘরের মধ্যে শান্ত ও স্থির হয়ে বসে রয়েছেন এক বৃদ্ধা। তাঁর সেই অভিজাত [illegible] এবং ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক [illegible] একটি মুহূর্তেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। [illegible] নেই। [illegible] কয়েকটি [illegible]। তিনি বিধবা। তাঁর পাশে বসে রয়েছেন এক পরিণত যৌবনা মহিলা। [illegible] সরু পাড় [illegible]। তিনিও বিধবা। [illegible] তাঁর বড় বড় চোখ যেন [illegible] দিকে তাকালে [illegible]। আমি রজনীর পাশে গিয়ে [illegible] বসলাম।

আরতি প্রথম পরিচয় করিয়ে দিল [illegible]। বলল, উনি হচ্ছেন বিদ্যাসাগরের [illegible] মেয়ে শরৎকুমারী দেবী—

আমার সর্বাঙ্গে [illegible] উঠে গিয়ে আমি [illegible] পায়ের ধুলো নিলাম। বললাম, [illegible] আপনার দর্শন পেলাম।

শরৎকুমারী হাসিমুখে [illegible] মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তখন [illegible] সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের স্পর্শই যেন অনুভব করে [illegible] ছিলাম। ওঁর মুখশ্রীতে বিদ্যাসাগরের ছবিটি যেন মূর্ত।

আরতি আমার সঙ্গে দ্বিতীয় মহিলার পরিচয় করিয়ে বলল, এঁর কথা আপনার [illegible]। মনে আছে [illegible]—ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরের পৌত্রী [illegible] ক্ষিতীশ মামা—আর ইনি তাঁরই সহধর্মিণী [illegible]।

নমস্কার বিনিময়ের পর [illegible] কণ্ঠে [illegible] বললেন, আমি [illegible] আমার নামের সঙ্গে মেলে না!

সবাই আমরা হেসে উঠলাম।

শরৎকুমারী দেবী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, ক্ষিতীশ আমার ভাই।

অতঃপর পারস্পরিক সম্পর্কের বিস্তৃত বিকাশের অংক নিয়ে আলোচনা উঠল। সর্বাগ্রে ঋষি নৃসিংহরাম, তারপর ভুবনেশ্বর, তারপর রামজয়, তারপর ঋষি ঠাকুরদাস। ঠাকুরদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। অর্থাৎ অনায়াসে আড়াইশ' বছর পিছিয়ে গিয়ে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে আশ্রয় নেওয়া চলে! আমার মাথার মধ্যে তৎক্ষণাৎ বংশানুক্রমিকভাবে জটিলতা ঢুকে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা কুমুদিনীর পৌত্র ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের অধ্যাপক সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার সম্পর্কিত [illegible]। তিনিই এই 'বংশ তালিকা' আমার কাছে পাঠিয়ে দেন।

রজনী ও আরতির আন্তরিক [illegible] সেদিন খুবই [illegible] ছিল। কিন্তু সব ছাপিয়ে শরৎকুমারী দেবীর দর্শনলাভের সেই দিনটি আমার মনে উজ্জ্বল ও [illegible] হয়ে রয়েছে। এ জন্য [illegible] রজনী ও শ্রীমতী আরতির কাছে আমার কৃতজ্ঞতা [illegible]।

এই প্রসঙ্গেই রজনীর সম্পর্কে আরও [illegible] কথা বলা চলে। [illegible] পর বাংলার [illegible] সমাজবাদ সম্বন্ধে [illegible] হয়ে ওঠে। সেই সময় যাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও [illegible] পড়াশোনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে [illegible] রজনীর রাজনৈতিক [illegible] অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। পৃথিবীর নানা দেশে [illegible] সমাজবাদ, শ্রমিক বিপ্লব এবং [illegible] সম্বন্ধে যে সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে চলেছে, সেগুলি [illegible] একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, [illegible] সেগুলি জনমনকে প্রভাবিত করে তুলবে এবং ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। ধনতন্ত্রী এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তখন এই ধরনের সাহিত্যের ঘোরতর শত্রু। কিন্তু এরই মধ্যে নানান ফাঁকির এবং সংগোপনে যে সমস্ত নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদি বোম্বাই বা কলকাতায় এসে পৌঁছত তারই কিছু কিছু রজনীর হাতে আসত। এই সকল সাহিত্যের ভিতর দিয়েই জানা যেত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নতুন চিন্তার ধারা, সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা, সোভিয়েট জনজীবনের প্রগতিশীল চিত্র ও তাদের বিপুল নির্মাণ সজ্জা, জার্মানিতে নবাগত হিটলারের অন্ধ জাতীয়তার আস্ফালন, বিলাতে সাম্যবাদী নেতা সাপুরজি শাকলাৎওয়ালা ও রজনী পাম দত্তর অগ্নিক্ষরা ভাষণ প্রভৃতি। সেদিনকার প্রচণ্ড ইংরেজ শাসনে যখন বাঙালীর চিত্ত উৎপীড়িত এবং নির্যাতিত সেই সময় এই সকল সাহিত্য যেন বহির্বিশ্বের জানলা খুলে দিত। রজনী সেই সময় বোঝাত [illegible] প্রকৃত স্বরূপ কি প্রকার, গান্ধীজীর আন্দোলনের প্রকৃতি, দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে ভিত্তি অর্থনীতি কিনা, চাষী ও মজদুর শ্রেণীর কল্যাণ ভিন্ন দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় কিনা, সামাজিক পরগাছা কাদের বলে ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনার ভিতর দিয়ে তার পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রকাশ করত।

এই বিষয়গুলি তখনকার কালে ছিল অনেকখানি নতুন, এবং এগুলি নিয়ে কেউ [illegible] বক্তৃতা করতে সাহস পেত না। যতদূর আমার মনে পড়ে, ঐ সময় রজনী ও আরতি [illegible] একটি স্টাডি সার্কেল তৈরি করে এবং তার উদ্ভবেই—বিশেষ করে রজনী—শ্রমিকদলের নেতা বলে পরিচিত হয়।

পরবর্তীকালে রজনীর রাজনৈতিক পরিচয় অনেক বড় হয়ে ওঠে এবং সে এম

এন রায় মহাশয়ের সংস্পর্শে 'র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট' নামক একটি সংস্থার পরিচালক হয়।

১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে পাটনা থেকে হীরালাল দাশগুপ্ত মহাশয় চিঠি দিলেন তাঁর অনুপম লিপিদক্ষতায়। —"সামনে বড়দিন। জ্যোৎস্না রাত। 'কুহুডাকের' জংগলে তুমি! পিছার কোঠির দিক থেকে কী যেন আওয়াজ! নবী অকাতরে বলল, 'খাঁ সাব' নিকলো তুয়া! দুটো ডবল ব্যারেল গান, একটা রাইফেল। হলদিছাপরায় বুনো হাঁসের পেছনে ছোটা। চিঠি পেয়েই চলে এসো।—দাদা।"

চিঠিতে নাচের ছন্দ আমাকে নাচিয়ে তুলল। আগামীকাল রাত সাড়ে আটটায় দেরাদুন এক্সপ্রেস ধরব—কারণ আমি এবার পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দিরটি দেখে গয়া জাহানাবাদ হয়ে পাটনায় পৌঁছব।

চিঠি পেয়ে যখন প্রস্তুত হচ্ছি, তখন দুপুরের দিকে দুজন অপরিচিতা মহিলা দেখা করতে এলেন। ওঁদের মধ্যে একজন কিছু বর্ষীয়সী। ওঁরা বললেন, আমরা বাদুড়বাগানের শ্যামমোহিনী দেবীর শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে আসছি।

প্রসিদ্ধ সমাজসেবিকা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনীর সঙ্গে আমার একদিন মাত্র আলাপ হয়েছিল। আমি ওঁদের অভ্যর্থনা করে বসালুম। বললুম, ওখানে আমার জানা এক মহিলা আছেন তাঁর নাম নীলিমা চট্টোপাধ্যায়।

বর্ষীয়সী মহিলা বললেন, ইনিই সেই!

হাসিমুখে নীলিমা দেবী নমস্কার জানালেন। বললেন, আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। অনেক দিন ধরে চিঠি দিয়ে আপনাকে ব্যস্ত করেছি। আপনার সাহায্য না পেলে কলকাতায় আমি দাঁড়াতেই পারতুম না। সরোজ মিত্র মশায়দের ওখান থেকে কিছুদিন আগে কাজ ছেড়ে এখন আমি শ্যামমোহিনী দেবীর ওখানে আছি।

হাসিমুখে আমি বললুম, পাঁচ বছর ধরে চিঠিপত্রেই আমাদের আলাপ হচ্ছিল। আপনাকে চোখে দেখছি আজ প্রথম।

নীলিমা বললেন, ইনি হিরণ্ময়ী দেবী। এঁকে আমি মাসিমা বলি।

—আপনার স্বামী কেমন আছেন এখন?—নীলিমাকে প্রশ্ন করলুম।

—ভাল নেই। আমি সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি।

—বলুন, আমি কি করতে পারি?

নীলিমার হয়ে হিরণ্ময়ী দেবী বললেন, ওর স্বামী একেই ত সেই পক্ষাঘাতে পঙ্গু, তার ওপর রোজ জ্বর আসছে! সেখানে দেখবার এখন কেউ নেই, চাকরটাও জবাব দিয়ে গেছে। নীলিমার রাঁচি ফিরে যাওয়া খুবই দরকার।

বললুম, কিন্তু কলকাতার রোজগার ছেড়ে উনি যাবেন কেমন করে?

এবার নীলিমা দেবী কথা বললেন—আপনাকে সেই কথাই বলতে এসেছি। ও'র কথা মনে রেখেই রাঁচির গার্লস স্কুলে আমি দরখাস্ত করেছিলুম। খবর পেলুম সেখানে আমার চাকরি হয়েছে। সেই জন্যই আমি রাঁচিতে ফিরে যেতে চাই।

—এত খুব ভাল কথা—সুসংবাদ।—আমি বললুম, বাস্তবিক, আপনার স্বামীর এই অবস্থা—বাইরে আপনার থাকাই চলে না। এখনই আপনার চলে যাওয়া উচিত।

হিরণ্ময়ী বললেন, আপনাকে একটি অনুরোধ করবার জন্যই নীলিমা আমাকে সঙ্গে এনেছে। আপনার জানা কেউ একজন যদি ওকে রাঁচিতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসে—নীলিমা তা হলে যাতায়াতের রাহাখরচ দিতে পারে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। পরে বললুম, দেখুন, আমার জানা এমন কেউ নেই যাকে আমি অনুরোধ করতে পারব। রাঁচি যেতে গেলে এক আধবার গাড়ি বদলাতে হয়। তা ছাড়া আসছে কাল আমি যাচ্ছি পরেশনাথ হয়ে গয়া। আমি কাকেই বা বলব,

আপনার টাকার
সুদসমেত দাম
চুকিয়ে দিতে
একমাত্র পেন্ট

কেউ বা রাজী হবে। তা ছাড়া আমার সময়ও কম।

নীলিমা দেবী সবিনয়ে বললেন আপনি যদি আমাকে দয়া করে রাঁচিতে নামিয়ে দিয়ে যান তা হলে আমার খুবই উপকার হয়।

তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ আমার নিজের কাছে বিশেষ-বিশেষ তারিখ অতিশয় মূল্যবান। সুতরাং তিনজনে বসে পরবর্তী প্রত্যেকটি তারিখ মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত স্থির হল, আজই রাত্রে তা হলে আমাদের গাড়ি ধরতে হয়। বেশ মনে পড়ছে সেটা ২২ ডিসেম্বর। নীলিমা দেবী তখনই রাজী হয়ে গেলেন। গাড়ি রাত সাড়ে আটটায়। উনি নিজে হাজারিবাগ রোডের টিকিট করে হাওড়া স্টেশনে ৭নং প্ল্যাটফরমের মাথে আটটার সময় অপেক্ষা করবেন। আমি ঠিক সময় গিয়ে পৌঁছবো।

আমাকে নানাভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে ওঁরা এক সময় বিদায় নিলেন। সেদিন দুপুরে স্বপ্নেও ভাবিনি, এই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে দু'একটি অভাবনীয় সংকটের মধ্যে পড়তে হবে।

আমি সম্পূর্ণভাবে সেদিনও সামাজিক জীব হয়ে উঠতে পারিনি, সেটি আমার প্রকৃতিগত ত্রুটি। অনেক কর্তব্যের ডাক থাকে অনেক দিক থেকে, কিন্তু আমি সবার সাড়া দিতে পারিনে। আমার ভ্রমণই আমার জীবন, সেখানে তিলমাত্র বাধা পেলে আমি দুঃখিত হই। শ্রীমতী নীলিমা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেদিন থার্ড ক্লাস কামরায় উঠে ওঁর সুখ-সুবিধার দিকে আমাকে মনঃসংযোগ করতে হচ্ছিল, এজন্য আমি ঈষৎ ক্ষুব্ধ। কারণ ভ্রমণকালে আমি অন্য মন এবং ভিন্ন চেতনায় বাস করি।

মহিলা কুণ্ঠিত হয়ে এক কোণে বসেছেন। আমি বসেছিলুম মুখোমুখি। ওঁর বয়স কম, বোধ করি সেই কারণেই আড়ষ্টতা কিছু বেশি। এক সময় সহাস্যে আমি বললুম, সেই 'বিজলী'র আমল থেকে আপনার সঙ্গে আমার পত্রালাপ হয়ে আসছে —প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল। দেখা শোনা এই প্রথম। আপনার তিন চারটে লেখাও বোধ হয় 'বিজলী'তে ছাপা হয়েছিল।

আমার কথাবার্তা শুনে উনি যেন একটু সহজ হলেন। বললেন, আমি ঠিক লেখিকা নই। শখ করে আপনাদের কাছে লেখা পাঠাতুম। ছাপা হতে পারে এটা কখনও ভাবিনি।

আমরা দুজনেই হাসলুম। বর্ধমান ছেড়ে গাড়ি চলল আসানসোলের দিকে। এবার উনি বললেন, একদিন আপনার চিঠিতে সাহস পেয়েই আমি কলকাতায় এসেছিলুম। আপনার কথাতেই সরোজ মিত্র আর হরিদাসবাবু আমাকে কাজ দেন। সেই দুঃসময়ের কথা আমি ভুলিনি।

আমি বললাম, যাই হোক, সে অবস্থা এখন আপনার বোধ হয় কেটে গেছে। আপাতত আপনার স্বামী সুস্থ হয়ে উঠুন, এইটি কাম্য। আপনি গার্লস স্কুলে কাজ পেয়েছেন, এটিও খুব আনন্দের কথা। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি আহারাদি সেরে এসেছেন ত?

—ও নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না।

আমি চুপ করে গেলুম। সে রাত্রে প্রচুর শীত পড়েছিল। যখন আসানসোল পার হল, আমি আমার দুটি কম্বলের থেকে একটি ওঁকে পাঠালুম। বললুম তা হোক, আমার গায়ে লংকোট রয়েছে। আপনি কম্বল ঢাকা দিয়ে বসুন।

ওঁকে অপেক্ষাকৃত আরামের মধ্যে বসিয়ে আমি চুপ করে গেলুম। ওঁর সঙ্গে শুধু রয়েছে একটি আন্টাওলা টিনের বাক্স। আমারও প্রায় তাই। একটি ছোট সুটকেস ও দুখানা কম্বল। এসব আমরা হাতে হাতেই নিতে পারব।

রাত নিশুতি হয়েছে। আমরা ধানবাদ ছেড়ে যখন গোমো পার হয়ে গেলাম তখন রাত দেড়টা বেজে গেছে। এ গাড়ি 'ঈসিতে' দাঁড়ায় না, সুতরাং আমরা হাজারিবাগ রোডে নামব। এক সময় নীলিমা দেবীকে আমি সতর্ক করলুম। যখন গাড়ি এসে স্টেশনে দাঁড়াল, রাত তখন আড়াইটে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে দেখি চারিদিক ঘুটঘুটি অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষের চিহ্নমাত্র নেই! টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে সেই কনকনে ঠাণ্ডায়। আকাশ ঘন অন্ধকার, কোনদিকে কিছু দেখা যায় না। স্টেশনে বিন্দুমাত্র আলো বা লোকজন নেই। আমরা কম্বল ও সুটকেশ নিয়ে সেই অন্ধকারে খুঁজতে খুঁজতে ওয়েটিং রুম খুঁজে বার করলুম। ভিতরটায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঘরখানা ঝুপসি। ঠাউরিয়ে দেখি, স্তূপাকার কী যেন সব মালপত্র। কিন্তু আমরা ছিলাম ক্লান্ত ও শীতার্ত, এবং ঘুমে আমার নিজের চোখ জড়িয়ে আসছিল। সুতরাং আকাশের আলোর আভাসটুকুতে ঘরের দরজার কাছেই যেটুকু খালি জায়গা দেখা যাচ্ছিল, সেইটুকুতেই আমি ও নীলিমা দেবী কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়লাম। দু মিনিটের মধ্যেই আমি নিদ্রায় তলিয়ে গেলুম।

যখন ঘুম ভাঙলো, চমকিয়ে উঠলাম। সামনে তিন চারজন পোশাকপরা আরদালি। হাত তিনেক দূরে দুজন খাস ইংরেজ অফিসার বিছানায় বসে চা পান করছেন। আমার মাথার কাছে দশ বারোটা বন্দুক ও রাইফেল দাঁড় করানো। বড় বড় কয়েকটা কাঠের পেটি, তার পাশে-পাশে শিকারীর নানাবিধ পোশাকপত্র। গত রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারে এসব কোনও কিছুই দেখতে পাইনি। এদিকে ফিরে দেখি, ওখানে নীলিমা দেবীর চিহ্নমাত্র নেই! তিনি তাঁর বাক্সটি ও কম্বলখানা আমার পাশে রেখে যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য! ঘুমের ঘোরে অতর্কিতে উঠে সামনে দুজন ইংরেজ আর অতগুলো বন্দুক দেখে আমি একেবারে হতভম্ব।

ক্লান্ত দিনান্তে ভরে দিক প্রাণ নেস্‌কাফে

সাহেব দুজন হাসিমুখে বললেন, গুড মর্নিং! আপনার ইচ্ছে হলে আরেকটু ঘুমিয়ে নিতে পারেন। আমরা ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়ব।

মৃদুহাস্যে আমিও শুভ প্রভাত জানিয়ে বললুম, আপনারা কি শিকারে বেরিয়েছেন?

—হ্যাঁ, উনি এখনকার পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেল। আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার সঙ্গের লেডি বাইরে গেছেন। এখন সকাল সাড়ে সাতটা।

ওঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি উঠে কম্বল দুখানা পাট করে সুটকেস দুটোর ওপর গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে এলুম। ভাবছিলুম বাংলার অগ্নিবিপ্লবের উগ্রতা সম্প্রতি কমে এসেছে! কিন্তু দু'তিনজন বিপ্লবী যুবক গত রাত্রে এঘরে নিঃশব্দে ঢুকে কী না করতে পারত। আর কিছু না হোক, পাঁচ সাতটা বন্দুক পাচার করে হাজারিবাগ বা চাতরার জঙ্গলে গা ঢাকা দিতে পারত!

প্লাটফরমের প্রান্তে জলের কলে মুখ ধুয়ে চায়ের দোকানের কাছে এসে দেখি, নীলিমা দেবী অপেক্ষা করে রয়েছেন। কিন্তু আজ সকালে দুজনের আর কোনও গাম্ভীর্য রইল না। পরস্পরকে দেখে আমরা সংকোচে উল্লাসে হেসে অস্থির হলুম। সন্দেহ নেই, অন্ধকার রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমরা বোকা বনে গিয়েছিলুম।

সাহেবরা বিদায় নেবার পর ওদের ওই ওয়েটিং রুমটি আমরা দখল করলাম এবং ওখানেই স্নানাহার সেরে যখন বেরোলুম তখন বেলা এগারোটা। এখান থেকে ইস্রি বা উস্রী পর্যন্ত মোটর বাস পাওয়া যাবে। উস্রী আমার চেনা জায়গা। ওখানকার জঙ্গলে উস্রী জলপ্রপাতটি খুব চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। যাই হোক, উস্রীতে পৌঁছে অনেক চেষ্টায় একখানা টাঙ্গা পাওয়া গেল। আমরা নিমিয়াঘাটের পাশ কাটিয়ে যখন পরেশনাথ পাহাড়ের ঠিক নিচে এসে এক জঙ্গলের ধারে নামলুম, সেখান থেকে খানিকটা পথ হেঁটে গেলে জৈনদের দুটি মস্ত ধর্মশালা। একটি তার শ্বেতাম্বরী অন্যটি দিগম্বরী। বেলা তখন প্রায় চারটে। চারদিক নিঃঝুম। আজ আকাশ পরিষ্কার। গাড়িখানা ছেড়ে দিয়ে আমরা হাঁটিতে হাঁটিতে এসে ধর্মশালার ভিতরে ঢুকলুম। কিন্তু প্রথমেই একটি লোকের কাছে বাধা পেলুম এবং তর্ক বাধল। ওরা আশ্রয় দিতে নারাজ। যাই হোক আমরা সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী, এ-কথাটি কর্তৃপক্ষকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে তবে বাইরের ফটকের পাশে একটি ঘরে আশ্রয় পেলুম। কর্তাদের একজন জানালেন, এখানে কাছাকাছি কোথাও খাবার কিনতে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি এদিককার জঙ্গলে জঙ্গলে জানোয়ারের উৎপাত বেড়েছে। নরখাদক বাঘের উপদ্রবে নাকি সবাই আতঙ্কিত। আমরা থাকি সেই ভিতর দিকে। আপনাদের আসা উচিৎ হয়নি!—আমরা যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর ধমক খেলুম।

লোকটা আমাদের তাড়াতে পারলে বাঁচে! কিন্তু আমরা টাঙ্গা ছেড়ে দিয়েছি, এখন যাব কোথা? শেষ পর্যন্ত নীলিমা দেবীর অনুরোধে ওরা দুটি টাকার বিনিময়ে একটি হারিকেন ল্যাম্প, রুটি-তরকারি-রাবড়ি এবং পানীয় জল দিতে রাজি হল। কাল সকালে পাহাড়ে উঠে পরেশনাথ দর্শন করে আমরা চলে যাব। প্রণামী দিয়ে যাব বইকি।

লোকটার কথা শোনার পর থেকে একটা গা ছমছম করছিল। তবু ফটকের বাইরে এসে এদিক ওদিক চুপচাপ ঘুরে দেখছিলুম। চারদিকে ঘন বন, সামনে মস্ত এক পাহাড়। জনমানব কেউ কোনও দিকে নেই। নিঃঝুম বনস্থলীর দিকে এই আসন্ন সন্ধ্যায় তাকালে দুর্ভাবনা আসে। আমরা ভিতরে চলে এলুম। এবার একটা লোক এসে [illegible] ফটকটা বন্ধ করে সোজা ভিতর দিকের পথ ধরে চলে গেল। যাবার সময় বলল, বাহারমে মৎ খাড়া হো। ভিতরে রহো।

সন্ধ্যা তখন সমাগত। ঘরের ভিতরটা সম্পূর্ণ শূন্য, একটিও আসবাবপত্র নেই। মেঝেটা কনকনে ঠাণ্ডা। চারিদিকের জনশূন্যতার মধ্যে এই ন্যাড়া ঘরখানায় রাতটা কেমন করে কাটিয়ে পালাবো এই কথা যখন ভাবছি, তখন ভিতর দিকের [illegible] পথ ধরে দুটো লোক এসে শালপাতায় আহার্য সামগ্রী, একটি ছোট জলের বালতি ও তার সঙ্গে একটা টিনের ঘটি রাখল। [illegible] হারিকেনটি দিল। ওদের কাজ ওখানেই শেষ। নীলিমা দেবী সেগুলি গুছিয়ে ভিতরে এনে রাখলেন। লোক দুটো আবার চলে গেল।

সন্ধ্যার পরে পরিষ্কার জোৎস্না দেখা দিয়েছিল। ঘরের দরজাটা খুলে রেখে হারিকেন ল্যাম্পটা সামনে বসিয়ে আমরা গল্প করছিলুম। নীলিমা দেবী পাটনা ও রাঁচির মেয়ে। ১৯২৭-এ উনি প্রাইভেটে বি-এ পাস করেন। বিবাহের পর একটি বাচ্চা হয়ে মারা যায়। কিন্তু কলকাতার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনায় উনি হেসে খুন হচ্ছিলেন। এক সময় উনি বললেন, এবার খেয়ে নিন—

অতঃপর মিনিট পনেরোর মধ্যে আহারাদি সেরে বাইরের বারান্দায় বালতির জলে আঁচিয়ে আমরা ঘরে এলুম। উনি দরজাটা বন্ধ করে কাঠের হুড়কোটা লাগিয়ে দিলেন। ঠাণ্ডা পড়েছে প্রচুর। ওঁর গায়ে গরম চাদর, আমার লংকোট। কম্বল মাত্র দুখানা। একখানা ওঁকে দিলুম। আধখানা উনি পাতবেন, বাকি আধখানা গায়ে দেবেন। আমারও তাই। এইভাবে আমরা রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করে নিয়ে যখন ঘরের এধারে ওধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে মেঝের উপর পড়েছি, তখন কেরোসিনের অভাবে আলোটা ধীরে ধীরে কমে এল। জৈনরা একটু হিসেবী সন্দেহ নেই।

বোধ হয় রাত তখন এগারোটা। ঘরের ভিতর পরিবেশ তখন নিঃসাড়। ঠাণ্ডায় [illegible] কম্বলের ভিতরে আমার ঘুম আসছিল। এমন সময় ওধার থেকে নীলিমা চাপা গলায় ডাকলেন, শুনছেন?

ধড়মড়িয়ে উঠলুম। উনি বললেন, বাইরে কিসের আওয়াজ হল!

আমি উঠে সমস্ত দরজা ও জানলা পরীক্ষা করলুম। সবগুলো বন্ধ, কিন্তু সবগুলোই পুরনো, একেবারে ঝাঁঝরা। ওগুলির ফাটলের ভিতর দিয়ে বাইরের চাঁদের আলো দেখা যায়। গরাদগুলো এমন ক্ষয়ে গেছে যে, ধাক্কা দিলেই ভেঙে পড়ে। দরজাটায় হুড়কো আছে, কিন্তু খিল নেই।

হঠাৎ একটা বড় আওয়াজে আঁতকে উঠলুম। মুহূর্তেই একটা হৃৎকম্প দেখা দিল। সরে এসে মহিলাকে চুপি চুপি শুধু বললুম বাঘ! খুব সম্ভব!

বাঘের প্রকৃতি সম্বন্ধে সেদিনও আমি অনভিজ্ঞ। নরখাদকরা যে জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শিকারের গতিবিধি নিরীক্ষণ করে, এটি জানতুম না।

ভ্রমণ সাহিত্যে নবতম সংযোজন
শংকরপ্রসাদ রায়ের
তুষার তীর্থ অমরনাথ ... ৮.০০
রূপ নগরী হংকং (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ... [illegible]
নিরূপ মিত্রের নগরী নিষ্প্রদীপ ... ৫.০০
[illegible] দত্তের এই চোখ অন্য চোখ ... ১০.০০
কর্নেল সেনগুপ্তের রহস্য উপন্যাস জোঁক ... ৭.০০
শংকরপ্রসাদ রায়ের লেক মোশন প্র্যাকটিস (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ... ৮.০০
ইলোরা প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স, ২৮ ডোভার রোড, কলিকাতা ১৯
পরিবেশনায় — ডি, এম, নাথ, দে বুক, কথা ও কাহিনী
স্টকিস্ট — জে এন ঘোষ এন্ড সন্স
(সি ১১৭৮৬)

দেখলেই জিভে জল
এসে যাবে – কেন না,
মুঠোমুঠো টফি লজেন্সে
সেরা স্বাদগন্ধ দিয়েই
ঠাসা কিনা!

নিউট্রিন

–চাকুম-চাকুম খাসা
মিষ্টি দিয়ে ঠাসা

নিউট্রিন কনফেকশনারি কোং প্রাঃ লিমিটেড, প্যালামানের রোড, চিত্তুর (এ.পি)

সন্ধ্যার ঠিক আগে ফটকের বাইরে ঘোরা-ফেরা করা আমাদের পক্ষে ভাল হয়নি। লোকটা ঠিকই বলেছিল। নীলিমা দেবী ভয়ে কাঠ হয়ে অন্ধকার কোণে বসেছিলেন। দ্বিতীয়বার ঝপাৎ করে ঝাপটার মতো একটা শব্দ হল জানলার ঠিক নিচে। ঠিক তার পরে বন্ধ জানলায় যখন দু' একবার আঁচড় পড়ল, তখন আমার সাহস হারালুম! বাঘ আক্রমণশীল হয়, যখন সে নরখাদক হয়ে ওঠে! পুরনো জানলাটা ভাঙতে ওর এক সেকেণ্ডও লাগবে না। তবে? তবে কি আমার জননীর আশীর্বাদ সব মিথ্যে? তিনি যে বলেছেন, তিনি জীবিত থাকতে আমার পায়ে কুশাঙ্কুরও ফুটবে না! আমি মহিলার কাছে এসে হেঁট হয়ে দেখি, তিনি কম্বলে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছেন এবং চাপা জড়িত কণ্ঠে বললেন, ওঁর সঙ্গে আর দেখা হল না!

অপরাধ আমারই। ওঁকে আগে রাঁচিতে পোঁছিয়ে দেওয়া আমার উচিত ছিল। কেন এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন হলুম? কেন আমার এই সর্বনাশা আত্মপরতা? ধিক আমার জীবনে। আগে ওঁকে স্বামীর কাছে দিয়ে এলে আমার অরণ্যযাত্রা একটুও কি ক্ষুণ্ন হত?

ফটকের দিকে হুড়মুড় করে একটা আওয়াজ হতেই আমি থরথরিয়ে কেঁপে উঠলুম। অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে জানলা-দরজাগুলো দেখছিলুম। এমন সময় সহসা বাইরের বারান্দায় জলসমেত বালতিটা ঝন-ঝনাৎ করে উঁচু থেকে আছড়িয়ে পড়ল নিচে শানের উঠানের ওপর। তখন আমি পাগলের মতো এগিয়ে প্রাণপণে ঘরের দরজা ভিতর থেকে ঠেলে ধরলুম। না, আর উপায় নেই। এবার নিশ্চিত মৃত্যু!

অন্ধকারে পলকের মধ্যে লক্ষ করলুম, কম্বল-মুড়িসমেত হুমড়ি খেয়ে মুখ গুঁজড়িয়ে নীলিমা দেবী দেওয়ালের কোণে পড়ে ক্ষীণস্বরে গোঁ গোঁ করছেন! মনে হচ্ছে আতঙ্কে তার দাঁতি লেগে গেছে। কিন্তু তাঁরই মাথার কাছের জানলায় যখন পুনরায় আঁচড়ের আওয়াজ পেলুম, তখন আর স্থির থাকতে পারলুম না! দরজাটা ছেড়ে ওঁর ওই মুখের আওয়াজটা বন্ধ করার জন্য এগিয়ে গিয়ে কম্বলসুদ্ধ ওঁকে পাশ ফিরিয়ে শোওয়ালুম এবং আমার পকেটের ছুরিখানার বাঁট ওঁর দাঁতের দুই পাটির মাঝখানে একটু প্রবেশ করালুম—যাতে ওঁর মুখের ওই শব্দটা কমে। না, উনি একেবারেই অচেতন। আমি ঠকঠক করে কাঁপছিলাম উত্তেজনায় আর আতঙ্কে। ওঁর মতো আমিও যেন হতচেতন অবস্থায় যন্ত্রবৎ এগুলো করে যাচ্ছিলুম এবং উৎকণ্ঠিত আতঙ্ক ও প্রাণভয়ে ভীত হয়ে নিশ্চুপ প্রেতের মতো আমি নড়াচড়া করছিলুম! নীলিমা দেবীর গোঁ গোঁ শব্দটা সম্পূর্ণ থামেনি, তবে পাশ ফিরিয়ে শোওয়ানোতে আওয়াজ কিছু কমেছিল। ভদ্রমহিলার গলা টিপে ওই আওয়াজটা বন্ধ করার জন্য আমার হাত নিশপিশ করছিল। এবার আমি তাঁর মুখ থেকে ছুরিখানা সরিয়ে নিয়ে অন্য পাশ ফিরিয়ে দিলুম। তারপর উঠে এসে আবার দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালুম। বোধ হয় আকাশের চাঁদ ততক্ষণে অনেকটা ঘুরেছে। তিনটে বন্ধ জানলার ফাটলগুলো দিয়ে তার আলো ঠিকরিয়ে ভিতরে আসছে।

সমস্ত রাত্রির সেই আত্মরক্ষার প্রাণপণ সংগ্রাম আমার কাছে এখন যেন উপকথার মতো। সে কি নরখাদক বাঘ, সে কি কোনও অরণ্যবাসী অতিকায় নরাসুর, না কি সে একটা ভালুকে? কিন্তু ভালুকের ত ল্যাজের ঝাপট নেই? তার ত কোনও 'গ্রাউলিং' নেই। অথচ নিজের চোখে সে-জন্তুকে আমি দেখিনি সেই রাত্রে!

রাত চারটের পর সমস্ত আওয়াজ থামল! প্রবল উত্তেজনা ও আতঙ্কের পর আমার অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসাদ আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না। ওই দরজা চেপেই বসে হেলান দিয়ে চোখ বুজলুম। এর মধ্যে কখন নীলিমা দেবীর জ্ঞান ফিরেছে এবং কখন তিনি অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছেন, আমি জানিনে।

হঠাৎ আমার হাত ধরে সকালবেলা হিড়হিড়িয়ে টান পড়াতে আমি চমকিয়ে জেগে উঠলুম। নীলিমা দেবী উত্তেজিত হয়ে বললেন, সরে যান—সরে যান—আপনার কানের পাশে মস্ত কাঁকড়া বিছে—

সরে এলুম। চেয়ে দেখি ঘন কালোবর্ণ ইঞ্চি ছয়েক লম্বা একটা কাঁকড়া বিছা আমার কানের পাশে দেওয়ালে আমারই মতো রাত থেকে ঘুমোচ্ছিল! মহিলা বললেন, পালিয়ে যাবে—শিগগির মারুন, ওই জুতোটা দিয়ে ঠুকে মারুন। কালো কাঁকড়া বিছে কামড়ালে কেউ বাঁচে না!

উনি যত চঞ্চল, আমি ততই স্থির। ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে সাতটা। উনি এর মধ্যে জানলাগুলো খুলেছেন। বাইরে বেশ রোদ উঠেছে। সুন্দর শুভ সকাল!

—মারলেন না বিছেটাকে?

হাসিমুখে বললুম, ওটা বোধ হয় ঘুমোচ্ছে, থাক না ঘুমিয়ে?

—আমার বড্ড ভয় করে। ওটাকে মারুন আপনি।

—না—আমি বললুম, যেটাকে সহজেই মারতে পারি, সেটার প্রাণ নষ্ট নাই করলুম! এটা জৈন ধর্মশালা!

*

চার হাজার ফুট উঁচুতে পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দির। আমি একাই গেলুম। বিগ্রহদর্শন শেষ করে যখন ফিরে এলাম তখন সাড়ে এগারোটা। নীলিমা দেবী এর মধ্যে স্নানাদি সেরে পরিচ্ছদ বদলিয়ে মাথায় সিঁদুর দিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। গত কালকের মতো তিনি ভিতরে গিয়ে আহারাদির কথাও পাকা করে এসেছেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। সন্ধ্যার আগে ওঁকে রাঁচিতে পোঁছিয়ে আমি রামগড়ে ফিরে রাঁচি রোড স্টেশনে গাড়ি ধরব। এ যাত্রায় আমার খুব শিক্ষা হল।

নীলিমা দেবী বললেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার খুবই বিপদে কাটল। আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি সঙ্কোচ আর লজ্জা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

আমি হেসে বললুম, আমি নিজে খুবই অনুতপ্ত যে, আপনাকে আগে রাঁচিতে রেখে আসিনি! আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত। আপনার স্বামী কেমন থাকেন এবং স্কুলের কাজ আপনার কেমন লাগে—এসব চিঠিতে জানলে আমি খুশী হব।

আহারাদি সেরে আমরা এক সময় বেরিয়ে পড়লুম।

আর নয়, এবার কিছুকালের জন্য সরে যেতে চাই সামাজিক জীবনের বাইরে। যেতে চাইছি একটা বন্য জীবনে—সেটা দুর্বোধ বা বর্বর হলে ক্ষতি নেই। এবার থেকে আমি অরণ্যে-অরণ্যে! বাঘের দাঁত, ভালুকের থাবা, হরিণ-শম্বরের দৌড়, বন্য কুকুরের চক্রান্ত—ওদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব অরণ্যের গহন রহস্যকে! পরবর্তী সাত বছর কাল অবধি জঙ্গলের নেশায় যখন-তখন হীরালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে আমার বন-জঙ্গলে কেটেছে। তিনি তাঁর 'মায়ামৃগ' বইটি আমার নামে উৎসর্গ করেন। ওই কালের মধ্যেই আমি আমার 'অরণ্যপথ' বইটিতে লিখি, হে অরণ্য, এবার থেকে তুমি কথা বলো আমার কানে কানে!

আমার অরণ্য ভ্রমণের প্রথম কাহিনী 'হে অরণ্য, কথা কও'—এটি প্রকাশ করি সেই বছরের 'দেশ সংখ্যা' আনন্দবাজার পত্রিকায়।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

কেটে পাঠান

জিতে নিন!

লিওর 'ফিল্ম নির্মাণ' প্রতিযোগিতা

আপনি নিশ্চয়ই অনেক (একঘেঁয়ে?) বিজ্ঞাপন-ফিল্ম দেখেছেন। এবার আপনি নিজে একটি তৈরী করতে সাহায্য করুন, আর জয়ী হয়ে জীবনের একটি অপূর্ব (দারুণ মজার!) সপ্তাহ উপভোগ করুন!

প্রতিযোগিতা

নীচে লেখা এক একটি বিবরণীর সঙ্গে নীচে দেওয়া এক একটি ছবি মেলাতে আমাদের সাহায্য করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ: ৬ নং বিবরণীর সঙ্গে মেলে একমাত্র ৬ নং ছবি। সেইমত, আপনাকে বাকি ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫-এর প্রত্যেকটি বিবরণীর সঙ্গে ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫-এর ছবি মেলাতে হবে। এর মধ্যে মিলিয়ে ফেলেছেন? বাঃ! এবার ফিল্মটা শেষ করতে আমাদের সাহায্য করুন। শুধু ৭নং ছবির সঙ্গে একটি উপযুক্ত বিবরণী লিখুন। ১৬টি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই।

☆ 6 মুখ তুলুন দেখি! আপনার ত্বকের জন্যে চাই লিওর ক্রেমা ক্যালামাইন। সৌন্দর্যের জন্যে এটি কাজ করে ৬ ভাবে: পরিষ্কার করে, আরাম দেয়, আর্দ্র রাখে, খুঁত সারায়, সজীব রাখে, আর ত্বককে রক্ষা করে।

☆ আপনার চোখের কোলে কালি পড়ে? মৃদু হালকা কোমল লিওর আউটডোর আইক্রীম লাগিয়ে তা দূর করুন। দেখবেন, আপনার বয়েস কমে গেছে।

☆ কামিয়ে বা ক্রীম লাগিয়ে সমস্যার মূল দূর করতে পারবেন না। লিওর কোল্ড ওয়াক্স অবাঞ্ছিত চুলকে গোড়া থেকে নির্মূল করে দেয়। ক্রমাগত ব্যবহারে চুলের বৃদ্ধি কমে যায়, কর্কশ চুল গজানো রোধ করে, আপনার ত্বক হয়ে ওঠে রেশমের মত মোলায়েম।

☆ আপনার চুল থেকে তেলচিটে ময়লা আর খুসকি দূর করে—নিরাপদে, মৃদুভাবে—এমন উপায় খুঁজছেন? লিওর লাইম শ্যাম্পু লাগিয়ে দেখুন না! আপনার চুলকে করে তুলবে ঝলমলে পরিষ্কার... অথচ চুলের স্বাভাবিক তেলাভাব শুকিয়ে দেবে না, যা অন্যান্য কর্কশ ঘনীভূত শ্যাম্পু করে থাকে।

☆ চুল ওঠা বন্ধ করতে হলে চুলের গোড়া শক্ত করা দরকার। লিওর আমণ্ড হেয়ার অয়েল চুলের গোড়ায় যোগায় শক্তিদায়ক পুষ্টি, চুল ওঠার জন্যে দায়ী মাথার খুলির সব সমস্যা দূর করে।

☆ এ হল জগৎবিখ্যাত মুখসৌন্দর্য প্রসাধন—লিওর বিউটী মাস্ক—যা আপনার ত্বকের তারুণ্য নতুন করে ফিরিয়ে আনে। আপনি আরামে শুয়ে বসে থাকতে থাকতে এটি আপনার ত্বকের বুঁজে যাওয়া লোমকূপ থেকে ময়লা বার করে আপনার লাবণ্য নিখুঁত নির্মল করে তোলে।

☆ 7 ________________

(মোটা অক্ষরে, ১৬টি শব্দের মধ্যে)

____

____

____

____

____

____

পুনশ্চ: অক্টোবর ২৭, ১৯৭৩ বা তার পরের কোনো তারিখে একটি বা তার বেশী লিওর সৌন্দর্য প্রসাধন সামগ্রী কেনার একটি ক্যাশমেমো আপনার প্রবেশপত্রের সঙ্গে পাঠানো চাই।

লিওর

...উপভোগ করুন!

৫,০০০/- টাকা আর আপনার প্রিয় চিত্রতারকাদের সঙ্গে সাতটি রোমাঞ্চকর দিন!

মমতাজ, শশী কাপুরের আলিঙ্গনে ছবি—'চোর মচায়ে শোর'।

আপনি যদি প্রতি বিবরণীর সঙ্গে প্রতি ছবি সঠিক মেলাতে পারেন...আর শেষ ছবিটির সঙ্গে মিলিয়ে সবচেয়ে ভালো বিবরণী লিখতে পারেন...অবশ্য সব নিয়ম মেনে...তাহলে আপনি কি কি জিতবেন...

পুরস্কার

২,০০০/- টাকা নগদ দেওয়া হবে—আপনি যে শহরে থাকেন সেখান থেকে বম্বে যাতায়াতের দুজন লোকের খরচ হিসেবে (যাতায়াতের খরচ কম হলেও)।

শোফার চালিত লিমুসিন মোটর কার—বম্বে পৌঁছোনো থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সদাসর্বদা আপনার জন্যে হাজির থাকবে।

এক সপ্তাহের জন্যে বম্বের সবচেয়ে সৌখিন জায়গায় চমৎকার ফ্ল্যাটে থাকার ব্যবস্থা।

আপনার প্রিয় চিত্রতারকার সঙ্গে কোনো উঁচুদরের রেস্তোরাঁয় একান্তভাবে খানাপিনার ব্যবস্থা।

একটি চমৎকার দিন কাটবে—সমুদ্রের ধারে সুন্দর সৌখিন এক ক্লাবে, যেখানে বহু চিত্রতারকা-সভ্যের আনাগোনা।

ভালো ভালো ফিল্ম স্টুডিও দেখে বেড়ানোর ব্যবস্থা।

বম্বের আসেপাশে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে ফিল্মের সত্যিকারের শুটিং দেখতে দেখতে পিকনিকের ব্যবস্থা।

বড় বড় চিত্রতারকাদের সুরুচিপূর্ণ সৌখিন বাড়ীতে গিয়ে স্বচক্ষে তাঁদের জীবনযাপনের স্টাইল দেখার, আর তাঁদের পরিবারবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ।

আসামাত্র, ৩,০০০/- টাকা দামের আপনার পছন্দমত সৌখিন জামা কাপড় পাবেন, যাতে ঐ ৭ দিনও পরতে পারেন। আপনার জন্যে এগুলি বিশেষভাবে তৈরী করবেন এক পোষাক-বিশেষজ্ঞ।

একটি অতি উঁচুদরের বিউটী সেলুনে, খুবই নামী এক বিউটিশিয়ানের তদারকে, আপনার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রসাধনের ব্যবস্থা।

একটি প্রাইভেট পার্টিতে বিখ্যাত চিত্রতারকাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বিশেষ আমন্ত্রণ।

একটি দিন কাটবে নির্জন সমুদ্রতীরে আপনার অধীনে একটি সুন্দর কুটীরে।

ঐ সপ্তাহে যে ছবি মুক্তি পাবে তার প্রিমিয়ার শো-তে যোগদানের আমন্ত্রণ।

নিয়মাবলী

১। ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫-এর প্রতিটি বিবরণীর সঙ্গে ১, ২, ৩, ৪, আর ৫-এর ছবি সঠিকভাবে মেলানো চাই।

২। ৭ নম্বর ছবির সঙ্গে মিলিয়ে উপযুক্ত বিবরণী লিখতে হবে—১৬টি শব্দের মধ্যে।

৩। অক্টোবর ২৭, ১৯৭৩ বা তার পরের কোনো তারিখে একটি বা তার বেশী লিওর সৌন্দর্য্য প্রসাধন সামগ্রী কেনার একটি ক্যাশমেমো আপনার প্রবেশ-পত্রের সঙ্গে পাঠানো চাই।

৪। একটি বা তার বেশী প্রবেশপত্র পাঠাতে পারেন, তবে প্রতি প্রবেশপত্রের সঙ্গে ৩নং নিয়ম অনুসারে একটি আসল ক্যাশমেমো পাঠাতে হবে।

৫। সমস্ত প্রবেশপত্র পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়:
লিওর 'ফিল্ম নির্মাণ' প্রতিযোগিতা
পোঃ বক্স নং ৭১১৭, বম্বে ৪০০০৩১
প্রবেশপত্র ১৯৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, বেলা ১২টার মধ্যে পৌঁছোনো চাই।

৬। ভারতের সমস্ত অধিবাসীই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন, শুধু নাফিরা কসমেটিক্স প্রাঃ লিঃ ও তাঁদের অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি—ক্রিয়েটিভ ইউনিটের কর্মচারীরা ও তাঁদের পরিবারবর্গ ছাড়া।

৭। শুধু একটিই পুরস্কার দেওয়া হবে—যথা, নগদ ২,০০০/- টাকা, ভারতের যেকোনো জায়গা থেকে দুজন লোকের বম্বে যাতায়াতের খরচ হিসেবে। এক সপ্তাহের জন্যে শোফার চালিত মোটর কার, সুন্দর সৌখিন একটি ফ্ল্যাটে এক সপ্তাহ থাকার ব্যবস্থা, এক চিত্রতারকার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খানাপিনা, সমুদ্রতীরে সুন্দর একটি ক্লাবে বেড়াতে যাওয়া, বড় বড় ফিল্ম স্টুডিও দেখে বেড়ানো, আউটডোরে একদিন সত্যিকারের ফিল্ম শুটিং দেখা, কয়েকজন চিত্রতারকার বাড়ীতে যাওয়া, ৩০০০/- টাকা দামের জামা-কাপড়, বিউটী সেলুনে সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রসাধন, একটি প্রাইভেট পার্টিতে বিশেষ আমন্ত্রণ, সমুদ্রতীরে একদিন কুটীরে কাটানো, প্রিমিয়ারে যোগদানের আমন্ত্রণ।

৮। ভারতের যেকোনো জায়গা থেকে দুজন লোকের বম্বে যাতায়াতের খরচ হিসেবে যে নগদ ২০০০/- টাকা দেওয়া হবে, সেটা বম্বে শহরের প্রতিযোগীকেও দেওয়া হবে—যাতায়াতের খরচ হোক আর নাই হোক।

৯। যিনি জিতবেন তাঁর নাম বড় বড় পত্রপত্রিকায় ঘোষণা করা হবে। ডাকযোগেও তাঁকে খবর দেওয়া হবে।

১০। বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হবে। প্রবেশপত্র বিষয়ে পত্রের আদানপ্রদান করা হবে না। বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত প্রভাবান্বিত করার কোনো চেষ্টা করলে প্রবেশপত্র নাকচ করে দেওয়া হবে।

১১। সমস্ত প্রবেশপত্র নাফিরা কসমেটিক্স প্রাঃ লিঃ-এর সম্পত্তি বলে গণ্য হবে—এবং ফেরৎ দেওয়া হবে না।

গত কয়েক বৎসর ধরে পূজোর প্রাক্-কালে তথাকথিত আগমনী গানের অনুষ্ঠান শুনে আসছি আকাশবাণীতে এবং অন্যান্য আসরে। প্রতিবারই ক্ষোভ থেকে যায়, যা আশা করেছি তা পাইনি—এসব গানই যেন কেমন একটা ভিন্ন ধরনের—যে স্বাদ এবং রস যথার্থ আগমনীর গান থেকে পেয়েছি এই সব গানে তা আদৌ পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা কৃত্রিম একরকম কম্পে জি-ন্দনের রস যা হাল আমলের এবং আধুনিক পর্যায়ের।

যা ক্ল্যাসিকাল আগমনী তার সবচেয়ে বড় গুণ যে তাতে সফিস্টিকেশন নেই,—তা রাগসঙ্গীতকে আশ্রয় করলেও পুরোপুরি লোকধর্মী,—তাতে ওস্তাদি থাকলেও তা যেন শরতের রৌদ্র ছায়ায় আপনাকে একান্ত প্রাকৃতিক নিয়মে বিস্তার করে দেয়,—গ্রামীণ থেকে নাগরিক সকলেই সেই রসের স্নিগ্ধতায়, ভাবালুতায়, স্পর্শকাতরতায় মুগ্ধ হয়ে যান। এই আবেদনই হচ্ছে মানবিক আবেদন যা কৃত্রিমতায় কলুষিত নয়। কিন্তু যুগধর্মের রীতি থেকে বোধ করি অব্যাহতি নেই। সর্বজনীন পূজায়, প্রতিমায় যে আধুনিকতা প্রবলভাবে সোচ্চার সে আগমনীর গানেও সেইভাবেই বিরাজমান। তাই এই আগমনীকে 'তথাকথিত আগমনী' বলছিলাম।

শোনা যায় রামপ্রসাদ আগমনী গানের নবতর সূচনা করেন চলতি বাংলাভাষায়। তিনি কি ঢঙে গাইতেন বলা শক্ত তবে পরবর্তীকালে আগমনী গানে টপ্পার প্রয়োগ যথেষ্ট ঘটেছিল কিন্তু ধ্রুপদী চালে এ ধরণের গান প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আগমনীর গানে বহু সুর প্রযুক্ত হত কিন্তু প্রধান ছিল ঝিঁঝিট, খাম্বাজ আর বিভাস। বাংলার বিভাসে এমন একটা আবেদন আছে যা অন্যত্র পাওয়া যায় না। এই বিভাস যেন লোকসঙ্গীতেরও একটা আমেজ এনে দিত। দাশরথির আমলে আগমনীর রীতিতে আরও একটু লোকধারার বৈশিষ্ট্য অনুভূত হয় এবং আগমনীর গান অতিশয় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তারপরে গিরিশচন্দ্রও তাঁর আগমনীর গানে একটু নূতন রস এনেছিলেন নাট্যপ্রয়োগের দিক থেকে। ভক্তিরসের গান মঞ্চে গাওয়াতে তিনি ভালবাসতেন এবং বলা বাহুল্য, সে কারণে গানের কিছুটা নবতর বিবর্তনও আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এইভাবেই চলে আসছিল আগমনীর গান।

আমরা যে যুগে আগমনীর গান শুনতে আরম্ভ করেছি সেটা বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক। তখন গায়ক গায়িকাদের মধ্যে যাঁরা একটু গান বাজনা জানতেন তাঁরা সকলেই আগমনী গাইতেন। কিন্তু সকলের গলাতেই যে আগমনীর সাড়া জাগত এমন নয়, বিশেষ করে সেকালের গায়িকাদের গলায় যে ভঙ্গী ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল সেটা ভক্তিরসের উদ্দীপক ছিল না। স্পষ্টই বোঝা যেত অনেক কষ্ট করে তাঁদের শিক্ষা দিয়ে এসব গান রেকর্ড করানো হত। এযুগেও এই ধরণের গায়িকা দু-চার জন আছেন,—ঘটা করে এঁদের দিয়ে প্রাচীন বাংলাগান বা আগমনী গাওয়ানো হয়, কিন্তু সেসব গানের প্রকৃত গায়কী যে এঁরা আয়ত্ত করেছেন এটা ধারণা করবার মত কোনও প্রমাণ এঁদের কণ্ঠে পাওয়া যায় না। আসলে বহু বৎসর ধরে এঁরা বহু গান রেকর্ড করে এসেছেন, যেমনটি শেখানো হয়েছে তেমনটি গাইতে চেষ্টা করেছেন। পুঁজি এইটুকই—তার বেশী নয়। এঁদের নিয়ে খুব একটা মাতামাতি করবার কোনও হেতু তো খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি লোক যথার্থ আগমনী বা শ্যামাসঙ্গীত গাইতে পারতেন তিনি ছিলেন—কে মল্লিক। তাঁর রেকর্ড কি আজকাল বাজানো হয়? কই শুনি বলে তো মনে হয় না। কে মল্লিক মহাশয়ের কণ্ঠে কোনরকম সফিস্টিকেশন ছিল না—বরং গ্রাম্যভাব ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের আগমনী শুনলে চোখে জল এসে যেত। তাঁর অনেক আগমনীর মধ্যে একটি গানের প্রথম দু-একটি লাইন আমার মনে আছে-

আমার উমা কই গিরিরাজ
কোথায় আমার নন্দিনী
মোর লীলাময়ী চঞ্চলারে ফেলে
এ কোন তেজী মূর্তি নিয়ে এলে
এযে মহীয়সী মহারাণী
বামা মহিষমর্দিনী।

সিদ্ধু কাফীর করুণ রসে এ গানটি অতুলনীয়। শেষের দিকে তিনি গেয়েছিলেন—'শারদীয়া নিশি হতেছে ভোর আগমনী ওই বাজিছে, জগতজননী আসিবে বলিয়া হরষে জগত সেজেছে' (মিশ্র ললিত)। খুব সম্ভবত গানটি নজরুলের রচনা। নজরুল ইসলাম এযুগে বহু শ্যামাসঙ্গীত ও আগমনী রচনা করেছেন। কিছু তাঁর নিজের প্রেরণায়, কিছু গ্রামোফোন কোম্পানীর চাহিদা মেটাতে। যদিচ এর ধারাটা কাব্য-সঙ্গীতেরই তথাপি প্রাণস্পর্শী আবেদনের অভাব এসব গানে নেই। প্রভূত প্রতিভার স্পর্শে এ গানগুলি আমাদের সঙ্গীতে চির আদরণীয় বস্তু হয়ে থাকবে। তবে এসব
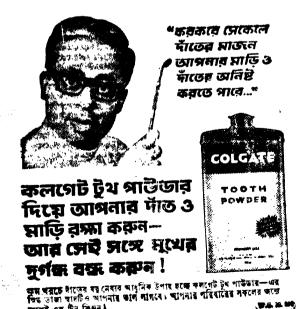
গানকে নজরুলগীতি বলে প্রচার করাই ভাল. চিরাচরিত শ্যামাসঙ্গীত বা আগমনী আখ্যা দেওয়াটা ঠিক হবে না, কেননা তার চিরায়ত রূপটি ভিন্ন পর্যায়ের। নজরুলের রচনা—অঙ্গে আগমনীর আবাহনে কি সুর উঠেছে বেজে বা 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে' যাঁরা ধীরেন দাসের গাওয়া রেকর্ডে শুনেছেন তাঁরা ভুলতে পারবেন না। সম্প্রতিও এগান দুটি গাইতে শোনা যাচ্ছে।

শেষে আবার একটু আগের কথায় ফিরি। অতি সম্প্রতি একটি বিদেশী দূতাবাসের আয়োজনে অনুষ্ঠিত আগমনীর আসরে উপস্থিত ছিলাম। শুনে তেমন সুখী হইনি। বার বার এই কথাই মনে হয়েছে যে, আগমনীর মূল আবেদন কোথায়, কিভাবে তার রেনডারিং হবে সেটা যেন অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। একজন যথার্থ ভাল গায়ক তাঁর টপ্পা ভঙ্গী আগমনী গানে যে সব কাজ প্রয়োগ করেছিলেন সেগুলি বিদগ্ধতার পরিচয় দেয় না। ট্রাডিশনাল পদ্ধতিতে যে প্রয়োগ মানায় সেটা প্রবর্তন করাই ভাল,—কিছু ঠুংরি, কিঞ্চিৎ খেয়াল যত্রতত্র সন্নিবেশ করাটা দায়িত্বশীল শিল্পীর পরিচায়ক নয়। যে বিদেশী দূতাবাস এই আয়োজন প্রতি বৎসর করে থাকেন তাঁদের অনুরোধ করব তাঁরা যেন হালকা অনুষ্ঠানের প্রশ্রয় না দেন, অপটু কথকতা বা অনাবশ্যক বক্তৃতা বাদ দিয়ে শিল্পী গাম্ভীর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্বটুকু পালন করবেন এটাই কাম্য। এসবের জন্য নানা বারোয়ারী আসর তো খোলাই রয়েছে।

শার্ঙ্গদেব

চিঠিপত্র

গত ১ লা সেপ্টেম্বর দেশ-এ প্রকাশিত শ্রীপঞ্চানন রায় চৌধুরীর 'সঙ্গীতে ধ্বনি-বিজ্ঞান' শীর্ষক পত্রটির জন্য লেখককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কেবলমাত্র নকল করবার মনোবৃত্তি নিয়ে বর্তমানে সঙ্গীতের যে রেওয়াজ চলছে তার মধ্যে এজাতীয় চি[ন্তা] করবার মত লোক আছেন, ভাবতে আশ্চ[র্য] লাগে।

শিক্ষার্থিনী এবং শিক্ষিকা দুই হিসেবেই দেখেছি সঙ্গীতে ধ্বনি বিজ্ঞান সম্পর্কিত বীক্ষণাগার অতি অবশ্য থাকা উচিৎ। বিজ্ঞানের নানান কচকচির কথা বাদই দিলাম—নাট্যশাস্ত্রোল্লিখিত 'কাকু' কথাটির যদি সমর্থ খুঁজতে হয় তাহলে বীক্ষণাগার ছাড়া গতি থাকে না। যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার সঙ্গীতশিক্ষা সেখানকার মাননীয় অধ্যাপকরা ধ্বনিবিজ্ঞান পড়াবার সময় বীক্ষণাগারের অভাবে বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন। সঙ্গীতকে যদি সত্যি সত্যি অ্যাকাডেমিক ধর্মী করে তুলতে হয় তাহলে বীক্ষণাগারের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে।

পুষ্প রায়,
হাওড়া

শরীর দুর্বল থাকলে সর্দিকাশি সারতে চায় না

সেইজন্য সর্দিকাশির বিরুদ্ধে যোঝবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার শরীরে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা চাই। একমাত্র ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড লাল লেবেলই এই দুই কাজ একসঙ্গে করতে পারে: সর্দিকাশি প্রতিহত করে, আর দুর্বলতাও দূর করে।

সুস্থ এবং সবল থাকার জন্যে...

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড লাল লেবেল

পরিবারের সকলের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য টনিক।

ওয়ার্নার-ল্যাম্বার্ট এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

WH 2037

সাফল্য কি ওঁর মাথায় চড়ে বসেছে?

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার হেসে বললেন .

"সাধারণতঃ মাথায় আমি অন্য কিছু চড়তেই দিই না—একমাত্র প্রোটীন-সমৃদ্ধ ব্রিলক্রীম ছাড়া। এতে আমার চুল সজীব আর পরিপাটী থাকে। ঠিক যেমনটি আমার পছন্দ।"

ব্রিলক্রীমের প্রোটীন চুলের গোড়াকে শক্ত করে, চুলের পুষ্টি যোগায়। সারাদিন চুলকে সুন্দরভাবে বশে রাখে। তাছাড়া, এতে চুল চট্‌চট করে না। চুলে তেলতেল ভাব হয় না। এটি এক আধুনিক কেশ-প্রসাধন।

ফারুকের মত আপনিও একটা কাজের কাজ করুন। প্রোটীন-সমৃদ্ধ ব্রিলক্রীম ব্যবহার করুন।

প্রোটীন-সমৃদ্ধ

ব্রিলক্রীম সুন্দর চুলের স্বাস্থ্যকর প্রসাধন

BrF-3191-B-1

॥ পনের ॥

ধোঁয়া ছড়ানো চলমান হাওয়া-গাড়ি না, যেন এক চলমান মঞ্চ এবং ত্রিদিবেশের মনে হয় একটি নিখুঁত নরক সজ্জা। দিকে দিকে বিভিন্ন দৃশ্য, প্রবহমান ঘটনা, ক্রিয়াশীল চরিত্রবৃন্দ, নরকের সেই ছবিটার মতো, যা টাঙানো থাকে দোকানেই বেশি। কিন্তু নরকের সেই ছবিতে আছে বিভিন্ন পাপের বিভিন্ন শাস্তি, তপ্ত তৈলকটাহে নিক্ষেপ, চক্ষু উপড়ানো, চাবুকের কষাঘাত, সহস্র বৃশ্চিকের আক্রমণ ইত্যাদি যা মনোযোগ দিয়ে দেখলে গায়ে শিহরণ জাগে, শাস্তির কল্পনায় ভয় লাগে, যদিচ সে ছবি তেমন বিশ্বাসযোগ্য না। চলমান এই নরকের দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। নরক। ত্রিদিবেশের তা-ই মনে হয় এবং মনে জিজ্ঞাসা জাগে, এইসব ঘটনাবলীর মধ্যে কি কোনো বিশেষ সংকেত রয়েছে? কোনো ইঙ্গিত? এই সময়ের বা আগামী অনাগত কালের? অন্যথায় এটা কেমন করে সম্ভব, দিনের বেলা ট্রেনের কামরায় একটি মেয়েকে, সে যাই হোক, তাকে একদল পুরুষ আক্রমণ করে তার পোশাক ছিঁড়ে দেয়! এমন না যে ধর্ষণ করে, আসলে নাকি শাসন করে, ক্রুদ্ধ জনতা এবং তারা সুনীতিসম্পন্ন, কেননা তাদের ক্রুদ্ধ গর্জনে সেইসব কথা শোনা যায়, 'একটা কুত্তি বেশ্যা ভদ্দরলোকদের গা ঘেঁষে বসে!' বা 'একটা বেশ্যার এত বড় সাহস গায়ে হাত তোলে!' এবং অতএব 'শালীকে মেরে ফেলে দাও, ছুঁড়ে ফেলে দাও গাড়ি থেকে!'...

নীতি শাসন প্রহার, ভদ্দরলোক আর তাদের ছেলেদের, ওদের হাতে কী শালীনতার প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা, দলদলা মাংসের গা খবলিয়ে লাল জমার টুকরোর পতাকা উঠিয়ে তোলা, অথচ ত্রিদিবেশের মনে হয় চলমান ট্রেনের কামরায় এক বেশ্যাকেই জনতা ধর্ষণ করে এবং ওদের ক্রুদ্ধ চোখ যেন রাত্রের অন্ধকারে শেয়ালের চোখ, ঘৃণায় এক তৃপ্তির জ্বালা এবং এখনো গান শোনা যায়, 'একে ছিঁড়ি, তাকে দিলি'...এবং কখন? যখন রাজনৈতিক-মতবিরোধে দুজনের আলোচনা কোন্দায় এবং যে কারণে মতবিরোধের উত্থাপন, সেই নিমিত্তের ভাগী রক্তাক্ত আহত অবস্থায় এখনো বন্ধ বাথরুমে!

বাথরুমের দরজা খোলে নি, দরজার কাছে লোকটি হয়তো কোনো শব্দ শুনে থাকবে। যদি শুনে থাকে সেটা একটা আশার কথা। ভিতর থেকে যদি কোনো শব্দ বেজে থাকে তাহলে অনুমান করা যায়, চীনা এখনো জীবিত।

'ছাড়ুন, ছেড়ে দিন, কী হচ্ছে এসব?' একটা মোটা ঝাঁঝানো স্বর শোনা যায় মেয়ে-ঘিরে-থাকা দলটার কাছে। ত্রিদিবেশ সেদিকে তাকায়। কালিঝুলি মাখা নীল জিনের হাফ প্যান্ট পরা আর হাফ শার্ট গায়ে দেওয়া বেঁটে খাটো কিন্তু চওড়া শক্ত এক জোয়ান সেই দলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দাঁতে দাঁত টেপা চোয়াল, শক্ত মুখ, জ্বলন্ত চোখ, তার কঠিন হাতে যেন দলা পাকানো এক একটা জোঁককে টেনে টেনে তোলে আর সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে রীতিমতো যোদ্ধার হুংকারে বাজে, 'ছাড়ুন, সরুন এখান থেকে। মামদোবাজী? যা খুশি?'...

ত্রিদিবেশেরও যেন জয় হয়, জয় করে জোয়ানের অভিব্যক্তি আর কাজ। দাঁতে দাঁত চেপে ও হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, নিঃশ্বাস বন্ধ করে এগোতে উদ্যত হয়—রশীদ ঝটিতি ওর হাত ধরে বলে, 'কোথায় যাচ্ছেন।'

ত্রিদিবেশ উচ্চারণ করে রাসকেল-গুলো—।'

'থাক, রাসকেলগুলোর ব্যবস্থা যার করবার সে করছে।' রশীদ বলে, 'তুই বোস। এবার ঠিক হাতে পড়েছে, তুই গিয়ে ঝামেলা বাড়াবি।'

ত্রিদিবেশ অবাক ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'তোর গায়ের মধ্যে নিশপিশ করছে না?'

রশীদ নির্বিকারভাবে বলে, 'করলেও কিছু করার নেই। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।'

অবাঙালী রশীদ এইরকম বাঙলা বলে, এবং আরো বলে, 'দ্যাখ না, জোয়ানটা একলাই সবগুলোকে টিট করবে। ওকে যদি কোনো ব্যাটা গায়ে হাত দেয় তখন আমরা দেখবো।'

মিথ্যা না, রশীদের কথা যথার্থ। যুবকটিকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না, প্রতিবাদ করে না। সে যেন কুকুরের গা থেকে এঁটুলি টেনে টেনে তোলে আর ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং তার আচরণ দেখে বোঝা যায়, সে সকলের সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত।

'দিনকালের কী অবস্থা হচ্ছে, ছি ছি ছি।' সেই প্রৌঢ় বলেন, 'যেমন মাগীটা, তেমনি লোকগুলো। তোমাদের খারাপ লেগেছিল তো, আগেভাগেই মেয়েটাকে নামিয়ে দাওনি কেন?'

কেন? তাই বা কেন, ত্রিদিবেশের মনে প্রশ্ন জাগে, মেয়েটিকে নামিয়ে দেবার কী অধিকার আছে এই সব লোকদের। মেয়েটির কথাতেই প্রমাণ, প্রথমে সেই আক্রান্ত হয়েছিল, তারপরে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

এ সময়েই গাড়ির গতি কমে আসে, গাড়ি একটা স্টেশনে ঢোকে এবং ত্রিদিবেশ জোঁক আর এঁটুলিমুক্ত মেয়েটিকে দেখতে পায়, লাল জামার অনেকখানিই বুকের কাছে নেই। সাদা থান কাপড়ের সাধারণ বডিস টেনে নামানো, অধরা বুকের একটি কালো পিণ্ড মুক্ত। খোঁপা খোলা, কপালের ওপর ছড়ানো চুল, ঠোঁটের কষে রক্ত। বাঘিনী বলা যায় না, যেন হিংস্র কালো মার্জারি, তার মুঠিতেও কারোর ছিঁড়ে নেওয়া চুলের গুচ্ছ. একটি শাসিত বেশ্যা, এখনো ফোঁসে তার সেইসব অতি তীব্র গালির ভাষায়। ত্রিদিবেশ বিভ্রান্তি আর অস্থিরতা বোধ করে, শিউলীর কথা আবার মনে পড়ে যায়। হিংস্র মার্জারি বটে, বেশ্যাটির জন্য কষ্ট বোধ করে এবং একই সঙ্গে একটা কৌতুকও বোধ করে যখন মেয়েটি বলে, 'বেলাড্ডি বাসটার চুতিয়া কাহিংকা।'

নীল জিনের কালিঝুলি মাখা প্যান্ট শার্ট পরা যুবকটি মেয়েটিকে নাঁসিয়ে নির্দেশ দেয়, 'যাও, উতর যাও, দুসরা কামরা মে যাও। জলদি যাও।'

ইতিমধ্যে গাড়ি দাঁড়ায়, জোয়ান মেয়েটিকে দরজার দিকে হাত দেখায়। আমক্রমণকারীরা এখনো ফোঁসে, যদিচ স্পষ্ট তাদের শক্তি বিনষ্ট এবং কারোর কারোর মুখে প্রকৃতই মার্জারির নখের দাগের রক্তরেখা, দু'এক-জনের জামা ছিন্ন, চুল অবিন্যস্ত। প্রতি-শোধের আকাঙ্ক্ষায় এখনো তাদের দৃষ্টি জ্বলজ্বলে এবং শোনা যায়, 'একটা বেশ্যার এতো সাহস—'

ত্রিদিবেশের মনে হয়, মেয়েটির ঘৃণা চলকানো চোখ দুটো যেন জোড়া। সে জোয়ানের দিকে তাকায় না, তার আক্রমণ-কারীদের দিকে তাকায়, কিন্তু জোয়ানের

সব তুলোই বলতে গেলে এক
তবে আপনার যদি
পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন থাকে
তাহলে পুরোটা পড়ে দেখুন

জিগজ্যাগ
অ্যাবসর্বেণ্ট

আই. পি..

১। ভারত থেকে যে আন্তর্জাতিক মানের তুলোর রপ্তানী সর্বাধিক তার নাম ল্যাভিনো-কাপুর জিগজ্যাগ কটন উল।

২। জিগজ্যাগ প্যাকেজিং : যেটুকু প্রয়োজন ঠিক সেইটুকু বার করে নিন। বাকীটা যেমন কে তেমন মোড়কে থাকবে, ধুলো-হাওয়া কিছু লাগবে না।

৩। চট ক'রে শুষে নেয়।

৪। আন্তর্জাতিক সার্জিক্যাল মানের উপযুক্ত।

৫। ধবধবে সাদা ও নিখুঁত।

৬। উৎকর্ষে ইতালীর এরমানো ল্যাভিনোর কারিগরি দক্ষতার ছাপ।

ঔষুধ বিক্রেতা ও বিভাগীয় বিপনিগুলিতে বিভিন্ন আকারের প্যাকে পাওয়া যায়।

ল্যাভিনো-কাপুর
প্রাইভেট লিমিটেড

ফ্যাক্টরী—আগ্রা রোড, এবং থানা, বোম্বাই।

বিক্রয় কেন্দ্র : আম্বালা, অমৃতসর, বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী ও গাজিয়াবাদ।

নির্দেশ অমান্য করে না এবং শুনেতে অবাক লাগে, বারাঙ্গনার মতো আক্রমণকারীদের দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতে আহ্বান জানায়, 'উতারকে আর কুত্তালোগ, দেখ লেগি, মায়ীকে দুধ তুলেগ কিতনা পিয়া, আ যা কমিনালোগ... ।'

সে নেমে যায়। ত্রিদিবেশ দেখতে পায় তার লাল জামার পিছনেও ছেঁড়া, ঘাড়ের কাছে নখের ক্ষতরেখা। সে প্ল্যাটফরমে নামতেই কিছু লোক জমে যায় এবং সে গাড়ির দিকে তাকিয়ে একভাবে যুদ্ধের আহ্বান জানাতে থাকে তার ভাষায়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীরা তখন যে যার জায়গা নিয়ে বসতে ব্যস্ত। দরজার কাছে আসনের যাত্রীরা এবং প্ল্যাটফরমের অধিকাংশ লোকেরা মেয়েটির ছিন্ন পোশাক, অপাতত বডিস দিয়ে ঢেকে দেওয়া বুক, তার অসহ্য বয়স আর গালাগাল শুনে হাসাহাসি করে।

'শালা, একেবারে রক্তখেগো মা কালী।' কেউ বলে।

কে যেন চিৎকার করে ডাকে, 'এই লক্ষ্মণ, চলে আয়, বোস।'

জোয়ান স্বরের লক্ষ্যে তাকিয়ে সেদিকে যাবার আগে একবার নীতিবান আক্রমণকারীদের দিকে তাকায়, দেখে বোঝা যায়, তার মন এখনো অশান্ত। ত্রিদিবেশ দেখতে পায়, 'লক্ষ্মণ' বলে যারা ডাকে তাদের পোশাকও প্রায় একরকমের—ছোটখাটো একটি দল, একটা জায়গায় বসা। লক্ষ্মণ সেদিকে যেতে উদ্যত হতেই কে যেন বলে, 'আপনি থামিয়ে দিলেন ভাই, তা না হলে আজ মাগীকে দেখিয়ে দিতাম।'

লক্ষ্মণ ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়, বক্তাকে কঠিন স্বরে বলে, 'যান না, গাড়ি তো সবে ছাড়ছে। ও তো আপনাদের ডাকছে, দেখিয়ে দিয়ে আসুন।'

সেই প্রৌঢ় বলেন, "কেন আবার ঝামেলা বাড়ানো হচ্ছে? আজ যে কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম, গাড়িতে ওঠা ইস্তক একটা না একটা গোলমাল লেগেই আছে। তুমি যাও তো ভাই, লক্ষ্মণ নাকি নাম তোমার, তুমি তোমার জায়গায় যাও। ছুঁড়িকে নামিয়ে দিয়েছ বেশ করেছ, খুব ভালো কাজ করেছ, এদের কথায় আর কান দিতে হবে না।'

লক্ষ্মণ যার নাম, ত্রিদিবেশের চোখে যে একটি বীরের মতো পুরুষ, সে খানিকটা অবহেলা ভরে ভদ্দরলোকদের দিকে তাকায়, তারপরে নিজের জায়গায় বন্ধুদের কাছে চলে যায়। ওর চওড়া মুখ, চোয়ালও চওড়া, পাথরের মতো শক্ত মুখে, চোখ দুটো ছোট কিন্তু ঝকঝকে। ত্রিদিবেশের ইচ্ছা করে ওকে সামনে বসিয়ে ওর ছবি আঁকে। ওর কালো সিঁথে কাটা চুল তেল ঝকঝকে, দেখলেই মনে হয় স্নানের পরে চুল এখনো তেলে-জলে ভেজা।

কে একজন বলে, 'আপনি জানেন না দাদা, এ সব মাগী আজকাল কীরকম বেড়ে উঠেছে। শহরে পাড়ায় [illegible] সঙ্গে যা লীলা যদি দেখেন। [illegible] চোখের সামনে—।'

যাকে উদ্দেশ করে [illegible], সেই [illegible] হাত তুলে বললে, 'জানি ভাই জানি, আমাকে আর কী বলবেন। আমার কি চোখ নেই? বুঝলেন, একে বলে [illegible], আরো কতো কী দেখতে হবে, কে [illegible] আর বেশি দিন না।' প্রৌঢ় এবার বিশেষ ইশারার ভঙ্গি করেন, বলেন, 'ওদিকে তো ঠ্যালার নাম বাবাজী। রেঙ্গুন থেকে তো মেরে তাড়িয়েছে। কাগজে আর কতোটুকু খবর থাকে? আসাম গেল বলে, চিটাগংও বোধ হয় গেছে, কলকাতার আর বেশি দিন না। বলতে গেলেই দেয়ালে পোস্টার দেখবেন, গুজবে কান দেবেন না। সব ঠান্ডা হয়ে যাবে, কিছু ভাববেন না।'

বলে প্রৌঢ় তার আশেপাশে একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন। একজন বলে, 'গুজবে কান দিতে বারন করছে, অথচ নিজেরাই গুজব ছড়াচ্ছে।'

প্রৌঢ় বলেন, 'তার মানে হলো ভাই, ওদের গুজব শুনতে হবে, পরের কথায় কান দিও না।'

রশীদ প্রৌঢ়ের প্রতি নিচু স্বরে একটি গালি দেয়, যা মানুষের বিশেষ অঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। ত্রিদিবেশেরও এইসব আলোচনা ভালো লাগে না, কারণ এসব লোকের কথার মধ্যে সত্য বা বিশ্বাস বলে কিছু আছে, মনে হয় না। কিন্তু অন্যত্র মতবিরোধ থেমে নেই। মেয়েটির ঘটনার আকস্মিক চমকে একটু সময়ের বিরতি ছিল মাত্র। ছোটখাটো বিষণ্ণ মুখ ব্যক্তিটি চুপ করে যেতেন হয় তো, সেই যুবকটি ছাড়তে রাজী না, বলে, 'মোন্দা ফল কিছুই হয়নি তা কি আপনি বলতে পারেন?'

চল্লিশোর্ধ্বের ব্যক্তি যেন স্মরণ করতে পারেন না, কথার প্রসঙ্গটা কী। এখনো যেন তাঁর চোখে, একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনার বিচলিত ছায়া এবং ভুরু কুঁচকে যুবকের দিকে তাকিয়ে নিমেষ কয়েক পরেই তাঁর যেন মনে পড়ে যায় এবং তাঁর মুখের অভিব্যক্তিতে দৃঢ়তা ফোটে, যদিচ একটু হাসি ধরে রাখতে চান ঠোঁটের কোণে। বলেন, 'আপনাকে আমি চিনি, আপনি তো যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পড়েন, না?'

যুবকের ঠোঁটেও একটু বিদ্রূপের হাসি ঝিলিক দেয়, বলে, 'চিনি আপনাকেও আমি, তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি রিপনের প্রফেসর, ধরনী মজুমদার। কিন্তু আপনি যে বললেন, চিয়াং কাইশেক আসাতে মোন্দা ফল কিছুই হয়নি, তা কি সত্যি?'

ধরনী মজুমদার। ত্রিদিবেশের মনে হয় নামটা যেন শোনা-শোনা। মুখটা চেনা-চেনা লাগছিল, নামটা শুনে মনে হয় ব্যক্তিটি ওর চেনা। মুখোমুখি [illegible] নেই। রিপনের প্রফেসর পরিচয়টাই [illegible] আরো বেশি করে মনে করিয়ে দেয়, ধরনী মজুমদার নামটা শোনা, জানা এবং রাজনীতির সঙ্গে তা যুক্ত। ধরনী মজুমদারের ঠোঁটের কোণে সেইরকম হাসি, বললেন, 'আমি গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনার মোন্দাফলের কথা বলছি। না, কোন ফল হয়নি, তাঁদের আসল আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। তার প্রমাণ দেখতেই পাচ্ছেন, চীন এখন অ্যান্টি অ্যাকসিস যুদ্ধে সামিল হয়েছে, গান্ধীজী জেলে রয়েছেন।'

যুবক বলে, 'অ্যান্টি অ্যাকসিস বলছেন কেন, অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট বলুন। এখন অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট লড়াই চলছে।'

ধরনী মজুমদার একটু গম্ভীর হয়ে ওঠেন, তাঁর ঠোঁটের হাসি মিলায়, মোটা স্বরে বলেন, 'আপনি বরং আপনাদের লিডার হীরেন মুখার্জিকেই জিজ্ঞেস করবেন না, চিয়াং কাইশেকের ভারতবর্ষে আসা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে কী না। আপনাদের স্টুডেন্ট ফেডারেশন থেকেও তো চিয়াংকে ডেকেছিলেন, তিনি রিগ্রেট করেছিলেন। করবেনই, কারণ আপনাদের নিয়ে চিয়াং-এর মাথা ব্যথা ছিল না, ছিল ন্যাশনাল লিডারদের নিয়ে।'

যুবকের স্বরে এবার একটু ঝাঁজ ফোটে, এবং দৃঢ়তা। বলে, 'আপনি রিগ্রেট করা কাকে বলেন? নিজেদের দরকার মতো কথা তৈরি করে নেবেন না, তৈরি করা কথাকে মিথ্যা কথা বলা হয়। একজন অধ্যাপকের মুখে এটা মানায় না।'

ধরনী মজুমদারের বিষণ্ণ মুখে চাঁকতে একটা রক্তের ঝলক লাগে এবং চোখেও। তিনি আর একটু বেশি করে ঘাড় ফেরান, ঘাড়ের ভাঁজে একটি বলিষ্ঠ দৃঢ়তা, যা ছোটখাটো মানুষটিকে যেন শক্তিমান করে তোলে। স্বরে ঝাঁজ নেই, উত্তাপ বর্তমান। জিজ্ঞেস করেন, 'কী বলতে চান, আমি মিথ্যুক?'

'আপনাকে মিথ্যুক বলার দরকার নেই, কিন্তু আপনি ঠিক কথা বলেননি।' যুবক নিঃশঙ্ক এবং খানিকটা নির্বিকারভাবে বলে, দেখে মনে হয় সে আর এ বিষয়ে কথা বলতে চায় না, কারণ সে আবার বাথরুমের দরজার দিকে তাকায়, কিন্তু আবার মুখ ফিরিয়ে একই স্বরে ও ভঙ্গিতে বলে, 'চিয়াং কাইশেক সময় করতে পারেননি বলেই এস এফ-এর ডাকে আসতে পারেননি। আপনার কথা শুনলে মনে হয় তিনি ইচ্ছা করেই এস এফ-এর ডাকে সাড়া দেননি। আর তাঁর ভারতে আসা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে

নতুন বেরিয়েছে!
দুনিয়ার সেরা বাচ্চার জন্যে

কী না, এ কথা হীরেনবাবুদের জিজ্ঞেস করার দরকার করে না, আমি নিজেই তা জানি।'

'কী জানেন?' ধরনী মজুমদারের ঠোঁট দুটি এখন শাণিত ও বাঁকা দেখায়।

যুবক বলে, 'জানি, বুর্জোয়া নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার ব্যর্থতাই আপনার কাছে সব থেকে বড় ব্যাপার। জনসাধারণের কাছে তা না। ফেবরুয়ারির কথা মনে করে দেখুন, চিয়াং কাইশেক যখন কলকাতায় এসেছিলেন, মানুষের মধ্যে কীরকম উদ্দীপনা এসেছিল।'

ধরণী মজুমদারের ঠোঁটের বক্রতা আরো ধারালো দেখায়, বলেন 'তাই নাকি? না, কলকাতার মানুষের মধ্যে আমি সেরকম কোনো উদ্দীপনা দেখি নি। কলকাতার মানুষদের খেয়ে দেয়ে অনেক কাজ ছিল। তবে হ্যাঁ, উদ্দীপনা দেখেছিলাম এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এখন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্বাভাবিক। কিন্তু ইংরেজরা চিয়াংকে এনে মোটেই সুবিধা করতে পারেনি, যদিও অনেক আশা নিয়ে তারা ভদ্রলোককে ডেকে এনেছিল। অনেক গর্জন হয়েছিল, বর্ষায়নি কিছুই।'

'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে কাদের বলছেন আপনি?' যুবকের স্বরে প্রতিবাদের থেকেও একটা বিস্ফোরণই যেন আসন্ন বোধ হয়।

ধরনী মজুমদার কিছুটা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন, বলেন 'এ সব তর্কে আমার যেতে ইচ্ছা করে না, যাবোও না, তবে বন্ধু যারা তারা নিজেরাই ভালো জানে, বৃটিশ এখন তাদের হাতে হাত মেলানো সাথী—মানে কমরেড।'

ধরণী মজুমদারের ঠোঁটের কোণে সেই হাসি আবার উদিত হয়, যা বিকীর্ণ তাঁর চোখেও। যুবকের ঠোঁট ধনুকের ছিলার মতো, তার কালো ডাগর চোখের দৃষ্টি ক্ষুব্ধ, কুপিত। বলে, 'তর্কে আমিও আপনার সঙ্গে যাবো না, কারণ আপনি পলিটিকস ছেড়ে স্ল্যাণ্ডারিং করবেন এখন বেশি। কিন্তু আপনি তো দেখছি ভয় পেয়েছেন।'

ধরণী মজুমদার ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে তাকিয়ে উচ্চারণ করেন, 'ভয়?'

'নয়?' যুবক বলে, 'আপনি তর্কে আসতে চান না, কারণ আপনার আসল চেহারা ধরা পড়ে যাবে, আপনাকে পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে। আপনি কংগ্রেসের ডিস্ট্রিক্ট কমিটি থেকে গত আগস্টের আগেই রিজাইন দিয়েছেন, তা আমি জানি।'

ধরণী মজুমদার হাসেন, তাঁর দাঁত দেখা যায়, যদিচ তাঁকে একটু অপ্রস্তুত দেখায়। তিনি আশেপাশে অনেকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন। ত্রিদিবেশের মনে পড়ে যায়, ধরণী মজুমদার কে। ও ধরনী মজুমদারের বক্তৃতা শুনেছে। এবং দুজনের কথাবার্তায় অন্তরা অনেক কথা মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে সবিতা পণ্ডিত, মোহন, বিপিন আর বকুলতলা [illegible] ঝড়, এবং প্রবীণ কংগ্রেসের বয়স্ক নেতাদের প্রতি ওর তেমন কোনো আস্থা নেই, মনে হয় ও'রা দূরের মানুষ, অপরিচ্ছন্ন, অস্পষ্ট এক দূর জগতের মানুষ এবং কংগ্রেস একটি অপরিচিত জগত। সবিতা পণ্ডিতকে ও ভালবাসে, সেটা সবিতা পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব এবং সেই ব্যক্তিত্ব যে মত ও পথকে বিশ্বাস করে, সেই মত ও পথকে মিথ্যা বা হীন মনে করতে পারে না। সেই হিসাবে যুবককে ওর বেশি সমর্থন জানাতে ইচ্ছা করে, কিন্তু চিয়াং কাইশেককে নিয়ে এতো সব কথা, এতে বিবাদ বিসম্বাদ ভালো লাগে না, বিরক্তি বোধ করে। তথাপি ধরণী মজুমদারের রিজাইনের কথা শুনেই, অকারণেই ও খানিকটা কৌতূহলিত হয়ে ওঠে, অকারণ—কারণ, ধরণী মজুমদারের পদত্যাগে সত্যিই ওর কিছু যায় আসে না, চিন্তিতও না, কেবল মাত্র ঘটনার দর্শক আর শ্রোতা হিসাবে জড়িয়ে যাওয়া মানুষ।

ধরণী মজুমদার বলেন, 'সংবাদটা নতুন না, খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল। তবে তো ভালোই বুঝেছেন, আমি ভয়ে জেলা কংগ্রেস কমিটি থেকে রিজাইন করেছি। এখন ভয় দেখাচ্ছেন কেন, আপনি নিজেই আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবেন নাকি?'

বলে তিনি আবার আশেপাশের অনেকের মুখের দিকে তাকান। আশেপাশের যাত্রীরা তাঁর মুখের দিকে তাকান এবং যুবকের মুখের দিকে, অংশ গ্রহণের মতো কথা সম্ভবত কারোরই নেই। যুবক বলে, 'না, আপনার মতো দেশদ্রোহীকে দেশের লোকেরা এমনিই চিনে নেবে, আপনাকে আমি পুলিসে ধরিয়ে দেবো না।'

ধরণী মজুমদার এবার শব্দ করে হাসেন। তাঁর গম্ভীর বিষণ্ণ মূর্তির এই পরিবর্তন ত্রিদিবেশের মন খারাপ করে দেয়, তাঁর চেহারা ওর দৃষ্টিতে যেন কেমন বদলিয়ে যায়। তিনি বলেন, 'দেশদ্রোহী! কুইসলিং যাকে বলেন আপনারা?'

'হ্যাঁ।' যুবক যেন একটু ঝুঁকে পড়ে বলে, 'আপনার রিজাইনের কারণও অজানা নেই, আর আপনার আসল নেতা কে, তাও জানি। তিনি এখন ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আনতে গেছেন আপনি তাদের রিসিভ করার জন্য মনের সুখে চুপচাপ অপেক্ষা করছেন। কিন্তু কাঁচ-কলা।'

বলে যুবক সত্যি সত্যি বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায় এবং তার চোখে মুখে এখন উত্তেজনা। ক্রুদ্ধ হলেও তাকে তেমন দীপ্ত দেখায় না, মূলত তার সমস্ত চেহারাটাই অতি কোমল।

ধরণী মজুমদার হেসে বলেন, 'আপনি দেখছি আমার সব খবর রাখেন, স্পায়িং করেন নাকি?'

যুবক বলে, 'না, স্পায়িং করবার দরকার হয় না, আপনার অ্যাকটিভিটিই সব বুঝিয়ে দেয়।'

ধরণী মজুমদার কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যান, যুবকের মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে দেখেন, এবং তাঁর মুখ আস্তে আস্তে শক্ত হয়, কয়েকটি রেখা জায়গা বদল করে। গম্ভীর স্বর শোনা যায়, 'টাইম ইজ এ গ্রেট ফ্যাকটর, টাইম মে অ্যানসার যু।'

বলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন, পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মোছেন। বোঝা যায়, তিনি আর ফিরে তাকাতে চান না। যুবক বলে, 'সময় কারোর উইশফুল অ্যানসার দেবে না, তার আর এক নাম ইতিহাস, আপনি সেটা দয়া করে মনে রাখবেন।'

ধরণী মজুমদার ফিরে তাকান না, কোনো জবাবও দেন না। ত্রিদিবেশের কানে, যুবকের কথা অনেকটা কবিতার মতো বাজে, 'তার আর এক নাম ইতিহাস।' কে এ যুবক। কোন্ শহরে থাকে। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ে, সম্ভবত ত্রিদিবেশের থেকে কিছু বড়, সবিতা পণ্ডিতের বয়সী হতে পারে। এই ভাববার মুহূর্তেই যুবকের সঙ্গে ত্রিদিবেশের চোখাচোখি হয়। যুবককে এখনো উত্তেজিত দেখায় এবং খানিকটা ক্ষুব্ধ আর অসহায়। ত্রিদিবেশ বলে ওঠে, 'আচ্ছা বাথরুমে লোকটা—।'

যুবক বলে, 'তাই তো দেখতে চাইছিলাম, পণ্ডিতেরা সব বড় বড় কথা আরম্ভ করে দিলেন।'

বলে সে আবার বাথরুমের দরজার দিকে ফিরে তাকায়। এই সময়ে গাড়ি শিয়ালদহ স্টেশনে ঢোকে, কামরার মধ্যে কয়লার ধোঁয়া। শেডের মধ্যে গাড়ি ঢোকে, ধোঁয়াচ্ছন্ন কামরা অন্ধকার হয়ে যায়, যাত্রীরা সবাই দরজার দিকে এগোয়। ত্রিদিবেশ যুবকের দিকে তাকায়, সে তখন বাংকের

একজিমা রোগ

সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত দাগ সহ আরও অনেক কঠিন কঠিন চর্মরোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ৮০ বৎসরের চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯)। পূরবী সিনেমার পাশে।

ওপর থেকে খাতা বই আর টি-সেট স্কোয়ার নামিয়ে হাতে নেয়। কিছু যাত্রী বার বার বাথরুমের দরজায় জোরে জোরে লাথি মারে, মেরে চলে আসে, এবং তাদের বিশেষ প্রাকৃতিক কাজটি করতে না পারার জন্য আফশোস এবং দৈহিক বৈকল্যের কথা ঘোষণা করে এবং সেই সঙ্গে চীনার মৃত্যু সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত ধারণাও ঘোষণা করে যায়। ত্রিদিবেশ তখনো যুবকের দিকে তাকিয়ে। যুবক যেন তা বুঝতে পারে, দরজার দিকে যেতে যেতে বলে, 'যা হবার হয়েছে, এখন আর কী দেখবো। ওর লোকেরা এসে নিশ্চয়ই খোঁজ করবে।'

রশীদ ত্রিদিবেশের হাত ধরে টানে, ডাকে, 'আয়।'

বাথরুমের দরজাটা খুলে যায়। খানিকটা ফাঁক, কিন্তু কারোকে দেখা যায় না। ত্রিদিবেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ওর যেন নিঃশ্বাস পড়ে না। কামরাটা এখন প্রায় শূন্য।

(ক্রমশ)

সময়ের সমতালে চলতে... মডেলা!

OBM-0780-BEN

ওয়র্স্টেড-পদ্ধতিতে তৈরী টেরিন, টেরিন/উল, অল উল স্যুটিংস, মডেলার সাম্প্রতিক সৃষ্টিগুলো দেখুন! মডেলার বৈশিষ্ট্যই আলাদা,—তা সে টুইডই হোক বা ব্লেজার, কম্বল বা বোনার উল, নাইলন, বা অরলন—সবকিছুই লোভনীয়, অনুপম। ওরস্টেড পদ্ধতিতে বোনা স্যুটিংস একবার অঙ্গে ধারণ ক'রে দেখুন; এর রঙরূপ, এর স্পর্শ, এর 'ফল'—সবই অপূর্ব্ব। যাঁরা পরেছেন তাঁরাই বলেন—যা আছে মডেলার তা আর কা'রো নেই!

মডেলা স্যুটিংস মানেই পলকে প্রেম!

মডেলা টেক্সটাইল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ, মডেলাগ্রাম, থানা, মহারাষ্ট্র

রোগ নিরাময়ে চা

ঘটনাটা এই রকম।

পরিণত, এবং বলতে পারেন সম্পূর্ণ নীরোগ কয়েকটি ইঁদুরকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সামনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। ফলে ওই বিকিরণ ইঁদুরগুলির রক্ত ক্রমে দূষিত করে। এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর, যা আশা করা গিয়েছিল, ঠিক তেমনটিই ঘটে গেল। প্রত্যেকটি ইঁদুর প্রাণঘাতী লিউকেমিয়া বা রক্তের ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

অতঃপর রোগাক্রান্ত ইঁদুরগুলিকে দুটি দলে ভাগ করে নেয়া হয়। প্রথম দলটিকে রেখে দেওয়া হয় সম্পূর্ণ চিকিৎসাবিহীন অবস্থায়। তারা খুব কম সময়ের মধ্যেই মারা যায়। দ্বিতীয় দলের প্রত্যেকটি ইঁদুরের দেহে নিয়মিত ইনজেকশন করা হতে লাগল 'ক্যাটেচিনস' (catechins)-এর নির্যাস। ফলে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে ইঁদুরগুলি রক্ষা পেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, 'ক্যাটেচিনস' নামে বিশেষ ধরনের জৈব-রাসায়নিক যৌগ চা-পাতার অন্যতম উপাদান।

হ্যাঁ, সম্প্রতি ইউক্রেইন-এর কিয়েভে অবস্থিত বোগোমোলেটস ফিজিওলজি ইনসটিটিউটের কয়েকজন বিজ্ঞানী এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করেছেন। ওঁদের ধারণা, লিউকেমিয়া নিরাময়ের যথাযথ ওষুধ তৈরির ব্যাপারে 'ক্যাটেচিনস' হয়ত একদিন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অধিকার করে বসবে। 'যদিও', এমন মন্তব্যও কেউ কেউ করেছেন, 'আরও একটি বিষয় খুঁটিয়ে দেখা দরকার। দেখা দরকার, শুধু ক্যাটেচিনস, না আরও কিছু কিছু রাসায়নিক যৌগ, যারা ক্যাটেচিনস-এর সঙ্গে পাশাপাশি চা-এর পাতায় বাস করে, তারাও ক্যাটেচিনস-এর সহযোগীরূপে লিউকেমিয়া নিরাময়ের ব্যাপারে সাহায্য করে কী না?

প্রশ্নটি যে খুবই প্রাসঙ্গিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, অনেকেই হয়ত জানেন 'ক্যাটেচিনস' ছাড়াও চায়ের পাতায় থাকে উত্তেজক রাসায়নিক যৌগ ক্যাফেইন (Caffein) এবং কিছু পরিমাণ থিওব্রোমাইন (Theobromine) এবং ট্যানিনস (tannins)। দেহ-কোষের সংকোচক হিসেবে ট্যানিন যে কাজ করে এ তথ্য দীর্ঘকাল ধরেই বিজ্ঞানীরা জেনে আসছেন। এ ছাড়া বিশেষ ধরনের এই রাসায়নিক যৌগ শরীরে ফোঁড়া প্রভৃতি জনিত স্ফীতি, জ্বালা অথবা প্রদাহ এ সব উপশমের ব্যাপারেও যথেষ্ট সহায্য করে। কিয়েভের বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, প্রাণীদেহের বিকিরণজনিত ক্ষয়ক্ষতি নিরাময়ে ক্যাটেচিনস-এর ভূমিকা নিশ্চয় অনস্বীকার্য। তবে চায়ের মধ্যে আর যে সব সামগ্রী রয়েছে ওই ধরনের সমস্যার সমাধান কল্পে তারাও পাশাপাশি যে কাজ চালিয়ে যায়, সেটাও অস্বীকার করা চলে না।

ইতিমধ্যে চায়ের পাতা থেকে সংগৃহীত 'ক্যাটেচিনস'-এর উপর মস্কোর সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির বাইওকেমিস্ট্রি ইনসটিটিউটের বিজ্ঞানীরাও পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'রাসায়নিক দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হবে বিশেষ শ্রেণীর এই যৌগগুলির বৈশিষ্ট্য ঠিক যেন ভিটামিন-পি-এর মত। উল্লেখ্য, কোন কোন গাছের (primroses) পাতা, কাণ্ড এবং ফলের খোসায় এক শ্রেণীর বর্ণহীন কেলাসিত 'কিটোন' পাওয়া যায় যাদের বলা হয় ফ্লেভোন (flavone)। বিশেষ ধরনের এই 'কিটোন'-এর এক একটি অণুর মধ্যে থাকে পনেরটি কার্বন পরমাণু, দশটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং দুটি অক্সিজেন পরমাণু। ফ্লেভোনের বিশেষ ধরনের যৌগই পাতা বা ফুলের হলুদ রঙের জন্যে দায়ী। শেষোক্ত এই যৌগগুলিকে বলা হয় 'ফ্লেভোনয়েড'। যে সব 'ফ্লেভোনইড' উদ্ভিদের এবং ব্যাপক অর্থে জীবদেহের বিপাকীয় কাজ কর্মে সহায্য করে তাদের নাম বাইও-ফ্লেভোনইড। অথবা ভিটামিন-পি।

বলা বাহুল্য, কিয়েভের বিজ্ঞানীর চেয়ে মস্কোর বিজ্ঞানীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তাঁরা ধরে নিলেন, ভিটামিন-পি-এর মত ক্যাটেচিনস-এর সঙ্গে কিছুটা ভিটামিন-সি মিশিয়ে দিয়ে ইঁদুরের দেহে বিকিরণ জনিত রোগের যদি চিকিৎসা করা যায়, তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে?

এক নজরে

শুধু পাহারা দেওয়া অথবা দুষ্কৃতকারীকে খুঁজে বের করা নয়, ত্রাণ কাজেও কুকুরের ভূমিকা আজ অপরিহার্য। বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে যখন বরফের ধস নামে এবং সেই ধসে যখন কোন স্কি-খেলোয়াড় আক্রান্ত হয়। এদিকে লক্ষ রেখেই সুইস অ্যালপাইন ক্লাব বাছা বাছা কুকুরদের ইস্কুলে ভর্তি করে দেয় দক্ষ শিক্ষকের অধীনে। প্রথম 'এ' শ্রেণীতে, তারপর 'বি' শ্রেণীতে তার প্রমোশন। এরই মধ্যে কুকুররা শিখে ফেলে কী ভাবে চড়াই ভেঙে অকুস্থলে ছুটে যেতে হবে, কী ভাবে বরফে চাপা পড়া মানুষকে তার জামা-প্যান্ট ধরে টেনে বাইরে আনতে হবে। দরকার হলে বরফের উপর দিয়ে তাকে টেনে বিপদমুক্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়া—এ সব কাজের পরীক্ষায় পাশ করার পর শিক্ষার্থী কুকুররা 'সি' শ্রেণীতে প্রমোশন পায়। তখন তারা প্রত্যেকে ত্রাণকারী সমাজসেবী। বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন এ সব কাজে অ্যালসেসিয়ান নেকড়ে-কুকুরের যেন তুলনা হয় না। তারা অনেক বেশি বাধ্য, ক্ষিপ্র এবং তৎপর। ছবিতে আলপসের তেরবিয়ের অঞ্চলে সমাজসেবী অ্যালসেসিয়ান বরফের নিচে চাপা পড়া মানুষের খোঁজে কী ভাবে ছুটে চলেছে, লক্ষ করুন।

গোড়ায় এটা অবশ্য অনুমান হিসেবেই ধরে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, অনুমান হলেও, সে অনুমান যথেষ্ট বাস্তব সম্মত। ভিটামিন-সি মেশান ক্যাটেচিনের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা একক ক্যাটেচিনের চেয়ে অনেক বেশি।

অতএব প্রশ্ন এই : চায়ে প্রচুর ভিটামিন-সি থাকে। বিশেষ করে টাটকা সবুজ চায়ের পাতায় ভিটামিন-সি-এর পরিমাণ পাতি অথবা কাগজি লেবু এবং কমলা লেবুর রসের চেয়ে প্রায় চার গুণ বেশি থাকে। এ ছাড়াও একমাত্র সবুজ চা-পাতায় যে পরিমাণ ভিটামিন-পি পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন গাছের পাতায় এ পর্যন্ত অত বেশি ভিটামিন-পি-এর সন্ধান এখনও পর্যন্ত কেউ দিতে পেরেছেন বলে কারোর জানা নেই। এর জন্যেই কি চায়ের নির্যাস বিকিরণ জনিত রোগ সারিয়ে তোলার ব্যাপারে এত বেশি কার্যকর? অর্থাৎ সরাসরি প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম : অতিরিক্ত ভিটামিন-সি এবং ভিটামিন-পি থাকার দরুনই কি চায়ের পাতা রোগ-নিবারক হিসেবে এত বেশি সক্রিয়?

*

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেও অনেকে বিশ্বাস করতেন, চা-এর মুখ্য রাসায়নিক উপাদান চার অথবা পাঁচটির বেশি কখনই হতে পারে না। ওই সব উপাদানের মধ্যে আবার অন্যতম হল 'ক্যাফেইন'। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, চায়ের উত্তেজক গুণের জন্যে এই বস্তুটিই বহুলাংশে দায়ী। কিন্তু পরবর্তীকালে এই উপাদানগুলির তালিকা আরও বিস্তৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে—১৩০-এ। আর এই ১৩০ রকমের উপাদানের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি প্রধান এবং কোন্ কোন্‌টি সহযোগী অথবা একাধিক উপাদানের মিলিত যোগ, পরিষ্কার করে বলা শক্ত। কেউ কেউ একথাও বলেছেন, মুখ্য যোগের সংখ্যা হয়ত অনেক কম। কিন্তু জীব রাসায়নিক পদ্ধতিতে তাদের মধ্যেই এত বেশি রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটছে যে, শেষ পর্যন্ত কোন 'বাই-প্রোডাক্ট' বা উপসামগ্রী ঠিক কোন্ কোন্ যোগের পারস্পরিক মিলনে তৈরি হয়েছে সে সব ব্যাপার এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার করে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি।

তবু, পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে চা পাতার রাসায়নিক যোগগুলি পৃথক করার চেষ্টা হয়েছে। অত্যন্ত জটিল পদ্ধতিতে ওই সব বস্তুর প্রত্যেকটিকে যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করে তাদের প্রত্যেকটি শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া করে, পৃথক পৃথক ভাবে তা নিয়ে অনুসন্ধান চালান হয়। যেমন ধরুন, দেখা গেছে চা থেকে সংগৃহীত বিশেষ এক ধরনের ক্যাটেচিন 'নেফ্রাইটিস' রোগ নিরাময়ে যথেষ্ট সহায্য করে। 'নেফ্রাইটিস' কিডনি বা মূত্রগ্রন্থির প্রদাহজনিত রোগ। এ ছাড়াও পুরনো হেপাটাইটিস বা যকৃৎ-এর প্রদাহজনিত রোগ এবং উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসাতেও এই বস্তুটির উপকারিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বিশিষ্ট জজীয় বিজ্ঞানী ডঃ ওয়াই মগালোরিশভিলি, চা পাতার ভেষজ গুণের ওপর দীর্ঘকাল ধরে যিনি গবেষণা করে আসছেন, তাঁর বক্তব্য, 'শুধু চা নয়, ভিটামিন, ক্যাটেচিনস, ট্যানিন এবং আরও নানা রকম উপাদান চা পাতা ছাড়াও আরও বিভিন্ন ভেষজ গাছপালায় পাওয়া যায়। যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে ওই সব বস্তুকে আলাদা আলাদা ভাবে পৃথক করাও সম্ভব হয়েছে। তারপর, তাদের প্রত্যেকটিকে নিয়ে রোগ নিবারণের ব্যাপারে কোন্‌টির গুণ কী ধরনের, অথবা কোন্‌টি কত বেশি কার্যকর সে সব জানার জন্যে আমরা পরীক্ষাও চালিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই,
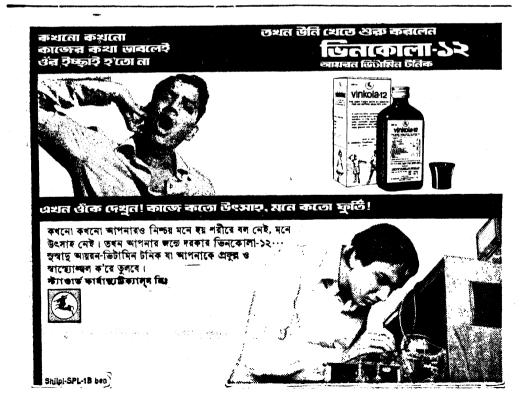
থেকে পৃথক ভাবে প্রয়োগ করার পর দেখা গেছে তাদের কার্যক্ষমতা যেন অনেকটা কমে গেছে। বরং এক সঙ্গে একাধিক বস্তু এবং তাদের কাছাকাছি চরিত্রের রাসায়নিক যোগ কাজে লাগিয়ে অনেক বেশি ফল পাওয়া যায়।" হ্যাঁ, আসল ব্যাপার এই। চা পাতার মধ্যেকার রাসায়নিক যোগগুলি যেন একটি সুশৃঙ্খল টিমের মত কাজ করে। ফুটবল খেলার সময় কোন টিমের একজন খেলোয়াড়ের গাফিলতি বা অনুপস্থিতি যেমন খেলার পুরো ফলাফলটাই উল্টে দিতে পারে, চা-এর ব্যাপারটাও ঠিক যেন তেমনি। এর ভেতরকার বিভিন্ন যোগ পরস্পর সমঝোতা বজায় রেখেই যেন কাজ করে। ঠিক কোন্ কোন্ যোগ পারস্পরিক সমঝোতা রেখে ঠিক কোন্ কোন্ রোগ নিরাময়ে সাহায্য করতে পারে, সে সব আরও বিশদভাবে জানা গেলে মানব কল্যাণে চায়ের প্রয়োজনীয়তা যে বাড়বে, বলাই বাহুল্য।

একটি পরীক্ষায় ডঃ মগালোব্রিশভিলি কয়েক শ' রোগীকে অন্য কোন রকম ওষুধ না দিয়ে শুধু সবুজ পাতা চা পানের নির্দেশ দেন। দেখা গেছে, এ ধরনের চিকিৎসায় বাতের দরুন যাদের শরীরের কোন কোন অংশ ফুলে উঠেছিল, তাঁরা যথেষ্ট আরাম বোধ করছেন। অনেকের ফোলাও কমে গেছে। যকৃৎ-এর প্রদাহ প্রশমিত হয়েছে। রক্তবাহী নলের সংকোচন এবং সম্প্রসারণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। ফলে রক্তচাপজনিত রোগের আশংকা দূরে হয়েছে। সেই সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত আশংকা এবং হৃদরোগ (বিশেষ করে মাইওকারডিয়াল ইনফ্র্যাকসন)। বলা হয়েছে, চা পান করিয়ে যাঁদের চিকিৎসা করা হয়েছিল, তাঁদের অনেকেই আগে কখনও নিয়মিত চা পান করতেন না।

*

অদ্ভুত ব্যাপার এই, প্রকৃতির কোন এক অলিখিত নিয়মে ভৌগলিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মানুষ যেন তার মূলে খাদ্য তালিকাটি সব সময় তৈরি করে নেয়। না। হয়ত কথাট ঠিক পরিষ্কার হল না। শুধু ভৌগলিক না বলে বলা উচিত ভূ-রাসায়নিক বা জিওকেমিকেল এনভায়রনমেন্ট। যাকে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়াবে: পৃথিবীর এক এক অঞ্চলের মাটির উপাদান এক এক রকমের। সেই সঙ্গে তার মধ্যে মিশে থাকে 'জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয়' এমন সব পদার্থের বিশেষত্ব এবং পরিমাণও স্বতন্ত্র। ফলে কোন জায়গার মাটিতে লোহা বেশি, কোথাও বা তামা। ফলে কোন অঞ্চলের গাছপালায় বা ফলে খাদ্যগুণ কম থাকে, কোথাও বা বেশি থাকে। আর এর জন্যেই খাদ্য তালিকাটিও এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে করে এক ধরনের খাদ্য-জনিত ঘাটতি আর এক ধরনের খাদ্য খেয়ে পুষিয়ে নেয়া যায়।

এবং এর জন্যেই হয়ত মধ্য এশিয়ার মানুষ চা পান করে বেশি। কারণ ওই সব অঞ্চলে যে সমস্ত ফল বা শাকসব্জি উৎপন্ন হয়ে থাকে তাদের ভিটামিন-পি এবং ভিটামিন-সি-এর পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে শতকরা তিরিশ এবং পঞ্চাশ ভাগ কম। তুলনায় চা পাতায় ওই দুই ভিটামিনের পরিমাণ অনেক বেশি। ভিটামিনের ঘাটতি মেটানর জন্যে জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক, চা-এর কদর মধ্য এশিয়ার মানুষের খাদ্য তালিকায় অন্যতম প্রধান স্থান দখল করে নিয়েছে। উল্লেখ্য, মধ্য এশিয়ার গরুর দুধেও ভিটামিন-সি-এর পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম।

কিন্তু লিউকেমিয়া, হৃদরোগ অথবা মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ এসব তো বিপাকীয় ত্রুটি-জনিত রোগ। অর্থাৎ শরীরের নিজস্ব রাসায়নিক কাজকর্মে যখন অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় এ সব রোগ তখনই দানা বেঁধে ওঠে। এ ছাড়াও জীবাণুঘটিত সংক্রামক রোগের ব্যাপারও তো আছে? তেমন তেমন ক্ষেত্রে চায়ের ভূমিকাটি কী রকমের হতে পারে?

বিশিষ্ট সোভিয়েত বিজ্ঞানী ডঃ এস বেরদিইয়েভ লক্ষ করেছেন, তুর্কমেনিয়া অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে আমাশা রোগটি নেই বললেই চলে। দেখা গেছে এখানকার লোকেরা অতিরিক্ত চা পান করে। পরে এ ব্যাপারটি নিয়ে আশখাবাদের সংক্রামক রোগ বিষয়ক গবেষণাগার এবং মস্কোর বোটকিন হাসপাতালে ধারাবাহিক পরীক্ষা চালান হয়। তাতে দেখা গেছে, প্রচলিত 'অ্যান্টিবাইওটিক' বা জীবাণু নাশক ওষুধের চেয়ে আমাশা সারানোর ব্যাপারে চায়ের ভূমিকা যেন অনেকটা উন্নত ধরনের। ডঃ বেরদিয়েভ ১৪ রকম চা পাতা নিয়ে গবেষণা চালান। তিনি লক্ষ করেছেন, জীবাণু ধ্বংসের ব্যাপারে চা, বিশেষ করে সবুজ চার ক্ষমতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এবং সবুজ চায়ের মান যত উন্নত, জীবাণু ধ্বংসের ক্ষমতাও তার তত বেশি। দেখা গেছে, কঠিন আমাশা রোগীকে সবুজ চা পান করিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যে সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। তার শরীরের মধ্যেকার সমস্ত আমাশা-জীবাণু ধ্বংস হয়ে গেছে। এবং পুরোপুরি নিরাময় হতে সময় লেগেছে মাত্র দশ দিন। অথচ প্রচলিত অ্যান্টিবাইওটিকের সাহায্যে এ ধরনের রোগীকে সারিয়ে তুলতে অনেক সময় ছয় মাসেরও বেশি সময় লাগে।

বিশেষজ্ঞরা দুরারোগ্য পাকস্থলীর রোগ, অন্ত্রের ব্যাধি, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, এমন কি রক্তবাহী নলের কাঠিন্য নিরাময়ের জন্যেও সবুজ চা কাজে লাগান। এ ছাড়াও চা গাত্রত্বককে সুস্থ রাখে, নিয়মিত ঘর্ম-ঝরা অব্যাহত রেখে রোমকূপ পরিষ্কার করে দেয়। চায়ের মধ্যে আছে মূল্যবান ভিটামিন বি-২, 'পি' এবং 'কে'। যারা গাত্র-ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়, রক্তবাহী নলকে শক্ত রাখে এবং ত্বকের নিচে তিল, আঁচিল অথবা ব্রণ তৈরি হতে বাধা দেয়।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিভিন্ন রকমের চা পাতার উপর পর্যায়ক্রমিক গবেষণা চালালে চায়ের বহুমুখী ভেষজগুণ সম্পর্কে আরও নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করা ভবিষ্যতে হয়ত শক্ত হবে না।

সমরজিৎ কর

চিঠি

৪০ বর্ষ, ৪৭তম সংখ্যায় **বিশ্ববিজ্ঞান** পর্যায়ে রচনার ২৫৩তম লাইনে কোবরা সাপের নামের পাশে বন্ধনীতে ল্যাতিন (বিজ্ঞানসম্মত) নাম লেখা আছে 'Naja haja'—প্রকৃতপক্ষে নামটি হবে 'Naja naja'। সম্ভবত এ ত্রুটি মুদ্রণ ঘটিত।...
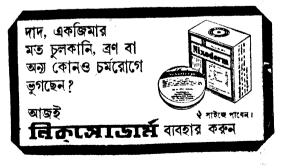
শ্রীঅভিজিৎ পাল

লালগোলা, মুর্শিদাবাদ

আপনার চুলকে
অপূর্ব সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যে
উজ্জ্বল ক'রে তুলুন

ব্যবহার করুন অতি পুষ্টিকর
প্রোটীন-সমৃদ্ধ
হ্যালো
এগ্ শ্যাম্পু

[illegible] মত নরম সোনালী গোছায় উজ্জ্বল ও মসৃণ—হ্যালো এগ্ শ্যাম্পু। এই বাড়তি পুষ্টির এগ্ ফর্মুলা আপনার চুলে প্রাণ ও রূপের সঞ্চার করে।

এর প্রচুর নরম ফেনা আস্তে আস্তে মাথায় পুষ্টি যোগায় আর চুলের মধ্যে ঢুকে সব চুল স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতায় পরিষ্কার ঝকঝকে ক'রে তোলে। হ্যালো এগ্ শ্যাম্পু ব্যবহার করলে আপনার চুল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

হ্যালো—রূপের ছটায়, সারা জগৎ মাতায়

New
Halo
SHAMPOO

এখন ৩টি নতুন সুবিধাজনক সাইজে পাওয়া যায়

HES. 13.BN
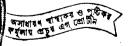
দুর্গাপূজার অর্থনীতি ও পশ্চিমবঙ্গ—একটি দিক

এ বছরের দুর্গাপূজায় গত কয়েক বছরের মত প্রাচুর্যের জৌলুস ছিল না। হয়ত জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব বেড়ে যাওয়াই এই অবস্থার জন্য দায়ী। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে বাঙালীর সামাজিক জীবনে যা কিছু ঘটে তার অর্থনৈতিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গাপূজার অর্থনীতির মূল্যায়ন করা যেতে পারে। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আমরা দেখতে পাই তার সূচনা হয় পূজার প্রায় এক মাস আগে থেকে। বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, কল-কারখানায়, এমন কি সরকারী সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারিগণ বোনাস অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বেতন থেকে কিছু অগ্রিম পেয়ে থাকেন। বোনাস, অথবা অগ্রিম বেতন পাবার সঙ্গে টাকার প্রচলন-বেগ বেড়ে যায়: শুরু হয় কাপড়-চোপড় কেনাকাটা। টাকার বর্ধিত সরবরাহের সঙ্গে জনসাধারণের কার্যকরী চাহিদাও বেড়ে যায়, এবং অর্থশাস্ত্রের স্বাভাবিক নিয়মেই জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। কারণ পূজার এক মাস আগেই চট করে চাহিদা অনুযায়ী যোগান বাড়ানো সম্ভব হয় না। বহু পরিবারে শুধু পূজার সময়েই সারা বছরের তিন-চতুর্থাংশ জামা-কাপড় কেনা হয়। জামা-কাপড়ের দোকানগুলিও সারা বছর এই বিশেষ সময়টির আশায় বসে থাকে; কেননা এ সময়েই তাদের সারা বছরের অর্ধেকের চেয়েও বেশি আয় হয়। পূজার সময়েই সাময়িকভাবে কিছু নতুন দোকানও গজিয়ে উঠে। শিক্ষিত বেকার যুবকগণ এ-সময়ে নিজেদের উদ্যোগে ছোটখাটো ব্যবসায় থেকে কিছু উপার্জনও করতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে যে কোটি কোটি টাকার লেন দেন হয় তার কতটা পশ্চিমবঙ্গের আয় বাড়াবার পক্ষে সহায়ক হয়? এক কালে পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্প যতটা উন্নত ছিল এখন আর ততটা নয়। সুতোর অভাব, শিল্প সম্পর্কের অবনতি লক-আউট শ্রমিক ছাঁটাই ও শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতির প্রভাবে বস্ত্র উৎপাদনের হার এই রাজ্যে যথেষ্ট কমে গেছে। পূজার সময়ে বহু জামা-কাপড়, শাড়ি, ধুতি বিক্রি হয়েছে; তার মধ্যে কতটা পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্র-শিল্পের ভাগে এসেছে? যাঁরা এই রাজ্যের তৈরি তাঁত, খাদি বা সিল্কের কাপড় কিনেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে এই রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের সহায়তা করেছেন। কিন্তু যাঁরা মাদ্রাজ বা কেরালা হ্যান্ডলুমের কাপড়, বোম্বে ডাইং-এর কাপড়, কাশ্মীরী সিল্ক অথবা মহীশূরে সিল্কের কাপড় কিনেছেন, তাঁরা স্থানীয় দোকানদারদের আয়-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকলেও পরোক্ষভাবে এই রাজ্যের বাইরে টাকা পাঠিয়ে দেবার ক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। হয়ত এই উক্তিতে অনেকে প্রাদেশিকতার গন্ধ পেতে পারেন,—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্পের দুরবস্থার কথা চিন্তা করলে একথা মানতেই হবে যে, এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে এই রাজ্যের অধিবাসীদেরই তৎপর হতে হবে। বাইরের রাজ্যের তৈরি কাপড় বিক্রি হোক তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু আগে পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে বাইরের রাজ্যের বস্ত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করলে এই রাজ্যের অর্থনীতির বুনিয়াদ আরও কিছুটা মজবুত করার ক্ষেত্রে সুবিধা হত। খাদির তৈরি কাপড়ের ক্ষেত্রে যেমন রিবেট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে তেমনি সব দোকানেই ধনেখালি, শান্তিপুরী অথবা টাঙ্গাইলের কাপড়ের ক্ষেত্রেও রিবেট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত; সরকারও এ ক্ষেত্রে সুতোর উপর অন্ততঃ শুল্কের ভার কিছুটা লাঘব করতে পারতেন। এই রাজ্যের রেশম শিল্পের গুণগত উৎকর্ষও কম নয়; তাকে কি আরও জনপ্রিয় করে তোলা যায় না?

দুর্গাপূজার অর্থনৈতিক সুফলের একটি বড় দিক হল বহু লোকের আয় বৃদ্ধি। পণ্য-প্রবাহের সঙ্গে অর্থ-প্রবাহও যথেষ্ট বেড়ে যায়। যে হারে অর্থ-প্রবাহ বেড়ে যায় সে হারে প্রকৃত উৎপাদন বাড়ে না। সুতরাং আয় বৃদ্ধির ফলে এক শ্রেণীর লোক বিশেষভাবে উপকৃত হলেও সামগ্রিকভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়। দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছোট-বড় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা শারদীয় সংখ্যা বের করে থাকে। ছাপাখানাগুলিতে এ জন্য যথেষ্ট কাজের চাপে থাকে। মুদ্রণ শিল্প পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব সম্পদ; হাজার হাজার লোক এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এ বছর কাগজের সংকট খুবই তীব্র হওয়ায় ছোট-ছোট পত্র-পত্রিকাকে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবুও পূজার বাজারে মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের আর্থিক ক্রিয়াকলাপ যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাছাড়া দর্জির দোকান, ডেকোরেটারের দোকান, ইলেকট্রিসিয়ানদের দোকান, গ্রামোফোনের রেকর্ড, রেকর্ডপ্লেয়ার ও রেডিওর দোকান, মিষ্টির দোকান,—সর্বত্রই পূজার বাজারে খুশীর আমেজ দেখতে পাওয়া যায়; এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু এ বছর উৎসব-মুখরিত পশ্চিমবঙ্গে দুঃখ-দুর্দশার করাল ছায়া যেন বেশি প্রকট হয়েছে। পূজার বাজারে জিনিসপত্রের দাম এ বছর যত বেড়েছে আর কোন বছরেই তত বাড়েনি। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমনি টাকার প্রচলন-বেগ ও লেনদেন বেড়েছে, অন্য দিকে সেই প্রকার জিনিসপত্রের দামও আকাশ-ছোঁয়া হয়েছে। মাছ, তরিতরকারী, চাল প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রী প্রভৃতির দাম এত বেড়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য তা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। যাঁরা ভাগ্যবান এবং যাঁদের পকেটে বাড়তি টাকা আছে তাঁদের পক্ষে বেশি দাম দিয়েও নিত্য-ব্যবহার্য জিনিস কেনা সম্ভব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ৮০ শতাংশ লোকের পক্ষে তা সম্ভব কি? এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। সর্বজনীন পূজায় বহু টাকা খরচ হয়ে থাকে। সাধারণ হিসাবে দেখা যায়, শুধু কলকাতা মহানগরীতেই বারোয়ারী পূজায় যে টাকা সংগৃহীত হয় ও খরচ হয় তার পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকার উপর। বহু বারোয়ারী পূজার ক্ষেত্রে পূজার শেষে নানাবিধ বিচিত্রানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, (তা-ও আবার বহু ক্ষেত্রে হিন্দী ছবি) এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এ-ভাবে টাকা খরচ না করে পূজার শেষে উদ্বৃত্ত টাকা কি সংশ্লিষ্ট পাড়ার শিক্ষিত বেকার যুবকদের সমবায়ের ভিত্তিতে পুনর্বাসনের জন্য খরচ করা সম্ভব নয়? এই মহানগরীর তিন হাজার বারোয়ারী পূজা কমিটি যদি অন্তত তিনজন করে বেকার যুবকের ছোটখাটো ব্যবসায়-বাণিজ্যের (সমবায়ের ভিত্তিতে) সংস্থান করে দেন তবে তো নয় হাজার যুবকের স্ব-নিয়োজিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। পূজার সাজ-সজ্জা, আলোকমালার বৈচিত্র্য প্রভৃতি খাতে খরচ কমিয়ে সাধারণ গৃহস্থের পূজা-বাজেটেও কি খরচের

পরিমাণ একটু কমানো যায় না? যে প্রশ্নগুলি এ ক্ষেত্রে মনে জেগেছে সেগুলি নতুন কিছু নয়। হয়ত অনেকেই এ ধরনের চিন্তা করছেন; কিন্তু যুব-সমাজকে এ বিষয়ে প্রেরণা দেবার মত উদ্যোগের অভাব নিশ্চয়ই আছে।

দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে বহু ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের উন্নতি হয়, বহু লোকের সাময়িক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় এবং বহু পণ্য-প্রবাহের সৃষ্টি হয় যা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ প্রত্যক্ষভাবে [illegible] এই উৎসব [illegible] এই উৎসব রাজ্যের অর্থনৈতিক কল্যাণের একটি প্রধান অঙ্গ। সুতরাং এই উৎসব এমনভাবে উদ্‌যাপিত হওয়া উচিত যেন তার মর্যাদা, গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখেও রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা আরও সক্রিয় করা যায়। অতএব পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক অবক্ষয় মনে রেখে এ বিষয়ে নতুন করে সবাইকে ভাবতে হবে।

সুব্রত গুপ্ত

মা ও মেয়ে—দু-জনেরই আগ্রহ প্রচুর। ম্যাডাম বারবিয়ের অ্যানি বেসেন্টের কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন উদয়শংকরকে। বলেন, "ছোটবেলা থেকে সিমন থিওসফি নিয়ে মাথা ঘামায়। সে এই সোসাইটির একজন উৎসাহী সদস্য।"

মিসেল আর সিমন—এদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হওয়ার পর উদয়শংকরের মনে নতুন একটা উত্তাপ সঞ্চারিত হয়ে গেল। তার সাধের ট্রিও হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার পর সে যেন একটা নৌকোর মতন হয়ে গিয়েছিল। পাল নেই, নোঙর নেই—ঢেউ-এর ঠেলায় যেখানে সেখানে মাথা ঠোকা, আঘাত খাওয়া। তার উদ্যম, ভবিষ্যতের স্বপ্ন এবং কল্পনাশক্তিও যেন অনেকখানি ম্লান হয়ে এসেছিল। শুধু জীবনধারণের জন্যে একটা মরচে-ধরা যন্ত্রের মতন কোনরকমে দিন কাটিয়ে দেওয়া।

সিমন আর মিসেলের আকস্মিক আবির্ভাব উদয়শংকরের জীবনে উষার আলোর মতন। তারা অবলীলায় দূর করে দিল চাপ নৈরাশ্যের ভিজে-ভিজে জোলো অন্ধকার। তা ছাড়া ম্যাডাম বনসেও ছিলেন উদয়শংকরের সহায় এবং অবলম্বন। তার সংগ্রামসংকুল প্রথম জীবনে ম্যাডাম বনসের অবদান কিছু কম নয়।

উদয়শংকরের চিন্তা যেন মন্ত্রবলে নিমেষে সক্রিয় হয়ে উঠল। সিমন আর মিসেল! এতদিন উদয়শংকরের কোন নৃত্য-সঙ্গিনী ছিল না। একক নৃত্যই ছিল তার জীবিকা। এখন স্থির চিত্তে ভাবল সে ভাবতে পারল যুগল নৃত্যের কথা। সিমন আর মিসেলকে মনে করেই সে ভাবল গন্ধর্ব ও অপ্সরা, রাধা-কৃষ্ণ এবং শিব-পার্বতী নৃত্যের কথা।

আনা পাভলোভার সঙ্গে উদয়শংকরের যে প্রথম রাধা-কৃষ্ণ নৃত্য—এবারকার পরিকল্পনা তেমন নয়—একেবারেই অন্যরকম। সে নৃত্যে ছিল অনেক নর্তকী বহু সরঞ্জাম। এবার কেউ নেই, শুধু রাধা আর কৃষ্ণ।

মিসেল আর উদয়শংকর। তাকে নৃত্য-সঙ্গিনী ভেবে গন্ধর্ব ও অপ্সরার পরিকল্পনাও করল উদয়শংকর। আর একটি নৃত্য যা দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিল সে সময়, তার নাম শিব-পার্বতী। উদয়শংকর ও সিমন।

মিসেল কিংবা সিমনের বাড়িতে কিংবা এখানে-ওখানে বেড়াতে বেড়াতে কথায় কথায় ও দের দুজনকে এইসব নাচের মূল ভাবধারা বুঝিয়ে দিল উদয়শংকর। বলল স্বর্গলোকের গায়ক গন্ধর্বদের কথা, নৃত্যপটীয়সী অপ্সরাদের কথা। রাধাকৃষ্ণ এবং শিব-পার্বতীর পৌরাণিক কাহিনী সিমন আর মিসেলকে এক ফরাসী রেস্তরাঁয় বসে শুনিয়ে দিল উদয়শংকর।

আবার সেই ট্রিও। তবে এবারে এই

গন্ধর্ব ও অপ্সরা নৃত্যে মিসেল ও উদয়শংকর

ছোট নৃত্যদলের কোন নামকরণ হল না। ম্যাডাম বনসের বাড়ির ইস্কুলে নয়, নাচের মহড়ার জন্যে আলাদা একটা ঘর ভাড়া নেওয়া হল। সিমন পিয়ানোর স্বরলিপি বেঁধে দিল উদয়শংকরের নির্দেশমত। নাচের পোশাক-আশাকও তৈরি হল। দরজী উদয়শংকর নিজেই।

সিমনের মুদ্রা, তার ভঙ্গি ও অভিব্যক্তি বিস্মিত করল উদয়শংকরকে। তার মনে হল পার্বতীর এই স্বচ্ছন্দ ও নিখুঁত রূপ নিতে এত অল্প সময়ের মধ্যে বোধ হয় কোন ভারতীয় মেয়ের পক্ষেও আয়ত্ত করা সম্ভব হত না।

উদয়শংকর তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাকে বলল, "সিমন, তোমার ভঙ্গি দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীবিখ্যাত আনা পাভলোভাও তোমার মতন এত সুন্দর ভারতীয় মুদ্রা আয়ত্ত করতে পারেননি।"

সিমন বলল, "পাভলোভা তাঁর নিজের দেশের ব্যালেতে অদ্বিতীয় বলে হয়ত তোমাদের নাচ শিখতে ওঁর অসুবিধা হয়েছিল। আর আমি তো কোন নাচই জানি না—" সে একটু চুপ করে থেকে পরে আবার বলল, "জানি না আমি কতটুকু কি করতে পারছি, তবে নাচের সময় গভীর এক অনুভূতি আমাকে যেন ভারতীয় করে তোলে।"

উদয়শংকর বলল, "তোমার শিব-পার্বতী নাচ দেখলে কে বলবে যে, তুমি ভারতীয় মেয়ে নও? আমিই অবাক হয়ে যাই।"

সিমন হাসল, "আজকাল এক এক সময় মনে হয় আমি সত্যি জন্মেও আছি যেন ভারতীয় মেয়ে হয়ে পড়ছি।"

উদয়শংকরও হাসল, "ভালই তো। তা হলে তোমার একটা নতুন নামকরণ করে দি।"

সিমন উৎসুক চোখে উদয়শংকরের দিকে তাকাতেই সে কিছু না ভেবে হঠাৎ তাকে তার মনোমত নামে ডেকে ফেলল, "সিমকী!"

সম্ভবত সিমন উদয়শংকরের দেওয়া নতুন নাম মনে মনে একবার উচ্চারণ করে নিল। পরে প্রশ্ন করল, "এ নামের মানে কি?"

"মানে-টানে কিছু নেই সিমকী—" উদয়শংকর হাসতে হাসতে বলল, "সব নামের কি মানে হয়? নাম নামই। আমার হঠাৎ মনে এসে গেল তাই তোমাকে ডাকলাম, সিমকী! নামটা একবার শুনলেই দর্শকদের মনে থাকবে।"

সিমকী বলল, "আমি তোমাকে কি নামে ডাকব, বলে দাও না!"

উদয়শংকর একটু ভেবে বলল, "আমাকে তুমি দাদা বলবে।"

"কি বললে? ডা-ডা? বুঝে উঠলাম কেন?"

উদয়শংকর হেসে ফেলল। সিমকীর উচ্চারণ সংশোধন করে দিয়ে তাকে বলল, "ডা-ডা নয়, নরম করে বলবার চেষ্টা কর, দাদা—মানে বড় ভাই।"

এবার সিমকী পরিষ্কার বাংলা বলার মতন বলল, "দাদা!"

ম্যাডাম বনসের সহায়তায় প্যারিসের

প্রেমিক-প্রেমিকাদের
বৈঠকে — ৪.
কলকাতা দেখেছি-র লেখক
দীপক দে-র নতুন উপন্যাস
ডি এম লাইব্রেরী | ৪২, বিধান সরণি
জিজ্ঞাসা | ৩৩/১, কলেজ রো
(সি ১০০৩০)

কোন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতভবনে তার নৃত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করল উদয়শংকর। শুধু ভারতীয় নৃত্য ছাড়া আর কোন বিচিত্র অনুষ্ঠান হবে না। কেননা উদয়শংকর এবার পরিপূর্ণ প্রস্তুত। তার নৃত্যের সূচীও বেশ দীর্ঘ।

নতুন দল। নতুন পরিকল্পনা! এখন ফরাসী দর্শককুলের সামনে যদি ভিন্ন লোকের আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায় নৃত্যের ছন্দ-তালে আর পিয়ানোর ঝংকারে, যদি উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে পাদপ্রদীপের আলো তাহলেই শ্রম সার্থক হবে উদয়শংকরের। তবে এবারে একটা অলৌকিক আশ্বাস স্থির হয়ে আছে উদয়শংকরের মনে। এ দেশে তার উদ্যম ব্যর্থ হবে না। ফরাসী দর্শকসাধারণের প্রশংসা সে অর্জন করবেই।

উদয়শংকরের একক নৃত্য, গন্ধর্ব। পৌরাণিক গন্ধর্ব। তার চোখে স্বপ্ন। গতি স্বচ্ছন্দ। তার হাতে ও গলায় রত্নখচিত নানা অলংকার। উদয়শংকরের সজ্জা দেবলোক-বাসী নায়ক গন্ধর্বের মতনই। তার ভাব-ভঙ্গি, অভিব্যক্তিও যেন অতিপ্রাকৃত। ফরাসী দর্শকের শ্রবণে উদয়শংকরের দ্রুত তালের ঘুঙুরবোল বড় মধুর বলে মনে হল।

গন্ধর্ব ও অপ্সরা নৃত্যে (সিমেন ও উদয়শংকর) বেশভূষার কিছু পারিপাট্য ছিল। অপ্সরার আবির্ভাবে গন্ধর্ব এখন ঈষৎ সচেতন। তার অভিব্যক্তিও অনির্বচনীয় বিহ্বলতর। অপ্সরার দৃষ্টিও গভীর।

উদয়শংকরের একক নৃত্য, রাজপুত বধূ। তার চাউনি, তার পদক্ষেপ এবং মনের এক-এক ভাবনার প্রকাশ দেখে কোন দর্শক কল্পনা করতে পারেনি যে, রাজপুত বধূ এক পুরুষ নর্তক—উদয়শংকর স্বয়ং।

মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে
আর মিত্রের
ময়ূর মার্কা
তিল তেল
বিশুদ্ধ ও সুপরিস্রুত তিল
তেল হইতে প্রস্তুত

স্বর্গীয় যে পরিমণ্ডল ফরাসী সঙ্গীতভবনের মঞ্চে গড়ে তুলল শিল্পীরা তা আরও অপরূপ হয়ে উঠল শিব ও পার্বতীর আবির্ভাবে। ধূম্রজাল হচ্ছে পিয়ানোর গুরুগম্ভীর আওয়াজ। সমান দক্ষ শিব ও পার্বতী। অবাধ পার্বতীর পদচারণ, তার হস্তসঞ্চালন। চোখ-মুখের অভিব্যক্তিও অপূর্ব। সে যে ফরাসী মেয়ে তা তার দেশের লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না।

পরদিন কোন ফরাসী দৈনিকে প্রকাশিত হল, "ভারতীয় নর্তকীদ্বয়ের নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, পরে জানলাম তারা ফরাসী। ফরাসী মেয়েরা এত সুন্দর ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করতে পারে বলে আমরা গর্ব অনুভব করছি।"

'রাজপুত বধূ' প্রসঙ্গে সংবাদপত্র লিখল, "ভারতীয় নর্তক উদয়শংকারের চলাফেরা জাহাজের নাবিকের মতন। তবে বধূবেশে তার ভঙ্গি অনবদ্য। তার নৃত্য আগাগোড়া মেয়েলী ভাবাপন্ন। 'রাজপুত বধূ' উদয়শংকরের এক আশ্চর্য সৃষ্টি।"

এই সময় সিমন আর সিমেন আরও এক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল প্যারিসে। সেখানে প্রাচ্যের একটি নৃত্য প্রতিযোগিতা হয়েছিল। উদয়শংকরের শেখানো ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করে তারা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেল।

এমনি করেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্যারিসের দর্শকসাধারণের কাছে পরিচিত হল উদয়শংকর। এবং তার আর্থিক সংকটেরও অবসান হল। সে স্থির করল, এবার ফ্রান্সের বাইরে বিভিন্ন শহরে নৃত্য প্রদর্শন করবে। কিন্তু প্যারিস ছাড়াতে রাজী হল না সিমেন। তার পড়াশোনার চাপ বড় বেশী। নৃত্যে বেশী সময় ব্যয় করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। সিমেন চলে গেল। ইউরোপের দেশে দেশে ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করবার জন্যে রইল শুধু সিমকী আর উদয়শংকর।

উদয়শংকরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তাকে দেখে বিচিত্র দেশ ভারতবর্ষের প্রতি বড় বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল সিমকী। যে-দেশের মানুষ উদয়শংকর, কেমন সে-দেশ, কত বিশাল—এসব ভেবে ভারতবর্ষে পাড়ি দেওয়ার একটা অদম্য ইচ্ছা ধীরে ধীরে জাগছিল সিমকীর মনে। এবং সে-দেশে প্রস্তুত ছোটখাট নানা সুন্দর জিনিস সে সাজিয়ে রেখেছিল তার শোবার ঘরে।

একটা বেশ বড় মিউজিয়ম আছে প্যারিসে। নাম মিউজে গিমে অর্থাৎ গিমে মিউজিয়ম। ভারতবর্ষ সম্পর্কে অতিমাত্রায় উৎসাহী ফরাসী গিমে দম্পতি এটা নির্মাণ করেছেন। এই মিউজিয়মে আছে ভারতবর্ষের নানা শিল্প ও ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন।

সিমকীর সঙ্গে মাঝে মাঝে উদয়শংকর আসে গিমে মিউজিয়মে। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মহিলা এই মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম গিমে। তিনি মনে করেন, উদয়শংকরের নৃত্যের মাধ্যমে লোকে ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বিশেষ রূপও দেখতে পায়।

ম্যাডাম গিমে অনুরোধ করেন উদয়-শংকরকে, "ভারতবর্ষের সংস্কৃতি প্রসারের জন্যেই তো আমাদের এই মিউজে গিমে। এখানে একদিন তোমার নাচের ব্যবস্থা করি। সম্ভ্রান্ত লোকেরা দেখুক, তোমাদের দেশকে জানুক। তোমার নাচ ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গই তো।"

উদয়শংকর সবিনয়ে বলে, "বেশ তো, আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি নিশ্চয়ই নাচব আপনাদের মিউজিয়মে।"

ম্যাডাম গিমের কথামতন বেশ কয়েক-বার উদয়শংকরকে বিশেষভাবে নাচতে হয়েছিল এই মিউজে গিমেতে।

উদয়শংকরের নাচ দেখে প্যারিসেই তার সঙ্গে আলাপ করেছিল মহীশূরের যুবরাজ। তাকে বলেছিল, "ভারতবর্ষে ফিরে দয়া করে আমাকে জানাবেন। আমি হয়তো আপনার কিছু কাজে লাগতে পারি।"

যুবরাজকে ধন্যবাদ জানিয়ে উদয়শংকর বলেছিল, "দেশে ফিরলে আপনাকে জানাব নিশ্চয়ই।"

মুখে এ কথা মহীশূরের যুবরাজকে বললেও উদয়শংকর কিন্তু তার বুকের মধ্যে যেন উথলে একটা প্রশ্ন বারে বারে: কবে সে ফিরবে ভারতবর্ষে! কেমন করে ফিরে যেতে পারবে!

স্যার উইলিয়ম রোদেনস্টাইন কে অনেক আগেই তার চোখের সামনে খুলে দিয়েছেন ভারতবর্ষকে। অগাধ জ্ঞানের বিরাট ভাণ্ডার। আর ভালোভাবে বুঝিয়ে তাকে বলেছিলেন যে সেরা প্রস্তাব এবং নিজস্ব দল গঠন করে ভারতীয় নৃত্য-শিল্পের উৎকর্ষসাধন ও এ-দেশে পুনরাগমনই তার একমাত্র কাজ।

এই উপদেশ মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারলেও অবস্থা একটা মানুষের মতন চুপচাপ বসে থাকে উদয়শংকর। সে জানে ভারতবর্ষে ফিরে যেতে না পারলে সম্পূর্ণ হবে না তার কাজ। সে ফিরবে। নিজের দল তৈরি করবে। এবং সদলবলে আবার ফিরে আসবে এ-দেশে।

ভারতবর্ষে ফেরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে উদয়শংকর। কিন্তু সে খুঁজে পায় না কোন পথ। অসম্ভব কল্পনা। তার মনো-বাসনা হয়তো পূর্ণ হবে না কোনদিন।

কিন্তু অসম্ভবই সম্ভব হল অল্প পরেই। উদয়শংকর যেন লাভ করল দৈবীর বর। এবং সগৌরবে তার দেশে ফেরার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে গেল।

(ক্রমশ)

যুগান্তরের স্বপ্ন

পরিবর্তন যদি জীবনের ধর্ম হয় তবে সে পরিবর্তন আবহমান কালের। বিগত-দিনের মানুষ অনেক সময় সে পরিবর্তনকে সুনজরে দেখে না। বহু ক্ষেত্রে বুঝতে চায় না পরিবর্তন ঠিক একইভাবে না হলেও, তাঁদের কালেও এসেছিল। একইভাবে গুরুজন তাঁদের নূতনত্বকে আপত্তি দিয়ে বাধা দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। এখন যুবসমাজ অনেক বেশী স্বাধীন এবং আত্ম-প্রত্যয়পূর্ণ। আমরা সেখানে আপত্তি তুলি। আমাদের বিচারবুদ্ধিকে উপেক্ষা করে তারা এগিয়ে যাচ্ছে—ভাবতে ভাল লাগে না। তাদের ভাবনা ভিন্ন হলে নাক সিঁটকে বলি পাশ্চাত্যধারায় দেশটা উচ্ছন্নে গেল। ভাবধারা তো বাজারের পণ্য নয় যে বিদেশে প্রস্তুত বলে ছাপ থাকবে। ভাবধারার জয় যুগে যুগে এসেছে-গিয়েছে কোন্ পথে তার ঠিকানা কে বা জানে! তা ছাড়া সারাদিন সে যদি দেখে বিদেশী সব কিছুর প্রতি সবার কি প্রচণ্ড আকর্ষণ, তবে সেই বা বাঁচবে কি করে বলুন।

মাতাপিতা অনেক সময় সন্তানের সব সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। তখন তাঁরা generation gap-এর দোহাই দেন। সমাজের নিয়ম কানুন এত বদলেছে যে মাতা পিতা সত্যই বয়স্ক না হলে যুব-সমাজকে বুঝতে পারবেন—এটা আশা করাও চলে না। যুব সমাজও বয়স্কদের প্রতি মারমুখো হয়, কারণ তারা মনে করে ভাল মন্দ বিচার না করে বড়রা তাদের নিন্দা করে। তারা নিন্দার যোগ্য কাজ হয়তো কখনও কখনও করে, কিন্তু বেশীর-ভাগ সময়ই বোঝবার ভুলে দুই যুগের মাঝে দেওয়াল খাড়া হয়ে যায়। জীবিকার সন্ধানে বা জীবনসঙ্গিনী বরণে বড়দের উপেক্ষা করলে তাঁদের প্রচণ্ড আঘাত লাগে। কিন্তু কেন? যুগের সন্ধি তো দুদিকেরই মেনে নিতে হবে। সেখানেই মানুষের জয়। সেখানেই তার অনন্ত যাত্রার সেতু।

*

ইতিহাসের পাতা থেকে

"The Kingdom of the Gonds is gone.
And strangers rule o'er hill and plain.
But never statelier form has shone
On the Still Lake that owns thy reign.
Durgavati!"—

(গোনড্দের রাজত্ব গেছে
পাহাড় আর প্রান্তরে আজ বিদেশী শাসক
কিন্তু শান্ত সরোবরে তোমার রাজত্বের স্বাক্ষর আছে
যে সরোবর তোমার চেয়ে মহিমান্বিত মূর্তি ধারণ করেনি দুর্গাবতী!')

গড়মণ্ডলের রানী দুর্গাবতীর কথা ইতিহাসের কেতাবে কতভাবে পড়েছি। দুর্গাবতী মাহোবার রাজপুত রাজনন্দনী ছিলেন। বিবাহ হয়েছিল গড়মণ্ডলের রাজা দলপৎ শার সঙ্গে। একমাত্র পুত্র বীরনারায়ণের বয়স তখন মাত্র তিন বছর—রাজা দলপৎ মারা যান। বীরনারায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত রানী রিজেনট হলেন।

বাদশাহ আকবর তখন দিল্লীশ্বর। গোনড্ দেশ অতি লোভনীয় সুজলা সুফলা দেশ। বাদশাহের ইচ্ছা সে দেশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বার বার বাদশাহ গোনড জয়ের অভিযান পাঠালেন। গোনড্দের রাণী দুর্গাবতী প্রতিবার অভিযান বিফল করে দিলেন। আসফ খাঁ ছিলেন মুঘলপক্ষের অভিযানের নায়ক। তাঁর আবার ইচ্ছা ছিল রূপবতী রানী দুর্গাবতীকে হারেমে নিয়ে রাখা!

শেষ যুদ্ধ হলো নরই নালাতে। নর্মদা তীরে জবলপুর। জবলপুর থেকে সাত আট মাইল তফাতে নরাই নালা। একদিকে আসফ খাঁর দশগুণ বড় গোলন্দাজ-বাহিনী, আর অন্যদিকে রানী দুর্গাবতী ও তাঁর বীর গোনড দল। আঠারো বছরের রাজকুমার বীরনারায়ণ রয়েছেন মায়ের পাশে পাশে। দুজন দুটি গজরাজের উপর আসীন হয়ে আছেন। প্রথম তো আসফ খাঁ পরাজয়ের আশংকায় আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ নরাই নালায় জল নামলো। ফুলে ফেঁপে নালা করাল মূর্তি ধারণ করলো। সামনে আসফ খাঁ, আর পিছনে নরাই নালা। মুঘল সৈন্যরা সুযোগ পেয়ে তীরের বৃষ্টি আরম্ভ করে দিল। বীর-নারায়ণের লুটিয়ে পড়া মৃতদেহের পাশে যুদ্ধ চালালেন দুর্গাবতী। হঠাৎ তীর এসে বিঁধলো রানীর একটি চোখে। মুহূর্তে দ্বিধা না করে রাণী তীর তুলে ফেললেন এক হাতে, অন্য হাতে তখনও যুদ্ধ চলছে। এদিকে মুঘল সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে গোনডোয়ানার ভবিষ্যৎ। রানী মাহুতের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন খঞ্জর। ঢুকিয়ে দিলেন নিজের বুকে। বাদশাহ আকবরের বিশাল শক্তির সঙ্গে লড়াই তাঁর শেষ হয়ে গেল কিন্তু গোনডোয়ানার মানুষের মনে তাঁর স্মৃতি অমর হয়ে রইল। সেখানকার মানুষের সংগীতগাথায় রাণী দুর্গাবতীর নিত্য তর্পণ হয়। যেখানে বীরাঙ্গনা প্রাণত্যাগ করেছিলেন সেখানে একটি সমাধি মন্দির আছে। গাঁয়ের মানুষ আসা-যাওয়ার পথে নুড়ি বা শিলাখণ্ডটি রেখে আসে সমাধির গায়ে তাদের পূজার উপচার হিসাবে। ১৫৬৪ সনের ২৪শে জুন রানী দুর্গাবতীর মরদেহের অবসান হয় কিন্তু তাঁর অবিনশ্বর আত্মা ভারতের নারীর শাশ্বত মহিমা বয়ে নিয়ে চলেছে যুগ-যুগান্তরের মধ্য দিয়ে। এমনকি ব্রিটিশ রাজত্বকালে ইংরেজ শাসকও সে মহিমাকে মান দিয়েছে। উপরে উদ্ধৃত কবিতার অংশটি এক ইংরেজ আই সি এস অফিসারের লেখা। তাঁর দুর্গাবতী প্রশস্তি নাকি ব্রিটিশরাজ ভাল চোখে দেখেন নি। সেজন্য তাঁকে অসুবিধাও ভোগ করতে হয়েছিল। সরকারের ভয় হয়েছিল যে এই ইংরেজের কলমে দুর্গাবতীর প্রশস্তি গোনড্দের মনে নূতন করে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুললে ঝামেলা বাড়বে!

টুকিটাকি

মাছের আঁশটে গন্ধ যদি অপছন্দ করেন তবে বেসম দিয়ে ধুয়ে নেবেন। মুরগীর বেলায়ও বেসম দিয়ে ধুয়ে রান্না করলে মুরগীর যে উগ্র গন্ধ থাকে তা' কমে যায়।

ছানার ডালনা রান্না করতে ছানা কাটিয়ে আলতোভাবে বাঁধবেন। দীর্ঘ সময় টাঙিয়ে রাখবেন না, তাতে ছানা শক্ত হয়ে যাবে। ছানার টুকরো ভেজে গরম ছানার জলে ফেলে মশলা কষে তাতে ঐ ভিজানো ছানা সামান্য চেপে তবে দেবেন। চমৎকার মশলা ঢুকবে ভিতরে।

গমের সঙ্গে সামান্য ছোলা মিশিয়ে আটা করলে স্বাদ ভাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে বেমালুম পরিবারের সবার প্রোটিন খাওয়ার ব্যবস্থাও হয়।

মাথা ঘষবার জন্য আমলকি প্রশস্ত। ভিটামিন সিতে পরিপূর্ণ আমলকি ভিটামিন তত্ত্ব আবিষ্কারের বহু আগে আয়ুর্বেদে নানাগুণে সম্পন্ন বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। শুকনো আমলকি এক কাপ দুধে দুঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। তারপর মিহি ও মোলায়েম করে বেটে শ্যাম্পুর মত ব্যবহার করুন। ছয় মাসে চুলের চাকচিক্য দেখে অবাক হয়ে যাবেন নিজেই।

রিঠা দিয়ে মাথা ঘষার রেওয়াজ আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে চলে আসছে চিরকাল। যাদের চুল তেল চুকচুকে করে তারা রিঠার সঙ্গে সামান্য লেবুর খোসা শুকিয়ে গুঁড়ো করে ব্যবহার করলে চুকচুকে ভাব কমে যাবে। তিন ভাগ রিঠায় এক ভাগ লেবুর খোসা গুঁড়ো দেবেন। নিত্য যে লেবু ব্যবহার করেন তার খোসা ফেলে না দিয়ে রোদে রেখে দিলে শুকিয়ে যাবে।

শ্রীমতী

সোল এজেন্ট : রাধেশ্যাম কৃষ্ণকুমার অ্যাণ্ড কোং. ১৯৬ যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। অনুমোদিত খুচরা স্টকিস্ট : ফ্যাব্রিক হোম, ৪৬ রফি আমেদ কিদোয়াই রোড (পার্ক স্ট্রীট ক্রসিং), কলিকাতা-১৬। সেঞ্চুরীর ফ্যান্সি শাড়ির স্টকিস্ট : (১) মাহেশ্বরী স্টোর্স, ১৪ নুরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা-৭; (২) জগন্নাথ বনওয়ারিলাল, ২০১-বি এম. জি. রোড, কলিকাতা-৭।

যাঁরা গত কয়েক বছর যাবৎ সোসাইটি অব কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস-এর বার্ষিক প্রদর্শনীগুলি নিয়মিতভাবে দেখে আসছেন তাঁরা বিড়লা অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এবারের প্রদর্শনীতে একটি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে থাকবেন। এই সংস্থার অধিকাংশ সভ্য-শিল্পীই সুনাম অর্জন করেছেন এবং কয়েকজন খ্যাতিলাভও করেছেন। নতুনতর প্রিন্ট পদ্ধতির পরিচয় পেলেও এবারকার গ্রাফিক প্রিন্ট নিদর্শনে কয়েকজন শিল্পী আকার ও অলংকরণের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন। ফলে কয়েকটি প্রিন্টের বিচিত্রতর রূপ অনেককেই মুগ্ধ করে। তা ছাড়া গ্রাফিক অথবা কমপোজিশনের নানা নিদর্শনের মধ্যে প্রত্যেক শিল্পীর আপন আপন চিন্তাধারা রচনারীতি ও পরিকল্পনার আভাস মেলে। প্রথমেই গ্রাফিকে সোমনাথ হোড়, সনৎ কর ও দীপক ব্যানার্জীর নিদর্শনগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সোমনাথ হোড় তাঁর কাজে উডকাটে যেন নবদিগন্তের সূচনা করেছেন। সরল ও আদিমযুগে জাতীয় মানব আকার ও অতি সূক্ষ্ম খোদাইরীতির মধ্য দিয়ে তিনি প্রত্যেক প্রিন্টেই মৌলিক কাঠের দানা বা গোন-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষ করে উডকাট-২ ও উডকাট-৩এর এই প্রসঙ্গে নাম করা যায়। সনৎ করের প্রিন্টে নতুন রীতির সন্ধান মেলে। প্রতীক ও অলংকরণের প্রাধান্যের মধ্য দিয়ে তিনি অতি-অল্প কথায় যেন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন—যেমন রাধা। সূক্ষ্ম কারুকার্য প্রধান জ্ঞানদাস ইলাস্ট্রেটেড দেখে মনে হয় বাঁশ বা হাতীর দাঁতের ওপর কোনও কারিগর অতি সূক্ষ্ম খোদাই কাজ করেছেন। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে কাজ করেছেন এবং তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি আয়তনিক তারতম্য সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণ হিসাবে ফয়েল-২-এর নাম করা যায়। রিলিফ ও রেখা বৈচিত্র্যের দিক থেকে রিলিফ প্রিন্ট উল্লেখ্য। অমিতাভ ব্যানার্জীর কাজেও আকার ও কারুকার্যের সুসমন্বয় দেখা যায়—বিশেষ করে এচিং-এনগ্রেভিংএর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে ফ্লশ-এর নাম করা যায়, তাদের মধ্যে চিকচিক মাছের রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নানা মোটিফ প্রধান হলদে সবুজ ও লালরঙের প্রিন্ট রেলিকও অনেকের চোখে পড়ে। শ্যামল দত্ত রায়ের প্রিন্টে রঙ ও কারুকার্যের সাংকেতিক সমন্বয় ধরা পড়ে। আকার ও খোদাই রীতির দিক থেকে সারেন্ডারড-এর নাম করা চলে। সুশীল গুপ্ত আদিবাসীদের নানা মোটিফ অবলম্বনে এচিং নিদর্শন পেশ করেছেন, বিশেষ করে প্রিন্ট-১ অনেকের চোখে পড়ে। শৈলেন মিত্রের ড্রয়িং নিদর্শন ভাস্কর্যজাতীয়, যেমন ড্রয়িং-১। কালিকলমের এই নিদর্শনে শিল্পী যে আধুনিক ভাস্কর্যেরই একটি রূপ প্রদান করেছেন। জ্যামিতিক বিভিন্ন ক্ষেত্র শূন্যস্থান বিভক্ত করে লাল, কালো দুটি বিমূর্ত প্রিন্ট পেশ করেছেন—বিশেষ করে গ্রাফিক-৫ অনেকের ভাল লাগে। বিভিন্ন মাধ্যমে রচিত নানা কমপোজিশনের মধ্যে প্রথমেই গণেশ পাইন ও বিকাশ ভট্টাচার্যের নিদর্শনগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যদিও দুজনের চিন্তাধারা ও রচনারীতি সম্পূর্ণ পৃথক। নানা স্বচ্ছ রঙের সূক্ষ্মতর স্তরভেদের মধ্য দিয়ে গণেশ পাইন যেন নিজস্ব একটি স্বপ্নালোক সৃষ্টি করেন। হিজ বিলংগিংস ও বিশেষ করে দি মাস্ক্যারেড নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। আর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন দি ডগ। এটির সরল আকার ও রচনাপদ্ধতি দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। বিকাশ ভট্টাচার্য সাররিয়ালিস্টিক রীতিতে কাজ করেছেন। রঙীন ড্রয়িং, রঙ সংযোজনা ও পরিকল্পনার দিক থেকে ভাস্কর্যজাতীয় ইন মাই ড্রিম-২ ও ইন মাই ড্রিম-৪ অনেকের চোখে পড়ে। মানু রাখোড়ের কমপোজিশনগুলিতে নতুনতর রঙ ব্যবহার রীতির পরিচয় মেলে। কালি বা কালো রঙ তিনি যেন ওপর থেকে নীচে ছড়িয়ে দিয়ে নানা বিচিত্র আকার সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এগুলি পরীক্ষামূলক বলেই মনে হয়। তা সত্ত্বেও ড্রয়িং-৫ অনেকের ভাল লাগে। সুনীল দাস তান্ত্রিক মোটিফ অবলম্বনে রচনা করেছেন—তাঁর কাজে গ্রাফিক জাতীয় সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখা যায়। বিশেষ করে ১৬ আগস্ট '৭৩ অনেকের চোখে পড়ে।

সুহাস রায়ের নিদর্শনগুলি নিওরিয়া-লিস্টিক শ্রেণীর—দু'একটিতে বিকাশ ভট্টাচার্যের প্রভাব দেখা যায়। তবে উওম্যান-এর উল্লেখ করা যায়। সূক্ষ্ম রেখাভিত্তিক ড্রয়িংএর জন্য অজিত চক্রবর্তী প্রশংসা দাবী করতে পারেন, বিশেষ করে ড্রয়িং-২-এর এই প্রসঙ্গে নাম করা চলে। ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত কালি ও স্থিরচিত্র মাধ্যমে কোলাজ রচনা করেছেন। পরীক্ষামূলক নিদর্শন হিসাবে অলংকার-প্রধান আ্যাট রেস্ট অনেকের চোখে পড়ে। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে শ্যামল দত্ত রায়ের অপূর্ব এচিং নিদর্শন ম্যান অ্যান্ড ডেভ বার্ড, দীপক ব্যানার্জীর গ্রাফিক প্রিন্ট ফর্ম-২, অমিতাভ ব্যানার্জীর গ্রাফিক প্রিন্ট উইন্ডো ও মানু পারেখের ড্রয়িং নিদর্শন পেজ-৩ উল্লেখযোগ্য।

*

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শিল্পী অমলেশ ঘোষ তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে জলরঙ ও প্যাস্টেলে আঁকা ১৮টি ছবি দেখা যায়, সেই সঙ্গে থাকে কয়েকটি স্কেচ। ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করে এই তরুণ শিল্পী ইতিপূর্বে নিয়মিত প্রদর্শনীর আয়োজন

টাচ অব গ্রীন —অমলেশ ঘোষ

করে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যাঁরা বিমূর্ত বা অতি আধুনিক নানা শ্রেণীর কম্পোজিশন দেখে দেখে প্রায় হাঁফিয়ে উঠেছেন তাঁরা এই শিল্পীর সহজ রচনা-পদ্ধতি দেখে যে খুশী হবেন স বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ শিল্পী বহির্মুখী—চলার পথে যখন যে দৃশ্য তাঁর ভাল লেগেছে তাই তিনি রিয়ালিস্টিক রীতিতে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন—বিশেষ করে প্রদর্শনীতে কয়েকটি সুন্দর নিসর্গ দৃশ্য দেখা যায়। কল্পনার আশ্রয় নিলেও কয়েক ক্ষেত্রে শিল্পী যে মনুসচকারে স্টাডি করেছেন তা কয়েকটি নিদর্শন দেখে বোঝা যায়। এই শিল্পীর সাম্প্রতিক রচনারীতির প্রধান গুণ এই যে জলরঙেই তিনি জলরঙের ইমপ্যাস্টো বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন—বিশেষ করে এই প্রসঙ্গে বোট-এর উল্লেখ করা যায়। তবে অপর কয়েকটি ছবিতে ইমপ্যাস্টো প্রথায় রঙ ব্যবহাররীতি প্রশংসনীয় হলেও উপরোক্ত ছবিতে এই রীতি অনুসরণ করার ফলে জলভাগে স্বচ্ছতার অভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কয়েকটি নিসর্গদৃশ্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিশেষত পরিপ্রেক্ষিত-বোধ ও রঙ ব্যবহার কৌশলের জন্য। যেমন টাচ অব গ্রীন। দুটি গাছ ও পাহাড়ী জমিকে কেন্দ্র করে সবুজ ও নীল রঙের সাংকোশল তারতম্যর মধ্য দিয়ে শিল্পী এটিতে একটি বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য ছবির মধ্যে ভিলেজ বাই লেন-এর নাম করা চলে। রঙ ব্যবহার বিষয়ে অধিকতর সচেতন হলে প্যারাডাইস রিগেনও রসোত্তীর্ণ হত। স্তরপ্রধান রঙ ব্যবহারের জন্য ১৯নং ছবি অনেকের নজরে পড়ে। দি কক-ও উল্লেখ্য রচনা। স্টাডি নিদর্শন হিসবে কমপ্যানিয়ন প্রশংসা দাবী করে।

চিত্রপ্রিয়

সাম্প্রদায়িকতার উৎস

১২ই আশ্বিনের 'দেশ'-এ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'সাম্প্রদায়িকতার উৎস' সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধটি ভালই লাগল। এই ধরনের চিন্তাধারার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। লেখক এর আগেও কয়েকটি এই ধরনের প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু সব ক্ষেত্রে তার সঙ্গে মৌলিক এবং তথ্যগত ভাবেও এক হওয়া যায় না। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, '......অনেক সময়ই মুসলমানেরা প্রাথমিক আগ্রাসী ভূমিকা নিতেন। স্বাধীন ভারতের পরিবর্তিত রাজনৈতিক কাঠামোর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আগ্রাসী ভূমিকা প্রধানত হিন্দুরাই নিয়েছেন......।" এই উক্তিগুলি বাস্তব ঘটনাপ্রসূত নয় বলেই মনে হয়, কাশ্মীরের হজরতের পবিত্র কেশ, এলাহাবাদের হিন্দী অমৃত পত্রিকা, স্টেটসম্যানের টয়নবির প্রবন্ধ, মুর্শিদাবাদের হরিহর পাড়ার ঘটনা, এমনি কয়েক বছর আগের অধিকাংশ ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করা যায়। লেখকের বিশ্লেষণ গাণিতিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সমাজজীবন অঙ্ক নয়, বোধ হয় আরো জটিল, বিশেষত ভারতের ক্ষেত্রে। স্বাধীন ভারতে মুসলিম মনোভাব বোঝবার জন্য হামিদ দালওয়াই-এর Muslim politics in secular India গ্রন্থটি পড়া যায়।

অন্য এক জায়গায় লিখেছেন, "মিশ্র বিবাহ তো পাগলের প্রলাপ. এই দুর্ভাগা দেশে হিন্দুর কাছে মুসলমান শব্দটিই অবজ্ঞা ও হীনস্থান ব্যঞ্জক।" এই মনোভাব সম্ভবত ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণদের অধিকাংশের অব্রাহ্মণদের প্রতি কি মনোভাব, লেখক সে সম্বন্ধে কি সচেতন আছেন? ব্রাহ্মণের মনোভাব দিয়ে সকল হিন্দুর মনোভাব নির্ণয় করা বোধ হয় ঠিক হবে না। কলকাতার কাছেই বারাসতের পার্শ্ববর্তী এলাকা, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের কিছু অংশের সামাজিক ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণান্তে বিশ্লেষণ করলে বাস্তব চিত্র অনেকখানি বোঝা যাবে। আসলে নিজ বর্ণ এবং গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্রাহ্মণ এবং মৌলভী শ্রেণীরাই পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ, ঈর্ষা বা শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখেন এবং নিজ নিজ সমাজশাসিতদের মধ্যেও তা সঞ্চার করান। ইতরজনের কাছে সমস্যাটা বোধ হয় এত ভয়াবহ নয়, আর হলেও মূলত তাদের দায়ী করা ঠিক হবে না।

হিন্দুদের মধ্যেই ব্রাহ্মণরা কত সমস্যা সৃষ্টি করে রেখেছেন। এখানে অব্রাহ্মণদের একটি অবশ্য প্রথার উল্লেখ করছি। অব্রাহ্মণের একটি শ্রাদ্ধ বাসরের চিত্র চিন্তা করুন। শ্রাদ্ধকার্য হয়ে গেলে ভোজনের পালা—আগে ব্রাহ্মণরা আলাদা খেয়ে দক্ষিণা পাবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নিমন্ত্রিত অব্রাহ্মণরা ক্ষুধা নিয়েও অপেক্ষা করতে বাধ্য হবেন এবং পরে এদের খাওয়ার পর উচ্ছিষ্ট পাবার জন্য কারা অপেক্ষা করেন। এই চিত্রস্তরে মানবতার, সভ্যতার, সংস্কৃতির কত বড় অপমান!

মুসলমানদের সম্বন্ধে কোন কিছু অমুসলমানদের পক্ষে বিশেষত হিন্দুর পক্ষে লেখা বা বলা ভারতে বহু অবাঞ্ছিত সমস্যার সৃষ্টি করে। এর ফলে সন্দেহ আরো বেড়ে যাবারই সম্ভাবনা বেশি। তাদের মধ্য থেকেই ভারতীয় কামাল পাশা না এলে কিছু করা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। তেমনি হিন্দুর মধ্যেও 'কালাপাহাড়ের' দরকার।

হিন্দুদের মধ্যেই প্রচুর সংস্কারশাসিত ব্যবস্থা তীব্রভাবে আফিমের নেশার মত আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার জন্য অপেক্ষা করছে একটি অবশ্যম্ভাবী সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক বিপ্লব। মানসিক দিক দিয়ে নিজেদের তৈরী করে রাখাই হবে প্রধান কাজ।

জন্মভিত্তিক বর্ণাশ্রম ও কতকগুলি বিশিষ্ট পদবী নিয়ে তাকে গৌরবান্বিত করা, উপনয়ন প্রথা এবং বিভিন্ন সংস্কার দিয়ে গোটা হিন্দু সমাজকে লালন করার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অর্জিত গুণ ও কর্মভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাসের প্রয়োজন। মনুসংহিতার শাসন অনেকাংশে বর্জন করে পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন সংহিতা সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

রঞ্জিত দত্ত রায়
বড়জাগুলি, নদীয়া

॥ ২ ॥

১২ই আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীজয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সাম্প্রদায়িকতার উৎস" প্রবন্ধটির জন্য লেখককে ও দেশ-এর সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। ভারত উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতা সমস্যার মূল কারণ সম্বন্ধে লেখকের অতি যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ এবং সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে পথনির্দেশ খুবই মনোগ্রাহী। কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগে। লেখক বলেছেন: "মৃত্যুভয়, পরলোক, কামনা, জীবনের উৎকণ্ঠা, মাতাপিতারূপী রক্ষকের মানসিক প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়...।" ধর্মবোধের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যথার্থই তাই; ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানও এই কথাই বলে।

অতএব, মানসিক ও আত্মিক প্রয়োজন থেকেই যদি ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি হয় তা হলে "...কঠোর ধর্মহীনতার উপরেই মানবতার জয়স্তম্ভ নির্মাণ সম্ভব" কি করে হবে? কোনো সমাজব্যবস্থা, কোনো অর্থনৈতিক কাঠামোই মানুষকে মৃত্যুভয়, জীবনের উৎকণ্ঠা, [illegible] মাতাপিতারূপী রক্ষকের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তি দিতে পারে না। [illegible] হয় [illegible]কও এ সম্বন্ধে চিন্তা [illegible] তিনি লিখেছেন: "ধর্মহীন মানুষের [illegible]তরে তবু হয়তো জেগে [illegible] বির[illegible] অনন্ত জিজ্ঞাসা।" কিন্তু [illegible] জিজ্ঞাসার [illegible] আবার ধর্মাশ্রয়ী [illegible] গণদেবতার' অধিষ্ঠান কি মানু[illegible] মৃত্যুভয় ও জীবনের উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি দিতে পারবে? তাই মনে হয়, কাজটা খুব সহজ নয়। ধর্মবিশ্বাসকে উৎপাটিত করার চেয়ে ধর্মবোধকে পুরোহিত-মোল্লা-পাদ্রী প্রভৃতি ধর্মব্যবসায়ীদের হাত থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিচেতনার মধ্যে সঞ্জীবিত করে তাকে মানবকল্যাণমুখী করে তোলাটা বোধ হয় সহজতর কাজ। তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লব। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ ও অধ্যাত্মচিন্তার মধ্যে কি এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের একটা ইঙ্গিত মেলে না?

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সূচনার এক সামান্য আয়োজন থেকে 'পারাপার' উপন্যাসের কাহিনীকে ধীরে ধীরে, কিন্তু আশ্চর্য নৈপুণ্যে, লেখক নিয়ে যান এক বিশাল ব্যাপ্ত জগতের মধ্যে —ঘটনার সংঘাতে যেখানে প্রত্যক্ষ ও অনুভব্য যাবতীয় অভিজ্ঞতা বদলে যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

পারাপার

দাম ১২·০০

প্রতি মুহূর্তে, গার্হস্থ্য আর অধ্যাত্ম হয়ে পড়ে একাকার। বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী নানা চরিত্রের সংলগ্ন হয়ে এগিয়ে চলে জীবন—এক বিচিত্র সমগ্রতার দিকে॥

এই লেখকের আর একটি উপন্যাস:
ঘুণপোকা ৬·০০॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

॥ ৩ ॥

২৯শে সেপ্টেম্বরের 'দেশ' পত্রিকাতে শ্রীজয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'সাম্প্রদায়িকতার উৎস' নামক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে দু-চার কথা লিখতে চাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। একটি প্রবন্ধের পরিসরে এই জটিল প্রক্রিয়ার বিবরণ ও কারণ বিশ্লেষণ করা যায় না। সুতরাং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে বহু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নই অনুচ্চারিত থেকে গেছে। সেসব প্রশ্ন এই পত্রে উত্থাপন করা যাবে না, করতে হলে বই লিখতে হয়। তবে তিনি যে-বক্তব্য রেখেছেন তার পরিধিতেই বলতে পারি যে, এই সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে কয়েকটি কথা মনে রাখা উচিত। হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যে-উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার কথা বলা হয় তা একটা গালগল্প। এখানে কিছু সেমানটিক তর্ক এসে যায়। সেই তর্ক এড়িয়ে দেখা যাক কেন এখনও বহু হরিজন দলেদলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করছে? স্পষ্টতই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। ভদ্র হিন্দুরা সাধারণত আপস-আলাপে মুসলিমদের সম্বন্ধে কেন মনোভাব প্রকাশ করে? নিজেদের দিকে তাকালে দেখি, আমরা মুসলিমদের সম্বন্ধে যে-মনোভাব পোষণ করি তা কাগজে কলমে প্রকাশ করি না এবং কাগজে কলমে যা প্রকাশ করি তা আমাদের সত্যকার মনোভাব নয়। হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে এই মনে-মুখে দু রকমের একটা ঐতিহ্য আছে। যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণকে হিন্দু জাতির নবজন্ম বলে ঘোষণা করা হলো তখন ব্যাপারটা মহান। তার উত্তরে যখন আলিগড় আন্দোলন থেকে বলা হলো, ভারতীয় মুসলিমরা এক জাতি তখন ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক। যে-আচরণ হিন্দুদের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক সেইটেই মুসলিমদের সংকীর্ণতার একটা দৃষ্টান্ত। আমাদের সর্বত্রই বিচারের দ্বিমুখী নীতি প্রকটিত। এজন্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল।' সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী আমাদের আলোকবর্তিকা এবং তাঁর সাক্ষ্য প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যও বটে। চাই অবিকৃত ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, ইস্কাপনকে ইস্কাপন বলার আন্তরিকতা—শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমটি করতে পারেননি স্থানাভাবে, কিন্তু দ্বিতীয় কথাটা স্পষ্ট করে না বলে বহু তথ্য তত্ত্ব তর্কের অবতারণা করে সমস্ত বক্তব্যটাকেই ধোঁয়াটে করে তুলেছেন।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত
কলিকাতা-৩২

॥ ৪ ॥

শ্রীজয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাম্প্রদায়িকতার উৎস' প্রবন্ধে (দেশ, ২৯-৯-৭৩) লিখেছেন যে 'ধর্মগোষ্ঠীর ভিত্তিতে তুলনা করলে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরা দরিদ্রতর।' কোন তথ্যের ভিত্তিতে লেখক এই মন্তব্য করেছেন বলে মনে হয় না। সরকারী ও বেসরকারী পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখতে পাই যে, হিন্দু সমাজেরই বেশ কিছু অংশ সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে বেশী দরিদ্র। তা ছাড়া বেশ কিছু উপজাতীয় যারা সমাজিক দিক দিয়ে হিন্দুদের কাছাকাছি, তারাও মুসলমানদের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে হীন অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

জয়ন্তানুজবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, "ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু বলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁদের সংখ্যালঘু আখ্যা দিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের অমর্যাদা করা হয়েছে।" যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, মুসলমানেরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে অনগ্রসর, তা হলে তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাদের সংখ্যালঘু বলে আখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় সমাজে সকল সম্প্রদায়ের সাম্যের স্বার্থেই এটা প্রয়োজন, এবং ভারত সরকার নীতিগতভাবে ও কার্যক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য নিয়েই এগিয়েছেন।

সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করবার পন্থা হিসাবে লেখক আবেগভরে এক বহুমুখী ও উত্তাল সাংস্কৃতিক গণবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এই তথাকথিত সাংস্কৃতিক (সামাজিক নয় কেন?) গণবিপ্লবের মাধ্যমে আসল উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে মনে হয় না, বরঞ্চ দেশের মধ্যে অশান্তি ও হানাহানি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। লেখকের নির্দেশিত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

"পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি"

লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও অনুরাগীদের পক্ষে একটি আবশ্যক সংকলন-গ্রন্থ

মূল্য : সাড়ে পাঁচ টাকা

॥ বিষয় ও লেখক-সূচী ॥

বাংলার লোক-সাহিত্য—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ● বাংলার লোকনাট্য—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ● পশ্চিমবঙ্গের লোক-নৃত্য—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ● লোকসংস্কৃতি বিকাশের পশ্চাৎপট ও বংগদেশ—ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় ● লোক-সাহিত্যের ভাষা—ডঃ সুকুমার সেন ● বাংলার লোক-সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য—শ্রীগোপাল হালদার ● বাংলার লোক-সঙ্গীত—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র ● পশ্চিমবঙ্গের লোক-উৎসব—ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক ● বাংলার লৌকিক ভাষা—ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ● বাংলার লৌকিক দেব-দেবী—শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ● বাংলার লোক-শিল্প—ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ● বাংলার লোকধর্ম—ডঃ সুধীররঞ্জন দাশ ● বাংলার মৃৎশিল্পের সমাজতত্ত্ব—শ্রীবিনয় ঘোষ ● পশ্চিমবঙ্গের নবপর্যায়ের মন্দির চর্চা (১৫ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ-১৯০০) উৎস সন্ধান ও চরিত্র বিচার—শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল ● পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সংস্কৃতির ধারা—ডঃ অমলকুমার দাশ ● পশ্চিম সীমান্ত-বঙ্গের লোক-সংস্কৃতি—ডঃ সুধীরকুমার করণ ● উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি—শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য ● বাংলার লোক-সংস্কৃতি ও প্রচার-মাধ্যম—শ্রীশংকর সেনগুপ্ত।

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন-বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়

৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-৭০০০২৭

প্রকাশন বিক্রয়-কেন্দ্র, নিউ সেক্রেটারিয়েট

১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ)/৭৩

পালন পোষণ যদি ঠিকমত চান
তবে বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান!

পড়াশোনায় চৌকস....খেলাধুলায় ওস্তাদ

পড়াশোনার বা খেলাধুলার চাপে ছেলেমেয়েদের যে শক্তির অপচয় হয়, তার পূরণ না হলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে না। প্রতিদিন বোর্নভিটা খেলে শক্তির উৎস অফুরান থাকে।

বোর্নভিটায় আছে পুষ্টিকর **কোকো**, দুধ, মল্ট ও চিনি—তাই এটি এত সুস্বাদু:
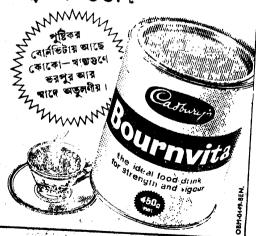
শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্য—
ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা!

OBM-0449-BEN.

"সাংস্কৃতিক" বিপ্লবের পথে অগ্রসর হলে সাম্প্রদায়িকতা দূর হওয়ার পরিবর্তে আরো নতুন সম্প্রদায় গজিয়ে ওঠার এবং সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ ভেদবুদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। এতে সামাজিক শান্তি ও জাতীয় সংহতি দুই-ই বিপন্ন হবে, যেটা নিশ্চয় কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরই কাম্য নয়।

প্রবন্ধ লেখক ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে "একমাত্র কঠোর ধর্মহীনতার উপরই মানবতার জয়স্তম্ভ" নির্মাণ করবার কথা বলেছেন। এটা একটা অবাস্তব পরিকল্পনা। লেখক স্বীকার করেছেন যে, "ধর্ম সামাজিক সংঘাতের মূল কারণ নয়।" তা হলে ধর্মহীনতার বীজ মানুষের মনে বপন করবার জন্য লেখকের এত অসহিষ্ণুতার কারণ কি? এটা কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না যে ধর্মের অস্তিত্বই সামাজিক সংঘাত সৃষ্টি করে বা তার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ধর্মের যে সকল দিক মনুষ্যসমাজে বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে সেগুলির সংস্কার বা বর্জন করা দরকার। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, সময়ের সাথে সাথে বহু ধর্মীয় সংস্কার হয়েছে। সেইজন্যই খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের ক্রুসেডের কথা বা অর্থডক্স চার্চের ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে জেহাদের কথা শোনা যায় না। এই উপমহাদেশে হিন্দু ধর্ম ও ঐস্লামিক রীতিনীতিতে অনেক সংস্কার হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা একদিন বিস্তার লাভ করে নি। সময়ের সাথে এর অবসান হবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে রাষ্ট্রীয় নির্দেশে ধর্মহীনতাকে উৎসাহ দেওয়া হয়, কিন্তু মানবতার জয়স্তম্ভ সেখানে নির্মিত হয়নি। মানুষকে এক অমানবিক যন্ত্রে পরিণত করবার ব্যর্থ চেষ্টা শুধু হয়েছে মাত্র। অন্যদিকে অনেক ইউরোপীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক বিভেদ প্রায় নেই বললেই চলে। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শের কোন সার্থকতা বা উপযোগিতা নেই। ধর্ম যেমন মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, তেমনি ধর্মকে (বিশেষ করে স্বেচ্ছায় যে ধর্মকে সে গ্রহণ করেছে) মনুষ্যমন থেকে মুছে দেওয়া যায় না।

গৌতম সেন
নিউদিল্লি-২২

বনস্পতির বৈঠক

'দেশ' পত্রিকার ৪০ বর্ষ ৪৮নং সংখ্যায় শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর স্মৃতিচারণমূলক রচনা "বনস্পতির বৈঠকে" শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন, "যে দু-একজন সম্পাদক তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'ভারতবর্ষে'র বন্ধু জলধর সেন ও 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকার তরুণ বয়স্ক সম্পাদক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রথমেই মনে পড়ে। উমাপ্রসাদ তখন শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নামক বিপ্লবমূর্তি উপন্যাসটি তাঁর সম্পাদিত বঙ্গবাণীতে প্রকাশ করে তৎকালে অসমসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।"

এই তথ্যটি ভুল। 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকা ১৩২৮ সনের ফাল্গুন মাসে বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেনের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে তৃতীয় বর্ষ থেকে সম্পাদনা করেন কেবলমাত্র বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ওই পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন স্যার আশুতোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

'পথের দাবী' 'বঙ্গবাণী'তে ১৩২৯ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হইয়া ধারাবাহিকভাবে শেষ হয় ১৩৩৩ সনের বৈশাখ সংখ্যায়। 'বঙ্গবাণী'তে পথের দাবী প্রকাশের ইতিহাসটি গোপালচন্দ্র রায়ের 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে নিম্নোক্তরূপে লিপিবদ্ধ আছে।

'বঙ্গবাণী'তে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি (আশ্বিন, ১৩২৯) প্রকাশিত হইবার পর ওই বছর মাঘ মাসে তাঁর 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটিও 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়। সেই সময়েই রমাপ্রসাদবাবু একদিন কুমুদবাবুকে (বঙ্গবাণী পত্রিকার কর্মসচিব ও আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী) সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবাণীর জন্য আরও কিছু লেখা পাওয়ার আশায় শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাসায় যান। রমাপ্রসাদবাবু যখন যান, শরৎচন্দ্র তখন গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন।

রমাপ্রসাদবাবু গিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে বঙ্গবাণীর জন্য কিছু লেখা চাইলে, শরৎচন্দ্র বললেন—লেখা নেই। এক ভারতবর্ষের লেখাই নিয়মিত লিখতে পারছি না।

শরৎচন্দ্র এই কথা বললেও রমাপ্রসাদবাবু শরৎচন্দ্রের লেখার টেবিলের কাছে গিয়ে শরৎচন্দ্রের কোন লেখা আছে কি না দেখতে লাগলেন। এমন সময়ে শরৎচন্দ্রের একটি খাতায় অসমাপ্ত খানিকটা লেখা রমাপ্রসাদবাবুর চোখে পড়ল। তখন তিনি শরৎচন্দ্রকে বললেন—লেখা নেই বলছেন, এই তো একটা খাতায় খানিকটা লেখা রয়েছে।

রমাপ্রসাদবাবুর কথার উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—ও লেখা তোমরা ছাপতে পারবে না। শুধু তোমরা কেন, কেউই ও লেখা ছাপতে সাহস করবে না। তাই কেউ ছাপবে না ভেবেই লিখতে লিখতে ফেলে রেখেছি। অনেকদিন আর লিখিনি।

রমাপ্রসাদবাবু বললেন—আপনার যে লেখা কেউ ছাপতে সাহস করবে না, সেই লেখা আমি ছাপব। আমাকে দিন।

—ছাপবে? ছাপলে হয়ত জেলও হতে পারে।

—তা হয় হবে। দিন আমাকে, আমি বঙ্গবাণীতে ছাপি।

—আচ্ছা, তা হলে তোমাকেই দোব। ওটা একটা বড় উপন্যাস হবে। নাম দিয়েছি 'পথের দাবী'। তোমাদের কাগজে অনেকদিন ধরে বেরোবে।

এর পর রমাপ্রসাদবাবু একদিন শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে বঙ্গবাণীতে প্রকাশের জন্য 'পথের দাবী'র প্রথম কিছুটা কপি নিয়ে এলেন। এইভাবে পথের দাবী বঙ্গবাণীতে প্রথম ছাপা শুরু হল ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাসে।"

লেখা রায় চৌধুরী
কলিকাতা-৫৩

সেকালের বাবুদের দুর্গোৎসব

'সেকালের কলকাতায় বাবুদের দুর্গোৎসব' লেখাটি পড়িলাম। লেখক শ্রীঘটক মহাশয় পুরানো দিনের একটি চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু একটি ভুল তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে যাহার নিরসন হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে (বর্তমান পশ্চিম বাংলা অবশ্য) জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথম প্রবর্তক কৃষ্ণনগরের খ্যাতকীর্তি মহারাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং কৃষ্ণনগরেই ইহার প্রথম প্রচলন হয়। জনশ্রুতি যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার হইতে জলপথে প্রত্যাবর্তনকালে রুকণপুরে ঘাটে রাত্রি যাপনের সময় মা দুর্গার স্বপ্নাদেশ পান এই জগদ্ধাত্রী মূর্তির পূজা ও এক দিনেই তিন তিথির পূজা প্রচলন করার জন্য, এবং মহারাজা কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া তাহাই প্রচলন করেন।

লেখকের প্রারম্ভিক প্রশ্নের তাৎপর্য ঠিক বুঝিলাম না। শ্রীশ্রীচণ্ডী-তে তো অকালবোধনের সবিশেষ বিশ্লেষণ আছে।

মঞ্জু মুখোপাধ্যায়
মুড়াগাছা, নদীয়া

বিশ্ববিজ্ঞান

দেশ পত্রিকার ৪৭নং সংখ্যার 'বিশ্ববিজ্ঞান'-এ সমরজিৎ কর মহাশয় ৭৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "মাত্র ১৫০ থেকে ২০০ বছর আগে অতিকায় জাভা-জলহস্তী সুন্দরবনে বাস করত। এখন তাদের কাউকে এখানে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।" এ সংবাদ তিনি কোথায় পেলেন? বৈজ্ঞানিক শ্রীচৌধুরী নিশ্চয়ই এ কথা বলেন নি।

সংবাদটি ভুল—'জাভা-গণ্ডার' লিখতে 'জাভা-জলহস্তী' লিখেছেন। জাভা-গণ্ডার (Rhinoceros Sondaicus Desmarest) সুন্দরবনে ১০০।১৫০ বছর আগে ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য এখন তারা লুপ্ত হয়েছে। যাস জাভাতেও এরা অবলুপ্তির পথে, অতি কষ্টে ৩০।৪০টি টিকে আছে।

জাতীয় আন্তর্জাতীয় আন্তরিক প্রচেষ্টা না হলে এরাও বিলুপ্ত হবে।

অনন্ত মিশ্র
কলিকাতা-৩৩

হাসির শোভায়
আজ সন্ধ্যায়
অপরূপ সাজে সেজেছো!

হ্যাঁ, আপনার হাসিতে সব সময়েই একটি শুভ্র –
সুন্দর আভা মুক্তোর মত ঝলমলিয়ে উঠবে।
রোজ পেপসোডেন্ট দিয়ে দাঁত মেজে দেখুন,
কত সহজে আপনি এধরনের হাসি ছড়াতে পারেন।
পেপসোডেন্ট বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী –
অপূর্ব এর স্বাদ, এবং দাঁতকে আরও বেশী সাদা ও
সুন্দর করে পেপসোডেন্ট।

পেপসোডেন্ট ঝকঝকে দাঁতের জন্য

হিন্দুস্থান লিভার-এর তৈরী একটি সেরা টুথপেস্ট

HLP.6087 A.

কাব্যগ্রন্থ

কফিন কিংবা সুটকেশ। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। উলুখড়। ১/৪ নীলকমল চক্রবর্তী লেন, হাওড়া-২। তিন টাকা।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নামকরণে ধরে রেখেছেন এক বিপন্ন সময়ের স্মৃতি, এক সন্ত্রাসময় দিবারাত্রির অভিজ্ঞান, '৭০-৭১এর বিপর্যস্ত বাংলাদেশের বিষণ্ণ কোমল চলচ্চিত্র, যখন স্বপ্নবিলাসী যৌবনের কাছে খোলা ছিল একটিমাত্র পথ, কফিন কিংবা সুটকেশ ঃ মৃত্যুদণ্ড কিংবা নির্বাসন। 'এই অদ্ভুত সময়/যখন কফিন কিংবা সুটকেশ যে-কোনও একটা বেছে নিতে বলা হয়েছে তোমাকে' (তৈরী হও), যখন 'আরো তীব্রভাবে ফেটে পড়ার আগে শুধু স্তব্ধ হয়ে আছে/বেদনাময় হাজার মানুষের জমাট-বাঁধা অপর্যাপ্ত রক্ত' (মৃত অশ্রুকে), যখন 'মুখচোরা লাজুক লাইটটি/হঠাৎ গেছে গ্রামে/চোখে তার শানানো নীল স্বপ্ন/সে কি ফিরে আসবে কখনো/মা ভাবেন সারা রাত বসে' (স্বপ্ন, স্বপ্ন), যখন 'ফুটপাথে এবং বাস-গুমটির কাছে কথা বলছে চিন্তিত মানুষ' (এই রাত), এবং যখন 'ভালোবাসার রঙীন চিঠি সকাল থেকে/কিশোরীর হাতে ঘুরছে, দিশেহারা কিশোর/পাইপগান হাতে দমবন্ধ করে বসে আছে তাঁও। গ্যারেজের পাশে' (এপ্রিল '৭১)।

বেদনা ও বিক্ষোভ, স্বপ্ন ও প্রতীক্ষা, দুশ্চিন্তা ও দুঃসময়, ভালোবাসা ও গ্লানি, অপ্রেম ও বিস্ফোরণ, স্বপ্নহীনতা ও রক্তপাতের এমন বহু তীব্র ছবি ছড়ানো কফিন কিংবা সুটকেশ। এমন নয় যে, বুদ্ধদেব সরব সংরোষ সুলভ তির্যক ভঙ্গিতে এই সময়ের কথা শুনিয়েছেন। তাঁর ভয় মুখ্যত কবিতারই ভায়। এ-কথা বোধ ও বিস্মৃত হন নি তিনি। সমসময়ের প্রতি দুর্বার মমতা তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থে শুধু একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। 'গম্ভীর এরিয়েলের পথ-সন্ধানী, উন্মুখ, অস্থির কবি 'কফিন কিংবা সুটকেশে' এসে প্রাজ্ঞ, গম্ভীর, সময়সচেতন, শান্ত এবং সর্বোপরি প্রখর ব্যক্তিত্বময়—সানন্দে লক্ষণীয়।

বুদ্ধদেবের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, চিত্রময়তা। স্বচ্ছন্দ, সপ্রতিভ, গতিময় ভঙ্গির সুররিয়ালিস্ট ভঙ্গিতে আঁকা ছবিগুলি টাটকা, তেজী এবং অনায়াস। তার থেকেও বড়ো কথা এলোমেলো নয়, অন্তর্গূঢ় কার্যকারণের সূত্রে গাঁথা। 'কাক্ষিত শান্ত অভিমানী' প্রেমের কবিতাগুলিতেই একই রকম স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল ছবি ঃ

সারা রাত বাজি পুড়বে, সিল্কের পেটিকোট প'রে সারা রাত/হাসতে হাসতে চ্যান্সেলারের ঘামাচি মেরে দেবে চ্যান্সেলারের স্ত্রী/লাল রিকেণ চিবিয়ে খেয়ে মার্চ ক'রে এগিয়ে আসবে/মানুষের বাচ্চারা, তারা গান গাইবে ইনটারন্যাশনাল,/ তুমি তখনো শুয়েই আছো, শুয়ে আছ বুকের ওপর দোদ্যমান হাত, কার কথা মনে পড়ছে তোমার" (ভোর হয়েছে, তবু)।

অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলার অভাব বেশির ভাগ তরুণ কবির রচনায় যখন পীড়াদায়করূপে প্রকট তখন বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর এই শৃঙ্খলাবদ্ধ, গম্ভীর, পারম্পর্যময় কবিতাবলী অতিরিক্ত বিস্ময়ের ধাক্কা জাগায়।

শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র তৈরী করা যেতে পারে এমন গল্প বা চিত্র-নাট্য পাঠাবার জন্য চিল্ড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটী ভারতীয় সব ভাষার লেখক-লেখিকাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। রচনা টাইপ ক'রে বা পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। চলচ্চিত্রের জন্য যে যে কাহিনী বেছে নেওয়া হবে তার জন্য উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়া হবে।

সেক্রেটারী,
চিল্ড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটী;
হিঙ্কোরানি হাউস,
ডাঃ অ্যানি বেসান্ত রোড,
ওর্লি, বোম্বাই-18
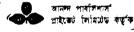
davp 912 (1) 73

শচীন্দ্রাংশু গুপ্তের

নতুন উপন্যাস

অনুপ্রবেশ

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

পঞ্চাশ গুলির ফো[illegible] পিস্তল

(লাইসেন্স প্রয়োজন হয় না) [illegible] পিস্তল। চোর ও [illegible] নিকট থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। নাটক ও [illegible] বিশেষ উপযোগী। ১০০ গুলি বিনামূল্যে। দাম ১২ টাঃ ৫০ পঃ উপরি ডাকব্যয় ২ টাঃ ৫০ পঃ। ডিলাক্স (স্পেঃ) ২০ টাকা। উপরি ডাকব্যয় ৩ টাকা। বেল্টসহ ক্রোম লেদার কেস (স্পেঃ) ৮ টাকা। অতিরিক্ত গুলি ২ টাকা প্রতি শত।

STAR TRADING CO.
(WDC) Chhapati, Aligarh (UP)

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আনন্দ মেলায় ধারাবাহিকভাবে বেরবার সময়েই বেশ সাড়া জেগেছিল, এখন স্থায়ী উপহার হিসেবে বেরল তারাপদ রায়ের ছোটদের মন-কেড়ে-নেওয়া বই **ডোডো-তাতাই** (মডেল পাবলিশিং হাউস দেড় টাকা)। সঙ্গে অহিভূষণ মালিকের সংগতপ্রতিম সেই আশ্চর্য মজাদার ছবি, শিশুশিল্পী কৃত্তিবাস রায়ের আঁকা বিস্ময়কর স্কেচ, দীননাথ সেনের বর্ণময় প্রচ্ছদ—কোনো দিক থেকেই কার্পণ্য নেই বইটির প্রকাশনায়। সাধ্যের সীমায় বইয়ের দাম না-বেঁধেও পরিপাটি সৌষ্ঠব সম্পন্ন একটি বই ছোটদের হাতে যাতে পৌঁছোয় সেদিকে প্রকাশকের সতর্ক দৃ- ছিল নিশ্চিত। এর জন্যে তিনি কৃতজ্ঞতা- ভাজন।

মূলত কবি হলেও তারাপদ রায়ে- হাতে সরস গদ্যও কম দ্যুতিময় হয়ে ও- না—এ-প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। ডোডো, এব- তাতাই নামক দুটি নিতান্ত বালক তাঁ- এই কৌতুককর কাহিনীর নায়ক। এ-

শিশিরসিক্ত আভারঞ্জিত বিকশিত কুসুম

দুজনের নানান কীর্তিময় ঘটনার সচিত্র পরিচয় ডোডো-তাতাই। ইংরেজীতে যেমন কমিক-সিরিজ, তারই ঘরোয়া বাংলা সংস্করণ আর কি। কিন্তু চপলমতি ফন্দিবাজ অপরিণতবুদ্ধি ফুর্তিকাতর দুই নাবালকের মজাদার কাণ্ডকারখানার একের-পর-এক পরিচয় শুধু ছোটদের কেন, বয়স্কদের পক্ষেও সমান উপভোগ্য। এখানেই তারাপদ রায়ের কৃতিত্ব। ডোডো এবং তাতাইবাবুর মধ্য দিয়ে বাংলা শিশু-সাহিত্যে দুটি ছটফটে জ্যান্ত আনকোরা চরিত্র আমদানি করলেন তিনি।

*

প্রাণেশ চক্রবর্তীর **মানসী মানা** (রূপরেখা, সাত টাকা) গ্রন্থের ভূমিকায় গৌরকিশোর ঘোষ লিখেছেন : "চেয়েছিলাম মানার কাহিনী অন্য কেউ লিখুক, এমন কেউ যে মানার আদর আর লাথি আমার চেয়েও বেশী খেয়েছে। প্রাণেশ সে কাহিনী লিখেছে। আমি খুবই খুশী, এ কাজে ওর চেয়ে যোগ্য আর কে আছে?"

১৯৬৬ সালে পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘ আয়োজিত মানা-কামেট যুগল শৃঙ্গ অভিযাত্রী দলের সদস্য হিসেবে এক ভয়ংকর বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে প্রাণেশ চক্রবর্তী ২৩,৮৬০ ফুট উঁচু মানা পর্বতের শীর্ষে আরোহণ করে এই যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। বাঙালী পর্বতারোহীদের মধ্যে উচ্চতম চূড়ায় আরোহণের রেকর্ডটি আজ পর্যন্ত তাঁরই দখলে। সেই দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী মানসী মানা।

কিন্তু প্রাণেশ চক্রবর্তী শুধু যে সাফল্যের যোগ্যতাতেই একমাত্র অধিকারী তাই নয়, মানসী মানা পড়ে স্বীকার করতে দ্বিধা থাকে না যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভয়ংকর দিনলিপিকে সাহিত্যের স্বাদে উত্তীর্ণ করার বিরল দক্ষতাও তাঁর রয়েছে। অভিযানের শুরু থেকে বিপদসংকুল শেষের সেদিন পর্যন্ত একটানা বর্ণনার সর্বত্র কৌতূহল, রোমাঞ্চ কৌতুক, আবেগ ও প্রত্যাশাকে জীইয়ে রাখতে পেরেছেন তিনি। ফলে দুর্লভ অ্যাডভেঞ্চার ও দুঃসাহসী ভ্রমণকাহিনীর দুর্লভ সংমিশ্রণ ঘটেছে তাঁর রচনায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আরকে সিঞ্চিত বলেই প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতিটি বর্ণনা। পর্বতারোহণকেন্দ্রিক অ্যাডভেঞ্চারের বই বাংলায় এখনো বেশী লেখা হয় নি, মানসী মানা নিঃসন্দেহে একটি সুযোগ্য সংযোজন হয়ে থাকবে।

*

কালীপদ কোঙার সম্পাদিত **কয়েকটি কণ্ঠস্বর** (পরিবেশক : দীপায়ন বুক ডিপো, তিন টাকা) কয়েকজন কবির কবিতার সংকলন। সম্পাদকের ভাষায়, "জন্ম ও কর্মসূত্রে মেদিনীপুর জেলার আছেন, হাতের হাছে লভ্য এমন কিছু কবির কবিতা সাজানো এই গ্রন্থ।" সেই সঙ্গে বিনীত সংযোজন : "এই সংকলন মেদিনীপুর জেলা বা রেলশহর খড়্গপুর—কোনো জায়গারই প্রতিনিধিত্ব করে না।" যত দূর মনে হয়, খড়্গপুরের প্রতীক সাহিত্য চক্রগোষ্ঠীর সদস্যদের লেখা নিয়েই মুখ্যত এই সংকলনটি গ্রথিত। কেননা, গ্রন্থটি ওই গোষ্ঠীর তরফ থেকেই প্রকাশিত হয়েছে।

সংকলনে পনেরজনের কবিতা রয়েছে। এর মধ্যে একজনের জন্মসাল দেখছি ১৯৬৫। অর্থাৎ মাত্রই আট-ন বছর বয়েস এখন। সে তুলনায় মিহির দত্ত নিশ্চিত অনেক পরিণত। অন্যান্যরা বেশীর ভাগই উৎসাহী। ব্যতিক্রম অমর ষড়ংগী ও কালীপদ কোঙার। এঁদের দুজনের লেখা পড়লেই একমাত্র মনে হয় আধুনিক কবিতার সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। কালীপদ কোঙারের 'শব্দের রূপসী পরী' এবং অমর ষড়ংগীর প্রথম তিনটি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

*

প্রধানত শিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের নিজস্ব সংস্থান গড়ে তুলতে সাহায্য করবে সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের **শিল্পের সন্ধানে** (রকমারি বুক হাউস, চোদ্দ টাকা) বইটি। প্রয়োজনের তুলনায় নতুন চাকরির সুযোগ যেখানে ক্রমশ ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে আসছে, সে ক্ষেত্রে সুভাষবাবুর এই বইটির গুরুত্ব বিশেষ ব্যাপক বলাই বাহুল্য। অল্প মূলধন নিয়ে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার মতো শতাধিক রাস্তা দেখিয়েছেন শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর এই মূল্যবান গ্রন্থে। স্নো, ক্রীম, পাউডার, সিঁদুর, আলতা, কেশতেল, স্যাম্পু, জর্দা, কিমাম, গোলাপজল নস্যি, চুরুট, রবার-স্ট্যাম্প, গাম, মোমবাতি ফিনাইল, আইস-ক্রীম, মাজন সিরাপ, লজেন্স, চকোলেট, জ্যাম, জেলী ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু তৈরি করার সরল ফর্মুলা বাতলেছেন তিনি। ইচ্ছে করলেই যে-কোনো ব্যবসা ঘরে বসে শুরু করা যায়।

শিল্প বিষয়ে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এর আগেও কয়েকটি বই লিখেছেন। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার অভাব নেই। লেখাও বেশ সহজ, প্রাঞ্জল। সামান্য মুদ্রণ-প্রমাদের কথা বাদ দিলে বইটির অকুণ্ঠ প্রশংসা প্রাপ্য।

সৈয়দ মুজতবা আলী

ও

রঞ্জন-এর

কোয়ালিশন গ্রন্থ

দ্বন্দ্ব মধুর ৬·০০

ডাঃ আলী এবং রঞ্জনের চরিত্র যে অসেতুসাধ্য, তাঁদের গল্পের চরিত্রও যে তাই, তা এই কোয়ালিশন গ্রন্থে আর একবার প্রমাণ হয়েছে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর অন্যান্য গ্রন্থ

মুসাফির ৯, কত না অশ্রুজল ১০, হিটলার ৭,
শবনম ৮, ধূপছায়া ৬, অবিশ্বাস্য ৫,

রঞ্জনের একটি উপন্যাস

শীতে উপেক্ষিতা ৬,

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা-৯

(সি ১১৪০৯/২)

ফ্লাইং ফিন পাভো নুর্মি

বিশ ও ত্রিশ-এর দশকের বিস্ময়কর দৌড়বীর পাভো নুর্মির মৃত্যু অ্যাথলেটিক জগৎ থেকে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অপসারণ বলা যেতে পারে।

নুর্মি অবশ্য অ্যাথলেটিকস থেকে বিদায় নিয়েছিলেন অনেক কাল আগে, অ্যামেচার স্টেটাস নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় ১৯৩২এ লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকের আগে। যদিও তার পরে কিছু কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয় করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁর সৃষ্ট ২৩টি বিশ্ব রেকর্ডের সব কটি রেকর্ডও ম্লান হয়ে গেছে অনেক দিন। তবু, অ্যাথলেটিদের কাছে তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস, আরাধ্য দেবতার মত। মৃত্যুসময়ে নুর্মির বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। সম্প্রতি কয়েকবার তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। হেলসিঙ্কিতে নিজের বাড়িতে মারা যান অক্টোবরের দুই তারিখে।

অ্যাথলেটিক জগতের কিছু কিছু নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ক্রীড়ামোদীর মনে স্বাভাবিকভাবেই একটা সম্ভ্রমমিশ্রিত স্মৃতি জেগে ওঠে। এবং অসাধারণ কৃতিত্বের নজিরে তাদের আসল নামের বদলে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে জনগণের দেওয়া তাদের রূপক নামটি। যেমন 'ফ্লাইং ফিন', 'ব্ল্যাক প্যান্থার', 'হিউম্যান লোকোমোটিভ', 'ফ্লাইং শিখ' ইত্যাদি।

ফিনল্যাণ্ডের পাভো নুর্মিই যে ফ্লাইং ফিন এ কথা যেমন কাউকে বলে বোঝাবার প্রয়োজন হত না, তেমন বলবার দরকার করে না ব্ল্যাক প্যান্থার, হিউম্যান লোকোমোটিভ, ফ্লাইং শিখ যথাক্রমে জেসি ওয়েন্স, এমিল জ্যাটোপেক এবং মিলখা সিংয়ের রূপক নাম। এবং পরে নেওয়া যেতে পারে, যদিও আমাদের মিলখা সিং অলিম্পিক পদক পায়নি তবু ভারতে এবং আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্যই ফ্লাইং ফিন-এর অনুকরণে ফ্লাইং শিখ হিসাবে তার পরিচিতি।

'ফ্লাই' শব্দটি দ্রুত গতির ইঙ্গিতবহ। স্বল্প পাল্লা বা মাঝারি পাল্লার দৌড় অসাধারণ গতির গৌরব দিতে ফ্লাই কথাটি চমৎকার মানিয়ে যায়। দূর পাল্লার গতি স্বভাবত ধীর। দূর পাল্লার দৌড় অসাধারণ কৃতিত্বের ক্ষেত্রে এমিল জ্যাটোপেকের হিউম্যান লোকোমোটিভ আখ্যা অর্থাৎ মানব ইঞ্জিন হিসাবে নামকরণ অনেক অর্থবহ। 'ফ্লাইং ফিন' হিসাবে নুর্মির পরিচয় বরং কিছুটা বে-মানান বলে মনে হয়।

কিন্তু দূরপাল্লার দৌড়েও নুর্মি উড়ন্ত ফিন হিসাবে পরিচিত কেন? না, নুর্মির দৌড়ের মধ্যেও ছিল উড়ে যাবার ছন্দ। বিশেষ করে সমাপ্তির মুখে। দীর্ঘ সময়ের কষ্টসাধ্য দৌড়ের শেষ পর্যায় তিনি যেন পাখির মত উড়ে গিয়ে ফিতে ছিঁড়তেন।

নীল আকাশের বুকে ডানা মেলে দীর্ঘ সময় ধরে পাখি যেমন বিচরণ করে বেড়ায়, তেমন সবুজ ঘাসের উপর দীর্ঘ সময় ধরে নুর্মি দৌড়ে চলতেন সহজ ছন্দে। চোখে মুখে তেমন ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠত না। ভূরি ভূরি রেকর্ড আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন জয়ের অলৌকিক কৃতিত্বে লোক-কাহিনীর নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। শুধু ২৩টি বিশ্ব রেকর্ডই নয়, বিভিন্ন সময়ে

পাভো নুর্মি

অনিয়মিত ইভেন্টে আরও বহু বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন, যেগুলি বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। ফিনল্যাণ্ডের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ২২ বার। অ্যান্টোয়ার্প, প্যারী ও আমস্টার্ডাম—তিনটি অলিম্পিক স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন দুটি টিম ইভেন্ট সহ নয়টি, রৌপ্যপদক তিনটি। লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক থেকেও সোনা তুলতে পারতেন যদি পেশাদারের অপবাদে অলিম্পিক অঙ্গন থেকে দূরে সরে না থাকতেন। ওই বছরও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দূর পাল্লার সেরা দৌড়বীর। মোটের উপর ১৯২০ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত পাভো জোহানেস নুর্মি ছিলেন অ্যাথলেটিক জগতের বিস্ময়-মানব।

ফিনল্যাণ্ড পৃথিবীর ছোট একটি দেশ। জনসংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ লাখের মত। কিন্তু অ্যাথলেটিকসে, বিশেষ করে দূর পাল্লার দৌড়ে ফিনদের ভূমিকা অনেক বড়। এই সেদিনও মিউনিখ অলিম্পিকে ১৫০০ মিটার দৌড়ের সোনা জিতেছে ফিনল্যাণ্ডের পেক্কা ভেসালা। পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার দৌড় দুটি সোনা পেয়েছে ওই দেশেরই লাসে ভিরেন। তার আগে শুধু দূর পাল্লার দৌড়বীয়রাই অলিম্পিক থেকে ফিনল্যাণ্ডে নিয়ে গেছে কম করে ৩৭টি সোনার পদক। নুর্মি ছাড়াও অনেক নাম। কোলেমেনেন, রিটোলা, আয়রিকালিস, স্যালমিনেন, হিনো প্রভৃতির অনেক কীর্তি আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসে। কিন্তু 'ফ্লাইং ফিন'-এর আখ্যা আর কেউই পায়নি নুর্মি ছাড়া।

বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে দীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিক সাফল্য, বেশী পদক জয়, বেশী রেকর্ড সৃষ্টি, দৌড়ের স্টাইল প্রভৃতি নানা কারণে নুর্মি অবশ্যই কিংবদন্তীর নায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু পাঁচ ফুট সওয়া আট ইঞ্চি মাথায় উঁচু, ৬৫ কিলোগ্রাম ওজনের মানুষটির আরও কিছু বিশেষত্ব ছিল। কিছু গোপন রহস্যও। দূর পাল্লার দৌড়ীয়া হলেও তাঁর পাল্লার কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। দেড় হাজার মিটার থেকে শুরু করে দশ হাজার মিটার পর্যন্ত এবং এক মাইল থেকে ছয় মাইল পর্যন্ত সব দূরত্বের দৌড়েই তিনি ছিলেন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী।

আবার রহস্যের আবরণেই ঢেকে রাখতেন তাঁর অনুশীলন পদ্ধতি। কেউ জানত না নুর্মি কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছেন। ফিনল্যাণ্ডের অ্যাথলেটিক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত অধ্যাপক লাউরি পিকালা নুর্মি সম্বন্ধে গভীরভাবে গবেষণা করেও তাঁর সঠিক ট্রেনিং পদ্ধতির হদিস পাননি। অর্ধ-অনুমানের উপর নির্ভর করে লিখেছেন: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেলব রাখার জন্য অল্পস্বল্প ব্যায়াম, শক্তি ও সহনশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্য স্বল্প পাল্লায় তাঁর গতির দৌড় এবং মাইল দৌড়ের তৃতীয় ল্যাপে উড়ে যাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা—এসবই ছিল নুর্মির অনুশীলন সূচীর অন্তর্ভুক্ত। লোকচক্ষুর আড়ালে একা একা অনুশীলন করতেন।

তবে শোনা যায় রাত্রিকালে হাতে ঘড়ি নিয়ে তিনি চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা টেনেছেন। কখনো ট্রেন অনুসরণ করে তার পিছু পিছু স্লিপারের উপর পা ফেলে ফেলে ছুটেছেন স্ট্রাইড বাড়াবার জন্য। প্রতিযোগিতার সময়ও নুর্মি হাতে স্টপ ওয়াচ রাখতেন এবং সময়ের সঙ্গে তাল রেখে দৌড়তেন। শেষ ল্যাপের ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্টপ ওয়াচটি ট্র্যাকের পাশে

আস্তে ফেলে দিয়ে উড়তে আরম্ভ করতেন। সবার আগে ফিতে ছিঁড়ে আবার আস্তে ঘড়িটি কুড়িয়ে নিয়ে ট্র্যাক স্যুট পরে হাসতে হাসতে বিদায় নিতেন।

অফুরন্ত দমের অধিকারী ছিলেন। না হলে ১৯২৪ সালে প্যারী অলিম্পিকে একই দিনে মাত্র এক ঘণ্টার ব্যবধানে ১৫০০ মিটার ও পাঁচ হাজার মিটারের ফাইনাল জিতে দুটি স্বর্ণপদক লাভ করা কি কারো পক্ষে সম্ভব? অলিম্পিকের ইতিহাসে একই দিনে এক ঘণ্টার ব্যবধানে এভাবে দুটি কষ্টসাধ্য রেস জয়ের দ্বিতীয় নজির নেই।

"দি কিং অব ডিসট্যান্স" পুস্তকের লেখক পিটার লোভেসি ওই ঘটনাকে অলিম্পিক ইতিহাসের গ্রেটেস্ট অ্যাচিভমেন্ট—বড় একক কৃতিত্ব বলে অভিহিত করেছেন। এমনভাবে ওই দৌড়ের বিবরণ দিয়েছেন যে, পড়তে পড়তে মনে হয় চোখের সামনে নুর্মিকে দৌড়তে দেখছি।

পাভো নুর্মির মানসিক দৃঢ়তা এবং সংকল্পও ছিল অটুট। প্যারী অলিম্পিকের অনুষ্ঠানসূচী যখন ঘোষণা করা হল, যখন জানা গেল ১৯২৪-এর ১০ জুলাইয়ের অপরাহ্ণে এক ঘণ্টার ব্যবধানে ১৫০০ ও ৫০০০ মিটার দৌড়ের ফাইনাল হবে তখন দশ হাজার মিটারে স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব রিটোলার উপর ছেড়ে দিয়ে নুর্মি ঠিক করলেন ওই দুটি ইভেন্টে তিনি দৌড়বেন। সেই অনুসারে ফিনল্যান্ডের অলিম্পিক ট্রায়ালেও এক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি ফাইনাল হল ১৯ জুন তারিখে। নুর্মি দুটি রেসেই প্রথম হলেন বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে। প্যারীর কলম্বাস স্টেডিয়ামে ১০ জুলাইয়ের অপরাহ্ণেও দুটি রেসে স্বর্ণপদক জিতলেন। নিজের বিশ্ব রেকর্ড অবশ্য ম্লান করতে পারলেন না। কিন্তু ১৫০০ মিটারের প্রথম ল্যাপের ৫০০ মিটারে যে সময় করলেন (১ মিনিট ১৩ সেকেন্ড) ১৯৬৭-তে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টির সময় হার্ব ইলিয়টের (১ মিনিট ১৩·১ সেকেন্ড) এবং ১৯৬৭-তে বিশ্ব রেকর্ড ভাঙ্গার সময় জিম রুয়ানের (১ মিনিট ১৪·৫ সেকেন্ড) সময়ের চেয়েও তা উন্নত ছিল। ওইদিন পাঁচ হাজার মিটারের দ্বিতীয় ল্যাপে অর্থাৎ ১০০০ মিটারে নুর্মির সময় হয়েছিল ২ মিনিট ৪৬·৪ সেকেন্ড। ৪০ বছর পরে ১৯৬৪-র টোকিও অলিম্পিকের স্বর্ণজয়ীর দ্বিতীয় ল্যাপে সময় লেগেছিল ২ মিনিট ৫০·২ সেকেন্ড। নুর্মির সময় শরীর বিজ্ঞান বা স্পোর্টস মেডিসিন সম্পর্কে এখনকার মত গবেষণা হয়নি। তবু তখন দৌড়ে তিনি কতখানি শক্তির অধিকারী ছিলেন ওই দুটি রেস থেকে তার প্রমাণ মেলে।

এত বড় অ্যাথলীট কিন্তু বড় নিঃসঙ্গ ছিল তাঁর জীবন। শৈশবে পিতৃহারা। বিয়ের পর এক বছরের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। শয়নে স্বপনে জাগরণে দৌড় ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। দৌড়ের দৌলতেই ফিনল্যান্ডে পেয়েছেন রাজার সম্মান সারা বিশ্বের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। ১৯৫২ সালে ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে যখন বিশ্ব অলিম্পিকের আসর বসে তখন স্মৃতির রাজা পাভো নুর্মির উপরই পড়ে অলিম্পিক স্টেডিয়ামের দীপাধারে পূতাগ্নি প্রজ্বলিত করার সম্মান।

—মুকুল

সাঁতারু পটীয়সী স্মিতা দেশাইয়ের বাটারফ্লাই স্ট্রোকের ভঙ্গী। জাতীয় সাঁতারে স্মিতা এবার পাঁচটি সোনা পেয়েছে

আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে ভারতে সাঁতারের মান খুবই নীচু। তবু মাঝে মাঝে রেকর্ড সৃষ্টির কথা শুনতে কানে মন্দ লাগে না। মহাপূজার মধ্যে বেলেঘাটার সুভাষ সরোবরে ইউনিভার্সিটি সুইমিং পুলে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারে দশটি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠার খবরও কানে ভাল লেগেছিল। কিন্তু জয়পুরে সমস্ত জাতীয় সাঁতারে আমাদের সাঁতারুদের ভূমিকা কি? না চারদিনের অনুষ্ঠানে মাত্র চারটি রেকর্ড। তাও তিনটি রেকর্ড হয়েছে ইভেন্টের হিটে। ফাইনালে হয়েছে মাত্র একটি রেকর্ড। হিটে রেকর্ড সৃষ্টিকারী সাঁতারুরা ফাইনালে সময় মোটেই ভাল করতে পারেন নি।

অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে একাধিক বিষয় সাফল্যের নজিরে কয়েকজন সাঁতারু কৃতিত্ব দেখিয়েছে। যেমন মহারাষ্ট্রের মেয়ে স্মিতা দেশাই, মহারাষ্ট্রের ছেলে ইয়াং চিন সিন, সার্ভিসেসের সাঁতারু এম এস রানা, জি এন নায়ার ও চাঁদ গেড়া, বাংলার বালক সাঁতারু অনিমেষ দাস প্রভৃতি।

গত বছর মাদ্রাজের জাতীয় সাঁতারে ছয়টি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকারিণী স্মিতা দেশাই এবারও পেয়েছে পাঁচটি সোনা একশো, দুশো চারশো মিটার ফ্রি স্টাইল, দুশো মিটার ব্যক্তিগত মেডলি ও একশো মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে।

সার্ভিসেস দলের সাঁতারু এম এস রানা ২০০ মিটার রিলের হিট রেকর্ড করার কৃতিত্ব সহ ওই বিষয়ের ফাইনালে এবং ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের ফাইনালে প্রথম হয়েছে। একশো মিটার ফ্রি স্টাইলের

হিটে রেকর্ড সহ ফাইনালে ও ৪০০ মিটার ব্যাক্তিগত মেডলির ফাইনালে বিজয়ী হয়েছে জি এস নায়ার। দুটি ব্যাক স্ট্রোকের সোনা পেয়েছে সামরিক বিভাগেরই চাঁদ গেড়া। মহারাষ্ট্রের ইয়াং চিন সিন সোনা পেয়েছে দুটি বাটারফ্লাই স্ট্রোকে।

বাংলার সাঁতারুদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী কৃতিত্ব বালক সাঁতারু আশিস দাসের। জুনিয়রদের একশো মিটার ব্যাক স্ট্রোকের ফাইনালে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও আশিস সোনা পেয়েছে একশো মিটার ফ্রি স্টাইল ও দুশো মিটার ব্যাক্তিগত মেডলিতে। বালক বিভাগে বিজয়ী বাংলার দুটি রিলে দলেও আশিস ছিল অন্যতম সাঁতারু।

চারটি নতুন রেকর্ডের সময়ের কথা বলতে হলেও প্রথমে আশিসের কথা বলতে হয়: আশিসই একমাত্র সাঁতারু যার রেকর্ড সময় ভাল হয়েছে। জুনিয়র ইভেন্টের সময় প্রায় পৌঁছে দিয়েছে সিনিয়রের সময়ে। একশো মিটার ব্যাক স্ট্রোকে আশিসের রেকর্ড সময় ১ মিনিট ১০·৮ সেকেন্ড আর ওই বিষয়ের সিনিয়রে চাঁদ গেড়া প্রথম হয়েছে ১ মিনিট ১০·২ সেকেন্ডে। অবশ্য ১৯৭১-এ চাঁদের সৃষ্ট সিনিয়র রেকর্ড (১ মিনিট ০৯·৮ সেকেন্ড) এখনো অম্লান। সুতরাং মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য আশিস সিনিয়র রেকর্ড স্পর্শ করতে পারে নি।

সিনিয়রে একশো মিটার ফ্রি স্টাইলে জাতীয় রেকর্ডের অধিকারী ছিল বসাকা সিং (৫৯·৭ সেকেন্ড)। গত সেপ্টেম্বরে কলকাতায় আন্তঃসার্ভিসেস সাঁতারে জি এস নায়ার বসাকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫৯·৬ সেকেন্ড সময়ে বসাকার রেকর্ড ম্লান করলেও সে সময় জাতীয় রেকর্ডের স্বীকৃতি পায় নি। কিন্তু জয়পুরে আবার বসাকাকে হারিয়ে নায়ার নতুন জাতীয় রেকর্ড করেছে ৫৯·৫ সেকেন্ড সময়ে। দুশো মিটার ফ্রি স্টাইলের হিটে এম এস রানা নিজের জাতীয় রেকর্ড থেকে ১·১ সেকেন্ড সময় কমিয়ে নতুন রেকর্ডের (২ মিঃ ১২ সেঃ) অধিকারী হলেও ফাইনালে তার সময় বেড়ে গেছে ২·৬ সেকেন্ড। ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলের হিটে সার্ভিসেসের সাঁতারুরা নতুন রেকর্ড করেছে ৪ মিনিট ৫·২ সেকেন্ড সময়ে। আগে ওদেরই রেকর্ড ছিল ৪ মিনিট ৭·৫ সেকেন্ড।

প্রধানত স্মিতা দেশাইয়ের কৃতিত্বে

জাতীয় সাঁতারের শত মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন রেকর্ডের অধিকারী জি এস নায়ার

যেমন মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্রের চ্যাম্পিয়ন-শিপ, পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেসের চ্যাম্পিয়নশিপ রানা, নায়ার ও চাঁদ গেড়ার কৃতিত্বে, তেমন আশিস দাসের জন্য বালক বিভাগে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব।

বাংলার মেয়েদের মধ্যে নাফিসা আলী দুশো মিটার ব্যাক স্ট্রোকে সোনা, একশো মিটার ফ্রি স্টাইলে রুপো এবং একশো মিটার বাটারফ্লাইতে ব্রোঞ্জ পেলেও তার সম্পর্কে আরও প্রত্যাশা ছিল। বালিকা বিভাগে একশো মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে বাংলার মেয়ে শ্রীপর্ণা ব্যানার্জির সোনা লাভ উল্লেখের দাবি রাখে।

ওয়াটারপোলো খেলায় মহারাষ্ট্রের কাছে বাংলার ৪—৭ গোলে পরাজয় রীতিমত অপ্রত্যাশিত ফল।

স্টেট ব্যাঙ্কের আবার মইন-উ-দ্দৌলা কাপ

বেশীর ভাগ টেস্ট খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া স্টেট ব্যাঙ্ক আবার মইন-উ-দ্দৌলা গোল্ড কাপ ক্রিকেটে বিজয়ী হয়ে উপর্যুপরি তিন বছর জয়ের সুবাদে চিরতরে পেয়েছে গোল্ড কাপের একটি প্রতীক কাপ।

স্টেট ব্যাংকের ফাইনালের প্রতিদ্বন্দ্বী ইউ ফোম দলেও টেস্ট খেলোয়াড়ের ঘাটতি ছিল না। বিজয়ী দলের বড় রানের বিরুদ্ধে তারা ব্যাটের দাপটও কম দেখায় নি, কিন্তু শেষ-রক্ষা করতে পারে নি। ফাইনাল খেলার মাঝেই কাগজে ইউ ফোমের একটি বিজ্ঞাপন দেখছিলাম। তাতে লেখা ছিল: "ঝুলে পড়া নেতানো ফোমে কোন কাজই হয় না। ঝুলে পড়ার কারণ সেটি সঠিক ফোম নয়।" ফোমের ক্রিকেটাররা স্টেট ব্যাঙ্কের ৪৪২ রানের উত্তরে ভাল সূচনা করেও সঠিকভাবে ব্যাট করতে পারে নি, ইনিংসের মাঝখানে নেতিয়ে ঝুলে পড়েছে। পরাজয়ের সেটাই মুখ্য কারণ।

শুধু স্টেট ব্যাঙ্ক এবং ইউ ফোমেই টেস্ট খেলোয়াড়ের আধিক্য ছিল না। বস্তুত সারা ভারতের ক্রিকেট তারকারা হায়দরাবাদের লাল বাহাদুর স্টেডিয়ামে সমবেত হয়েছিল মইন-উ-দ্দৌলার খেলার জন্য। এত নামী খেলোয়াড় জড় হয়েছিল যে, ওদের মধ্য থেকে এক নম্বর ও দুই নম্বর দুটি টেস্ট দল গড়া যেতে পারত। কিন্তু বৃষ্টি এ বছরের খেলার আমেজটাই জোলো করে দিয়েছে। অনেক খেলোয়াড় আদৌ খেলার সুযোগ পায় নি।

বৃহন মহারাষ্ট্র সুগার সিণ্ডিকেট ও মফৎলাল দলের প্রথম রাউণ্ডের খেলা একেবারেই হয় নি তিন দিন ধরে বৃষ্টির ফলে। টসে জয়ী হয়ে সুগার সিণ্ডিকেট দল সেমিফাইনালে যায়। হায়দরাবাদ এবং উত্তর সুলতান দলের প্রথম রাউণ্ডের তিন দিনের খেলা হয় মাত্র দেড় দিন বৃষ্টির জন্য। প্রথম ইনিংসের ফলে জয়ী হয় হায়দরাবাদ। বৃষ্টি বিঘ্নিত সেমিফাইনালে গতবারের রানার্স ইউ ফোমও সুগার সিণ্ডিকেটকে হারায় প্রথম ইনিংসের ফলে। একইভাবে অপর সেমিফাইনালে স্টেট ব্যাঙ্ক হারায় হায়দরাবাদকে। পুরো খেলা বলতে শুধু স্টেট ব্যাঙ্ক ও ইউ ফোমের ফাইনাল খেলাটি। চার দিনব্যাপী ফাইনালেও অবশ্য স্টেট ব্যাঙ্ক জিতেছে প্রথম ইনিংসের ফলে। এ খেলায় স্টেট ব্যাংক অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকর (১৭৬) এবং অম্বর রায়ের (১২৪) সেঞ্চুরি যেমন উল্লেখের দাবি রাখে, তেমন ইউ ফোমের সুনীল গাভাসকরের ৯৩ এবং অধিনায়ক জয়সীমার ৭২ রানও উজ্জ্বল ব্যাটিংয়ের নিদর্শন।

ফাইনালে স্টেট ব্যাঙ্কের ৪৪২ রানের উত্তরে ইউ ফোম একাদশের প্রথম ইনিংস চতুর্থ দিনের সকালে ৩৪৫ রানে শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে খেলার জয়-পরাজয় মীমাংসা হয়ে যায়। দিনের বাকি খেলা নিয়ম রক্ষার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় পরিণত হয়। প্রথম ইনিংসের ফলে ৯৭ রানে এগিয়ে থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক উপর্যুপরি তিন বছর অর্জন করে বিজয়ীর সম্মান।

একলব্য

"পালঙ্ক" (পরিচালনা: রঞ্জন তরফদার) ছবিতে সন্ধ্যা রায়

মতামতের মন্তাজ

ফিলম মহলে এখন গল্প নিয়ে খুব মাথা ব্যথা। বাংলা গল্পের আকাল দেখা দেয়নি নিশ্চয়ই, কখনই তা হবার নয়। তবে সিনেমার গল্পের মড়ক হয়ত একটা আছে। নতুবা ফিল্মের গল্পের জন্য এত অস্থিরতা বা দুশ্চিন্তা কেন। সৎ লেখকরা সিনেমার কথা ভেবে গল্প লেখেন না। সৎ পরিচালকরা ওই সৎ গল্প নিয়েই কিন্তু সৎ সিনেমা তৈরি করতে পারেন। তাঁদের অন্য আগ্রহ নেই। বেশির ভাগ প্রযোজক বা পরিচালক খোঁজেন নতুন প্যাঁচ—যা দিয়ে টিকিট ঘর মাৎ করা যাবে। ও'দের চলতি কথায় নতুন অ্যাঙ্গেল। তাঁরা খোঁজেন এমন গল্প যাতে প্রায় সব প্রমোদ-উপকরণই কিছু পরিমাণে থাকবে—সাজানো প্রেম, শঠতা, নাচ ও গান কোনটাই বাদ যাবে না। এমন গল্পের গল্পকারের অবশ্য অভাব নেই, নতুবা এত অবাস্তব ছবিই বা হয় কী করে। ওই সব গল্পেরই নাকি এখন অভাব। এ ধরনের কোন একটি কাহিনীর খোঁজ করতে গিয়ে প্রযোজক হয়ত জানলেন মাত্র একদিন আগে গল্পের চিত্রস্বত্ব বিক্রী হয়ে গেছে। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। শেষ পর্যন্ত ওইরকমই আর একটি মামুলি গল্প হয়ত তিনি খুঁজে নিলেন। আসলে এহেন সিনেমার গল্পেরই অভাব, বাংলা সাহিত্যে সুন্দর গল্পের অভাব নেই। আধুনিক সাহিত্যেও নয়।

• • •

বকস-অফিসের শর্ত দুর্জ্ঞেয়। তার আনুকূল্য পাওয়া বড় কঠিন। যাঁরা এতদিন ভেবেছেন যে বড় স্টার থাকলেই ছবি চলে তাঁরাও ইদানীং নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছেন। বড় স্টারের উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে রসোত্তীর্ণ গল্প ও সুষ্ঠু প্রয়োগের কাজও দরকার। আজকের দিনে কেবল স্টার-ভ্যালু দিয়ে দর্শকদের আকর্ষণ করা যায় না। এই সত্যটা আজ তাঁরা বিশেষভাবে বুঝতে পারছেন। তা ছাড়া ফরমুলা-সর্বস্ব গল্পও যে পরিত্যজ্য এই অভিজ্ঞতাও প্রযোজক ও পরিচালকরা ক্রমে লাভ করছেন। ভাল গল্পের ছবি এখনও হয়। ক্লাসিক গল্প বা উপন্যাসের চিত্ররূপও তৈরি হচ্ছে। এখানেও অবশ্য আর এক ফ্যাসাদ। অক্ষম পরিচালকের হাতে ওই সব ছবি দেখাও কখনও-সখনও কষ্টকর হয়ে ওঠে। সার্থক কাহিনীর অপমৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে হয়। একদিকে গতানুগতিকতার প্রতি আস্থা অপর দিকে অক্ষমতা—এই দুয়ের চাপে বাংলা ছবির সংকটও বেড়ে চলেছে।

• • •

প্রাসঙ্গিক সমস্যা আরও আছে। শোনা যায়, গল্প নির্বাচনের ব্যাপারে সুপার স্টারদের হাত থাকে। কে চিত্র পরিচালনা করবেন কিংবা কে ফটোগ্রাফার হবেন সেটাও স্টারের উপর নির্ভর করে। অনেক সময় পরিচালনার কাজটিও নাকি স্টাররা পরিচালকের হাত থেকে কেড়ে নেন। স্টার-ভজনা প্রবল হলেই সেটা সম্ভব। স্টাররা অনেক সময় বুঝেও বুঝতে চান না যে সময়

আরোর তোমাদের অপেক্ষা করে না। যে স্টার-ইমেজ এককালে ফ্যানদের মাতিয়ে রেখেছে তারও একটা আয়ু-সীমা আছে। ওই সীমা অতিক্রান্ত হলে সে ইমেজ-এর কদরও কমে যায়। অতএব স্টাররা যদি ওই ইমেজ-এর স্মৃতিকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে চান তবে ভুল করবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলেরই বাস্তববোধ থাকা দরকার। দর্শকরা আজকাল ওই বাস্তবের চেহারাই দেখতে চান—কী গল্পে, কী চরিত্রচিত্রণে। বাস্তবের কাছ থেকে বিচ্ছেদ বাংলা ছবিকে এতকাল অনেকদিক থেকেই ক্ষতি করেছে। সবক্ষেত্রেই স্বাভাবিকতা ফিরে আসা দরকার। তাহলে টিকিট ঘরের আনুকূল্যও স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

"রৌদ্রছায়া"য় উত্তমকুমার ও সুলতা চৌধুরী

রৌদ্রছায়া

রৌদ্রছায়া-য় উত্তমকুমার দেখিয়ে দিলেন যে প্রয়োজন হলে তিনিও শত্রুঘন সিন্হার মতো অভিনয় করতে পারেন। এই ছবিতে তাঁর কুখ্যাত ওয়াগন ব্রেকারের ভূমিক—ডানপিটে, গুন্ডা, মারপিটে অজেয়। তাঁর পোশাকটিও হিন্দীচিত্রের ওই জাতীয় নায়কের মতো—সংলাপ আধা বাংলা আধা হিন্দী। কারণ নায়ক বঙ্গসন্তান হলেও ছোটবেলা থেকেই বাংলার বাইরে মানুষ। এহেন নায়ক রয়েছে বলে অ্যাকশন-প্রধান হিন্দীচিত্র দেখার কিছুটা সুখ রৌদ্রছায়া-তেও লভ্য। তবে বিমল করের 'পিয়ারীলাল বক্স' গল্প অ্যাকশনই বড় বা শেষ কথা নয়। বিপথগামী পিয়ারীলাল বাবা-মা'র পরিচয় জেনেও যে তাদের কাছে কিংবা সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে পারছে না সেখানেই গল্পের আসল নাট্য-আকর্ষণ। এই যন্ত্রণা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের একটি মুহূর্তে নায়ক উত্তমকুমার অবর্ণিত অশ্রুভরা চোখে স্বভাবসিদ্ধ অভিব্যক্তি ও অভিনয় দেখিয়ে দিয়েছেন।

কাহিনীর পটস্থল কারখানা-নগরটি বাংলার বাইরে। সেখানে ভাটিখানা আছে, কারখানার শ্রমিকরা (অধিকাংশই অবাঙালী) যেখানে সারাদিনের খাটুনির পরে মদ গিলতে যায়। মেয়ে-খদ্দেরও আছে। ভাটিখানায় ক্যাবারে গার্ল-এর মতো এক মেয়ে (সুলতা চৌধুরী) খদ্দের-দের মনোরঞ্জনের জন্য অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে, হিন্দীচিত্রে যেমন থাকে, আধা বাংলা আধা হিন্দী গানও গেয়েছে। ওই পরিবেশ বা ভাটিখানা কখনও অবার ইংরেজি ওয়েস-টার্ন ছবির বার-রুমের মতোই দেখানো হয়েছে। সেখানে হঠাৎ মারপিট ও সব কিছু লণ্ডভণ্ড হবার ব্যাপারও আছে।

বহিরঙ্গ যেমনই হোক, নাট্যোপকরণ-গুলি বাংলা ছবির মতোই। সেসব বিশেষ-ভাবে দেখা গেছে যখন ফেরার পিয়ারীলাল কারখানায় চাকুরি পাবার পর নতুন বন্ধু-পত্নীর পরিবারে আশ্রয় পেয়েছে। বন্ধু-দম্পতির (তরুণকুমার ও সুব্রতা চট্টো-পাধ্যায়) সঙ্গে পিয়ারীলালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে নাটকীয় আস্বাদ পাওয়া যায়। এই অংশে বন্ধুবৎসল তরুণকুমার এবং তাঁর স্ত্রী সুব্রতার সপ্রাণ অভিনয় ছবির উপভোগ্যতা বাড়িয়েছে। যমুনা ভাবী (সুব্রতা) চেয়েছিল হারু সিংয়ের মেয়ে কৌশল্যাকে (অঞ্জনা ভৌমিক) পিয়ারীলাল জীবনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করুক। সেটাও যে হবার নয় তা নিয়ে [illegible]

ভৌমিক রোমান্টিক নায়িকার মতোই চোখে-মুখে প্রেম ও মিলনের সাধ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। উত্তমকুমারকে যাই হোক তথাকথিত রোমান্টিক নায়ক হতে হয়নি। শেষ পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে পিয়ারী-লালের এনকাউন্টারের সময় ওরা দুজনেই নিহত।

বাংলা ছবিতে সাধারণত অ্যাকশনের প্রস্তুতিই থাকে, অ্যাকশন তেমন থাকে না। এ-ছবিতেও সংঘর্ষের সম্ভাবনা অনেক ছিল। কারখানা-এলাকার গুন্ডা, কৌশল্যার প্রণয়প্রার্থী কেল্টর (নির্মল ঘোষ) সঙ্গে পিয়ারীলালের শত্রুতার সূত্রপাত ওদের প্রথম সাক্ষাতেই। ওদের মধ্যে কিছুটা মারপিট হয়েছে, কিন্তু আশানুরূপ নয়। পিয়ারীলালের আগের দলের বিশ্বাসঘাতক চার্লি (মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়) আসার পরও ব্যাপার-স্যাপার খুব রোমাঞ্চকর হতে পারত। কেল্ট বা চার্লির রূপসজ্জা বা অভিনয়েও কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু সম্ভাব্য রোমাঞ্চ থেকে দর্শক বঞ্চিত হলেন। তবে পরিচালক শচীন অধিকারী এই অভাব পুষিয়ে দিয়েছেন ক্লাইম্যাক্স-এ পুলিশের সঙ্গে পিয়ারীলালের গান-ফাইট-এ। দৃশ্যটিতে প্রয়োগ-কর্ম বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। ট্রিটমেন্ট-এর কাজ আগাগোড়াই ভাল। তার মধ্যে খুবই প্রশংসনীয় কারখানা-এলাকার পরিবেশ রচনার কাজ এবং কারখানার কাজের সঙ্গে গল্পটিকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার পরি-কল্পনা। এদিক থেকে চিত্রনাট্যও (পীযূষ বসু রচিত) সুগ্রথিত। ছবির শেষ দৃশ্যে, ছেলের পরিচয় পেয়ে কারখানার বড়বাবু ও তার স্ত্রী (কমল মিত্র ও ছায়া দেবী) পিয়ারীলালের মৃতদেহের সামনে এসে উপস্থিত। ছবির এই পরিণতিতে পুনরা-[illegible]

রঙ্গশ্রীর নতুন নাটক
জীবনের স্বাদ
নাটক / নির্দেশ—রমেন লাহিড়ী
মুক্তঅঙ্গন ৩০ অক্টো ৭টায়
২ নভেম্বর ৭টা রঙমহল
(সি ১১৯৯৮)

রঙ্গনা নান্দীকার
৫৫-৬৮৪৬ প্রযোজিত
২৭শে শনিবার ৬াটায়
নটী বিনোদিনী
২৮শে রবিবার ৩ ও ৬াটায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

জমিয়ে তোলার অবকাশ ছিল। সুলতা চৌধুরী, মন্মথ মুখার্জি (হারু সিং), রসরাজ চক্রবর্তী, কমল মিত্র, ছায়া দেবী প্রমুখ শিল্পীরা চিত্রনাট্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিনয়ের দক্ষতাও দেখিয়েছেন। কিন্তু ঘটনার বিন্যাসে তেমন বিশেষ কোন নাট্য-মুহূর্ত রচিত হল না। তবু ছবিটি দেখে সময় কাটে বেশ কারণ প্রধানত আউটডোরে তোলা এই ছবির অনেক দৃশ্যই দেখতে ভাল লাগে। কৌতূহল জাগাবার মতো পরিস্থিতিরও অভাব নেই। তা-ছাড়া উপভোগ করার মতো কিছু সুন্দর সুরের (সংগীত পরিচালক সুকুমার মিত্র রচিত) গানও মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুস্মিতা সেনগুপ্তের কণ্ঠে রয়েছে। রৌদ্রের তাপ যদি কমও থাকে কারণে আবেগের ছায়ায় অনেক কিছুই দেখতে খারাপ লাগে না।

"অভিমান"/জয়া ভাদুড়ি

অভিমান

হৃষীকেশ মুখার্জির হিন্দী ছবি হিন্দী ছবির মতো নয়। তাঁর ছবি দেখে কিছুটা স্বাদ পালটানো যায়, যদিও অভিমান-এর শেষে পুরোটাই নাটকের স্বাদ। অভিমান-এ অবশ্য পরিচালক হৃষীবাবু (কাহিনীও তাঁর) নবদম্পতির পারস্পরিক সম্পর্কের এক জটিল অশান্তিই বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু তার নিষ্পত্তি ঘটিয়েছেন সহজ সরল পথে। ফিলমের অতি জনপ্রিয় প্লেব্যাক গায়ক সুবীরকুমার (অমিতাভ বচ্চন) সাধ করে যখন স্ত্রী উমাকেও (জয়া ভাদুড়ি) ফিলমে গান গাইতে উৎসাহিত করল তখন সে বুঝতে পারেনি যে অশান্তির বীজ সে নিজের হাতেই বপন করেছে। উমার বিপুল খ্যাতি ও সাফল্য সুবীর-কুমারের মনে হীনমন্যতার ভাব জাগিয়েছে, যা এ-ছবির মূল নাট্য উপাদান। বাস্তবের স্পর্শ এখানে আছে, কিন্তু উমা যেহেতু স্বামীগত প্রাণ এবং যশের মোহে কখনই কিছু ভুল করেনি তাই এই অশান্তি আশানুরূপ জটিল হল না। উমার তরফে ম্যালঅ্যাডজাস্টমেনট-এর প্রশ্নও ওঠে না।

ছবির শেষাংশ বা নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন-পর্ব অতি মাত্রায় নাটকীয়। তার জন্য একটি ফাংশানের প্রয়োজন হয়েছে—শাস্ত্রীয় সংগীত প্রতিষ্ঠান সুর-ঝংকারের জয়ন্তী অনুষ্ঠান। তাতে মামুলি ফিলমি গান চলে না, তাই সুরকার শচীন দেববর্মণ রবীন্দ্র সংগীতের আদলে একটি গানের সুর রচনা করেছেন যাতে গানটি একটু মার্জিত ধরনের হয়। গানটি শুনতে খুবই ভাল লেগেছে। ওই দ্বৈত গানের মধ্য দিয়েই নায়ক-নায়িকার দুঃখের অবসান। নায়ক প্রথমে গানটি শুরু করার পরই শোকস্তব্ধ উমার মধ্যে আবেগ জেগেছে, সে অঝোরে কেঁদেছে এবং পূর্ব স্মৃতি ফিরে পেয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর জীবনের এত বড় নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে বহু দর্শকের সামনে, মঞ্চে। হৃষীবাবু জানেন, পরিস্থিতি যত অবাস্তবই হোক দর্শককে আবেগে আমোদিত করার এটা এক মোক্ষম অস্ত্র। উপরি-পাওনা হিসাবে গান তো আছেই, অনেক চমৎকার সুরের গান, কারণ নায়ক-নায়িকা দুজনেই প্লেব্যাক শিল্পী। অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের কাহিনীর আবেগ-স্বাদ পরিচালক সারা ছবিতেই একটু একটু করে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই কারণে অভিমান বেশ উপভোগ্য। তাছাড়া জনপ্রিয় স্টারের দৈনন্দিন জীবন, তার সেক্রেটারির (অসরানি) স্বভাব ও কাজ-কর্ম, স্টুডিওতে গান-রেকর্ডিং ইত্যাদি পরিচালক সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যা ছবির বিশেষ আকর্ষণ। প্রয়োগের কাজে ছবিটি আগাগোড়া পরিচ্ছন্ন। টেকনিক্যাল কাজ, বিশেষত এডিটিং উঁচু পর্যায়ের। শিল্পীদের অভিনয়ও সাবলীল।

ছবিতে ভিন্ন পরিবেশে, গ্রামে, দেখা গেছে উমাকে—সংগীতসাধক পিতার (এ কে হাঙ্গল) সঙ্গে শিবগান গাইছে। উমার শাস্ত্রীয় সংগীতের রিয়াজ আছে বলে সে ফিলমের প্লেব্যাক গানে যে স্বামীকে ছাড়িয়ে যাবে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন এক ওস্তাদজী। কোন কোন দর্শকের এই আশঙ্কাও জেগে থাকতে পারে, উমা যে পরিবেশে মানুষ এবং যে সংগীত-সাধনায় দীক্ষিত তাতে শেষ পর্যন্ত ফিলমের প্লে-ব্যাক গানে তার আর উৎসাহ থাকবে না। বিশেষত এ-ব্যাপারে তার কোন উচ্চাশা বা মোহও যখন নেই। হৃষীবাবু সুবীরের গান সাময়িক বন্ধ রেখেছেন, কিন্তু উমার তথা লতা মঙ্গেশকরের গান নয়।

রিকশাওয়ালা

বড় বড় আদর্শবাদের কথা এবং উচ্চমার্গের ভাবনা-চিন্তা এক ধরনের হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে নিদারুণ পরিহাস বলেই মনে হয়। সত্য মুভীজ-এর রিকশাওয়ালা ছবির শিক্ষিত নায়ক গোপী (রণধীর কাপুর) যে রিকশা চালিয়েছে তা দারিদ্র্যের কারণে নয়, কায়িক শ্রমকে মর্যাদা দেবার জন্যে। আসলে নায়ককে পরিচালক কে শংকর শেষ পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছেন ছবির খল-নায়ক মদনকে (আনোয়ার হোসেন) শায়েস্তা করার জন্য। গল্প ঘুরে ফিরে দৌড়িয়েছে সেই সনাতন আবেগ, খুন জখম নাচ-গান আর হৈ-হুল্লোড়ের রাজ্যে। শহরের দুঁদে উকিল কৈলাসের (প্রাণ) কন্যা কিরণ (নিতু সিং) মানুষ হয়েছে যার কাছে সেই পার্বতী (মালা সিন্‌হা) রিকশা স্ট্যান্ডে খাবার বিক্রি করে সংসার চালান। কিরণের মা মরবার আগে তাঁর শিশুকন্যাকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য কিরণকে তুলে দিয়েছিলেন পার্বতীর হাতে। বলা বাহুল্য কিরণের সঙ্গে গোপীর প্রেমের সেই চিরন্তন মামুলী দৃশ্যগুলি এ ছবিতেও দেখা গেছে। কিরণ শেষ পর্যন্ত খলনায়কের হাতে ধরা পড়েছে এবং তাকে উদ্ধার করার কাজে গোপীর কৃতিত্বই সর্বাধিক। কিরণ যে কৈলাসের হারানো মেয়ে সেটা ফাঁস হবার পর কৈলাস উকীলও মদনকে শায়েস্তা করার কাজে মদত দিয়েছেন। এই জাতীয় হিন্দী

"রিকশাওয়ালা"/নিতু সিং

হাসি বারবার যেখানে, অন্তত ক্লান্তি বোধ করবেন না তাদের আড়ালোআবডালে সব রসদই ছড়িয়ে আছে। বাংলা সিনেমার আর নিত্য সিং-এর অভিনয়ও মন্দ নয়। সেই সঙ্গে আছে আর ডি বর্মণ-সুরারোপিত কয়েকটি গান যা শ্রুতিসুখকর।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

(স্টার)

স্টার রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের আসর ছাড়াও রবিবার ও ছুটির দিনগুলি সকালে ছোটদের জন্য নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছেন। কলকাতার উত্তরাঞ্চলে এই জাতীয় একটি আয়োজনের অভাব ছিল। সেটা পূর্ণ হল। কেবল অভিনয় দেখার ব্যবস্থাই নয়, ছোটদের মধ্যে যারা দর্শক হিসেবে আসবে তারা নাট্যাভিনয়ের আগে গান, ছড়া, আবৃত্তি ইত্যাদির এক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে হাতে হাতে পুরস্কারও পেতে পারবে। ছোটদের জন্য এই আনন্দের আয়োজন করে স্টার রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ একটি প্রশংসনীয় কাজ করলেন বলা যেতে পারে।

ছোটদের জন্য এঁদের নাটক "লক্ষ্মণের শক্তিশেল"। ছোটদের (এবং বড়দেরও) হাসানোর রাজা সুকুমার রায়ের এ নাটক অনেকেরই পড়া। কিন্তু পড়ার মজা আর চোখে দেখার মজায় তফাৎ অনেক। নাটকের মজার উপকরণগুলি শিশু শিল্পীরা অভিনয়, গান আর নাচের মধ্যে দিয়ে জমিয়ে দিয়েছেন যেমন, দর্শকদের মজিয়েও দিয়েছেন তেমনি। প্রয়োগের কাজে আধুনিকতার ছাপ আছে কিন্তু তা কোথাও নাটকের মজা ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। নির্দেশক জয় সেনগুপ্ত নাটকের সেই দিকটির কথা সর্বক্ষণই মাথার মধ্যে রেখেছেন। রাবণ আর সুগ্রীবের যুদ্ধও যেমন মজার তেমনি মজার ব্যাপার হল অত যে রাবণের বীরদর্প সব চুরমার হয়ে গেল বানরদের কাতুকুতুর জোয়ারে। সুগ্রীব অবশ্য যুদ্ধও করেছে আবার নিয়মিত রামকে খৈনী সরবরাহও করেছে। জাম্বুমানের একটি হাঁচিতে স্বয়ং রামচন্দ্র পর্যন্ত ভয়ে উল্টে পড়েছেন এটা দেখার মধ্যে মজা অনেক। নাটকে অনেক গান, তার সবগুলিই যে সংগীত এমন কথা বলা যাবে না, তবে সুগ্রীব, রাবণ এবং যমদূতদের গাওয়া গানগুলি বেশ উপভোগ্য। পশ্চাৎপটের আলোকনিয়ন্ত্রণে রাবণের রথ, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনা ইত্যাদি দৃশ্যগুলি চমৎকার বিস্ময় দাবি করতে পারে। নিতাই ঘোষের মঞ্চ পরিকল্পনা এবং দীপক নন্দীর আলোকপরিকল্পনার কাজও প্রশংসা করার মত।

রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি যে শক্তিশেলের

"বেদনা" ছবিতে মহুয়া রায়চৌধুরী

আঘাত হেনেছে তা বিভীষণের গদা। যমও খালি হাতে আসেনি। মাস্তানের বেশে ছুরি হাতে তার আবির্ভাব। এসব দেখে ছোটদের সঙ্গে বড়রাও আনন্দ পেতে পারেন।

শিল্পীরা সকলেই কিশোর ও শিশু। মোটামুটি সাবলীল অভিনয় সকলেই করেছে। ওদের মধ্যে দীপংকর দে (রাবণ), শ্রীমান প্রণব (সুগ্রীব) ও তাপস মুখার্জীর (জাম্বুবান) কৃতিত্ব একটু বেশি। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছে সমিত সান্যাল, শিবকৃষ্ণ মুখার্জী, শোভন দত্ত, তপন সিংহ, পার্থনাথ রায়, কৃষ্ণেন্দু মুখার্জী, দেবব্রত গাঙ্গুলী, সুব্রত গাঙ্গুলী, দিব্যেন্দু ঘোষ, সুব্রত ঘোষ, সুশান্ত চৌধুরী, দেবাশীষ সাধুখাঁ, সৌমেন্দ্র ঘোষ, শিশির সাহা, তপু সরকার, শৈবাল দাস, তারক মুখার্জী, তাপস সিংহ প্রভৃতি।

বোম্বাই বিচিত্রা

"ছেলের ছেলে নাও থাকতে পারে, কিন্তু সব ছেলেরই বাপ থাকে, আর শুধু তাই নয় সব বাপেরও বাপ থাকে।" বলে নিজেই হো হো করে হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক। আমরা যারা 'প্রসঙ্গটা' জানতাম তারা একটু হাসলাম, বাকির 'কথার' গভীরে ডুব দেবার চেষ্টা করল। এক বিচিত্র সমাবেশে হঠাৎ বিভিন্ন লাইনের লোক একত্র হয়ে খাওয়ার কখন যে কী কথা হচ্ছিল তার কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। দুজন ফিল্মের লোক, জনা তিনেক বিমানচালক কয়েকজন বড় চাকুরে, কয়েকজন ব্যবসাদার, একজন পেশাদার ট্রেড ইউনিয়ানিস্ট, একজন সাংবাদিক, আর দুজন অতি আপ্যায়িত ব্যক্তি যাঁরা কী করেন জানতে চাইলে খুব বেশী ঔৎসুক্য প্রকাশ করা হয় তাই তাঁদের কর্মজীবন সম্পর্কে চুপচাপ থাকাই শ্রেয়!

কথায় কথায় একজন ফিল্মওয়ালা বলে ফেললেন যে, "মিথ্যে নিয়ে, ইলিউশন নিয়ে আমরা কাজ করি, আমরা রাতকে দিন করতে পারি দিনকে রাত করতে পারি আমরা অঙ্গুলি হেলনে লোককে হাসাতে পারি, কাঁদাতে পারি...।" ভদ্রলোক কথা শেষ করবার আগেই বিমানচালকরা বললেন, "আমরা যখন আকাশে উড়ি, অর্থাৎ আমাদের কাজের সময় আমরা সমস্ত যাত্রীর ভগবান—আমরা যা চাই তাই করতে পারি সুতরাং—" বিরাট এক হেঁচকি তুলে ভগবান বিমানচালক বসে পড়লেন। ব্যবসাদের ভদ্রলোক বললেন, "আপনারা সবাই খুব শক্তিশালী মানুষ, আপনারা ভীষণ বড়, আপনারা সবাই ঠিক কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না।" ব্যবসাদার ভদ্রলোকের কথায় সাংবাদিক প্রচণ্ড চটে গেলেন, বললেন, "আপনার আবার মত কি? আপনার তো সব কিছুই লাভলোকসানের নিক্তিতে মাপা। এ-জগতের আসল আয়না হলাম আমরা, আমাদের ছাড়া সংবাদ ছাড়া, একদিনও বিশ্ব চলে না।" পেশাদার ট্রেড ইউনিয়নিস্ট [illegible] ক্ষণ চুপচাপ ছিলেন এবার একটু কটাক্ষ করে বললেন "আমি কিছুই বলতে চাই না, শুধু একটা কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে এই যে, এই দুনিয়াকে যারা চালাচ্ছে, অর্থাৎ যাদের না হলে কোনো কিছুই হয় না, অর্থাৎ যাদের নাম মজুর, সেই তাদের নেতৃত্ব করে খাই, সুতরাং আমার সামনে লম্ফঝম্ফটা নাই করলেন।" ভদ্রলোক আবার পানপাত্রের দিকে মন দিলেন।

ফিল্মওয়ালা বললেন, "আপনারা সেই ছবিটা দেখেছেন সেই যে সত্যজিৎ রায়ের ছবি। "মহাপুরুষ" যে ট্রেনে যেতে যেতে সূর্য ওঠায়। আসবেন কাল আমাদের স্টুডিওয়, দেখবেন আমার ডিরেকটর অথবা ক্যামেরাম্যান হয়ত বলছে লাইটস্‌ম্যানদের—আরে সূর্যটাকে একটু সরিয়ে দে না, হ্যাঁ ঐ জানলার ওপাশে বস বস। এবার মেঘটাকে একটু পাশ ফেরা, আর একটু বাঁদিকে, আর একটু ওঠা, ঠিক

অরণ্যদেব লী ফক

কুকুর নিয়ে ট্রেনে ওঠা চলবে না।
ভয় নেই, কাউকে কামড়াবে না। তা ছাড়া এটা কুকুর নয়, এটা নেকড়ে।

শিগগিরই ডায়ানার সঙ্গে দেখা হবে। আরে...এটা কী?

শূন্যে ঝাঁপ দিচ্ছে ডায়ানা পামার
দারুণ মজা পাবে!

কেমন লাগছে?
ভারী মজা!

কোনটায় বেশী মজা পান? জলে সাঁতরাতে, না বাতাসে সাঁতরাতে?
এককালে উনি চ্যাম্পিয়ন-সাঁতারু ছিলেন
দুটোতেই সমান মজা।
2·25

অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ন-সাঁতারু ডায়ানা পামার এখন শূন্যে-ঝাঁপের খেলায় মেতেছেন। তাঁর সঙ্গী ইদানীং কাউন্ট পেপি। খেলার সঙ্গীই কি ডায়ানার জীবন-সঙ্গী হবেন?

ডায়ানার মা আর মামা ....
এইবারে ঠিক লোকের সঙ্গে ভাব হয়েছে ডায়ানার। উঃ, সেই মুখোশ পরা জংলীটার কথা ভাবতেই তো আমার বিচ্ছিরি লাগে!
কিন্তু লিলি, সেই মুখোশ পরা লোকটিকেই ভালবাসে ডায়ানা!

এ কি শুধুই খেলা? না অন্য-কিছু?
?

অরণ্যদেব

লী ফক

আমি যে যাচ্ছি, ডায়ানা তা জানে না। বাড়িতে থাকবে কিনা কে জানে! একটা টেলিগ্রাম করে দিই।
দয়া করে এই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেবেন?
দেব, কিন্তু আপনার গাড়ি যে ছেড়ে দিল!
MIDWESTERN

শিগগির উঠে পড়ুন।

কাউন্ট পেপির সঙ্গে শূন্যে ঝাঁপ দিচ্ছে ডায়ানা
মাল রেডি কালই পাঠাব।
পেপিকে জানাচ্ছি

কাল কিন্তু নিশ্চয়ই এসো, ডায়ানা।
নিশ্চয় আসব!
চমৎকার ছেলে! সেই জংলীটার মতো নয়!

ডায়ানাদের বাড়ি। একটা জানালা যেখানে সর্বক্ষণ খোলা থাকে… অরণ্যদেবের জন্য।
অনেকদিন আসেনি। এইবার নিশ্চয় ডেভিলকে নিয়ে হঠাৎ একদিন এসে পড়বে!
হুম!

পরদিন…
তুই কি কাউন্ট পেপিকে ভালবাসিস?
প্যারাসুট নিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিতে ভালবাসি। ব্যস, ওই পর্যন্ত।

ডায়ানা পামারের টেলিগ্রাম আছে…
আমি তার মা, খবরটা আমাকে দিতে পারেন।
"আজ রাতে পৌঁছচ্ছি। ভালবাসা নিয়ো।" কোন স্বাক্ষর নেই।
দরকার নেই। ধন্যবাদ।
এ নিশ্চয়ই সেই জংলীটার টেলিগ্রাম!
?

তৈরী তো?
হ্যাঁ… এক মিনিট… মা, কার টেলিগ্রাম এসেছিল?
তোর নয়।
?

আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচ্য সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য বিষয়। আরবরা লড়ছে ১৯৬৭-র যুদ্ধ বিরতি রেখা ভাঙবার জন্য এবং ভেঙে যতটা সম্ভব এগিয়ে যাওয়ার জন্য, পক্ষান্তরে ইজরায়েল লড়ছে এই রেখা রক্ষার জন্য। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলি এক জোট। এদিকে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি অধিবেশনের জন্য তৎপরতা শুরু হয়েছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে ছয় দিন প্রাণপণ চেষ্টা করেও সুয়েজের পূর্ব তীর থেকে আরবদের সরাতে পারেনি। তবু কোন একটা গোপন হিসাবের উপর ভিত্তি করে তেল আভিভ বিশ্বের সব ইজরায়েলী রাষ্ট্রদূতকে জানিয়েছে যে আরবদের বিরুদ্ধে তারা খুব বড় রকমের আক্রমণ চালাবে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পরে পশ্চিম এশিয়ায় রণে শামিল হল আরও দুই পক্ষ, জরডন ও সৌদি আরব। ১৪ অক্টোবর পশ্চিম এশিয়ার রণাঙ্গন উত্তাল। সিনাই ও সিরিয় দুই ফ্রন্টেই চলেছে প্রচণ্ড লড়াই। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট শ্রীজরজ পম্পিদু লিবিয়ার নেতা শ্রী এম গাড্ডাফির কাছে বলেছেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী মধ্য প্রাচ্যের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে গত সপ্তাহের মাঝামাঝি।

দেশী সংবাদ

৮ **অক্টোবর**—কেন্দ্রীয় সরকারের অসামরিক কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন মাসে ১৯৬ টাকা করা হল। তৃতীয় বেতন কমিশন ন্যূনতম বেতন মাসে ১৮৫ টাকা ধার্য করেছিলেন। সরকার তার চেয়ে ১১ টাকা বাড়িয়ে দিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ উইলিংডন হাসপাতালের এমারজেন্সি ওয়ার্ডে হাজির হলে ডাক্তার, নার্স ও রোগীরা বিস্মিত হয়ে যান। শ্রীমতী গান্ধী সরাসরি একজন রোগীর নিকট চলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কি ভাল চিকিৎসা পাচ্ছেন? পা-ভাঙা শয্যাশায়ী রোগী স্মিতহাস্যে জবাব দেন 'আজ্ঞে হাঁ।'

৯ **অক্টোবর**—আজ বারানসীতে একটি ব্যাঙ্ক ভবনের কাছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা লুঠ হয়। অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজন আততায়ীর গুলিতে দুজন প্রাণ হারায় এবং আততায়ীরা ওই টাকা নিয়ে উধাও হয়। সংসদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের আইন ও শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ আজ প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে খাদ্যনীতি ও খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে খাদ্য কমিশনার শ্রী এস বি রায়ও ছিলেন।

১০ **অক্টোবর**—অন্যের নামের টিকিটে রেল ভ্রমণের অভিযোগে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুজোর ছুটির সময় রেল এবং বিশেষ পুলিশ যুক্তভাবে একটি অভিযান চালান, এবং তাতে দেখা যায় রেলের আসন সংরক্ষণে সময়সীমা তুলে দেওয়ার ফলে এই যাত্রীরা শিকার হয়েছেন। কালোবাজারে বাইরে থেকে এদের টিকিট কিনতে হয়েছিল।

ভাড়া যেতে অস্বীকার করার অভিযোগে অভিযুক্ত ট্যাক্সিওয়ালাদের কাছ থেকে ১৯৭৩ সালে গত ৮ মাসে ২০ হাজার ৬৩০ টাকা জরিমানা আদায় হয়েছে। ১৯৭২ সালে সারা বছরে ওই বাবদ আয় হয়েছিল ১৮ হাজার ৯শ টাকা।

১১ **অক্টোবর**—বিহারের বিভিন্ন স্থানে বিলাস দ্রব্যের দোকানগুলি ঘেরাও করার জন্য সপ্তাহব্যাপী একটি কর্মসূচী সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল চূড়ান্তভাবে স্থির করেছেন। ১১ থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত তারা এই আন্দোলন করবেন। দলের জাতীয় পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীকেদারপ্রসাদ সিং বলেন, বিভিন্ন কলকারখানার মালিকানায় যে সব দোকান রয়েছে সেখানে তাঁরা ১৯৭১ সালের বেঁধে দেওয়া দামে জিনিস বিক্রি করতে বাধ্য করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন খাদ্যনীতির কথা এই মাসের [illegible] ঘোষণা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় শিলিগুড়িতে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এই মর্মে আভাস দেন যে সরকারের নিয়ন্ত্রণে [illegible] প্রচুর ভাণ্ডার গড়ে তোলাই এই খাদ্যনীতির প্রধান কাজ হবে।

১২ **অক্টোবর**—রেল মন্ত্রকের গবেষণা ও নকশা প্রস্তুত শাখার সহযোগিতায় [illegible] পরমাণু গবেষণা সংস্থা রেলপথের জন্য স্বয়ংক্রিয় সংকেতীকরণ সরঞ্জাম উদ্ভাবনের কাজ নিয়েছেন। [illegible] ড্রাইভার যদি কোন কারণে সিগনাল অগ্রাহ্য করে এগোতে থাকেন তবে এই যন্ত্র তাঁকে আর একবার হুঁশিয়ার করে দেবে।

আজ অপরাহ্নে দার্জিলিং থেকে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে একটি যাত্রী বোঝাই বাস প্লাবিত পাহাড়ী নদী জলঢাকার তীব্র স্রোতে ভেসে যায়। এর ফলে ৭৪ জনের সলিল সমাধি হয়েছে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

১৩ **অক্টোবর**—কলকাতা পুলিশ আজ সরষের তেল, সরষের বীজ ও ডাল ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত পাঁচজন বড় ব্যবসায়ীকে ভারতরক্ষা বিধি বলে গ্রেফতার করেছে। এদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এরা অন্যান্য রাজ্যে এদের অংশীদারদের পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য দ্রব্যাদি পাঠানোর জন্য ইতিপূর্বে টেলিগ্রাম করেছিলেন।

আজ ভারতীয় বিমান বাহিনীর দু[illegible] বিমান হরিয়ানার আম্বালার কাছে ভেঙে পড়ে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে কেউ হতাহত হয়নি। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

১৪ **অক্টোবর**—হাতে হাতকড়া। কোমরে দড়ি লাগিয়ে আজ (রবিবার) ৬জন ব্যবসায়ীকে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী লালবাজার সেন্ট্রাল লক আপ থেকে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে হাঁটিয়ে ব্যাংকশাল কোর্টে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। আদালতের কাছে জামিনের আবেদন করা হ[illegible] আদালত তা অগ্রাহ্য করেন এবং ২২ অক্টোবর পর্যন্ত ওই ব্যবসায়ীদের পুলিশ হাজতে আটক রাখার নির্দেশ দেন।

বিদেশী সংবাদ

৮ **অক্টোবর**—পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের বিষয় প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভের মধ্যে গতকাল সরকারী বার্তা বিনিময় হয়েছে। পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিংগার চীনা রাষ্ট্রদূত হুয়াং চেনের সঙ্গেও এ নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন।

৯ **অক্টোবর**—পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপারে দায়িত্বশীল আচরণের প্রত্যাশী আমরা। অনুরূপ আচরণ করুন। নইলে শান্তি [illegible] [illegible]। রাশিয়াকে হুঁশিয়ারি দিয়ে এ কথা বলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডঃ কিসিংগার।

১০ **অক্টোবর**—পশ্চিম এশিয়া পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় সময় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ইজরায়েলি প্রতিনিধির প্রতিবাদে [illegible] নিরাপত্তা পরিষদ থেকে বেরিয়ে যান। তিনি বলেন এই বোমা বর্ষণের ফলে ৩০জন সোভিয়েত নিহত হয়েছেন।

১১ **অক্টোবর**—পশ্চিম এশিয়ায় জোর যুদ্ধ চলছে। আর এদিকে দুই বৃহৎ শক্তির দুই নৌবহর পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর আর অন্যটি রুশ নৌবহরের [illegible] [illegible]। প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেলেই উভয় নৌবহর যুধ্যমান পক্ষগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে পারবে।

১২ **অক্টোবর**—পরমাণু বোমা তৈরির অন্যতম মশলা প্লুটোনিয়াম ইজরায়েলের হাতে রয়েছে। প্লুটোনিয়াম আছে ৭৫ পাউন্ডের মত। এ দিয়ে ৫ থেকে দশটি পরমাণু বোমা তৈরি করা যায়। ১৯৬৮ সালেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, পরমাণু বোমা বানানোর কৌশল আমাদের জানা আছে।'

১৩ **অক্টোবর**—সৌদি আরবের [illegible] হুমকি দিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ইজরায়েলকে নতুন করে অস্ত্র সরবরাহ করে তা হলে আমরা আমেরিকাকে তেল দেব না, এবং কূটনৈতিক সম্পর্কও রাখব না। আর্থিক সম্পর্কও নয়।

১৪ **অক্টোবর**—জল-স্থলে অন্তরীক্ষে ইজরায়েলের যা যা সমরাস্ত্র ক্ষতি হয়েছে আমেরিকা তার সবগুলিই পূরণ করে দেবে। এই খবর মার্কিন সরকারী সূত্রের। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর অবশ্য এ ব্যাপারে বেশী কথা বলতে নারাজ।

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৪০ বর্ষ

৪০ সংখ্যা হইতে ৫১ সংখ্যা পর্যন্ত

পণ্ডস
ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক

ভোরের স্নিগ্ধ পরশের আমেজে সারাদিন আপনাকে ঘিরে রাখে

শীতল জলে স্নানে যেমন সুখের শিহরণ জাগে···শিশির-ধোয়া ভোরে যেমন খুশীর পরশ লাগে···পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক মাখলে তেমনি মনে হবে ঝরঝরে মনোরম···সারাদিন, সারাক্ষণ। হালকা-সুবাস জড়ানো এই ট্যাল্‌ক ঘাম টেনে নেয় নিমেষে আর অঙ্গ সৌরভ আপনাকে ক'রে তোলে প্রিয়-সঙ্গিনী! এই ট্যাল্‌ক সারা বছর সারা শরীরে মাখা যায়।

৩ রকম সাইজে পাওয়া যায়: ফ্যামিলি, লার্জ, মিডিয়াম

পণ্ডস ফেস পাউডার

সব ফেস পাউডারের চেয়ে পণ্ডসই রূপসীদের প্রিয়।

চীজব্রো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড
(সীমিত দায়িত্বসহ ইউ.এস এ.তে সংস্থাপিত)

P-5588

REGD. NO. C 2106 DESH WEEKLY, 27th October, 1973

রকমারি রঙের বাহার

আপনার স্বপ্ন ICI ডুলাক্স পাকা রঙের ছোঁয়ায় রূপায়িত হয়ে উঠবে

★ আপনি যেমনটি চান, আপনার রুচি ও মেজাজ অনুযায়ী উজ্জ্বল বা হাল্‌কা, রকমারি রঙের বাহার এনে দেয় সুশ্রী ও সুন্দর—ডুলাক্স।

★ ডুলাক্স দিয়ে রং করা জিনিস সহজেই ধুয়ে পরিষ্কার করা যায় কারণ ডুলাক্স পুরোপুরি জল-নিরোধক।

★ নিখুঁত ফিনিশ—ডুলাক্স রঙে হেরফের নেই।

★ ডুলাক্স সত্যিকারের পাকা রং, ফিকে হবে না। আপনার রঙের স্বপ্নকে সার্থক ও স্থায়ী করবে।

DULUX

DULUX

নামজাদা কোনো ইনটিরিয়র ডিজাইনারকে জিজ্ঞেস করেই দেখুন না।

কলকাতার সুপরিচিত ইনটিরিয়র ডিজাইনার শ্রীকমল মজুমদারের মতে "আপনার দেওয়ালের রং সত্যি কেমন দেখাবে তা আপনার রং বাছাইয়ের উপরেই শুধু নির্ভর করে না, নির্ভর করে বাছাই রঙের গুণাগুণের উপরও। অবশ্য কোন্ জায়গায় কতটুকু লাগাবেন, আপনার রং পরিকল্পনা তার উপযুক্ত হওয়া চাই। সেই সঙ্গে বিচার করে নিতে হবে প্রত্যেকটি ঘরের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য; তার আকার-আকৃতি, অঙ্গসজ্জা, ঘরের ভিতরকার আলোকের পরিমাণ ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়। তাহলেই আপনার রং পরিকল্পনা হয়ে উঠবে স্বচ্ছন্দ আর বস্তুনিষ্ঠ। উৎকৃষ্ট রঙের কাজে তাই গোড়ার কথাটি হলো—বাজারের সেরা রং বাছাই"।

ডুলাক্স ইন[illegible] সার্ভিসেস
পোঃ বক্স ১০২২২ কলিকাতা ৭০০০১৯

ডুলাক্স রং দিয়ে ঘর সাজান পরিকল্পনার একটি ফোল্ডার অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠাবেন।

নাম ....

ঠিকানা ....

পেশা ....

ডুলাক্স প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা :
দি অ্যালকালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ডুলাক্স—ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড, লণ্ডন-এর ট্রেডমার্ক।
রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী : দি অ্যালকালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।
ACCI (P) 7707

গৃহসজ্জায়—ডুলাক্স আপনার পরম বন্ধু